১৪২. ৫৫. ৪৪৫.৭.

নবজীবন

দ্বিতীয় ভাগ।

NATIONAL LIBRARY
No. 2654
Date 19.7.54
CALCUTTA

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক
সম্পাদিত।

দ্বিতীয় বৎসরের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
,, ডাক্তার দীননাথ সান্যাল
,, চন্দ্রশেখর বসু
,, রমেশচন্দ্র দত্ত
,, শশধর তর্কচূড়ামণি
,, তারকনাথ বিশ্বাস
,, চন্দ্রনাথ বসু
,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
,, চিরঞ্জীব শর্ম্মা
,, দেবেন্দ্রবিজয় বসু
,, নীলকণ্ঠ মজুমদার
,, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, কালিনাথ দত্ত
,, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
,, ভগবতীচরণ ঘোষ
,, রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
,, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
,, দেবকণ্ঠ বাকচী
,, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
,, পূর্ণচন্দ্র বসু
,, রজনীকান্ত গুপ্ত
,, গোপালচন্দ্র চৌধুরী
,, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
,, ডাক্তার রামদাস সেন
,, শ্রীশচন্দ্র রায়
,, জয়চন্দ্র রায়চৌধুরী
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস
,, নগেন্দ্রনাথ বসু
,, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
,, তারণবন্ধু ভট্টাচার্য্য
,, উমেশচন্দ্র গুপ্ত
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়
ও সম্পাদক।

কলিকাতা।

৫১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, সাধারণী প্রেসে, শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৩ সাল।

সূচিপত্র।

নবজীবন।

২য় ভাগ } শ্রাবণ ১২৯২। { ১ম সংখ্যা।

ভক্তি।

এবা

ঈশ্বরে ভক্তি। ষষ্ঠ কথা।

ভগবদ্গীতা—সন্ন্যাস।

গুরু। তার পর, আর একটা কথা শোন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যৌবনে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়, মধ্যবয়সে গৃহস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্ম্মে ঠিক তাহা বলা হয় নাই; বরং কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহাই সত্য কথা, কেননা অধ্যয়নও কর্ম্মের মধ্যে এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সে যাই হোক, মনুষ্যের এমন এক দিন উপস্থিত হয়, যে কর্ম্ম করিবার সময়ও নহে, জ্ঞানোপার্জ্জনের সময়ও নহে। তখন জ্ঞান উপার্জ্জিত হইয়াছে, কর্ম্মেরও শক্তি আর নাই। হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার বিধি আছে। তাহাকে সচরাচর সন্ন্যাস বলে। সন্ন্যাসের স্থূল মর্ম্ম কর্ম্মত্যাগ। ইহাও মুক্তির উপায় বলিয়া ভগবৎ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। বরং তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যদিও জ্ঞানযোগে আরোহণ করিবার যে ইচ্ছা করে, কর্ম্মই তাহার সহায়, কিন্তু যে জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছে, কর্ম্মত্যাগ তাহার সহায়।

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৬।৩

শিষ্য। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা। তবে কি সংসারত্যাগ একটা ধর্ম্ম? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত?

গুরু। পূর্ব্বগামী হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের তাহাই মত বটে। জ্ঞানীর পূ
কর্ম্মত্যাগ যে তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য। এ বি
ভগদ্বাক্যই প্রমাণ। তথাপি কৃষ্ণোক্ত এই পুণ্যময় ধর্ম্মের
শিক্ষা নহে যে কেহ কর্ম্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ করিবে। ভগ
বলেন, যে কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ উভয়েই মুক্তির কারণ, কিন্তু ত
কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তুকর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে॥ ৫।২

শিষ্য। তাহা কখনই হইতে পারে না। জ্বরত্যাগটা যদি ভাল
তবে জ্বর কখন ভাল নহে। কর্ম্মত্যাগ যদি ভাল হয়, তবে কর্ম্ম ভাল হই
পারে না। জ্বরত্যাগের চেয়ে কি জ্বর ভাল?

গুরু। কিন্তু এমন যদি হয় যে কর্ম্ম রাখিয়াও কর্ম্মত্যাগের ফ
পাওয়া যায়?

শিষ্য। তাহা হইলে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেননা তাহা হইলে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ
উভয়েরই ফল পাওয়া গেল।

গুরু। ঠিক তাই। পূর্ব্বগামী হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ, কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যা
গ্রহণ। গীতার উপদেশ, কর্ম্ম এমন চিত্তে কর, যে তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল
প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে?
বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিষ্প্রয়োজনীয় দুঃখ।

জ্ঞেয়ঃসনিত্যঃ সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি নাকাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলং॥
যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃপশ্যতি স পশ্যতি॥
সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তোমুনির্ব্রহ্মনচিরেণাধিগচ্ছতি। ৫।৩—৬।

"যাঁহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই; তাঁহাকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলি
জানিও। তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষেরাই, সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে
(সাংখ্য) সন্ন্যাস ও (কর্ম্ম) যোগ যে পৃথক ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিতে ন

কের আশ্রয়ে, একত্রে উভয়েরই ফল লাভ করা যায়। সাংখ্যে (সন্ন্যাসে)* যাহা পাওয়া যায়, (কর্ম্ম) যোগেও তাই পাওয়া যায়। যিনি উভয়কে একই দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শী। হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ বিনা সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্ম পায়েন।" স্থূল কথা এই যে যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্ম্ম সম্বন্ধেই সন্ন্যাসী, তিনিই ধার্ম্মিক।

শিষ্য। এই পরম বৈষ্ণব ধর্ম্মত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগীরা ডোর কৌপীন পরিয়া সং সাজিয়া বেড়ায় কেন বুঝিতে পারি না। ইংরেজেরা যাহাকে Asceticsm বলেন, বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এখন দেখিতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্ম্মে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। অথচ এমন পবিত্র, সর্ব্বব্যাপী, উন্নতিশীল, বৈরাগ্য আর কোথাও নাই। ইহাতে সর্ব্বত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্ম্ম বৈরাগ্য; অথচ Asceticsm কোথাও নাই। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম্ম, জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। গীতা থাকিতে, লোকে, বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরাণে ধর্ম্ম খুঁজিতে যায়, ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই ধর্ম্মের প্রথম প্রচারকের কাছে, শাক্য (সিংহ বা যীশু বা) কেহই ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। এ অতিমানুষ ধর্ম্ম প্রণেতা কে?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই সকল কথা গুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু কৃষ্ণ যে গীতোক্ত ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ, যে এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদায় মনুষ্যজীবন শাসিত এবং নীতি ও ধর্ম্মের সকল উচ্চতত্ত্ব একতা প্রাপ্ত হইয়া, পবিত্র হইতেছে। কাম্য কর্ম্মের ত্যাগই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ। ১৮। ২

* "সাংখ্য" কথাটির অর্থ লইয়া আপাতত গোলযোগ বোধ হইতে পারে। যাঁহাদিগের এমত সন্দেহ হইবে, তাঁহারা শাঙ্কর ভাষ্য দেখিবেন।

যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, ও ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।

শিষ্য। মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে?

গুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্ত্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য যে এই কর্ম্মহীন সন্ন্যাস, নিকৃষ্ট সন্ন্যাস। কর্ম্ম, বুঝাইয়াছি—ভক্ত্যাত্মক। অতএব এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্য্য এই যে ভক্ত্যাত্মক কর্ম্মযুক্ত সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস।

সপ্তম কথা।

ধ্যান বিজ্ঞানাদি।

গুরু। ভগবদ্গীতার পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে সৈন্য দর্শন, দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগের স্থূলাভাস, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্ম্মযোগ, চতুর্থে জ্ঞান কর্ম্ম-ন্যাসযোগ, পঞ্চমে সন্ন্যাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি। ষষ্ঠে, ধ্যানযোগ ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন নাই। যে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে যোগী। যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্তি হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্র লোভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধ হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে, অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ—নহিলে খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া বার বৎসর একঠাঁই বসিয়া চোক্ বুঝিয়া ভাবিলে যোগ হয় না। কিন্তু যোগীর মধ্যে ও প্রধান ভক্ত—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। ৬।৪৭

"যে আমাতে আসক্ত-মনা হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, আমার মতে যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ।" ইহাই ভগবদুক্তি। অতএব এই গীতোক্ত ধর্ম্মে, জ্ঞান, কর্ম্ম, ধ্যান, সন্ন্যাস,—ভক্তি ব্যতীত কিছুই সম্পূর্ণ নহে। ভক্তিই সর্ব্বসাধনের সার।

সপ্তমে বিজ্ঞান যোগ। ইহাতে ঈশ্বর, আপন স্বরূপ কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নির্গুণ ও সগুণ, অর্থাৎ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বিশদরূপে বলিয়াছেন, যে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়।

অষ্টমে, তারক ব্রহ্মযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিযোগ। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (ইহাই তাহাতে কথিত হইয়াছে।)

নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহ্যযোগ। ইহাতে অতিশয় মনোহারিণী কথা সকল আছে। ইতিপূর্ব্বে জগদীশ্বর একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন,—"যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্বগ্রথিত রহিয়াছে।" অষ্টমে আর একটি সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে যথা,—

"আমার আত্মা ভূত সকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্ব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে।" হর্বর্ট স্পেন্সরের নদীর উপর জলবুদ্বুদের উপমা অপেক্ষা এই উপমা কতগুণে শ্রেষ্ঠ!

শিষ্য। চক্ষু হইতে আমার ঠুলি খসিয়া পড়িল। আমার একটা বিশ্বাস ছিল—যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদটা Pantheism মাত্র। এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

গুরু। ইংরেজি সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের আলোচনার দোষই। আমাদের মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাঁচের টম্‌লরে না খাইলে তাঁহাদের জল মিষ্ট লাগে না। তোমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয়, যে মনুষ্য মাত্রেই—মূর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,—সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরূপে পরিত্রাণের অধিকারী, এ

সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধর্ম্মে ও খৃষ্টধর্ম্মেই আছে, বর্ণভেদজন্ত হিন্দুধর্ম্মে নাই। এই অধ্যায়ের দুইটা শ্লোক শ্রবণ কর।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং। ৯৷২৯

*　　*　　*　　*

মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥ ৯৷৩২

"আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার দ্বেষ্য বা কেহ প্রিয় নাই; যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, আমি তাহাতে সে আমাতে। * * পাপীরাও আমাকে আশ্রয় করিলে পরাগতি পায়—বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক, সকলেই পায়।

শিষ্য। এটা বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গুরু। কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে ৫৪৩ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ মরিয়াছেন; কাজেই তাঁহাদের দেখা দেখি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ, যে যাহা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে হিন্দুধর্ম্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী, যে ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এই শিক্ষিত মূর্খ সম্প্রদায় ভুলিয়া যায়, যে বৌদ্ধধর্ম্ম নিজেই এই হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল, ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাহা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না?

শিষ্য। যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ রাগটুকু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে রাজগুহ্য যোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই।

গুরু। রাজগুহ্য যোগ সর্ব্বপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যদিও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যেভাবে চিন্তা করে, সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পায়। যাঁহারা দেব দেবীর সকাম উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহে সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা নিষ্কাম বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন, কেন না ঈশ্বর ভিন্ন অন্য

দেবতা নাই। তবে যাঁহারা সকাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা যে ভাবান্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না, তাহার কারণ সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরন্তু ঈশ্বরের নিষ্কাম উপাসনাই মুখ্য উপাসনা, তদ্ভিন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অতএব সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম্ম ও মোক্ষের উপায়। এই রাজগুহ্য যোগ ভক্তিপূর্ণ।

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাঁহার বিভূতি (Attributes) সকল কথিত হইতেছে। এই বিভূতিযোগ অতি বিচিত্র. কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। দশমে বিভূতি সকল বিবৃত করিয়া, তাঁহার প্রত্যক্ষ স্বরূপ. একাদশে ভগবান অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই ভক্তিযোগ শুনাইব।

অষ্টম কথা।

ভগবদ্গীতা—ভক্তিযোগ।

শিষ্য। ভক্তিযোগ বলিবার আগে, একটা কথা বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর এক, কিন্তু সাধন এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না।

গুরু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে সকল সময়ে সোজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, দুই একজন বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহিত। এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে। যে সংসারী তাহার পক্ষে কর্ম্ম; যে অসংসারী তাহার পক্ষে সন্ন্যাস। যে জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাঁহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বসাধন শ্রেষ্ঠ রাজগুহ্য যোগই প্রশস্ত। অতএব সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি করুণাময়—যাহাতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

শিষ্য। কিন্তু আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল সাধনের অন্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে পথ সোজা হইত।

গুরু। কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই। এই বিবিধ সাধন, বিবিধ অনুশীলন পদ্ধতি। আমার কথিত অনুশীলন তত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে একথা শীঘ্র বুঝিবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলন পদ্ধতি বিধেয়। যোগ, সেই অনুশীলন পদ্ধতির নামান্তর মাত্র।

শিষ্য। কিন্তু যে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধন বিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকের পক্ষে দুই সাধ্য। যাহার পক্ষে দুই সাধ্য সে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? দুই ভক্তি বটে জানি, তথাপি জ্ঞান-বুদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর ভক্তি কর্ম্ম ময়ী ভক্তি মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

গুরু। দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে এই প্রশ্নই অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং এই প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ। এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই গীতার পূর্ব্বগামী; একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা যায় না।

শিষ্য। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন?

গুরু। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, ও ঈশ্বর-ভক্ত উভয়ই ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে ব্রহ্মোপাসকেরা অধিকতর দুঃখ ভোগ করে; ভক্তেরা সহজে উদ্ধৃত হয়।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ॥ ১২।৫৭

শিষ্য। এক্ষণে বলুন তবে এই ভক্ত কে?

গুরু। ভগবান স্বয়ং তাহা বলিতেছেন।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকোলোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ সচ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
যো ন হৃষ্যতি নদ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমাভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ১২।১৩—২০

যে মমতাশূন্য, (অর্থাৎ যার 'আমার! আমার!' জ্ঞান নাই) অহঙ্কারশূন্য, যাহার সুখ দুঃখ সমানজ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাত্মা এবং দৃঢ় সঙ্কল্প, যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এমন যে আমার ভক্ত সেই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোক হইতে নিজে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয় এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সেই আমার প্রিয়। যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, অথচ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাঁহার কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষ ও নাই, যিনি শোক ও করেন না, বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাঁহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখসমান, যিনি আসঙ্গ বিবর্জ্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা সুসন্তুষ্ট, এবং যিনি সর্ব্বদা আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয়। এই ধর্ম্মামৃত যেমন বলিয়াছি যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্ আমার পরমভক্ত, আমার অতিশয় প্রিয়।"

এখন বুঝিলে ভক্তি কি*? মালা ঠক্ ঠক্ করিয়া হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্ম-জয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই। এরূপ উদার, এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। এই জন্য ভগবদ্গীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিবর্ত্তন।

জগতের প্রত্যেক পদার্থেরই তিনটি করিয়া অবস্থা। যে অবস্থাকেই আমরা কোন পদার্থের বর্ত্তমান অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইনা কেন, সেই অবস্থা সংঘটনের পূর্ব্বে উহার অন্য একটি অবস্থা ছিল; আর, অবস্থিতি কালের পরেও আবার অপর একটি অবস্থা ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক পদার্থই আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভাবে, অন্য আকারে অবস্থিত ছিল; আবার, স্থিতি-কাল নানাভাবে কাটাইয়া, পরে প্রত্যেক বস্তুই অবস্থান্তর পরিগ্রহ করে। পদার্থের অবস্থার এই ত্রিকালব্যাপী বিবরণের নাম, বিবর্ত্তন। প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় এই বিবর্ত্তন আনুপূর্ব্বিক সর্ব্বতোভাবে জানিতে হয়;—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর-ভাব ধারণ করা হইতে আরম্ভ করিয়া, ইন্দ্রিয়গোচর-ভাব পরিত্যাগ করা পর্য্যন্ত, পদার্থের যে যে রূপ-ভেদ হয়, পদার্থের ইতিহাসে

---

* নবজীবনে "মৈত্রী" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। লেখকের সঙ্গে আমার এই প্রভেদ যে, তাঁহার কথিত "মৈত্রী" যে ভক্তির অন্তর্গত এ কথাটি তিনি তত স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ভক্তি মূল, মৈত্রী শাখা। এই "মৈত্রী" এই অনুশীলন তত্ত্বে "প্রীতি" বলিয়া কথিত হইয়াছে ও হইবে। লেখকের অনেকগুলি কথা আমাকে পুনরুক্ত করিতে হইবে।

পর্য্যায়ক্রমে সে সমস্তই জানিবার বিষয়। ' এই বিবর্ত্তন জ্ঞানই পদার্থ-তত্ত্বের চরম-জ্ঞান। আংশিকরূপে এ জ্ঞান সকলেরই কিছু না কিছু আছে; বিজ্ঞান কেবল পরিধি বাড়াইয়াছে মাত্র। কতকগুলি পদার্থের কতকগুলি অবস্থার ইতিহাস, সকলেই জানেন; বিজ্ঞান, জগতের সমস্ত পদার্থের সমগ্র ইতিহাস জানাইতে ব্যগ্র। সকলেই জানেন যে, মানবের ইতিহাস, ক্রমান্বয়ে—শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু; বিজ্ঞান দেখাইয়াছে যে, শৈশবের পূর্ব্বেও একটা জরায়ু-বাসাবস্থা আছে, আর মৃত্যুর পরেও শরীরের একটা ধ্বংসাবস্থা আছে। জরায়ু মধ্যে শুক্র ও বীজের সংযোগে সূক্ষ্মতম মানবাণুর সৃষ্টি হইল। একটি মনুষ্যের ইতিহাসের আরম্ভ এইখান হইতে। আর, মৃত্যুর পর যখন দেহ-ধ্বংস হইতে লাগিল, যখন সংশ্লিষ্ট পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া দেহ ভাগের লোপ হইয়া গেল, তথায় সেই মনুষ্য দেহের ইতিহাসের শেষ। শুধু মানুষ বলিয়া নহে, জগতের প্রত্যেক পদার্থের,—অগণ্য—নক্ষত্র—পরিব্যাপ্ত জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম বালুকাকণা পর্য্যন্ত,—জীবোত্তম মানব হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য একটি লতা-কীট পর্য্যন্ত,—এই বিশাল-ক্ষেত্রান্তর্গত সমস্ত জড় পদার্থেরই, যে একটি একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, বিজ্ঞান সে সকলেরই অনুশীলন করিতেছে। ইহাই বিবর্ত্তন।

এখন সহজেই বুঝা যায় যে, দুইটি প্রধান ঘটনা লইয়াই বিবর্ত্তন;—একটি বিকাশ, আর একটি বিনাশ। যতকাল কোন একটি পদার্থ ইন্দ্রিয়-গোচর ভাবে থাকে, ততকালের মধ্যে উহার যে সকল অবস্থা-পরম্পরা ঘটে, তাহাতে দুইটি সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন প্রকারের অবস্থা পরিলক্ষিত হয়;—একটি বিকাশাবস্থা, আর একটি বিনাশাবস্থা। সঞ্চার-সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পদার্থের বিকাশাবস্থা আর পূর্ণতা প্রাপ্তির পর হইতে বিচ্ছেদ বিলয় বিঘটন পর্য্যন্ত, বিনাশাবস্থা। নব সঞ্চারিত ভ্রূণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ যৌবন-বিভাসিত সুঠাম গঠন পর্য্যন্ত মানবের বিকাশাবস্থা; আর পূর্ণ যৌবন হইতে আরম্ভ করিয়া বিচ্ছিন্ন—গলিত—দেহভাগজাত বাষ্পাকার পর্য্যন্ত মানব দেহের বিনাশাবস্থা। যেমন মানবের, সকল পদার্থের বিবর্ত্তনেই তেমনই দুইটি ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়,—বিকাশ, আর বিনাশ। এস্থলে আরও একটু বুঝিতে হইবে। অবিমিশ্র বিকাশ বা অবিমিশ্র বিনাশ জগতে কোথাও ঘটে না। কোন

একটি পদার্থের ক্রমাগত কিছুকাল বিকাশ হইতে থাকিল, তখন তাহাতে বিনাশের সংস্পর্শ মাত্র নাই; তার পর আর কিছুকাল ক্রমাগত বিনাশ চলিতে লাগিল, তখন তাহাতে বিকাশের লেশ মাত্র নাহি; এরূপ ঘটনা অসম্ভব। বিবর্ত্তনে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিকাশ ও বিনাশ জড়িত ভাবে চলিতেছে। পদার্থের ইতিহাসে এমন এক সময়ও নাই, যখন বলিতে পারা যায় যে, এখন ইহার বিশুদ্ধ বিকাশ হইতেছে বা অমিশ্র বিনাশ চলিতেছে। পদার্থের সকল সময়ের সকল অবস্থাতেই বিকাশ ও বিনাশ, দুই বিরাজমান। তবে, যখন বিনাশাপেক্ষা বিকাশের পরিমাণ বেশী, তখনই সমগ্র পদার্থটির বিকাশাবস্থা বলা যায়; আর, যখন বিকাশাপেক্ষা বিনাশের পরিমাণ বেশী, তখনই তাহার বিনাশাবস্থা। বিকাশ যেমন, বিনাশও তেমনই, দুই সমভাবে চলিয়াছে. পদার্থটি ন-বিকাশ ন-বিনাশ ভাবে রহিয়াছে, এরূপ স্থিরাবস্থা পদার্থের কখনও ঘটে না। এক সময়ে বিকাশের জয়, বিনাশের পরাজয়; আবার তাহার পরেই বিনাশের জয়, বিকাশের পরাজয়; যতদিন বিকাশ বিনাশের জয় পরাজয়, পর পর, এইরূপ ভাবে চলিতে থাকে, ততদিন স্থূল দৃষ্টিতে আমরা পদার্থের স্থিরাবস্থা দেখি। বস্তুত উহা স্থিরাবস্থা নহে,—উহা জয় পরাজয়ের চক্র পরিবর্ত্তন মাত্র। ইহাই পদার্থের যৌবন। যখন অল্প স্বল্প বিনাশ সত্ত্বেও পদার্থটি বিকাশোন্মুখ, তখন বিকাশ-প্রবল বাল্য; যখন বিকাশ ও বিনাশ, দুই প্রবল,—কখনও একের জয়, কখনও অন্যের জয়, তখন পদার্থের মধ্যকাল বা যৌবন; আর যখন বিনাশই প্রবল, বিনাশের মুখে বিকাশ "থই" পাইতেছে না, ডুবিয়া যাইতেছে, তখনই বিনাশোন্মুখ—বার্দ্ধক্য। বিবর্ত্তনে পদার্থের এই তিনটি অবস্থা,—বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য। ফলে, মূল কথা, ঐ বিকাশ ও বিনাশ লইয়া; সুতরাং বিকাশ কি, বিনাশই বা কি; কিসে পদার্থের বিকাশ হয়, কিসেই বা বিনাশ ঘটে, এখন ইহাই বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

পদার্থ মাত্রই পরমাণু সমষ্টি*। ক্ষুদ্রতম পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া পদার্থ-আকার ধারণ করে। সুতরাং আকর্ষণ-ভেদে, পদার্থের রূপ

* পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশই পরমাণু নামে অভিহিত হইল; অর্থাৎ পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম অংশটুকুকে তাহার 'পদার্থত্ব বজায় রাখিয়া আর

ভেদ হয়। কঠিন পদার্থের পরমাণুদিগের পরস্পর যেরূপ আকর্ষণ, তরল পদার্থের পারমাণবিক আকর্ষণ ততটা নহে; আবার বাষ্পীয় পদার্থের আরও কম। তাই, কঠিনের পরমাণুদিগের মিলন যত দৃঢ়, তরলের তত নহে; বাষ্পীয় পদার্থের পরমাণু সকল ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে পারিলেই বাঁচে। তাই, কঠিন পদার্থ নিজের নির্দ্দিষ্ট আয়তন-পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়াই সন্তুষ্ট; বিশেষ চাপ কিম্বা বিশেষ তাপ না দিলে কিম্বা অন্য কোনরূপ বিশেষ পীড়াপীড়ি না করিলে, সহজে উহার ব্যাপকতার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তরলের ব্যাপকতা সহজেই বাড়ে। আর, বাষ্প ত ব্যাপকতার জন্য আকুল বলিলেই হয়; যতটুকু বাষ্প যতখানি স্থানেই ছাড়িয়া দেওনা কেন, তৎক্ষণাৎ উহা সমস্ত স্থানটুকু জুড়িয়া বসিবে; বাষ্পের পারমাণবিক আকর্ষণ এতই কম, উহার পরমাণু সকল এতই বিচ্ছেদোন্মুখ। অবশ্য, এই আকর্ষণ—পদার্থের আভ্যন্তরীণ পরমাণুদিগের পরস্পরের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। এক পদার্থের সহিত বা উহার পরমাণুর সহিত, অন্য পদার্থের কিম্বা অন্য পদার্থের পরমাণুর যে আকর্ষণ, সে স্বতন্ত্র কথা। এখানে কেবল পদার্থের গঠন-গত পরমাণুসমাবেশের কথাই হইতেছে। পদার্থের এই ব্যাপকতার কারণ কি? কেনই বা চাপের পীড়নে, তাপের তাড়নে, উহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়? কথাটি ভাল করিয়া বুঝা চাহি। পদার্থের পরমাণুগুলি কখনও স্থির নিস্পন্দ ভাবে থাকে না; নিরন্তর তাহাদের স্পন্দন হইতেছে। পদার্থ সকলের বাহ্যিক স্থিরভাব আমরা নিয়ত দেখিতেছি। নিরন্তর স্পন্দন কথাটা যেন কেমন কেমন বোধ হয়। এখানে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমরা যে বাহ্যিক স্থিরভাব দেখি, তাহা পরমাণু সমষ্টির। কিন্তু এক একটি পরমাণুর অবস্থা অন্যরূপ; তাহা চক্ষুরতীত, একটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বেগে, এই আভ্যন্তরীণ পারমাণবিক স্পন্দন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। কঠিনে এই স্পন্দন যত, তরলে তদপেক্ষা বেশী, আবার বাষ্পে তাহার অপেক্ষাও বেশী। অর্থাৎ, বাষ্পের পরমাণু সকলের স্পন্দন সুদূরব্যাপী। পদার্থগত তেজই এই স্পন্দনের কারণ। সুতরাং তেজের সংযোগে ঐ স্পন্দন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার তেজের বিয়োগে স্পন্দনেরও বেগ হ্রাস হয়। এই স্পন্দনেই পদার্থের ব্যাপকতা। বিজ্ঞানের চক্ষে পদার্থের

ভাগ করা যায় না, সেই কাল্পনিক বিন্দুবৎ পদার্থাংশকেই পরমাণু বলা গেল।

গঠন-রহস্য কি চমৎকার! কঠিনতম শিলাখণ্ড হইতে অদৃশ্য বাষ্প পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত পদার্থই যেন এক একটি আবর্ত্ত। সকল পদার্থেই নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ পরমাণু সকল নির্দ্দিষ্ট বেগে নাচিতেছে, সকলই চাঞ্চল্যময়। এই চাঞ্চল্যেই, এই স্পন্দনেই পদার্থে তারল্যকাঠিন্য-ভেদ, পদার্থের ব্যাপকতা।

পদার্থের গঠন সম্বন্ধে আর একটি কথা এইখানেই বলা ভাল। পূর্ব্বে যাহা বলা গেল, তাহা কেবল পদার্থের কাঠিন্য ও অবস্থা ভেদ সম্বন্ধে। তদ্ভিন্ন পদার্থের এক একটা প্রকৃতি আছে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। পদার্থনিচয়ের মধ্যে যেমন কাঠিন্য-ভেদ ও অবস্থাগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, তেমনই প্রকারগত বৈষম্যও দেখা যায়। পরমাণু-গণের পরস্পর সমাবেশের, বিভিন্নতাই, পদার্থের এই প্রকৃতিগত বৈষম্যের কারণ। পদার্থের কাঠিন্য ও অবস্থা যেমন পরমাণুগণের স্পন্দনের উপর নির্ভর করে, পদার্থের প্রকৃতি তেমনই পরমাণুগণের সমাবেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ক-ক-খ-খ এইরূপ সমাবেশের মিশ্র পদার্থ এক প্রকৃতির, ক-খ-ক-খ এইরূপ সমাবেশের মিশ্র পদার্থ আর এক প্রকৃতির; আবার, ক-খ-খ-ক এইরূপ সমাবেশের মিশ্র পদার্থ ঐ দুই হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। কি মিশ্র, কি অমিশ্র, সকল পদার্থেই পরমাণুগণের নানারূপ সমাবেশ হইতে পারে। আর সমাবেশের ঐরূপ ভেদেই পদার্থের প্রকৃতিগত বৈষম্য হয়। আবার, আর এক প্রকারেও পদার্থের প্রকৃতিগত বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। পরমাণুগণের পরস্পর-সান্নিধ্যের তারতম্যেই এই বৈষম্য। এক পদার্থেই কোন কারণ বিশেষে, এক অংশের পরমাণুগণ যেরূপ সন্নিহিত, হয়ত অপরাংশের পরমাণুগণ সেরূপ সন্নিহিত নহে। ইহাতেও পদার্থটির একরূপ প্রকৃতিগত বৈষম্য ঘটে। এ বৈষম্য এক পদার্থেরই এক অংশের সহিত আর এক অংশের। বায়ুর কিম্বা জলের নিম্নস্তর যেরূপ ঘন সন্নিহিত, উচ্চস্তর সেরূপ নহে; একটি লৌহ দণ্ডের একদিকে তাপ সংযোগ ও অন্যদিক হইতে তাপ সংহরণ করিলে, দুইদিকের তাপের তারতম্যবশত পরমাণু সমাবেশেরও তারতম্য ঘটে। এইরূপ সান্নিধ্য সম্বন্ধীয় তারতম্যই, পদার্থে প্রকৃতিগত আর একরূপ বৈষম্য ঘটায়। প্রথমোক্ত প্রকারের সমাবেশকে আমরা মিশ্র সমাবেশ ও অমিশ্র সমাবেশ আর শেষোক্ত প্রকারের সমাবেশকে সম-সমাবেশ ও বিষম-সমাবেশ বলিতে পারি। পরমাণু-সমাবেশ যতই মিশ্র বা বিষম ভাব ধারণ করে,

ততই পরমাণু সমষ্টি অধিকতর গতি-সম্পন্ন হয়; সুতরাং সামান্য তেজ সংস্পর্শে পরমাণু সকলে গতিবৃদ্ধি হইয়া পরস্পর হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার ততই অধিকতর সম্ভাবনা; সামান্য কারণেই একরূপ সমাবেশ ঘুচিয়া আর একরূপ সমাবেশ ঘটিয়া পড়ে। মিশ্র সমাবেশ বা বিষম সমাবেশ পদার্থকে এইরূপ পরিবর্ত্তন-প্রবণ করিয়া রাখে। পরমাণু সমষ্টির এই জটিল-গঠন ও কুটিল-গতি রহস্য কতদূর পরিস্ফুট হইল, বলিতে পারি না। সংক্ষেপেই সারিতে হইল। বিস্তারিতরূপে উদাহৃত করিয়া একথা বলিতে গেলে, এক প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠে। আর, তাহার প্রয়োজনও নাই। বিবর্ত্তন বুঝিতে যতটুকুর প্রয়োজন, সংক্ষেপে ততটুকুই বলা গিয়াছে। ক্রমে একথা আরও পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এখন ধরা যাউক,—বিকাশ কি, বিনাশই বা কি,—কিসে পদার্থের বিকাশ হয়, কিসেই বা বিনাশ ঘটে।

যখন পরমাণুর অবস্থান ও গতি লইয়াই পদার্থ, তখন পদার্থে যে রূপ-পরিবর্ত্তন ও যে গুণ-পরিবর্ত্তনই হউক না কেন, পরমাণুর অবস্থান ও গতির পরিবর্ত্তনেই তাহা সংঘটিত হইবে, বৈ কি। আর যখন রূপ-পরিবর্ত্তন ও গুণ-পরিবর্ত্তন লইয়াই পদার্থের বিবর্ত্তন, তখন পরমাণুর অবস্থানের ও গতির পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিলেই, বিবর্ত্তনের মূলতত্ত্ব জানা হইল। সুতরাং শেষ কথা দাঁড়াইতেছে এইরূপ; পরমাণুর অবস্থানের ও গতির পরিবর্ত্তন লইয়াই বিবর্ত্তন। এখন, সে পরিবর্ত্তন কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়-অগোচর অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয়গোচর অবস্থায় আসিবার সময়, বিচ্ছিন্ন সুদূরগতি সম্পন্ন পরমাণু নিচয় পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও কেন্দ্রাভিসারী হইয়া আইসে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গতিরও হ্রাস হয়। পরমাণু সমষ্টির এই সমাহারেই, এই গতিহ্রাসেই পদার্থের বিকাশ। আর, উহার বিপরীতেই বিনাশ; অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় গোচর অবস্থা হইতে পুনরায় অতীন্দ্রিয় ভাব ধারণ করিতে,—ঘনিষ্ঠ, হ্রস্বগতি পরমাণুকুলের ঘনিষ্ঠতা ঘুচিয়া যায়, গতিও বাড়ে;—পরমাণুর আবার সেই কেন্দ্রাপসারিণী বিচ্ছিন্নতা, আবার সেই দূরব্যাপিনী দীর্ঘগতি সংঘটিত হয়। ইহাতেই পদার্থের বিনাশ। বিকাশের পারমাণবিক ঘটনা,—ঘনিষ্ঠতা ও গতিহ্রাস;—আর, বিনাশের পারমাণবিক ঘটনা,—বিচ্ছিন্নতা ও গতি বৃদ্ধি।

পদার্থের যে অবস্থাই হউক না কেন, ঐ বিস্তৃত নিয়মের সীমা-মধ্যে পড়িতেই হইবে। হয়, উহার পরমাণু সকল ঘনিষ্ঠ হইতেছে এবং উহাদের গতি কমিতেছে, নয় উহার ঘনিষ্ঠ পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, আর তাহাদের সঙ্কীর্ণ গতি ঘুচিয়া আবার গতি বৃদ্ধি হইতেছে। যে অবস্থা-তেই দেখ না কেন, হয় দেখিবে বিকাশ চলিতেছে, নয় বিনাশ ঘটিতেছে। না-বিকাশ-না-বিনাশ, পদার্থের এরূপ স্থিরভাব, একেবারে অসম্ভব। বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর পরিবর্ত্তন আমরা সচরাচর গ্রাহ্য করি না; বস্তুত তখনও পরিবর্ত্তন চলিতেছে। সে পরিবর্ত্তন হয় বিকাশের দিকে, নয় বিনাশের দিকে। যে পদার্থের দিকেই তাকাই না কেন, হয় তাহার পরমাণুর বৃদ্ধি হইতেছে, ঘনিষ্ঠতা হইতেছে—নয় পরমাণুর হ্রাস হইতেছে ও বিচ্ছিন্নতা বাড়িতেছে। তাপ একটি জগৎব্যাপী তরঙ্গ। সে তরঙ্গে সমস্ত পদার্থের সমস্ত পরমাণুই নিরন্তর তরঙ্গায়িত হইতেছে। সুতরাং তাপের হ্রাস বৃদ্ধিতে পদার্থান্তর্গত পরমাণুর গতিরও তদনুযায়ী হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাপ হ্রাসে, পরমাণু সকল ঘনিষ্ঠ হয়, তাপের বৃদ্ধিতে পরমাণু সকল দূর প্রসারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু পদার্থে এই তাপ তরঙ্গ কখনই সমভাবে থাকে না; হয় তাপ বাড়িতেছে, নয় কমিতেছে, এবং তৎফলে তাহার পরমাণুনিচয় হয় ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে, না হয় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। তাই বলা গেল যে পদার্থের যে অবস্থাই লওয়া যাউক না কেন, উহা ঐ মূলসূত্রে আবদ্ধ।

মূল সূত্র ত পাওয়া গেল। এখন, ঐ সূত্র ধরিয়া পদার্থের একটু বিশেষ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। জাগতিক সমস্ত পদার্থই যে ঐ মূল সূত্রে আবদ্ধ, সমস্ত পদার্থেই যে ঐ নিয়ম বিরাজমান, ইহা স্পষ্টত দেখা কর্ত্তব্য। বিবর্ত্তন বুঝিতে গিয়া সার কথাগুলি সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে; বেশী উদাহরণ দিয়া বিশেষরূপে দেখা হয় নাই। বিস্তৃত কথার মূলতত্ত্ব জানিতে গেলে প্রথমে সংক্ষেপেই জানিতে হয়, বেশী উদাহরণ চলে না। এখন, আমরা এক একটি ভাগ—একটু বিশেষরূপে আলোচনা করিব। ক্রমে পূর্ব্বের অনেক কথা পরিস্ফুট হইয়াও আসিবে। বিকাশ ও বিনাশ, বিবর্ত্তনের এই দুইটি স্বতন্ত্র ভাগ এক একটি করিয়া লওয়া যাইবে।

শাস্ত্রীয় সৃষ্টি ও প্রলয়-তত্ত্ব।

হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রলয়তত্ত্ব অবগত না হইলে হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত মায়াতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, অদৃষ্টতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, স্থূলসূক্ষ্ম কারণ প্রভৃতি ত্রিবিধ দেহতত্ত্ব, ক্রিয়াহীন নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব, ক্রিয়াবিশিষ্ট সগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব ব্যবহারিক জীবাত্মতত্ত্ব, অব্যবহার্য্য আত্মতত্ত্ব, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা উপাসনাতত্ত্ব, উপাসনা নিরপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান—এ সমস্ত কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া যাঁহারা এই বর্ত্তমান সময়ে নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, এবং তাহার বিরোধী হইয়া যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য শাস্ত্রীয় সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্ব অবগত হন। সে সম্বন্ধে অতি ধীরভাবে বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য ন্যায় স্মৃতি পুরাণ ও গীতা শাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহারা জানিতে পারিবেন, যে সে সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিন্দুমাত্র মতভেদ নাই। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অভিলষিত সমস্ত বিচার ও তত্ত্ব প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে কেবল শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্ব বিষয়ে কতিপয় সাধারণ বিবরণ মাত্র প্রদান করিলাম। পশ্চাৎ অবসর ক্রমে তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র সমন্বয়, এবং মায়াতত্ত্ব, অদৃষ্টতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সন্ধ্যা-বন্দনা প্রভৃতিতে তাহার প্রয়োগ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

পরব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তির নাম প্রকৃতি। উহার অব্যক্ত এবং ব্যক্ত এই দুই অবস্থা আছে। অব্যক্ত অবস্থায় উহা সৃষ্টির বীজস্বরূপে অবস্থিতি করে। ব্যক্তাবস্থায় উহা সৃষ্টিকার্য্যে পরিণত হয়। উহা প্রত্যেক পদার্থের জন্ম, স্থিতি ভঙ্গের হেতু। জন্মস্থিতি ভঙ্গ প্রকৃতিরই আবির্ভাব, ও তিরোভাব মাত্র। জগতে যে পদার্থে বা যে কোন জীবে যত শক্তি ও গুণ দৃষ্ট ও শ্রুত হয় সকলই প্রকৃতির শক্তি। মনুষ্যের দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতিরই ব্যাপার। জাগরণ চেষ্টা, নিদ্রা প্রকৃতিরই উদয়, উদ্যম ও অস্ত। জীবন ও মৃত্যু প্রকৃতিরই দর্শন ও অদর্শন। জীব সকল প্রকৃতিতে বেষ্টিত। তাহারা যে সকল আহার দ্বারা শরীর ধারণ করে, তাহা প্রকৃতিরই রূপ। যে শক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক কর্ম্ম করে, তাহা প্রকৃতিরই রূপ। যে সকল চিন্তা করে, তাহা প্রকৃতিরই আবির্ভাব বিশেষ। কর্ম্ম ও চিন্তা দ্বারা ফল স্বরূপে প্রকৃতিকেই লাভ করে। আহার

বিহারদ্বারা শরীরে যে শক্তি লাভ হয়, তাহাও প্রকৃতি। চিন্তা, আলোচনা, ও সঙ্গদ্বারা মনে যে সকল সাধু বা অসাধু ভাব জন্মে তাহাও প্রকৃতি। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শাস্ত্রে প্রকৃতির অসংখ্য গুণ ও শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ।

প্রকৃতির যে গুণের দ্বারা সৃষ্টি, চেষ্টা, ও কর্ম্ম হয় তাহার নাম রজোগুণ এই গুণ চঞ্চল ধর্ম্মী। উহাই প্রকৃতি স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডবীজকে অঙ্কুরিত করে। মানবের দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতিকে কার্য্যে নিয়োগ করে। জীবগণকে সন্তানোৎপাদনে রতিদান করে। ওষধি ও বৃক্ষের বীজ ক্ষেত্র লাভ করিবা মাত্র, তাহাদিগের মধ্য হইতে অঙ্কুর আকর্ষণ করিয়া বাহির করে। প্রকৃতির ঐ গুণের যোগে প্রকৃতির কার্য্যকারিতা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির আবির্ভাব বিশেষ যে চন্দ্র সূর্য্য, তাহা তদীয় রজোগুণ প্রভাবে উদিত ও অস্তগত হইতেছে। অগ্নি দাহিকা শক্তি প্রকাশ করিতেছে। হলাহল ও সুরা তীক্ষ্ণ তেজে জীবদেহে প্রবেশ করিতেছে। অশ্ব, বাষ্প ও বিদ্যুৎ উহা অবস্থিতি করিয়া বেগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। সংক্ষেপত ঈশ্বরকৃত সৃষ্টিকার্য্য অবধি মানব ও অন্যান্য জীবগণের কৃতকর্ম্ম পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র প্রকৃতির রজোগুণ প্রকাশ পাইতেছে।

প্রকৃতির যে গুণের দ্বারা জগৎ তেজ ও শক্তিহীন হইয়া আদিম শক্তি স্বরূপিণী প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা লাভ করে তাহার নাম তমোগুণ। ঐ গুণ প্রকৃতিতেই আছে। প্রকৃতির নানা ভাবে আবির্ভূত হওয়া সমাধা হইলেই ঐ গুণের কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহাতে জীবদেহস্থ প্রকৃতি যেমন কার্য্যাবসানে শ্রমযুক্ত হইয়া নিদ্রাতে পরিণত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডীয় সমষ্টি প্রকৃতি তিরোভাবরূপ বিরাম লাভ করে। তখন আর কিছু সৃষ্টি হয় না। ইহাই তমঃ। সেই অবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্ত ভাবে থাকে। যেরূপ বীজমধ্যে অব্যক্ত ভাবে বৃক্ষ থাকে, তদ্রূপ তখন সেই অব্যক্ত প্রকৃতিতে ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয়। প্রকৃতির এই তমোগুণ সমস্ত জীব ও পদার্থেই আছে। সময়ে সময়ে তাহা কর্ত্তৃক সমস্ত পদার্থই অভিভূত হয়। আলস্য, নিদ্রা, মোহ ভ্রম, প্রমাদ এ সমস্তই প্রকৃতির ঐ তমোগুণের দৃশ্য বিশেষ। মৃত্যু নিদ্রার চূড়ান্ত ভাব। যেমন জৈবিক প্রকৃতিতে এই তমোগুণ বিরাজ করে, সেইরূপ ভৌতিক প্রকৃতিতেও বিরাজ করে। পদার্থ মাত্রের সার ভাগ ও অসার ভাগ আছে। তন্মধ্যে অসার ভাগ তমোধর্ম্মী। যথা পর্য্যুষিত

অন্নাদি অথবা অধিকাংশ অসার ভাগ বিশিষ্ট খাদ্য। সে সমস্ত আহার দ্বারা নিদ্রা, আলস্য, রোগ বৃদ্ধি হয়। সংক্ষেপত ঈশ্বরকৃত ব্রহ্মাণ্ডের লয় অবধি জীবগণের নিদ্রা; আলস্য প্রভৃতি পর্য্যন্ত—ঈশ্বরকৃত অমানিশি অবধি, মানবকৃত অন্ধকারাগার পর্য্যন্ত সমস্তই প্রকৃতির তমোগুণের বিকার।

প্রকৃতির রজঃ ও তম এই দুইগুণ হইতে বিলক্ষণ, যে শান্তিজনক উৎকৃষ্টগুণ তাহার নাম সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম—স্থিতি, প্রকাশ ও প্রসাদ। মৃত্যু হইতে ভিন্ন, জন্ম হইতে ভিন্ন, আলস্য ও নিদ্রা হইতে ভিন্ন,—চেষ্টা ও চাঞ্চল্য হইতে ভিন্ন, মদ্য হলাহল হইতে ভিন্ন—পর্য্যুষিত অন্নাদি হইতে ভিন্ন, চিত্তচাপল্য হইতে ভিন্ন, প্রমাদ হইতে ভিন্ন, সংক্ষেপত সৃষ্টিকারক গুণ হইতে ভিন্ন—বিনাশকর গুণ হইতে ভিন্ন,—যে শান্তি, সুখ ও স্থিতি-প্রদ ধর্ম্ম—তাহাকেই পণ্ডিতেরা সত্ত্বগুণ বলেন। রজোগুণ প্রভাবে প্রকৃতি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে পরিণত হইতেছে। তমোগুণ প্রভাবে আপনার সৃষ্টিতে পরিণত সমস্ত রূপকে অন্তর্হিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু সত্ত্বগুণযোগে স্বকীয় সমস্ত অবয়বকে প্রতিপালন ও সুখাভিষিক্ত করিতেছে। রজঃ ধর্ম্মপ্রভাবে জীবসকল বীরদর্পে বসুন্ধরাকে কম্পমান করিতেছে—তমোপ্রভাবে আলস্য ও নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে, কিন্তু সত্ত্বপ্রভাবে শান্তি ও প্রসাদগুণে প্রতিপালিত হইতেছে। সংক্ষেপত ঈশ্বরকৃত জগৎপালন অবধি জীবকৃত শান্তিরক্ষা পর্য্যন্ত সমস্তই সত্ত্বগুণের পরিণাম।

এই তিনগুণে ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি স্বরূপিণী প্রকৃতি জড়িত। একই প্রকৃতি যেমন এই ধরণীতে নানা প্রবৃত্তি ও পদার্থরূপে পরিণত, সেইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই তাহা ঐ তিনগুণে বিরাজিত। এই পৃথিবী অবধি যত লোকমণ্ডল আছে তৎসর্ব্বত্রই প্রকৃতি নিত্য নিত্য সৃষ্টি বিধান করিতেছে, নিত্য নিত্য পালনকার্য্য করিতেছে, নিত্য নিত্য সংহারও করিতেছে। সমস্ত লোকমণ্ডলের গর্ভেই প্রকৃতি স্বীয় সংহার বীজস্বরূপ সঙ্কর্ষণাগ্নি পোষণ করিতেছে। তথা জীবগণের দ্বারা রজঃ ও সত্ত্বগুণের ভোগ সমাধা হইলেই ঐকালানল কর্তৃক তত্রত্য প্রকৃতি পুনঃ তমঃ স্বভাব লাভ করিবেক। সেই অগ্নির তেজে প্রভূত জলোৎপন্ন হইবে। সেইজলে সেই লোকমণ্ডল দ্রবীভূত হইবে। সেই দ্রবীভূত পদার্থ সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে তেজে পরিণত হইবে।

সেই তেজঃ বায়ু কর্ত্তৃক সমীকৃত হইয়া বায়ুতে বিলীন হইবে। সেই বায়ু আকাশে লয় পাইবে। আকাশ প্রকৃতির তমঃ প্রধান বিক্ষেপ শক্তিতে পুনঃ প্রবেশ করিবে। সমস্ত পদার্থ প্রকৃতির তমোগুণে উপসংহৃত হইয়া সামান্য রাত্রি হইতে ভিন্ন এক মহাঘোরা কাল রজনীর আকার ধারণ করিবে।

কিন্তু, পৃথিবী ও শূন্যমার্গে অন্যান্য যত লোকমণ্ডল আছে, সর্ব্বত্র প্রকৃতির গুণসকল তুল্যরূপে অবস্থিতি করে না। কোন লোকমণ্ডলে তমোগুণের ভাগ অধিক, কোথাও রজোগুণের ভাগ অধিক, কোথাও বা সত্ত্ব গুণেরভাগ অধিক। যেখানে যে ভাগের আধিক্য, সেখানে সেইরূপ প্রকৃতির জীব সকল বাস করে। বাহ্যবস্তুগত প্রকৃতির সহিত জৈবিক প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, যেখানে যেমন ভোগ্য বস্তুস্বরূপিণী প্রকৃতি বর্ত্তমান, সেখানে সেইরূপ ভোগকর্ত্তা স্বরূপ জৈবিক প্রকৃতি, ভোগায়তনস্বরূপ দৈহিক প্রকৃতি, এবং ভোগোপকরণস্বরূপ আনুসঙ্গিক প্রকৃতি সমস্ত বিরাজমান। প্রকৃতি অন্ন, জীব অত্তা। অন্ন যেখানে স্থূলধাতুবিশিষ্ট, ভোক্তা সেখানে স্থূলভোগী। আর অন্ন যেখানে যত সূক্ষ্ম, ভোক্তা সেখানে তত সূক্ষ্মভোগী। অতএব ভিন্ন ভিন্ন লোকমণ্ডল প্রকৃতির গুণবিশেষের আধিক্যদ্বারা বিরচিত হইয়া ভোক্তা বিশেষের যোগ্য ভোগস্থানরূপে বর্ত্তমান আছে।

এই সৃষ্টি একবার হইয়াছে এমত নহে। কতবার হইয়াছে ও কতবার গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কতবার মহাপ্রলয়ে ইহা মূল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আবার কতবার বা অবান্তর প্রলয়দ্বারা সৃষ্টির অন্তর্গত কোন কোন লোকমণ্ডল একার্ণবীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন প্রলয়ে সৃষ্টিবীজাণুধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। উহা মূল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া গিয়াও আবার নিদ্রোত্থিত জীবের ন্যায় নবোদ্যমে উদিত হইয়াছে। কেননা প্রকৃতিস্বরূপ সৃষ্টিবীজ অক্ষয় এবং নিত্য। উহা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি শক্তি। প্রাকৃতিক প্রলয়াবস্থায় উহা তমঃ প্রভাবে নিশ্চেষ্ট থাকে। রাত্রিকালে, নিদ্রা সময়ে, বা মৃত্যুকালে জীবের প্রকৃতি যেমন নিশ্চেষ্ট হয়, সেইরূপ প্রাকৃতিক প্রলয়ে সমষ্টি প্রকৃতি নিশ্চেষ্ট হয়।

প্রাকৃতিক প্রলয়-সময়ে যখন সমস্ত ভেদজাত প্রকৃতিগর্ত্তে বিলীন হয়, তখন তাহার মধ্যে পূর্ব্ব সৃষ্টির সমুদায় ভাবই বর্ত্তমান থাকে।

তাহাতে তাবৎ পদার্থ উৎপাদনের শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তাবৎ জীবের আত্মা মহানিদ্রায় অবস্থান করে। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে কর্ম্মদ্বারা প্রকৃতিকে সম্ভোগপূর্ব্বক যে জীব যেরূপ উত্তমাধম প্রকৃতি উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহাও ঐ সকল আত্মাতে নিরুদ্ধভাবে স্থিতি করে। এই স্থূল উপলক্ষে বৈশেষিক দর্শনে পরমাণু ও জীবাত্মাকে "বিশেষ" পদার্থ বলেন। তাহাদের "বিশেষতা" প্রলয়কালে থাকে। সেই "বিশেষতা" হইতে জগৎ পুনঃ পরিণত হয়।

সত্ত্ব রজঃ তমোগুণময়ী প্রকৃতি দ্বিবিধ অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি-প্রকৃতি। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাহার যে প্রভাব তাহাই সমষ্টি প্রকৃতি। প্রত্যেক পদার্থে তাহার যে ব্যাপ্তি তাহাই ব্যষ্টিপ্রকৃতি। ব্যষ্টিপ্রকৃতি দুই প্রকার যথা—বাহ্যবস্তুগত ভৌতিক প্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি। মানবপ্রকৃতি শুভ ও অশুভ দুই প্রকার। তাহা শুভ হইলে মানব সুখভোগ করেন, অশুভ হইলে দুঃখ ভোগ করেন। মানব ভোগী ও প্রকৃতি ভোগ্য। মানব যদি শুভ ইচ্ছা প্রেরিত শুভকর্ম্ম দ্বারা প্রকৃতির শুভ অংশ আহরণ করেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি শুভ, নচেৎ অশুভ হয়। শুভ প্রকৃতি চিরকাল শুভফল এবং অশুভ প্রকৃতি চিরকাল অশুভ ফল প্রদান করে। প্রকৃতিই মানবের অদৃষ্টরূপী। জগতের স্থিতিকালে ঐ উভয়বিধ অদৃষ্টের ফলভোগ হয়। কিন্তু চিরকাল একাদিক্রমে সে ভোগ চলেনা। ভোগাসক্তিরূপ শক্তি ও ভোগ্যপদার্থের শক্তি কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন ভৌতিক প্রকৃতিও যেমন মূলপ্রকৃতিতে বিলীন হয়, জীবাত্মাসমূহের সহিত মানসিক প্রকৃতিও সেইরূপ বিলীন হয়। অতএব সেসময়ে ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তিস্বরূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতি একেবারে ভৌতিক প্রকৃতি ও মানসিক প্রকৃতিস্বরূপ অদৃষ্টকে আত্মসাৎ করিয়া লয়। এইরূপে ভৌতিক প্রকৃতিস্বরূপ ভোগ্য পদার্থ এবং জৈবিকপ্রকৃতি স্বরূপ ভোক্তৃ পদার্থ মূলপ্রকৃতিস্বরূপ মাতৃ ক্রোড়ে নিদ্রা যায়। মূলপ্রকৃতি শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা, ভৌতিক ও জৈবিক প্রকৃতি মলিনা। সেই শুদ্ধ- সত্ত্বাত্মিকা মাতার ক্রোড়ে মলিনা প্রকৃতি পুনঃ সৃষ্টির উদয় পর্য্যন্ত শ্রান্তিদূর করে। প্রকৃতির এই অব্যক্তাবস্থায় তদীয় সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ সাম্যভাবে স্থিতি করে।

শ্রান্তিদূর হইলে ভৌতিকীপ্রকৃতি এবং জৈবিক অদৃষ্ট স্বরূপিণী মানসিক প্রকৃতি পুনরুদয়োন্মুখী হয়। তাহাতে ক্রমে ক্রমে সেই মলিনা বা তমঃপ্রধান প্রকৃতিতে বিক্ষেপ বা স্পন্দন জন্মে। প্রধানত জৈবিক অদৃষ্টই ঐ

বিক্ষেপের হেতু। অদৃষ্টের নিয়ন্তা ও ফলদাতা ভগবান। প্রাকৃতিক প্রলয়কালে সৃষ্টিপ্রকাশের নিমিত্ত-ভূতা তদীয় ইচ্ছা, বুদ্ধি, বা মতি উক্ত তমঃ প্রধান প্রকৃতিদ্বারা আবৃত থাকে। অর্থাৎ তাহা চেষ্টাশূন্য, বৃত্তিশূন্য, এবং অব্যক্ত প্রকৃতির সহিত অব্যক্তরূপে অবস্থিতি করে। জীবের অদৃষ্ট-স্বরূপিণী প্রকৃতি, জীবের অদৃষ্টোপযোগী ভোগ্য পদার্থ স্বরূপিণী ভৌতিকী প্রকৃতির সহিত, নবোদ্যমোন্মুখী হইলেই, ভগবানের সৃষ্টি-প্রকাশিকা ইচ্ছা বুদ্ধি বা চিৎশক্তি সুপ্রকাশিতা হইয়া প্রলয়ান্ধকার দূরকরে। সেই চিৎশক্তির নামই মহত্তত্ত্ব। তাহা প্রলয়কালে তমঃপ্রধান প্রকৃতির মধ্যেই মৃতবৎ থাকে। সৃষ্টিকাল প্রাপ্ত হইলেই পুনরুদিত হয়। ফলত প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের চিৎশক্তি লয়বিক্ষেপশূন্য। কিন্তু প্রকৃতি নিশ্চেষ্ট হওয়াতে প্রলয় সময়ে সেই শক্তিও নিরুদ্যম হয়। সুতরাং তাহাকে তৎকালে মৃতবৎ বলিয়া কল্পনা করা যায়। মহত্তত্ত্বই জগতের নিমিত্ত কারণ। তাহা সমস্ত জীবের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা। সেইকারণে শাস্ত্রে তাহা জীবঘন অর্থাৎ সমষ্টি জীবস্বরূপে উক্ত হয়। তাহা সর্ব্বজীবের অধিষ্ঠাতা সমষ্টি-চৈতন্য। সর্ব্বজীবের আত্মবুদ্ধিপ্রদ ঘন সংঘাত। তাহা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি-নিয়ামক বুদ্ধি। ঈশ্বর ঐ বুদ্ধি-প্রধান রূপে জগতের নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি-প্রধান রূপে উপাদান কারণ। পরিপক্ব প্রলয়াবস্থায় জীবের বিকাশোন্মুখ বাসনা বা অদৃষ্টবশত প্রকৃতির গুণ-বিক্ষেপ হইলে, সেই প্রকৃতি ভেদ করিয়া উক্ত মহত্তত্ত্বের উদয় হয়। ঈশ্বর-চৈতন্য স্বরূপ সেই মহত্তত্ত্বের উদয়ে, প্রলয় স্বরূপ কালরজনীর প্রভাত হয়। তাহাতে ক্রমে সূক্ষ্ম ভেদজাত সকল দেখা দিতে থাকে। সমষ্টি জীবচৈতন্যেতে নানা প্রকার ভেদ বুদ্ধির উদয় হয়। সমস্ত জীবই অনাদি অদৃষ্ট বা বাসনা প্রতি-পালিত মানসিক দেহ ও ভোগ্য পদার্থে আত্মধ্যাস করিতে আরম্ভ করে। তাদৃশ আত্মধ্যাসকে অহঙ্কার কহে। অর্থাৎ "দেহ আমি নহি" তথাপি তাহাতে আমিত্ব আরোপ করে, ভোগ্য প্রকৃতি "আমি বা আমার নহে" তথাপি তাহাতে মমত্ব অধ্যাস করে। সার্ব্বভৌমিক জীবের এই অহঙ্কারতত্ত্ব সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই মহত্তত্ত্বরূপী ভগবানের "অহঙ্কার" রূপে কল্পিত হয়। তাহাতে ভেদবুদ্ধি বিশিষ্ট "ইদং" "অহং" ইত্যাকার জ্ঞান সেই মহত্তত্ত্বরূপী ভগবানে জন্মে বলিয়া উক্ত হয়। তাদৃশ ভাগবতী ইদংকার ও "অহঙ্কার" বৃত্তি দ্বারা প্রকৃতি হইতে আকাশাদি ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়।

অদৃষ্ট-প্রেরিত ভোগী ও ভোগ্যবস্তু সকল, অত্তা ও অন্ন সকল, ভোগায়তন স্বরূপ দেহ ও ভোগোপকরণ স্বরূপ সম্পত্তি সকল যথাযোগ্য রূপে স্থূল অবয়বে প্রকাশ পাইতে থাকে। উৎপত্তির পরে, ঐ সমস্ত ভেদজাতে, কারণ গুণ-ক্রমে—তারতম্যবিশেষে, সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ সংক্রামিত হয়। ঐ সমস্ত ভেদ জাত, গুণের তারতম্যানুসারে ভোক্তা, ভোগায়তন ও ভোগ্য পদার্থের সহিত বিবিধ লোকমণ্ডল রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

এইরূপে প্রাকৃতিক প্রলয়ের পর মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি ক্রমে যে সৃষ্টি তাহারই নাম "প্রাকৃতিক সৃষ্টি।" এইরূপ সৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি স্বরূপিণী মূল প্রকৃতি হইতে হয় বলিয়া ইহাকে প্রাকৃতিক সৃষ্টি কহে। এই সৃষ্টির সহিত যে "মহত্তত্ত্বের" উদয় হয়, তাঁহারই নামান্তর হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। এই সৃষ্টি প্রকৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বের সঙ্গে প্রকটিত হয়। সূক্ষ্মতত্ত্বে উপহিত থাকায় ব্রহ্মার নাম সূত্রাত্মা, যেহেতু তিনি সূত্রের ন্যায় সর্ব্ববস্তুতে অনুস্যূত। অতঃপর প্রকাশ বহুল বিধায় তিনি মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্ময়। তেজোধর্ম্মী সূক্ষ্মতত্ত্ব সমস্তে তিনি উপহিত থাকায়, তাঁহার নামান্তর হিরণ্যগর্ভ। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃতিক সৃষ্টিকালে অগ্রে হিরণ্যগর্ভের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি সকলের একমাত্র জাতপ্রভু। তিনি প্রথমজ এবং অগ্রজ। তিনি আদি প্রজাপতি। এই হিরণ্যগর্ভ কোন স্বতন্ত্র দেবতা নহেন। তিনি পরমপুরুষের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব রূপ ক্ষমতা বিশেষ; সেই ক্ষমতার অভ্যুদয়কে তাঁহার অবতরণ বা জন্ম বলা গিয়া থাকে। যখন ভোগক্ষয়বশত সমস্ত সূক্ষ্ম স্থূল প্রকৃতি গুণত্রয়ের সহিত সাম্যভাব অবলম্বন করে, অতিঘোর প্রলয়তমোদ্বারা সমস্ত ভেদজাত আবৃত হয়, যখন সূর্য্য চন্দ্র তারাগণ প্রকৃতির আদিম সূক্ষ্মধাতুতে বিলীন হয়, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চেষ্ট হইয়া স্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তমোগুণে প্রবেশ করে, তখন ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তির বিরাম সুতরাং সৃষ্টিনিয়ন্তৃত্ব স্বরূপ মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মার মৃত্যু স্বীকার করা গিয়া থাকে। এই অবস্থার নাম "প্রাকৃতিক প্রলয়।" এপ্রলয়ে সর্ব্বভূতের বীজস্বরূপিণী, সর্ব্বজীবের অদৃষ্ট, দেহ ও অন্নস্বরূপিণী প্রকৃতি মাত্র অব্যক্ত ভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তিরূপে অবস্থিতি করেন, নতুবা ব্রহ্মাদি যাবন্ত ভূত লয়প্রাপ্ত হয়। একমাত্র মূল প্রকৃতি অর্থাৎ ঈশ্বরীয় শক্তিতে সমস্ত লয় হয় বলিয়া ইহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। ইহার নামান্তর ব্রাহ্ম প্রলয়, কেন না ইহাতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়েন।

কিন্তু অন্য একপ্রকার প্রলয় আছে যাহাতে প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত স্থূল অবয়ব সকল, স্থূলভোক্তা সকল এবং স্থূলভোগ্য ও ভোগোপকরণ সকল, কেবল অবান্তর বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। জীবদেহের বিনাশরূপ যে মৃত্যু তাহার সহিত যদি প্রাকৃতিক প্রলয়ের তুলনা দেওয়া যায়, তবে জীবদেহের নিদ্রার সহিত ঐ দ্বিতীয় প্রকার প্রলয়ের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। তাদৃশ প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডীয় সূক্ষ্ম প্রকৃতি আহত হয় না। কেবল স্থূল প্রকৃতি মাত্র লয় প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী ও শূন্যমার্গস্থ অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন লোকমণ্ডল সকল প্রকৃতির গুণবিশেষ দ্বারা বিরচিত হইয়াছে। যে লোকমণ্ডল প্রকৃতির যত উৎকৃষ্ট গুণ ও সূক্ষ্মভোগ্য ধাতুদ্বারা বিরচিত তথাকার ভোগীগণ সেইরূপ সূক্ষ্মভোক্তা। প্রত্যুত প্রলয়েলীনা প্রকৃতির গর্ভে অদৃষ্ট ও ভোগ্যের সহিত ভোক্তাগণ বৃত্তিশূন্য হইয়া অবস্থিতি করে। সেই অদৃষ্টের তারতম্য অনুসারে জীবদিগের ভোগস্থানের তারতম্য হয়। অদৃষ্টই সৃষ্টি হেতু। সূক্ষ্মতত্ত্বভোগী সত্ত্বগুণাবলম্বী জীবাত্মাদিগের অদৃষ্ট বশত একদিকে সূক্ষ্ম ভোগের স্থান সকল স্বতন্ত্র সৃষ্ট হইল। অন্যদিকে স্থূলভোগীগণের অদৃষ্টানুযায়ী স্থূলভোগের মণ্ডল সকল উৎপন্ন হইল। ভোগ মাত্রেরই ক্ষয় আছে। ভোগ প্রকৃতিরই রূপবিশেষ। প্রকৃতি যখন সমস্ত স্থূল সূক্ষ্মগুণের সহিত সাম্যভাব ধারণ করে, তখন সূক্ষ্ম ভোগ সূক্ষ্মভোগস্থান, সূক্ষ্মশরীর প্রভৃতিও যেমন লয় প্রাপ্ত হয়, স্থূল ভোগজাত, স্থূলদেহ, স্থূল ভোগী ও স্থূল-ভোগস্থান সকলও সেইরূপ লয়কে পায়। তাদৃশ সূক্ষ্মধাতু পর্য্যন্ত বিনাশকারী প্রলয় দীর্ঘকালান্তে সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বারবার যে সকল অবান্তর প্রলয় হয় তাহাতে সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সূক্ষ্মভোগস্থান সকল আহত হয় না। কেবল স্থূলের বিনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রের সামান্য সিদ্ধান্ত এই যে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই ত্রিলোক স্থূলভোগের স্থান। তাহা রজোগুণে বিরচিত। এই লোকত্রয় ব্যতীত আর চারিটি লোকমণ্ডল আছে। সে সমস্তের নাম মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক। এ সমস্ত সত্ত্বগুণে বিরচিত। যাহাদের প্রকৃতি স্থূলৈশ্বর্য্য ভোগের জন্য ব্যাকুলা, যাহারা সাধনা, কামনা, ক্রিয়াদ্বারা স্থূলসম্পত্তিভোগার্থ প্রকৃতিরূপী অদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের তাদৃশ অদৃষ্টের তারতম্যানুসারে ভূলোক, ভুবর্লোক বা স্বর্গলোকে স্থান হয়। আর যে সকল শান্তচিত্ত ধীরেরা যোগাচরণ পরায়ণও সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী

এবং অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যোগৈশ্বর্য্য যাঁহাদের সাধনীয় তাঁহাদের সেইরূপ প্রকৃতি বিরচিত অদৃষ্টের ইতর বিশেষানুসারে উক্ত মহল্লোকাদিতে বাস হয়। ভূলোকাদিলোকত্রয় প্রকৃতির স্থূলধাতু দ্বারা বিরচিত এবং মহল্লোকাদি চারি ভুবন সূক্ষ্মগুণ দ্বারা সংরচিত। অবান্তর প্রলয়ে উক্ত সূক্ষ্ম ভোগরাগ সমন্বিত ঊর্দ্ধভুবনচতুষ্টয় প্রকৃতিস্থ থাকে। তাহাতে কেবল নিম্নস্থ ত্রৈলোক্যে প্রকৃতির স্থূল শক্তি সকল দূষিতা হয়। তৎসঙ্গে স্থূলভোগের ক্ষয় হইতে থাকে। পৃথিবী শস্যদান করে না, গো সকল দুগ্ধদানে অপটু হয়, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু প্রভৃতি ভোজনে লোকের ভোগশক্তি হ্রাসাবস্থ হয়, সুখের আশা যে পরিমাণ বৃদ্ধি হয় প্রকৃতি তাহা কুলান করিতে অপারগ হয়, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, ভূকম্প মারীভয় সকল দেখা দেয় এবং সকল বিষয়েই ক্রমে হীনতা জন্মে। এইরূপ স্থূল প্রাকৃতিক ভোগের চূড়ান্ত ক্ষয় হইলেই উক্ত ত্রিলোকস্থ সর্ব্ব ভূতের ও সর্ব্ব প্রাণির এক বিরামকাল আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই বিরামকালে ভগবান হরি নিম্নস্থ ত্রিলোকরূপে পরিণতা দূষিতা প্রকৃতিকে অগ্নি ও জল দ্বারা পুনঃ সংস্কৃত করেন। সে সময়ে তাঁহার ত্রিলোক শাসনকারী ব্রহ্মারূপটি নিদ্রিত হয়। তখন পৃথিবী হইতে স্বরপুরি পর্য্যন্ত লোকমণ্ডলে যত ভোগী বাস করেন সকলেই স্বীয় স্বীয় অদৃষ্ট লইয়া ব্রহ্মার সহিত যোগনিদ্রা স্বরূপিণী প্রকৃতিরূপ মাতার ক্রোড়ে অবশতা প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপ অবান্তর প্রলয়ের নাম "নৈমিত্তিক প্রলয়।"

নৈমিত্তিক প্রলয়ে প্রকৃতির সূক্ষ্মধাতু সকল বিনষ্ট হয় না। সুতরাং সূক্ষ্মভোগস্থান যে মহল্লোকাদি ও তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে হিরণ্য-গর্ভ এবং অণিমা-লঘিমাদি প্রকৃতি সম্পন্ন যোগীগণ এ সমস্তই রক্ষা পায়। সূক্ষ্মধাতুবিশিষ্টা সত্বগুণ প্রধানা প্রকৃতি তথা প্রবহমান থাকে। কিন্তু প্রকৃ-তির সূক্ষ্মধাতুও ভোগ্যবস্তু; এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যোগীরাও ভোগী। ভোগ-মাত্রেরই ক্ষয় আছে। সেই হেতু এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন সেই সূক্ষ্ম শক্তি সকলও হীন হইতে থাকে। তৎকালে প্রকৃ-তির সূক্ষ্মধাতু সকল লুপ্ত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মভোক্তাগণও লয় পাইয়া থাকেন। * ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়। এই প্রলয়ে স্থূলশক্তি

* ফলত ব্রহ্মলোকবাসীগণের মধ্যে যাঁহারা জীবন্মুক্ত সেই কৃতাত্মা পুরুষেরা এই পরান্তকালে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মেতে লীন হন। তাঁহারা

সকলওবিনষ্ট হয়। কেননা প্রকৃতির সূক্ষ্মধাতু সকলই স্থূলধাতুর পত্তন ভূমি।

নৈমিত্তিক প্রলয়ে উপরি-উক্ত ত্রিলোক বিশ্ব তাহার অব্যবহিত কারণ স্বরূপ জল দ্বারা একার্ণবীকৃত হয়। কালক্রমে প্রকৃতি সংশোধিতা হইলে আবার পূর্ব্বোক্ত লোকত্রয়ের রচনা আরম্ভ হয়। এই রচনায় ব্রহ্মাই নিমিত্ত কারণ। এই হেতু ইহাকে নৈমিত্তিক সৃষ্টি কহে। নৈমিত্তিক সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রাকৃতিক সৃষ্টির সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল অবস্থিতি করে। সে সকলকে আর সৃষ্টি করিতে হয় না। যথা মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র এবং সূক্ষ্মদেহ এ সমস্তই থাকে। কেবল জীবগণের কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট রূপী প্রকৃতি, তাহার ফলস্বরূপ ভোগ ও ভোগ্যবস্তু সকল এবং তদুপহিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মারূপ নিয়ন্তৃত্ব নিদ্রিত থাকে। এই নিদ্রা কেবল স্থূল সৃষ্টি সম্বন্ধে। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে প্রকৃতি জড়মাত্র। জড়কখনও সৃষ্টির বিধান করিতে পারে না। তাহার জন্য একজনের নিয়ন্তৃত্ব প্রয়োজন। সে নিয়ন্তৃত্ব একমাত্র পরম পুরুষের; সেই নিয়ন্তৃত্বের বিবিধ উপাধি। সূক্ষ্ম সৃষ্টিতে তাহার নাম মহত্তত্ত্ব সূত্রাত্মা ও হিরণ্যগর্ভ; স্থূল সৃষ্টিতে তাহার নাম ব্রহ্মা, বিরাট প্রভৃতি। সামান্যতঃ সে তত্ত্বটিকে ব্রহ্মাই বলা গিয়া থাকে। স্থূল জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মা স্থূল প্রকৃতির নিয়ন্তা। অদৃষ্টের সাক্ষী ফলদাতা, বিধাতা এবং সমস্ত বৈদিক প্রকৃতির সমষ্টি চৈতন্য। এই নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রলয়ে সেই তত্ত্বের মুদিতাবস্থা পরিকল্পিত হয়। তাহারই নামান্তর ব্রহ্ম নিদ্রা। নৈমিত্তিক সৃষ্টি কালে ঐ নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তাহাতে সমষ্টি স্থূল প্রকৃতি স্বরূপিণী অদৃষ্টাদির সহিত সমষ্টি সাক্ষী ও নিয়ন্তা স্বরূপ ব্রহ্মারূপ তত্ত্ব জাগ্রত হয়। জাগ্রত হইবামাত্র ত্রিভুবন পুনঃ প্রকটিত হইয়া থাকে। এ সমস্তই স্বভাবত অর্থাৎ প্রকৃতিবশাৎ হইয়া থাকে। ব্রহ্মা তাহার নিমিত্ত কারণ মাত্র, নচেৎ মূলাবধি রচনাকর্ত্তা নহেন। পরব্রহ্মই সকলের মূল। সৃষ্টির কুহক নিরস্ত হইলেই তাহাকে নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নিরাকার ও কৈবল্য রূপে লাভ করা যায়। মোক্ষাধিকারে ব্রহ্মও যাহা কৈবল্যও তাহা।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হন না সুতরাং তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি নাই, ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত।

ঋগ্বেদের দেবগণ।

প্রথম প্রস্তাব। ঋগ্বেদ সংহিতা।

ঋগ্বেদের দেবগণ সম্বন্ধে এবং সেই প্রাচীন কালের সরল ধর্ম্মবিশ্বাস, উপাসনা পদ্ধতি, সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও সভ্যতাসম্বন্ধে একটি সরল বিবরণ লেখা আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু সে বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে ঋগ্বেদ গ্রন্থ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

ঋগ্বেদ হিন্দুদিগের এত আদরণীয় কেন, সে কথা হিন্দু লেখক হিন্দু পাঠককে জিজ্ঞাসা করেন না। কিন্তু ঋগ্বেদ আজি জগতের সকল জাতির একরূপ আদরের ধন কেন? খৃষ্টীয় ইউরোপবাসীগণ আজি এই পুরাতন গ্রন্থ লইয়া এত আলোচনা করিতেছেন কেন? ইউরোপের প্রধান প্রধান ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই পুস্তকের আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন কেন? জর্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরাজ, আমেরিকাবাসী, সভ্যজাতি মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন কি জন্য? যে দেশে হোমর বা দান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের লোকেও অদ্য ঋগ্বেদের সরল কবিত্বে কি অপূর্ব্ব মধুরতা পাইয়াছেন? এরূপ প্রশ্ন একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

কোন ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত যদি বিন্ধ্যাচলের উপত্যকায়ই হউক বা নীলনদীর তীরেই হউক বা বেলজিয়ম দেশের পর্ব্বত গর্ত্তেই হউক একটি আট সহস্র বৎসরের পুরাতন প্রস্তর নির্ম্মিত কুড়ালী পান, এবং সভ্য জগতের সম্মুখে সেটি আনয়ন করেন, সভ্য জগৎ সেটিকে বড় সমাদর করেন। মনুষ্য যখন সভ্যতার প্রথম শিক্ষা পাঠ করে নাই, যখন পর্ব্বত গহ্বরে বাস করিত, নর নারী যখন গাত্রের লোম ভিন্ন অন্য বসন পরিধান করিত না, ভল্লুক বা হরিণের রক্তাপ্লুত মাংস ভিন্ন অন্য আহার জানিত না, তখন যুদ্ধার্থ বা পশু হননার্থ এইরূপ প্রস্তরের কুড়ালী নির্ম্মাণ করিত। লৌহের ব্যবহার তখন জানা ছিল না, প্রস্তরে প্রস্তর ঠুকিয়া ঠুকিয়া যুদ্ধের অস্ত্র নির্ম্মিত হইত। জগতে কোন্ সভ্য জাতি আছে, যাঁহারা মনুষ্যের প্রাচীন অবস্থা আলোচনা করিতে ব্যগ্র নহেন, যাঁহারা

সেই প্রাচীন অবস্থার নিদর্শন স্বরূপ একটি প্রস্তর কুড়ালী পাইলে আদরের সহিত না—ধারণ করেন; সে নিদর্শন দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না, এটি কোন্ জাতির নিদর্শন? এটি কি জর্ম্মাণদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের, না ফরাসীদিগের? এটি কি হিন্দুদিগের, না চীনদিগের? এ প্রস্তরটি মনুষ্যের প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন, মনুষ্য মাত্রেই ইহা দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন।

মনে কর, মনুষ্য সেই প্রাচীন বর্ব্বরতা ত্যাগ করিয়া একটু সভ্যতা শিখিয়াছে। লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্তু হৃদয়ের উল্লাসে বা ভয়ে বা আশায় গান গাইতে জানে। ঈশ্বরকে তখনও চেনে না কিন্তু সূর্য্যের জ্বলন্ত প্রভা, উষার রক্তিমচ্ছটা, ঝড়ের প্রবল বেগ বা বৃষ্টির হিতকর জল দেখিয়া বারবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখে, সে আকাশের কল্পিত দেবগণকে আরাধনা করে। বিশেষ সভ্যতা শিখে নাই, তথাপি চাষ করিতে কাপড় বুনিতে নৌকা বাহিতে শিখিয়াছে। এরূপ প্রাচীন জাতি মনের আনন্দে কি গান গাইত, কি চিন্তা করিত, কি বিশ্বাস করিত,—তাহা আমরা আজি কিরূপে জানিব? তখনকার লোকে লিখিতে জানিত না, কিছু লিখিয়া যায় নাই, তাহাদিগের চিন্তা ধর্ম্ম ও উপাসনা, তাহাদিগের, আশা ভরসা ও হৃদয়ের ভাব কালের অনন্ত স্রোতের গর্ব্বে লীন—হইয়াছে, তাহার উদ্ধারের আর সম্ভাবনা নাই। আমরা উনবিংশ শতাব্দির উন্নত সভ্যতা দেখিতেছি, কিন্তু যাহারা সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিবার জন্য প্রথম পদবিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের জানিতে মনুষ্য মাত্রেরই মনে ইচ্ছা হয়।

মনে কর, কেহ সহসা কোন পুরাতন ভগ্ন মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে সেই প্রচীন কালের সেই মনুষ্য সভ্যতার প্রারম্ভের চারি সহস্র বৎসরের পুরাতন একটি নিদর্শন বাহির করিলেন; তখনকার মনুষ্যের আশা ভরসা চিন্তা বিশ্বাস ও কল্পনার একটি নিদর্শন সহসা বাহির করিয়া উনবিংশ শতাব্দির সভ্য জগতের সম্মুখে স্থাপন করিলেন, স্থাপন করিয়া গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন, "মনুষ্যগণ! অবলোকন কর, আমি মনুষ্য জাতির প্রথম গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছি, মনুষ্য জাতির প্রথম সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন হস্তে ধারণ করিয়াছি, মনুষ্য জাতির ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রারম্ভের একটি নিদর্শন তোমাদিগকে দেখাইতে আনিয়াছি!" এ কথা শুনিলে সভ্য মনুষ্য মাত্রেই কিরূপ ব্যগ্র হইয়া সেই প্রাচীন

নিদর্শনটি দেখিতে আইসে, সকল পুস্তক ভুলিয়া গিয়া সেই জগতের প্রথম গ্রন্থটি পাঠ করিতে আইসে। তখন কি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এ গ্রন্থটি এ নিদর্শনটি ফরাসীদিগের, না জর্ম্মাণদিগের? হিন্দুদিগের, না চীনদিগের? মনুষ্য জাতির প্রথম গ্রন্থ মনুষ্য সভ্যতার প্রথম নিদর্শন মনুষ্য মাত্রেরই আদরণীয়!

এইরূপ নিদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়াছে,—সেটি ঋগ্বেদ সংহিতা। ঋগ্বেদ সংহিতা মনুষ্য জাতির সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ; * মনুষ্য জাতি যখন সভ্যতার প্রথম শিক্ষা লাভ করিতেছিল, যখন তাহারা প্রকৃতির অনন্ত গৌরব দেখিয়া তাহাই উপাসনা করিত, যখন চাষাদি অল্প অল্প সভ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াও চারিদিকে বর্ব্বরদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য অনন্ত যুদ্ধ করিত, তখন তাহারা কিরূপ চিন্তা করিত, কিরূপ আশা ভরসা করিত, কিরূপ বিশ্বাস ও উপাসনা করিত, তাহাই আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। মন্ত্র বলে যেন চারি সহস্র বৎসরের সভ্যতা বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় সরিয়া যায়, সেই মেঘের পশ্চাতে আমরা এই বিস্তীর্ণ সভ্যতা স্রোতের শান্ত নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র উৎপত্তি স্থল একবার অবলোকন করিতে পারি। অদ্যকার রেলওয়ে, টেলিগ্রাম, অর্ণবযান, ব্যোমযান, আত্মশাসন, পার্লিয়ামেণ্ট, বিশ্ব বিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি ভুলিয়া যাই, মুহূর্ত্তের জন্য সেই সিন্ধু নদী তীরের বর্ব্বর বেষ্টিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্য্য গ্রাম, জঙ্গল বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণভূমি ও যজ্ঞস্থান দেখিতে পাই, এবং সেই গ্রামের সরল হৃদয় সবল বাহু আকাশের দেবগণের অর্চ্চনা পরায়ণ প্রথম আর্য্যদিগের গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারি। এ দৃশ্য দেখিয়া কেননা ইউরোপীয়গণ বিমোহিত হইবেন, কেননা মনুষ্য জাতির আদি গ্রন্থকে মনুষ্য মাত্রেই সমাদর করিবেন?

কিন্তু মনুষ্য জাতির প্রথম গ্রন্থ বলিয়াই কেবল ঋগ্বেদের ইউরোপে সমাদর তাহা নহে; আর একটি বিশেষ কারণ আছে, সেটিও সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

সংস্কৃত ভাষার মাহাত্ম্য এক্ষণে সকলেই অবগত আছেন। সংস্কৃত ভাষা সকল আর্য্য ভাষার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, সংস্কৃত না জানিলে কি ইংরাজি কি

---

* "The most ancient of books in the library of mankind" Preface to Maxmuller's Translation of the Rig Veda. vol. I.

ফরাসী, কি লাটিন বা গ্রীক, কি জর্ম্মাণ বা ইতালীয়—কোন ভাষার উৎপত্তি বুঝা যায় না। এ বিষয়টি সকলেই জানেন, বিশেষ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই, একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

ইংরাজিতে রাজাকে King বলে, ফরাসিরা Roi বলে। কিন্তু King বা Roi শব্দের আদিম মৌলিক অর্থ কি? ইংরাজিবিৎ পণ্ডিত তাহা বলিতে পারেন না, ফরাসিবিৎ পণ্ডিত তাহা বলিতে পারেন না। ইউরোপের সমস্ত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ আলোচনা করিলেও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস কর, এ প্রশ্নের উত্তর পাইবে। king শব্দের প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ 'জনক,' Roi শব্দের প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ 'রাজন্'। জনক অর্থ জন্মদাতা, রাজন্ অর্থ যিনি বিরাজ করেন বা প্রকৃতি রঞ্জন করেন। সমাজ সুশৃঙ্খলায় রাখিবার জন্য প্রথম আর্য্যগণ যে এক এক জন প্রধান যোদ্ধার অধীনে বাস করিতেন, তাঁহাদের এই দুইটি গুণ দেখিয়া তাঁহাদের নাম দিয়াছিলেন। সে যোদ্ধাগণ জন্মদাতার ন্যায় প্রজাকে পালন ও রঞ্জন করেন, এবং সমাজের মধ্যে শিরোবস্ত্র রূপে বিরাজ করেন,—সেই জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অদ্যাবধি জনক বা রাজা, King বা Roi বলিয়া সম্বোধন করি। এ শিক্ষা আমরা কেবল মাত্র সংস্কৃত ভাষা হইতে পাই, আর্য্য জগতের প্রাচীন বা আধুনিক অন্য সমস্ত ভাষা অধ্যয়ন করিলেও এ শিক্ষা পাই না।

এই একটি শব্দ যেরূপ, আধুনিক আর্য্যভাষার অনেক শব্দই সেইরূপ; আদিম মৌলিক অর্থ যদি গ্রহণ করিতে চাহ, তবে ইংলণ্ড হইতে জর্ম্মাণি হইতে সকল সভ্য আর্য্য দেশ হইতে শিষ্যের ন্যায় বিনীত ভাবে আসিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাকে জিজ্ঞাসা কর, সংস্কৃত ভাষা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ, কেননা তিনি আর্য্যভাষাদিগের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ছেলে বেলার অনেক কথা যাহা কনিষ্ঠাদিগের মনে নাই, জ্যেষ্ঠার তাহা মনে আছে, ছেলে বেলার গল্পগুলি যদি জানিতে চাহ, শব্দোৎপত্তির উপাখ্যান গুলি শিখিতে চাহ, প্রাচীনা দিদীর কাছে আইস তিনি বলিয়া দিবেন।

আর উদাহরণ দিবার কি আবশ্যক আছে? Father, Mother, Daughter প্রভৃতি শব্দের মৌলিক অর্থ কেবল সংস্কৃততেই পাওয়া যায়, তাহা স্কুলের ছাত্রেরাও জানেন। star শব্দের মৌলিক অর্থ কি? সংস্কৃত স্তৃ অর্থ

ছড়ান—আকাশে যাহা ছড়াইয়া আছে। friend শব্দের মৌলিক অর্থ কি? পৃণাতি অর্থ প্রীত করা। feather শব্দের মৌলিক অর্থ কি? পৎ অর্থ পতন বা উড্ডীয়মান হওয়া; পত্র অর্থ যাহা দ্বারা উড্ডীয়মান হওয়া যায়। fume শব্দের মৌলিক অর্থ কি? সংস্কৃত ধূ ধাতু অর্থ কম্পিত হওয়া, ধূম অর্থ যাহা কম্পিত হইয়া উঠে। Deity শব্দের মৌলিক অর্থ কি? দিব্ ধাতু অর্থ উজ্জ্বল হওয়া বা আলোক দান করা; যিনি আলোক স্বরূপ তিনিই ঈশ্বর।

এরূপ শত শত উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু আবশ্যক নাই। আর্য্য-ভাষা সমূহের মৌলিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে সংস্কৃত জানা আবশ্যক, এটি অদ্য ইউরোপে স্বতঃসিদ্ধ বাক্য, এই জন্যই সংস্কৃত ভাষার অদ্য ইউরোপে এরূপ সমাদর।

সংস্কৃত ভাষা যেরূপ আর্য্যভাষা সমূহের জেষ্ঠা ভগিনী, এবং সকল ভাষার মৌলিক অর্থ বুঝাইয়া দেয়, ঋগ্বেদ সেইরূপ সকল আর্য্য ধর্ম্ম প্রণালী গুলির জেষ্ঠা ভগিনী, সকল প্রকার আর্য্য বিশ্বাসের ও দেব দেবীর উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ বুঝাইয়া দেয়। এবিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।

যিনি ঋগ্বেদের আকাশে দেব "দ্যু" তিনিই গ্রীকদিগের Zeus, লাটিনদিগের Jupiter; আংগ্লোসাক্সনদিগের Tiw এবং জর্ম্মাণদিগের Zio; ইহা সকলেই অবগত আছেন। যিনি ঋগ্বেদের বরুণ (আবরণকারী আকাশ) তিনিই গ্রীকদিগের Uranos; ঋগ্বেদের অগ্নি লাটিনদিগের Ignis এবং স্লাবদিগের Ogni; ঋগ্বেদের মিত্র ইরাণীয়দিগের মিথ্র; ঋগ্বেদের বায়ু ইরাণীয়দিগের বায়ু; ঋগ্বেদের পর্জ্জন্য (বৃষ্টি দাতা) লিথুনীয়দিগের Parjanya; ঋগ্বেদের উষা গ্রীকদিগের Eos ও লাটিনদিগের Aurora; ঋগ্বেদের অহনা (উষা) গ্রীকদিগের Athena (Minarva); ঋগ্বেদের সূর্য্য ইরাণীয়দিগের খোরসেদ্, গ্রীকদিগের Helios এবং লাটিনদিগের Sol; গ্রীকগণ আপনাদিগকে Hellenes কহিত অর্থাৎ সূর্য্যবংশীয়। এ কথা গুলি সকলেই জানেন, অতএব এবিষয় আর কিছু না লিখিয়া আমরা দুই একটি ধর্ম্মোপাখ্যানের কথা বলিব।

হেমবাবুর রসময়ী লেখনী হইতে যে বৃত্রসংহার কাব্য নিঃসৃত হইয়াছে তাহা সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেই পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্র সংহারের গল্পটি আজকার নহে। অনেক দিনের। এটি আমাদের পুরাণের গল্প সুতরাং

হিন্দু মাত্রেই এ গল্প জানেন, কিন্তু পুরাণে এ গল্পের মৌলিক অর্থ পাওয়া যায় না। বৃত্র স্বর্গ অধিকার করিলেন, ইন্দ্র তাঁহাকে হত করিয়া পুনরায় স্বর্গ উদ্ধার করিলেন; এটি ত উপন্যাস, ইহার অর্থ কি? ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য কি? পুরাণে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর পাই না।

হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য আর্য্য জাতির মধ্যেও আমরা এই বৃত্র সংহারের গল্প পাই, ইরাণীয় ধর্ম্মপুস্তক "অবস্তায়" আমরা সর্ব্বদাই বৃত্র হন্তার প্রশংসা পাই, এবং অহি বা বৃত্রের হননের কথা পাই। সে সমস্ত স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে বিরক্ত করিবার কোনও আবশ্যক নাই, কেবল দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।

"জারাথস্ত্র অহুরো মজ্‌দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সদয় চিত্ত অহুরো মজ্‌দ! হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পবিত্রাত্মা! স্বর্গীয় উপাস্যদিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী?'

"অহুরো মজ্‌দ উত্তর করিলেন 'হে স্পিতিমা জারাথস্ত্র! অহুরের সৃষ্ট বেরেথঘ্ন (সংস্কৃতে বৃত্রঘ্ন) সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী।" জেন্দ অবস্থা বহুরাম যাস্ত।

"তিনি (থ্রৈতয়ন) তাঁহার নিকট (বায়ুর নিকট) একটি বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন 'হে উর্দ্ধ বিচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও যে আমি তিন মুখ ও তিন মস্তক যুক্ত অজি দহকাকে (সংস্কৃতে অহি দহক) পরাস্ত করিতে পারি'। * *

"উর্দ্ধবিচারী বায়ু তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরো মজ্‌দের প্রার্থনা অনুসারে সেই বর দিলেন।" জেন্দ অবস্তা। রামযাস্ত।

এই ইরাণীয় শাস্ত্রের বেরেথ্রঘ্ন, এই অজি-দহক কে? ইহাদের উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ কি? ইরাণীয় শাস্ত্র জেন্দ অবস্তা তাহার উত্তর প্রদান করেন না।

আবার এই গল্প আমরা গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাই। Echidna নাম্নী সর্প বা দেবীর উর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীলোকের ন্যায়, এবং নীচের অঙ্গ সর্পের ন্যায়। এই ভীষণ জীবের Orthos প্রভৃতি সন্তান হয়, সে Orthos দ্বিমস্তক বিশিষ্ট যমালয়ের একটি কুকুর। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে এই Echidna বা Echis ঋগ্বেদের অহি, এবং এই Orthos ঋগ্বেদের বৃত্র। Hercules নামক দেব যোদ্ধা Orthos কে হনন করিয়াছিলেন সুতরাং Hercules গ্রীকদিগের বৃত্র হন্তা।

কিন্তু তথাপি আমরা উপাখ্যানের মর্ম্ম বুঝিলাম না। হিন্দু পুরাণে, ইরাণীয় শাস্ত্রে, গ্রীক শাস্ত্রে আমরা একই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখিতেছি, কিন্তু পুরাণ বা জেন্দ অবস্তা বা হিসিয়ড্ আমাদিগকে এ উপাখ্যানের অর্থ বলে না।

আর্য্যদিগের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে ঐ উপাখ্যানের অর্থ পাই না; কেবল মাত্র ঋগ্বেদে পাই।

ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের ৩২ সূক্তে সেই উপাখ্যানের অর্থ জলের ন্যায় পরিষ্কার। বৃত্র বা অহি আকাশের মেঘ বই আর কিছু নহে, আকাশ সেই মেঘকে বজ্রদ্বারা আঘাত করেন, তাহাতে মেঘ মানবজাতির উপকারার্থ জল বর্ষণ করে। এই বৃত্র সংহার! প্রকৃতির একটি অপূর্ব্ব আনন্দকর দৃশ্য লইয়া প্রথম আর্য্যগণ একটি উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন, হিন্দু, ইরাণীয় ও গ্রীকগণ সেই উপাখ্যানটি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। অথচ ঋগ্বেদ না জানিলে এই সুন্দর উপাখ্যানের অর্থ গ্রহণ করা যায় না।

আবার বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই অহি ও বৃত্রহন্তার গল্প ইতিহাসেও স্থান পাইয়াছে! আধুনিক পারস্যদিগের প্রধান ইতিহাস গ্রন্থ ফের্দৌসীর "শাহনামা"; তাহাতে আমরা দেখিতে পাই টাইগ্রীস নদীর তীরে ফেরুদীন পারস্যরাজ জোহক্‌কে হনন করিয়াছিলেন। ফেরুদীন ঋগ্বেদের বৃত্রঘ্ন, জোহক ঋগ্বেদের অহি-দহক! ঋগ্বেদের অহির তিন মস্তক সেই জন্য ফের্দৌসীর জোহকের ও তিনটি মস্তক, কেবল সেগুলি সর্পের মস্তক নহে, ইতিহাসে মনুষ্যের মস্তক হইয়া গিয়াছে।

এরূপ অনেক উদাহরণ আমরা দিতে পারিতাম কিন্তু আমাদিগের স্থান বড় অল্প, অতি সংক্ষেপে আর দুই একটি মাত্র উদাহরণ দিব।

গ্রীকদের Prometheus আকাশ হইতে মনুষ্যদিগের জন্য অগ্নি চুরি করিয়া আনেন, সে উপাখ্যান সকলেই জানেন। এ উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ কি? গ্রীক শাস্ত্রে তাহা পাওয়া যায় না, ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কাষ্ঠঘর্ষণ বা "প্রমন্থন" দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেই জন্য অগ্নির নাম "প্রমন্থ" তাহারই রূপান্তর Prometheus. এখন আমরা বুঝিলাম কেন Prometheus অগ্নি আনিয়া ছিলেন।

হিন্দু পুরাণে বিষ্ণু অবতার হইয়া তিনটি পদ-বিক্ষেপ-দ্বারা বলি রাজাকে দমন করিয়াছিলেন। সে সুন্দর উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ কি? পুরাণে

তাহা বলে না, ঋগ্বেদে সে অর্থ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বিষ্ণু সূর্য্যরূপ, সূর্য্য উদয়, মধ্যাহ্ন ও অস্ত এই তিন স্থানে পদবিক্ষেপ করিয়া সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করেন।*

প্রাচীন জর্ম্মাণদিগের Tyr দেবের একটি হাত ব্যাঘ্রে খাইয়া ফেলিয়াছিল। এ উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ কি? Tyr সূর্য্যশব্দের প্রতিরূপ, একটি যজ্ঞে সূর্য্যের একটি হস্ত ছিন্ন হইয়া পড়ে ও পূজকগণ তাঁহার একটি সুবর্ণের হস্ত গড়াইয়া দেন, এরূপ পৌরাণিক গল্পও আছে। এ গল্পেরই বা অর্থ কি?

ঋগ্বেদে ইহার অর্থ উপলব্ধি হয়। ঋগ্বেদের কবিগণ সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ দেখিয়া কল্পনাচ্ছলে অনেক স্থানে সূর্য্যকে হিরণ্যপাণি "হিরণ্যবাহু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন;—তাহা হইতে সূর্য্যের বাহুনাশের ও সুবর্ণবাহু নির্ম্মাণের উপাখ্যান হইল!

গ্রীকদিগের সূর্য্যদেব Apollo, Daphne নাম্নী দেবীর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন! পলায়মানা Daphne অবশেষে পরিত্রাণার্থ শরীর বিসর্জ্জন দিয়া একটি লরেল বৃক্ষের রূপ ধারণ করিলেন। এ উপন্যাসের অর্থ কি? ঋগ্বেদপাঠ ভিন্ন এ উপন্যাসের অর্থ গ্রহণের উপায় নাই। Daphne ঋগ্বেদের "দহনা" শব্দের প্রতিরূপ; দহনা ঊষার নাম। সূর্য্য ঊষার পশ্চাতে ধাবমান হয়েন, সূর্য্য উদয় হইলেই ঊষা আর থাকে না, শরীর ত্যাগ করে। পুরাণে যে উর্ব্বশী ও পুরুরবার উপাখ্যান আছে, যাহা কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন তাহার ও এই অর্থ; পুরুরবা (সূর্য্যের) উলঙ্গ অঙ্গ দেখিলেই (ঊষা) অন্তর্হিতা হয়েন।

গ্রীকদিগের বিশ্বকর্ম্মা Hephaistos (Latin Vulcan) কে? তাঁহার নামের অর্থ কি, তিনি সর্ব্বদা অগ্নি লইয়া কার্য্য করেন কেন? অগ্নি কখনও বৃদ্ধ হয়েন না, কেননা তাঁহাকে প্রত্যহ জ্বালা যায়, অতএব তিনি সর্ব্বদাই যুবা। এই জন্য ঋগ্বেদে তাঁহাকে যুবাতম বা "যবিষ্ঠ" বলে, এটি অগ্নির একরূপ নাম হইয়া গিয়াছে। গ্রীক "Hephaistos" "যবিষ্ঠ" শব্দের প্রতিরূপ।

গ্রীকদিগের কামদেব Eros (Latin Cupid) কে? সূর্য্যের প্রথম অরুণ

* যাস্ক ও ঔর্ণবাভের ব্যাখ্যা দেখ।

বর্ণ রশ্মিকে ঋগ্বেদে অশ্বের সহিত তুলনা দিয়া "অরুষ" নাম দেওয়া হইয়াছে, "Eros" শব্দ তাহারই প্রতিরূপ শব্দ।

গ্রীকদিগের সুন্দরী Charites (Graces) দেবীগুলি কে? তাঁহারাও লোহিত সূর্য্যকিরণ। ঋগ্বেদে তাঁহাদিগকে অশ্বের সহিত তুলনা করিয়া "হরিৎ" নাম দেওয়া হইয়াছে, "Charites„ শব্দ তাহারই প্রতিরূপ শব্দ।

এরূপ শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রবন্ধে আর আমাদিগের স্থান নাই, যখন ভিন্ন ভিন্ন দেবদিগের কথা কহিব, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য উপাখ্যানের উল্লেখ করিব। তবে এখানে আর একটি উপাখ্যানের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র আকাশ-দেবতা। উষার রক্তিমচ্ছটা বা রক্তবর্ণ মেঘখণ্ডগুলি দিবা প্রকাশ হইলে থাকে না। ঋগ্বেদের কবিগণ উপমাস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন যে পণিস্ নামক এক অসুর দেবদিগের গাভী (রক্তবর্ণ আলোক বা মেঘখণ্ড) হরণ করিয়া লইয়া যায়, এবং একটি দুর্গম স্থানে ("বিলু" অর্থ দুর্গম স্থান) লুকাইয়া রাখে। ইন্দ্র তাঁহার দেবকুক্কুরী সরমাকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়া দেন, এবং সরমার সন্ধান হইলে পণিস্ তাহাকে আপন পক্ষে লওয়াইয়া আনিতে চেষ্টা করে। সরমা ফিরিয়া গিয়া ইন্দ্রকে গাভীগণের সন্ধান দিলে, ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়া সেই বিলু হইতে সেই গাভী উদ্ধার করেন। এটি প্রাতঃকালের সম্বন্ধে একটি উপমাগর্ত্ত উপাখ্যান মাত্র। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে গ্রীকের অদ্বিতীয় কবি হোমর যে Iliad নামক সুন্দর মহাকাব্য লিখিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহাও মূলে এই উপাখ্যানটি অবলম্বন করিয়া লিখিত; ভাষাবিৎ-পণ্ডিতগণ জানেন যে Helena সরমা শব্দের রূপান্তর; Ilium বিলু শব্দের রূপান্তর, Paris পণিস্ শব্দের রূপান্তর, ইত্যাদি। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে, অনেক পণ্ডিত উপরি উক্ত মত গ্রহণ করেন না, এবং গ্রীক ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা এবং পারিস ও হেলেনাকেও ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি ইউরোপে কেন ঋগ্বেদের এরূপ আদর। ঋগ্বেদের ধর্ম্মপ্রণালী সকল আর্য্যধর্ম্ম প্রণালীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ঋগ্বেদ আলোচনা না করিলে সে ধর্ম্ম প্রণালীগুলি বুঝা যায় না, নানা দেশের ধর্ম্ম উপাখ্যানগুলি বুঝা যায় না। সকল আর্য্যধর্ম্ম ও বিশ্বাসগুলি আমা-

দিগের চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না। সম্মুখে যেন একটি নিবিড় কুহায় সমস্ত আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, অতএব যাহা দেখিতেছি তাহা স্পষ্ট দেখি না, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝি না, তাহাদিগের অর্থগ্রহণ করি না। ঋগ্বেদের আলোক তাহাদের উপর পতিত হইলে যেন সহসা সে কুহা সরিয়া যায়, যেন সহসা সে দেবদেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেন তাহাদিগের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। প্রকৃতির উপাসনাতেই আর্য্যধর্ম্মের উৎপত্তি; কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মপ্রণালীতে প্রকৃতির দৃশ্যগুলি বা কার্য্যগুলি একেবারে দেব দেবীর রূপ ধারণ করিয়াছে, ঋগ্বেদে তাহারা এখনও প্রকৃতির কার্য্যই রহিয়াছে; অথচ বিস্ময়কর, হিতকর, ভক্তিপ্রদ, ভয়প্রদ এই জন্য উপাস্য। * মানব জাতির প্রকৃত ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিতে চাহেন, মানব বিশ্বাস ও ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস যাঁহারা জানিতে চাহেন, ঋগ্বেদ তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট উপায়। আর্য্যধর্ম্ম যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, আর্য্য-চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থ যাঁহারা গ্রহণ করিতে চাহেন, আর্য্যইতিহাসের মূল, উৎপত্তি ও বৃদ্ধি যাঁহারা অবগত হইতে চাহেন, ঋগ্বেদ তাঁহাদিগের একমাত্র উপায়।

এক্ষণে ঋগ্বেদ গ্রন্থের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। দেব দেবীদিগের কথা অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, কেননা পরের প্রবন্ধ গুলিতে তাঁহাদিগের বিস্তীর্ণ বর্ণনা দেওয়া যাইবে। এখানে দেবগুলির নাম দিলেই যথেষ্ট হইবে।

দ্যু (অর্থাৎ আকাশ) এবং পৃথিবীকে সকল দেবগণের পিতা মাতা বলিয়া অর্চনা করা হইয়াছে, অদিতিও (অর্থাৎ অনন্ত আকাশ বা বিশ্ব জগৎ) সকল দেবের মাতা স্বরূপা। তাঁহারই সন্তান সূর্য্যাদি আদিত্যগণ। ইন্দ্র আকাশ

* "The mythology of the Veda is to comparative mythology what Sanscrit has been to comparative grammar. * * No where is the wide distance which separates the ancient poems of India from the most ancient literature of Greece more clearly felt than when we compare the growing myths of the Veda with the full grown and decayed myths on which the poetry of Homer is founded. The Veda is the real Theogony of the Aryan races." *Max Muller's Chips from a German work-shop. Article, Comparative Mythology.*

দেব, মেঘকে হনন করিয়া বৃষ্টি দিয়া মনুষ্যের হিত করেন, এবং ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত (অর্থাৎ স্তুতি) আছে, অন্য কোনও দেব সম্বন্ধে ততগুলি নাই। বরুণও আবরণকারী আকাশ বা নৈশ আকাশ; মিত্র আলোক বা দিবা; সুতরাং মিত্র ও বরুণের প্রায়ই একত্র স্তুতি করা হইয়াছে। এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে অর্য্যমারও স্তুতি আছে, কেন না তিনি দিবা ও রাত্রির মধ্যস্থ প্রাতঃকাল, অথবা প্রাতঃকালের সূর্য্য। অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না. অতএব অগ্নিই সকল যজ্ঞের পুরোহিত, এবং তাঁহাকে যে হব্য অর্পণ করা যায় তিনি তাহা দেবগণের নিকট লইয়া যান। বায়ু বাতাস, মরুৎগণ ঝড়ের বাতাস, মহা পরাক্রান্ত, এবং ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া শত্রু বিনাশ করেন। সূর্য্য বা সবিতা আলোক বর্ষণ করেন: উষা প্রাচীন ঋষিদের বড় আদরের দেবী; তাঁহার সম্বন্ধে সূক্তগুলি যেরূপ কবিত্ব-পূর্ণ; সেরূপ আর কোন দেব সম্বন্ধে দেখা যায় না। তিনি সংসারের গৃহিণীর ন্যায় প্রত্যূষে জাগ্রত হইয়া স্নেহের সহিত সকলকে জাগরিত করেন, সকলকে আপন আপন কার্য্যে প্রেরণ করেন। উষার পূর্ব্বে আকাশে যে আলোক ও অন্ধকারে মিশ্রিত থাকে, তাহাই অশ্বিদ্বয়; পুরাণে তাঁহাদিগকে অশ্বিনী-কুমার বলে। তাঁহারা দেব-চিকিৎসক, রোগ বিনাশ করেন এবং বিপদে মনুষ্যগণকে সহায়তা করেন। সোম রস না হইলে যজ্ঞ হইত না, এইজন্য সোমও উপাস্য দেব। পর্জ্জন্য মেঘ অথবা বৃষ্টিদেব, পূষা সূর্য্যের একটি রূপ এবং প্রাণী জগতের পুষ্টিকর দেব ও মনুষ্যদিগের দেশ ভ্রমণে পথ প্রদর্শক, এবং ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাতা। বিশ্বদেবগণ ও ঋভুগণেরও অর্চ্চনা আছে; ঋভুগণ প্রথমে মনুষ্য ছিলেন, পরে দেবদিগের জন্য একখানি যজ্ঞপাত্রকে চারিখানি করিয়া দেবগণকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, এবং সূর্য্য তাঁহাদিগকে দেবত্ব দান করেন। যম ও তাঁহার ভগিনী যমীর আদিম অর্থ বোধ হয় দিবা ও রাত্রি· দিবা বা সূর্য্যরূপ যম অস্ত যান, অর্থাৎ পরলোক গমন করেন, তিনিই প্রথমে পরলোকে গিয়াছেন। বিষ্ণু সূর্য্যের রূপ মাত্র, রুদ্র অগ্নির রূপ অথবা ঝড়ের রূপ, এবং মরুৎগণের অর্থাৎ ঝড়ের পিতা। ব্রহ্ম অর্থ প্রার্থনা বা স্তুতি, তাহা হইতে ব্রহ্মণস্পতি নামে একজন দেব আছেন, অর্থ প্রার্থনার দেব। সরস্বতী নদী দেবীরূপে উপাসিত হইতেন, বোধ হয় সেই নদীতীরে যজ্ঞাদি সম্পাদিত করা হইত ও মন্ত্র উচ্চারিত হইত, সেই কারণেই হউক বা অন্য কোনও কারণেই হউক তিনি ক্রমে মন্ত্রদেবী বা বাগ্দেবী হইয়া উঠিলেন। ইলা

ভারতী প্রভৃতি যজ্ঞের প্রথা বা অংশ সকলও দেবীরূপে উপাসিতা হইতেন। তাহা ভিন্ন অগ্নির স্ত্রী আগ্নায়ী, বরুণের স্ত্রী বরুণানী ইত্যাদির উল্লেখ মাত্র আছে, ইহাদিগের স্তুতি বা উপাসনা নাই।

ইহারাই ঋগ্বেদের দেবতা। ঋগ্বেদের যতগুলি ব্যাখ্যা এক্ষণে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে যাস্কের নিরুক্ত সর্ব্ব প্রাচীন। তিনি খৃষ্টের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বুদ্ধ দেবের সময় জীবিত ছিলেন, সুতরাং যখন বৈদিক হিন্দু ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, যখন পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্ম প্রচলিত হয় নাই এবং পুরাণ সমস্ত রচিত হয় নাই, যাস্ক তখনকার লোক। এই জন্য তাঁহার ব্যাখ্যা অতিশয় আদরণীয়; বৈদিক সময়ে বাস করিয়া তিনি যত দূর বেদের অর্থগ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, পরের ব্যাখ্যাকারগণ ততদূর হইয়াছেন এরূপ সম্ভব নহে। তাহা ভিন্ন যাস্ক অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার নিরুক্ত দেখিয়া বোধ হয় তিনি বেদের আলোচনাতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

যাস্ক সমস্ত বৈদিক দেবদিগের সম্বন্ধে চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে প্রকৃত পক্ষে বেদের তিনজন মাত্র দেব; অর্থাৎ পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু বা ইন্দ্র, এবং আকাশে সূর্য্য। ইহাদিগের এক এক জনের অনেকগুলি কার্য্য, এই জন্য অনেকগুলি করিয়া নাম। অথবা যাঁহাদের পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা পৃথক পৃথক দেবই হইবেন।*

অতএব বৈদিক দেবদিগের মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্য যে প্রধান দেব ছিলেন তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋগ্বেদে ইন্দ্র সম্বন্ধে সকল দেব অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সূক্ত আছে, তাহার পরে অগ্নির। আর ব্রাহ্মণেরা যে প্রসিদ্ধ ও পবিত্র গায়ত্রী উচ্চারণ করেন সেটি সবিতার সম্বন্ধে।

যজ্ঞ ও উপাসনার পদ্ধতিও ইহার পর বর্ণিত হইবে, এক্ষণে কেবল দুই চারিটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। অগ্নি না জ্বালিয়া যজ্ঞ হইত না, অগ্নিতে হব্য ঘৃত অর্পিত হইত, এবং নিকটে পাত্র করিয়া সোমরস সজ্জিত

* "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নি পৃথিবী স্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্রো-ইন্তরিক্ষ স্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদেকৈকস্যাপি বহূনি নাম ধেয়ানি ভবন্ত্যপি বা কর্ম্ম পৃথকত্বাৎ যথা হোতাধ্বর্য্যু ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপি একস্যসতঃ। অপি বা পৃথগেব স্যুঃ। পৃথগ্ হি স্তুতয়ো ভবন্তি তথাভিধা-নানি।" নিরুক্ত। ৭।৫

থাকিত, এবং ভূমিতে বিস্তৃত কুশের উপর সেই রস সেচন করা হইত। যজমান নিজেই যজ্ঞ সাধন করিতে পারিতেন, অথবা মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিক অর্থাৎ পূজকদিগকে ডাকাইয়া যজ্ঞ সমাধা করাইতেন, সেই ঋত্বিকগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবের স্তুতি ও অর্চনা করিয়া হব্য প্রদান করিয়া যজ্ঞ সমাধা করিতেন। দেব মন্দিরের কোনও উল্লেখ নাই; ঋগ্বেদের সময়ে যজমানদিগের গৃহেই যজ্ঞ হইত, এবং সেই যজ্ঞগৃহে কুশ বিস্তৃত করিবার প্রথা হইতে, অনুমান করা যায় যে তাহার পূর্ব্বকালে দুর্ব্বাক্ষেত্রেই যজ্ঞ সম্পাদিত হইত। পশু বলি কখন কখন দেওয়া যাইত, কখনই বা নর বলি হইত; তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ কিন্তু ঋগ্বেদে নাই।

ঋগ্বেদে ১০১৭টি সূক্ত অর্থাৎ প্রার্থনা—বা স্তুতি আছে এবং দেড় লক্ষের অধিক শব্দ আছে। * সুবিধার জন্য এই সূক্তগুলিকে ১০ মণ্ডলে বা ৮ অষ্টকে বিভক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং প্রত্যেক মণ্ডলে গড়ে ১০০ সূক্ত আছে, এবং প্রত্যেক অষ্টকে গড়ে প্রায় ১৩০টি সূক্ত আছে। প্রত্যেক সূক্তে রচয়িতা ঋষির নাম আছে, সে ঋষিদিগের নাম কতক কতক আমরা পুরাণে অবগত আছি, যথা, কণ্ব, গোতম, কক্ষীবান্ অঙ্গিরার পুত্র নোধা, বশিষ্ঠ ইত্যাদি।

যে ঋষিদিগের নাম দেওয়া আছে সেই ঋষিগণ স্বয়ংই যে সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নাও হইতে পারে, তাঁহাদিগের বংশে যে সূক্তগুলি প্রচলিত ছিল, সেই গুলি বংশের আদি পুরুষের নামে বোধ হয় আরোপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে আর্য্যগণ আসিবার পর যে ক্ষুদ্র আর্য্যসমাজ ও আর্য্যপল্লী সকল গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কয়েকটি ঋষিবংশ যাগ যজ্ঞাদির জন্য এবং মন্ত্র রচনা ও অগ্নির অর্চ্চনার জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন; যথা মনু, অঙ্গিরা ভৃগু, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, দধীচির পিতা অথর্ব্বা গোতম, কণ্ব ইত্যাদি। তৎকালের ঋষি অর্থে বনবাসী ফল মূলাহারী ঋষি নহে, ঋষিগণ যাগযজ্ঞরত শাস্ত্রজ্ঞ পুত্রকলত্র বেষ্টিত সংসারী, তাঁহাদিগের রচিত মন্ত্র ও অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি পুরুষ ক্রমে সেই সেই বংশে প্রচলিত থাকিত। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি ঋষিবংশ, অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল, এমন কি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বিবেচনা করেন, তাঁহারাই

* ১,৫৩,৮২৬ শব্দ।

ভারতবর্ষে অগ্নিপূজা প্রচার করিয়াছিলেন। এটি ভ্রম, কেন না আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেই অগ্নিপূজা জানিতেন। কিন্তু এই কয়েকটি ঋষিবংশ যে ভারতবর্ষের প্রথম আর্য্য উপনিবেশে যাগ যজ্ঞ ও অগ্নি হোমাদি অনেক বিস্তৃত করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।

কালক্রমে যজ্ঞের ঘটা ও অনুষ্ঠান কার্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকদিগের সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ জানেন যে অবশেষে সেই ঋত্বিক বা পূজক সম্প্রদায় একটি শ্রেণীভুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইলেন। রাজপুরুষগণ ক্ষত্রিয় জাতি হইলেন, সাধারণ শ্রমজীবিগণ বৈশ্য হইলেন, বিজিত বর্ব্বর জাতিগণ শূদ্র হইলেন। এগুলি ঐতিহাসিক কথা, এখানে বলিবার এই আবশ্যক যে ঋগ্বেদসংহিতায় এ চারি জাতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, এ জাতি বিভাগটি ঋগ্বেদের সূক্ত রচনার পর সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

ক্রমে যজ্ঞের আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান বাড়িতে লাগিল, এবং ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি লইয়া অন্যরূপ মন্ত্র রচিত হইতে লাগিল। অবশেষে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মন্ত্রগুলি একত্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বেদ সঙ্কলিত হইল। হোতা ঋত্বিকদিগের জন্য ঋগ্বেদ, উদ্গাতা অর্থাৎ গায়ক ঋত্বিকদিগের জন্য সামবেদ, অধ্বর্য্যুদিগের জন্য যজুর্ব্বেদ। এ তিনটি বেদেরও অনেক পরে অথর্ব্ব বেদ সঙ্কলিত হইল। যখন এই নূতন তিনখানি বেদ রচিত হইল ও চারিটি বেদ সঙ্কলিত হইল তখন জাতি বিভাগরূপ ভিত্তির উপর নূতন হিন্দু সমাজ গঠিত হইয়াছে।

এই সঙ্কলন কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর চারি বেদের "ব্রাহ্মণ" ও "উপনিষদ্" রচিত হইতে আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণে কেবল যজ্ঞ ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদির বিবরণ পাওয়া যায়, উপনিষদ্ প্রথম বিজ্ঞান আলোচনা। জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে ঋগ্বেদের বহু দেবে বিশ্বাস স্খলিত হইতে লাগিল; বেদের "ব্রাহ্মণ" গুলিতে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে—তাহাতে শ্রদ্ধালোপ

---

* ৬০ সূক্তের প্রথম ঋকে আছে যে মাতরিশ্বা আকাশ হইতে ভৃগুকে অগ্নি আনিয়া দিয়াছিলেন; ৭১ সূক্তের ৩ ঋকে আছে, যে, অঙ্গিরা অগ্নিকে ধারণ করিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন, পরে অন্যান্য লোকে সেইরূপ করিল, ইত্যাদি।

হইতে লাগিল, প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হইল। জগতের আদি ও অন্ত কার্য্য ও কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে হিন্দুগণ এক আত্মা বা ব্রহ্মকে জানিলেন। সেই উন্নত বিশ্বাস, সেই ক্ষমতাপূর্ণ অনুসন্ধানই উপনিষদ্, আমরা এখন ইহাকে বেদান্ত কহি।

যে শাস্ত্রকে আমরা শ্রুতি কহি, তাহা এই স্থানে শেষ হইল, এক্ষণে স্মৃতি আরম্ভ হইল।

স্মৃতি শাস্ত্রের প্রারম্ভেই সূত্র। সে সময়ে যাহা কিছু রচনা হইত, তাহা অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে রচনা হইত। তখনও লেখা বড় প্রচলিত হয় নাই, সমস্ত বেদ এতদিন মুখে মুখে অভ্যাস হইত, মুখে মুখে উচ্চারিত হইত, পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে আচার্য্যের নিকট শিষ্য শিখিত। এক্ষণেও যাহা রচিত হইতে লাগিল, তাহাও মুখে মুখে অভ্যাসের জন্য; সূত্রগুলি এই জন্য, এরূপ সংক্ষেপে রচিত। সূত্র সমূহের মধ্যে পাণিনির জগৎ বিখ্যাত ব্যাকরণসূত্র এবং তাৎকালিক গুহ্য ও ধর্ম্মসূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই গুহ্যসূত্রে তৎকালের হিন্দু গৃহস্থের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়;—এই গুহ্য সূত্রের অনুকরণে তাহার অনেক পরে মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সংহিতাগুলি রচিত হয়। আর এই সূত্র রচনার সময়ে যে বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তাহা হইতেই পরে প্রসিদ্ধ ষড় দর্শন উৎপন্ন হইল।

এই সূত্র-সাহিত্যের কাল না শেষ হইতে হইতেই বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিলেন, বৌদ্ধ বিপ্লব আরম্ভ হইল। প্রায় সহস্র বৎসর বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের পার্শ্বে ভারতবর্ষে স্থান পাইয়া বিলুপ্ত হইল, তাহার পর হিন্দু ধর্ম্ম কঠোরতর ভাবে পৌরাণিক ধর্ম্মের রূপে ভারতবর্ষে একাধিপত্য পাইল। হিন্দু ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপনে যে অসাধারণ পণ্ডিতগণ যত্নশীল হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; কালিদাসও ভবভূতির গ্রন্থাদির যে সংস্কৃত সাহিত্য আমাদিগের বিশেষ পরিচিত, তাহাও এই পৌরাণিক কালের। কিরূপে মুসলমান শাসনাধীনে জাতীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কঠোর অস্বাস্থ্যকর নিয়মগুলি ও পুরোহিতপ্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহা ইতিহাসে আখ্যাত আছে।

আমাদিগের সাহিত্যের এই অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে আমরা ঋগ্বেদের সময় কতক পরিমাণে নির্দ্ধারিত করিতে পারিব। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ

পণ্ডিত সর উইলিয়ম জোন্‌স বিবেচনা করেন খৃষ্টের পূর্ব্বে দ্বাদশ শতাব্দিতে চারি বেদের মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। বেদে যে জ্যোতিষ গণনা আছে তাহা হইতে গণনা করিয়া পণ্ডিতাগ্রগণ্য কোলব্রুক স্থির করেন যে খৃষ্টের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে বেদের মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। গণনা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত আর্চডিকন প্রাট্‌ সেই গণনা হইতে বেদ সঙ্কলনের সময় খৃষ্টের পূর্ব্বে দ্বাদশ শতাব্দি স্থির করিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই মতগুলি অমূলক বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু এই পর্য্যালোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিত সমূহ সচরাচর যে ভুল করেন, আমরা সেই ভুলটি না করিতে চেষ্টা করিব। ইংলণ্ডের আধুনিক সমস্ত কবিতা মিল্টনের কাব্য হইতে টেনিসনের কাব্য পর্য্যন্ত দুই কি আড়াই শত বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সেইরূপ। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক অধিক স্থিতিপ্রিয়, তাঁহাদিগের মধ্যে একটি ধর্ম্ম বা সাহিত্য সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন অধিকদিনে সঙ্ঘটিত হয়। আমাদিগের পৌরাণিক সাহিত্যের সারাংশ অন্যূন পাঁচশত বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যের সারাংশও চারি পাঁচ শত বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছিল; এই সকল উদাহরণ গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা এ বিচারে লিপ্ত হইব।

বুদ্ধদেব খৃষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। তখন সূত্র সাহিত্যের অনেক অংশ রচিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা আমরা জানি। অতএব সূত্র সাহিত্য রচনা খৃষ্টের পূর্ব্বে নবম শতাব্দিতে আরম্ভ হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

সূত্র সাহিত্য রচনার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌ সমুদয় রচিত হইয়াছিল। আধুনিক উপনিষদ্‌গুলি ত্যাগ করিলেও প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌গুলি বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তাহা যে চারি পাঁচ শত বৎসরের অল্প সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। অতএব ব্রাহ্মণ রচনা খৃষ্টের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে আরম্ভ হইয়াছিল, এরূপ অনুমিত হইতে পারে।

তাহার পূর্ব্বে বেদের মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। অতএব খৃষ্টের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমিত হইতে পারে। জনশ্রুতি আছে, যে বেদব্যাস কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় এই বেদসঙ্কলন কার্য্য

করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা কি না, বেদব্যাস ঐতিহাসিক মনুষ্য কি না, সে বিচারে অদ্য আমরা প্রবেশ করিব না।

যদি খৃষ্টের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে বেদ সঙ্কলন কার্য্য হইয়া থাকে,* তবে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল কোন্ কালে? আমরা স্মরণ রাখিব, যে ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনার পর সেই মন্ত্র রূপান্তরিত হইয়া অন্যান্য বেদের মন্ত্র রূপে পরিণত হইয়াছিল। আমরা স্মরণ রাখিব, যে ঋগ্বেদের মন্ত্র সমূহও এক দিনে রচিত হয় নাই, উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভাষায় অনেক বৈষম্য দেখা যায়, উহার মতও বিশ্বাস গুলিতেও কতক কতক বৈষম্য দেখা যায়। ঋষি কোথাও বা জ্বলন্ত সূর্য্যকে উদয় হইতে দেখিয়া বালকের ন্যায় বিস্মিত হইতেছেন, কোথাও বা সেই দৃশ্যটি দেখিয়া এক ঈশ্বরের বিশ্বাস প্রায় অনুভব করিতে পারিয়াছেন। এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে ঋগ্বেদের মন্ত্র যে খৃষ্টের ২০০০০ বৎসর পূর্ব্ব রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি আজ চারি সহস্র বৎসর হইল রচিত হইয়াছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। †

এই চারিসহস্র বৎসরের পুস্তক, এই জগতের প্রথম গ্রন্থ, এই হিন্দুদিগের সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্র ও আদিম সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন,—অনুশীলন করিয়া দেখা উচিত কি না, তাহা শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই বিবেচনা করুন। এবিষয়ে যে সকলে আমাদিগের সহিত একমত হইবেন তাহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তবে দুইটি কথা আমরা শুনিয়াছি যে, সে জন্য কেহ কেহ ঋগ্বেদ অনুশীলনের আবশ্যকতায় সন্দেহ করিয়া থাকেন।

প্রথম কথাটি যে অদ্য চারি সহস্রবৎসর পর আমরা ঋগ্বেদের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে অক্ষম অতএব অনুশীলন করিয়া কেবল আমাদিগের মূর্খতা প্রকাশ করিবার এবং ঋগ্বেদের অপ্রকৃত অর্থ পাঠকদিগকে দিবার কোনও আবশ্যক নাই।

* "The Vedic hymns were collected about 1000 B. C." *Max Muller's Origin and Growth of Religion. 1882.* এমত আমরা সমর্থন করিতে পারি না।

† Four thousand years ago, or it may be earlier the Aryans who had travelled southwards to the rivers of the Panjab called him (God) Dyu Pitar, Heaven Father.' *Max Muller's Origin and Growth of Religion 1882.* এ মত আমরা সমর্থন করিতে পারি।

দ্বিতীয় কথাটি এই যে ঋগ্বেদের ধর্ম্মপ্রণালী পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রণালী হইতে কোন কোন অংশে বিভিন্ন, ভারতবর্ষে এক্ষণে পৌরাণিক ধর্ম্মই প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদের কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যক নাই।

প্রথম কথার আমরা এই উত্তর করিব, যে আমরা ঋগ্বেদের অর্থ গ্রহণ করিতেছি না। যাস্ক সায়নাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বকালীন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই আমরা পাঠকদিগের সম্মুখে স্থাপন করিব। যাস্ক ও সায়ন ঋগ্বেদের অর্থ গ্রহণে অসমর্থ এরূপ তর্ক আমরা শুনি নাই, বোধ হয় কেহ করিবেনও না। সায়নের ন্যায় গভীর ব্যুৎপত্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন টীকাকার বোধ হয় জগতে কুত্রাপি জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তথাপি তিনি একালের লোক, তিনি খৃষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে জীবিত ছিলেন, এই কথা বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিবেন। কিন্তু যাস্ক একালের লোক ও নহেন, তিনি খৃষ্টের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে, বৈদিক বিশ্বাস. বৈদিক অনুষ্ঠান, বৈদিক আচার ব্যবহারের কালে, জীবিত ছিলেন। তিনিও কি বৈদিক অর্থ গ্রহণে অসমর্থ?

দ্বিতীয় কথাটির আমাদের এই উত্তর যে যদি বৃক্ষের বীজ হইতে বৃক্ষটি বিভিন্ন না হয়, তবে ঋগ্বেদের বিশ্বাস হইতে বেদান্তের বিশ্বাস বা পৌরাণিক বিশ্বাসটি বিভিন্ন নহে। উভয়ই হিন্দু ধর্ম্ম, উভয়ই হিন্দু গৌরবের হেতু, তবে একটি প্রাচীন, অপরটি আধুনিক, একটি হইতে অন্যটি উৎপন্ন হইয়াছে। বীজটি অনুশীলন না করিলে বৃক্ষটি বুঝিতে পারিব না, যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের সার মর্ম্ম বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা মূল হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

ঋগ্বেদের সময়ের বিশ্বাস ও আচার পৌরাণিক সময়ের বিশ্বাস ও আচার হইতে কতক বিভিন্ন তাহা সত্য, কিন্তু তাহাতে কি আশঙ্কার কোন কারণ আছে? ধর্ম্ম—জাতির জীবন; জাতীয় জীবনের সহিত ধর্ম্ম উন্নতি ও অবনতিও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়; এটি কি নূতন কথা? ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দির খৃষ্টধর্ম্ম যে অদ্যকার খৃষ্টধর্ম্ম নহে তাহা কোন্ ইতিহাসজ্ঞ না জানেন? ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণ আনন্দের সহিত জাতীয় জীবনের উন্নতির সহিত ধর্ম্মের উন্নতি লক্ষ্য করেন, আমরাও আনন্দের সহিত ঋগ্বেদ স্বরূপ অঙ্কুর হইতে কিরূপে হিন্দুধর্ম্ম স্বরূপ বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিব। আমাদের যেরূপ সুবিধা আছে সেরূপ আর কোন জাতির নাই,

জগতের মধ্যে কোনও জাতি চারি সহস্র বৎসরের মানসিক বিকাশ ও ধর্ম্মের বিকাশ নিজ জাতীয় ইতিহাসে দেখাইতে পারে না। এই ক্রমশ ধর্ম্ম-বিকাশ ভারতবর্ষের গৌরবের কথা, আশঙ্কার কথা নহে।

ফলত ধর্ম্ম যদি জাতির জীবন হয় তবে সেই বহমান জীবনের সহিত ধর্ম্মও বহিতে থাকে, এক স্থানে একরূপে দাঁড়াইয়া থাকে না। যদি ধর্ম্ম জাতীয় জীবনের সহিত পরিবর্ত্তনশীল না হইত তবে জগৎ হইতে এত দিন লোপ পাইয়া যাইত। মৃত, জীবন রহিত, গতি রহিত, ধর্ম্ম লইয়া মনুষ্যের কাজ চলে না, তাহাদিগের হৃদয়ের আশাগুলি পূর্ণ হয় না। হিন্দু ধর্ম্ম যে চারি সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বিরাজ করিতেছে, সে কেবল হিন্দুধর্ম্ম সজীব ধর্ম্ম এই জন্য। হিন্দু ধর্ম্ম আমাদিগের জাতীয় উন্নতির সহিত উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, নূতন নূতন রূপে আমাদিগের নূতন নূতন সামাজিক অভাব পূরণ করিয়াছে, আমাদিগের সুখে দুঃখে, অধীনতায় স্বাধীনতায়, শিক্ষায় ও মূর্খতায়, আমাদিগের সহচর ও সহায় হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের ধর্ম্ম তাহা চিন্তাশীল পণ্ডিত মাত্রই জানেন; তাহার কারণ এই যে হিন্দু ধর্ম্ম সজীব ও উৎকর্ষশীল, মৃত জড় পদার্থ নহে।

ফলত ঋগ্বেদের হিন্দুধর্ম্মই রূপান্তরিত হইয়া পর সময়ের হিন্দুধর্ম্ম হইয়াছিল, ইহা দেখিয়া হিন্দু জাতির হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে। অনেকে বলেন, আমরাও কতক বিশ্বাস করি, যে এখন আমাদিগের একটি নবজীবন আরম্ভ হইয়াছে, যে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণেই হউক, শিক্ষা বিস্তারের গুণেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, আমরা এক্ষণে দিন দিন উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইতেছি। হিন্দুধর্ম্ম যদি গতি রহিত উন্নতি রহিত হইত, তাহা হইলে অদ্য হয় হিন্দু ধর্ম্মের সহিত আমাদের স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত, না হয়, সেই পুরাতন চারিসহস্র বৎসরের বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া অগ্রসর হইতে হইত। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের পুরাতন ইতিহাস দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুধর্ম্ম গতি রহিত বা উন্নতি রহিত নহে, আমাদিগের উন্নতির সহিত উন্নতি লাভ করিবে, জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইবে, উৎকর্ষের সহিত উৎকৃষ্ট হইবে, অথচ আমাদের পুরাতন সহচর চিরকাল সঙ্গে থাকিবে।

জগতের সৃষ্টি হইতে হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান আকার আছে, যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, ও যাঁহারা জগতের অন্তপর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ আকাঙ্

রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাঁহারা যে প্রাচীন ইতিহাস অনুশীলন অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিবেন, আমরা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইব না। যাঁহারা কেবল সত্য উপলব্ধির জন্য ধর্ম্মের বিশ্বাস আলোচনা করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন প্রাচীন ঋষিগণও একদিনে সত্য লাভ করেন নাই। তাঁহারা দেখিবেন ঋগ্বেদের ঋষিগণ সূর্য্য ও অনন্ত আকাশকে স্তুতি করিতে করিতে কখন কখন সন্দিগ্ধমনা হইয়াছিলেন, কখনও বৈদিক দেবদিগের উপরে আর একজন দেব আছেন, এরূপ কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। * তাঁহারা সত্য লাভের কঠোর পথ এক দিনে অতিবাহিত করেন নাই, জগতে অতুল্য চিন্তা রত্নগুলি একদিনে আহরণ করেন নাই; সে কঠোর পথে তাঁহারা কিরূপে গিয়াছিলেন, ভ্রান্ত মনুষ্য কত ভ্রম করিয়া সত্য পাইয়াছিলেন, জ্ঞানের আলোকের সহিত ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বিশ্বাস কিরূপ ক্রমশ পরিবর্ত্তন ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইটি বুঝিব, আমাদের এই উদ্দেশ্য।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

---

* "যখন কিছুই ছিল না, যখন মৃত্যু বা অমরত্ব ছিল না, যখন দিবা ও রাত্রির প্রভেদ ছিল না তখন তিনি ছিলেন। ১০ম মণ্ডল ১২৯ সূক্ত।

"আমি কিছু জানি না, যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি অজ্ঞ, শিখিতে ইচ্ছা করি। যিনি এই ছয় জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তিনি কি সেই অজ্ঞাত পুরুষ"? প্রথম মণ্ডল ১৬৪ সূক্ত।

ইহা ভিন্ন বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতি প্রভৃতির স্তুতি দেখ। এরূপ চিন্তা প্রায় ঋগ্বেদের শেষ দিকের মণ্ডল গুলিতে পাওয়া যায়, গোড়ার দিকের মণ্ডল গুলিতে বিরল।

হলধর ঘটক।

হলধর ঘটক বড় তৈয়ার লোক ছিলেন। আয় উপায়, যৎসামান্য, কিন্তু তাহাতেই সর্ব্বদা প্রফুল্ল। তবে, "ছি বাবা!" বলিয়া কখন কখন চটিয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রফুল্লতা নষ্ট হইত না। তিনি সর্ব্বদাই হাস্যবদন; কিন্তু সেই হাস্যের সঙ্গে শ্লেষ যেন সর্ব্বদাই মাখান রহিয়াছে। কথায় তিনি তুখড়; তিনি বলিতেন, যে কথা কাটাইতেই মনুষ্য জন্ম, তা কথায় হঠিলে, মনুষ্যত্ব থাকে কৈ?

হলধর খুড়োর অনেক কাহিনী আমরা জানি! কিন্তু সামান্য লোকের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সভ্য রীতির বিরুদ্ধ; কাজেই আমরা সকল কথা বলিব না। তবে—গোটাকত কথা না বলিয়াও থাকা যায় না।

দেশভ্রমণ হলধর খুড়োর একটা রোগ ছিল। এখনকার মত তখন এত রেল পথ হয় নাই; সুতরাং পদব্রজে কেবল এ গ্রাম ও গ্রাম করিয়া বেড়াইতেন। শুধু শুধু ত আর দেশ ভ্রমণ হয় না; লোককে বুঝান দায়, তার উপর, তেমন সংস্থানই বা কৈ? কাজেই হলধর খুড়ো ঘটকালির একটা অছিলা করিয়াছিলেন। সেই অছিলায় বহুতর ভদ্র লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে কাহারও না কাহার অবশ্যই তাঁহাকে স্মরণ আছে।

প্রথম রেল হইতেই হলধর খুড়ো বর্দ্ধমানে উপস্থিত। ষ্টেশন হইতেই বাহির হইয়া ব্রাহ্মণ মিঠাইওয়ালার দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান। বড় বড় খাজার দাম চারি পয়সা করিয়া; অতি অল্পই আছে; কয়জন খরিদার বাছিয়া গুছিয়া বড় বড় দেখিয়া লইয়া গেল। হলধর খুড়ো বলিলেন, "একখানা চারি পয়সার খাজা দাও ত বাবা।" মিঠাইওয়ালা সেই কাচপড়া খাজা হইতে একখানা দিল। খুড়ো বলিলেন, "এ যে বড় ছোট হে বাপু!" মিঠাইওয়ালা বলিল, "তা ত ক্ষতি কি, তোমার বেশী বহিতে হইল না, ভালই ত।" শম্ভু খুড়ো আর দ্বিতীয় কথা কহিলেন না, পকেট হইতে তিনটি পয়সা বাহির করিয়া ময়রার হাতে দিলেন; ময়রা বলিল "মহাশয় তিনটে দিলেন যে";—শম্ভু খুড়ো বলিলেন "তাতে ক্ষতি কি, বেশী গুণতে হইল না, ভালই ত।" মেঠাইওয়ালা একটা মোড়া

বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "তামাক ইচ্ছা করিবেন না?" সেই হইতে মিঠাইওয়ালা ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইল; যখনই বৰ্দ্ধমানে যাইতেন, তাহার কাছে এক দিন থাকিতে হইত।

হলধর খুড়ো রাজ বাড়ী দেখিতে গেলেন। বড় বৈটকখানায় (এখন তাহা ভাঙ্গিয়া মহাতাপ মঞ্জিল হইয়াছে) সারি সারি রাজার পূর্ব্বপুরুষদের চেহারা টাঙ্গান রহিয়াছে। প্রথমে আদি পুরুষের, তাহার পর তাঁহার পুত্রের তাহার পর তাঁহার পৌত্রের কুলজিনামা অনুসারে সাজান রহিয়াছে। একখানি ছবিতে বেশ নধর সুন্দর গোলাল গালাল একটি ছেলের মাথায় জরির তাজ; তাহার পরের খানিতে শাদা চৌ-গোপ্পা, কপালে বয়সের ত্রিবলী। হলধর খুড়োর সঙ্গে পল্লীগ্রামের একটি লোক সব ছবিগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিল। এই দুইখানি ছবি দেখিয়া বলিল "মহাশয় এ যে ছেলের বয়স বাপের বয়সের চেয়ে বেশী দেখিতেছি গা" হলধর খুড়ো বলিলেন, "তবে বুঝি পোষ্য পুত্র হইবে।" সে লোকটা বলিল "তাই হবে।"

হলধর খুড়ো সহরে বেড়াইতেছেন, রাজ বাড়ীর বড় গাড়ি চারিদিকে খড় খড়ি আঁটা গড় গড় করিয়া চলিয়া গেল। একজন বলিল, "যেন মড়া ফেলিবার গাড়ি করিয়াছে।" আর একজন বলিল, "মেয়েদের জন্য গাড়ি ঐরূপই ত হবে"। হলধর খুড়ো বলিলেন 'তবেই হলো।"

হলধর খুড়ো মহেশের স্নান যাত্রা দেখিতে আসিয়া বৃহৎ একটা কাঁটাল কিনিয়াছিলেন। বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছেন কাঁটালটা আর বহিয়া লইয়া যাইতে পারেন না। হন্ হন্ করিয়া একখানা ফেরৎ গোরুর গাড়ি যাইতেছে। হলধর গাড়ওয়ানকে বলিল যে, "বাবা আমার এই কাঁটালটা তোর গাড়িতে যদি নিস্, বহিতে আর পারি না।" গাড়োয়ান বলিল "তাত নেলাম, তুমি গাড়ীর সঙ্গে আস্‌তে পারবা কি?" হলধর বলিলেন "আমিও কাটালের সঙ্গে চেপে লব।" গাড়োয়ান হলধরের মুখের দিকে একবার দেখিয়া স্বীকার করিল, সেই অবধি হলধরে মামজুতে বড় প্রণয় হয়।

কিছুকাল পরে দেনার দায়ে মামজু গাড়োয়ানের দেওয়ানী জেল হইল। মামজু গাড়োয়ান খুব মর্দ্দ; খায় ও তেমনই। ডিক্রীদারকে রোজ চারি আনা মামজুর খোরাকি দিতে হয়। এমনই করিয়া প্রায় একমাস

গেল। ডিক্রীদারের বিশ্বাস যে মামজুর কিছু আছে। হলধর খুড়ো মামজুর ঘরের খবর বেশ জানিতেন, প্রথমেই ডিক্রীদারকে বলেন; সে তাহা বিশ্বাস করে নাই। একমাস পরে হলধর খুড়ো ডিক্রীদারের বাটীতে উপস্থিত। অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "রায় মহাশয় এমন করিয়া, দিন চারি আনা করিয়া পয়সা আর কতদিন দিবেন? ইহাতে আপনারও ক্ষতি, মামজুর পরিবারেদেরও ক্লেশ; আমি একটা ঠাহরিয়াছি, সেইরূপ বন্দোবস্ত করুন।" ডিক্রীদারের মুখ চক চক করিয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন, এতদিনে আমার সংকল্প সিদ্ধ হইল, টাকার একটা কিনারা হইবে। উত্তরে হলধর খুড়োকে বলিলেন "ভালইত—যা হউক একটা বন্দোবস্ত কর না, একটা লোক জেলে থাকে, তাকি আমার সাধ"? হলধর খুড়ো বলিলেন, "আমিও তাই বলি; আপনি মামজুকে খালাস দিয়া দিন ছপয়সা করিয়া দিবেন, আর বাকি দশ পয়সা আপনার দেনার হিসাবে কাটিয়া লইবেন, কেমন এ বন্দোবস্ত ত ভালনহে কি?" ডিক্রীদার একটু হাসিলেন। আর খোরাকির টাকা জমা দিলেন না। মামজু খালাস হইয়া আসিল।

হলধর খুড়ো যাত্রা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যাত্রা শুনিবার জন্য তিন চারি ক্রোশ পথ-হাঁটা তাঁহার গায়েই লাগিত না। সকল অধিকারীর সঙ্গেই তাঁহার আলাপ ছিল; দলের অধিকাংশ ছেলেও তাঁহাকে চিনিত। সে বার গোপীনাথপুরে বদন অধিকারীর দল যাত্রা করিতে আসিল; সেই সময় হলধর খুড়ো সেইখানে। ভাগাভাগি করিয়া কয়ঘর ব্রাহ্মণের বাড়ী দলের লোকের মধ্যাহ্নের বন্দোবস্ত হইয়াছে। চারি পাঁচটি ফুট্‌ফুটে ছেলে এক বাড়ীতে তিনটার সময় আহার করিতে বসিয়াছে। হলধর খুড়ো হুঁকো হাতে করিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন; প্রাচীনা বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা পরিবেশন করিতেছেন। বয়ো-জ্যেষ্ঠ বালককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমরা এত রোগা কেন?"

বালক। "মা নিত্য রাত্রি জাগরণে কি আর শরীর থাকে?"

ব্রাহ্মণী। "বাছা, তা তোমরা কি পাও?"

বালক। "কি পাব মা! এ বেলা এই তোমার এখানে প্রসাদ পাইলাম, রাত্রিতে চারিটি জলপান। আর পালে পার্ব্বণে টাকাটা সিকাটা পাওয়া যায়।"

ব্রাহ্মণী। "যদি পাওয়া থোওয়া নাই, তবে এত কষ্ট কর কেন?"

বালক উত্তর দিতে পারিল না, নীরবে রহিল। হলধর একমনে উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতেছিলেন; এতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ কন্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "তা দিদি, বিদ্যা শিখেছে জাহির করিতেত হইবে।" ব্রাহ্মণী বলিলেন "তা বটে।" তখন এত বাঙ্গালা খবরের কাগজ হয় নাই; এত কাগজওয়ালাও ছিলেন না; থাকিলে,—হলধর খুড়ো ঐ কথাই বলিতেন, "বিদ্যে শিখেছে জাহির করিবে না।"

হলধর খুড়োর সর্ব্বত্রই গতি বিধি ছিল; তবে তিনি আইন আদালতে বড় ভয় করিতেন। ১৯ আইন জারি হইলে হলধর খুড়ো প্রায় মাসাবধি কাল বিষণ্ণ ছিলেন; ইহার পূর্ব্বে, এত দীর্ঘকালের জন্য তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদ কখনই জায়গা পায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বারই তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হয়। তখন ইংরাজিওয়ালা উকীলের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। জেরা করিয়া বুকে পাটকরা উড়াণী দেওয়া, শামলা মস্তক জীব শ্রেণীর সেই প্রথম অভ্যুদয়ের কাল। উকীল বাবু চক্ষু কটমট করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কাছ থেকে সেই জায়গা ঠিক কতদূর বল দেখি?" হলধর খুড়ো ধীর শান্তভাবে উত্তর করিলেন, "দশ হাত দশ আঙ্গুল।" উকীল বাবু এবার হাসিয়া গ্রীবাবক্র করিয়া বলিলেন, "এত ঠিক ঠাক জানিলে কি করিয়া?" হলধর খুড়ো পূর্ব্বমত বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "দুষ্ট লোকে সওয়াল করিবে বলিয়া মেপে ছিলাম।" হাকিম গোপীনাথ বাবুর সহিত সেই অবধি হলধর খুড়োর আত্মীয়তা হয়। গোপীনাথ বাবু এজলাসে আপনার সম্মুখে হলধর বাবুকে বসাইয়া রাখিলেন। মধ্যে মধ্যে একটি আধটি কথা চলিতে লাগিল। এমন সময় পুলিসের এক দারোগা বাবু সাক্ষ্য দিতে আসিলেন। মোকদ্দমা পুলিসের সংস্পৃষ্ট নয়। তবু দারোগা বাবু সে সাজে আসিয়াছেন। ভাবটা আপনার গৌরব দেখান। আবার সেই উকীল বাবু জেরা করিতে আসিলেন। তিনি দারোগা বাবুর পরিচ্ছদের উপর লক্ষ্য করিয়া, একবার চারি দিকে চাহিয়া সওয়াল করিলেন, "মহাশয় হাঙ্গার কিরীচ লইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন কেন?" দারোগা বাবু সে সওয়ালের কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, হলধর খুড়ো হাকিম বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তা বাবুদের কাছে আসিতে হইলে আগুসার করিয়া আসিতে হয় বৈকি; আমি গরিব ব্রাহ্মণ, আমাকেও রামকবচটা পরিয়া আসিতে হইয়াছে।"—উকীল বাবু, একটু বিরক্ত হইয়া

বলিলেন, "প্রথম আলাপেই এত! আপনার দেখিতেছি খুব সৌজন্যতা।" হলধর খুড়ো আপনার সেই মৌরষি হাসি হাসিয়া বলিলেন "বাবুজি, অনর্থক কথা বাড়ান কেন?" উকীল বাবু সিনিয়ার ছাত্র; কোকিলের Feminine 'মেদী কোকিল' লিখিয়া বাঙ্গালায় পাশ হন। হলধর খুড়ো টোলে বসে তামাক খাইতেন মাত্র, শুনিয়াছিলেন যে, সৌজন্য কথার উপর আর "তা" কথা হয় না।

উকীল, ডাক্তার উভয়ের উপরেই হলধর খুড়োর সমান ভক্তি ছিল। তিনি ডাক্তারদের কথা উঠিলে বলিতেন, "যাহারা বাড়ীতে পা দিয়াই তোমাকে জিহ্বা বাহির করিয়া কালী হইতে বলে, তাহারা যে তোমাকে কালের উপরে সমর্পণ করিতে ব্যগ্র, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে!" একবার গোপীনাথ বাবুর সামান্য পীড়া হয়। ঔষধ খাওয়াইবার জন্য ডাক্তার বাবুর জেদাজেদি। শেষে তিনি বলিলেন, "আপনি খান উপকার না হয়, আমি আর আপনার বাড়ীতে চিকিৎসা করিব না।" হলধর খুড়ো বলিলেন, "তবে আপনাকে ঔষধ খাইতেই হইতেছে, যেরূপ বন্দোবস্ত হইল, তাহাতে এদিকে না হয়, ওদিকে উপকার হতেই হবে।"

বাপ. পিতামহকে লইয়া লুকোচুরি দোকানদারি খুড়ো. দুইই দেখিতে পারিতেন না। পূর্ব্ব পুরুষদের পরিচয়েই যাহাদের পরিচয়, নিজের পরিচয় দিবার কিছু নাই, তাঁহাদিগকে খুড়ো বলিতেন, মুদ্দোরফরাস। বলিতেন, উহাদের সমস্ত পুঁজিই শ্মশানে। শ্মশানের সম্বল লইয়াই উহাদের ব্যবসা। আবার দীন দয়াল বড় দুঃখী ছিল, ছেলের চাকরি হওয়ায়, কিছু বারফট্টাই আরম্ভ করে। হলধর খুড়ো একদিন একখানি পুরাতন কাশ্মীরি শাল গায়ে দিয়াছিলেন, দেখিয়া দীনদয়াল বলে 'কি বাবা বৃদ্ধ পিতামহের আমলের বমাল বাহির করিয়াছ যে.' খুড়ো উত্তর দেন "ছেলের আমলের চেয়ে ভাল ত?"

হলধর খুড়োর গল্প আর কত বলিব। সে এক গঙ্গা। তেমনই কল কল ছল ছল; একদিকে তাহার ধস্ ভাঙ্গে; অন্যদিকে চড়া পড়ে; তাহাতে কত মাটি ময়লা হয়। আবার কত ফুল বিল্বপত্র ভাসে। তোমারা তাহার সব কথা শুনিতে পারিবে কি? হলধর খুড়োর কাহিনীতে দেশ উদ্ধার নাই, বক্তৃতা নাই, তোমাদের সাক্ষাতে আমাদের বলিতেই লজ্জা করে; তা তোমাদের শুনিতে লজ্জা করিবে না?

তবে হলধর খুড়োর কাছে এমন অনেক জিনিষ ছিল বটে, যে সে সকল চিরকালই উপদেষ্টাগণের পক্ষে উপদেশ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার ভাষা ও ভঙ্গি ভেদ করা অনেক সময় কঠিন। একদিনকার একটা গল্প বলি—

বলরামপুরের বিজয় বাবুর বড় বেশী বিষয় আশয় নয়। চারি পাঁচ হাজার টাকার মধ্যেই; অথচ ক্রিয়াকাণ্ড, দান, ধ্যান, লোক লৌকতায় বড় বড় বড়মানুষেরাও তাঁহার মত যশ লইতে পারেন না। একদিন হলধর খুড়োর সাক্ষাতে সেই কথা উত্থাপন হইয়াছিল; অনেকেই বলিলেন, যে "কিরূপে যে বিজয় বাবুব ওরূপ চালচলনে চলে, তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না।" হলধর খুড়ো বলিলেন, "বিজয় বাবু যে আপনার বিষয় কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার চাকরি করিয়া থাকেন।" একজন বলিলেন "তা ত এতদিন জানি না, তাইতে বটে; তা নইলে কুলায় কোথা হইতে? তা কোথায় চাকরি করেন?" হলধর খুড়ো বলিলেন "তিনি নিজের বাড়ীতেই মুহুরিগিরি করিয়া থাকেন।" তখন সকলে বুঝিল; আমাদের বিষয়ী পাঠকবর্গ মধ্যে কেহ বুঝিলেন কি? যদি কার্য্যত বুঝেন, তবে তাহাই অদ্য আমাদের বিদায়ী দর্শনী। ইতি।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা।

ধর্ম্মের চরমোন্নতিই মনুষ্যোন্নতির শেষ সীমা, কেন না ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব একই কথা। আর্য্যগণ এই কথাটি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া উন্নতির চরম লোকে অধিরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাই আজি আমরা তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মের বর্ত্তমানতা উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাই; তাঁহাদের রাজনীতিতে ধর্ম্ম, তাঁহাদের সমাজনীতিতে ধর্ম্ম, তাঁহাদের গার্হস্থ্যনীতিতে ধর্ম্ম, তাঁহাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রত্যেক দৈনন্দিন কার্য্যে ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ভিন্ন তাঁহারা কিছু জানিতেন না, ধর্ম্মানুশীলন না হয়, এমন কার্য্য তাঁহারা করিতেন না।

অনেক দিন পরে ভারতবর্ষে আবার সেই ধর্ম্মের কথা শ্রুত হইতেছে, অনেক দিন পরে মূর্চ্ছা প্রসুপ্ত আর্য্যজাতির পুনরায় জীবনীশক্তি দেখা

দিতেছে। কে জানিত এই ঘোর যবন-ম্লেচ্ছ-বিপ্লবে ভারতবর্ষ আপনার অস্তিত্ব হারাইবে না? কে জানিত, এই পিশাচের নাট্যশালায় আবার দেব লীলার সূচনা হইবে?

তাই আজি আর্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্মের কথা শুনিলে মনে বড় আনন্দ হয়, সেই ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা ও প্রতিষ্ঠাতা মহা মহোপাধ্যায় মহর্ষিগণের মহিমা কীর্ত্তন শুনিলে,মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠে। আমাদের ইচ্ছা হয়,আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই আন্দোলনে যোগ দিই, উন্মত্ত হইয়া সেই মহিমা-কীর্ত্তনে আত্ম-সমর্পণ করি, আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তি, যত কেন সামান্য হউক না, সেই ধর্ম্ম চর্চ্চায় উৎসর্গ করি।

কিন্তু যখন সেই ধর্ম্মের গুরুতার কথা মনে হয়, তখন মনে বাস্তবিকই ভীতির উদয় হয়। যে ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া আর্য্যগণ উন্নতির বৈকুণ্ঠ-ধাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া আর্য্যজাতির এত অধঃপতন হইয়াছে, ও যে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া আর্য্যজাতিকে আবার উন্নতির সেই লোকে উত্থান করিতে হইবে, সে ধর্ম্ম বড় সাধারণ পদার্থ নহে। অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণের সহিত, সেই ধর্ম্মের পথ পুনর্ব্বার পরিষ্কৃত সংস্কৃত করিতে হইবে। ক্ষিপ্রকারিতা ও অদূরদর্শিতা সকল দিক মাটি করিয়া ফেলিবে ও আমাদিগকে বিপদ হইতে বিপদান্তরে নিপতিত করিবে।

আমাদের অদ্যকার আলোচনার বিষয়,ধর্ম্ম ওধর্ম্মানুষ্ঠাতার মধ্যে কে কাহার অধীন? অনুষ্ঠাতার অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হইবে, না ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয়, এবং সেই ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যের সকল প্রকার পরিবর্ত্তনকে সংযত ও ধর্ম্ম সাধনোপযোগী করিয়া প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে?

একটু প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে ধর্ম্ম কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। ধর্ম্ম ত কাল্পনিক পদার্থ নহে, যে পরিবর্ত্তনশীল হইবে। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, যাহা বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ, তাহাই তাহার ধর্ম্ম; মনুষ্যের ধর্ম্মও সেইরূপ। যে বিশেষ গুণগুলি আমাদিগকে পশু পক্ষ্যাদি প্রাণি জগৎ হইতে পৃথক করিতেছে, যে বিশেষ গুণগুলি সূক্ষ্ম বীজ ভাবে থাকাতে আমরা মনুষ্য, যে সূক্ষ্ম গুণ বিশেষ গুলির বিনাশে মনুষ্যত্বের হানি ও যে সূক্ষ্ম গুণ বিশেষ-গুলি না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, সেই বিশেষ গুণ গুলিই আমাদের

ধর্ম্ম। সেই গুণ গুলি—আত্মজ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ঔদাসীন্য, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় প্রভৃতি। এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি আছে বলিয়াই আমাদের এই মনুষ্য প্রকৃতি। এই ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে শুধু যে মনুষ্যের আয়ুক্ষয়াদি অনিষ্ট হয় এমন নহে, মনুষ্যের আকার পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হয়; এমন কি বংশ পরম্পরায় মানুষ বনমানুষ অথবা অন্য কোন নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হইতে পারে।

মনুষ্যত্বই যদি ধর্ম্ম হইল ও ধর্ম্মের ক্ষয়ে যদি মনুষ্যত্বের ও মনুষ্যাকারের হানি হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য মনুষ্য থাকিবে, সে পর্য্যন্ত মানবধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। তুমি সবলই থাক, আর দুর্ব্বলই থাক, তুমি স্বাধীন থাক, আর পরাধীন থাক, ধর্ম্ম তোমার অবস্থার দিকে চাহিবে না। দুই লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে আত্মজ্ঞান মনুষ্যের সকল ধর্ম্মের সারভূত ধর্ম্ম ছিল, আজিও তাহাই আছে। তুমি আমি অবস্থার দাস হইয়া, সাধনা করিতে পারিব না বলিয়া যে, আত্মজ্ঞান মানবধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবে না, কি সাধনা না করা জনিত ফল তোমাতে আমাতে স্পর্শিবে না, তাহা নহে।

ধর্ম্ম যদি অনুষ্ঠাতার অপেক্ষা না করিল, তাহা হইলে বুঝা গেল অনুষ্ঠাতাকেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে। তুমি যে কোন অবস্থায় থাক না কেন, তোমাকে সর্ব্ব প্রযত্নে সেই একই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

এক্ষণে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন লইয়া দুই একটি কথা আছে। দুই ভাবে আমরা অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি। এক, জড় জগতের প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শারীর প্রকৃতির ও তন্নিবন্ধন মানস প্রকৃতির পরিবর্ত্তন; অপর, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অথবা স্বেচ্ছাচারিতার জন্য পরাধীনতা, ইত্যাদি ব্যক্তিগত অবস্থার পরিবর্ত্তন। সত্যত্রেতাদি যুগের লোক অপেক্ষা আমাদের শরীর দুর্ব্বল; তিন সপ্তাহ উপবাস করিলে তাঁহাদের কিছু হইত না, কিন্তু এক দিন উপবাস করিলে আমরা মরিয়া যাই; যে যে উপকরণে তাঁহাদের আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম্মের বিকাশ হইত, সেই সেই উপকরণে আমাদের আত্মজ্ঞানাদির বিকাশ হয় না, ইত্যাদি প্রথম প্রকার পরিবর্ত্তনের উদাহরণ।*

---

* ভৌতিক প্রকৃতি যে অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই অবগত আছেন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানের ভৌতিক প্রকৃতি

পূর্ব্বে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, এক্ষণে আপিসে কেরাণিগিরি না করিলে, তাঁহার জীবিকা চলে না, ইত্যাদি দ্বিতীয় প্রকার পরিবর্ত্তনের উদাহরণ। প্রথম প্রকার পরিবর্ত্তন প্রকৃতির নিয়মে ঘটিয়া থাকে, উহা নিবারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য; দ্বিতীয় প্রকার পরিবর্ত্তনের দাস হওয়া অল্প অধিক পরিমাণে আমাদের ইচ্ছা সাপেক্ষ। যে জীবনোপায়ে অধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, বা যাহা ধর্ম্ম সঞ্চয়ের পথে বাধা দেয়, তাহা অবলম্বন করা না করা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

আমরা প্রথমত প্রথম প্রকার পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ জাগতিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শারীর প্রকৃতির ও তন্নিবন্ধন মানস প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের কথা বলিব। এস্থলে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন কথায় কেহ বুঝিবেন না যে, মনুষ্য প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। জাগতিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা প্রথমত মনুষ্যের শরীরের উপর দিয়া। বলের হ্রাস বৃদ্ধি, শীতোষ্ণাদি সহ্য করিবার শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি,—এই পরিবর্ত্তনের অন্তর্ভূত; নহিলে মনুষ্যের কোন মূল প্রকৃতির, যাহা লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। মানুষ সেই মানুষই আছে, হয়ত পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল; শীতোষ্ণাদির কষ্ট, কি উপবাসজনিত কষ্ট হয়ত পূর্ব্বের মত সহ্য করিতে পারে না। ফল এই হইয়াছে, পূর্ব্বে যে সমস্ত ক্রিয়ায় ও যে সমস্ত উপকরণে অধিকাংশ মনুষ্যের চিত্ত-সংযম ও ধৃতি সংস্থান হইত, এক্ষণে সে সমস্ত ক্রিয়া ও সে সমস্ত উপকরণ-সংহৃতি অধিকাংশ মনুষ্যের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

একটু প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, যে মানবপ্রকৃতির এইরূপ অপ্রতিবিধেয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবল ধর্ম্ম সঞ্চয়ের উপকরণ অথবা উপায় পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র। মূল প্রকৃতি কখন বদলায় না। মানবের ধর্ম্মও কখন বদলায় না। সেই ধৃতি ক্ষমতাদি যাহা সত্যযুগের ধর্ম্ম ছিল, সেই ধৃতি ক্ষমতাদি এক্ষণকারও ধর্ম্ম। যে আত্মজ্ঞানে তখনও সর্ব্বথা অন্বে

যেমন ছিল, এক্ষণে সে স্থানের সে প্রকৃতির আর সেরূপ নাই। পুরাণাদিতে আমাদের দেশের বৎসর বর্ণনা যেমন দেখা যায়, এক্ষণকার সহিত তাহার সকলাংশে ঐক্য হয় না। পূর্ব্বে ষড়্ ঋতু যেমন সমভাবে উদিত হইত, এখন আর তেমন হয় না। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে তাপের পরিমাণ অধিক হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

ষণীয় ছিল, এখনও তাহা আছে, তবে উপকরণের ইতর বিশেষ মাত্র। এই উপকরণ বা উপায়ভেদে যে উপাসনা প্রণালীর ভেদ আছে, আমরা শাস্ত্রে তাহা দেখিতে পাই। শাস্ত্র উপাসনার পাঁচ প্রকার উপায় নির্ণয় করিয়াছেন।

১ম। নিজের অন্নময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের উপর সমাধি। * এক্ষণে যেমন ধর্ম্ম বলিলে কেবল মাত্র ঈশ্বরোপাসনা বুঝায়, পূর্ব্বে তেমন ছিল না। আর্য্যগণের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার প্রণালী স্বতন্ত্র। "ভগবন্ কোঽহং অস্মি?" ইহাই শিষ্যের গুরুর প্রতি প্রথম ও শেষ প্রশ্ন। আমি কে, আমি তাহাই জানিতে পারিলে আমার কার্য্য সিদ্ধ হইল। তাহাই জানিবার জন্য ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন হইয়া থাকে, ও সে উপাসনার চরম ফল এই দাঁড়ায়, যে ঈশ্বর ও আমাতে কোন ভেদ থাকে না, অর্থাৎ জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার পক্ষে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বতন্ত্র। ভগবান্ পতঞ্জলি তৎকৃত দর্শনের প্রথমেই এই প্রকার সাধনার উল্লেখ ও বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমত নিজের অন্নময় কোষের উপর সমাধি করিতে হইবে, অর্থাৎ নিজের আত্মময় কোষের সহিত মিশ্রিত করিয়া চৈতন্যের চিন্তা করিতে হইবে; করিতে করিতে যখন সেই অন্নময় কোষকে চৈতন্য পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাইবে, তখন অন্নময় কোষের সমাধি সফল হইবে। তৎপরে মনোময় কোষের উপর সমাধি করিতে হইবে, অর্থাৎ মনোময় কোষের সহিত মাখাইয়া পরমাত্মা চৈতন্যের ধ্যান করিতে হইবে। যখন চিত্তচাঞ্চল্যপরিশূন্য হইয়া কেবল চৈতন্য পরিব্যাপ্ত মনোময় কোষকেই দেখিতে পাইবে, তখন মনোময় কোষের সমাধি সমাপ্ত হইবে। অতঃপর বিজ্ঞানময় কোষ। তাহারও সমাধি ঐরূপে করিতে হইবে। বিজ্ঞানময় কোষের সমাধি শেষ হইলে পর আনন্দময় কোষের সমাধি করিতে হইবে। আনন্দময় কোষের সমাধি শেষ হইয়া গেলেই পরমাত্মা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। প্রকৃত আত্মজ্ঞানরূপ পরম ধর্ম্মের তখনই পূর্ণরূপে বিকাশ হয়। এই প্রণালীর মধ্যে ঈশ্বর-

---

* ভৌতিক পদার্থ বিরচিত স্থূল দেহের নাম অন্নময় কোষ, দশেন্দ্রিয় ও মনের নাম মনোময় কোষ, বুদ্ধি অভিমান ও চিত্তের নাম বিজ্ঞানময়কোষ, এবং প্রকৃতি ও চৈতন্যের নাম আনন্দময় কোষ।

ভাবে ধ্যান ধারণাদি কিছুই নাই। প্রধান প্রধান ঋষিগণ এই প্রণালীর সাধক ছিলেন। সাধনার এই প্রণালী বড় কৃচ্ছ্রসাধ্য ও ইহাতে নানাবিধ বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। মনুষ্য প্রকৃতি অতি উচ্চের না হইলে এ সাধনা তাহার আয়ত্তীভূত হইতে পারে না। ক্রমে কাল সহকারে যখন মনুষ্যপ্রকৃতি একটু হীন বল হইয়া আসিল তখনকার জন্য আর একরূপ বিধান হইল।

২য়। নিজের অন্নময়াদি কোষের উপর সমাধি করা যখন অসাধ্য হইয়া উঠিল, তখনকার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইল। তখন নিজের অন্নময়াদি কোষের সহিত ঈশ্বরের অন্নময়াদি কোষের ঐক্য করিয়া সমাধি করিতে হইবে। আমার এই স্থূল দেহ যেমন আমার অন্নময় কোষ, এই স্থূল জগৎ তেমনই ঈশ্বরের অন্নময় কোষ ও সেই স্থূল জগতের অন্তর্গত বলিয়া আমার দেহও ঈশ্বরের অন্নময় কোষের অন্তর্নিবিষ্ট। সাধনার এই প্রণালীতে ভক্তি প্রথম দেখা দিল। কাল স্বভাবে মনের বলের যেটুকু অভাব হইল, ভক্তি তাহা পূরণ করিয়া দিল। আমি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে শিখিলাম। সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বর বলিয়া দেখিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্রমে অন্নময়াদি কোষ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর কোষে উঠিতে লাগিলাম, শেষে সেই চৈতন্য-সমুদ্রে নিজের ক্ষুদ্র চৈতন্য মিশাইয়া দিলাম, তখন আমি আর আমার ঈশ্বর এক হইয়া গেল। সাধনার এই প্রণালীতেও পুষ্প চন্দনাদির আবশ্যক হয় না, বা ঈশ্বরের কোন মূর্ত্তি বিশেষের চিন্তা করিতে হয় না। ইহাও মনুষ্যপ্রকৃতির অতি উচ্চতা সাপেক্ষ।

৩য়। তাহার পর প্রকৃতি আরও একটু হীনবল হইয়া আসিলে পর আর একরূপ সাধনার বিধান হইল। কালক্রমে যখন অন্নময়াদি কোষের ধারণা কঠিন হইয়া আসিল, তখন ঈশ্বরের অঙ্গীভূত এক একটি পদার্থ আশ্রয় করিয়া চৈতন্যের চিন্তা আরম্ভ হইল। নিজের অন্নময়াদি কোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত চৈতন্যের চিন্তা করিতে লাগিল, কেহ বা অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া অগ্নিনিহিত চৈতন্যের চিন্তা করিতে লাগিল। সূর্য্য বা অগ্নিকে চেতন বলিয়া অনুভব করিতে পারিলে ক্রমে ঈশ্বরের ব্যাপ্তি ও সমস্ত জগৎকে চেতন অনুভব করিতে কষ্ট হয় না। আপনা আপনিই সে অনুভব আসিয়া পড়ে ও তৎপরে ক্রমে ক্রমে জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হয়। সাধনার এই প্রণালীতে যাগ যজ্ঞাদির প্রয়োজন হয়।

৪র্থ ও ৫ম। ক্রমে প্রকৃতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে অবচ্ছিন্ন ভাবে চৈতন্য চিন্তা করাও কঠোর সাধ্য হইয়া উঠিল, তখন ঈশ্বরের অবতার চিন্তা করিবার প্রথা প্রচলিত হইল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশাদি ঈশ্বরের ইচ্ছামত আবতারিক মূর্ত্তি সকল এবং রাম-কৃষ্ণাদি দেহাবতার সকল সাধকের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। সাধক সেই সকল মূর্ত্তিতে চৈতন্যের আধার ভাবিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, সোঽহং ভাবে সাধক সেই মূর্ত্তির সহিত একীভাব হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ মূর্ত্তিতে তাহার সমাধি হইল। অবিকল্প সমাধি হইতে ক্রমে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে, খণ্ড চৈতন্য হইতে ক্রমে ব্যাপ্ত চৈতন্যে পৌঁছিতে লাগিল। শেষে সেই চৈতন্যসাগরে আত্মহারা হইয়া আত্মজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ লাভ করিল।

সাধনার এই প্রণালীতে পুষ্পচন্দনাদি বিবিধ বাহ্যোপকরণের প্রয়োজন হয়। অধুনা সমাজে এই প্রকার উপাসনাই প্রচলিত।

সাধারণ মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনানুসারে যুগভেদে এক এক প্রকার সাধনার বহুল প্রচার হইয়াছিল বটে, কিন্তু শাস্ত্রে সকল প্রণালীর কথাই উক্ত আছে ও সকল যুগেই সকল প্রকারের সাধক বর্ত্তমান ছিল। সত্য যুগের সকলেই যে প্রথম প্রণালীর সাধক ও কলির সকলেই যে ৪র্থ ও ৫ম প্রণালীর সাধক, তাহা নহে। সত্য যুগেও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিল—যাগ, যজ্ঞও হইত, অবতারেরও উপাসনা হইত। আবার কলিতেও এমন লোকের বিষয় জানা যায় যাঁহারা প্রথম প্রণালীর সাধক। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যাদি প্রথম প্রণালীর সাধক ছিলেন।

যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা গেল জাগতিক প্রকৃতির ও তন্নিবন্ধন মানস প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র, ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যে আত্মজ্ঞান সত্য যুগের ধর্ম্ম ছিল, যে মুক্তি সত্য যুগেও বাঞ্ছনীয় ছিল, সে আত্মজ্ঞান কলিযুগেরও ধর্ম্ম আছে, সে মুক্তি কলিযুগেও প্রার্থনীয়। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনীয় নহে, কিন্তু ধর্ম্ম সাধনের উপায় ও উপকরণ পরিবর্ত্তনীয় বটে।

মহামায়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শুভ সংবাদ।

নিজ বাঁকিপুর সহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ট্রাঙ্ক রোডের উপরে একটি সুন্দর দ্বিতল বাটী ছিল। বাটীটির চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত, মধ্যে ইঁদারা ও নানাবিধ সুস্বাদু ফল মূলাদির বৃক্ষ, সম্মুখ ভাগ নয়নানন্দ-প্রদ কুসুমকানন পরিশোভিত, দেখিলেই নয়ন জুড়াইয়া যায়, প্রাণ বিমোহিত হয়। এই সুন্দর বাটীটির একমাত্র অধিকারী সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা। সর্ব্বানন্দের আদিবাটি কোন্নগর,—সর্ব্বানন্দের পিতা ব্যবসা উপলক্ষে তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তিনি নিরক্ষর লোক হইলেও কমলার কৃপায় অল্পদিন মধ্যে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, নগদ টাকা জমিদারী প্রভৃতি অনেক করিয়াছিলেন। সর্ব্বানন্দ তাঁহার একমাত্র পুত্র, পিতার অকাল মৃত্যুতে তিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কিছু বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিলাসিতায় পিতার সোণার ব্যবসা মাটি করিলেন, এবং দিনে দিনে ঋণ-জালে জড়ীভূত হইয়া অনেক সম্পত্তি হইতে ক্রমশ বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু মেজাজ পূর্ব্ববৎই আছে, কেহ দায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে কখন বিমুখ করিতেন না, অনাথ অনাশ্রয়ের তিনি পিতাস্বরূপ।

সর্ব্বানন্দর এখন একখানি জমিদারি ব্যতীত আর কিছুই নাই—, তাহাও ষষ্টি সহস্র মুদ্রায় বন্ধক দিয়াছেন, সুদ দিতেই তাঁহার আয় প্রায় ফুরাইয়া যায়। সুতরাং সংসারে অনাটন হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বানন্দ এতদিনে অর্থের উপকারিতা বুঝিয়াছেন; যে অর্থকে তিনি অকিঞ্চিৎকর পদার্থজ্ঞানে হতাদর করিতেন, এখন তাহার আদর বুঝিয়াছেন; কিন্তু অর্থ নাই, আদর করিবেন কাহাকে?

বার্ষিক তাঁহার লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল, তাঁহার আজি এই দশা। সর্ব্বানন্দের বদনমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন দেখা দিয়াছে, তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ন। সর্ব্বানন্দের অতুল সুখ—প্রেমময়ী ভার্য্যা, তিনি স্বামীর অপব্যয়ে আধুনিক রমণীদিগের ন্যায় মান, অভিমান, তিরস্কার, করা দূরে থাকুক, ভ্রমে সে কথা উত্থাপনও করিতেন না। পাছে—সাংসারিক অসচ্ছলতা দর্শনে,—স্বামীর মনোকষ্ট হয়, সেই জন্য তিনি যাহাতে তাহা টের না পান, তাহার বিশেষ

চেষ্টা করিতেন। স্বামীর সন্তোষসম্পাদন, তাঁহার [illegible] ছিল,—এই দেবীদুর্লভ রমণীরত্নের নাম—দুর্গাবতী। দুর্গাবতী যৌবনকালে বড়ই সুন্দরী ছিলেন,—এখনও কম নয়। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাত্রিংশ বৎসর। সর্ব্বানন্দ অপেক্ষা চারি পাঁচ বৎসরের ছোট।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে,—আকাশে পূর্ণ শশধর সমুদিত, তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণজালে জগৎ সংসার হাস্যময়। সর্ব্বানন্দের কুসুমকানন তাহার বিমল ছটার অতুল শোভায় সুশোভিত। সর্ব্বানন্দ দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া বাতায়ন পথ দিয়া কুসুমকানন প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন; তবে কি তিনি প্রকৃতির এই অতুল শোভা দেখিতেই নিবিষ্ট চিত্ত? তাঁহার দৃষ্টি কুসুমকাননে সংলগ্ন ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার মন অন্য চিন্তায় নিবিষ্ট ছিল, সুতরাং তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। এমত সময়ে সেই দ্বারদেশে দুর্গাবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ক্ষণেক স্বামীর প্রতি চাহিয়া তথা হইতে সরিয়া আসিলেন, চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে বলিলেন "আমাদের জন্যই সতত চিন্তিত,—আমরা কেন উঁহাকে বিষাদিত করিতে সংসারে জন্মিয়াছিলাম।" দুর্গাবতী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; আপন মনে হাসিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হাসি আসিল না, যাহা আসিল তাহাতে মন উঠিল না। দুর্গাবতী—ক্ষণেক পরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে কহিলেন "একি, বসে বসে ভাবছ কি?"

সর্ব্বানন্দ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "না—এমন—কিছু নয়।"

দুর্গা। এমন আর তেমন কি, তুমি ভাব কেন, ভাবলে কি শরীর থাকে।

সর্ব্বা। ভাব্‌ব না মনে করি বটে, কিন্তু এক এক সময় কেমন ভাবনা এসে পড়ে। এখন অমূল্যর চাকরিটি হয় তো বাঁচি।

দুর্গাবতী বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, "পাঁচটি নয়, সাতটি নয়—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে একটি, তা কি ছেড়ে থাকা যায়, আর বিশেষ ও যে চাকরি—বাপ্‌রে,' দুর্গাবতী শিহরিয়া উঠিলেন।

সর্ব্বা। চাকরিটিতে বেশ দু পয়সা আছে,—বিশেষ ইংরেজদের এখন আর কোন লড়ায়ের হাঙ্গাম নাই ত।

দুর্গা। কমিসেরিয়েটের কাজ এমন নয়, সেবার ন-কাকার কি কম বিপদটা হয়েছিল।

সর্ব্বা। তেমনি কেমন বিষয় করেছেন। আমার অমূল্য যদি বিষয়টি উদ্ধার কর্‌তে পারে, তা হ'লে ভাবনা কি! এই পাঁচ বৎসরে কত টাকা সুদ দিয়াছি ভাব দেখি।

দুর্গা। তা কি দেখ্‌ছি না। আচ্ছা সে যা হোক যাদের বিষয় নেই, তাদের কি সুখ নেই? আমার মনে হয় যদি তোমাদের নিয়ে নির্জ্জন বনে কুটীর মধ্যে থাকি, তাতেও সুখ আছে, আর তাতে যে সুখ, সে সুখ তোমরা বিদেশে থেকে আমাকে রাজ্যেশ্বরী করলেও নেই।

এমত সময়ে কক্ষ মধ্যে একটি সপ্তদশ বর্ষীয় বেশ বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা-পুরুষ প্রবেশ করিয়া সাগ্রহে কহিলেন "বাবা আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে।"

সর্ব্বানন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন "অঁ্যা হয়েছে?"

যুবক। হঁ্যা।

সর্ব্বানন্দ যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন, কিন্তু দুর্গাবতীর কোমল হৃদয় দুর দুর করিয়া উঠিল, চক্ষু সজল হইল, তিনি কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

প্রভাত সময়—সূর্য্যদেব উদয় হইয়াছেন মাত্র। কল্য আবার যখন জগৎ সংসারে সূর্য্যদেবের উদয় হইবে, তখন আর অমূল্য এখানে থাকিবে না, তাঁহাকে কানপুর অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। সৈনিক বিভাগ হইতে তাঁহাকে ত্বরায় কানপুরে আসিয়া চাকরি গ্রহণ করিবার আদেশ হইয়াছে।

অমূল্য সর্ব্বানন্দের একমাত্র পুত্র। আজি সপ্তদশ বৎসর একটি দিনের জন্যও তিনি পুত্র ছাড়া হন নাই—পুত্রের অদর্শন যাতনা যে কি তাহা তিনি জানেন না, কিন্তু কল্য তাঁহাকে ইহা বুঝিতে হইবে। সর্ব্বানন্দ প্রাতঃকালে পুত্রের সহিত কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন—"বিদেশ, বড় বিশ্রী স্থান. তথায় বিশেষ সাবধানে থাকা চাই,—আর তোমার জমার টাকা আমি সত্বর পাঠাইব, ভদ্রাসন বন্ধক ব্যতীত তাহার উপায় নাই।"

অমূল্য। বাড়ীটিও বন্ধক পড়িবে?

সর্ব্বা। তুমি উদ্ধার করবে, এখন তুমিই আমার এক মাত্র ভরসা।

অমূল্য অধোবদনে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, মনে মনে ভাবিতেছিলেন "ঈশ্বর যদি দিন দেন, তবে পিতার এ দুঃখ ঘুচাইব।"

সর্ব্বানন্দ আরও কিছুক্ষণ নানা বিষয়ক কথোপকথনের পর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন অমূল্যর হৃদয়ে কত প্রকার চিন্তা-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতে লাগিল। নূতন দেশ ভ্রমণ,—নূতন জীবন অবলম্বন প্রভৃতির কতই আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত,—স্নেহময়ী দুর্গাবতী আজি নানাবিধ আহারের আয়োজন করিয়াছেন, অমূল্য যে সকল বস্তু আহার করিতে ভালবাসে আজি সে সমস্তই প্রস্তুত।

ক্রমশ দিবা শেষ হইতে লাগিল, প্রাণাধিক অমূল্য রতনের বিদেশ যাইবার সময় নিকট হইতেও নিকটতর হইয়া আসিতে লাগিল, দুর্গাবতীর হৃদয় অধিক হইতে অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। যদিও দুর্গাবতী নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া আত্ম বিস্মৃত হইবার অশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন সত্য, কিন্তু তথাপি থাকিয়া থাকিয়া অপাঙ্গে জল দেখা দিতে ছিল, কখন কখন তিনি গোপনে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাধানে বদন ন্যস্ত করিয়া স্বকীয় হৃদয়রাজ্যে দুঃখকে তাহার আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্রয় প্রদান করিতে ত্রুটি করিতেছিলেন না। হায়! আজি সপ্তদশ বৎসর ধরিয়া যাঁহার জীবন-নদী প্রভাকরদীপ্ত কিরণজাল বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, আজি তা ঘোর কৃষ্ণান্ধকার মেঘমালায় আবৃত হইল। সংসারের নিয়মই এই, এখানে চির সুখ কাহারও নাই।

দিবা অবসান প্রায়, প্রখর রবি-ছটা মন্দীভূত হইয়া আসিল, অমূল্যের বিদেশ যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত, যান গৃহ দ্বারে সমাগত। আজি দাস দাসী সকলেই যেন মহা ব্যস্ত। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, অমূল্য আহারান্তে শয়ন করিলেন। গৃহ নীরব, পল্লী নীরব—কিন্তু অমূল্যের চক্ষে এখনও নিদ্রা নাই, বিদেশ গমনের উৎসাহ আনন্দ সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে, মাতার যত্ন, পিতার স্নেহ প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে উদিত হইতে লাগিল, মন ক্রমশ উদাস হইল, তিনি আপন মনে অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সহসা দ্বারদেশে কিসের মৃদু শব্দ হইল। অমূল্য চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন ইহ সংসারের দেবী—জননী—দুর্গাবতী।

দুর্গাবতী বলিলেন "অমূল্য, বাবা এখনও ঘুমোও নি!"

অমূল্যরতন সজল নেত্রে বলিলেন "না—মা।"

দুর্গাবতী আর থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন, পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি তুমি, চিরজীবী হও;

ভগবান যেন তোমায় ভাল রাখেন, বাবা, তোমা ছাড়া এ সংসারে আর আমার কেউ নাই।"

দুর্গাবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, বাক্য অস্ফুট হইল। তাঁহার চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

অমূল্য। মা তুমি কাঁদ্‌চ?

দুর্গাবতী। না বাবা,—বড় মনটা কেমন কর্‌ছে—আজ সতেরটি বছর তোকে নিয়ে যে কি সুখে ছিলাম—

তাঁহার কণ্ঠ আবার রোধ হইল, তিনি আবার অঝোরে কাঁদিলেন।

অমূল্য। তবে আমি যাবনা মা।

দুর্গা। তাও কি হয় বাপ,—আমাদের এখন তুমিই একমাত্র ভরসা, তোমার আশাতেই তিনি এখনও জীবিত আছেন।

অমূল্য। মা তবে তুমি আর কেঁদো না—আমাকে কাঁদিওনা।

দুর্গা। না বাবা, এই আমি যাই, মনে করেছিলাম দরজার ফাঁক দিয়ে তোর মুখখানি দেখবো, কিন্তু এসে আর থাকতে পারলাম না। তুমি যে আমার কাঙ্গালের ধন,—অঞ্চলের নিধি!

দুর্গাবতী আর কোন কথা না কহিয়া বলিলেন "তুমি ঘুমোও, আমি আসি।"

অমূল্য আধোবদনে রহিলেন; দুর্গাবতী প্রস্থান করিলেন। অনেকক্ষণ পরে অমূল্য শয়ন করিলেন, ক্ষণেক পরে নিদ্রাও আসিল, কিন্তু সে রজনীতে দুর্গাবতীর আর নিদ্রা হইল না। তিনি রজনীতে অনেকবার দ্বারদেশ হইতে অনিমেষ লোচনে পুত্রের বদন প্রতি চাহিয়া চক্ষুজলে বক্ষস্থল ভাসাইয়াছিলেন, অনেকবার—কেন কাঁদি, কেন বাছার অকল্যাণ করি - বলিয়া আপন মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু চক্ষু মানে নাই, যেন বিষাদে বিদীর্ণ হইয়া সলিল পাত করিয়াছিল। ধন্য-মাতা! ধন্য তোমার কোমল স্নেহ পূর্ণ প্রাণ, মানব বহুভাগ্য বলে ইহ সংসারে মাতৃধনের অধিকারী হয়। যাঁহার মাতা বর্ত্তমান, তিনি শত দুঃখ থাকিলেও ভাগ্যধর!

অতি প্রত্যুষে অমূল্য রতন পিতা মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন। যাইবার কালে অমূল্য বাতায়ন দিকে চাহিয়া দেখেন, যে মাতা সজল নেত্রে দণ্ডায়মান। অমূল্য রতনের যান দৃষ্টি বহির্গত হইল, অমনি দুর্গাবতী আকুল নয়নে উদাস প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ মানসিক বিকলতার কথা সর্ব্বানন্দ জানিলেন না, পাছে তাঁহার দুঃখে সর্ব্বানন্দ সমধিক দুঃখিত হন, সেই জন্য তিনি তাঁহার নিকট কোন দুঃখ করিতেন না।

শুক সারী-সংবাদ।

শুক বলে,
আমার কৃষ্ণ রোজ্‌গারি ছেলে,
সারী বলে,
আমার রাধায় গয়না দিবে বলে,
রোজ্‌গার কিসের লাগি ?
শুক বলে,
আমার কৃষ্ণের চস্‌মা শোভে নাকে,
সারী বলে,
আমার রাধায় খুঁটিয়া দেখ্‌বার পাকে,
নৈলে পর্‌বে কেন ?
শুক বলে,
আমার কৃষ্ণের দাড়ি দোলায়িত,
সারী বলে,
আমার রাধার চিরুণী-চালিত,
নৈলে জটা হ'ত।
শুক বলে,
আমার কৃষ্ণের চেন্‌ ঝলমল, ;
সারী বলে,
সেত রাধার গোটেরি নকল,
কেবল এপিট ওপিট।
শুক বলে,
আমার কৃষ্ণের আলবর্ট টেরী—
সারী বলে,
আমার রাধার সীঁথির অনুকারী,
টেরী পেলে কোথা ?
শুক বলে,
আমার কৃষ্ণ কভু হাট-কোট ধারী—
সারী বলে,
রাধার তখন ঘেরাল ঘাঘরি —
সে যে রাই নাগরী।
শুক বলে,
আমার কৃষ্ণ সাম্য গীতি গায়—
সারী বলে,
আমার রাধায় ভুলাবারে চায়,
নৈলে বিষমদায়।
শুক বলে,
কৃষ্ণ আকুল স্বাধীনতা তরে,
সারী বলে,
তাইতে রাধার কোটালি সে করে,
এই দিন দুপরে।
শুক বলে,
কৃষ্ণ করেন নারীর উদ্ধার,
সারী বলে,
নৈলে মন পেতো কি রাধার ?
হতো পায়েধরা সার।
শুক বলে,
আমার কৃষ্ণ কোম্‌ত তন্ত্র পড়ে,
সারী বলে,
আমার রাধার পূজা কর্‌বে বলে,
কোম্‌ত রাধাতন্ত্র।
শুক বলে,
আমার কৃষ্ণ হবে বলণ্টিয়ার,
সারী বলে,
আমার রাধা তাতেও আগুসার
যমুনার ঢেউ দেখেছ।
শুক বলে,
আমার কৃষ্ণ যোগ শিখিতে চায়,
সারী বলে,
আমার রাধা মন্ত্রদাতা তায়,
সে যে মন্ত্রগুরু।
শুক বলে,
আমার কৃষ্ণ লেখে নবেল নাটক,
সারী বলে,
তাতে রাধার গুণেরই চটক,
তাই পড়ে পাঠক।
শুক বলে,
আমার কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন গায়,
সারী বলে,
বিনোদিনী মহাপ্রভু তায়,
নৈলে ভজ্‌বে কেন ?
কবি বলে,
শুক-সারীর বিবাদ সে অনন্ত যমুনা;
গোটা দুই কথা মাত্র দিলাম নমুনা।
বলি, লাগ্‌লো কেমন ?

নবজীবন।

২য় ভাগ } ভাদ্র ১২৯২। { ২য় সংখ্যা।

মৈত্রী।

জাতিভেদ।

সমত্ববাদ এবং মৈত্রীবাদ ভারতের জিনিস। কিন্তু সমত্ববাদ এবং মৈত্রীবাদ কি ভারতের কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রেই আছে, ভারতবাসীর জীবনে কি তাহার কোন কার্য্যকারিতা নাই? ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এবং ইংরাজি-শিক্ষা-সম্পন্ন অনেক বাঙ্গালি বলিয়া থাকেন যে "ভারত বৈষম্যময়, সাম্য বা সমত্বের চিহ্ন মাত্র তথায় নাই।" এবং মৈত্রীবাদ সম্বন্ধে অনেকে বলিয়া থাকেন যে ওটা কেবল কথার কথা। সর্ব্বব্যাপী প্রেম বা মৈত্রী মনুষ্য মধ্যে অসম্ভব। দুইটি মতই আমাদের ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়।

যাঁহারা বলেন যে হিন্দু সমাজে সাম্য বা সমত্ব নাই, তাঁহারা প্রমাণ স্বরূপ প্রধানত জাতি বা বর্ণভেদের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে "যেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্রের মধ্যে এত প্রভেদ সেখানে লোকের সমত্ব-বোধ কোথায়?" কিন্তু এই বর্ণ ভেদ প্রথার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিলে ইহাতে সমত্বের অসদ্ভাব লক্ষিত হইবে না, এবং ইউরোপবাসীর অপেক্ষা হিন্দুর সমত্ব-বোধ যে অনেক বেশী, তাহাও পরিষ্কার উপলব্ধি হইবে। বর্ণ-ভেদ প্রথার একটি ফল এই যে তদ্দ্বারা লোকমধ্যে পদ, মর্য্যাদা, সম্মান প্রভৃতি লইয়া অনেক ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ, কাহারো পদ শ্রেষ্ঠ হয়, কাহারো পদ নিকৃষ্ট হয়, কাহারো সম্মান বেশী হয়, কাহারো সম্মান কম হয়, ইত্যাদি। এইরূপ হইলে সকল লোক আর সমান হয় না, লোকমধ্যে বিষম বৈষম্য উপস্থিত হয়। কিন্তু

এরূপ বৈষম্য অনিবার্য্য। যে ইউরোপকে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালি সাম্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা স্থান বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সেই ইউরোপেও এ প্রকার বৈষম্য বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। ইউরোপে হর্বার্ট স্পেন্সরের ন্যায় একজন দার্শনিকের যে সম্মান, একজন সামান্য মুদির তাহার এক-শতাংশ সম্মানও নাই। ফরাসি রিপব্লিকের অধিনায়ক মুসো গ্রিবির যে পদ ও মর্য্যাদা, একজন ফরাসি পাহারাওয়ালার তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট পদ ও মর্য্যাদা। অতএব পদ, মর্য্যাদা ইত্যাদি লইয়া লোকমধ্যে সকল দেশেই ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এবং তদ্রূপ ইতর বিশেষ হওয়াও উচিত। মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিতের সম্মান যদি বেশী না হয়, তবে পণ্ডি-তের প্রতি অবিচার করা হয়; কিন্তু সাম্য সংস্থাপনার্থ যদি অবিচার করিতে হয়, তবে সাম্য আর সাম্য হয় না, বিষম বৈষম্য হইয়া পড়ে। আসল কথা এই যে লোকের ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিমাণ ভেদে তাহা-দের কর্ম্ম ও বিভিন্ন হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মের বিভিন্নতা অনুসারে তাহা-দের পদও বিভিন্ন এবং সমাজে সম্মান ইত্যাদি কম বেশী হইয়া থাকে। কর্ম্ম, পদ এবং সম্মান ইত্যাদির এই প্রকার বিভিন্নতাই প্রকৃত সাম্য। এক পক্ষে লোকের ক্ষমতার প্রকৃতি এবং পরিমাণের বিভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাদের সকলকে যদি একই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়, তবে সমাজের ক্ষতি বা অনিষ্টের সীমা থাকে না, এবং অপর পক্ষে তাহাদের ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিমাণানুসারে যদি তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াও তাহাদের সকলের জন্য সমান পদ ও মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট করা হয়, তবে অবিচারের সীমা থাকে না। অতএব ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম এবং পদ ও মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট করাই প্রকৃত সাম্যপ্রতিষ্ঠা, এবং তদ্বিপরীত কার্য্যই ঘোর অবিচার এবং অনিষ্ট সাধন। ক্ষুধায় একটি অষ্টবিংশতি বর্ষীয় যুবককে যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী দিবে, একটি অষ্টমবর্ষীয় শিশুকেও যদি সেই পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী দেও, তবে কেবল অবিচার এবং অপচয় করা হয় মাত্র, উভয়কে সমান ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু অষ্টবিংশতি বর্ষীয় যুবক যে পরিমাণ অন্ন ভোজন করিতে পারে তাহাকে যদি সেই পরিমাণ অন্ন দেও, তদপেক্ষা কম বা বেশী না দেও, এবং অষ্টমবর্ষীয় শিশু যে পরিমাণ অন্ন ভোজন করিতে পারে তাহাকে যদি সেই পরিমাণ অন্ন দেও, তদপেক্ষা

কম বা বেশী না দেও, তবেই তাহাদের দুই জনের প্রতি সমান ব্যবহার করা হয়। ন্যায় ছাড়া সাম্য নাই। সাম্যকে যদি ন্যায় ছাড়া করিতে চাও—ইউরোপীয় সোসিয়ালিষ্ট (Socialists) এবং কমুনিষ্ট (Communists) দিগের ন্যায় যদি সাম্যকে ন্যায়ছাড়া করিতে চাও,—তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সমাজ কাহাকে বলে তাহা তুমি ভাল জান না, এবং তুমি সমাজের মিত্র নও, শত্রু। ন্যায় ছাড়িলে সমাজ টিকে না বলিয়া, যে ইউরোপ তোমার মতে সাম্যের একমাত্র প্রতিষ্ঠা-স্থান, সেই ইউরোপে কর্ম্মানুসারে লোক মধ্যে পদের এবং মর্য্যাদা ইত্যাদির এতই প্রভেদ। ভারতের বর্ণভেদ প্রণালীতেও তাহাই ঘটিয়াছে। সমাজ রক্ষার্থ বিবিধ কর্ম্মের প্রায়োজন। শক্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণানুসারে হিন্দুগণ বিবিধ অর্থাৎ ছোট বড় কর্ম্মে নিযুক্ত, এবং ছোট বড় কর্ম্মে নিযুক্ত বলিয়া ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পদ ও মর্য্যাদা বেশী, বৈশ্যের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পদ ও মর্য্যাদা বেশী, শূদ্রের অপেক্ষা বৈশ্যের পদ ও মর্য্যাদা বেশী। শক্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণ বিভিন্ন, পদ ছোট বড়, এবং মর্য্যাদা ইত্যাদি কম বেশী হইলে আরো অনেক বিষয়ে লোকমধ্যে বিভিন্নতা জন্মিয়া থাকে। একই অপরাধে একজন সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং উৎকৃষ্ট ব্যবসায়াসক্ত ব্যক্তিকে যতটুকু এবং যে প্রকারের দণ্ড দেওয়া আবশ্যক, একজন অশিক্ষিত মর্য্যাদাহীন নিকৃষ্ট ব্যবসায়াসক্ত ব্যক্তিকে তদপেক্ষা অনেক বেশী এবং তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হয়। ইউরোপে এই প্রণালীতে দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। যে একজন ডিউক বা আর্লের অপবাদ ঘোষণা করে, তাহার যে পরিমাণে জেল বা জরিমানা হয়, যে একজন মুদির অপবাদ ঘোষণা করে, তাহার তদপেক্ষা অনেক কম জেল ও জরিমানা হয়। একজন শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তি চুরি করিলে তাহার যদি ছয় মাস কারাবাস হয়, একজন মূর্খ নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক চুরি করিলে তাহার ছয় বৎসর কারাবাস বা নির্ব্বাসন হয়। একজন ডিউক একটা মুটেকে একটা ঘুষা মারিলে হয় ত 'আর এরূপ করিবে না' কেবল এই রকম উপদেশ পাইয়াই অব্যাহতি পায়; কিন্তু একটা মুটে একজন ডিউকের গায় শুধু হাত দেওয়া অপরাধে হয় ত ছয় মাসের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করে। এরূপ বিভিন্ন ব্যবহার যে অন্যায় তা নয়। লোকের শিক্ষা, শক্তি এবং পদমর্য্যাদার বিভিন্নতা অনুসারে তাহাদের মান, অপমান, লজ্জা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান

এবং অভিমান (sensibility) কমবেশী হইয়া থাকে, এবং সেই জন্য দণ্ডনীয় কার্য্য করিলে তাহাদিগের মনে চৈতন্য এবং অনুতাপ উৎপাদনার্থ তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এবং পরিমাণে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে দণ্ড দিলে লোকমধ্যে প্রকৃত সাম্য সংস্থাপিত হয়, নচেৎ ঘোর অবিচার এবং বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়। মনু প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রকারগণও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ভেদে এইরূপ দণ্ডের বিভিন্নতা ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে ব্যবস্থার মূলে শাস্ত্রকারগণের নিজের বর্ণাভিমান একেবারেই যে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। সংসারে থাকিয়া একেবারেই আত্মাভিমান পরিত্যাগ করা, কি এ দেশে কি ইউরোপে, কোথাও মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। আবার আদিমকালের ক্রোধাদি প্রবৃত্তির স্বাভাবিক তীব্রতা এবং প্রবলতা বশত, এখনকার তুলনায় তখনকার ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক সংস্কারের গাঢ়তা এবং বহুলতা বশত, বিজিতের প্রতি বিজেতার স্বাভাবিক ঘৃণা এবং আক্রোশ বশত এবং অপরাপর কারণে সে ব্যবস্থার অনেক স্থল হয় ত আমাদিগকে অন্যায় এবং অতিশয় কঠোর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সে ব্যবস্থার সমস্ত অংশ ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে লোকের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণের বিভিন্নতা বশত তাহাদের পদ মর্য্যাদা ইত্যাদির যে প্রভেদ হইয়া থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে প্রকৃত সাম্য সংস্থাপনার্থ দণ্ড সম্বন্ধে যে বিভিন্নতা হওয়া উচিত, সেই বিভিন্নতা বিধিবদ্ধ করাই সেই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। আধুনিক ইউরোপীয় জাতিদিগের দণ্ডবিধি আইনে শ্রেণী বা সম্প্রদায় উল্লেখে দণ্ড ব্যবস্থিত হয় না বলিয়া লোকের এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে যে, ইউরোপে লোকের শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা অনুসারে দণ্ডের বিভিন্নতা নাই অর্থাৎ দণ্ডবিধি সম্বন্ধে সকল লোকই সমান। কিন্তু সকলেই জানেন যে বিচারকালে সকল লোক সমান থাকে না, প্রভূত পরিমাণে ছোট বড় উত্তম অধম হইয়া যায়। তাই ইউরোপীয়দিগের বিচারালয়ের রিপোর্ট গ্রন্থ পড়িবার সময় মনে হয় যে সে সব গ্রন্থ মনু বা যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা হইতে বড় একটা বিভিন্ন নয়। কিন্তু সে সব গ্রন্থ ইউরোপীয় দণ্ডবিধি আইনের অংশ স্বরূপ। সে গ্রন্থ ছাড়িলে ইউরোপীয় দণ্ডবিধি আইন সম্পূর্ণ হয় না। অতএব এইরূপ বুঝা উচিত যে ইউরোপীয় দণ্ডবিধি আইন মনুর দণ্ডবিধি আইন হইতে বড় একটা বিভিন্ন নয়। ইউরোপীয়েরা একটা জিনিসকে আর একটা

জিনিসের সঙ্গে গাথিয়া না রাখিয়া একটু তফাতে রাখে বলিয়া ইউরোপে সে জিনিসটা নাই এরূপ মনে করা বড়ই ভুল। আবার ইউরোপীয়দিগের আদালত ছাড়িয়া তাহাদের জেলখানায় প্রবেশ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর অপরাধী-দিগকে যে ভীষণ ও নিষ্ঠুর প্রণালীতে শাস্তি দেওয়া হয় তাহা না দেখিলে, ইউরোপীয়দিগের দণ্ডবিধি আইন পূর্ণমাত্রায় বুঝা হয় না। কিন্তু সে সকল শাস্তি দেখিলে ইউরোপীয়দিগকে সাম্যপ্রিয় এবং সভ্য বলিয়া প্রশংসা করিয়া বৃদ্ধ মনুকে বৈষম্যপ্রিয় এবং অসভ্য বলিয়া নিন্দা করিবার কিছুমাত্র কারণ থাকে না। ইউরোপীয়দিগের জেলের কাণ্ড কারখানা গুলা তাহা-দের দণ্ডবিধি আইনে লেখা থাকে না বলিয়া সে গুলা নাই, অথবা সেগুলা তাহাদের দণ্ডবিধি আইনের অন্তর্গত নয়, এরূপ মনে করা বিষম ভ্রম।

মনুষ্যের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণের বিভিন্নতা বশত লোকমধ্যে পদ মর্য্যাদা ইত্যাদি লইয়া যেমন ইতর বিশেষ করা হয়, সেইরূপ পদমর্য্যাদা ইত্যাদির বিভিন্নতা বশত আহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে লোক মধ্যে অনেক ইতর বিশেষ করা হইয়া থাকে। ইউরোপেও উচ্চশ্রেণীর লোক নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত একত্র আহার করে না, এবং বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ হয় না। এমন কি, আহারের স্থলে যদি কোন নিম্ন শ্রেণীর লোক কোন উচ্চ শ্রেণীর লোকের খাদ্য সামগ্রী স্পর্শ করে, তবে অনেক সময়ে সেই উচ্চ শ্রেণীর লোক সে খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করে না। এরূপ আচরণ ভাল কি না এস্থানে তাহার মীমাংসা করা যাইতে পারে না। কিন্তু ভালই হউক আর মন্দই হউক, ইহা যে কেবল আমাদের দেশের বর্ণভেদ প্রথা হইতে উদ্ভূত হয় এরকম মনে করা অন্যায়।

এইরূপ দেখিবে যে সকল আচার ব্যবহারাদি এদেশে বর্ণভেদ প্রথার সহিত সংযুক্ত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় সে সমস্তই ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু এদেশের বর্ণভেদ প্রথার দুইটি লক্ষণ আছে, তাহা ইউরোপীয় সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম লক্ষণটি এই যে, বর্ণভেদ অনুসারে পদমর্য্যাদা ব্যবসায় বৃত্তি ইত্যাদির যে বিভিন্নতা হইয়া থাকে, তাহা এদেশে কৌলিক (hereditary); ইউরোপে কৌলিক নয়। এদেশে যে ক্ষত্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল, সে চিরকালই ক্ষত্রিয় রহিল, কখন এবং কোন প্রকারে ব্রাহ্মণ হইতে পারিল না। যে সূত্রধর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিল, সে চিরকালই সূত্রধর রহিল, কখনই স্বর্ণকার বা বণিক বা শাস্ত্রব্যবসায়ী

হইতে পারিল না। ইউরোপে এরূপ হয় না। ইউরোপে মুচির সন্তান পুরোহিত হইতেছে, এবং পুরোহিতের সন্তান মুচি হইতেছে। এই প্রভেদ দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এবং দেশীয় ইংরাজি-শিক্ষা-সম্পন্ন লোকে বলিয়া থাকেন যে ইউরোপীয় সমাজ প্রণালীতে ন্যায় ও সাম্য আছে, এদেশের সমাজ প্রণালীতে ন্যায় ও সাম্য নাই। তাঁহারা বলেন যে একজন পুরোহিতের সন্তানের পৌরহিত্ব করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, তাহাকে যদি পুরোহিত হইতে দেওয়া হয়, আর পৌরহিত্ব করিবার ক্ষমতা থাকিলেও যদি একজন মুচির সন্তানকে পুরোহিত হইতে না দেওয়া হয়, তবে আর সকল লোককে সমান ব্যবহার এবং সকলের প্রতি ন্যায়াচরণ করা হয় কই? হিন্দু সমাজে মুচির ছেলেকে পুরোহিত হইবার অধিকার দেওয়া হয় না বলিয়া তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে সে সমাজের বর্ণভেদ প্রথায় ন্যায় এবং সাম্য কিছুই নাই। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারের পক্ষ হইতে বিচার করিতে গেলে অবশ্যই বলিতে হয়, যে একথা ভ্রান্তিমূলক। তুমি আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি আর নাই পারি, কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের মতে বর্ণভেদ অনুসারে ব্যবসায় বৃত্তি সম্বন্ধে যে প্রকার নিয়ম আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ন্যায় ও সাম্যমূলক। প্রথম কথা এই যে সমাজের আদিম অবস্থায় যখন প্রথম ব্যবসায় ভেদ হয় তখন এখনকার মতন লোকের বহুল পরিমাণ এবং বিবিধ প্রকার জ্ঞান ও বিদ্যা থাকে না, এবং সেই জন্য তখন এক ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করা সহজও নয় এবং সচরাচর লোকের সেরূপ আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহাও হয় না। পৈত্রিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে এরূপ নিয়ম না থাকিলেও আধুনিক ইউরোপের প্রারম্ভ কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে তথায় সকল শ্রেণীর লোকেই পুরুষানুক্রমে আপন আপন পৈত্রিক ব্যবসায় বৃত্তিতে নিযুক্ত হইত। এখনও যে ইউরোপে সে প্রথার বিশেষ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তা নয়। পুরুষানুক্রমে কোন একটি কার্য্য করিলে তাহাতে উত্তরোত্তর দক্ষতা এবং ক্রমে ক্রমে তৎপ্রতি অধিকতর আসক্তি জন্মিয়া থাকে। অতএব পুরুষানুক্রমে পৈত্রিক ব্যবসা অবলম্বন করা শুধু যে সমাজের পার্থিব (material) উন্নতির অনুকূল তা নয়, লোকের পক্ষে সহজ, প্রীতিকর এবং অনেক স্থলেই অনিবার্য্যও বটে। তাই ইউরোপে আগেও যেমন এখনও তেমনি, অধিকাংশ লোকে পুরুষানুক্রমে পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করে।

তবে কতকগুলি লোক সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করে বলিয়া সেই নিয়ম ভঙ্গ-কার্য্যটি অধিক পরিমাণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং তাই আমাদের মনে হয় যে নূতন নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করাই বুঝি ইউরোপীয় সমাজের প্রধান নিয়ম। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। হউক আর নাই হউক, একথা কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, যে সমাজের আদিম অবস্থায় লোকে জ্ঞান ও বিদ্যার স্বল্পতা ও বৈচিত্র্যাভাব বশত সহজে পৈত্রিক ব্যবসায় ছাড়িয়া নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না, এবং সেই জন্য পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করিতেই হইবে, এরূপ কোন রাজাজ্ঞা বা অবশ্য পালনীয় বিধি তখন না থাকিলেও, লোকে পৈত্রিক ব্যবসায়ই অবলম্বনকরিয়া থাকে, এবং প্রত্যেক ব্যবসায় কাজেই কৌলিক (hereditary) হইয়া পড়ে। আবার সমাজের আদিম অবস্থায় যখন লোকের জ্ঞান বুদ্ধি এবং মানসিক শক্তি কম থাকে এবং প্রাকৃতিক শক্তির সহিত লোকের যুঝিবার ক্ষমতা এবং উপায়ও অল্প থাকে, তখন স্বভাবতই লোকের আত্মরক্ষার জন্য বেশী চেষ্টা হয়, এবং সেইজন্য সাবধানে এবং নিরাপদে পৈত্রিক ব্যবসায় পালন করার দিকে লোকের তখন যত ঝোঁক হয়, অসমসাহসিক হইয়া নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করার দিকে তত ঝোক হইতে পারে না। একারণেও সমাজের প্রথম অবস্থায় লোকে পুরুষানুক্রমে পৈত্রিক ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। তাই প্রায় সকল দেশেই সমাজের প্রথম অবস্থায় ব্যবসায় কৌলিক আকার ধারণ করে। এবং তাই আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে এদেশে শাস্ত্রকারেরা বর্ণ সকলের ব্যবসায় সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার আগেই ব্যবসায় সকল কৌলিক আকার ধারণ করিয়াছিল। ব্যবসায় কৌলিক আকার ধারণ করিলে পর শাস্ত্রকারেরা যখন তৎসম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা করিলেন তখন তাঁহারা সম্ভবত দুইটি কারণে ব্যবসায়কে কৌলিক এবং বর্ণ-ভেদ অনুসারে বিভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সমাজের প্রথমাবস্থায় লোককে পুরুষানুক্রমে পৈত্রিক ব্যবসায় পালন করিতে দেখিলে সমাজনেতাদিগের এরূপ মনে হইয়া থাকে যে মানুষ স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, সে প্রকৃতি অতিক্রম করিতে মানুষ অক্ষম, এবং সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানুষ আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো মানুষকে স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, ও লৌহ প্রকৃতিভিন্ন বলিয়া চারিটি স্বাভাবিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন, এবং তদনুসারে সেই প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য

নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। * হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতেও স্বভাবের স্বতন্ত্রতা বশতই বর্ণ এবং ব্যবসায় ভেদ। মানুষ স্বভাবত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য, আদিম কালে অথবা সমাজের প্রথম অবস্থায় সকল দেশেই এরূপ অনুমতি হওয়া যে নিতান্তই সম্ভবপর, তাহা বোধ হয় বুঝা গেল। অতএব এখন বলা যাইতে পারে, যে এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুশাস্ত্রকারগণও বর্ণ এবং ব্যবসায় ভেদকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বভাবের ফল বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে পর বর্ণ ও ব্যবসায় ভেদ প্রণালী অবলম্বন ও বিধিবদ্ধ করা বিষয়ে এদেশে আরো একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মায় সে যে আমরণ ব্রাহ্মণই থাকিবে, যে শূদ্রকুলে জন্মায় সে যে আমরণ শূদ্রই থাকিবে, এরূপ বিবেচনা ও ব্যবস্থা করিবার এদেশে আরো একটি কারণ ঘটিয়াছিল। এদেশের তত্ত্ববিদ্যানুসারে জীবের অবস্থা তাহার কর্ম্মের ফল মাত্র। এক জন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহার ফল-স্বরূপ পর জন্মে তাহার সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। জন্মান্তরবাদ মানিলে এ কথা ও যে মানিতে হয়, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বী-কার করিতে পারেন না। সকলেই দেখিয়াছেন যে ইহজীবনে যে চুরি করে, তাহার ভাগ্যে কারাবাস হয়, এবং যে সকলের সহিত ন্যায় ব্যবহার করে তাহার অবস্থা নিরঙ্কুশ হয়, অর্থাৎ, যে যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহার অবস্থা তদনুরূপ হইয়া থাকে। অতএব যদি জন্মান্তর থাকে তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে এক জন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করে পরজন্মে তাহার সেইরূপ অবস্থা হয়। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মফল এবং জন্মান্তর দুইই মানিতেন। তাই তাঁহারা বর্ণ ও ব্যবসা-ভেদ প্রণালী স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন যে গোড়ায় সকল মনুষ্যই এক—সেই এক ব্রহ্ম পদার্থ। কিন্তু তাঁহারা এইরূপ বুঝিয়াছিলেন যে কর্ম্মগুণে মনুষ্যের স্বভাব বিভিন্ন হইয়া পড়ে এবং স্বভাব বিভিন্ন হইলে মনুষ্যের অবস্থার বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য্য। পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে ;—

---

* *Grote's Plato* নামক গ্রন্থ দেখ। হিন্দুশাস্ত্রকারের মতেও সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণ শুভ্রবর্ণ, রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, রজ এবং তমো গুণ মিশ্রিত বৈশ্য হরিদ্রাবর্ণ এবং তমোগুণ প্রধান শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্‌॥

বাস্তবিক বর্ণভেদ বলিয়া কিছুই নাই, কেন না সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়; এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম্ম দ্বারা বর্ণভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

অর্থাৎ মানুষ গোড়ায় সব এক, কেবল কর্ম্মগুণে বিভিন্ন বর্ণান্তর্গত হইয়া থাকে, অর্থাৎ জন্মান্তরে বিভিন্ন অবস্থা ও কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। এক জন্মে কর্ম্মের গুণে যাহার যেরূপ স্বভাব হয়, পর জন্মে সে সেই স্বভাবোপযোগী অবস্থা এবং কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন :—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ। (১৮ অ—৪১)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির স্বস্ব স্বভাব সম্ভূত গুণে কর্ম্ম সকল চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

কর্ম্মগুণে স্বভাব, স্বভাবের উপযোগী পদ, অবস্থা এবং ব্যবস্থা—ইহাইত প্রকৃত ন্যায়, প্রকৃত বিচার, প্রকৃত সাম্য, প্রকৃত সামাজিক ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা ইউরোপীয় সাম্যবাদের পক্ষপাতী, তাঁহারা হয়ত এই খানে হিন্দুশাস্ত্রকারকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—তবে কি শূদ্র কখনই এবং কিছুতে বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না?—বৈশ্য কি কিছুতেই ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না? ইত্যাদি। হিন্দু শাস্ত্রকার বোধ হয় একথার উত্তরে এই বলিবেন, পারিবে—পারিবে, কিন্তু এজন্মে নয়।—পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এজন্মে যেমন বর্ণ বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছে, এ জন্মে তেমনি আপন বর্ণধর্ম্ম পালন করিয়া এবং ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া উন্নত স্বভাব লাভ করিলে পর জন্মে উচ্চতর অবস্থা অর্থাৎ উচ্চতর বর্ণ ও ব্যবসায় প্রাপ্ত হইবে। গৌতম বলিয়াছেন—'বর্ণাশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে'। (সংহিতা, ১১শ অধ্যায়) অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বর্ণের ও সর্ব্বপ্রকার আশ্রমের লোক সকল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মরণানন্তর স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্মফল অনুসারে বিশেষ বিশেষ দেশ জাতি কুল রূপ আয়ু শ্রুত বৃত্ত,বিত্ত সুখ ও মেধা লাভ করত জন্ম গ্রহণ করে। অতএব হিন্দু শাস্ত্রকারের মতে এজন্মে যে উত্তম কর্ম্ম করে

পর জন্মে সে উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্তি—উত্তম ধর্ম্মচর্য্যা এবং উন্নত আধ্যাত্মিকতার ফল। একথার অর্থ এই যে পার্থিব জীবনে বর্ণভেদ প্রণালীর কার্য্যকারিতা থাকিলেও সে প্রণালী প্রধানত আধ্যাত্মিক প্রণালী। অর্থাৎ সে প্রণালী মানুষের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সোপান। জীবজগতে ক্রমোন্নতি এবং ক্রম বিকাশের নিমিত্ত জীবশ্রেণী ও যা, হিন্দুশাস্ত্রকারের মতে আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতি এবং ক্রম বিকাশের নিমিত্ত বর্ণশ্রেণীও তাই। অতএব জীবজগতে ক্রমোন্নতির নিমিত্ত যে উচ্চ নীচ জীবশ্রেণী আছে, তাহাতে যদি অবিচার এবং বৈষম্য না থাকে, তবে হিন্দুর আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতির নিমিত্ত যে উচ্চ নীচ বর্ণশ্রেণী আছে, তাহাতেও অবিচার এবং বৈষম্য নাই। হিন্দুশাস্ত্রকারের এই কথা। অতএব হিন্দুশাস্ত্রকারের মতে বর্ণভেদ প্রণালীতেও পার্থিব অবস্থা ও মর্য্যাদা ইত্যাদির উন্নতি আছে। তবে ইউরোপে যে প্রণালীতে সে উন্নতি হয়, ভারতের তদ্বিষয়ক প্রণালী তাহা হইতে দুইটি বিষয়ে ভিন্ন। প্রথম বিভিন্নতা এই যে, ইউরোপে পার্থিব উন্নতি পার্থিব চেষ্টার ফল, ভারতে পার্থিব উন্নতি ধর্ম্মচর্য্যা বা আধ্যাত্মিকতার ফল। ইউরোপে বাহ্য সম্পদের জন্য চেষ্টা করিয়া যে যত কৃতকার্য্য হয় লোক মধ্যে তাহার তত সুখ সম্মান ও পদ বৃদ্ধি হয়। ভারতে যে যত ধর্ম্মচর্য্যা ও নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করে, সমাজে তাহার তত সুখ সম্মান ও পদ বৃদ্ধি হয়। ইউরোপে পার্থিব উন্নতির সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। ভারতের পার্থিব উন্নতি ধর্ম্মোন্নতির ফল মাত্র এবং ধর্ম্মোন্নতির একান্ত অনুযায়ী। দ্বিতীয় বিভিন্নতা এই যে, ইউরোপে পার্থিব উন্নতি ইহজন্মে হইয়া থাকে, ভারতে পার্থিব উন্নতি জন্মান্তরেও হয়। অর্থাৎ ইউরোপে ইহজীবন ইহজীবনেই শেষ হইয়া যায়, ভারতে ইহজীবন ইহজীবনে শেষ হয় না, বহু জীবনের সহিত সম্বন্ধ; ইউরোপে ইহজীবন ইহজীবন লইয়াই সম্পূর্ণ, ভারতে ইহজীবন অনন্ত জীবনের একটি অংশ মাত্র। ইউরোপে একটি জীবন লইয়াই একটি জীবন, ভারতে অসংখ্য জীবন লইয়া একটি জীবন। ইউরোপে ইহজীবন ছাড়া আর কাল নাই, ভারতে ইহ জীবন অনন্তকালের একটি অণুমাত্র। ইউরোপে অংশ—সমষ্টি হইতে পৃথক, ভারতে অংশ—সমষ্টির সহিত সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত। ইউরোপ অংশদর্শী, ভারত সমগ্রদর্শী। ভারতের অংশ ইউরোপের সম্পূর্ণতা, ইউরোপের সম্পূর্ণতা ভারতের অংশ। তাই ইউ-

রোপে ইহজীবন লইয়াই পার্থিব উন্নতি, ভারতে অনন্তজীবন লইয়া পার্থিব উন্নতি। হিন্দুশাস্ত্রের এই মর্ম্ম। এ বিষয়ে আমাদের নিজের কি মত তাহা ব্যক্ত করা যদি আবশ্যক বোধ হয় ত পরে করিব। এখানে কেবল হিন্দুশাস্ত্রকারের পক্ষ হইতে এই কথা বলিব, যে হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালীতে হিন্দুর সোহং-বাদ মূলক সমত্ববাদ এবং মৈত্রীবাদের কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ নাই, বরং সম্পূর্ণ অনুকূল প্রমাণই আছে।

স্পেন্সরের সাম্য।

ইউরোপীয় দার্শনিক স্পেন্সরের মত আজকাল সভ্যজগতে বিশেষ আদরণীয়। যে দর্শনে এতদিন কেবল ইন্দ্রিয়শক্তির আলোচনা, জড়জগতের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ, কিম্বা শারীরিক পরিবর্ত্তনের সহিত মানসিক গতির পরিচয় পাওয়া যাইত, স্পেন্সর তাহাতে এক নূতন জীবনী শক্তি অর্পিত করিয়াছেন। যাহা ভারতবর্ষীয় দর্শনের উচ্চতম শিক্ষা, ইউরোপীয় দর্শনে আজও তাহার আভাস পাওয়া যায় না। ভাতবর্ষীয় দর্শনে মনোবিজ্ঞানের যে উন্নতি দর্শিত হইয়াছে, সে উন্নতি অন্য কুত্রাপি হয় নাই। সভ্যতার নূতন অর্থের সহিত বিজ্ঞানের আলোচনা স্থানেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আধুনিক ইউরোপ সভ্য। আজ সেই জন্য ইউরোপীয় বিজ্ঞান আদৃত; এখন আর কাশীর কিম্বা জয়পুরের বিজ্ঞানালোচনার উৎকর্ষ স্বীকার করা যাইতে পারে না। যদিও কাশী ও জয়পুরের প্রসিদ্ধ মাণমন্দিরগুলির গঠন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎদিগের বিস্ময়ের বিষয়, তথাপি কাশী ও জয়পুরে সে সকল পণ্ডিত সেইরূপ মাণ-মন্দিরের প্রণালীতে বিস্ময়ের বিষয় না দেখিয়াও ঐসকলের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সক্ষম, তাঁহারা আজ গ্রীণউইচের বিজ্ঞানবিৎদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভারতবর্ষ যদি সভ্য বলিয়া সভ্যজগতে বিদিত হইত, তাহা হইলে আজ ঐ মাণ-মন্দির-গুলির স্বতন্ত্র আদর হইত, ঐ সকল পণ্ডিতেরাও উপযুক্ত আদর ও সম্মান পাইতেন। যে সকল মনস্তত্ত্ববিৎ ঋষিগণ হিমালয়শিখরে বিরাজিত হইয়া আজিও প্রাচীন ভারতের মনোবিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করিতেছেন,

তাঁহার সভ্য জগতে দার্শনিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। যে দর্শনে মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, আজ সে দর্শনের দাঁড়াইবার স্থান নাই। যদি এরূপ বলা যায় যে, মনুষ্য আত্মা মনুষ্য শরীর হইতে স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকিতে পাবে, যদি বলা যায় যে মনুষ্য আত্মা দৈহিক উৎকর্ষ না থাকিলেও সহজ জ্ঞানাতীত উৎকৃষ্টতা লাভ করিতে পারে, যদি বলা যায় যে মনুষ্য আত্মা নিশ্চল নিস্পন্দদেহে অবস্থিত হইয়া যাহা সবল ও পুষ্ট, মানবের চিন্তাতীত, এমন বিষয়েব সমালোচন করিতে সক্ষম, কিম্বা যদি বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ মানব মনের গোচর হইতে পারে, তাহা হইলে সভ্য জগৎ তাহার সত্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। দৈহিক জড় হইতে মানসিক বল স্বতন্ত্র, একথা ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি। ইউরোপীয় দর্শনে এ অবস্থা আজও নূতন। কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ ও জৈমিনি যে উচ্চ আসন অধিকার কবিয়া ছিলেন, আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার খাতিরে লক, কাণ্ট, হবস্, ফিক্তে, মিল ও কোম্‌ত তাঁহাদের আসন অযথারূপে অধিকার করিয়াছেন। যে অবস্থান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই, তাহার অধিকার কয় দিন? যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের প্রথম সোপানে উঠিতে পাবেন নাই, তাঁহারা কেমন করিয়া সর্ব্বোচ্চ সোপানের উপরে বসিয়া থাকিবার যোগ্য হইবেন? উন্নতির গতি অনিরুদ্ধ। আজ পাশ্চাত্য দর্শনের যে উন্নতি হয় নাই, ভবিষ্যতে যে তাহা হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? লক্ ও কাণ্ট যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা যে আর কখন হইবে না, একথা সম্ভব নয়। ইউরোপীয় দর্শনে স্পেন্সর তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন। স্পেন্সর চিন্তার গতিতে দেখিয়াছেন যেন, তাঁহার আত্মা তাঁহার শরীর হইতে বিভিন্ন হইয়া সেই শরীরকে পিঞ্জরের ন্যায় বোধ করিতেছে। এইরূপে স্পেন্সরের চিন্তা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক গণের চিন্তা হইতে উচ্চ; এইরূপে সভ্য-জগতে তাঁহার মানও অন্যান্য দার্শনিক অপেক্ষা অধিক। একথা স্পষ্টরূপে বুঝাইতে যাহা বলা আবশ্যক, এথানে তত বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এই মাত্র বুঝা যাইবে যে, স্পেন্সরের মত আজকাল অন্যান্য সকলের মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্পেন্সর "সাম্য" কাহাকে বলেন? তাঁহার মতে মনুষ্যজীবনের পূর্ণাবস্থা জনিত একীভাব "সাম্য"। তিনি বলেন প্রত্যেক মনুষ্যেরই সমান উৎকর্ষ হওয়া

সম্ভব। সেই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিলে প্রত্যেক মনুষ্যের মত বা অবস্থা একপথে প্রস্থিত হইয়া একাবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং মতানৈক্য বা অবস্থানৈক্য প্রযুক্ত কোন অসংলগ্ন ভাব উপস্থিত হইবে না। মনুষ্যের একত্র বাস স্বভাবসিদ্ধ। এইরূপে একত্র বাস করিতে গেলে,পরস্পরের অধিকার বা সম্বন্ধ হইতে নানা প্রকার অবস্থা উপস্থিত হয়। স্পেন্সর বা ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মতে সুখাভিলাষ মনুষ্যের একমাত্র অভীপ্সিত বিষয়। সেই সুখাভিলাষের চরমসীমা লাভ করিতে যে সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলা আবশ্যক, যদি প্রত্যেক মনুষ্য সেই সকল নিয়মানুসারে চলিতে পারে,তাহা হইলে“সাম্য”লাভ করা যায়। মনুষ্যের ক্রমোন্নতি সেই “সাম্যের” দিকে অগ্রসর হইতেছে। আদিম মনুষ্যগণ যে অবস্থা সুখকরী বিবেচনা করিয়াছিল, মনুষ্যের নূতন নূতন পর্য্যায় অনুসারে সেই অবস্থা একভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন, একজন বন্য মানব আপনার শয়নের জন্য একটি পর্ণকুটির ও একখানি মৃগচর্ম্ম যথেষ্ট বিবেচনা করে, এবং তাহার পুত্র সেই দুইটি উপকরণের সহিত সুখোপযোগী আরও কতকগুলি উপকরণের সঞ্চয় করিবার জন্য স্বত প্রবৃত্ত হয়। যেমন, প্রত্যেক মনুষ্য পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে নৈতিক বা মানসিক বলের উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। বালকের মন তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মনের অনুরূপমাত্র; এইরূপে আদি মনুষ্য যে অবস্থায় পৃথিবীতে আসিয়াছিল, পর্য্যায়ক্রমে তদ্বংশজাত মনুষ্যের নৈতিক, মানসিক প্রভৃতি অবস্থার তদপেক্ষা অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে যে সকল বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল কেবল মনুষ্য জীবনের পূর্ণাবস্থা জনিত একীভাবের বিপর্য্যয়মাত্র। মনুষ্য যতই উন্নতি লাভ করে, ততই এই বৈষম্য নষ্ট হয়। যতদিন না এই বৈষম্য একবারে নষ্ট হইয়া যায়, ততদিনই মনুষ্য উন্নতি মুখে ধাবমান হইবে। যখন এই বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে, তখনই মনুষ্যের “সাম্য” অবস্থা আসিবে। সাম্য অবস্থায় এক ব্যক্তি অপরের অধিকারে প্রবিষ্ট হইবে না, একজন অপরের সুখে বাধা দিবে না, সকলেই যে অবস্থায় অন্যের অবস্থায় বাধা না পড়ে, সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে। তখন সমাজে যে নিয়ম সকলে স্বতই অনুধাবন করিবে, এমন নিয়মই প্রচলিত থাকিবে। মানব জীবনের স্বাধীনতাই এইরূপ “সাম্য” লাভের ফল। এই স্বাধীনতায় অন্যের স্বাধীনতা নষ্টকারক কোন প্রকার অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনরূপ বাধা থাকিবে না। এই অবস্থা

হইতে মনুষ্য জীবনে সুখের চরম সীমা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এখন মানব জীবনে যে সকল কষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল "সাম্যের" অভাব হেতু। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধীয় যুদ্ধবৃত্তি ও বিপ্লববৃত্তি আজিও আমাদের অবস্থার অন্যতর ভাব। সভ্যতার উন্নতির সহিত ঐ সকল প্রবৃত্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া অবশেষে লোপ পাইবে।

এখন স্পেন্সরের "সাম্য" কি তাহা বুঝান গিয়াছে। কিন্তু স্পেন্সর তাঁহার "সাম্য" প্রতিপন্ন করিবার জন্য আরও যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক। তিনি "সাম্য" প্রমাণ করিতে নিম্নলিখিত স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে একভাবের পৌনঃপুনঃ ঘটনা বা আসঙ্গজনিত অভ্যাস "সাম্যের" প্রথম সোপান। শীত গ্রীষ্মভেদে উদ্ভিদ ও গৃহ পালিত পশুদিগের পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইতে দেখা যায়, স্বভাবে সকলই এই "সাম্য" লাভের জন্য প্রস্থিত। রুষিয়ার উত্তর দেশে গ্রীষ্মের প্রভাব অতি সামান্য ও গ্রীষ্মকাল অল্পদিন স্থায়ী বলিয়া তত্রত্য উদ্ভিদ জাতির অতি অল্পদিনের মধ্যে ফুল ও ফল উদ্ভূত হইয়া বীজরূপে পরিণত হয়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশীয় জন্তুগণ শীত প্রধান দেশে নীত হইলে তদ্দেশীয় জন্তুগণের ন্যায় স্বভাবত প্রচুর লোমাবৃত হইয়া থাকে। যে সকল শিকারী কুকুর স্পেনদেশে সকল জন্তু অপেক্ষা দ্রুতগামী তাহাদিগকে আণ্ডিস্ পর্ব্বতে সামান্য আয়াসে ক্লান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু আবার কিছুদিন ঐ প্রদেশে থাকিলেই তাহারা প্রয়োজন মত দ্রুতগমন শক্তি প্রাপ্ত হয়। গোমেষাদি জন্তুগণ বন্য অবস্থায় অতি অল্পদিন মাত্র দুগ্ধ দিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগকে গৃহে পালন করিলে ও প্রত্যহ দুগ্ধ দোহনের চেষ্টা করিলে তাহারা ক্রমেই অধিকদিন দুগ্ধ দিতে অভ্যস্ত হয়। মনুষ্যও স্থান বিশেষে ও অবস্থা ভেদে এইরূপ শীততাপাদি জনিত "সাম্য" প্রাপ্ত হয়। আফ্রিকার প্রচণ্ডতাপে তথাকার অধিবাসীগণ শস্যাহারে শরীরের তাপরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। আবার আইস্লণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধান দেশবাসীগণ শারীরিক তাপরক্ষার জন্য মাংস ও চর্ব্বি আহার করিতে বাধ্য হয়। যাহারা পার্ব্বতীয় দেশে বাস করে তাহারা অধিক পরিশ্রম সহে; কিন্তু যাহাদের সমভূমিতে বাস তাহারা অল্পায়াসেই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। মনুষ্য যে ইন্দ্রিয় যে পরিমাণে ব্যবহার করে, তাহার সেই ইন্দ্রিয়

তদ্রূপ কার্য্যক্ষম হয়। এবং যাহার যে অবস্থায় যেরূপ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয়তা যত বেশি, সেই অবস্থা প্রাপ্ত লোকের সেই সকল ইন্দ্রিয় তেমন প্রবল দেখা গিয়াছে। ব্যাঘ্রের নখে, অশ্বের খুরে, কুকুরের ঘ্রাণে যে পরিমাণে তীক্ষ্ণতা দেখা যায়, তাহাদের অন্যান্য অঙ্গে সেরূপ নাই। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন যে মনুষ্য জীবনের গতির সঙ্গে সঙ্গে এমন একরূপ অন্তর্নিহিত অবস্থা আছে, যাহাতে মনুষ্য স্থান, কাল ও অবস্থা ভেদে তদুপযুক্ত "সাম্য" প্রাপ্ত হয়? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মনুষ্যের কষ্ট কেবল "সাম্যের' অভাব হেতু। কিন্তু এই অভাবের কারণ কি? স্পেন্সারের মতে মানবজাতির পূর্ব্বতন বন্য অবস্থা ও তজ্জনিত কুপ্রবৃত্তির অভ্যাসই এই অবস্থার কারণ। একজাতির সহিত আর এক জাতির বিবাদ, এক শ্রেণীর লোকের সহিত আর এক শ্রেণীর অসম্মিলন, একজন মনুষ্যের আর একজনের উপর প্রভুত্ব ইত্যাদি উক্ত প্রাচীন প্রবৃত্তি সমূহের ফল মাত্র। জড়জগতের ও জীবজগতের অন্তর্নিহিত "সাম্য" শক্তি ব্যতীত অন্য কিছুতেই এইরূপ বৈষম্য দূর করিতে সক্ষম নয়। মনুষ্যের আধুনিক অবস্থা যে ভাবে অবস্থিত, তাহা প্রকৃত "সাম্য" হইতে বিভিন্ন। কিন্তু ক্রমেই সেই "সাম্যের" দিকে অগ্রসর হইতেছে। যখন জীবজগৎ জড়জগতের ন্যায় একপথে, এক শক্তিতে, একরূপে চালিত হইবে, তখনই প্রকৃত "সাম্য" আসিবে।

হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সার অপরিবর্ত্তনীয় সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি আছে, এবং তাহাতে দেশ কালগত সাময়িক বিচিত্রতাও আছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সকল মূলতঃ এক সাধারণ কাণ্ডে দণ্ডায়মান হইয়াও পরস্পরের সহিত বিবাদ করে। এমন কি এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের পূজিত দেবতার নাম পর্য্যন্ত করিতে চাহে না। কেবল হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এইরূপ সম্প্রদায়িকতার প্রাধান্য লক্ষিত হয় এমন নহে, অল্পাধিক পরিমাণে পৃথিবীর প্রত্যেকে ধর্ম্ম সমাজের ভিতর ইহা

দেখিতে পাওয়া যায়। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যখন এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ এবং উপবিভাগ, তখন হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান বৌদ্ধ ও যবনের মধ্যে যে গভীর প্রভেদ অবস্থিতি করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র বিভাগ উপবিভাগের মধ্যে এবং তাহা হইতে পরিশেষে প্রত্যেক মানবাত্মার ব্যক্তিগত বিচিত্রতার ভিতরে যতই অবতরণ করা যায়, ততই দেখা যায়, সকলে মিলিয়া এক হওয়ার ইচ্ছা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি আবার প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে থাকিবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। এইজন্য পৃথিবীর ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের সাম্প্রদায়িকতার স্রোত কোন কালে অবরুদ্ধ হয় নাই; কত দিনে যে হইবে তাহাও ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব জগতের আদিমাবস্থাতেই নয়ন-গোচর হইয়াছে। যদিও বহুদিন হইল মানবজাতি সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু আদিমাবস্থার সে ভাব এখনো তাহার যায় নাই। আরো উন্নতি, আরো সভ্যতার বিকাশ প্রয়োজন।

ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য যেমন ব্যাকরণ অভিধানের শাসন বিধি সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ধর্ম্ম মতের স্থায়িত্বের জন্য তেমনি ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা উভয়ের স্বাধীন উন্নতির দ্বার একাল পর্য্যন্ত কেহ বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। আভিধানিক সংস্কৃত ভাষার বন্ধন সীমা অতিক্রম করিয়া প্রাকৃত ভাষা বিচিত্র আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে, কোন বাধা মানে না; যেন ভিতর হইতে এক অনন্ত উন্নতিশীল শক্তি তাহাদিগকে ঠেলিয়া তুলিতেছে। ভাষা সম্বন্ধে যেমন, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। বেদ কোরাণ বাইবেল ধম্মপদ, মনুসংহিতার নির্দ্দিষ্ট বিধিকে অতিক্রম করিয়া অপরাজিত ধর্ম্মশক্তি বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম ব্যবস্থা এখনও রচনা করিতেছে। যত প্রকারের লোক তত প্রকারের ধর্ম্ম। ইহা ভগবানের এক লীলা খেলা, সুতরাং বিচিত্রিতা স্বভাবের অপ্রতিবিধেয় কার্য্য। কিন্তু, এই বিচিত্রতার মধ্যে প্রত্যেক ধর্ম্মের ভিতরে একটি সাধারণ ভূমি আছে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সে ভূমি অতি প্রশস্ত আকারে অবস্থিতি করিতেছে। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে হিন্দু সন্তানেরা আপনার করিয়া লইতে পারেন।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্ম যে প্রকার উদার এবং বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া অনেকে বলেন, কোনটি হিন্দুধর্ম্ম তাহা বুঝা কঠিন।

একথা প্রত্যেক সম্প্রদায়স্থধর্ম্মের প্রতি সংলগ্ন হইতে পারে। এমন কি অল্প কালের ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যেও এই গণ্ডগোল ঘটিয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যজীবন যখন উন্নতির দিকে ক্রমাগত ধাবিত হইতেছে, তখন ইহা অবশ্যম্ভাবী। এক হিন্দুধর্ম্মের নামে আমরা এখন কত বিচিত্র ধর্ম্মমত ও ভাবই না দেখিতেছি। নামটি যখন সাধারণ—সম্পত্তি তখন কে কাহাকে ইহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে? সুসভ্য কৃতবিদ্য বঙ্গসন্তানগণ যদি এক্ষণে পানাহার সম্বন্ধে সেচ্ছাচারী এবং কর্ম্মকাণ্ড বর্জ্জিত হইয়াও যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসঙ্গত কোন নূতন ভাববিশিষ্ট ধর্ম্মমতকে হিন্দুধর্ম্ম বলেন, তাহা লইয়া তোমার আমার বিবাদ করিবার কি প্রয়োজন আছে? পুরাতন শব্দের মধ্যে এক নূতন মত এবং ভাবার্থ আছে, ইহা বুঝিয়া নীরব থাকাই শ্রেয়। নূতন নূতন নাম এত কোথা পাওয়া যাইবে? এই সকল নূতন যুক্তি ব্যাখ্যান যদি হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্ব-ভৌমিক সারসত্যের বিরোধী হয়, তবে তাহার হিন্দু নাম থাকিলেও কোন কার্য্যের হইবে না। দেশ কাল-গত সাময়িক বিচিত্র ভাবের এবং কার্য্যের পরিবর্ত্তন হইবেই, কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারিবেন না। অতএব এ সকল হউক; অসার অনিত্য অস্থায়ী ভাব হইতে অবশেষে সার নিত্য স্থায়ী সত্যের সার্ব্বভৌমিক ক্ষেত্রে আসিয়া সকলকে মিলিতে হইবে। ইহা মনুষ্যের অদৃষ্টে বিধাতা স্বহস্তে লিখিয়াছেন। ঐ প্রশস্ত স্থির ভূমিতে কেবল শাক্ত বৈষ্ণব একত্রিত হইবেন তাহা নহে, এখানে বৌদ্ধ খৃষ্টীয়ান যবন সকলেরই পরিণাম প্রাপ্ত হইবে। বর্ত্তমান কালে যে সকল জ্ঞানী উদারচরিত্র হিন্দু হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং সেই অনুসারে নানা স্থানে আর্য্য সভা হরি সভা করিয়া তাঁহারা বক্তৃতা, পাঠ এবং হরি সংকীর্ত্তনাদি করিতেছেন, তাঁহাদের মত ও কার্য্য সকল ক্রমশ ঐ উচ্চ পুণ্য ভূমির দিকেই ধাবিত হইতেছে। কেহ জ্ঞাতসারে সে দিকে যাউন, আর না যাউন বিধাতা সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। ধর্ম্মতত্ত্বদর্শী ভগবদ্ভক্ত যোগনেত্রে বিধাতার এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিয়া হাসিতেছে, আর বলিতেছে "এই স্বর্গধাম নিকটবর্ত্তী হইল।"

হিন্দুধর্ম্মের এই সার্ব্বভৌমিক পুণ্যক্ষেত্রে প্রত্যেক হিন্দু সম্প্রদায়স্থ ভক্ত বিশ্বাসিগণ একত্রিত হইবেন, ইহা যদি নিশ্চয় হয়, তবে ভারতের বহির্ভাগের ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলও তাহাতে আসিয়া মিলিবে। হিন্দু ধর্ম্মের এই

উদার ভূমিতে যোগ বৈরাগ্য প্রেমভক্তি বিজ্ঞান দর্শন গৌরবান্বিত হইবে, এখানে দেশীয় সদাচার, জাতিগত বিশেষ সুরুচি সুনিয়ম সাধু ব্যবহার নিরাপদে স্থিতি করিবে। এখানে কি বিভিন্ন দেশের সাধু যোগীজ্ঞান ভক্ত বৈরাগী প্রেমিক মহাজনগণের স্থান সমাবেশ হইবে না? ভক্ত হিন্দু কি বিদেশীয় সাধু অতিথিকে আদর করিবেন না? তাহা না করিলে, তাঁহার জ্ঞান বিজ্ঞানের মায়া থাকিবে কিরূপে? তিনি তাঁহাদের হস্তে আপনার কন্যাসম্প্রদান না করিতে পারেন, কিন্তু ভক্ত বংশাবতংস বিদেশী সাধুর চরণতলে বসিয়া যে তিনি ভগবৎতত্ত্ব বিশ্বাস বৈরাগ্য শিক্ষা করিবেন, ইহা তাঁহার ধর্ম্মপ্রকৃতি আমাদিগকে নিঃশব্দে বলিতেছে। এই উদার ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া যখন তিনি ক্রমাগত ইহাকে উদার করিয়া আনিতেছেন, তখন সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, যাবতীয় সাধু মহাজনদিগকে আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে স্থান না দিলে তাঁহার মান থাকে কৈ? বিশেষত শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র যখন বলিয়া গিয়াছেন।

"সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

তখন সুশিক্ষিত হিন্দু, সারগ্রাহী যোগী হিন্দু ইহা না করিবেন, তাঁহার পরিত্রাণ কোথায়? ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য্য অধিকার করিয়া সমস্ত বিশ্বকে তন্ময় দেখাই হিন্দুধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। এই উদার মতটি পরিত্যাগ করিলে ইহার গৌরব থাকে না। কিন্তু দেখ! ইহা কেমন সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

ত্রিগুণ ও সৃষ্টি।

১৫। সাঙ্খ্যমতে পুরুষ এক—কিন্তু ব্যাবৃত্তি জন্য বহুরূপ।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সাঙ্খ্যকার সৃষ্টি-রহস্য উদ্ভেদ করিতে গিয়া স্থির করিয়াছেন, যে সৃষ্টির প্রথমতত্ত্ব—পুরুষ। ইহা হইতেই প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার হয়। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে সাঙ্খ্যকার

একমাত্র আদি পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন, ইহাই বোধ হয়। এই পুরুষ সাঙ্খ্য-মতে অনাদি, অনন্ত, ব্যাপ্ত ও নির্গুণ। (ইংরাজিতে ইহাকেই unconditioned বা absolute বলে)। তবে সৃষ্টিকালে প্রকৃতির তমোগুণ হইতে আকাশাদি তন্মাত্রগুলি উৎপন্ন হইয়া যে দেশ (space) ও কাল (time) ধর্ম্মযুক্ত হইল, তাহারই সান্নিধ্যে (অথবা conditioned সৃষ্টজগতের সন্নিহিত, ও তাহার দ্বারা রঞ্জিত বোধ হয় বলিয়া) পুরুষকে বহুবোধ হয়। এই পুরুষ, প্রকৃতির সহিত মিলিত হওয়ায়, এবং জন্ম মৃত্যু আদি নানা কারণে, ও ব্যাবৃত্তিবশত বহুরূপ হইয়াছে। * সাঙ্খ্যকার আরও বলিয়াছেন যে, এই জন্মমৃত্যুজন্য, বহুরূপ পুরুষ (আমাদের জীবাত্মা) সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষে ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয়।

"সমাধি সুষুপ্তি মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা।" ৫।১১৬।

আদি পুরুষ যে এক, এ কথা ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝিয়াছিলেন; সেই জন্য তিনি বলিয়াছেন যে, সাঙ্খ্যশাস্ত্রের পুরুষ আর বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম একই। † আরও বিজ্ঞানভিক্ষু স্বীকার করেন যে,

---

* সাঙ্খ্য-প্রবচন পাঠে যতদূর জানা যায়, তাহাতে মহর্ষি কপিলমতে যে মূল পুরুষ এক, ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে বোধ হয়। শুধু তাহাই নহে; সাংখ্য-প্রবচনের বিভিন্ন স্থানে পুরুষ দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম; ইনিই আদি সৃষ্টি কালে প্রকৃতিতে ইঁহার শক্তি সঞ্চার করেন। আমরা ইঁহাকেই আদি পুরুষ সমষ্টি পুরুষ বা মূল পুরুষ বলিতেছি। আর এক জীবাত্মা; ইহাই সংখ্যমতে বহুরূপ। বেদান্তে এই জীবাত্মাকেও পরমাত্মা বলা হয়। সো হং, তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে তাহার প্রমাণ করা হয়। সাংখ্যকার এই মত লইয়াই বিবাদ করেন। তিনি জীবাত্মা সকলকে একজাতীয় বলেন, কিন্তু এক বলেন না। সাংখ্যকার এই জীবাত্মা বা পুরুষ ও প্রকৃতির সহযোগে আমাদের শরীর প্রভৃতি সৃষ্টির কথাই বিশেষরূপে অবতারণা করিয়াছেন,—জগৎসৃষ্টির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। যাঁহারা এ বিষয়ের বিশেষ তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সাংখ্য প্রবচনের প্রথম অধ্যায়ের ১২, ১৩, ৫০, ১৪৯—১৫৫, এবং ১৬০ সূত্র, তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ সূত্র, পঞ্চম অধ্যায়ের ১১৬ সূত্র এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৫, ৪৬—৪৮ ও ৪৯ সাঙ্খ্য—সূত্র দেখিবেন।

† গত আষাঢ় মাসের নবজীবনের ৭৩০ পৃষ্ঠার টীকাতে বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য হইতে—"অত্রশাস্ত্রে কারণ ব্রহ্মত্ব"—প্রভৃতি যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দেখিবেন। বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলিয়াছেন—"শ্রুতি স্মৃতিন্যায়েভ্যঃ সদৈকরূপতাসিদ্ধেঃ।"

"বহুরূপ ইবা ভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।"

"রমমানো গুণেষ্যস্যা মমাহমিতি বধ্যতে।"

বিজ্ঞানভিক্ষু উদ্ধৃত বচন।

সাংখ্য সারে আছে,

"ধিয়াং রূপৈঃ পুমানেকো বহুরূপ ইবেয়তে।" ২।৬।৩৬।

অর্থাৎ একরূপ পুরুষই বুদ্ধির নানারূপতাবশত বহুরূপির ন্যায় বোধ হয়। অথবা "পুংসাং ভেদো বুদ্ধি ভেদাৎ।"

বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলেন,

"পুমানেক জগৎকর্তা জগৎভর্ত্তাখিলেশ্বর।" ২।৫।১৩।

এবং যদিও সূক্ষ্ম শরীরযুক্ত জীবাত্মা বা পুরুষ অসংখ্য, "অসংখ্যাত্মানন্তোরাশিঃ" কিন্তু মূল পুরুষ বা পরমাত্মা "অবিভক্তৈকরূপকঃ।" সুতরাং

"পুংসঃ কলাস্তব্রতস্ত নিরংশত্বাৎ স নিস্কলঃ।" ২।৫।৪৪।

অর্থাৎ পুরুষের কলা আছে, কিন্তু মূল পুরুষের কোন অংশ নাই, সুতরাং ইহা কলাহীন।

জীবাত্মাকেও পুরুষ বলে কেন, বিজ্ঞানভিক্ষু, তাহাও দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, "পুর্য্যাভিব্যক্তিতঃ পুমান্।" অর্থাৎ দেহরূপ পুরীতে অভিব্যক্ত হয় বলিয়াই ইহাকে পুরুষ বলে। *

সাঙ্খ্যকারিকাতেও এই মতের আভাস আছে। কারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ দশম ও একাদশ শ্লোকে দেখাইয়াছেন যে, ব্যক্ত প্রকৃতি বহুরূপ (অনেকং) কিন্তু পুরুষ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

"তদ্‌বিপরীত স্তথাচ পুমান।"

অতএব ইহার মতেও পুরুষ ব্যক্ত প্রকৃতির ন্যায় বহুরূপ নহে। তবে জন্ম মৃত্যু জন্য, অথবা বহুরূপ ত্রৈগুণ্য পদার্থের সংযোগে "বহুত্ব সিদ্ধ" হইয়াছে। কারিকাকার ভাষ্যকার আচার্য্য প্রধান গৌরীপাদও এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন, যে ব্যক্ত প্রকৃতি অনেক, কিন্তু অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ এক মাত্র।

"অনেকং ব্যক্তং তথা পুমানপ্যেকঃ।"

---

* 'পুরুষের' ধাত্বর্থ দুইরূপ। এক, (পুর্) শরীরে, (বস) বাস করে যে, সেই পুরুষ বা আত্মা। আর এক, (পুর্ ধাতু + কুষণ প্রত্যয়ে) যিনি সকলের অগ্রবর্ত্তী বা আদি ব্রহ্ম তিনিই পুরুষ।

সাঙ্খ্যসূত্রেও আছে, যেমন আকাশ (বা জল) ভিন্ন পাত্রে রাখিলে তাহার নানা যোগ (রূপ) হয়, সেইরূপ পুরুষেরও বহুরূপ হইয়াছে মাত্র;—

"উপাধিভেদেপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্য ঘটাদিভিঃ। ১।১৫০।

ভগবদ্গীতাতেও সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতিপুরুষ ব্যাখ্যাকালে এই কথার উল্লেখ আছে,—

"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বাত্রাবস্থিত দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥"১৩৩২

সেশ্বর সাঙ্খ্যবাদী ভগবান পতঞ্জলিও এইরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ না বুঝিলে সাঙ্খ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায় না। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সমষ্টি ধরা হইয়াছে, কিন্তু পুরুষের ব্যষ্টি জন্য বহুত্ব হইলেও কেন সমষ্টি পুরুষ ধরা হইবে না, তাহা আমরা বুঝি না। বেদান্তে ত নিগুণ ব্রহ্মকে পরমাত্মা, ও ব্যষ্টি আত্মাকে জীবাত্মা বলা হইয়াছে।

আমরা সাঙ্খ্যমতে মূল পুরুষের একত্ব প্রমাণ করিতে এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, এ বিষয়ে অতি গুরুতর মতভেদ আছে। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি টীকাকারগণ সাঙ্খ্যমতে পুরুষের বহুত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকেই প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বহুত্বে বিশ্বাস করেন। বাস্তবিকই একথা কিছু গুরুতর। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ টেট সাহেব বলিয়াছেন;—

So far as science can inform us, it (the Intelligent Agency) may consist of a multitude of beings or of One Supreme Intelligence. As scientific men, we are absolutely ignorant of the subject."

Unseen universe P. 223.

১৬। সৃষ্টির ক্রম, ও তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত।

সে যাহা হউক, যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বোধ হয় যে, সাঙ্খ্যমতে সৃষ্টির আদিতত্ত্ব—পুরুষ এক। আমরা দেখাইয়াছি যে, এই পুরুষের সংক্রামিত শক্তিতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্বাধিক্যে সমষ্টি মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। ইহাই সাঙ্খ্যের দ্বিতীয় তত্ত্ব,—ইহাই সাঙ্খ্যের স্রষ্টা ঈশ্বর,—ইহাই সাঙ্খ্যের জগদ্ব্যাপ্ত মূল সৃষ্টিশক্তি।

বাস্তবিক আধুনিক বিজ্ঞানের চক্ষেই দেখি, আর দর্শনের চক্ষেই দেখি, কারণানুসন্ধায়ী যুক্তিই অবলম্বন করি, কিম্বা কার্য্যানুসন্ধায়ী যুক্তি অবলম্বন করি, যে দিক দিয়াই আমরা আমাদের জ্ঞানের চরম সীমায় যাইতে চেষ্টা করি না কেন, অবশেষে এই আদি সৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ ততই দূর হইতে থাকে।—

"But amid the mysteries which become the more mysterious the more they are taught about, there will remain one *absolute* certainty, that (we are) *ever in presence of an Infinite and Eternal Energy from which all things proceed.*"

Religious Retrospect and Prospect.

Herbert Spencer.

পণ্ডিত হর্বার্ট স্পেন্সর আরও বলিয়াছেন,

"Matter and Motion are both regarded by me as modes of manifestations of Force, and that Force is the correlation of that Universal Power which transends consciousness".

Unseen Universe P. 579.

আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন,

"We find, the continued existence of the unknowable, as the necessary correlative of the knowable."

Ibid P. 191d.

সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এই মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রিয়া ধর্ম্মযুক্ত অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। ইহার দ্বারা মহত্তত্ত্ব ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সাত্ত্বিক অংশে মন, রাজসিক অংশে দশ ইন্দ্রিয়, এবং তামসিক অংশে পঞ্চ তন্মাত্র ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়। সাঙ্খ্যমতে এই পঞ্চ তন্মাত্রমধ্যে প্রথমেই আকাশ সৃষ্টি হয়। এই আকাশ সর্ব্বব্যাপী এবং ইহা হইতে সমুদয় ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

অধুনা কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও সৃষ্টি কার্য্য এইরূপে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত টেট সাহেব বলেন,—

"We are compelled to imagine that what we see (ব্যক্ত জগৎ) has originated in the unseen (অব্যক্ত), and in using this term

we desire to go back even further than ether, (আকাশ) which according to (one) hypothesis has given rise to the visible order of things.".

Unseen Universe p. 198.

আর এক স্থলে তিনি বৃত্তের পর বৃত্ত আঁকিয়া দেখাইয়াছেন যে—

"The visible universe is developed out of the invisible universe immediately anterior to the present, which again is developed out of the next order (of the invisible), which again is developed out of the next order, and so on. * * * As far as energy is concerned, that of (2 – the above second order) is greater than (1), that of (3) is greater than (2) and so on."

Vide Unseen Universe P. 220-221

আর একস্থলে টেট সাহেব বলিয়াছেন –

"Development was brought about by means of Intellegence residing in the invisible universe and working through its laws.'

Ibid P. 214.

আমরা দেখাইয়াছি যে, মহর্ষি কপিলও এইরূপ ভৌতিক জগতের কারণ আকাশ, আকাশের কারণ তামসিক অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণ মহত্তত্ত্ব, এবং মহত্তত্ত্বের কারণ পুরুষের সন্নিধানস্থিত মূল প্রকৃতি, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে মহত্তত্ত্বই বুদ্ধির আধার, ইহাই স্রষ্টা ঈশ্বর এবং ইহারই শক্তির রাজসিক ও তামসিক পরিণাম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। আর এক আশ্চর্য্য কথা এই যে, সাঙ্খ্যদর্শন হইতে পরবর্ত্তী পুরাণ কর্ত্তাগণ মহত্তত্ত্বের ত্রিগুণ জন্য যে তিন পরিণামকে পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, এবং সংহারকর্ত্তা "ভূতনাথ" শিব, এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট সাহেবও কতকটা সেইরূপ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে,—

"The most probable solution is that there is an Intellegent Agent, one of whose functions it is to develope the universe objectively considered ; and also that there is an Intellegent

Agent one of whose functions it is to develope Intellegence and Life." Ibid. P. 247.

সে যাহা হউক, বিজ্ঞানমতে ভৌতিক সৃষ্টিসম্বন্ধে অন্য কথা আমরা পরে উল্লেখ করিব।

১৭। তন্মাত্রা বা সূক্ষ্মভূত সৃষ্টি।

আমরা এক্ষণে পঞ্চ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিব। এ সম্বন্ধে বাবু চন্দ্রশেখর বসুর ভূততত্ত্ব বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধের পর * আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। এই পঞ্চভূত সম্বন্ধে প্রচারের পঞ্চম ও নবম সংখ্যায়ও অনেক কথা আছে; তবে সৃষ্টি বুঝাইতে আমাদের যতদূর আবশ্যক তাহাই এস্থলে দেখাইব মাত্র।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাঙ্খ্যকারিকাতে আছে যে, ইহারা তামসিক ও রাজসিক উভয় প্রকার অহঙ্কার হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এবং সেই জন্য প্রত্যেক ভূতেই রজঃ ও তমঃ উভয় শক্তিই সম্মিলিত আছে। কারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন—

"ভূতাদি স্তন্মাত্রঃ স তামস স্তৈজসাদুভয়ং।" ২৫।

আমরাও পরে দেখাইব যে, প্রত্যেক ভূতেই বাস্তবিকই এই রজঃ ও তমঃ শক্তি বিদ্যমান আছে, তবে ভূত সৃষ্টির সহিত ক্রমে ক্রমে রজঃ শক্তির হ্রাস ও তমঃ শক্তির আধিক্য হইয়াছে; অর্থাৎ আকাশভূতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রজঃ ও অল্প তমঃ আছে। কিন্তু ক্ষিতিভূতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তমঃ ও অল্প রজঃ আছে। এই স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, যখন সকল পদার্থই ত্রিগুণাত্মিকা, তখন প্রত্যেক ভূতেই ত তমঃ ও রজঃ শক্তির সহিত সত্বশক্তি বিদ্যমান আছে, তবে তাহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তাহা তমঃ শক্তিদ্বারা অভিভূত। প্রথমেই ত বলিয়াছি যে, সাত্বিক মহত্তত্বের তমঃ অধিকারেই ভূত সৃষ্টি। বলিয়াছি ত "মহত্তুপরাগাদ্বিপরীতং।" একথা কতদূর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তাহা আমরা পরে দেখাইব। তবে এস্থলে এই মাত্র বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে এক্ষণে বিজ্ঞানে Matter ও Energy এই দুইটি, স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করে। সাঙ্খ্যকার সেরূপ করেন নাই। বিজ্ঞান মতে—

* গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের নবজীবন দেখুন।

"In the physical universe there are but two classes of things, MATTER and ENERGY."

Tait "On Properties of Matter." P. ২.

কিন্তু সাঙ্খ্যমতে ভূত বলিলে Matter ও Energy দুইই বুঝায়। Matter ও Energyর স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই। এবিষয়ে সাঙ্খ্যমত কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহা আমরা একজন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কথাতেই দেখাইতেছি। পণ্ডিতবর ষ্টেলো সাহেব বলিয়াছেন—

"It is equally clear that mass—or to use the ordinary term *inert matter* or *matter per se*—cannot be the object of sensible experience. * * Without its relation to, and union with force or motion, it has no existence just as force or motion has no existense without its relation to and union with inertia. * * The truth is that neither mass nor motion is substantially real, but both are concepts, or rather, constituents of a concept—the concept *matter*. They are ultimate product of generalization. * * It (matter) is not therefore real thing, but ideal complement of two attributes belonging to all bodies alike (which are) inseparable not only in fact, but also in thought."

Concept of Modern Physics. p. 149-50.

দার্শনিক পণ্ডিত বেন সাহেবও এ কথা বলেন, তাঁহার মতে,—

"Force and matter are not two things, but one thing"

সাঙ্খ্যকার এরূপ আধুনিক বিজ্ঞানের ভ্রমে পতিত হন নাই। তিনি ভূতকে রজঃ ও তমঃ এই দুই দ্রব্যের অথবা অনেকটা inert Matter ও Energy ইহাদের সমবায়ে উৎপন্ন, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানে—

"The theory takes not only the ideal concept *matter* but its two inseparable constituent attributes, and assumes each of them to be a distinct and real entity.,,

Concept of Modern Physics. p. 150

সে যাহা হউক, আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের atomo—mechanical Theoryর কথা পরে উল্লেখ করিব।

১৮। তন্মাত্রা সৃষ্টির ক্রম।

এক্ষণে সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্রা সৃষ্টির কথা বলি। শাস্ত্রে আছে,—

"আকাশাৎ জায়তে বায়ু বায়োরুৎপদ্যতে রবি (তেজঃ)।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী॥"

পুরাণ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শাস্ত্রেরই এই কথা।

সাঙ্খ্যকারে আছে।

দশগুণিত মহত্তত্ত্ব মধ্যে হহঙ্কারোহঙ্কারস্যাপি দশগুণিতস্য মধ্যে ব্যোম ব্যোম্নোহপি দশগুণিতস্য মধ্যে বায়ু র্বায়োরপি দশগুণিতস্য মধ্যে তেজঃ তেজসোপি দশগুণিতস্য মধ্যে জলং, জলস্যাপি দশগুণিতস্য মধ্যে পৃথিবী সমুৎপদ্যতে। ১।৩।৩৬।

বিজ্ঞানভিক্ষু যদিও একথা স্থূলভূত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সাংখ্য পণ্ডিতদিগের মতে সূক্ষ্মভূত সম্বন্ধেও এই নিয়ম, ইহারাও আকাশ হইতে এইরূপে ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যে আছে,

"যথাহঙ্কারাচ্ছব্দ তন্মাত্রং ততশ্চাহঙ্কার সহকৃতাচ্ছব্দ তন্মাত্রা চ্ছব্দ তন্মাত্রা চ্ছব্দস্পর্শগুণকং স্পর্শ তন্মাত্রং। এবং ক্রমেণৈকৈক গুণবৃদ্ধ্যা তন্মাত্রাণ্যুৎপদ্যন্ত ইতি।"

"আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণ স্পর্শমাত্রং সসর্জহ।
বলবানভবদ্বায়ু স্তস্য স্পর্শো গুণোমতঃ॥" ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণ।

অতএব পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি এক সময়ে হয় নাই। "ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার পদার্থের পরিচালক রজঃ অংশ তাহাকে ভিন্ন ভিন্নরূপে পরিচালিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত করিয়াছে।" প্রথমে এই তামসিক অহং হইতেই শব্দগুণবিশিষ্ট এক সূক্ষ্ম পদার্থের সৃষ্টি হয়; ইহাকেই আকাশ (ether) বলে। আমরা যেখানে যে শব্দ শুনিতে পাই, অথবা যেরূপ কম্পন ক্রিয়া আমাদের শ্রবণ পথে প্রবেশ করিলে আমাদের শব্দের প্রতীতি হয়, সেইরূপ কম্পন গুণসম্পন্ন পদার্থ অথবা সেইরূপ কম্পন ক্রিয়া উৎপাদক শক্তিবিশেষকে আকাশ বলা হইয়াছে। এই আকাশ

সমস্ত জগন্ময় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বাস্তবিক সাঙ্খ্যকার এই আকাশ হইতেই দিক্ ও কাল ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে কল্পনা করিয়াছেন,—

"দিক কালা বাকাশাদিভ্যাম্।" ২।১২

কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন নিত্য ও ব্যাপ্ত যে অনন্ত দিক্ (Space) ও কাল (time) তাহা মূল প্রকৃতির ধর্ম্ম বিশেষ। কেবল সসীম অথবা খণ্ড দিক্‌কাল ধর্ম্মই আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। *

এই আকাশের দশাংশের একাংশ— কেহ বলেন সহস্রাংশের একাংশ অথবা অতি অল্প ভাগ হইতেই স্পর্শগুণ বিশিষ্ট আর এক সূক্ষ্ম পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহাই বায়ু, ইহাই স্পর্শ তন্মাত্র। যেরূপ ক্রিয়াদ্বারা আমাদের স্পর্শজ্ঞান জন্মে, (ইংরাজিতে যাহাকে Tactual sense বলে) এবং যাহা হইতে আমাদের Resistance জ্ঞান হয়, তাহা এই বায়ু ভূতের স্পর্শ ক্রিয়া বা এইরূপ কম্পন হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহাই বায়ুর বিশেষ ধর্ম্ম এবং বায়ু হইতে পরবর্ত্তী যে তিন সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেও এই গুণ আছে। তবে বায়ু আকাশের বিকার বলিয়া আকাশের শব্দ গুণও এই বায়ুতে বিদ্যমান আছে, এবং বায়ুমধ্যে (স্থূলাবস্থায়) আকাশও নিহিত থাকে।

এই বায়ুর দশাংশের একাংশ বিকৃত হইয়া আবার পদার্থের রূপ বিধায়ক তেজঃ উৎপন্ন হয়। ইহাতে আকাশের গুণ শব্দ ও বায়ুর গুণ স্পর্শ উভয়ই নিহিত আছে। এই তেজের কিয়দংশ (দশমাংশ) পরিণামদ্বারা রসগুণযুক্ত অপ্ বা জলীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। কটু, অম্ল প্রভৃতি ষড়রস যে প্রকার ক্রিয়াদ্বারা জিহ্বার অনুভাব কিবা (অথবা আস্বাদন শক্তি) উৎপাদন করে, সেই ক্রিয়াশক্তি যাহার আছে তাহাই আপ্য (বা জলীয়) পদার্থ। এই রসতন্মাত্রিক অপ্ সূক্ষ্মভূত তেজঃ (ও তন্নিহিত বায়ুর পরিণাম বিশেষ) হইতে সৃষ্টি হয় বলিয়া আকাশ বায়ু ও তেজের যে ধর্ম্ম শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তাহাও ঐ অপের আছে।

---

* শাস্ত্রে কালসম্বন্ধে উক্ত আছে যে "কাল কতকগুলি ক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র," (ক্রিয়ৈব কাল ইতি।) অথবা ইংরাজিতে যাহাকে Succession of events বলে তাহা হইতেই কালধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইহা কার্য্য-কারণ ভাবের সহিত চিরসম্বদ্ধ। দিক্ সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলা যায়। "Special extension is a primary property of all variety of objective existence" এ সম্বন্ধে আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে ভয়ানক মতভেদ আছে। কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিবেন।

তৎপরেই এই রসতন্মাত্রিক অপের আংশিক (দশমাংশের) পরিণামে অবশেষে গন্ধগুণ বিশিষ্ট ক্ষিতির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং ইহাতে আকাশ, বায়ু তেজঃ ও অপের গুণ বিদ্যমান আছে। এই পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টিপ্রণালী এইরূপ—

সূক্ষ্মভূত	...	তাহাদের মূলধর্ম্ম বা তন্মাত্র।
আকাশ	..	শব্দ।
বায়ু	...	স্পর্শ ও শব্দ।
তেজ	..	রূপ, স্পর্শ ও শব্দ।
অপ্	...	রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ।
ক্ষিতি	...	গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই তন্মাত্রা বা পরমাণু সকল তামস্ অহঙ্কার (এবং রাজসিক অহঙ্কার) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই তামস্ অহং শক্তি হইতে যে শক্তি উৎপন্ন হইয়া, শব্দরূপ অনুকম্পন ক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাহাতে সত্ত্ব গুণেরও অংশ থাকে, এবং রজোশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে। তবে তমোগুণের আধিক্য জন্য তাহারা কতক পরিমাণে অভিভূত থাকে। আমরা এই ভূত কেবল ক্রিয়াদ্বারা—ইহার শব্দক্রিয়া আমাদের শব্দেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিয়া, এই ভূতের (স্থূলাবস্থায়) উপলব্ধি করি। এইরূপে এইশব্দক্রিয়ার বিকার বিশেষ হইতে স্পর্শরূপ ক্রিয়া, উৎপন্ন হয় এবং ত্বকের দ্বারা আমরা ইহার উপলব্ধি করিয়া বায়ুভূতের অস্তিত্ব অনুমান করি। অন্যান্য ভূত সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই আকাশ হইতে এক ভূতের পর আর একরূপ ভূতের সৃষ্টির সহিত রজো শক্তি (Energy) ক্রমে ক্রমে কমিয়া আইসে, এবং তমো শক্তির (Inertia) আধিক্য হয়, পরিশেষে ক্ষিতিভূতে তাহার সর্ব্বাধিক বিকাশ হয়, একথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।*

---

* সৃষ্টির ক্রমবিকাশের সহিত, তন্মাত্রাগুলির যতই স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে,—যতই ইহারা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে স্থূল অবস্থায় আসিতে থাকে, যতই তাহারা ক্রমে ক্রমে আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা প্রত্যক্ষের অতীত অবস্থা হইতে, জ্ঞানের বিষয়ীভূত (Objective) হইতে থাকে, এবং যতই তাহাদের বিশেষ অবস্থা হইতে অধিকতর বিশেষ অবস্থা হইতে থাকে, ততই তাহাদের ক্রিয়াশক্তি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয় এবং বলিয়াছি ত তৎসহিত ততই

ভক্তি।

ঈশ্বরে ভক্তি। বিষ্ণুপুরাণ।

নবম কথা।

গুরু। ভগবদ্গীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি যাহা বলিযাছি, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদ চরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষ্ণুপুরাণে দুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই জানেন—ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। এই দুই জনের ভক্তি দুই প্রকার। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম যে উপাসনা সেই কাম্য কর্ম্ম; নিষ্কাম যে উপাসনা সেই ভক্তি। ধ্রুবের উপাসনা সকাম,—তিনি উচ্চপদ লাভের জন্যই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে; ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্য ঈশ্বরে ভক্তিমান হয়েন নাই; বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান হওয়াতে, বহুবিধ বিপদে

তাহাদের তমঃ অংশের আধিক্য হইতে থাকে। প্রথমে আকাশ তন্মাত্রে যে রজোশক্তির আধিক্য ছিল বায়ু সৃষ্টি সময়ে তদন্তগত তমোশক্তির আধিক্য (ঘনীভূত বা Condensation) হওয়ায়, তাহার মধ্যস্থিত রজোশক্তির হ্রাস হইল, সুতরাং তাহা হইতে কতকটা রজোশক্তির বিকাশ হইল। রজোশক্তির বিকাশেই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই জন্যই বায়ুর ক্রিয়াশক্তি আকাশের ক্রিয়াশক্তি অপেক্ষা অধিক। আকাশের ক্রিয়া আমাদের একটি মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে—কিন্তু বায়ু, শব্দ ও স্পর্শ উভয়রূপ ক্রিয়া দ্বারা আমাদের দুইটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়। এইরূপ বায়ু হইতে যখন তেজো ভূত উৎপন্ন হয়, তখন তাহার ক্রিয়াশক্তি বায়ু অপেক্ষা আরও অধিক হয় তখন তাহা রূপ শব্দ ও স্পর্শ রূপ তিন প্রকার বিভিন্ন ক্রিয়া শক্তির দ্বারা আমাদের তিনটি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়। অপ ও ক্ষিতি ভূত-সম্বন্ধেও এই নিয়ম। তবে তাহাদের রজোশক্তির অংশ অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া তাহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারে হইলেও তাহার পরিমাণ অল্প হইতে থাকে। আমরা একথা পরে দেখাইব।

পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই সকল বিপদের কারণ ইহা জানিতে পারিয়াও তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই। এই নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্লাদই পরম ভক্ত। বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার উদাহরণ স্বরূপ, এবং পরস্পরের তুলনার জন্য ধ্রুব ও প্রহ্লাদ এই দুইটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে, যে সকাম উপাসনাও একেবারে নিষ্ফল নহে। যে যাহা কামনা করিয়া উপাসনা করে, সে তাহা পায়, কিন্তু ঈশ্বর পায় না। ধ্রুব উচ্চপদ কামনা করিয়া উপাসনা করিয়া ছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার সে উপাসনা নিম্নশ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা ভক্তি, এই জন্য তিনি লাভ করিলেন—মুক্তি।

শি। অনেকেই বলিবে, লাভটা ধ্রুবেরই বেশী হইল। মুক্তি পারলৌকিক লাভ, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভক্তিধর্ম্ম লোকায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

গুরু। মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ, এবং দুঃখের অতীত, সেই ইহলোকেই মুক্ত। সম্রাট দুঃখের অতীত নহেন, কিন্তু মুক্তজীব ইহলোকেই দুঃখের অতীত; কেন না সে আত্মজয়ী হইয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছে। সম্রাটের কি সুখ বলিতে পারি না। বড় বেশি সুখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাহার মনের সুখের সীমা নাই। যে মুক্ত সেই ইহজীবনেই সুখী। এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম যে সুখের উপায় ধর্ম্ম। মুক্তব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্য যুক্ত হইয়াছে, বলিয়া সে মুক্ত। যাহার বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা চিত্ত মালিন্যবশত মুক্ত হইতে পারে না।

শি। আমার বিশ্বাসই যে এই জীবন্মুক্তির কামনা করিয়া ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন। যাঁহারা এপ্রকার জীবন্মুক্ত, সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ তাঁহাদের মনোযোগ থাকে না; এজন্য ভারতবর্ষের এই অবনতি হইয়াছে।

গুরু। মুক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ। যাঁহারা মুক্ত, বা মুক্তি পথের পথিক, তাঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত হয়েন না,

তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের কর্ম্ম নিষ্কাম বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম স্বদেশের এবং জগতের মঙ্গলকর হয়; সকাম কর্ম্মীদিগের কর্ম্মে কাহারও মঙ্গল হয় না। আর তাঁহাদের বৃত্তি সকল অনুশীলিত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, এইজন্য তাঁহারা দক্ষ এবং কর্ম্মঠ; পূর্ব্বে যে ভগদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে, যে ভগবদ্ভক্তদিগের দক্ষতা* একটি লক্ষণ। তাঁহারা দক্ষ অথচ নিষ্কাম কর্ম্মী, এজন্য তাঁহাদিগের দ্বারা যতটা স্বজাতির এবং জগতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এদেশের সকলে এইরূপ মুক্তিমার্গাবলম্বী হইলেই ভারতবর্ষীয়েরাই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। মুক্তিতত্ত্বের এই যথার্থ ব্যাখ্যার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা আমি তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

শিষ্য। এক্ষণে প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি।

গুরু। প্রহ্লাদ চরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। তবে একটা কথা এই প্রহ্লাদ চরিত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলিয়াছি যে, কেবল হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া বেড়াইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্ব্বভূতকে আপনার মত দেখিয়া সর্ব্বজনের হিতে রত, শত্রু মিত্রে সমদর্শী, নিষ্কাম কর্ম্মী,—সেই ভক্ত। এই কথা ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে দেখাইয়াছি। এই প্রহ্লাদ তাহার উদাহরণ। ভগবদ্গীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্ণু পুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত। গীতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা যদি তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক, সেই জন্য তোমাকে উহা আর একবার শুনাইতেছি।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যোমদ্ভক্ত স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকা লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

* অনপেক্ষঃ শুচি র্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।

সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

নবজীবন। ২য় ১ সং ৮। ৯ পৃঃ।

প্রথমেই প্রহ্লাদকে "সর্ব্বত্র সমদৃগ্ বশী" বলা হইয়াছে।

সমচেতা জগত্যস্মিন্ যঃ সর্ব্বেষ্বেব জন্তুষু।
যথাত্মনি তথান্যত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ॥
ধর্ম্মাত্মা সত্যশৌচাদি গুণানামাকরস্তথা।
উপমানমশেষাণাং সাধূনাং যঃ সদা ভবেৎ॥

কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয় না, কার্য্যত দেখাইতে হয়। প্রহ্লাদের প্রথম কার্য্যে দেখি তিনি সত্যবাদী। সত্যে তাঁহার এতটা দার্ঢ্য যে কোন প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না। গুরু গৃহ হইতে তিনি পিতৃ সমীপে আনীত হইলে, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শিখিয়াছ? তাহার সার বল দেখি।"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "যাহা শিখিয়াছি তাহার সার এই যে, যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, যাঁহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, যিনি অচ্যুত, মহাত্মা, সর্ব্ব কারণের কারণ, তাঁহাকে নমস্কার।"

শুনিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু আরক্ত লোচনে, কম্পিতাধরে প্রহ্লাদের গুরুকে ভৎর্সনা করিলেন। গুরু বলিল, "আমার দোষ নাই, আমি এসব শিখাই নাই।"

'তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কে শিখাইল রে?"

প্রহ্লাদ বলিল, "পিতঃ! যে বিষ্ণু এই অনন্ত জগতের শাস্তা, যিনি আমার হৃদয়ে স্থিত, সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কে শিখায়?"

হিরণ্যকশিপু বলিলেন। "জগতের ঈশ্বর আমি; বিষ্ণু কে রে দুর্ব্বুদ্ধি!"

প্রহ্লাদ বলিল, "যাঁহার পরংপদ শব্দে ব্যক্ত করা যায় না, যাহার পরং পদ যোগিরা ধ্যান করে, যাঁহা হইতে বিশ্ব, এবং যিনিই বিশ্ব, সেই বিষ্ণু পরমেশ্বর।"

হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "মরিবার ইচ্ছা করিয়াছিস যে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছিস্? পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানিস্ না? আমি থাকিতে আবার তোর পরমেশ্বর কে?"

নির্ভীক প্রহ্লাদ বলিল, "পিতঃ তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর! সকল জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর,—তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা, পরমেশ্বর! রাগ করিও না, প্রসন্ন হও।"

হিরণ্যকশিপু বলিল, "বোধ হয়, কোন পাপাশয় এই দুর্ব্বুদ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে!"

প্রহ্লাদ বলিল, "কেবল আমার হৃদয়ে কেন? তিনি সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই সর্ব্বস্বামী বিষ্ণু, আমাকে, তোমাকে, সকলকে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন।"

এখন, সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর "যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ *"। দৃঢ়নিশ্চয় কেন তাহা বুঝিলে? সেই "হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স মে প্রিয়ঃ" স্মরণ কর। এখন, ভয় হইতে মুক্ত যে ভক্ত, সে কি প্রকার তাহা বুঝিলে? "ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ" কি বুঝিলে? † ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্য এই প্রহ্লাদ চরিত্র কহিতেছি।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তাড়াইয়া দিলেন, প্রহ্লাদ আবার গুরু গৃহে গেলেন। অনেক কালের পর আবার আনাইয়া অধীত বিদ্যার আবার পরীক্ষা লইতে বসিলেন। প্রথম উত্তরেই প্রহ্লাদ আবার সেই কথা বলিল,

কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত দৈত্য তাঁহাকে কাটিতে আসিল, কিন্তু প্রহ্লাদ "দৃঢ়নিশ্চয়" "ঈশ্বরার্পিত মনোবুদ্ধি,"—যাহারা মারিতে আসিল, প্রহ্লাদ তাহাদিগকে বলিল, "বিষ্ণু তোমাদের অস্ত্রেও আছেন, আমাতেও আছেন, এই সত্যানুসারে, আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।" ইহাই "দৃঢ় নিশ্চয়।"

শিষ্য। জানি যে বিষ্ণুপুরাণের উপন্যাসে আছে, যে প্রহ্লাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত রহিলেন। কিন্তু উপন্যাসেই এমন কথা থাকিতে পারে,—যথার্থ এমন ঘটনা হয় না। যে যেমন ইচ্ছা ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসর্গিক নিয়ম তাহার কাছে নিষ্ফল হয় না—অস্ত্রে পরমভক্তেরও মাংস কাটে।

গুরু। অর্থাৎ তুমি Miracle মান না। কথাটা পুরাতন। আমি তোমাদের মত, ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষ্ণু

---

* সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

† ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

পুরাণে যেরূপে প্রহ্লাদের রক্ষা কথিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিয়াই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু একটি নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানুকম্পায় নিয়মান্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না। অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত, ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে, যে অস্ত্র নিষ্ফল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত, সে "দক্ষ", ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং সে অতিশয় কার্য্যক্ষম; ইহার উপর ঈশ্বরানুগ্রহ পাইলে সে যে নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যেই, অতিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কি? * যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদিগের কোন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না,—কেন না আমি ভক্তি বুঝাইতেছি ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন কি না, তাহা বুঝাইতেছি না। এরূপ কোন ফলই ভক্তের কামনা করা উচিত নহে,—তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু প্রহ্লাদ ত এখানে রক্ষা কামনা করিলেন—

গুরু। না, তিনি রক্ষা কামনা করেন নাই, তিনি কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন, যে যখন আমার আরাধ্য বিষ্ণু আমাতেও আছেন, এই অস্ত্রেও আছেন, তখন এ অস্ত্রে কখন আমার অনিষ্ট হইবে না। সেই দৃঢ়নিশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে। কেবল ইহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য। প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্যাসে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণ ব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রাকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিপ্রাকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

---

* ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য শিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ; অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তি ব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

তারপর, অস্ত্রে প্রহ্লাদ মরিল না দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন। "ওরে দুর্বুদ্ধি, এখনও শত্রুস্তুতি হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্খ হইস না, আমি এখনও তোকে অভয় দিতেছি।"

অভয়ের কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিল "যিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাঁহার স্মরণে জন্ম জরা যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের?"

সেই 'ভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তো" কথা মনে কর। তারপর হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে আদেশ করিলেন যে উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্যাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা করি তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়েও প্রহ্লাদ মরিল না, —সে কথাও তোমার বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার এই সর্প দংশন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোযোগ কর।

স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদ সংস্থিতঃ॥

প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণে তখন এমন আসক্ত, যে মহা সর্প সকল দংশন করিতেছে তথাপি কৃষ্ণস্মৃতির আহ্লাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহ্লাদের জন্য সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্বাক্য আবার স্মরণ কর "সমদুঃখ সুখঃক্ষমী।"* "ক্ষমী" কি, পরে বুঝিবে, এখন 'সমদুঃখসুখ" বুঝিলে!

শিষ্য। বুঝিলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একটা ভারি সুখ রাত্রি দিন রহিয়াছে, বলিয়া অন্য সুখ দুঃখ, সুখদুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না।

গুরু। ঠিক তাই। সর্প কর্ত্তৃক প্রহ্লাদ বিনষ্ট হইল না, দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মত্ত হস্তিগণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দাঁতে ফাড়িয়া মারিয়া ফেল। হস্তিদিগের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহ্লাদের কিছু হইল না; বিশ্বাস করিও না, উপন্যাস মাত্র। কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ পিতাকে কি বলিলেন শুন,

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্র নিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।

---

* নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমসুখ দুঃখঃক্ষমী।

মহাবিপৎ পাপ বিনাশনোহয়ং
জনার্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

"কুলিশাগ্র কঠিন এই সকল গজদন্ত যে ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা আমার বল নহে।. যিনি মহাবিপৎ ও পাপের বিনাশন, তাঁহারই স্মরণে হইয়াছে।"

আবার সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর "নির্মমো নিরহঙ্কারঃ" ইত্যাদি' ইহাই নিরহঙ্কার। ভক্ত জানে যে সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জন্য ভক্ত নিরহঙ্কার।

হস্তী হইতে প্রহ্লাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু আগুনে পোড়াইতে আদেশ করিলেন প্রহ্লাদ আগুনেও পুড়িল না, প্রহ্লাদ "শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ" তাই প্রহ্লাদের সে আগুন পদ্মপত্রের ন্যায় শীতল বোধ হইল।* তখন দৈত্যপুরোহিত ভার্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, "ইহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদের জিম্মা করিয়া দিন। তাহাতেও যদি এ বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচারের দ্বারা ইহাকে বধ করিব। আমাদের কৃত অভিচার কখন বিফল হয় না।"

দৈত্যেশ্বর এই কথায় সম্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া বসিলেন। এবং দৈত্যপুত্রগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিষ্ণুভক্তিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি আর কিছুই নহে—পরহিত ব্রত মন্ত্র—

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥

* * * *

সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধন মচ্যুতস্য॥

অর্থাৎ বিশ্ব জগৎ সর্ব্বভূত বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র, বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে আপনার তুল্য অভেদ দেখিবেন। * * হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ব্বত্র সমান দেখিও, এই সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ব্বভূতের) ঈশ্বরের আরাধনা।

---

* শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ।

প্রহ্লাদের উক্তি প্রীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যার সময়ে তোমাকে সবিস্তারে শুনাইব, এখন কেবল আর দুইটি শ্লোক শুন।

অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তি রহং পরম্।
মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হ্যনির্দ্বেষ ফলং যতঃ॥
বদ্ধ বৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেৎততঃ।
শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিনা।

"অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি ইহা দেখিয়াও আহ্লাদ করিও দ্বেষ করিও না কেন না দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শত্রুতা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, বলিয়া জ্ঞানিরা দুঃখ করেন।"

এখন সেই ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ মনে কর।

'যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ" এবং 'নদ্বেষ্টি' * শব্দ মনে কর। ভগবদ্বাক্যে পুরাণকর্ত্তা কৃত এই টীকা।

প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুভক্তির উপদ্রব করিতেছে, জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে বিষপান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেশ্বর পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা প্রহ্লাদের সংহার করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা প্রহ্লাদকে একটু বুঝাইলেন। বলিলেন তোমার পিতা জগতের ঈশ্বর, তোমার অনন্তে কি হইবে? প্রহ্লাদ "স্থিরমতি" †; প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্য পুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচার ক্রিয়ার সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিময় মূর্ত্তিমতী অভিচার ক্রিয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূর্ত্তিমান অভিচার, নিরপরাধ প্রহ্লাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিয়া গেল। তখন প্রহ্লাদ "হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর" বলিয়া সেই দহ্যমান পুরোহিত দিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন, "হে সর্ব্বব্যাপিন্, হে জগৎ স্বরূপ, হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, হে জনার্দ্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল ভূতে সর্ব্বব্যাপী, জগদ্গুরু বিষ্ণু তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাহ্মণেরা

---

* যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
† অনিকেতঃ স্থিরমতি ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।

জীবিত হউক! বিষ্ণু সর্ব্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শত্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমনি—ইহারাও জীবিত হোক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতির দ্বারা আমাকে আহত করিয়াছিল, সাপের দ্বারা দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্র ভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতেরা জীবিত হউক।" তখন ঈশ্বরকৃপায় পুরোহিতেরা জীবিত হইয়া, প্রহ্লাদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল।

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম, অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার?*

শিষ্য। আমি স্বীকার করি দেশীয় গ্রন্থ সকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজি পড়ায় আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

গুরু। এখন ভগবদ্গীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শত্রু মিত্রে তুল্য জ্ঞানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার, তাহা বুঝিলে।†

পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এই প্রভাব কোথা হইতে হইল?" প্রহ্লাদ বলিলেন, "অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না—কারণাভাব বশত তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কর্ম্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে পরপীড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া থাকে।

"কেশব আমাতেও আছেন, সর্ব্বভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহারও মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা করি, আমার শারীরিক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে? হরি সর্ব্বময় জানিয়া সর্ব্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য।"

* মনস্বী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বপ্রণীত "Oriental Christ" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "A suppliant for mercy on behalf of those very men who put him to death, he said "Father. forgive them, for they know not what they do." Can ideal forgiveness go any further?" *Ideal* যায় বৈ কি, এই প্রহ্লাদচরিত্র দেখুন না।

† সম শত্রৌমিত্রো চ তথা মানাপমানয়োঃ।

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, পড়ায় কি না, মেকলে প্রণীত ক্লাইব ও হেষ্টিংস সম্বন্ধীয় উপন্যাস। আর সেই উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উন্মত্ত। (এমন উচ্চ শিক্ষা দেশ হইতে শীঘ্র দূর হয়, ইহা আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।)

পরে, প্রহ্লাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, শম্বরাসুরের মায়ার দ্বারা, ও বায়ুদ্বারা প্রহ্লাদের বিনাশের চেষ্টা করিলেন। প্রহ্লাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতি শিক্ষার জন্য তাহাকে পুনশ্চ গুরু গৃহে পাঠাইলেন। সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য্য প্রহ্লাদকে সঙ্গে করিয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আসিলেন। দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—

"হে প্রহ্লাদ! মিত্রের ও শত্রুর প্রতি ভূপতি, কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তিন সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন? মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে—চর, চৌর, শঙ্কিতে এবং অশঙ্কিতে—সন্ধি বিগ্রহে—দুর্গ ও আটবিক সাধনে বা কণ্টক শোধনে—কিরূপ করিবেন, তাহা বল।"

প্রহ্লাদ পিতৃ পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "গুরু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, আমিও শিখিয়াছি। কিন্তু সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে। শত্রু মিত্রের সাধন জন্য সাম দান ভেদ দণ্ড এই সকল উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্তু পিতঃ! রাগ করিবেন না, আমি ত সেরূপ শত্রু মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই, * সেখানেতে সাধনের কি প্রয়োজন! যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্বভূতাত্মা, তখন আর শত্রু মিত্র কে? তোমাতে ভগবান্ আছেন, আমাতে আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই শত্রু, এমন করিয়া পৃথক ভাবিব, কি প্রকারে? অতএব দুষ্ট-চেষ্টা-বিধি-বহুল এই নীতি শাস্ত্রে কি প্রয়োজন?"

হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। এবং প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অসুরগণকে আদেশ করিলেন। অসুরেরা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্ব্বত চাপা দিল। প্রহ্লাদ তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে

---

* অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত্রু মনে করা উচিত নহে।

লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন না অন্তিমকালে ঈশ্বর চিন্তা বিধেয়; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্ম রক্ষা প্রার্থনা করিলেন না, কেন না প্রহ্লাদ নিষ্কাম। প্রহ্লাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া,তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাতে লীন হইলেন। প্রহ্লাদ যোগী *। তখন তাঁহার নাগপাশ খসিয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল, পর্ব্বত সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ গাত্রোত্থান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন,—আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন। এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ "সন্তুষ্টঃ সততং" সুতরাং তাঁহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তিনি কেবল চাহিলেন যে, "যে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে।" ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, ভক্তির জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্য বা অন্য ইষ্ট সাধনের জন্য নহে।

ভগবান্ কহিলেন, "তাহা আছে ও থাকিবে। অন্য বর দিব প্রার্থনা কর।"

প্রহ্লাদ দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিলেন "আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম, বলিয়া পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তাঁর সেই পাপ ক্ষালিত হউক।"

ভগবান তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু নিষ্কাম প্রহ্লাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না, কেন না তিনি "সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী,--হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, শুভাশুভ পরিত্যাগী।"† তিনি আবার চাহিলেন, "তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী থাকে।"

বর দিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তার পর হিরণ্যকশিপু আর প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করেন নাই।

শিষ্য। তুলামানে একদিকে বেদ, নিখিল ধর্ম্ম শাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ আর একদিকে প্রহ্লাদ চরিত্র রাখিলে প্রহ্লাদ চরিত্রই গুরু হয়।

---

* সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।

† সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্ত স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি না শোচতি না কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

গুরু।—এবং প্রহ্লাদ কথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ধর্ম্মের সার, সুতরাং সকল বিশুদ্ধ ধর্ম্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ, ইহা সেই পরিমাণে সেই ধর্ম্মে আছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্গত। গড্ বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপাল জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও, তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধম ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহামায়া।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রবাসে।

অমূল্যকে কাণপুরে সকলে ধনি-সন্তান বলিয়া জানিতেন, সুতরাং কাণপুরে সকলেই তাঁহাকে ধার দিতে অগ্রসর হইল। তিনি সুযোগ পাইয়া দুই মাসের মধ্যেই যত টাকা জামিন দিয়াছিলেন, তাহা পিতাকে ফেরৎ পাঠাইলেন। পিতার অধরে মৃদুহাসি প্রতিভাত হইল। জমিদারি উদ্ধার হইবে,—এ আশা হৃদয়ে দ্বিগুণিত হইল। আশা! এইরূপে তুমি কত লোককেই না মজাইয়াছ!

ঋণ একবার যাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, আর তাহার নিস্তার নাই।—ঋণে কিন্তু অমূল্যের ভ্রূক্ষেপ নাই।

অমূল্যরতনের দিন আপাতত বেশ সুখ সচ্ছন্দে কাটিতেছে—অর্থের অনাটন নাই, কোন প্রকার চিন্তা নাই, যাহা আছে, তাহা কেবল ভবিষ্যৎ সুখ কল্পনার। আজি তাঁহার পক্ষে ইহসংসার নন্দনের রম্য কানন, বসন্তের মলয়ানিল, শরতের পূর্ণ-শশী,—তাঁহার জীবন নদীর সুখ প্রবাহে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিরাজি জ্যোৎস্না কিরণে সতত নৃত্য করিতেছে,—এই মধুর প্রীতিপ্রদ ভাব যেন অপরিবর্ত্তনীয়। বস্তুত অমূল্যরতন যেন সুখ-কল্পনার সর্ব্বোচ্চ স্থানে সমাগত। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা নাই, তাঁহার স্থির ধারণা যে এমনি দিনই যাইবে। হায়রে,—পূর্ণিমার পর আবার কেন অমানিশা দেখা দেয়,—সুখের বসন্ত যাইয়া কেন বর্ষা আসে!

কাণপুরের বাসায় একটি নবম বর্ষীয়া বিধবা গোপকন্যা অমূল্যকে প্রত্যহ দুগ্ধ দিতে আসিত। বালিকাটির নাম "যমুনা"। যমুনা অমূল্যকে বড় ভাল বাসিত; তাঁহার আহারের তত্ত্বাবধান করিত, আহারের সময়ে আসন পাতিয়া দিত, স্থানটি পরিষ্কার করিত, অপর কেহ সে কার্য্য করিলে, সে বড় দুঃখিত হইত। অমূল্য সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কখন কিছু দিতে গেলে, সে তাহা লইত না, মৃদু হাসিয়া বালিকা-স্বভাব-সুলভ চাপল্য প্রকাশ করিয়া ছুটিয়া পলাইত। অমূল্যের সুখ সরোবরে, যমুনা—কমলকোরক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুখের উষা।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সর্ব্বানন্দ মৃদু পাদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে দুইখানি অশ্বযান তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিল। সর্ব্বানন্দ শশব্যস্ত শকটের নিকটে যাইয়া—"আরে কেও নিতাই" বলিয়া সাগ্রহে আগন্তুকে আলিঙ্গন করিলেন। নিতাই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

নিতাইবাবুর বয়স বড় বেশি নয়, চল্লিশের মধ্যে, খর্ব্বাকৃতি, দেখিতে মন্দ নয়। নিতাইবাবু দুইবার বিবাহ করিয়া দুইবারই গৃহশূন্য। তা প্রথমা স্ত্রীর কোন সন্তানাদি হয় নাই, দ্বিতীয়টির একটি মাত্র কন্যা হওয়ার পরই মৃত্যু হয়, কিন্তু নিতাইবাবু তাহার পর আর বিবাহ করেন নাই, কন্যাটিকে তিনি প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন। নিতাই বাবুর সংসারে

কেবল তাঁহার কন্যা ও মাতা,—তাই তিনি একটিকে বড় মা, আর এক-টিকে ছোট মা বলিতেন। বড় মার বয়স প্রায় ষাট বৎসর, ছোট মার ষেটের কোলে দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

সর্ব্বানন্দ কন্যাটির হাত ধরিয়া এবং নিতাই বাবুর মাতাকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে গেলেন। কন্যাটির নাম, প্রভাবতী। প্রভাবতী নিতান্ত ছোট নয়, সর্ব্বানন্দের হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা করিল, সর্ব্বানন্দ বলিলেন "থাক্ না, আমি যে তোমার জেঠা হই।"

* * *

* * *

নিতাইবাবু একদিন কথায় কথায় সর্ব্বানন্দকে বলিলেন "দাদা, আমার একান্ত ইচ্ছা যে প্রভাকে অমূল্যর হাতে দিই।"

সর্ব্বানন্দ ভাবিলেন, কথা মন্দ নয়, প্রভাবতী দেখিতে বেশ সুশীলা; তার পর নিতাইবাবুর একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী, সুতরাং কালে নিতাই বাবুর সমস্তই অমূল্যর হইবে। তিনি বলিলেন "এত ভাল কথা অমূল্যর সঙ্গে প্রভার বিয়ে হ'লে, প্রভা ত ঘরেই রইল।"

নিতাই। আমার ত সেই জন্যই ইচ্ছা, বিশেষত অমূল্য বড় ভাল ছেলে।

সর্ব্বানন্দ। তার কথা আছে, যেমন রূপ, তেমনি গুণ।

বস্তুত এটি সর্ব্বানন্দের অন্তরের কথা।

নিতাই। তবে অমূল্যকে আস্‌তে লিখুন, আমার ইচ্ছা বিবাহটা এই খানেই দিয়ে যাই,—আর দেশে যাই, আর না যাই।

সর্ব্বা। তাত বটেই, সেখানে আছে কে তবে আমি অমূল্যকে লিখি?

নিতাই। এখনি,—

সর্ব্বানন্দ এ শুভ সংবাদ দুর্গাবতীকে দিতে কাল বিলম্ব করিলেন না, নিতাইবাবুর মাতাও এ সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

প্রেমময়ী দুর্গাবতী স্বামীকে বলিলেন "আমি ত তোমায় কতবার বলি-য়াছি, যে আমার অমূল্যর কখন কোন কষ্ট হইবে না।"

সর্ব্বা। আমারও তাই মনে হ'ত।

এইরূপ কত কথাই হইল। কথা একরূপ স্থির, হঠাৎ এক দিন ঘোর বিভ্রাট উপস্থিত হইল। নিতাই বাবু বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন, সেবা

সুশ্রুষার ত্রুটি হইল না, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না, নিতাই বৃদ্ধা মাতাকে কাঁদাইয়া—তাঁহাকে অনন্ত শোক সাগরে ভাসাইয়া— কন্যাটিকে অনাথা করিয়া—অনন্ত ধামে গমন করিলেন. সকলে মহা শোক সন্তপ্তা হইলেন।

নিতাইবাবু মৃত্যুকালে যে উইল করিয়া গিয়াছিলেন, সে উইলে তাঁহার লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ হইতে ৫০,০০০ হাজার টাকা ভাবী জামাতাকে ১০,০০০ দশ হাজার মাতাকে এবং চল্লিশ হাজার কন্যাকে দিয়া যান, এতদ্ব্যতীত স্থাবর অস্থাবর যে কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা সমস্তই প্রভাবতীর।—

সর্ব্বানন্দের কিছু দেনা আছে, সেই জন্যই নিতাইবাবু পঞ্চাশ সহস্র টাকা ভাবী জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। উইলের একজিকিউটর সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা।

পিতৃবিয়োগে ম্রিয়মাণা হইয়া প্রভাবতী অত্যন্ত পীড়িতা হইলেন, সে পীড়া আর সারে না। কাশিপুরে প্রভাবতী প্রায় দুই মাস কষ্ট পাইল, কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারিল না। আরও কিছু দিন গেল। তথাপি প্রভা সম্পূর্ণ সবল বা রোগ মুক্ত হইতে পারিল না। ডাক্তারেরা প্রভাবতীকে স্থান পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিলেন। সর্ব্বানন্দ সস্ত্রীক, প্রভাবতী ও তাঁহার পিতামহীকে লইয়া কাণপুরে প্রভার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গমন করিলেন। এখন প্রভার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর।

যথা সময় সকলে কাণপুরে পেঁছিলেন, অমূল্য পিতৃমাতৃ চরণে প্রণাম করিলেন, তাহার পর প্রভার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন; তাহার পর প্রভার ঠাকুরমার চরণে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মা বলিলেন "এস, ভাই এস, সুখে থাক, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—ওলো প্রভা! তোর দাদাকে প্রণাম কর না"। অমূল্য বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটু হাসি যেন তাঁহার অধরোষ্ঠ ভাসিয়া দেখা দিল। বৃদ্ধা বলিলেন, "এখন দাদা না বলে', আর কি বল্‌ব বল ভাই! এখনও ত সম্পর্ক ফেরে নাই।" প্রভার দিকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন "কি লো! এখনও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যে! প্রণাম কর্ না।" প্রভা একটু জড়সড় হইয়া, বুকের কাপড়টা একটু টানিয়া অমূল্যর পদপ্রান্তে প্রণাম করিল। একালের প্রথানুসারে অমূল্য একটু পিছাইয়া গিয়া, হাত তুলিয়া, একটু প্রতিনমস্কার করিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, 'থাক্ থাক্ আবার প্রণাম কেন।"

সর্ব্বানন্দ দুর্গাবতী, মহানন্দে এই রঙ্গ দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধার কিন্তু আশ মিটে নাই। অমূল্যর সঙ্গে আরও দুটা কথা না কহিয়া, তিনি কিছুতেই সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "দেখ ভাই!" বলিতে বলিতে চোখে জল উছলিয়া উঠিল, "দেখ ভাই! আমি অঞ্চলের রতন হারাইয়া এখন উহার মুখ দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি, তা সেই কাল রাত্রি হইতে প্রভা আমার একদিনের তরেও ভাল করিয়া খায় নাই, একবার হাসি মুখে কথা কয় নাই। আমি রাক্ষসী আপনার সন্তান খাইয়া, পাহাড়ে বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি; তা ভাই, সেত কেবল উহারই মুখ দেখিয়া। আর এই তোমার মুখখানি (ধীরে চুম্বন করিয়া) দেখিব বলে'। ওর বাপ তোমার হাতে প্রভাকে দেবার জন্য কত ব্যাকুলই হইয়াছিল, তার সে সাধ মিটে নাই। আমি এখন অভাগিনী তোমাদের একত্র দেখিলেই, আমার সকল দুঃখই মেটে।" বৃদ্ধা কাঁদিয়া আকুল! প্রভা হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। অমূল্য একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিছু দিন থাকিয়া প্রভাবতী আবার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিল। যদিও প্রভাবতী সত্বর ত্রয়োদশ বৎসর পদার্পণ করিবে বটে, কিন্তু তথাপি তাহার অঙ্গে যৌবনের মধুময় লালিত্যের পূর্ণত্ব হইল না। বোধ হয় অধিক দিন ধরিয়া রোগাক্রান্ত থাকাই তাহার অন্যতম কারণ—যাহাই হউক, ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্র বিবাহ দেওয়াই স্থির হইল।

এ সুখের দিনে, যমুনার আর দুঃখের সীমা নাই। সে আর আহারের স্থান করিতে পায় না; পিঁড়ে দিতে পায় না। প্রভাই এখন সে সকল কার্য্যের ভার লইয়াছে। যমুনা তার জন্য মনে মনে প্রভার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট। আর ও দুঃখ, দুধে জল দেয়—তাহার মা, বকুনি খায়—যমুনা। এত লাঞ্ছনা কি সহা যায়? যমুনা, এখন দুদিন আসে ত একদিন আসে না, যে দিন আসে, সে দিন অমূল্য একবার দেখিলেই সরিয়া যায়। গিয়া কাঁদিয়া ফেলে। যমুনার বয়স তখন দশবৎসর। কলিকায় কীট লাগিয়াছে না কি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইনি আবার কে?

অমূল্যরতনের বিবাহের আর অধিক বিলম্ব নাই, এটি ভাদ্র মাস, অগ্রহায়ণের প্রারম্ভেই বিবাহ হইবার কথা। অমূল্যরতন প্রভাবতীকে আজ

বাসেন, বড়ই ভাল বাসেন, তবু তাহা ভালবাসা মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী কি মহাসাগর প্রেম পারাবারে মিশিবে না?

আজি সন্ধ্যা সমাগমে অমূল্যরতন একাকী একটি প্রান্তরে সন্ধ্যা সমীরণ সেবন করিতে উপস্থিত, তিনি অনেক দূর আসিয়া একটি নবতৃণাচ্ছাদিত বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন, তখনও আকাশপটে সূর্য্যের মূর্ত্তি ছিল, তখনও পশ্চিম দিক রবিকরদীপ্ত; অমূল্য সেই নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া আপন মনে চিন্তাভিভূত হইলেন।

অমূল্য এইরূপে অবস্থিত, এমত সময়ে সন্নিকটে মনুষ্য-কণ্ঠ শুনা গেল। অমূল্যর চিন্তাভঙ্গ হইল. তিনি চাহিয়া দেখিলেন অদূরে একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে একটি মনোহর রূপবতী যুবতী ও একটি বৃদ্ধ—অবস্থিত। তাঁহারা অমূল্যকে দেখিতে পান নাই; অমূল্যর কিন্তু আর পলক পড়েনা, স্থির দৃষ্টে সেই মনোহারিণীর প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, মনে মনে বলিলেন "প্রকৃতি তোর সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই, এ সংসারে যে, সৌন্দর্য্য কি, তাহা বুঝে না—সেই সুখী।" অমূল্য একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সে সময়ে অমূল্যের হৃদয়ে যে কিরূপ ভাব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। হৃদয়মধ্যে যেন মহা হুলস্থূল বাধিয়া গেল, যেন ঘোর প্রলয় উপস্থিত, অমূল্য মনে মনে ভাবিল 'এই অপূর্ব্ব সুন্দরী যাহার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী, এ সংসারে সেই সুখী, তাহার কি কোন দুঃখ আছে? যিনি ইঁহার প্রণয় পাত্র,না জানি তিনি কতই ভাগ্যধর—সাংসারিক কোন দুঃখে তাঁহার কষ্ট নাই, ঘোর রাজ্য বিপ্লবেও তাঁহার মন বিচলিত হয় না। ধন গৌরব, যশ, মান, বন্ধু সমস্ত হারাইলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না, অগাধ কাল সমুদ্রে একটি মাত্র তারকা উপলক্ষ করিয়া জীবন-তরী বাহিত করায় মহা সুখ,—সে তারা বিহনে তরীতে আবশ্যক!' যুবক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবতীর অপরূপ রূপ বিভা অবলোকনে তৃষিত নয়ন জুড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় মন যেন স্বর্গীয় সুধাপানে বিভোর প্রমত্ত হইল, তাহার নিকট সাংসারিক যাবতীয় সুখ তুচ্ছ!

যুবতীর বয়ক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র, কিন্তু দেখিলে তদপেক্ষা দুই এক বৎসর অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হয়। এ চক্ষু কোথায় ছিল রে। কবি কল্পনা যাহা চঞ্চল বলিয়া জানে, তাহা আজি যুবতী বদনে

অচঞ্চল ভাবে শোভা পাইতেছে। মরি মরি কি মোহন হাসি রে! আমার কথা ছাড়িয়া দাও, ইহা কত মহাকবির মহাকাব্যের উপাদান! কোন মূর্খ মুক্তাপাতির সহিত দন্তের তুলনা করে, আমরা বলি সেই সুশ্রেণিবদ্ধ দন্তাবলীর মনোহর স্বর্গীয় শোভা সন্দর্শনে মুক্তা বিষাদে সাগর-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কি! প্রাণ ভুলনি চিবুক, দেখিলেই যেন প্রাণ কোন স্বপ্নরাজ্যে প্রস্থান করে। চিকুর চাঁচর কেশদাম অরচিত, পৃষ্ঠদেশে অবহেলে বিলম্বিত, তথাপি তাহাতে সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। স্বর্ণালঙ্কার দেখা যাইতে ছিল, কিন্তু ইহাতে যুবতীর বিন্দুমাত্র শোভার বৃদ্ধি করে নাই। পূর্ণের আর পূর্ণতর হয় না, সুতরাং অলঙ্কার সে অঙ্গে শোভার সামগ্রী নহে; যিনি সে কম কলবরে অলঙ্কারের ঘটা দেখিতে চান, তিনি সৌন্দর্য্য বুঝেন না। আর অলঙ্কারে যিনি সে অতুল সৌন্দর্য্যের হানি করিতে পারেন, তিনি তস্কর! যুবতীর সহিত যে লোকটি বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পিতামহ অপেক্ষায় বড় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শরীর বেশ বলিষ্ঠ, মুখভাব স্বর্গীয় শোভায় শোভান্বিত, অমূল্য যে সময়ে তাঁহাদিগকে একাগ্রচিত্তে দেখিতে ছিলেন, তখন বৃদ্ধ ও যুবতীর মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

বৃদ্ধ। গীতা বেশ বুঝিয়াছ?

যুবতী। গীতা আমি বড় ভালবাসি।

বৃদ্ধ। এই বার তোমায় বেদ বুঝাইব।

যুবতী। আপনি যে বেদকে দ্বিভাবাত্মক বলেন, তাহা আমি কিরূপে বুঝিব?

বৃদ্ধ। ক্রমে বুঝিবে, প্রথম সরল ভাবগুলি আয়ত্ত কর, পরে সেগুলি বুঝাইব।

যুবতী। সে দ্বিভাব কিরূপ?

বৃদ্ধ। বেদের একস্থানে আছে, "পরাঞ্চি স্বানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি না হন্তরাত্মন্।" ইহাতে কি বুঝিলে?

যুবতী। ইন্দ্রিয়গণ পরের অনুগত হইল দেখিয়া স্বয়ম্ভু তাহাদিগকে হিংসা করিলেন, সেই পর্য্যন্ত তাহারা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না।

বৃদ্ধ। বেশ,—কিন্তু ইহার অর্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল বাহ্য দর্শন সিদ্ধ হয়, অন্তর্পদার্থের জ্ঞান সিদ্ধি হয় না।

যুবতী। এইরূপ?

বৃদ্ধ। হাঁ এইরূপ। আচ্ছা তুমি—সাংখ্য দর্শনের "সূক্ষ্ম শরীর, জীবন, মরণ, পরলোকগতি, মরণ প্রণালী, জন্ম মরণের অন্তরাল" প্রভৃতি বেশ বুঝিয়াছ ?

যুবতী। আপনি কত কষ্ট করিয়াছেন, সমস্তই কি নিষ্ফলে গিয়াছে ?

বৃদ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে একটি আখ্যায়িকা আছে,—সেটি স্মরণ রাখিও। কোন বিদ্যাভিমানীর পিতা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "বাপু এমন কোন পদার্থ জান, যাহা জানিলে সকলই জানা যায় ?" পুত্র কহিলেন "তাহা কি সম্ভব ?" পিতা কহিলেন "একটি মৃন্ময় বস্তু দেখিলে যেমন সমস্ত মৃন্ময় বস্তুর প্রকৃতি জানা যায়, একটি হিরন্ময় বস্তু দেখিলে যেমন সকল হিরন্ময় বস্তুর প্রকৃতি জানিতে পারা যায়। তেমনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের একমাত্র মূল উপাদান জানিতে পারিলে তৎপর্যাভূত সমস্ত পদার্থই জানা যায়।"

যুবতী মৃদু হাসিয়া বলিল "আমি সেরূপ ভাবে "বুঝিয়াছি" শব্দ প্রয়োগ করি নাই, আমার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য।"

বৃদ্ধ। সেটি যেন চিরকাল স্মরণ থাকে, এ পৃথিবীতে জানিবার অনেক আছে, সর্ব্বজ্ঞ কেহই নহেন, যে আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ধারণা করে, সে মহাভ্রান্ত। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদিক শূদ্র মানার্হ, কিন্তু তুমি যে বেদপাঠ করিবে তোমার বেদ পাঠের সময় কৈ ? তুমি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ, তোমার বিবাহ কাল উপস্থিত। সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক,

যুবতী। কিরূপ সংস্কার ?

বৃদ্ধ। কোন বস্তু দেখিলে তাহা চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার গঠন আকার প্রভৃতি যেন অঙ্কিত হয়, একটু ভাল করিয়া দেখিলে তাহা আবার হৃদয়ে পরিণতি লাভ করে। সে বস্তু চক্ষের অন্তরাল হইলেও তাহা হৃদয় হইতে অপসৃত হয় না, ইহারই নাম "সংস্কার।"

যুবতী। এত দার্শনিকদিগের সংস্কার।

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তোমার না হয়, প্রণয়কারিদিগের সংস্কার হইবে।"

যুবতী অধোবদনে নীরব হইল।

* * *

* * *

অমূল্য বুঝিলেন, বালিকা অবিবাহিতা। ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন। যুবতী সহসা জনসমাগমে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু অবগুণ্ঠন দিল না।

বৃদ্ধ বলিলেন "জয়োস্তু,—মহামায়া আসন দাও।"

ঋগ্বেদের দেবগণ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। আকাশ দেবগণ।

প্রাচীন আর্য্যগণ কি উপায়ে প্রথমে ধর্ম্ম-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন? তাঁহাদিগকে কে উপাসনা শিখাইল? তাঁহাদিগের সরল হৃদয় প্রথমে কিসের দ্বারা ধর্ম্মভাবে আলোড়িত হইল?

অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায়, আকাশের আলোকই প্রথমে আর্য্য-হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উত্তেজিত করে, আলোক-পূর্ণ আকাশই আর্য্যদিগের প্রথম উপাস্য।

প্রাচীন "দ্যু" বা "দিব্" ধাতু অর্থে আলোক দান করা, আলোক প্রদাতা আকাশকে "দ্যু" নামে প্রথম আর্য্যগণ উপাসনা করিতেন। সেই আর্য্যদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখা যেখানে গিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই পবিত্র নাম বহন করিয়াছেন, সেই উপাস্যদেবকে উপাসনা করিয়াছেন। আর্য্য হিন্দুগণ ঋগ্বেদে "দ্যু"কে সকল দেবের পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; আর্য্য গ্রীকগণ Zeusকে সকল দেবের অধীশ্বর বলিয়া পূজা করিয়াছেন; আর্য্য রোমকগণ Jove নামে সেই দেবের উপাসনা করিতেন। আর্য্য জর্ম্মাণগণ প্রাচীন জর্ম্মাণির বিস্তীর্ণ অরণ্যে মৃগয়া ও যুদ্ধে জীবন ধারণ করিয়াও সেই দেবকে ভুলেন নাই, Tiu বা Zio বা অন্যান্য নামে সেই প্রথম আর্য্য দেবের উপাসনা করিতেন। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে জগতে জ্ঞানের আলোক বিস্তীর্ণ হইয়াছে; সভ্য আর্য্যগণ আকাশের উপাসনা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে আকাশের দেব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তাকে কতক অনুভব করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু সেই এক ঈশ্বরকে আর্য্যগণ অদ্যাপি সেই পুরাতন আর্য্যনাম দ্বারাই সম্বোধন করেন, আর্য্য হিন্দুগণ তাঁহাকে পরম "দেব", পরমেশ্বর বলিয়া উপাসনা করেন, আর্য্য ইংরাজ ও ফরাসিগণ তাঁহাকে "Deity" বা "Dieu" নামে পূজা করেন।

ঋগ্বেদে "দ্যু" অর্থাৎ আকাশকে সকল দেবের পিতা ও পৃথিবীকে সকল দেবের মাতা বলিয়া অনেক স্থানে স্তুতি করা হইয়াছে; দুই একটি সুন্দর স্তুতি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিব,—

"যজ্ঞপরায়ণ মনুষ্যের জন্য বায়ু মধু ক্ষরণ করে, বহমান নদীগণ মধু ক্ষরণ করে; শষ্যফলাদিও যেন আমাদিগের জন্য মাধুর্য্য বিশিষ্ট হয়।

"রাত্রি মধুর হউক, উষা মধুর হউক; এই পৃথিবী মাধুর্য্য বিশিষ্ট হউক, আমাদিগের পিতা দ্যু মধুর হউন।

"বনস্পতি মাধুর্য্য বিশিষ্ট হউন, সূর্য্য মাধুর্য্য বিশিষ্ট হউন, আমাদিগের গাভী সমূহ যেন মধুর দুগ্ধ বিশিষ্ট হয়।"

১ মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, ৬, ৭, ৮ ঋক্।

"দ্যু ও পৃথিবী যজ্ঞ বর্দ্ধন করেন, তাঁহারা মহৎ, তাঁহারা যাগকর্ম্মে আমাদিগকে প্রজ্ঞা সম্পন্ন করেন; আমি যজ্ঞে তাঁহাদিগের স্তুতি করি। দেবগণ তাঁহাদিগের পুত্র, তাঁহারা দেব সমন্বিত ও শোভনকর্ম্মা; তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে বরণীয় ধন দান করুন।

"আমি আহ্বান মন্ত্রদ্বারা পিতার সদয় প্রকৃতি, মাতার মহৎ ক্ষমতা চিন্তা করি। উৎপাদনক্ষম সেই পিতা মাতা সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং স্বীয় বদান্যতায় সন্তানদিগকে অমৃত দান করিয়াছেন।"

১ মণ্ডল, ১৫৯ সূক্ত, ১, ২ ঋক্।

"বিস্তীর্ণ ও মহৎ পিতা মাতা পরস্পর বিযুক্ত হইয়াও ভুবন সমুদয় রক্ষা করিতেছেন। বিক্রমশালী দ্যু ও পৃথিবী আমাদিগের শরীর রক্ষা করেন, পিতা নানারূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান করিতেছেন"।

১ মণ্ডল, ১৬০ সূক্ত, ২ ঋক্।

৬ মণ্ডলের ৫১ সূক্তের ৫ ঋকে এই রূপ আছে,—"দৌঃ পিতঃ পৃথিবী মাতার ক্রুগ্ অগ্নে ভ্রাতঃ বসবো মৃলতা নঃ"। অর্থাৎ হে পিতঃ দ্যু, হে সদয় মাতঃ পৃথিবী, হে ভ্রাতঃ অগ্নি, হে বসুগণ, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। এই "দৌষ্পিতর" ইউরোপের প্রসিদ্ধদেব Jupiter * তিনি এই

---

* পণ্ডিতবর মক্ষমূলর Westminister Abbey নামক খৃষ্টীয় মন্দিরে যে এই বিষয়ে একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী পবিত্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার এক অংশ আমরা এস্থানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"Five thousand years ago, or it may be earlier, the Aryans speaking as yet neither Sanscrit, Greek, nor Latin, called him Dyu Patar, Heaven Father.

নামের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তরে দেশ বিদেশে, সমস্ত আর্য্য জগতে পূজিত হইয়াছেন।

এ চিন্তাটি কি মহৎ, কি পবিত্র, কি বিস্ময়কর! আর্য্য আর্য্যের ভ্রাতা; সিন্ধুর উপকূল বাসী আর্য্য টাইবর নদীর তীরবাসী আর্য্যের ভ্রাতা; এই ভ্রাতৃগণ আলোকপূর্ণ আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া সভ্যতার প্রারম্ভকালে একটি পবিত্র নাম জগতের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত বহন করিয়াছেন, সেই পবিত্র নাম প্রাচীন হিন্দুদিগের যজ্ঞস্থলে, গ্রীক দিগের ওলিম্পীয় মহোৎসবে, রোমকদিগের জগদ্বিজয়ী যুদ্ধ পতাকার সঙ্গে সঙ্গে, অসভ্য প্রাচীন জর্ম্মণদিগের অনন্ত অরণ্য প্রদেশে—চারি সহস্র বৎসর অবধি শব্দিত হইয়াছে! জগতের ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা আর নাই; শিক্ষিত জগতের শিক্ষাগুরু হিন্দুদিগের ইহা অপেক্ষা গৌরবের কথা আর নাই।

দ্যু যেরূপ আর্য্যদিগের একজন প্রাচীন দেব ছিলেন, বরুণ ও সেইরূপ। তিনিও আকাশদেব; তবে দ্যু আলোকপূর্ণ (দিব অর্থে আলোক) আকাশ; বরুণ আবরণকারী (বৃ ধাতু আবরণে) আকাশ। ঋগ্বেদে অনেক স্থলে

"Four thousand years ago, or it may be earlier the Aryans who had travelled south-wards to the rivers of the Panjab called him Dyush Pita, Heaven-father.

"Three thousand years ago, or, it may be earlier the Aryans on the shores of the Hellespont called him Zeus, Heaven-father.

"Two thousand years ago the Aryans of Italy looked up to that bright heaven above *noc sublime candens,* and called it Ju-piter, Heaven-father.

"And a thousand years ago, the same Heaven-father and All-father was invoked in the dark forests of Germany by our own peculiar anscestors the Teutonic Aryans, and his old name *Tiu* or *Zio* was then heard perhaps for the last time.

"But no thought, no name is entirely lost. And when we here, in this ancient Abbey, which was built on the ruins of a still more ancient Roman temple, if we seek for a name for the invisible, the infinite, that surrounds as on every side, the unknown, the true Self of the world, and the true Self of ourselves, we too, feeling once more like children, kneeling in a small dark room can hardly find a better name than "Our Father which art in Heaven." *Origin and Growth of Religion* (*1882*; *P. 223.*

বরুণের সহিত মিত্রের একত্র স্তুতি দেখা যায়, এবং সায়ন বরুণ অর্থে নিশা (বা নৈশ আকাশ) এবং মিত্র অর্থে দিবা করিয়াছেন। গ্রীকদিগের Uranos সংস্কৃত বরুণের প্রতিরূপ, এবং গ্রীক কবি হিসীয়ডও Uranosকে আবরণকারী দেব বলিয়া এবং নিশার প্রণেতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (হিসীয়ড ৫।:২৭) ইরাণীয়দিগের মধ্যে বরণ প্রথমে আকাশের নাম ছিল, পরে একটি কাল্পনিক দেশের নাম হইয়া গিয়াছে; ইরাণীয় ধর্ম্ম পুস্তক জেন্দ অবস্থা হইতে আমরা এই বিষয়ে একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।

"আমি অহুর মজ্‌দ যে সকল উৎকৃষ্ট প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছি, তন্মধ্যে চতুষ্কোণ বরণ প্রদেশে চতুর্দ্দশ সংখ্যক; অহিদহকের সংহারকারী থ্রেতৈয়ন (ঋগ্বেদের অহিহন্তা ত্রৈতন) সেই দেশের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন"।

জেন্দ অবস্তা, প্রথম ফর্গাদ।

আমরা পরে দেখাইব, থ্রেতৈয়ন একজন আকাশদেব, অতএব তাঁহার দেশ চতুষ্কোণ বরণ চারিদিক-সম্পন্ন আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঋগ্বেদে বরুণ সম্বন্ধে যে স্তুতিগুলি আছে তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতিশয় সুন্দর, অতিশয় পবিত্র ও ভক্তি-ব্যঞ্জক। আমরা দুই একটি মাত্র উদ্ধৃত করিতে পারিব।

"হে বরুণ? এই উড্ডীয়মান পক্ষী সকলও তোমার বল ধারণ করে না, তোমার পরাক্রম ধারণ করে না, তোমার কোপ সহনে অসমর্থ! অনিমিষ বিচারী এই নদী সমূহ অথবা বায়ুর (অনন্ত) গতি, তোমার বেগ অতিক্রম করিতে পারে না।

"পবিত্রবল বরুণ রাজ মূল রহিত অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া উর্দ্ধে তেজ রাশি ধারণ করিয়া আছেন। সেই নিম্নাভিমুখ রশ্মি সমূহের মূল উর্দ্ধে; যেন তদ্দারা আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারি।

"বরুণ রাজা সূর্য্যের জন্য ক্রমান্বয়ে উদয় ও অস্তগমনার্থ বিস্তীর্ণ পথ করিয়াছেন; পাদবিক্ষেপের স্থানে রহিত অন্তরীক্ষে তিনি পাদ বিক্ষেপের জন্য পথ করিয়াছেন; তিনি আমাদিগের হৃদয় বিদ্ধকরী শত্রুকে তিরস্কার করুন।

"হে রাজন্! তোমার শত সহস্র ওষধি আছে, আমাদিগের প্রতি তোমার বিস্তীর্ণ ও গভীর অনুগ্রহ হউক। পাপ দেবতাকে পরাঙ্মুখ ও দূরে স্থাপিত করিয়া প্রতিরোধ কর, আমাদিগের কৃত পাপ মোচন কর।

ঐ যে সপ্তনক্ষত্র * ঊর্দ্ধে স্থাপিত হইয়াছে, নিশাকালে দেখা যায়, দিবসে তাহারা কোথায় যায়; বরুণের কার্য্যসমূহ বাধাশূন্য ও ভিন্য, তাঁহারই আজ্ঞায় নিশাকালে চন্দ্র দীপ্তিমান হইয়া আগমন করেন"।

১ মণ্ডল, ২৪ সূক্ত, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ঋক্।

এই চারি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের কবিতা পাঠক একবার আলোচনা করুন, ইহার সৌন্দর্য্য, উদারতা ইহার ভক্তি ও পবিত্রতা একবার অনুভব করিয়া দেখুন। মনুষ্য হৃদয়স্বরূপ আকর হইতে ইহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ পবিত্র-রত্ন কি কখন উৎপন্ন হইয়াছে? এই রত্ন আমাদিগের জাতীয় ধন, কিন্তু এতদিন আমরা এই ধন চিনিতাম না। আধুনিক শিক্ষা বলে সমস্ত ভারতবাসী এই ধন ভোগ করিতে উৎসুক হইয়াছেন। যাঁহারা এখনও এই রত্ন জনসাধারণের নিকট হইতে গোপন করিয়া রাখিতে চাহেন তাঁহারা প্রবাহিতা নদীর বেগ বালকের ন্যায় হস্তদ্বারা প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বরুণসম্বন্ধে আর একটি সুন্দর স্তুতি আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিব। পবিত্র মতি বশিষ্ঠ ঋষি পাপ খণ্ডনের জন্য সেই পবিত্র দেবের আরাধনা করিতেছেন,—

"হে বরুণ! সেই পাপ জানিবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, জ্ঞানীর নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। জ্ঞানীগণ একবাক্যে আমাকে বলিয়াছেন, বরুণ তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন"

---

* এই সপ্ত নক্ষত্র সম্বন্ধে একটি রহস্য আছে ইউরোপে ঐ সপ্ত নক্ষত্রকে বৃহৎ ভল্লুক (Great Bear) বলে। তাহার কারণ কি? নক্ষত্রগুলি একটি লাঙ্গলের ন্যায় দেখিতে, ভল্লুকের ন্যায় নহে, তবে উহাদিগকে ভল্লুক বলে কেন? সংস্কৃত না শিখিলে ইউরোপীয়গণ সে কারণটি কখনই বুঝিতে পারিতেন না। সংস্কৃতে ঋচ্ ধাতু অর্থে উজ্জ্বল হওয়া, এবং সেই জন্য জলন্ত স্তুতিকে "ঋক্" (ঋক্ বেদ) বলে, নক্ষত্রগুলিকে "ঋক্ষ" বলিত, এবং উজ্জ্বল কেশরবিশিষ্ট ভল্লুককেও "ঋক্ষ" বলিত। কালক্রমে লোকে "ঋক্ষের" নক্ষত্র অর্থটি ভুলিয়া গেল, কিন্তু ঐ শব্দের ভল্লুক অর্থটি রহিল; তখন সপ্ত নক্ষত্রকে প্রাচীন নাম "ঋক্ষ" বলিয়া ডাকিত, কিন্তু কেন উহাকে ঋক্ষ (ভল্লুক) বলে, তাহার কারণটি ভুলিয়া গেল। একদল আর্য্য যখন মধ্য আসিয়া হইতে গ্রীসে গেলেন, তখন এই ঋক্ষ শব্দটি (Arktos) তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে ইউরোপবাসীগণ সেই সপ্তনক্ষত্রকে অদ্যাবধি Great Bear অর্থাৎ ভল্লুক কহে।

"হে বরুণ! সেটি কোন্ মহৎ পাপ, যেজন্য তোমার স্তোতা, তোমার সখাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? হে দুর্দ্ধর্ষ স্বধাব দেব! সেটি আমাকে বল, আমি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অর্চ্চনার সহিত তোমার নিকট উপনীত হই।"

"আমাদিগকে পৈতৃক পাপ হইতে মুক্ত কর, আমরা নিজশরীরে যে পাপ করিয়াছি, তাহা হইতে মুক্ত কর। হে রাজন্! পশু-ভক্ষক চোরের ন্যায় বশিষ্ঠকে মুক্ত কর, গো বৎসকে যেরূপ বন্ধন-রজ্জু হইতে মুক্ত করে, বশিষ্ঠকে সেইরূপ মুক্ত কর।"

"হে বরুণ! আমাদিগের নিজের ইচ্ছায় নহে, সুরা বা ক্রোধ, দ্যূত-ক্রীড়া বা অজ্ঞানতায় আমাদিগকে কুপথে লইয়া গিয়াছে। বলবান্ দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব লাভ করে, নিদ্রা হইতেও পাপের উৎপত্তি হয়।"

৭ মণ্ডল, ৮৬ সূক্ত, ৩,৪,৫,৬ ঋক্।

উপরের লিখিত স্তুতিগুলি হইতে প্রকাশ হইবে যে, ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে বরুণ সম্বন্ধে অতিশয় পবিত্র স্তোত্র আছে, সেরূপ পবিত্র স্তোত্র প্রায় অন্য কোন দেব সম্বন্ধে নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে বরুণও মিত্রের একত্র উপাসনা আছে,। ইরাণীয়দিগের জেন্দ অবস্তায় ইরাণীয় ঈশ্বর অহুরমজ্দ ও মিথ্রের সেইরূপ একত্র স্তুতি আছে। এই সকল কারণ হইতে কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন, যে বরুণই এক সময়ে আর্য্যদিগের শ্রেষ্ঠ আকাশ দেব ছিলেন, আলোক পূর্ণ আকাশকে "মিত্র ও বরুণ" বলিয়া উপাসনা করা হইত। কালক্রমে ইরাণীয়গণ সেই শ্রেষ্ঠ দেবকে অহুর মজ্দ নাম দিলেন সুতরাং বরুণ একটি কাল্পনিক প্রদেশের নাম হইয়া গেল; এবং হিন্দুগণও বৃষ্টিদাতা আকাশকে ইন্দ্র বলিয়া একটি নূতন নাম দিলেন, সুতরাং আবরণকারী আকাশ-দেব বরুণের উপাসনা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল এবং অবশেষে তিনি কেবল জলের দেবতা হইয়া দাঁড়াইলেন। পৌরাণিক বরুণ আকাশও নহেন, নৈশ আকাশ বা নিশা ও নহেন, তিনি জলের দেব মাত্র।

আকাশদেব ক্রমে জলের দেব হইলেন কিরূপে? এবিষয়েও পণ্ডিতদিগের অনেক আলোচনা আছে। আকাশের বায়বীয় পদার্থের সহিত জলের অনেক সাদৃশ্য আছে, ঋগ্বেদে অন্তরীক্ষকে অনেক স্থলে জল বা সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হেতুই বোধ হয় বেদের আকাশদেব ক্রমে পৌরাণিক জলদেব হইয়া দাঁড়াইলেন। ঋগ্বেদেও স্থানে স্থানে তাঁহাকে জলের দেব বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে।

আর্য্যদিগের আর একজন প্রাচীন আকাশদেব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপাসনা ঋগ্বেদে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে! ত্রৈতন বা ত্রিত আপ্তের উল্লেখ ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, এবং তিনি ইন্দ্র বা বায়ু বা মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া বৃত্রাদি দানবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। আমরা একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ত্রিত আপ্ত্য পৈতৃক অস্ত্রের ব্যবহার জানিয়া এবং ইন্দ্রদ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া ত্রিমস্তকযুক্ত সপ্তরশ্মি বিশিষ্ট দানবের সহিত যুদ্ধ করিলেন; এবং তাহাকে হনন করিয়া ত্বষ্টার পুত্রেরও গাভী সকল লইয়া গেলেন।"

১০ মণ্ডল, ৮ সূক্ত, ৮ ঋক্।

অতএব দেখা যায় যে, ইন্দ্র যে ত্রিমস্তকযুক্ত অহিকে হনন করিয়াছিলেন বলিয়া ঋগ্বেদে ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে, ত্রিতও সেই কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানে স্থানে বর্ণনা আছে। অতএব ইন্দ্রই ত্রিত এরূপ বিবেচনা করিবার কতক কতক কারণ ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়।

ইরাণীয়দিগের জেন্দ অবস্তার উপাস্যদিগের মধ্যে ইন্দ্রের নাম নাই; ত্রিত বা ত্রৈতন (থ্রেতেয়ন) তথায় অহিহন্তা। সে বিষয়ে আমরা প্রথম প্রস্তাবে জেন্দ অবস্তা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, এই প্রস্তাবেও একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। আবার এই জেন্দ অবস্তার থ্রেতেয়ন ফের্দৌসীর শাহনামা নামক কাব্যে ফেরুদীন নামক ঐতিহাসিক রাজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহাও আমরা প্রথম প্রস্তাবে প্রকাশ করিয়াছি।

গ্রীকদিগের ধর্ম্মপুস্তকেও এই ত্রৈতনের নাম পাওয়া যায়। Triton সমুদ্রের দেব, এবং স্বর্গদুহিতা Minervaকে ও Tritogenia অর্থাৎ ত্রিত-কন্যা বলা যায়। অতএব বুঝা যায়, যে আকাশের পুরাতন ত্রিত-নামটি গ্রীকদিগেরও স্মরণ ছিল। কিন্তু আকাশদেব Zeusএর প্রাধান্য বশত গ্রীসে Triton দেবের মহিমার হ্রাস হইল, এবং ভারতবর্ষে আকাশদেব ইন্দ্রের প্রাধান্য বশত পুরাতন ত্রিতদেবের মহিমা হ্রাস হইল, এমন কি তিনি কাহারও মতে একজন ঋষিমাত্র! কেবল ইরাণে ত্রিতের মাহাত্ম্য রহিল, তথায় অহিহন্তার নাম ইন্দ্র নহে, থ্রেতেয়নই অহিহন্তা।

(ক্রমশ)

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

দুই অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

১ম অধ্যায়।

কালীঘাট।

আমি ও আমার কাকা রামকল উভয়ে কালীঘাট গিয়াছিলাম। আমার নাম নীলকমল। আমাদের সঙ্গে আরও লোক জন ছিলেন। তাঁহারা মন্দি-রের মধ্যে কালীর পূজা করিতেছিলেন। আমরা এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম।

যেখানে ছাগবলি দেওয়া হয়, তাহার অনতিদূরে থামের আড়ালে একটি শীর্ণকায় যুবাপুরুষ দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে কি বলিতে ছিল! আমরা তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। শুনিলাম যুবা বলিতেছে "মা! আমার সবল নিয়াছ। এখন কুপ্রবৃত্তিগুলিও নাও।" দুই চারি মিনিট যায়, আর যুবাটি এক একবার অতি সকরুণস্বরে বলে "মা! আমার সকলই নিয়াছ। এখন কুপ্রবৃত্তি গুলিও নাও।" আমরা স্তম্ভিত হইয়া যুবার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে, যুবা উঠিয়া বসিল। তাহার চক্ষু তখনও নিমীলিত। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন সে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইয়াছে। আমি রাম কাকাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম 'রাম কাকা! এ আমাদের বিশ্বম্ভর হালদার নয়?" রাম কাকা, যুবার মুখের দিকে বিশেষ করিয়া তাকাইয়া বলিলেন,— "হাঁ হাঁ বিশ্বম্ভরই ত বটে।" বিশ্বম্ভরের এই অবস্থা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। কারণ বিশ্বম্ভর অতি অল্প বয়সেই ডেপুটি মাজিষ্টেট হইয়াছিল! বিশ্বম্ভর বিদ্যা বুদ্ধি তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণে অল্প বয়সেই দেশ বিখ্যাত হইয়াছিল। যে বিশ্বম্ভরকে ইংরাজ বাঙ্গালি, সকলেই ভক্তি করিত, আজি সেই বিশ্বম্ভরকে আমরা এই অবস্থায় দেখিব ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

সে যাহা হউক, আমরা উভয়েই বিশ্বম্ভরের নিকট উপবিষ্ট হইলাম। রামকাকা আস্তে আস্তে বিশ্বম্ভরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিশ্বম্ভর, তুমি এখন যে বাড়ীতে আসিয়াছ? এখন কি ছুটি লইয়া আসিয়াছ।" বিশ্বম্ভর যেন চকিত হইয়া উঠিল, এবং নিদ্রোত্থিতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ আমাদিগের দিকে নিশ্চেষ্ট ভাবে তাকাইয়া রহিল। পরে আমাদিগকে চিনিতে পারিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে রামকাকার গলা জড়াইয়া ধরিল। রামকাকাও কাঁদিতে লাগিলেন, এবং বিশ্বম্ভরের সকরুণ ক্রন্দন-স্বরে, এবং নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতা দেখিয়া আমারও চক্ষে জল আসিল। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে, বিশ্বম্ভর রামকাকাকে বলিল 'রাম। তুমি কিছু শুন নাই'" আমরা উভয়েই বলিলাম—"না আমরাত কিছুই শুনি নাই।" তখন বিশ্বম্ভর বলিল 'আমি পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে হুগলি হইতে নৌকা করিয়া বাড়ী আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে একটা জাহাজের সঙ্গে টক্কর লাগিয়া আমাদের নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। স্ত্রী পুত্র কন্যা কোথায় ভাসিয়া গেল, নির্ণয় হইল না। আমিও তিনদিন পরে সংজ্ঞা লাভ করিলাম। তাহার পর আমি চাকরি ছাড়িয়া দিলাম, এবং সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলাম। আমি সংসার পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু সংসার আমাকে পরিত্যাগ করিল না। আমার মন এখন কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তা, দুরাশা প্রভৃতি পাপে কলুষিত। আমি অনেক তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও শান্তি পাই নাই। অবশেষে কালিকার শরণ লইয়াছি। কিন্তু কর্ম্মফল কোথায় যাইবে? বোধ হয় বহুজন্মার্জ্জিত পাপ বশতই আমার হৃদয়ের কলুষ যাইতেছে না।"

রামকাকা বলিলেন। "তোমার হৃদয়ে কলুষ, তোমার কুপ্রবৃত্তি,—তোমার বিরুদ্ধে এসব কথা তোমার শত্রুতেও বলিতে পারে না। তুমি মিছা আত্ম-নিন্দা করিতেছ কেন?"

বিশ্বম্ভর বলিল "যতদিন আমার শরীরে ও মনে বল ছিল, ততদিন কুপ্র-বৃত্তিগণের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিতাম, কিন্তু এক্ষণে ভাঙ্গা ঘর পাইয়া আমার মনে অনেক ভূত আসিয়া বাসা করিয়াছে। আমার নিজের চেষ্টায় তাহাদিগকে তাড়াইতে পারিতেছি না, তাই কালিকার আশ্রয় লইয়াছি, কিন্তু তথাপি কোন ফল পাই-তেছি না।"

রামকাকা বলিলেন—"কলিতে কুকার্য্য না করিলে শুদ্ধ কুপ্রবৃত্তিতে পাপ হয় না।"

বিশ্বম্ভর বলিল—"কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ না করিলে কলিতে পুণ্যও হয় না। আমার কুপ্রবৃত্তিগুলি কিরূপ তাহা তোমাকে খুলিয়া বলি। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর অবধি সর্ব্বদাই আমার মনে হয়, যেন আমরা আবার উভয়ে মিলিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুখ সম্ভোগ করিতেছি! কল্পনার সাহায্যে কখনও বা এদেশে কখনও বা অন্যদেশে, কখনও বা পৃথিবীতে কখনও বা স্বর্গে আমার স্ত্রীর সাহচর্য্য উপভোগ করি।"

রামকাকা বলিলেন। "ইহার নাম কি কুপ্রবৃত্তি? মৃত স্ত্রীকে বিস্মৃত হওয়াই কুপ্রবৃত্তির লক্ষণ। তাঁহার কথা বারম্বার ভাবা বা কল্পনার সাহায্যে তাঁহার সহিত কথোপকথন করাকে সুপ্রবৃত্তি বলিতে আমি কিছুমাত্রই কুণ্ঠিত নহি।"

বিশ্বম্ভর বলিল। "কিন্তু আমি শুদ্ধ যে আমার স্ত্রীর কথা ভাবি, তাহা নহে। অনেক সময়ে অন্য অন্য রমণীর কথাও ভাবিয়া থাকি। কখনও মনে করি, যেন কোন আশ্চর্য্য ঘটনা-পরম্পরাদ্বারা আমি কোন সুন্দরীর সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইতেছি, অথবা কোন সুন্দরী আমার সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইতেছে। আমি যেখানেই যাই, বা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, ঐরূপ অপবিত্র চিন্তা, ঐরূপ বীভৎস কল্পনাদ্বারা আমার হৃদয় পরিপূর্ণ থাকে। তুমি ইহা শুনিয়া আমাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু আমি এজন্য আপনাকে যেরূপ ঘৃণা করি, বোধ হয় তুমি ততদূর ঘৃণা করিতে পারিবে না।"

রামকাকা ইহা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। আমি বলিলাম—"এইরূপে রমণী চিন্তা করা বোধ হয় মনুষ্যের অন্ততঃ যৌবনের, স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। মোহমুদ্গরকার অনেককাল পূর্ব্বে কাঁদিয়াছিলেন,—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ, তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ,
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।

বঙ্কিমবাবুও তাঁহার "বুড়াবয়সের কথায়" এই রোগের অথবা চিত্তমালিন্যের সাক্ষ্য দিয়াছেন।"

বিশ্বম্ভর বলিল—"আমার ন্যায় পাপী অনেক আছে, একথা শুনিয়া আমার শান্তি হইবে কেন? আরও দেখ, আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। এখনও

যদি কিছু সুমতি, কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য কে?

পাপের বন্ধন বড় দৃঢ় বন্ধন। দয়া মায়ার বন্ধন অক্লেশে উন্মোচন করা যায়, কিন্তু পাপের গ্রন্থি বড় জটিল। এক দিক খুলিলে আর এক দিকে যোড় লাগে। এ বিপদে ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ পরিত্রাণ করিতে পারেন না। তাই কালিকার শরণ লইয়াছি। কিন্তু কিছুতেই কুপ্রবৃত্তি পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

রামকাকা বলিলেন। "তুমি যে কুপ্রবৃত্তিকে কু বলিয়া বুঝিয়াছ, ইহাতেই বুঝিতে হইবে, যে ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয় হইয়াছেন। প্রার্থনা করি, তোমার মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে সফল হউক।"

তাঁহার পরে, আমরা কিয়ৎক্ষণ অন্য অন্য আলাপের পর, বিশ্বম্ভরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্য অন্য সঙ্গীদের সমভিব্যাহারে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

২য় অধ্যায়।

তারকেশ্বর।

তারকেশ্বর পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছে। আমি, রামকাকা, ও আমাদের আরও পাঁচ সাতজন সমবয়স্ক বন্ধু, আমরা সকলে একদিন তারকেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তারকেশ্বরের সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বপ্রধান দৃশ্য—হত্যা দেওয়া। প্রায় পঞ্চাশ ষাটি জন লোক, ইতস্তত, কেহ বা পুত্রের, কেহ বা পতির, কেহ বা মাতার, কেহ বা পত্নীর,—মঙ্গল কামনায় হত্যা দিতেছে। এরূপ হৃদয়বিদারক মর্ম্মভেদী দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। যাঁহাদের জীবন মরুভূমি হইয়াছে, যাঁহারা পৃথিবীর কাহারও নিকট আর কোনরূপ সাহায্যের আশা করেন না, যাঁহাদের পতি পুত্র-কন্যা অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত, অথবা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাঁহারাই তারকেশ্বরে হত্যা দিয়া থাকেন। ইহাদের মুখে এমন বিষাদের ও নৈরাশ্যের চিহ্ন প্রকটিত থাকে, যে ইহাদিগকে দেখিলে নিতান্ত পাষাণেরও চিত্ত দয়ার্দ্র হয়; নিতান্ত নাস্তিকেরও হৃদয়ে ধর্ম্মের জন্য ও ঈশ্বরের জন্য প্রীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। দেব-মন্দিরের সম্মুখে, এই বিষণ্ণ নিরাশ পাপী তাপীদিগের সন্নিধানে, যাহার হৃদয়ে অসদ্রিপুর বা অসদিচ্ছার উদয় হয়, সে নিশ্চয়ই নরপ্রেত ও নরপিশাচ

আমরা স্নান পূজা সমাধান করিয়া আহারের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আমাদিগকে পশ্চাৎ করিয়া ও দেবমন্দিরের সম্মুখীন হইয়া, রামপ্রসাদীস্থরে একটি গান করিতে আরম্ভ করিল। আমরা নিষ্কর্ম্মা, সুতরাং আগ্রহ সহকারে গান শুনিতে লাগিলাম।

গান।

বাবার দয়া বল্‌তে নারি।
(আমার) দয়াময় সে ত্রিপুরারি॥
মা দিল খেদায়ে যবে, বাবা নিল কোলে করি।
(আমার) সর্ব্ববাঞ্ছা পূর্ণ হলো, হাতে পেলাম স্বর্গপুরী॥
মা বেটি পাষাণের মেয়ে, হাতে জল গলে না তারি।
(কিন্তু) সর্ব্বস্ব ভক্তেরে দিয়ে, বাবা হলেন কৌপিনধারী
যাগ যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম, ভজন পূজন নাইক যারি।
তারো এক ডাকেতে বাবা, হয়ে থাকেন আজ্ঞাকারী॥
বিশু বলে ওহে বাবা, পাপের বোঝা বইতে নারি।
রেখো পদাশ্রয়ে দাসে, এই যাচিঞা সদা করি॥

যখন গায়ক ব্রাহ্মণ আমাদের সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন আমিও রামকাকা আমরা উভয়েই তাহাকে বিশ্বম্ভর বলিয়া চিনিতে পারিলাম। বিশ্বম্ভরের আকৃতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা বড় সুখী হইলাম। বিশ্বম্ভরের চোখে মুখে এক আশ্চর্য্য লাবণ্য বিভাসিত হইতেছিল। তাহার শরীরও এক অপূর্ব্ব কান্তি দ্বারা বিমণ্ডিত রহিয়াছে, বলিয়া বোধ হইল। আমরা অতি সমাদরে বিশ্বম্ভরকে নিকটে বসাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলাম।

রামকাকা বলিলেন। "বিশ্বম্ভর তোমার বড় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতেছি।"

বিশ্বম্ভর। যাহা কিছু দেখিতেছ; সমস্তই তারকনাথের কৃপা। যেরূপে আমি ঘোর পাপী হইয়াও এই কৃপা লাভ করিলাম, তাহা তোমাদিগের নিকট বলিতেছি।

তোমাদের সঙ্গে যেদিন কালীঘাটে সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন রাত্রিতে আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম। আমি দেখিলাম যেন কালিকা দেবী স্বয়ং আমার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছেন, এবং বলিতেছেন,—"বৎস!

কেন তুমি আমার মন্দিরে বৃথা কষ্টভোগ করিতেছ? তারকেশ্বরের তারকনাথ, তোমার ইষ্ট-দেবতা। তাঁহার নিকটে গমন কর। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় ও কামারি। তাঁহার নিকটে গেলে, তোমার কামভয় ও মৃত্যুভয় উভয়ই দূর হইবে।" এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরদিনেই আমি যাত্রা করিলাম। নারিকুল পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া, পরে ঘোড়ার-গাড়ীতে উঠিলাম।

কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া অবধি, আমার কুপ্রবৃত্তি সমস্ত যেন শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। আমি লজ্জায় ও ভয়ে নিতান্ত অস্থির হইলাম। কখনও কখনও মনে করিতে লাগিলাম, যে এই পাপপূর্ণ জীবন বিষপানে বিসর্জ্জন করিব। এই অবস্থায় তারকনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের নিকটে আসিয়াই দেখিলাম যে, প্রায় শতাধিক লোক বাবার মন্দিরে হত্যা দিতেছে। ইহাদের বিষণ্ণ ও মলিন মুখ দেখিয়া আমার কুপ্রবৃত্তি সমস্ত কতক প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু একেবারে তিরোহিত হইল না। পরে মন্দিরের সমীপস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেলাম। স্নানের সময় পুরোহিত বলিল,—"এই সময়ে তোমার মনোভীষ্ট বাবার নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া রাখ।" আমিও ভক্তি-ভরে নিতান্ত আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিলাম,—"হে ভগবন্! আমার কুপ্রবৃত্তি সমস্ত উন্মূলিত কর।"

পরে পূজার সময়, যৎকালে পুরোহিত মন্ত্র বলাইতেছে, তৎকালে আমাকে কে যেন উপদেশ দিল,—"যে সকল রমণী তোমা অপেক্ষা বয়সে বড়, তাঁহাদিগকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে, আর যাঁহারা তোমা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা তাঁহাদিগকে কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিবে।" আমি আমার সাধনীয় মন্ত্র পাইলাম। সেই দিন অবধি যখনই আমার মনে কোনরূপ কুচিন্তার উদয় হইত, তখনই দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রাণের সহিত বলিতাম,—"আমার বয়োজ্যেষ্ঠা—আমার মাতা। আমার বয়ঃকনিষ্ঠা—আমার কন্যা।" এই মন্ত্র দুই বৎসর অহর্নিশি সাধন করিলাম। এবং এইরূপে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা, সমস্ত কলুষ মন হইতে অন্তর্হিত হইল। আমি নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গের আলোক দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে আমার আর বিষাদ নাই, নৈরাশ্য নাই, অনুতাপ নাই, উদ্বেগ নাই। আমার হৃদয় এক্ষণে আনন্দ, শান্তি, ও পবিত্রতার বিলাস ভূমি। এক্ষণে বাবার প্রশংসা গান করাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছে। আমি মন্দিরের নিকটে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছি। সেখানে দেবাদিদেবের পবিত্র সান্নিধ্যে মহানন্দে দিনপাত করি।"

এই বিবরণ শুনিয়া আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। পরে ভক্তিভাবে বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করিয়া ও ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া আমরা গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। বুঝিলাম, নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বলিতে একটু দুঃখ হয়, একটু সঙ্কোচও হয়, কিন্তু কথাটা ঠিক,—যে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার শেষ কবি। মধুসূদন বাঙ্গালার মিল্টন; হেমচন্দ্র পিণ্ডার; নবীনচন্দ্র বায়রন, রবীন্দ্রনাথ শেলি;—বেশ কথা—কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার কি? ঈশ্বর গুপ্ত—বাঙ্গালার ঈশ্বরগুপ্ত। ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের নিন্দা; ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসা। তাঁহার কবিত্ব বাঙ্গালির নিজস্ব। সেটুকু দরিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রা হইলেও তাহার নিজস্ব। আর নিজস্ব বলিয়াই বড় আদরের সামগ্রী।

তবে কি হেমবাবুর কবিতা আমাদের নিজস্ব নহে? আমাদের আদরের সামগ্রী নহে? নিজস্বও বটে, বিশেষ আদরের সামগ্রীও বটে;—কিন্তু একটু কথা আছে।

তোমার সহধর্ম্মিণী বিরলে বসিয়া একান্তমনে মখমলের উপর ফুল তুলিয়া, একটি সুন্দর টুপি, তোমার জন্য তৈয়ার করিলেন। তোমাকে দিলেন, তুমি হাসিতে হাসিতে মাথায় দিলে, হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া দশজন বন্ধু বান্ধবদের দেখাইলে। সেই টুপিটি তোমার প্রিয়া-স্ব, তোমার নিজস্ব, তোমার কত আদরের সামগ্রী! কিন্তু উলগুলি সমস্তই বিলাতি উল, ফুল গুলি বিলাতি ফুল, চিত্রের বিলাতি লতাটি বিলাতি পেঁচে জড়াইয়া আছে। সেই নিজস্বের ভিতর হইতে একরূপ পরস্ব পর্‌তে পর্‌তে উঁকি মারিতেছে। তাহার পর, সেই দশজন বন্ধুবান্ধবকে লইয়া যখন ভোজনে বসিলে, তখন তোমার গৃহিণী নিজে রাঁধিয়া বাঁধিয়া স্বহস্তে পলান্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। দেখিলে নয়ন জুড়ায়, গন্ধে গৃহ ভুর ভুর করিতেছে। তাহাতেও পেস্তা কিস্‌মিস্ প্রভৃতি বিদেশী দ্রব্যের আবির্ভাব আছে, কিন্তু সে কেবল মস্‌লা বৈত নয়। আতপ তণ্ডুল, গব্য ঘৃত, সদ্য মাংস,—অপূর্ব্ব মিশ্রণে মিশ্রিত করিয়া গৃহিণী দশবার অন্নপূর্ণার নাম লইয়া রাঁধিয়াছেন। আর পাকা সোণার বালা দুগাছি ননীর খাঁজে বসাইয়া সেই যে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠণে, ধীরে ধীরে পরিবেশন করিতেছেন,—এসকলি—পদার্থ প্রকরণ, ভাবভঙ্গি,—আমাদের নিজস্ব। পরস্ব কিছু থাকিলেও নিজস্বের অগাধে তাহা ডুবিয়া গিয়াছে; নিজস্বের বৃহত্ত্বে, তাহা বিলীন হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তেমন ভুর্‌ভুরে পলান্ন না হইলেও, ঢল্‌ঢলে মাছের ঝোল ত বটে। তাঁহার কবিতা আমাদের নিজস্বের নিজস্ব, আমাদের আদরের সামগ্রী, আমরা বড় ভাল বাসি।

গৃহিণীর সূচিত ঐ টুপি ফেলাইয়া দিয়া, গৃহিণীর প্রস্তুত ঐ পলান্ন বা মৎস্য সূপ খাইয়া দিন যাপন করিতে বলি না। তবে মাছের ঝোলের স্থানে

কট্‌লেট্‌কে অধিকার করিতে দেখিলে, সত্য সত্যই দুঃখ হয়। দিন দিন কিন্তু তাহাই হইতে চলিল। বাঙ্গালির খাটি বাঙ্গালা পদ্য এখন আনাচে কানাচে আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজিগন্ধী, ইংরাজিছন্দী, তাহার উল ইংরাজি, তাহার ফুল ইংরাজি,—একরূপ পরস্ব পদ্য কেবল আসর জাঁকাইয়া পসার করিতেছে।—দুঃখ হয় না? তোমাদের হয়ত হয় না; আমাদের কিন্তু হয়।

ঈশ্বর গুপ্ত বড় কবি নহেন। ক্ষুদ্র বাঙ্গালিজাতির মধ্যেও উচ্চতর কবিও নহেন, কিন্তু হয়ত তিনি শেষ কবি। দরিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রাটি হয়ত চির দিনের তরে হারাইয়াছে, আর ফিরিয়া পাইব না, সেই জন্য আমরা ঈশ্বর গুপ্তকে বড় ভালবাসি।

গুপ্ত কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে, আর একটি কথা বুঝা আবশ্যক। অনেকের মনে একটি ধারণা হইয়াছে যে, রচনায় ভাবই সর্ব্বস্ব; ভাষাটা কিছু নয়। কিসে ভাব পরিস্ফুট হইল, তাহাই দেখিবে, ভাষার পারিপাট্য বিষয়ে দৃষ্টিই দিবে না। এটি বড় ভুল। মহাকবি কালিদাসের মহাকাব্যের প্রথম শ্লোক দেখুন,—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ॥

আমি বন্দনা করিতেছি,—কিসের জন্য? না,—বাক্য এবং অর্থ উভয়েতেই যাহাতে আমার প্রতিপত্তি হয়, সেই জন্য; কাহার বন্দনা করিতেছি? না—বাক্য এবং অর্থের মত যাঁহারা নিয়ত সম্বন্ধ, সেই পার্ব্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিতেছি।

মহাকবি বুঝিতেন যে, বাক্য অবহেলার পদার্থ নহে; ভাবটিতে যেমন প্রতিপত্তি চাই, ভাষাতেও তেমনই চাই। দুয়েতে সমান দখল চাই; কেননা ভাব এবং ভাষা, পুরুষ প্রকৃতির মত জড়িত। যাঁহার কাব্য হইতে দশটি নিরর্থক, শুদ্ধ-মাত্র-পাদ-পূরক বিশেষণ খুঁজিয়া পাওয়া ভার, তিনি যদি বাক্যের গৌরব না বুঝিবেন, তবে কে বুঝিবে বল? আমাদের সাধারণ কথায় বলে যে, সরস কথায় গালি দেয়, তাও সহা যায়, তবু কর্কশ কথায় প্রশংসা করিলে সহা যায় না। বাস্তবিক সরস কথার মাহাত্ম্য এইরূপই বটে। ইট গুলি সুপোড় হবে, পাড়ন বেশ সোজা হবে; তাহার পর জলে ভিজাইতে হইবে, পাটা ধরিয়া বসাইতে হইবে; তবেত গাঁথনি ভাল হইবে। কেবল আমা ঝামা টেরা বাঁকা ইট হইলে, গাঁথনিও হয় খগা বগা। উপাদানের গুণেইত গঠন। সুতরাং পচা বা শুকা মাছের ঝোল আর নীরস বাক্য সংযোগে রচনা—পরিপাটি সুন্দর হইবে, প্রত্যাশা করাই ভুল।

গুপ্ত কবির রচনাতে খুব গূঢ়ভাব বা কল্পনার বিশেষ লাবণ্যময়ী লীলা খেলা না থাকিলেও, ভাবকে কখন ভাষার বিরাগ জন্য ম্রিয়মাণ হইতে হয় নাই। অনেক সময় হয় ত গরীয়সী ভাষার রূপচ্ছটায়, অলঙ্কার ঘটায় কিশোর

ভাব বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রৌঢ়ভাব কখন রুগ্না, ভগ্না, রোগিণী ভাষাকে সঙ্গিনী পাইয়াছে বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা চিরদিনই চিরযৌবনী। ভাষা কোথাও তুবড়ির মত ফুটিতেছে,—আর চারিদিকে কেবল ফুল কাটিতেছে। কোথাও এই ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত ছুটিতেছে, পাল ভরে কত তরীই না তাহাতে চলিয়াছে। কোথাও বসন্ত লতার মত ধীরে ধীরে দুলিতেছে, ফুলের গন্ধে ভোর করে। কোথাও ঝড় বৃষ্টি বাদলের মত, তড় তড় করিয়া শিল পড়িতেছে। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা,—দুরন্ত বালকের মত ধরি ধরি করিতে করিতে, কুঁদিয়া চলিয়া যায়, ঠাকুরদাদাকে একটি চড় মারিয়া, ঠাকুরণদিদীর দিকে একবার সহাস্য মুখভঙ্গি করিয়া, তবে নাচিতে নাচিতে ফিরিয়া আসে। ভাষা বড় দুরন্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যঙ্গ-বিশারদ; রহস্যে রসরাজ। সেই জীবন্ত, দুরন্ত ভাষা, আর সেই রঙ্‌ বিরঙের ব্যঙ্গ; বাসর ঘরের বুড়া ঠাকুরণদিদীর মত সে এক ঢঙ্গই স্বতন্ত্র। তাহার মধ্যে অশ্লীল আছে, অশ্লীল আছে; রঙ্গ আছে, ব্যঙ্গ আছে; হাসি আছে, খুসি আছে; উপদেশ আছে, নিদেশ আছে; কুন্দন আছে, ক্রন্দন আছে। কিন্তু তাহাতে হিংসা নাই, রীষা নাই; নাক শিটানি নাই, চোখ টাটানি নাই; অন্তরপ্রবাহে অন্তর্দাহ নাই। ঈশ্বর গুপ্তের রাগ—ভোলানাথের খোলা কথা। তুষের আগুনের মত সে রাগ, কখন গুমরে গুমরে থাকেন না। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ, ইয়ারের রঙ্গ। তাহাতে দ্বেষের লেশ নাই। ঈশ্বর গুপ্তের দুঃখ, বিশ্বেশ্বর সমীপে হৃদয়ের ব্যাকুলতা। তাহাতে দুরাকাঙ্ক্ষার নিরাশা নাই। আর ঈশ্বর গুপ্তের আনন্দ-লহরী। বাঁধা সুরের সাধা রাগিণী। তাহাতে অহঙ্কারের গাঁট্‌কারি বা ঘৃণার টিট্‌কারি নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যঙ্গ বিশারদ হইয়াও, নিঃসম্প্রদায়ী লোক; তাঁহার কাছে দল বিদল ছিল না। হিন্দু মুসলমান,—একেলে, সেকেলে,—ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান,—মেয়ে, পুরুষ,—রেঢ়ো, বাঙ্গাল,—সহুরে, পাড়াগেঁয়ে—সকলেরই উপর গুপ্ত কবির সমান দৃষ্টি আছে। যেখানে কোন ব্যতিক্রম বিড়ম্বনা দেখিয়াছেন, সেই-খানেই গুপ্তকবি প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে দুই দশ কথা বলিয়া আসিয়াছেন। আর সেই কথায় তাঁহার লক্ষ্য অলক্ষ্য নিরপেক্ষ সকলেই হাসিয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি ত রসের কথায় গালি দিলেও হাসি পায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যের নমুনা ও সমালোচনা আগামীতে থাকিবে।

নবজীবন।

২য় ভাগ } আশ্বিন ১২৯২। { ৩য় সংখ্যা।

দীক্ষা।

দেবতা নির্ব্বাচনের নাম দীক্ষা। হিন্দু দেবালয়ে নানা দেবতা নানা ভাবে বিরাজ করেন। একস্থলে কমল-লোচন, দয়াময়, পতিত-পাবন রামচন্দ্র ভার্য্যা ও অনুজগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। অন্যস্থানে মদনমোহন রাধারমণ, যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুরলি হস্তে ত্রিভঙ্গভাবে দণ্ডায়মান আছেন। এক স্থলে ধূর্জ্জটী ভস্ম-লেপিত অঙ্গে ধ্যানে নিমগ্ন। অন্য স্থলে ভগবতী দশভুজার মূর্ত্তিতে অসুর বিনাশ করিতেছেন। কোথাও বা সর্ব্বসংহারিণী কালী রক্তবীজের বিনাশ-সাধনে ব্যাপৃতা। সাধকের চক্ষে ইহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই ঐশ্বরিক গুণে বিভূষিত। ইহাদের কেহ বা সাত্ত্বিক, কেহ বা রাজসিক, কেহ বা তামসিক গুণের অবতার। সাধক ইহাদের মধ্যে কাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কাঁহাকে বর্জ্জন করিবেন? ইহাদের মধ্যে কাহার চরণে সাধক আপনাকে বিক্রীত করিবেন? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দীক্ষার ও দীক্ষাগুরুর প্রয়োজন।

কেহ হয়ত ভাবিবেন, যে এইরূপ নির্ব্বাচনের প্রয়োজন কি? ইহারা সকলেই আমাদের আরাধ্য। আমরা সময়ে সময়ে ইহাদের সকলেরই আরাধনা করিব। শরতে দশভুজার পূজা করিয়া শীতাগমে কালিকার পূজা করিব। বসন্তে মদনমোহনের সেবা করিয়া নিদাঘে মহাদেবের আরাধনা করিব। যাঁহারা এইরূপ সার্ব্বদৈবিক পূজার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আমরা বলিতে চাই, যে পূর্ব্বোক্ত পূজা সমস্ত নৈমিত্তিক পূজা। ঐ সমস্ত পূজায় দেবতাদিগকে আবাহন করিয়া পুনরায় বিসর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু সেই

দেবতা কে, যাঁহাকে তুমি আবাহন করিয়া আর বিসর্জ্জন করিবে না? সেই দেবতা কে, যাঁহাকে তুমি তোমার হৃদয়-সিংহাসনের চির-অধীশ্বর করিয়া রাখিবে? সেই দেবতা কে, যাঁহাকে তুমি শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, দুঃখে সুখে, হর্ষে, বিষাদে, জীবনে মরণে, অন্তরের অন্তরে উপভোগ করিবে? সেই দেবতা কে, যাঁহার প্রতি ধ্রুবলক্ষ্য রাখিয়া তুমি তোমার চিত্তের একাগ্রতা ও স্থিরতা সম্পাদন করিবে? এক স্ত্রীর বহুপতি হইলে যেমন প্রেমের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ এক আত্মার বহু ঈশ্বর হইলে ভক্তির ব্যাঘাত হয়। এইজন্য হিন্দু-সাধক তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে একজনকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। হিন্দু-সাধক অন্য অন্য দেবতাকে অভক্তি বা অসম্মান করেন না। ঐ সমস্ত দেবতাদের মধ্যে তিনি কাহাকেও বা পিতার ন্যায়, কাহাকেও বা মাতার ন্যায়, কাহাকেও বা ভ্রাতার ন্যায়, কাহাকেও বা ভগিনীর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। সময়ে সময়ে তিনি ইঁহাদিগকে কুটুম্বের ন্যায় হৃদয়মন্দিরে আনয়ন করেন ও ইঁহাদের যথাবিধি অতিথি-সৎকার করেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে একজনকে তিনি আত্মার অধীশ্বর করিয়া লইয়া তাঁহারই চরণে আপনাকে চিরদিনের জন্য বিক্রয় করেন। এই অর্থে হিন্দু-সাধকমাত্রকে একেশ্বরবাদী বলা অন্যায় বা অযৌক্তিক হয় না।

কিন্তু এই যে অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত মূর্ত্তি, ইঁহাদের মধ্যে কোনটিকে আমার আত্মার পতিত্বে বরণ করিব? এই যে তেত্রিশ কোটি দেবতা আমার সমক্ষে বিরাজ করিতেছেন, আমার চক্ষে ইঁহারা সকলেই সমান সুন্দর ও সমান প্রভাবশালী। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কাহার সহিত আমার আত্মার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিব? ইঁহাদের মধ্যে কে আমার আত্মার দারিদ্র্যদুর্গতি দূর করিবেন? ইঁহাদের মধ্যে কাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া আমার আত্মা-দেবী ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত সুখের অধিকারিণী হইবেন? আমার আত্মাদেবী বড়ই কুরূপা, বড়ই দুঃশীলা। ইঁহাদের মধ্যে কে এমন দয়াময় আছেন, যে তিনি স্বর্গসিংহাসন বিস্মৃত হইয়া আমার জীর্ণ, কলুষিত হৃদয়-কুটীরের অধীশ্বর হইতে স্বীকার করিবেন?

যখন সাধকের আত্মা এইরূপে পরিণয়ের জন্য লালায়িত হয়, তখন গুরু ঘটকের ন্যায় উহার জন্য পাত্রান্বেষণ করেন। সাধারণ বিবাহে ঘটক যেরূপ বরকন্যার বংশমর্য্যাদা, জন্মনক্ষত্র, জন্মরাশি, প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া

তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করেন, গুরুও সেইরূপ শিষ্য ও ঈশ্বর—এ উভয়ের নক্ষত্র, রাশি, প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরিণয়ের সম্বন্ধ স্থির করেন। হিন্দু সমাজে যে প্রণালীতে লৌকিক ও সাধারণ বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে, অবিকল সেই প্রণালীতেই পারত্রিক বিবাহও সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর এই বিবাহের পরিণেতা, শিষ্যের আত্মা এই বিবাহের কন্যা, এবং গুরু এই বিবাহের পুরোহিত বা ঘটক।

যে দিন আত্মার এই বিবাহ সম্পাদিত হয়, সে দিন কি সুখের দিন! শিষ্য প্রাতঃস্নান করিয়া, বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া, শুদ্ধদেহে শুদ্ধান্তঃকরণে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুও সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন—"বৎস! তুমি বড় সৌভাগ্যশালী। তোমার আত্মার বড় সুন্দর পাত্র মিলিয়াছে। আহা পাত্রের কি অনির্ব্বচনীয়রূপ! কি অনির্ব্বচনীয় গুণ! তোমার আত্মার সহিত এই পাত্রের রাজযোটক গণনা হইয়াছে। তোমার আত্মা চিরসুখী হইবে।" শিষ্য আনন্দে উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া গুরুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। কে তাঁহার আত্মার পাত্র শুনিবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। এমন সময়ে গুরু তাঁহার কর্ণে কর্ণে সেই পাত্রের নাম গুণ মহিমা বলিয়া দিলেন। তাঁহার আত্মার পাত্র মিলিল। সম্মুখস্থ দেবালয়ে শিষ্য তাঁহার পাত্রের রূপ গুণ সমস্ত অবলোকন করিলেন। আনন্দে, প্রেমে উৎসাহে তাঁহার হৃদয় পূরিয়া গেল। ভক্তিভাবে তাঁহার আত্মার পতিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"স্বামিন্ আজি হইতে তুমি আমার প্রাণেশ্বর।" এবং তৎপরেই তিনি শুনিলেন, যেন দেবতা বলিতেছেন—"বৎস! আজি হইতে আমি তোমার আত্মাকে পত্নী-ভাবে গ্রহণ করিলাম।" যৎকালে উভয়ের মধ্যে এইরূপ গ্রন্থিবন্ধন হইতেছে, তৎকালেই পরিজনেরা শঙ্খ ঘণ্টার নাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিতেছে, তৎকালেই বিবাহসূচক উলুধ্বনিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তৎকালেই চতুর্দ্দিকে আনন্দের কোলাহল বিকীর্ণ হইতেছে। যে দেশে প্রতিগৃহে নরনারী এইরূপ পারত্রিক পরিণয়ে পরিণীত হইতেছেন, সে দেশ ধন্য! এবং যাঁহাদের আত্মা এইরূপ বিবাহে অমোঘ মত ঈশ্বর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহারাও ধন্য।

এক্ষণে আমাদের শাস্ত্রে, দীক্ষা, গুরু, শিষ্য, মন্ত্র প্রভৃতির কিরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

১ম। দীক্ষা—যেক্রিয়া জ্ঞান দান করে ও পাপ ক্ষয় করে, তাহার নাম দীক্ষা ;—

দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং, ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।
তেন দীক্ষেতি সা জ্ঞেয়া পাপচ্ছেদক্ষমা ক্রিয়া॥"

রঘুনন্দন কৃত প্রয়োগসার।

২য়। দীক্ষার কালাকাল বিচার। দীক্ষাকার্য্যে শুভদিন শুভক্ষণ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু না করিলেও প্রত্যবায় নাই। যথা—

"যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তিথির্ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াং কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাবাপ্তে তু সদ্‌গুরৌ॥"

অর্থাৎ যদি সদ্গুরু স্বেচ্ছায় উপস্থিত হন, এবং যদি তাঁহার অনুমতি থাকে, তাহা হইলে তিথি, ব্রত, হোম, স্নান, জপ প্রভৃতি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, সকল সময়েই মন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৩য়। গুরু।

গুরু, বেদ দর্শন প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবেন। পরোপকারই তাঁহার ব্রত হইবে। এবং তিনি জপপূজাদি কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবেন।

সর্ব্বাগমানাং সারজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
পরোপকার নীরতো জপপূজাদি তৎপরঃ॥
ইত্যাদি গুণসম্পন্নো গুরুরাগম পারগঃ।

শৈবপুরাণে গুরুর মহিমা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ;—

যো গুরুঃ স শিবঃ প্রোক্তো যঃ শিবঃ স চ শঙ্করঃ।
শিববিদ্যা গুরুণাঞ্চ ভেদোনাস্তি কথঞ্চন॥

অর্থাৎ যিনি গুরু, তিনিই শিব। যিনি শিব তিনিই শঙ্কর। শিব, গুরু ও গুরুদত্তবিদ্যা এ তিনের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই।

কিন্তু গুরু যদি অনুপযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে।

"গুরোরবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্য মজানতঃ
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।"

মহাভারত

গুরু যদি অসৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তাঁহার যদি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা না থাকে, এবং তিনি যদি অসৎ পথের পথিক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।

৪র্থ। শিষ্য।

বাঙ্মনঃ কায়বসুভিঃ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
এতাদৃশগুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি না পরঃ॥
দেবতাচার্য্য শুশ্রূষাং মনোবাক্‌কায় কর্ম্মভিঃ।
শুদ্ধভাবো মহোৎসাহো বোদ্ধা শিষ্য ইতি স্মৃতঃ॥

যিনি কায়মনোবাক্যে ও ধনদ্বারা দেবতা, আচার্য্য ও গুরুর শুশ্রূষা করেন, যিনি নির্ম্মলচিত্ত যিনি শ্রমশীল, এবং যিনি বুদ্ধিমান্‌ তিনিই শিষ্য নামে কথিত হইবার উপযুক্ত।

৫ম। মন্ত্র।

যাহাদ্বারা বিশ্বজ্ঞান লাভ করা যায়, এবং যাহাদ্বারা সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহার নাম মন্ত্র। যথা—

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধ্যৈ মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে॥

একটি মন্ত্র সম্যক্‌রূপে সাধনা করিলেও শুদ্ধ হওয়া যায়। যথা—

সম্যক্‌সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য নাসিদ্ধমিহকিঞ্চন।
বহুমন্ত্রবতঃ পুংসঃ কা কথা হরিরেব সঃ॥

মন্ত্রগ্রহণ শেষ হইলে, শিষ্য গুরুকে এই বলিয়া প্রণাম করিবে।

"ত্বৎপ্রসাদাদহং দেবঃ কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ।
মায়ামৃত্যু মহাপাশাৎ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ॥

হে গুরো! আজি আমি আপনার প্রসাদে সর্ব্বপ্রকার কৃতার্থতা লাভ করিলাম। আজি আমি মায়াপাশ ও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করিলাম।

অন্য অন্য জাতির মধ্যেও এই দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে। কিন্তু দীক্ষার দিনে তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত দাস্যভাব সংস্থাপন করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত কান্তভাব সংস্থাপন করিতে সাহসী হন না। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের চরণে আপনাকে বিক্রয় করিতে হইবে, এ ভাব হিন্দুজাতি ভিন্ন আর কেহই প্রাপ্ত হন নাই। ঈশ্বরকে "স্বামিন্‌" বলিয়া সম্ভাষণ করিতে আর কাহারও সাহস হয় নাই।

স্পেন্‌সরের সাম্য।

স্পেন্সরের 'সাম্য" কি তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা আরও বলিয়াছি, ইউরোপীয় সভ্যতার পথে স্পেন্সরের "সাম্য" নাই। এখন তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে। কিন্তু সেই কারণ বুঝাইবার পূর্ব্বে ইউরোপীয় সভ্যতার গতি ও উদ্দেশ্য কিরূপ, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। মিলের মতে মনুষ্যের অসভ্য অবস্থার বিপরীত অবস্থাই সভ্য অবস্থা। যে অবস্থায় অতি অল্পসংখ্যক লোক কোন এক বৃহৎ প্রদেশে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিম্বা যখন সেই প্রদেশের স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া অবস্থান করে, তাহাই অসভ্য অবস্থা। আর যে অবস্থায় বহুসংখ্যক লোক নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বাস করে, সেই অবস্থা সভ্য অবস্থা। অসভ্য অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিরপেক্ষ। কেবল যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে মিলিত হইতে দেখা যায়। তাহারা মিলিত অবস্থায় থাকার উপকারিতা, কিম্বা সুখ আস্বাদনে অক্ষম। আর যখন দেখা যায়, মনুষ্যগণ একত্রীভূত হইয়া, পরস্পরের সুখোন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, তাহাদিগের সেই অবস্থাকে সভ্য অবস্থা বলা যায়। আর একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের মতে সমাজগত ও ব্যক্তিগত উন্নতির অবস্থাই সভ্য অবস্থা। কিন্তু সমাজগত ও ব্যক্তিগত উন্নতি কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ আছে। যাহা হউক দেখা যাইতেছে যে, উপরি উক্ত নিয়মানুসারে চালিত মনুষ্যগণ মিলপ্রমুখ দার্শনিকগণের অনুমোদিত সভ্যতা অনুসরণ করিতেছেন। সেই কারণেই আধুনিক ইউরোপে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণি দেশবাসীগণ সভ্য বলিয়া অভিহিত, এই সকল জাতির সভ্যতার একদিকে "প্রয়োজনবাদ" (Utilitarianism) এবং অপর দিকে "স্বকীয় সুখের চরমোৎকর্ষ।" ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি "ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা।" যদিও ইউরোপীয় সভ্যতায় অনেকগুলি সুনিয়ম রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও সেই সভ্যতায় রাজ্যশাসনের সুপ্রণালী, সমাজের বাহ্যিক সুশৃঙ্খলা, শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সুকৌশল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—প্রভৃতি নৈতিক উৎকর্ষ

দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি যে সভ্যতার আদিতে প্রয়োজনবাদ, অন্তে স্বকীয় সুখের চরমোৎকর্ষ, এবং ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা যে সভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহাতে যে কোনরূপ বিসদৃশ ভাব থাকিবে না, ইহা আশ্চর্য্য। যাহাতে সকলই স্থূলদৃষ্টির গোচর, যাহাতে সকল নিয়ম দৈহিক সুখ সাধনের প্রয়োজক, এবং যাহাতে শারীরিক সুখের স্থানে মানসিক সুখের সংস্থাপন নাই অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী সুখের স্থানে চিরস্থায়ী সুখের প্রবর্ত্তনা নাই, তাহা—যে সকল প্রকার অসামঞ্জস্য শূন্য একপ হইতে পারে না। যদি আমরা একে একে ইউরোপীয় সভ্য সমাজের নিয়মাবলী পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায়, তাহার মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, স্বার্থ-সাধন প্রভৃতি মহৎ বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইউরোপীয় সমাজে বিবাহের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য দেখা যায় না। সে সমাজে অর্থোপায় স্বকীয় সুখ-সাধনের একমাত্র কারণ। যদি আমার মনে কেবলই অন্যের সুখ হইতে আমার সুখ অধিক হইবার উপায় উদ্ভাবিত হইতে থাকে, তাহা হইলে আমার মন হইতে ঈর্ষা, দ্বেষ বর্জ্জন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। আমার প্রতিবাসীর অবস্থা আমার ন্যায় হউক, কিম্বা আমার অবস্থা আমার প্রতিবাসীর ন্যায় হউক, এই দুইটি চিন্তা আধুনিক সভ্য জাতির মনে পর্য্যায়ক্রমে বিঘূর্ণীত হইতেছে। তাই বলি, এ অবস্থায় কোন্ সুখ আসিতে পারে? তাই জিজ্ঞাসা করি, স্পেন্সরের "সাম্য" সম্ভব কি না? স্পেন্সারের মতে সৌরজগতে যেমন অনন্ত সাম্য বিরাজিত রহিয়াছে, যেমন প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্র স্বস্ব নির্দ্ধারিত পথে প্রধাবিত হইতেছে, এবং জড় জগতের ক্রিয়া যেমন সামঞ্জস্যের সহিত চালিত হইতেছে, সেইরূপ "সাম্য' জীবজগতে—প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব। তাই জিজ্ঞাসা করি, যে নিয়মে সভ্য সমাজ চালিত হইতেছে, তাহাতে জীবজগতে স্পেন্সরের "সাম্য" আসা সম্ভব কি না? ইউরোপীয় সভ্যতার গতি কি সূত্রে বহিতেছে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বলিতে কি, ইউরোপীয় সভ্যতা আত্মসম্বন্ধীয়; তাহা সমাজ সম্বন্ধীয় নয়। ইউরোপীয় সভ্যতা শারীরিক সুখের উৎকর্ষ সাধন, তাহাতে মানসিক সুখান্বেষণ নাই। ইউরোপীয় সভ্যতায় একজনের তুলনায় আমার অবস্থা, আমার ক্ষমতা, মৎসম্বন্ধীয় যে কোন শক্তি অপরের অপেক্ষা হীন বোধ হইলে, যে কোন উপায়ে তাহার উন্নতি সাধনের যথোচিত প্রয়াস করা

উচিত; কিন্তু আমি যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকি, এমন কথা তাহাতে নাই। তাই দেখিতে পাই, আজও ইংলণ্ড জর্ম্মণির উন্নতিতে এবং ফ্রান্স ইংলণ্ডের উন্নতিতে কাতর। তাই আজও তাহাদের মানসিক মিল নাই, তাই আজও তাহারা ঈর্ষাপরবশ, দ্বেষপরিপূর্ণ, এবং স্বার্থসাধন প্রবৃত্তির দাস। যে সভ্যতা আজকাল সভ্যতা বলিয়া বিদিত, তাহা প্রকৃত সভ্যতা নয়। প্রকৃত সভ্যতা হইলে স্পেন্সরের "সাম্য" আসিবে। সে "সাম্য" অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না। আধুনিক সভ্যতা, প্রকৃত সভ্যতা ও অসভ্যতার মধ্যবর্ত্তী, এ অবস্থায় আমরা সুখী হইতে পারি না। বরঞ্চ এখন আমরা অসভ্যদিগের অপেক্ষা অসুখী। তাহাদের শারীরিক সুখ আমাদের অপেক্ষা অধিক, আমরা এ অবস্থায় সম্পূর্ণ শারীরিক সুখে বঞ্চিত। আমরা পীড়িত; আমরা পীড়া হইতে মুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। তাই বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না যে, আমরা উন্নততর সীমায় উঠিয়াছি। যাহারা অসভ্য, তাহারা পীড়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নিয়ম জানে না; কিন্তু আবার তাহাদের উৎকট পীড়া হইতে কষ্টও পাইতে হয় না। এবং বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বোধ হয় যে, এই দুই অবস্থার মধ্যে অসভ্যদিগের অবস্থাই ভাল সুতরাং স্পৃহনীয়। তবে আমরা সভ্য হইবার জন্য ব্যস্ত কেন? সভ্য ও অসভ্যের মধ্যে একটি বিষয় প্রভেদ আছে। অসভ্যের সুখ ক্ষণস্থায়ী, তাহার সুখ নষ্ট করা অনায়াস-সাধ্য। কিন্তু সভ্যের সুখ চিরস্থায়ী; সে সুখ নষ্ট করা দুঃসাধ্য। অসভ্যের সুখ শরীরে, সভ্যের সুখ মনে। আধুনিক সভ্য অবস্থায় যে সকল কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, সে কেবল প্রকৃত সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া প্রযুক্ত। প্রকৃত সভ্যতায় কোন কষ্টই নাই। সে অবস্থা উন্নতির চরম সীমা। মনুষ্যের বৃদ্ধি বৃত্তি ও আয়াসজনিত মনুষ্য জীবনের চিরস্থায়ী পরিবর্ত্তনই সেই সভ্যতার প্রকৃত অবস্থা। মনুষ্য যদি আধুনিক সভ্য অবস্থা উন্নতির শেষ ও সভ্যতার চরম সীমা জ্ঞানে ইহাতেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে স্পেন্সরের "সাম্য" আসিতে পারে না।

অনেকে মনে করিতে পারেন, যে সভ্যতা আজ জনসমাজে আদৃত, যখন সেই সভ্যতা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে, তখন স্পেন্সরের "সাম্য" আসিবে। কিন্তু সেটি তাঁহাদের ভ্রম। আধুনিক সভ্যতার বিস্তারে

স্পেন্সরের "সাম্য" সংসাধিত হইবে না। সে সভ্যতার পথে সাম্য নাই। কারণ আমরা যে জাতিকে বলবিক্রমশালী, ও অর্থহীনতাজনিত ক্লেশ হইতে বিমুক্ত দেখি, তাহাকেই সভ্য বলি। কিন্তু ঐতিহাসিক জ্ঞান হইতে দেখিতে পাইতেছি, কোন জাতিই চিরদিনতরে উপরি উক্ত অবস্থা সংরক্ষিত করিতে পারে নাই। আজ যাহাকে ঐ সকল সম্বন্ধে উন্নত দেখিতেছি, এক সময়ে না এক সময়ে তাহার অবনতি দেখিতে হইবে। একটি জাতি উন্নতি হইতে অবনতিগ্রস্ত হইতেছে; আর একটি জাতি অবনতি হইতে উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে। তবে আর সাম্য আসিবে কিরূপে? যে উন্নতি পতনশীল তাহা হইতে সাম্য লাভের আশা বৃথা। যে সভ্যতা বলবিক্রমজনিত কিম্বা প্রচুর ধনসম্পত্তিজনিত তাহা পতনশীল। সুতরাং আধুনিক সভ্যতার পথে স্পেনসরের "সাম্য" নাই।

তবে কি স্পেন্সরের সাম্য অসম্ভব? তা নয়। ধর্ম্মবল ও নীতিবল যখন সভ্যতার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইবে তখন সেই সাম্য আসিবে। যখন আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি "প্রয়োজনবাদ" হইতে স্খলিত হইবে, যখন ইহার প্রকাণ্ড দেহ হইতে ভোগসুখ জনিত লালসা দূর হইবে, এবং যখন ইহার উদ্দেশ্য "স্বকীয় সুখের চরমোৎকর্ষ" হইতে বিভিন্ন হইবে, তখন স্পেন্সরের "সাম্য" নিয়মাবদ্ধ হইয়া লোকে শারীরিক কষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না ও পরার্থ-সাধন একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবে। যখন চৈতন্যের ন্যায় ভক্তিবলে, বুদ্ধের ন্যায় বৈরাগ্যবলে, প্রহ্লাদের ন্যায় ধর্ম্মবলে অন্যান্য সকল কষ্ট সহাস্য বদনে লোকে সহ্য করিতে পারিবে, তখন স্পেন্সরের "সাম্য" আসিতে পারে। ঐ উন্নতির পতন নাই। যাঁহারা একবার ইহার চরমসীমায় উঠিয়াছেন, আর তাঁহারা বৈষম্যের মুখ দেখিবেন না। তাঁহারা জগতের সর্ব্বত্র যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইবেন, সকলেই সেই পথে প্রধাবিত হইলে "সাম্য" লাভ করিবার অসম্ভাবনা কি? যদি সকল মনুষ্য প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের ন্যায় ঐহিক সুখে বিসর্জ্জন দিয়া, সংসারের মায়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যক্তিগত সকল গ্রন্থি ছেদ করিয়া, আত্মপর জ্ঞান দূর করিয়া, জীবজগতের ও জড়জগতের সমস্ত আপনার এবং আপনি জড়জগৎ ও জীবজগতের প্রত্যেক অণুর সহিত সম্বলিত—এই বিবেচনা করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে স্পেন্সরের সাম্য আসিতে পারে। যদি কখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের প্রাধান্য হয়, তাহা হইলে যুগযুগান্তর পরে স্পেন্সরের "সাম্য" সম্ভবে পরিণত হইতে পারে।

ভারত ভ্রমণ।

৪।

"পাণ্ডব গুহা" গুলি দূর হইতে পর্ব্বতের উর্দ্ধ অঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তের ন্যায় দেখায়। আমরা বেলা ৪টার সময় পাণ্ডবগুহা দেখিতে গিরি আরোহণ করিলাম; অর্দ্ধ মাইলের কিছু অধিক উঠিয়া দেখিলাম, যে পর্ব্বতের অঙ্গে একদিকে কতকগুলি বৃহৎ গহ্বর আছে। আমি একপ্রান্ত হইতে এক একটি করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। গুহা প্রবেশের পথে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র দূরস্থিত রেলগাড়ীর শব্দের ন্যায় এক অশ্রান্ত রব শুনিতে পাইলাম। অবিলম্বে বুঝিলাম পর্ব্বতের উপরে যে বায়ু বহিতেছে, উহা তাহারি শব্দ। গুহার ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম, চারিদিকেই অচ্ছিদ্র প্রস্তর ভিত্তি। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম,—আহা কি চমৎকার বৈসাদৃশ্য! সম্মুখে নেত্রপথ অতিক্রম করিয়া বিশাল তৃণাচ্ছাদিত অসমতল ক্ষেত্র, তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটি গিরিশাখা; অস্তমান ভানুকরে কাহারও শৃঙ্গ, কাহারও কটিদেশ, কাহারও বক্ষদেশ কাঞ্চন বিভায় রঞ্জিত। দূরস্থিত রাজবর্ত্ম একটি সূক্ষ্ম রেখার ন্যায় অনুমিত হইতেছে, পথিপার্শ্বের বৃক্ষগুলি শ্যামবর্ণের বিন্দু শ্রেণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। যে অবরুদ্ধ তাহার পক্ষে স্বাধীন দৃশ্য যে কতই মধুর, তাহা এই গুহার মধ্যে কিয়ৎকাল চাহিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেই অনুভূত হয়। ক্রমে ক্রমে দুইটি গুহা দেখিয়া তৃতীয়টিতে প্রবেশ করিলাম। প্রথম দুইটির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই; তৃতীয়টি উল্লেখ যোগ্য। এইটি অতি সুন্দর গুহা, স্বভাবজাত নহে, পর্ব্বত অঙ্গ কাটিয়া প্রস্তুত করা। গুহাটি সমচতুষ্কোণ; আয়তন প্রায় ১৬০০ বর্গ ফুট। ইহার ভিতরে তিনপার্শ্বে ১৯টি ঘর, তাহার সম্মুখেই দীর্ঘ দালান, মাঝখানে খট্‌খটে মেজে। কথা কহিলাম, দুই মিনিট কাল প্রতিধ্বনি গুহার ভিতর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে প্রতিধ্বনি প্রস্তর অঙ্গে এতই প্রতাড়িত হইয়া পড়িল যে, কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সে প্রতিধ্বনি শুনিলে কেবল মাত্র ঔদাস্যে মন পূর্ণ হইয়া উঠে। বৌদ্ধদেব মূর্ত্তিই এ গহ্বরে অধিক; কেবল মাত্র একটি দেবীমূর্ত্তি আছে। এ মূর্ত্তিকে আমার পাণ্ডা সর্ব্বমঙ্গলার মূর্ত্তি বলিয়া

উল্লেখ করিল। কিন্তু এই সকল গুহাস্থ মূর্ত্তির মধ্যে কোন্ গুলিই বৌদ্ধদের আর কোন্ গুলি হিন্দুদের, অথবা জৈনদের তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। ২২ নং গহ্বরে কতকগুলি মূর্ত্তি দেখিলাম তাহা ঠিক বৌদ্ধদের মূর্ত্তির মত নহে, পাণ্ডা এ মূর্ত্তিকে "ইন্দ্রসভা" বলিয়া বুঝাইয়া দিল, কিন্তু ঠিক হিন্দুদেব দেবীর মূর্ত্তির মতও তাহা নহে। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম গুহাগুলি সামান্য, তৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ বলিবার নাই। দশম গুহাটি তৃতীয় গুহার ন্যায়; দ্বাদশ গুহাটি সামান্য,ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ গুহাদ্বয়ে প্রত্যেকে গুটি চারি কামরা আছে; ষোড়শ গহ্বরটি ঊর্দ্ধে: লৌহ সোপান দ্বারায় উহাতে উঠিতে হয়। গুহার ভিতর জলে পরিপূর্ণ, ভিত্তির গায়ে একটি বৌদ্ধ মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি আছে। অষ্টাদশ গহ্বরটি এক বৃহৎ চতুরস্র দালান, পূর্ব্বধারে একটি দশহাত উচ্চ ইষ্টক নির্ম্মিত গম্বুজ, এটি কাহাদের কীর্ত্তি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বিংশতিতম গহ্বরটি তৃতীয় গহ্বরের ন্যায়; ভিতরে একটিমূর্ত্তি আছে, মূর্ত্তিটি বৃহৎ, রং করা এবং অঙ্গের কোন স্থানই ভগ্ন হয় নাই; এই গুহায় উঠিবার প্রস্তরসোপান আছে; ইহাতে একটি ফকির বাস করেন; ফকির দিবাভাগে এই গুহায় অবস্থান করেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পর্ব্বত হইতে নামিয়া স্থানান্তরে রাত্রি যাপন করিয়া আইসেন। রাত্রিকালে এসকল গুহায় কোন ব্যক্তির অবস্থান করায়, গবর্ণমেণ্টের নিষেধ আছে। তাহার কারণ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বোধ হয়, পূর্ব্বে কোন গুহাবাসী কোন দর্শকের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকিবে। দ্বাবিংশতিতম গহ্বরটি সর্ব্বাধিক উচ্চে, ইহাও বৃহৎ; ইহাতেও কতকগুলি মূর্ত্তি আছে; এগুহায় উঠিবার জন্যও লৌহ সোপান আছে। ত্রয়োবিংশ গহ্বর উল্লেখযোগ্য নহে। পাণ্ডব গুহায় উঠিতে পথে ও কোন কোন গুহার অদূরেই নানা প্রকার সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ আছে, আমরা কতকগুলি আতা ও লেবু তুলিয়াছিলাম। সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োবিংশতিটি গুহা, তন্মধ্যে যে কয়টি উল্লেখ যোগ্য তাহারি কথা বলিলাম।

এই সকল গুহা যথার্থই সাধনার স্থান; ইহার মধ্যে বসিয়া আরাধ্য দেব দেবীকে ডাকিলে ঘোর গম্ভীর প্রতিধ্বনিতে গহ্বর কিছুকাল পরিপ্লুত রহিবে; এবং সেই প্রতিধ্বনি শুনিলে প্রাণের আরাধনা উছলিয়া উঠিবে। প্রাচীন কালে যখন এস্থান সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ভল্লুক পরিবেষ্টিত ভীষণ দণ্ডকারণ্য ছিল, তখন যাঁহারা এই গুহায় বাস করিতেন, তাঁহাদের বৈরাগ্য কতদূর

হইত, তাহা একবার এই সকল গুহায় দাঁড়াইলে এখনও বুঝিতে পারা যায়।

পঞ্চপাণ্ডব যে অজ্ঞাতবাস কালে এই গুহায় বাস করিয়াছিলেন। কেবল "পাণ্ডব গুহা" নাম ব্যতীত তাহার আর কোন নিদর্শন নাই। এ সকল গুহা যে কোন সমৃদ্ধিশালী রাজা কর্ত্তৃক খোদিত ও নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই, কারণ ইহা প্রস্তুত করিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা রাজা ব্যতীত কোন সামান্য ধনী লোকের দ্বারায় সংসিদ্ধ হওয়া সম্ভাবিত নহে। পাণ্ডবেরা যেরূপ দরিদ্র-বেশে বনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের দ্বারায় তদবস্থায় এই সকল গুহা নির্ম্মিত হওয়া যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। হইতে পারে, যে তাঁহাদের বনবাসের পূর্ব্বে ইহা সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে এস্থানে উপস্থিত হইয়া কিছুকাল গুহায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা কহেন যে এ সকল গুহা চতুর্থ শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল; তাঁহারা কি নিদর্শন দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহা জানি না। বোধ হয় বৌদ্ধ মূর্ত্তির আধিক্য দেখিয়া তাঁহারা এরূপ অনুমান করেন, কিন্তু এই গুহাসকল যে হিন্দুদের কীর্ত্তি নহে তাহারি বা যুক্তি কি? হিন্দুদের মূর্ত্তিও ত অনেক রাহিয়াছে, এবং সে সকল মূর্ত্তি কোন কোন বৌদ্ধ মুর্ত্তি অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়াই বোধ হইল। ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে বৌদ্ধগণ ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন, এরূপ যুক্তি আমার নিকট অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

নাসীকের উত্তর পূর্ব্বে "চুমারলীনা" নামক আরো এক "গিরিগুহা" আছে। সে গিরি দুরারোহ বলিয়া অল্প লোকেই তাহা দর্শন করিতে গিয়া থাকে; কিন্তু উহা দর্শনযোগ্য।

নাসীক হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে "ত্র্যম্বক" নামে গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান। গোদাবরীর উৎপত্তি গঙ্গার উৎপত্তির ন্যায় নহে। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে হিমালয়ের এক শৃঙ্গ হইতে দুইটি কঠিন বরফ প্রবাহ নামিয়া, একস্থানে মিলিত হইয়া দ্রবীভূত হইতেছে, তাহাতেই গঙ্গার উৎপত্তি। গোদাবরীর উৎপত্তি সেরূপ নহে; গোদাবরী যে পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে বরফ পতিত হয় না। পর্ব্বত ১৭ হাজার ফুট উচ্চ না হইলে তাহাতে বরফ জমে না, এবং ১৫ হাজার ফুট উচ্চ না হইলে তাহাতে বরফ পড়ে না, ত্র্যম্বকের পর্ব্বত ১৫ হাজার ফুটের বিস্তর

কম। গোদাবরী সলিল উৎস হইতে উৎপন্ন হইতেছে। এই ত্র্যম্বকে দ্বাদশ বৎসর অন্তর মহাযোগ হইয়া থাকে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা যে সময়ে গিয়াছিলাম, সেই সময়েই এই যোগ আরম্ভ হইয়াছিল; এসময়ে লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই ত্র্যম্বকে গোদাবরীতে স্নান করিতে আইসে।

নাসীকে মহারাষ্ট্রীয় অধিবাসীই অধিক। এখানকার স্ত্রীলোকদিগের অবগুণ্ঠন নাই; কেবল এইখানেই কেন, বোম্বাই ও পুনা প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ দেখিলাম। এ অঞ্চলে স্ত্রী স্বাধীনতা বিলক্ষণ আছে। কি ধনী, কি নির্ধন, সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেই সর্ব্বদা অঙ্গে কাঁচুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশই বলিষ্ঠা ও সুন্দরী। এখনকার স্ত্রীলোকদিগের অতিথি সৎকার ধর্ম্ম বড় প্রবল। আমরা যে পাণ্ডাদের বাটীতে ছিলাম, তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা অতি যত্নসহকারে আমাদের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। নবীন বয়স্কা হইলেও, লজ্জাবশত আমাদের আহারাদির সরবরাহ ও পরিবেশনাদি করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। আমি যে পাণ্ডাদের বাটীতে ছিলাম, তাঁহাদের সংসারের দুই এক কথা বলিব। পাণ্ডারা পাঁচ সহোদর; সকলেই বিবাহিত। জ্যেষ্ঠ গৃহে থাকেন, সংসারের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করেন, আর তিনজন প্রত্যূষে উঠিয়া নাসীক রোড ষ্টেসনে গমন করেন, যাত্রী পাইলেই সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আইলেন, নতুবা মধ্যাহ্নে একবার আহার করিয়া গিয়া সমস্ত দিবা, কেহ বা দিবা রাত্রি ষ্টেসনে অতিবাহিত করেন; কনিষ্ঠ, ইংরাজি স্কুলে অধ্যয়ন করেন। কনিষ্ঠের বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু বিবাহ বহুপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। ইঁহারা গুরুজন সমক্ষে পতিপত্নীতে দিব্য কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, সঙ্কোচের নাম গন্ধও নাই। একদিন দেখিলাম সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীধর জীউ তাঁহার বালিকা পত্নীর সহিত বাল্য-ক্রীড়া করিতেছেন। অপরের সাক্ষাতে পতিপত্নীতে বাক্যালাপ করা যে গোপনীয় কাজ, তাহা ইঁহারা মনেও স্থান দেন না, সে ধারণাই তাঁহাদের নাই। আমি কেবল মধ্যবিত্ত লোকের কথা বলিতেছি না, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেও এইরূপ প্রথা। আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বোম্বাই হইতে পুনা যাইবার সময় একজন অতি সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় আমাদের গাড়ীতে ছিলেন; তাঁহার পার্শ্বে দুইটি বালক বালিকা খেলা করিতেছে দেখিয়া আমার এই বিষয়ে কৌতূহল হইল, আমি তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া জানিলাম যে বালক তাঁহার পুত্র, বালিকা

পুত্রবধূ। সেই দুই বালক বালিকার ব্যবহার দেখিতে বড়ই মধুর। খাদ্য দ্রব্য লইয়া উভয়ে কাড়াকাড়ি করিতেছে, সে বিবাদ পিতা ভঞ্জন করিতেছেন, আবার তখনি সদ্ভাব হইতেছে; রাত্রি অধিক হইলে, পিতার এক উরুদেশে পুত্র ও অন্য উরুদেশে পুত্রবধূ মস্তক রাখিয়া নিদ্রাগত হইল। এ দৃশ্যটি আমাব বড়ই মধুর বোধ হইল। আমাদের দেশের সমাজ পরিচালকেরা যাহাই বলুন, আমি দম্পতির মধ্যে এই বাল্যসখ্য ভাব টুকুর বড় পক্ষপাতী। ইহাতে একটি হৃদয়-লতিকা, একটি হৃদয়-তরুর অঙ্গে অঙ্কুর হইতেই জড়াইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমার বিশ্বাস যে, বাল্যজীবনের এই স্নেহ মমতা, কালে পরিণত হইয়া সংসার আশ্রমের সুখ সমৃদ্ধি প্রগাঢ় করিয়া তোলে, এবং তাহাতে দাম্পত্য প্রেম ঘনীভূত হইয়া যুবকদিগের পবিত্রতা রক্ষার এক প্রধান হেতু হইয়া উঠে। এই সঙ্গে এ দেশের গুরুজন সমক্ষে দম্পতির গোপনভাব উপলক্ষেও দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পতিপত্নীর সম্বন্ধ যদি পবিত্রই হইল, তবে আবার এ গোপনভাব কেন? যদি বল গুরুজনদিগকে সম্মানার্থ; কিন্তু আমি বলি, যাহা পবিত্র, গুরুজন সমক্ষে তাহার আচরণ দূষ্য কেন? আমাদের দেশের প্রথায় বোধ হয়, পুত্রবধূ ও জামাতা যেন শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট কেমন একটু পর পর হইয়া পড়েন। গুরুজন সমক্ষে পতি পত্নীর প্রকাশ্যভাবে মিলন হইলে সংসারিক সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।

নাসীকের স্ত্রীলোকেরা হিন্দি কথা বুঝিতে পারেন না, পুরুষেরা কতক কতক বুঝেন। স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ ক্ষীণাঙ্গী হইলেও অধিকাংশই বলিষ্ঠা: ইহাদের বলের কথা একটি বলি। পাণ্ডাদের বাসায় থাকিবার সময় একদিন আমার জল প্রয়োজন হইলে, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, নিজে কূয়ার নিকটে গেলাম, গিয়া দেখি যে একটি পঞ্চদশ বয়স্কা বালিকা এক বৃহৎ হাণ্ডা লইয়া এক গভীর কূপ হইতে অবলীলাক্রমে জল তুলিতেছেন, আমি কৌতূহলী হইয়া সে হাণ্ডা তুলিতে পারি কি-না, পরীক্ষা করিতে গেলাম, কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি? সে হাণ্ডা তোলা আমার দুষ্কর বোধ হইল; বালিকা হাসিয়া আমার হস্ত হইতে রজ্জু ধরিয়া লইলেন, আমি অবনত মস্তকে সে স্থান হইতে পলায়ন পর হইলাম। এই বালিকা স্থূলাঙ্গী নহেন, কিন্তু কঠিন পরিশ্রমে এরূপ

অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, কঠোর কাজ, তাঁহার পক্ষে অনায়াস-সিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন মিশরের মাইলোর গল্প বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ আছে; মাইলো বাল্যকালে একদিন পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে দেখেন যে, একটি গো-শাবক সেই পর্ব্বতে উঠিতে অশক্ত হইতেছে, মাইলো দুই হস্তে সেই শাবকটিকে তুলিয়া পর্ব্বতের উপরে ছাড়িয়া দিলেন, সেই অবধি প্রতিদিনই সেইরূপ করিতেন, তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাবকটিও কালক্রমে পূর্ণকায়া গাভী হইয়া উঠিল, কিন্তু মাইলো বাল্যকাল্যের ন্যায় নিত্যই সেই গাভীটিকে লইয়া গিরি আরোহণ করিতেন। অভ্যাস করিলে সকল কঠিন কার্য্যই সহজ হইয়া পড়ে। মহারাষ্ট্রীয় কি রমণী কি পুরুষ, দেখিতে বাঙ্গালি অপেক্ষা বড় অধিক বলশালী নহেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহারা শ্রমসহিষ্ণু, এবং সেইজন্যই গুরুতর কার্য্যের উপযোগী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অভ্যাস করিলে বাঙ্গালিও সকল প্রকার কঠিন বা গুরুতর কার্য্যের উপযোগী হইয়া উঠিবেন।

নাসীকের স্ত্রীলোকেরা এত স্বাধীন অবস্থাপন্ন হইলেও, এবং চম্পক বরণা ও অবগুণ্ঠন বিহীনা হইয়া পুরুষ সমক্ষে সচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিলেও নিতান্ত পাষণ্ড ব্যতীত, পুরুষমাত্রকেই সে সরলতা মাখান মুখ-চ্ছবির পবিত্রতার নিকট, অবনত হৃদয় হইতেই হইবে। সে মুখ চ্ছবিতে সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু বিলাসের পঙ্কিলতা নাই,—সে নয়ন জ্যোতিতে তড়িতের দ্যুতি আছে, কিন্তু তড়িতালোকের সে চমক নাই, তাহা নিবাত নিষ্কম্প সরোবর বক্ষে শান্ত, স্থির, নীলাব্জের ন্যায় স্নিগ্ধকর।

নাসীকে দ্রাক্ষাফল বিস্তর জন্মে, এবং চারি আনায় একসের পাওয়া যায়। আহার্য্য দ্রব্যাদিও এখানে যথেষ্ট সুলভ, তবে মৎস্য মাংস এখানকার অধিবাসীরা (মহারাষ্ট্রীয়েরা) আহার করেন না বলিয়া, সহরের মধ্যে সহজে মিলে না। এখানকার জল বায়ু অতি উত্তম।

ক্রমশ।

কংস কারাগারে দেবকী।

১

হা পুত্র! হা বাসুদেব! কি খেলা খেল রে!
এই কি উচিত তোর!— না বুঝিলি দুঃখ মোর!
দশ মাস, দশদিন উদরে ধরিয়া,
সহিনু দারুণ দুঃখ কিসের লাগিয়া?

২

গোপ—রাখালের চির দাসত্ব করিয়া,
করিছ রে! কাল গত! অসার বিলাস রত!
বসুদেব পুত্র হয়ে সন্তান আমার!
রাখালি করিলি কি রে জীবনের সার?

৩

কোথা তোর পাঞ্চজন্য? কোথা তোর গদা?
কোথা চক্র—সুদর্শন? এ সকল বিসর্জ্জন—
দাসত্ব সাগরে দিয়া!—কি মন্ত্রে ভুলিয়া
পদ্মহস্তে লয়েছিস্ পাঁচনী তুলিয়া!

৪

দাসত্বে এতই মোহ!—এতই বিস্মৃতি!
হায় বুক ফেটে যায়! এ বিষাদ কব কায়?
পাষাণ করিয়া বক্ষে, কংস কারাগারে—
মরি আমি!—পুত্র মোর থাকিতে সংসারে।

৫

"মা বলে" সরল মনে, ওরে রে অবোধ!
ডাকিছিস্ সদা যায়,— সেই নন্দরাণী হায়!
প্রকৃত মা নহে তোর! জানিস্ নিশ্চয়—
তার ভালবাসা কভু স্বার্থ ছাড়া নয়!

৬

কাটিস্ গাভীর ঘাস ভ্রমি বনে বনে!—
শীত, বৃষ্টি, রৌদ্র সহি, কাষ্ঠ বোঝা শিরে বহি,
রাখিস্ গোপের মন ধন্যবাদ তরে!—
তাই এক মুষ্টি অন্ন মেলে গোপঘরে!

৭

লইস্ মথিয়া দুগ্ধ—ঘৃত, ননী তুলি,
কিন্তু ভাগ্যগুণে আহা! কিঞ্চিত মিলে না তাহা!
খাইলে করিয়া চুরি, অমনি তখন
ভীষণ শৃঙ্খলে করে সুদৃঢ় বন্ধন!

৮

গোপের গোলামি আর শ্রীমতীর প্রেম,—
বুঝিছি নিশ্চয় চিতে, পারিবি না ছাড়াইতে!
আমারো এদশা দূর হবে না কখন!
কংস কারাগারে হবে ত্যজিতে জীবন!

৯

একদিন উপেক্ষিয়া ছিলি শত শত
ভীম বজ্র,—বাম করে শূন্যে তুলি মহীধরে!
শুনিয়াছি, তোরে নাকি করিলে দর্শন,
বিষধর পায়ে পড়ে করি নত ফণ!

১০

অঘা, বকা আদি যত কংসচর ছিল,
শুনিয়াছি, ক্রমান্বয়ে, বধেছিস্ সমুদয়ে।
হেন বীর পুত্র যার,—এই দশা তার!
এ পাপে রে পুত্র, তোর নাহি রে নিস্তার!

১১

কত যুগ যুগান্তর গত হ'য়ে গেল,
পাষাণ করিয়া বক্ষে, পড়ে আছি কারাকক্ষে;
কত যুগ যুগান্তর যাইবে যে আর!
স্মরিতেও ঘোরে নেত্র,—দেখি অন্ধকার!

১২

রে পুত্র! যাতনা আর সহে না পরাণে;
মার উদ্ধারের জন্য, ভীমকম্বু—পাঞ্চজন্য,
বাজায়ে নীরদ নাদে, আয় ত্বরা করি,
স্কন্ধে ফেলি ভীম গদা—বজ্রমুষ্টি ধরি!

ভক্তি।

দশমকথা—ভক্তির সাধন।

শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্য যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, তাহা সাধন না সাধ্য ?

গুরু। ভক্তি সাধন ও সাধ্য। ভক্তি মুক্তিপ্রদা এজন্য ভক্তি সাধন। আর ভক্তি মুক্তিপ্রদা হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামনা করে না, এজন্য ভক্তিই সাধ্য।

শিষ্য। তবে, এই ভক্তির সাধন কি শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার অনুশীলন প্রথা কি? উপাসনাই ভক্তির সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয়, তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি না।

গুরু। উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু উপাসনা কথাটা অনেক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে? তুমি অনুদিন সমস্ত কার্য্যে ঈশ্বরকে আন্তরিক চিন্তা না করিলে কখনই তাহা পারিবে না।

শিষ্য। তথাপি হিন্দুশাস্ত্রে এই ভক্তির অনুশীলনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইলেন, তাহা হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত ভক্তি হইলেও হিন্দুদিগের মধ্যে বড় বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে; কিন্তু সে আর এক রকমের। প্রতিমা গড়িয়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া, পট্টবস্ত্র গলদেশে দিয়া, গদ্গদ ভাবে অশ্রুমোচন, “হরি! হরি!” বা “মা! মা!” ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ, অথবা রোদন এবং প্রতিমার চরণামৃত পাইলে তাহা মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কাণে,—

গুরু। তুমি যাহা বলিতেছ বুঝিয়াছি। উহাও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে উপহাস করিও না। তোমার হক্সলী টিণ্ডল অপেক্ষা ওরূপ একজন ভাবুক আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ।

শিষ্য। আপনার পূর্ব্বকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।

গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ।

শিষ্য। গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্ত্বেরই প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্ত্রে গৌণ ভক্তি কি প্রকারে আসিল?

গুরু। ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা, এবং কর্ম্মাত্মিকা, ভরসা করি ইহা বুঝিয়াছ। ভক্তি উভয়াত্মিকা বলিয়া, তাহার অনুশীলনে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কর্ম্মাত্মিকা এবং কর্ম্ম সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কর্ম্মেন্দ্রিয়ই সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই উহা ঈশ্বর-মুখী হইল। কিন্তু অনেক শাস্ত্রকারেরা অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাঁহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শ্লোক ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। হরিনামের কথা হইতেছে,—

বিলেবতোরুক্রম বিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্ট কিরীটযুষ্ট মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌনো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎ কাঞ্চন কঙ্কনৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ননিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্ম ভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানু ব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুম্ নজাতু মর্ত্ত্যোভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যা শ্বসঞ্ছবো যস্ত নবেদ গন্ধং॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমানৈ হরিনামধেয়ৈঃ
নবিক্রিয়েতাথ যদাবিকারং নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

ভাগবত, ২স্ক, ৩অ, ২০—২৪

"যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণানুবাদ না শ্রবণ করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ত্ত মাত্র। হে সূত! যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অসতী

জিহ্বা ভেকজিহ্বা তুল্য। যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্ট কিরীট শোভিত হইলেও বোঝা মাত্র। যাহার হস্তদ্বয় হরির সপর্য্যা না করে, তাহা কনক কঙ্কনে শোভিত হইলেও মড়ার হাত মাত্র। মনুষ্যদিগের চক্ষুদ্বয় যদি বিষ্ণুমূর্ত্তি * নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা ময়ূরপুচ্ছ মাত্র। আর যে চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্য্যটন না করে, তাহার বৃক্ষ জন্ম লাভ হইয়াছে মাত্র। আর যে ভগবৎ পদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব। বিষ্ণু পাদার্পিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! হরিনাম কীর্ত্তনে যাহার হৃদয় বিকার প্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।"

এই শ্রেণির ভক্তেরা এইরূপে ঈশ্বরে বাহ্যেন্দ্রিয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা সাকারোপসনাসাপেক্ষ। নিরাকারে চক্ষুপাণি পাদের এরূপ নিয়োগ অঘটনীয়।

শিষ্য। বুঝিলাম বহিরিন্দ্রিয় সকলকে কি প্রকারে ঈশ্বরাভিমুখ করিতে হইবে, তাহার বিশুদ্ধ পদ্ধতি বুঝিতে না পারায়, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে এতটা সাকারোপাসনার প্রাবল্য, বাহ্যাড়ম্বর এবং পরিশেষে ভণ্ডামি আসিয়া পড়িয়া মুখ্যভক্তিকে স্থানচ্যুত ও আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে।

গুরু। কেবল তাহাই নহে। ঈশ্বরোপাসনায়, মস্তক, কর, চরণ, চক্ষু, কর্ণ, নাসা, রসনা, ত্বক, এই সকলকে কি প্রকারে ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহার বিধির কতকগুলি সূচনা শুনিলে। যাহা দুঃখের কথা, লজ্জা বা রুচির অনুরোধে তাহা না বলিলে দুঃখমোচন হয় না। এই মস্তক কর চরণাদির ঈশ্বর সেবায় নিয়োগে সন্তুষ্ট না হইয়া, যে ইন্দ্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা অধমতায় প্রধান বলিয়া বিশেষত ইন্দ্রিয় নামে পরিচিত, এই শ্রেণীর ভক্তেরা সেই নিকৃষ্টের অপেক্ষায় নিকৃষ্টবৃত্তিরও ঈশ্বর সেবায় নিয়োগের উদাহরণ স্বরূপ, বিশুদ্ধ ব্রজলীলার রূপকে রাধাকৃষ্ণের কামকেলি যুক্ত করিয়া দিয়া ভক্তির উপসংহার করিলেন। এবং বাঙ্গালি বৈষ্ণবকবি তাহার সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লিখিলেন,—

---

* এখানে 'লিঙ্গানি বিষ্ণোঃ' অর্থে বিষ্ণুর মূর্ত্তি সকল। অতি সঙ্গত অর্থ। তবে শিব লিঙ্গের কেবল সেই অর্থ না করিয়া, কদর্য্য উপন্যাসও উপাসনা পদ্ধতিতে যাই কেন?

আত্ম ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম।
কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি প্রেম ॥

এইরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয় ঈশ্বরে সমর্পিত হইল। ইহার ফল কি ভয়ঙ্কর হইয়াছে, তাহা কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কার্য্য কলাপে প্রকাশ পাইয়াছে। তোমার রুচির উপর আর অধিক পীড়ন করা যায় না,—এজন্য সে সকলের কথা বেশি করিয়া বলা যায় না। কেবল বোম্বাইয়ের মহারাজের মোকদ্দমার নাম করিলেই হইবে।

শিষ্য। তবে কৃষ্ণলীলাকে বিশুদ্ধ রূপক বলিতেছেন কেন?

গুরু। যখন ইহা প্রথমে কল্পিত হয়, তখন হইতে ইন্দ্রিয়পরতা কিছুই ছিল না। সময়ান্তরে আমি তোমাকে বিষ্ণু পুরাণ হইতে রাসলীলা পড়াইয়া শুনাইব। দেখিবে, তাহাতে ইন্দ্রিয়পরতা কিছুই নাই,—গোপীগণ কৃষ্ণে তন্ময় হইবার আকাঙ্ক্ষিণী, ইহাই আছে। কেবল একস্থানে কতকগুলি গোপীকে "রতিপ্রিয়াঃ" বলা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে রতি অর্থে কৃষ্ণেরতি। এখন সে কথা যাউক। এ সকল কথা তোমায় বলিবার তাৎপর্য্য এই, এখন যাহা ভক্তির সাধন বলিয়া প্রচলিত, তাহা যে ভক্তির প্রকৃত সাধন নহে, একটা গুরুতর ভ্রম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই বুঝাইতে চাই।)

শিষ্য। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি?

গুরু। তাহা ভগবান্ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্যমৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

"হে অর্জ্জুন! যাহারা সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়, এবং অন্য ভজনারহিত যে ভক্তিযোগ তদ্দ্বারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার হইতে সেই আমাতে-নিবিষ্টচেতাদিগের আমি অচিরে উদ্ধার কর্ত্তা হই। আমাতে তুমি মন স্থির কর, আমাতে

বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি উন্নত * হইয়া আমাতেই অধিষ্ঠান করিবে।”

শিষ্য। বড় কঠিন কথা। এইরূপ ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে কয়জন পারে?

গুরু। সকলেই পারে। চেষ্টা করিলেই পারে।

শিষ্য। কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে?

গুরু। ভগবান্ তাহাও অর্জ্জুনকে বলিয়া দিতেছেন,

অথচিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।

“হে অর্জ্জুন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।” অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য্য অভ্যস্ত করিবে।

শিষ্য। অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে পারে না। যাহারা না পারে, তাহারা কি করিবে?

গুরু। তাহারা কর্ম্ম করিতে পারে। তাহারা যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, বা ঈশ্বরানুমোদিত, সেই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মনস্থির হইবে। তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন—

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥

“যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্ম পরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম্ম সকল করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।”

শিষ্য। কিন্তু অনেকে কর্ম্মেও অপটু—বা অকর্ম্মা। তাহাদের উপায় কি?

গুরু। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্ বলিতেছেন,—

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥

---

* শাঙ্করাদি ভাষ্যে “অতউর্দ্ধং” ইহার অর্থে “শরীরপাতদূর্দ্ধং” এই অর্থ আছে। আমি যে ভিন্নার্থ করিয়াছি, তাহার কারণ আছে।

"যদি মদাশ্রিত কর্ম্মেও অশক্ত হও, তবে যতাত্মা হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগ কর।"

শিষ্য। সে কি? যে কর্ম্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম্ম নাই, সে কর্ম্ম ফল ত্যাগ করিবে কি প্রকারে?

গুরু। কোন জীবই একেবারে কর্ম্মশূন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম না করে, ভূততাড়িত হইয়া সেও কর্ম্ম করিবে। এ বিষয়ে ভগবদ্‌যুক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। যে কর্ম্মই তদ্দ্বারা সম্পন্ন হয়, যদি কর্ম্মকর্ত্তা তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, তবে অন্য কামনাভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবেন। তখন আপনা হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে।

শিষ্য। এই চতুর্ব্বিধ সাধনই অতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

গুরু। এই চতুর্ব্বিধই সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ সাধকদিগের পক্ষে অন্যবিধ উপাসনার প্রয়োজন নাই।

শিষ্য। কিন্তু, অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক, প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। তাহারা কি ভক্তির অধিকারী নহে?

গুরু। এইসবস্থলে উপাসনাত্মিকা গৌণ ভক্তির প্রয়োজন। গীতায় ভগবদুক্তি আছে যে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং

"যে যে রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজনা করি।"

এবং স্থানান্তরে বলিয়াছেন,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

"যে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাত্মার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি।"

শিষ্য। তবে কি গীতায় সাকার মূর্ত্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে?

গুরু। ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন।

শিষ্য। প্রতিমাদির পূজা বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মে নিষিদ্ধ, না বিহিত?

গুরু। অধিকারী ভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্বিষয়ে ভাগবত পুরাণ হইতে কপিলোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ভাগবত পুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। তিনি তাঁহার মাতা দেবহূতীকে নির্গুণ ভক্তি যোগের সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের মধ্যে একদিকে, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর চিন্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধরিয়াছেন, আর এক দিকে প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজাদি ধরিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন,—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতে ঽর্চ্চা বিড়ম্বনং॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মা নমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

৩স্ক। ২৯অ। ১৭।১৮।

"আমি, সর্ব্বভূতে ভূতাত্মা স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমাপূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আত্মাস্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।"

পুনশ্চ

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং॥

যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মে রত, সে যতদিন না আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদির পূজা করিবে।"

বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদির অর্চ্চনা বিড়ম্বনা। আর যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি পূজা নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে যতদিন সে জ্ঞান না জন্মে, ততদিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহিত নহে, কেননা তদ্দ্বারা ক্রমশ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমা পূজা গৌণভক্তির মধ্যে।

শিষ্য। গৌণভক্তি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না।

গুরু। মুখ্যভক্তির অনেক বিঘ্ন আছে। যাহাদ্বারা সেই সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় শাণ্ডিল্য সূত্র প্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণভক্তি। ঈশ্বরের

নামকীর্ত্তন, ফল পুষ্পাদির দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পূজা —এসকল গৌণভক্তির লক্ষণ। সূত্রের টীকাকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান ভক্তিজনক মাত্র; ইহার ফলান্তর নাই।

শিষ্য। তবে আপনার মত এই বুঝিলাম যে পূজা, হোম, যজ্ঞ, নাম-সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার ঐহিক বা পরমার্থিক ফল নাই,—ঐ সকল কেবল ভক্তির সাধন মাত্র।

গুরু। তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা তোমাকে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বর-চিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্য-ভক্তির লক্ষণ। যথা বিপদ্মুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণুস্তব; আর "আমার পাপ ক্ষালিত হউক," 'আমার সুখে দিন যাউক,' ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তুতি বা Prayer, গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। আমি তোমাদিগকে পরামর্শ দিই, যে কৃষ্ণোক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের কর্ম্মতৎপর হও।

শিষ্য। সেও ত পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ—

গুরু। সে আর একটি ভ্রম। এসকল ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম নহে; এসকল সাধকের নিজ মঙ্গলোদ্দিষ্ট কর্ম্ম—সাধকের নিজের কার্য্য; ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও যদি এ সকল কর, তথাপি তোমার নিজের জন্যই হইল। ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাঁহার কাজ। অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ম্মই কৃষ্ণোক্ত "সৎকর্ম্ম;" তাহার সাধনে তৎপর হও, এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও। তাহা হইলে যাঁহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম্ম, তাঁহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশ জীবন্মুক্ত হইবে। জীবন্মুক্তিই সুখ। বলিয়াছি, "সুখের উপায় ধর্ম্ম।" এই জীবন্মুক্তি সুখের উপায়ই ধর্ম্ম। রাজসম্পদাদি কোন সম্পদেই তত সুখ নাই।

যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা নামকীর্ত্তন, সন্ধ্যা-বন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা

---

* ভক্ত্যা কীর্ত্তনেন ভক্ত্যাদানেন পরাভক্তিং সাধয়েদিতি * * ন ফলান্তরার্থং গৌরবাদিতি।

করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ব্যতীত ভক্তির কিছু মাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু, যে কোন প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের প্রভেদ অল্প।

শিষ্য। তবে, এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয়, ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবৎ।

গুরু। হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দেখিবে শীঘ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত, অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিবে।

শিষ্য। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঋগ্বেদের দেবগণ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। আকাশ দেবগণ

(সমাপ্ত)।

আমরা পূর্ব্বে যে আকাশ—দেবদিগের কথা বলিয়াছি, তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যদিগের সাধারণ দেব ছিলেন; বরুণ, দ্যু ও ত্রিতকে প্রাচীন আর্য্যগণ মধ্য আসিয়াতে আরাধনা করিতেন, সুতরাং সেই আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা, হিন্দু, ইরাণীয় ও গ্রীকদিগের মধ্যে উক্ত দেবদিগের উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমরা ঋগ্বেদের প্রধান দেব ইন্দ্রের কথা বলিব; তিনিও আকাশদেব, কিন্তু তিনি আদিম আর্য্যদিগের প্রাচীন দেব ছিলেন না, তিনি কেবল হিন্দুদিগের নব্য দেবতা।

হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন আর্য্যজাতির উপাস্য দেবদিগের মধ্যে ইন্দ্রের নাম পাওয়া যায় না। তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হিন্দু আর্য্যগণ যখন মধ্য আসিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখনই আকাশকে এই নূতন নাম দিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অচিরে এই নূতন আকাশদেবের এরূপ প্রাধান্য হইল যে, ভারতবর্ষে অন্যান্য আকাশদেবের মহিমা হ্রাস হইয়া গেল ইন্দ্রের মহিমা বৃদ্ধি পাইল। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সম্বন্ধে যতগুলি স্তুতি আছে অন্য কোন দেব সম্বন্ধে ততগুলি নাই।

এই সকল ঘটনার প্রকৃত কারণ কি? আকাশের দ্যু ও বরুণ এই প্রাচীন আর্য্য নাম থাকিতেও হিন্দুগণ ভারতবর্ষে আসিয়া একটি নূতন নাম আবিষ্কার করিলেন কি জন্য? পুরাতন দেবদিগের অপেক্ষাও এই নূতন দেব অধিক আদরের ও উপাসনার ভাজন হইলেন কি জন্য?

একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ঘটনার কারণ অনায়াসে উপলব্ধি হয়। সরল-হৃদয় প্রাচীন আর্য্যগণ প্রকৃতির এক একটি বিস্ময়-কর দৃশ্য বা কার্য্য দেখিয়া উপাসনা তৎপর হইতেন, এবং সেই দৃশ্য বা কার্য্যকে এক একটি নাম দিয়া উপাসনা করিতেন। যে আকাশ চিরকাল আমাদিগকে আবরণ করিয়া রহিয়াছেন, নিশাকালে নক্ষত্র ও চন্দ্র বিভূষিত হইয়া আমাদিগের ভক্তি উত্তেজিত করেন, তাঁহাকে প্রাচীন আর্য্যগণ বরুণ নাম দিলেন। যে আকাশ প্রাতঃকালে ও দিবাযোগে আলোক বিতরণ করিয়া মানুষ্যের হিতসাধন করেন, প্রাচীন আর্য্যগণ তাঁহাকে দ্যু নাম দিলেন। পরে আর্য্যগণের যে শাখা ভারতবর্ষে আসি-লেন, তাঁহারা আকাশের একটি নূতন ক্রিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভারতবর্ষে বর্ষাকালের বৃষ্টিই জীবন ধারণের প্রধান উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বৃষ্টি দ্বারা গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ডতা শমিত হয়, রৌদ্রের উত্তাপ হ্রাস পায়, ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শুষ্ক নদী-গুলি জলে পূর্ণ হয়, এবং ধান্য যবাদি শস্য পাইয়া মনুষ্যগণ জীবন ধারণ করে। এরূপ হিতকরী বৃষ্টি দেখিয়া কেননা প্রথম হিন্দুগণ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হইবেন, ভারতবর্ষের বর্ষাকালের ঘন ঘটা ও বিদ্যুতের জ্যোতি দেখিয়া কেননা তাঁহারা বিস্মিত হইবেন? আকাশের এই নূতন হিতকর, বিস্ময়কর কার্য্য দেখিয়া প্রথম হিন্দুগণ বর্ষণকারী আকাশের একটি নূতন নাম দিলেন; ইন্দ্ ধাতু অর্থ বর্ষণ, ইন্দ্র অর্থে বর্ষণকারী

আকাশ। আকাশের বর্ষণ ক্রিয়া অন্য ক্রিয়া অপেক্ষা ভারতবর্ষে অধিক বিস্ময়কারী ও হিতকরী, এইজন্য বর্ষণকারী ইন্দ্র অচিরে দ্যু ও বরুণ অপেক্ষা স্তোতাদিগের অধিক প্রিয়পাত্র হইলেন। প্রথম হিন্দুগণ সেই বর্ষণ কার্য্যে কিরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং কিরূপ তাহা উপমাস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নের স্তুতি হইতে প্রকাশ হইবে।

"বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম সমূহ বর্ণনা করিব। তিনি অহিকে * হনন করিয়াছিলেন, পরে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন, পার্ব্বতীয় বহন-শীল নদী সমূহের পথ ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন।

'ইন্দ্র পর্ব্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গাভী যেরূপ সবেগে বৎসের নিকট যায়, ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিল।

"ইন্দ্র বৃষের ন্যায় বেগের সহিত সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিন প্রকার যজ্ঞে অভিষুক্ত সোম পান করিয়াছিলেন। মঘবান সায়ক বজ্র গ্রহণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলেন।

"হে ইন্দ্র! যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে তখন মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করিলে, পরে সূর্য্য ও উষা ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া আর শত্রু রাখিলে না।

"জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহৎ হননশীল বজ্র দ্বারা ছিন্ন বাহু করিয়া বিনাশ করিলেন; কুঠার ছিন্ন বৃক্ষ স্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে।

"দর্পযুক্ত বৃত্র আপনার সমতুল যোদ্ধা নাই মনে করিয়া মহাবীর ও বহুবিনাশী শত্রু বিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্রের হত্যা কার্য্য হইতে উদ্ধার পাইল না। ইন্দ্রশত্রু বৃত্র (নদীতে পতিত হইয়া) নদী সমূহ পিষিয়া ফেলিল।

১ মণ্ডল, ৩২ সূক্ত, ১,২,৩,৪,৫,৬ ঋক্।

ভারতবর্ষের বর্ষাকালের অতুল শোভা দেখিয়া, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতে ভীত হইয়া, হিতকারী বর্ষার জলে তৃপ্ত হইয়া আমাদিগের সরলহৃদয়

* অর্থাৎ মেঘকে। সায়ণ।

পূর্ব্ব পুরুষগণ এইরূপ ইন্দ্রের দ্বারা বৃত্রের অর্থাৎ মেঘের হননের কথা কল্পনা করিয়াছিলেন ; —সেই কল্পনা হইতে পৌরাণিক কত গল্পই সৃষ্ট হইয়াছে! ইন্দ্রের বৃষ্টিদান সম্বন্ধে যেরূপ এই একটি উপমা আছে, সেইরূপ ইন্দ্রের আলোক দান সম্বন্ধে আর একটি উপমা আছে। রাত্রিকালে দিবার আলোক থাকে না, কবিগণ উপমাস্থলে বলিতেন যে পণিঃ নামক অসুর দেবদিগের গাভী (আলোক) অপহরণ করিত। প্রাতঃকালে প্রথমে ঊষার আলোক দৃষ্ট হয়, কবিগণ কল্পনা করিতেন যে, ইন্দ্র সরমাকে (ঊষাকে) সেই গাভী অন্বেষণে পাঠাইতেন। এবং ক্ষণেক পর প্রাতঃকালের আলোকে আকাশ পূর্ণ হয়, ইন্দ্র অপহৃত গাভী উদ্ধার করিলেন!

"হে ইন্দ্র! দুর্গম স্থল ভেদকারী বাহক মরুৎগণের সহিত তুমি সেই দুর্গম গুহায় লুক্কায়িত গাভীগণ অনুসন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে।"

১ মণ্ডল, ৬ সূক্ত, ৫ ঋক্।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে এই বৈদিক উপমা হইতে গ্রীকদিগের ইলিয়ড নামক মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, এইরূপ অনেক পণ্ডিতে অনুমান করেন।

ইন্দ্রের পিতা মাতা ও স্ত্রী সম্বন্ধে ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে।

"তোমার পিতা দ্যুকে লোকে সুবীর মনে করিত, তিনি ইন্দ্রের কর্ত্তা এবং বলবান্; তিনি কার্য্য কুশল, এবং পৃথিবীর ন্যায় অবিচলিত স্বর্গীয় বজ্রধারীকে জন্ম দিয়াছেন।"

৪ মণ্ডল, ১৭ সূক্ত, ৪ ঋক্।

"বলবান পিতা বলবান পুত্রকে যুদ্ধের জন্য জন্ম দিয়াছিলেন, বলবতী নারী বলবান পুত্র প্রসব করিলেন।"

৭ মণ্ডল, ২০ সূক্ত, ৫ ঋক্।

"হে ইন্দ্র! যখন তুমি ঊষার ন্যায় উভয় পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, তোমার সুশীলা মাতৃদেবী তোমাকে মহৎ প্রজা সমূহের মহান্ সম্রাটরূপে জন্ম দিয়াছিলেন।"

১০ মণ্ডল, ১৩৪ সূক্ত, ১ ঋক্।

"হে ইন্দ্র! তুমি সোম পান করিয়াছ, তোমার গৃহে যাও, তোমার গৃহে তোমার কল্যাণী জায়া আছেন।"

৩ মণ্ডল, ৫৩ সূক্ত, ৬ ঋক্।

"আমি শুনিয়াছি ইন্দ্রাণী নারীদিগের মধ্যে সৌভাগ্যবতী, কেননা তাঁহার পতি কখনই বার্দ্ধক্য বশত্ মরিবেন না।"

১০ মণ্ডল, ৮৬ সূক্ত, ১১ ঋক্।

এইরূপে স্থানে স্থানে ইন্দ্রের স্ত্রীর ইন্দ্রাণী নামে উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার অন্য কোনও নাম বা বিশেষ বর্ণনা নাই। ঋগ্বেদের ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচি নহে, ঋগ্বেদে শচিপতি অর্থে যজ্ঞপালক;—তাহা হইতেই ইন্দ্রের স্ত্রী শচি সম্বন্ধে পৌরাণিক কথা সৃষ্ট হইয়াছে।

ফলত বৈদিক ইন্দ্র পৌরাণিক ইন্দ্র হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন। বৈদিক ইন্দ্র বিক্রমশালী যুদ্ধপ্রিয় আকাশ দেব, তিনি মনুষ্যের জন্য বৃত্রকে হনন করিয়া বৃষ্টি দান করেন, দেবদিগের জন্য পণিসের গুহা হইতে দেবদিগের গাভী উদ্ধার করেন, তিনি অতিশয় সোমপ্রিয়, রথে হরি নামক অশ্বদ্বয় সংযোজিত করিয়া সর্ব্বদা সোম পানার্থ যজ্ঞে আইসেন, এবং অনার্য্য বর্ব্বর জাতিদিগের সহিত যুদ্ধে আর্য্য হিন্দুদিগকে সহায়তা করেন। পৌরাণিক ইন্দ্র বিলাসপটু সমৃদ্ধিশালী স্বর্গের রাজা, কখন কখন পৃথিবীর রাজাদিগের নিকট রথে অবতীর্ণ হয়েন, অথবা তাঁহাদিগকে নিজ ধামে লইয়া যান, এবং অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করেন। কখন কখন অসুরদিগের দ্বারা স্বর্গচ্যুত হইলে, তাঁহার উদ্ধারার্থ ব্রহ্মাদি প্রধান দেবদিগের নিকট গমন করেন, এবং পুণ্য বলে স্বর্গের রাজ্য কেহ না প্রাপ্ত হয়েন, সেই জন্য কঠোর তাপসদিগের তপ ভঙ্গের নিমিত্ত মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণকে পাঠাইয়া দেন। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই ধর্ম্ম বিশ্বাস গুলি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়, এবং যখন যুদ্ধপ্রিয় সবল বাহু প্রথম আর্য্যগণ ক্রমে ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া অধিকতর সভ্যতালাভ করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু দুর্ব্বল, কিছু সুখপ্রিয় হইয়া উঠিলেন, তখন বেদের যুদ্ধপ্রিয় বিক্রমশালী ইন্দ্রও ক্রমে পুরাণের সুসভ্য সুখপ্রিয় ইন্দ্রে পরিণত হইলেন। কিন্তু সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্র অপেক্ষা মহত্তর দেব নাই; পুরাণে ইন্দ্র একজন নিম্ন শ্রেণীর দেব মাত্র, সুসভ্য হিন্দুগণ ইন্দ্র অপেক্ষা মহত্তর দেবকে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যত্রয় দেখিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নাম দিয়া ছিলেন। এইটি কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা পরে দেখাইব।

পৌরাণিক ইন্দ্র সর্ব্বদাই অসুরদিগকে আশঙ্কা করেন, এবং কখন কখন অসুরদিগের দ্বারা স্বর্গচ্যুত হইয়া ব্রহ্মাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। এ উপাখ্যানের প্রকৃত অর্থ কি ? অসুরগণ কে ? ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে যে বিস্ময়কর আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আর্য্যগণের প্রাচীন অজ্ঞাত ইতিহাসের উদ্ধার সাধন হইয়াছে, এবং প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্ম প্রণালী সমূহের প্রকৃত অর্থ অনেক পরিমাণে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

আদিম আর্য্যগণ মধ্য আসিয়ায় বাস কালে উপাস্যদিগকে "দেব" বা "অসুর" বলিতেন। পরে সেই আর্য্যদিগের মধ্যে কোন কারণে একটি বিবাদ বা বিচ্ছেদ হইয়া দুইটি দল হইল। এক দলের লোক অন্য দলের উপাস্যদিগকে নিন্দা করিতে লাগিল। যে দল ভারতবর্ষে আসিলেন, তাঁহারাই প্রাচীন হিন্দুগণ, অন্য দল প্রাচীন ইরাণীয়গণ। ইরাণীয়গণ উপাস্যদিগের সাধারণ নাম "অহুর" দিয়া হিন্দুদিগের উপাস্য "দেব" দিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, এবং হিন্দুগণ উপাস্যদিগকে "দেব" নাম দিয়া ইরাণীয়দিগের উপাস্য "অসুর"দিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কেবল উপাস্যদিগের সাধারণ নাম লইয়া এই পরস্পর নিন্দা চলিতে লাগিল। বরুণ, মিত্র, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, বৃত্রহন্তা, অর্য্যমা সোম প্রভৃতি যাঁহারা প্রাচীন আর্য্যদিগের উপাস্য ছিলেন, তাঁহাদিগকে উভয় দলেই উপাসনা করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে "দেব" বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন, ইরাণীয়গণ তাঁহাদিগকে "অহুর" বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। বিবাদের পর হিন্দুগণ যে সকল নূতন দেব কল্পনা করিলেন, ইরাণীয়গণ তাঁহাদিগকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন না, বরং পিশাচ বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইন্দ্র হিন্দুদিগের নূতন কল্পিত দেব, সুতরাং ইন্দ্রকে ইরাণীয়গণ পিশাচ বলিয়া ঘৃণা করেন।

আমাদিগের শাস্ত্রে যে অসুর নিন্দা আছে; তাহা পাঠকদিগকে বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ইরাণীয়দিগের শাস্ত্রে যে দেব নিন্দা আছে, এবং হিন্দুদিগের নব্যদেব ইন্দ্রের নিন্দা আছে সে বিষয়ে দুই একটি অংশ ইরাণীয় শাস্ত্র "অবস্থা" হইতে উদ্ধৃত করিব।

"যখন শস্য ভাল হয়, তখন দেবগণ যাতনায় চীৎকার করে; যখন যব উৎপন্ন হয়, তখন দেবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। * * যখন প্রচুর শস্য হয়, তখন দেবদিগের গলার ভিতর যেন উত্তপ্ত লৌহ ঘুরাণ হয়"। জেন্দ অবস্থা। তৃতীয় ফর্গার্দ।

"বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রপতি মিত্রের রথের পার্শ্বে সহস্র তীক্ষ্ণ ও সুনির্ম্মিত বর্শা আছে। সে বর্শা সকল আকাশ দিয়া দেবদিগের কঙ্কালের উপর দিয়া যায়।" জেন্দ অবস্থা। মিহির যাস্ত।

"হে জারা অস্ত্র! যখন তুমি একত্র পলায়মান পৌত্তলিক, তস্কর ও দেবদিগকে আক্রমণ করিবে, তখন সেই উচ্চার্য্য শব্দ উচ্চারণ করিও। * * দেবগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, দেব উপাসকগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর দংশন করিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইতেছে।"

জেন্দ অবস্থা। স্রোশ যাস্ত।

"আমি ইন্দ্রকে, সৌককে, ও দেব নঙ্ঘত্যকে এই গৃহ হইতে, এই পল্লী হইতে, এই নগর হইতে, এই দেশ হইতে, * * এই পবিত্র অখণ্ড জগৎ হইতে দূর করিয়া দিই।"

জেন্দ অবস্থা। দশম ফর্গার্দ।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ হওয়ায় একদল অন্য দলের উপাস্যদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। উভয় দলই প্রাচীন মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা প্রভৃতি উপাস্যদিগকে উপাসনা করিতেন, কিন্তু এক দল তাঁহাদিগকে "দেব" বলিয়া উপাসনা করিতেন, ও দেব শত্রুদিগকে অসুর বলিয়া নিন্দা করিতেন, অন্যদল তাঁহাদিগকে "অহুর" বলিয়া উপাসনা করিতেন ও অহুর শত্রুদিগকে "দেব" বলিয়া নিন্দা করিতেন। এইটি ও যে এক দিনে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা নহে, ঋগ্বেদের অনেক স্থলে ইন্দ্র বরুণাদিকেই পুরাতন নাম "অসুর" বলিয়াই উপাসনা করা হইয়াছে। কিন্তু দুই দলে বিবাদ যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমনই হিন্দুগণ ঘৃণিত পাপমতি দেব শত্রুদিগকেই অসুর বলিয়া অভিহিত করিলেন। বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে এবং পুরাণ ও ইতিহাসে আমরা এই অর্থেই অসুর শব্দ ব্যবহৃত দেখিতে পাই।

এখন আমরা পৌরাণিক দেবাসুরের যুদ্ধ কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সে যুদ্ধ কথা কাল্পনিক নহে; আর্য্য ইতিহাস যতদূর জানিতে

পারা যায়, তাহার পূর্ব্বের সময়ের ঘটনাবলি সেই পৌরাণিক কথায় সম্মিলিত রহিয়াছে। চারি পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মধ্য আসিয়াতে ইরাণীয়-আর্য্য ও হিন্দু-আর্য্যাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের যে বিবাদ ও বিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহাই দেবাসুরের যুদ্ধ! আমরা পুরাণে দেখি, যে, সে যুদ্ধে দেবগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বোধ হয় দেব-উপাসক আর্য্যগণই সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মধ্য আসিয়া ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন! সে পরাজয়ই আমাদিগের বিজয়ের দিন, আমাদিগের গৌরবের হেতু। সেই দিন হইতে আর্য্যজাতি ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, সেই দিন হইতে আমাদিগের পৃথক ধর্ম্ম প্রণালী, আমাদিগের সভ্যতা, আমাদিগের ইতিহাস আরম্ভ হইল

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

মৈত্রী।

৩।

জাতিভেদ।

হিন্দুবর্ণভেদ প্রণালীর আর একটি লক্ষণ আছে। সে লক্ষণটি ইউ-রোপীয় সমাজে দৃষ্ট হয় না। সে লক্ষণটির কথা এখন বলিব।

হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালীতে সমত্ব আছে কি না বুঝিতে হইলে, হিন্দু কাহাকে সমত্ব বলেন, অথবা হিন্দুর বিবেচনায় প্রকৃত সমত্ব কি, বা প্রকৃত সমত্ব কিসে হয়, অগ্রে তাহাই বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। তুমি আমি যাহাতে সমত্ব দেখি, হিন্দু-শাস্ত্রকার হয়ত তাহাতে বৈষম্য দেখিয়াছিলেন। অতএব হিন্দু-শাস্ত্রকার কিসে সমত্ব দেখিতেন, অগ্রে তাহা ঠিক করা চাই। আষাঢ় মাসের নবজীবনে বুঝাইয়াছি, যে, হিন্দু পার্থিবপদার্থ এবং পার্থিব আস-ক্তিতে সমত্ব দেখেন না, বৈষম্যই দেখেন। হিন্দুর মতে এক ব্রহ্ম বই আর কিছুতেই সমত্ব নাই, ব্রহ্ম পদার্থ যেখানেই থাকুক আর যাহাতেই থাকুক তাহা এক এবং সমান। ব্রহ্ম হইতে যাহা প্রক্ষিপ্ত, জগৎ বল, সৃষ্টি বল, পৃথিবী বল, পার্থিবতা বল, যাহাই বল, ব্রহ্ম হইতে যাহা প্রক্ষিপ্ত

তাহাই বহু এবং বহু বলিয়া বৈষম্য বিশিষ্ট। তাই হিন্দুর মতে পার্থিব পদার্থ এবং অধিকারে সমত্ব নাই, এবং থাকিতে পারে না। কেবল মাত্র বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। পার্থিব পদার্থ এবং অধিকারের অপলাপে বা পরিত্যাগেই প্রকৃত সমত্ব হইয়া থাকে। পার্থিবতা এবং পার্থিব অধিকার বহু জিনিষ লইয়া। অতএব লোকমধ্যে পার্থিবতা এবং পার্থিব অধিকার যত বৃদ্ধি হয়, তাহাদের মধ্যে বৈষম্যও তত বৃদ্ধি হয়। শুধু তাও নয়, পার্থিবতা বাড়িলে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সমত্ব কমিয়া বৈষম্য বাড়ে। অর্থাৎ সমস্ত মানসিক শক্তি, হৃদয়ের প্রবৃত্তি ইত্যাদির মধ্যে যাহার যতটুকু ক্রিয়া বা কর্ত্তৃত্ব থাকিলে, ব্যক্তিগত সমত্ব বা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় তাহার কমবেশি হইয়া পড়ে। এবং কমবেশি হইয়া পড়িলেই প্রত্যেক ব্যক্তি বৈষম্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। বৈষম্যে পূর্ণ হইয়া উঠিলে মানুষ যেন কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই ইতস্তত করিতে থাকে, কি চিন্তায়,—কি কার্য্যে কিছুতেই স্থৈর্য্যলাভ করিতে পারে না। ইউরোপে পার্থিবতা এত প্রবল বলিয়া সেখানকার লোক—কি বড়, কি ছোট—সকলেই এত অস্থির, এত চঞ্চল, এত পরিবর্ত্তনপ্রিয়। ইউরোপের অস্থিরতা, চঞ্চলতা এবং পরিবর্ত্তনপ্রিয়তাকে উন্নত প্রকৃতির লক্ষণ বলিয়া মনে করা বড় ভুল। উহা প্রকৃত পক্ষে নিকৃষ্ট প্রকৃতিরই লক্ষণ। ইউরোপে আত্মসমত্ব নাই বলিয়াই তথায় ঐ সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পার্থিবতা বৃদ্ধি হইলে যখন আত্মসমত্বই নষ্ট হইয়া যায়, আপনাকেই যখন বৈষম্যময় হইয়া উঠিতে হয়, তখন সামাজিক সমত্ব কেমন করিয়া বাড়িবে, এবং সামাজিক বৈষম্য কেমন করিয়া কমিবে? ফলত পার্থিবতা যেখানে প্রবল, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিও যেমন বৈষম্যময় ও সমত্বশূন্য সমস্ত সমাজও তেমন বৈষম্যময় ও সমত্বশূন্য। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা পার্থিবতার উল্টা জিনিস। আধ্যাত্মিকতা ব্রহ্মমুখী এবং পার্থিবতা হইতে বিমুখ। এক সমত্বময় ব্রহ্ম পদার্থ লইয়া আধ্যাত্মিকতা। অতএব যেখানে পার্থিবতার পরিহার, এবং আধ্যাত্মিকতার আদর, সেখানে কি ব্যক্তিগত কি সমাজগত সকল প্রকার সমত্বের বৃদ্ধি, এবং বৈষম্যের বিনাশ। পার্থিব পদার্থ এবং অধিকার পরিত্যাগে এবং আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধিতে প্রকৃত সাম্য বা সমত্ব, এ কথা না বুঝিলে হিন্দুবর্ণভেদ প্রণালীতে যে প্রকৃত সমত্ব আছে তাহাও বুঝা যাইবে না।

সংসার কার্য্যে পার্থিব পদার্থ এবং অধিকারের সংস্রব এককালে পরিত্যাগ করা যায় না। তাই বর্ণভেদ প্রণালীতে ক্ষত্রিয়ে রাজকার্য্য এবং রাজ্য-রক্ষার ভার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বৈশ্যে কৃষি ও বাণিজ্যের ভার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং শূদ্রে সমাজের সেবার ভার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মন্বাদি ঋষি-দিগের প্রণীত মানবধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ বিবেচনার সহিত অধ্যয়ন করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, পার্থিব পদার্থ সম্পদ বা অধিকার দেওয়া বর্ণভেদ প্রণালীর উদ্দেশ্য নয়, পরিত্যাগ করানই সে প্রণালীর উদ্দেশ্য। সমাজ রক্ষার্থ সে প্রণালীতে যে বর্ণের যতটুকু পার্থিব সংস্রব থাকা নিতান্ত প্রয়োজন ততটুকু মাত্র সংস্রব রাখিবার ব্যবস্থা আছে, অবশিষ্ট সমস্ত ব্যবস্থা পার্থিব সংস্রব আসক্তি এবং অধিকার পরিত্যাগপক্ষে। ব্রাহ্মণের ত কথাই নাই; শয়ন ভোজন ভিন্ন তাঁহার অন্য পার্থিব অধিকার নাই বলিলেই হয়। অধ্যয়ন অধ্যাপনা যাগযজ্ঞ ধ্যান ধারণা এই সকল লইয়াই ব্রাহ্মণের জীবন। ধনোপার্জ্জন তাঁহার কার্য্য নয়। ভোগ বিলাস তাঁহার দিক্ দিয়াও যাইতে পায় না। ক্ষত্রীয় রাজা রাজ্যেশ্বর বটে, কিন্তু তিনি পার্থিব ভোগের অধিকারী নন। প্রকৃত রাজা হইতে হইলে তাঁহাকে একজন নানা বিদ্যাসম্পন্ন নানা গুণালঙ্কৃত জিতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত বিলাস-বিদ্বেষী সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ প্রজাবৎসল মহাপুরুষ হইতে হয়।

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাৎ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥
ইন্দ্রিয়াণাং জয়েযোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশং।
জিতেন্দ্রিয়োহি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥
দশকাম সমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ॥

মনুসংহিতা, ৭ অ—৪৩ হইতে ৪৫।

ত্রিবেদী হইতে রাজা বেদ শিক্ষা করিবেন, এবং দণ্ডনীতি তর্কবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা এবং বার্ত্তারম্ভ শাস্ত্র যথাসম্ভব লোকের নিকট শিক্ষা করিবেন। দিবারাত্রি ইন্দ্রিয় জয় করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয় রাজা প্রজাগণকে বশীভূত করিতে পারেন। কামজ দশটি এবং ক্রোধজ আটটি ব্যসন যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন।

আবার :—

ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ শাসনে॥
বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে॥
তেভ্যোঽধিগচ্ছেদ্বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশ।
বিনীতাত্মা হি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ॥

মনু, ৭ অ—৩৭ হইতে ৩৯।

রাজা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ত্রিবেদজ্ঞ বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিবেন এবং তাঁহাদের আজ্ঞাধীন থাকিবেন। বেদবিৎ শুদ্ধস্বভাব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে নিত্য সেবা করিবেন। যে সতত বৃদ্ধসেবা করে, রাক্ষসেরা—হিংস্রকেরাও তাহাকে পূজা করিয়া থাকে। রাজা বিনীত হইলেও ঐ ব্রাহ্মণগণের নিকট বিনয় শিক্ষা করিবেন। বিনীত রাজা কখনই বিনষ্ট হয়েন না।

রাজার চিন্তার মধ্যে দুইটি—আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং রাজ্যের চিন্তা। এবং কাজের মধ্যে দুইটি—আত্মার কাজ এবং রাজ্যের কাজ। এই দুইটি চিন্তায় এবং এই দুইটি কাজে তিনি দিবারাত্রি নিযুক্ত। কেবল দিবসে দুই চারি দণ্ডের জন্য একবার ভোজন ও বিশ্রাম এবং রাত্রিতে দুই চারি দণ্ডের জন্য একবার ভোজন ও নিদ্রা। হিন্দুরাজা অতুল পদ এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। কিন্তু ধর্ম্মই তাঁহার প্রকৃত অধিকার। জনক যুধিষ্ঠিরের ন্যায় হিন্দুরাজা মণিমুক্তাখচিত সিংহাসনোপবিষ্ট মহাযোগী মাত্র। সকল হিন্দুরাজাই যে মহাযোগী ছিলেন তা নয়। কিন্তু যে দেশের শাস্ত্র এত উন্নত এবং রাজধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও নীতি এত উচ্চ ও পবিত্র, সে দেশে অনেক রাজা যে জনক যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাযোগী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। বর্ণভেদ প্রণালীতে পৃথিবীর ব্যবসায় বাণিজ্য ধন সম্পত্তি বৈশ্যের বটে। কিন্তু সে ধন বৈশ্যের নিজের ভোগের নিমিত্ত নয়, যাগযজ্ঞ ক্রিয়া কলাপ সদাব্রত সদনুষ্ঠান সমাজসেবা এবং রাজভাণ্ডার পোষণার্থ সে ধন। একথার শাস্ত্রীয় প্রমাণ আবশ্যক নাই। ধন যে সৎকর্ম্মের জন্য এবং পাঁচজনের উপকারের জন্য, একথা এদেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমান প্রচলিত। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কথা

ভাল জানি না। কিন্তু যতটুকু জানি বা বুঝিতে পারি তাহাতে বোধ হয় যে সে সব দেশে একথা এদেশের ন্যায় প্রচলিত নাই। এদেশে অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকের হাতেও দুই চারি টাকার সঙ্গতি হইলে,সেই শ্রেণীর লোকে প্রত্যাশা করিয়া থাকে, যে, সে তাহা সৎকর্ম্মে ব্যয় করিবে এবং কার্য্যত সে তাহাই করিয়া থাকে, প্রায়ই নিজের ভোগে বা ব্যবহারে ব্যয় করে না। এবং কিঞ্চিন্মাত্র ধনের অধিকারী হইয়া যে ব্যক্তি ক্রিয়াকলাপ বা পাঁচজনকে প্রতিপালন না করে, এদেশে সে যেমন সমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হয়, বোধ হয় আর কোন দেশে তেমন হয় না। এদেশে ধন ভোগের জন্য নয়,—ধর্ম্মচর্য্যার জন্য। বর্ণভেদ প্রণালীতে বৈশ্যের ধনোপার্জ্জনও সেই জন্য, পার্থিব বাসনা পূরাইবার জন্য নয়। মূর্খ শূদ্র দাসত্বে আবদ্ধ এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ। কিন্তু তাহাকেও মুক্তি চিন্তা করিতে হইবে, ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত ব্রতব্রত করিতে হইবে, এবং ব্রাহ্মণের মুখে পুরাণ কথা শুনিতে হইবে। সকলেই জানেন, যে, স্ত্রী এবং শূদ্রের নিমিত্তই পুরাণের সৃষ্টি।

দেখা যাইতেছে, যে, এ দেশের বর্ণভেদ অনুসারে ব্যবসায় ভেদ হইলেও ব্যবসায়ার্জ্জিত বিষয় ভোগের জন্য বর্ণভেদ নয়। এ দেশের বর্ণভেদ প্রণালীতে বর্ণ যে পরিমাণে উচ্চ পার্থিব সম্পদ ও অধিকার সে পরিমাণে বেশি নয়, পার্থিব সম্পদ ও অধিকারের পরিহার সেই পরিমাণে বেশি। এদেশের বর্ণভেদ প্রণালীতে পার্থিবতা পরিহার সকল বর্ণের পক্ষেই ব্যবস্থিত, এবং সেই পার্থিবতা পরিহারে সকল বর্ণের অপূর্ব্ব সমত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। আবার পার্থিবতা পরিহারই যদি বর্ণভেদ প্রণালীর প্রকৃত মর্ম হয়, তবে আর একটা কথা না মানিয়া থাকা যায় না। সে কথাটা এই, যে, বর্ণভেদ অনুসারে যে পার্থিব অধিকার ভেদ আছে, তাহাকে কিছুতেই বর্ণমধ্যে বৈষম্যের কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। সে সকল অধিকার বর্ণগুলিকে আপন আপন সুখ সমৃদ্ধি এবং ভোগের নিমিত্ত দেওয়া হয় নাই, কেননা পার্থিবতা পরিহার সকল বর্ণেরই সমান উদ্দেশ্য। অতএব সম্ভব এই, যে, সমস্ত সমাজের রক্ষা ও মঙ্গলের নিমিত্ত সে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে পার্থিব বলিয়া বৈষম্যের কারণ, এরূপ বিবেচ্য হইলেও সে সকল বিশেষ বিশেষ পার্থিব অধি-

কার বর্ণ সকলের মধ্যে বৈষম্যের কারণ হইতে পারে না। কেননা সে সকল অধিকার বর্ণ বিশেষের উদ্দেশে প্রদত্ত হয় নাই, সমস্ত সমাজের উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা সকল লোকের উদ্দেশে দেওয়া হয় তাহা লোক বিশেষের অযথা অভিমান বা অহঙ্কারের কারণ হইতে পারে না। হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালী আধ্যাত্মিকতা বা ত্যাগমূলক বলিয়া উহাতে যে পার্থিব অংশটুকু আছে, তাহাও বর্ণ সকলের মধ্যে সমত্বের বিরোধী হইতে পারে নাই। সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি করিলে এতই লাভ হয়, সমাজ এতই শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে।

এখন এ কথা বলিলে বুঝা যাইবে, যে, ইউরোপের ন্যায় এদেশে পার্থিব ভোগাধিকার লইয়া বর্ণ ভেদ হয় নাই। ইউরোপের ন্যায় এদেশে লোকের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণভেদে পার্থিব ভোগাধিকার নয়, এদেশে লোকের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণভেদে পার্থিবতা ত্যাগ এবং ধর্ম্মচর্য্যা। এই কথা বিবেচনা করিয়াই মার্কিণ পণ্ডিত জন্সন্ বলিয়াছেন:—"As the basis of Brahminical speculation is that self is nothing' and that of their ethics that selfishness is hell, so the substance of their jurisprudence is a discipline of entire self renunciation. The theoretic aim of the Manavasastra is the utter suppression of selfish desire." আর এক স্থলে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের আত্মসংযম এবং পরার্থপরতা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া সেই পণ্ডিত বলিয়াছেন:—"We see the same endeavour in the stern disciplines laid upon servants, priests and kings, a deeper democracy of renunciation beneath the tyrannies of caste." * পার্থিবতায় হিন্দু সমত্ব দেখেন না, বৈষম্য দেখেন, হিন্দুর সমত্ব পার্থিবতা ত্যাগে। তাই হিন্দুর বর্ণভেদে অর্থাৎ শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ ভেদে পার্থিবতা পরিত্যাগের পরিমাণভেদ। "The demands of ascetcism rose in proportion to one's elevation in caste life." † যে পার্থিবতায় বৈষম্য এবং বৈষম্যের মূল সেই পার্থিবতা পরিত্যাগের ব্যবস্থাতেই হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালীর অপূর্ব্ব সাম্য বা সমত্ব রহিয়াছে।

---

* *Oriental Religion* নামক গ্রন্থের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় খণ্ডের ৬ম অধ্যায় দেখ।

† ঐ ঐ ৭ম অধ্যায়।

ইউরোপীয় সমাজপ্রণালী দেখিয়া যাঁহাদের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, যে, পার্থিব অধিকারের সমান বিভাগ লইয়াই সামাজিক সাম্য, তাঁহারা হিন্দু-সমাজ-শরীরে যে অপূর্ব্ব সমত্ব আছে, তাহা বুঝিতে একেবারেই অসমর্থ, এবং তাঁহারা শূদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে বিবাহ করিতে পারে না কেন, বৈশ্য যুদ্ধ করিতে পারে না কেন, এইরূপ নানাবিধ অপ্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন করিয়া বিষম গণ্ডগোল করেন, এবং লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, যে, হিন্দু সমাজে সাম্যের চিহ্নমাত্র নাই, হিন্দু সমাজ সাম্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

হিন্দু-বর্ণভেদ প্রণালীর মূলে যে সমত্ব আছে, তাহার যে অর্থ করিলাম হিন্দুসমাজ দৃষ্টে তাহা বড় একটা ভুল বলিয়া মনে হয় না। এখনও হিন্দু সমাজে বর্ণ লইয়াই মানুষ মানুষ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট। আর কিছু লইয়া মানুষকে মানুষ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট জ্ঞান করিবার রীতি নাই। কোন একটি বর্ণ লইয়া বিচার করিলে একথা ঠিক বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। কায়স্থ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু কায়স্থের মধ্যে সকল কায়স্থই সমান, কেহ কোন রকমে কাহারো অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়। কায়স্থ সমাজের মধ্যে যিনি ক্রোরপতি তিনিও যেমন একজন, যিনি উদরান্নের জন্য লালায়িত তিনিও তেমনি একজন; যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী তিনিও যেমন একজন যিনি মূর্খ এবং নিরক্ষর তিনিও তেমনি একজন। ক্রোরপতি কায়স্থ কাঙ্গাল কায়স্থের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করেন, কাঙ্গাল কায়স্থের ঘরে কন্যাদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন না। আমার বাল্যকালের একটি কথা মনে পড়ে। একজন পল্লীগ্রামস্থ কায়স্থের বাড়ীতে স্বজাতীয়দিগের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বেলা আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে, আহারাদি প্রস্তুত, চণ্ডীমণ্ডপ আটচালা নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে পণ্ডিতও আছেন, ধনাঢ্যও আছেন। সকলেই স্থিরভাবে বসিয়া আছেন,—ভোজন আরম্ভ হইতেছে না। প্রায় এক ঘণ্টা পরে একখানি অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, একখানি অতি মলিন উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া একটি লোক আগমন করিলেন। অমনি সমস্ত নিমন্ত্রিত মণ্ডলী বলিয়া উঠিলেন—'এই যে মিত্রজ মহাশয় আসিয়াছেন, এইবার তবে ভোজনের উদ্যোগ হইতে পারে'। যিনি আসিলেন তিনি কাঙ্গাল কিন্তু কায়স্থ। তাই পণ্ডিত মূর্খ ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে উপস্থিত সমস্ত কায়স্থ সেই কাঙ্গালের অপেক্ষায় ভোজন হইতে বিরত হইয়া বেলা তিন প্রহর পর্য্যন্ত

স্থির ভাবে বসিয়াছিলেন। এদেশে এক বর্ণভেদ আছে মাত্র, নহিলে সকল লোকই সমান। এদেশে বর্ণের ভিতরে ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলেই একত্র পান ভোজন ইত্যাদি করিয়া থাকে এবং পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ হয়। ইউরোপে তাহা হয় না। সেখানে বর্ণভেদ নাই বটে। কিন্তু অবস্থা সম্পদ সম্পত্তি বিদ্যা যশ প্রভৃতি বহুতর জিনিস লইয়া পান ভোজন বিবাহাদির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। অতএব সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে, লোকমধ্যে প্রকৃত সাম্য এদেশে যত আছে ইউরোপে তাহার অনেক কম। অতএব বলিতে পারা যায়, যে, হিন্দুর সোহং মূলক সমত্ববাদ শুধু শাস্ত্রের বচন নয়। হিন্দুর সমাজে সে সমত্ব বহুল পরিমাণে আছে।

হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালী সম্বন্ধীয় আর একটি কথা এখানে বলিতে হইবে। সে কথা এই যে, বর্ণভেদ প্রণালী অনুসারে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের যে পদ অপরাপর বর্ণের পদ তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু তা বলিয়া ব্রাহ্মণ অপরাপর বর্ণের কথা বিস্মৃত নন। এত বড় হইয়া ব্রাহ্মণ অতি ক্ষুদ্র অতি অধমের ভাবনাও ভাবিয়াছেন। সমাজের যে যেখানে আছে এবং যে যেমন হউক তিনি সকলকেই জানেন, সকলেরই তত্ত্ব লয়েন, সকলেরই পরকালের ভাবনা ভাবেন, সকলেরই উদরান্নের জন্য চিন্তা করেন। মনু বলিতেছেনঃ—

অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাং।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তোজীবেৎ কারুককর্ম্মভিঃ॥ (১০ অ—৯৯)

শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবায় অপারগ হইলে যদি তাহার স্ত্রীপুত্র অন্নাভাবে মারা যায়, তবে সে কারুকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

এইরূপ দেখিবে, হিন্দু শাস্ত্রকার অতি অধমের ভাবনাও ভাবিয়া থাকেন, —সমাজের ছোটবড় সকলের নিমিত্তই বিধি ব্যবস্থা করেন। হিন্দুশাস্ত্রকারের কাছে শূদ্র অধম বটে, চণ্ডাল অস্পৃশ্য বটে। কিন্তু যেখানে জঠরানলের কথা, যেখানে অন্নাভাবে মরিয়া যাইবার কথা, সেখানে হিন্দুশাস্ত্রকারের ব্রাহ্মণের জন্যও যেমন ভাবনা, অধম শূদ্র এবং অস্পৃশ্য চণ্ডালের জন্যও তেমনি ভাবনা। ছোট বড় উত্তম অধম সকলের প্রতি স্নেহ না থাকিলে এরূপ হয় না। প্রাচীন রোম গ্রীসে যাঁহারা সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন, তাঁহারা সমাজের ক্ষুদ্র ও দরিদ্রের ভাবনা ভাবিতেন না, বরং ক্ষুদ্র

এবং দরিদ্রকে ইচ্ছা করিয়া ক্লেশ দিতেন। তাই প্রাচীন রোম গ্রীসে উদরান্নের কথা লইয়া উচ্চ শ্রেণীর লোকের সহিত নিম্ন শ্রেণীর লোকের সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ হইত। আজিকার দিনেও কোন কোন উন্নতচেতা এবং হৃদয়বান ইংরাজের মুখে শুনা যায় যে, ইংরাজ সমাজে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা আপনাদের ভাবনাই ভাবিয়া থাকেন; দুঃখী শ্রমজীবী ইংরাজের ভাবনা বড় একটা ভাবেন না। বোধ হয় ক্ষুদ্র এবং দরিদ্রকে তাঁহারা মানুষ বলিয়া মনে করেন না এবং মানুষ বলিয়া তাহাদের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় গলে না বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্রকেও মানুষ বলিয়া মনে করেন এবং ক্ষুদ্রের দুঃখের ভাবনা ভাবেন। ইহাতেই বোধ হয় যে, হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীবাদ কেবল কথার কথা নয়—হিন্দশাস্ত্রকারের মৈত্রী তাঁহার হৃদয়ের একটি সজীব এবং সতেজ ভাব।

ত্রিগুণ ও সৃষ্টি।

১৮। পঞ্চ সূক্ষ্মভূত

তামসিক অহঙ্কার হইতে কিরূপে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত এক-মতাবলম্বী। শ্রুতিতেও একথার উল্লেখ আছে। বেদান্ত মতে,—

"তমঃপ্রধান, বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট, অজ্ঞান সমাবৃত- চৈতন্য হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশ প্রপঞ্চ বিশ্বের উৎপত্তি হয়। এই কথা শ্রুতিতেও লিখিত আছে। সেই উৎপন্ন আকাশাদিতে জড়তার আধিক্য বশত (তাহাদের কারণে) তমঃ প্রাধান্য অনুমিত হয়।"

বেদান্ত সার ২৫।২৬।

অতএব বেদান্ত মতেও আকাশ প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভূতে জড়ত্ব, বিক্ষেপশক্তি (ক্রিয়া শক্তি বা গতি) এবং অজ্ঞান সমাবৃতচৈতন্য—এই তিনটিই বিদ্যমান আছে। বলিয়াছি ত সাংখ্যমতেও প্রধানত তমঃ এবং তাহার সহিত রজঃ

ও সত্ত্ব মিশ্রিত হইয়া পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। তবে এই তমঃ আধিক্য বশত রজঃ শক্তির অল্পমাত্র বিকাশ হয় আর সত্ত্ব শক্তি আবৃত থাকে। বেদান্তের বিক্ষেপশক্তিই সাংখ্যের রজঃ শক্তি, আর অজ্ঞান সমাবৃত চৈতন্যই সাংখ্যের প্রকৃতিতে সংক্রামিত পুরুষ শক্তি বা মহত্তত্ত্ব—ইহাই সত্ত্বঃ শক্তি।

সে যাহা হউক, এই তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় উৎপন্ন হয়। তাহার ব্যক্ত বা বিকৃত অবস্থায় এই সূক্ষ্ম ভাব থাকে না। প্রলয়ের সময় হইতে ব্যক্তাবস্থা হওয়া পর্য্যন্ত—প্রকৃতির তিন প্রকার অবস্থা (বা stage) হইয়া থাকে। অলিঙ্গ ও অবিশেষ অবস্থা হইতে প্রকৃতি ক্রমে বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবিশেষ অবস্থার তন্মাত্রগুলি বিশেষ অবস্থায় সূক্ষ্মভাব হইতে স্থূলভাবে পরিণত হয়। প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থায় বা জগদবস্থায় তন্মাত্রের এ সূক্ষ্ম ভাব থাকিতে পারে না। এই সূক্ষ্ম ভূত আর বিজ্ঞানের এটম বা পরমাণু কতকটা একরূপ। কেন একথা বলা হইল তাহা পরে সংক্ষেপে দেখান যাইবে। বিজ্ঞান মতে যেমন এটম্ (atom) এটম্ অবস্থায় থাকিতে পারে না—যৌগিক বা molecule অবস্থায় পরিণত হয়—সেইরূপ সূক্ষ্মভূতেরও স্থূল পরিণাম হইয়া থাকে সাংখ্যকার বলেন,

তন্মাত্রেভ্য স্থূলভূতানি। ১।৫১।

কারিকায় আছে,

"তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চভ্য।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢাশ্চ।" ৩৮।

অর্থাৎ, তন্মাত্র সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। তন্মাত্র হইতেই পাঁচ স্থূল ভূত উৎপন্ন হয়। এই স্থূলভূতই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। ইহারা কথন শান্ত, কথন ঘোর, কথন মূঢ়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে বলিয়াছেন,—

"আকাশাদি স্থূল ভূত মধ্যে কোনটি (আকাশ) অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণের আধিক্য বশত শান্ত, লঘু, সূক্ষ্ম ও প্রসন্ন; কোনটি (বায়ু ও তেজঃ) রজোগুণের আধিক্য জন্য ঘোর, দুঃখ উৎপাদক, অস্থির ও ক্রিয়াশীল; আর কোনটি (অপ্ ও ক্ষিতি) তমোগুণ প্রধান বলিয়া মূঢ় (inert) ভারযুক্ত ও বিষণ্ণ।" একথা পূর্ব্বে বুঝান হইয়াছে।

অতএব দেখা গেল, যে, তন্মাত্রাবস্থায় ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। বাস্তবিক তখন তাহাদের রূপ, রস প্রভৃতি ক্রিয়াও থাকে না। এইগুলি তখন অব্যক্ত (বা Latent অথবা Potental) অবস্থায় থাকে। তখন,—

"শব্দ স্পর্শ বিহীনং তৎ রূপাদিভিরসংযুক্তং।"

আর তখন ইহাদের এ তন্মাত্রাবস্থায়, সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি গুণজনিত শান্ত, ঘোর বা মূঢ় ভাবও আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না—

"তস্মিংস্তস্মিংস্ত তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে, ন মূঢ়াশ্চ বিশেষিণঃ॥"

বিষ্ণু পুরাণ।

তৎপরে পরস্পর সংযোগ দ্বারা,—এক সূক্ষ্ম ভূত ভূতান্তরের সহিত—অথবা নিজের সূক্ষ্ম অবস্থার সহিত বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া, স্থূলরূপে পরিণত হইয়াছে। এই স্থূল অবস্থাতেই, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি ক্রিয়ার বিকাশ হয়,—তখনই ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। তখন তন্মাত্রিক, শব্দাত্মক আকাশ হইতে স্থূল আকাশ, স্পর্শ তন্মাত্রিক সূক্ষ্ম বায়ু হইতে স্থূল বায়ু—এইরূপে পাঁচ স্থূলভূতের সৃষ্টি হয়।

আবার যখন তন্মাত্রাদিগের ঐরূপ অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত অবস্থা হইতে স্থূল পরিণাম হইতে লাগিল, তখনই স্থূলভূতের মধ্যে পরস্পর সংমিশ্রণে বা সাঙ্কর্য্যবলে, তাহাদের পৃথকভাব—তাহাদের অমিশ্র অবস্থা দূর হইয়া গেল। পরস্পরের মধ্যে মিশামিশি—মাখামাখি হইয়া যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইল, সে সকলের মধ্যেই এই পঞ্চভূত সম্মিলিত আছে—সকল পদার্থগুলিই তাহাদের রূপ রস প্রভৃতি গুণের দ্বারা—এবং আমাদের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যুগপৎ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। সুতরাং এক্ষণে সকল পদার্থই পঞ্চভৌতিক। সাংখ্য, বেদান্ত ন্যায় প্রভৃতি দর্শনের মতে, প্রত্যেক পাঁচ ভূতের সম্মিলন বিশেষ দ্বারা (পঞ্চীকরণ দ্বারা) কাহারও মতে প্রত্যেক তিন ভূতের (ক্ষিতি, অপ্ ও বায়ু) সম্মিলনে (ত্রিবৃৎকৃত হইয়া) স্থূল ভূতগুলি উৎপন্ন হয়—এবং তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে আরও বিভিন্নরূপ সংযোগে জগতের যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা পঞ্চীকরণ কাহাকে বলে বুঝাই। পঞ্চীকৃত আকাশ বলিলে, মূল সূক্ষ্ম আকাশের অর্দ্ধেক, আর বাকি অর্দ্ধেক অন্য চারি ভূতের প্রত্যেকের দুই আনা রকম অংশ দ্বারা সংগঠিত আকাশ বুঝায়। অন্যান্য ভূতের পঞ্চীকরণ সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

বেদান্তবাদীরা, আরও বলেন যে, ভূতগণের পঞ্চীকরণ হয় বলিয়াই ইহাদের রূপরসাদি গুণ উৎপন্ন হয়। ইহাদের মতে "পঞ্চভূতের পঞ্চী-

করণ কালে আকাশে শব্দগুণ, বায়ুতে স্পর্শ ও শব্দ,......প্রভৃতি গুণ প্রকাশিত হয়। বেদান্ত-সার। ৪১।

সে যাই হউক, এক্ষণে ক্ষিতি, অপ্, বায়ু প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহারা অমিশ্র ভূত নহে। উক্তরূপে ভূতগণের পঞ্চীকৃত সম্মিলনে উৎপন্ন হয়। সাংখ্য মতে শাঙ্কর্য্য (combination) ও বিক্রিয়া শক্তিই (interaction) স্থূল পরিণামের বা ব্যক্তরূপ হইবার প্রধান কারণ। মিশ্রিত বা বিকৃত না হইলে, পদার্থের স্থূল পরিণাম আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় না।

১৯। সাংখ্যমতে জৈবিক সৃষ্টি

এইরূপে যখন ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূত সৃষ্টি হইল, তখন এই পঞ্চভূতের নানারূপ সম্মিলনে, এবং বিভিন্ন পদার্থে ত্রিগুণের বিভিন্নরূপ বিকাশে অসংখ্য পদার্থের সৃষ্টি হইল। এই সমস্ত পদার্থে প্রধানত পার্থিবভূতের ভাগ অধিক (সূত্র ৫।১১১।) বিশেষত সমস্ত জৈবিক পদার্থেই ইহা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে,—সাংখ্য পণ্ডিতগণের মতে ক্ষিতিভূতই স্থূলশরীরের বীজ স্বরূপ। (সৈব স্থূলশরীরস্য বীজম্—সাংখ্যসার) সাংখ্য পণ্ডিতগণ আরও বলেন, যে যখন অপ্ ভূত সৃষ্টি হয়, তখন তাহাতে স্বয়ম্ভু স্থূলশরীরের বীজ নিহিত করেন—পরে ক্ষিতি ভূত উৎপন্ন হইলে, তাহার বিকাশ আরম্ভ হয় এই মাত্র। সাংখ্যমতে জৈবিক সৃষ্টি নানাপ্রকার—উষ্মজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাংকল্পিক, সাংসিদ্ধিক ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার আছে, (সূত্র ৫।১৪১)

যাঁহারা জড়বাদী তাঁহাদের মতে স্থূল পদার্থ হইতেই জীব সৃষ্টি হয়—ইহাতে কোন বিশেষ শক্তির কর্তৃত্ব আবশ্যক করে না, পরমাণুর কোন বিশেষরূপ সংযোগ বিয়োগের ফলেই জৈবিক সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাংখ্যকার ইহার উত্তরে বলেন, যে, যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্যে প্রকাশ পাইতে পারে না! যদি বল যে, যেমন ভাত পচাইলে মদ উৎপন্ন হয়,—চৈতন্য ও বুদ্ধি সেইরূপ পরমাণুর সংযোগ ক্রিয়া মাত্র। কিন্তু এস্থলে দেখা যায়, যে, ভাতের প্রত্যেক অণুতে মাদকতা শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে, অবস্থা বিশেষে ইহার প্রকাশ হয়, এই মাত্র,—(সূত্র ৩।২২) সেইরূপ অণুর সংযোগ বিশেষের সাংসিদ্ধিক ফল চৈতন্য নহে অণুর মূলেও সর্ব্বত্র চৈতন্য নিহিত থাকে,—তবে অবস্থা বিশেষে ইহার প্রকাশ হয় এই মাত্র।

শুধু তাহাই নহে,—সাংখ্যকার বলেন, যে, ভোক্তা পুরুষের অধিষ্ঠানেই ভোগায়তন শরীর নির্ম্মিত হইয়া থাকে,—নতুবা শরীর পচিয়া যাইত। (সূত্র ৫।১১৪।) আর শুধু যে এই ভোক্তা পুরুষ, মনুষ্য বা অন্যান্য প্রাণীর দেহেই বিদ্যমান আছে তাহা নহে—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ওষধি, বনষ্পতি, তৃণ, বীরুধ প্রভৃতি সমুদায় উদ্ভিদরূপ ভোগায়তন শরীরেও ইহা বিদ্যমান আছে—তবে উহাতে মন, বা বুদ্ধির বিকাশ, বুঝা যায় না এই মাত্র। (সূত্র ৫।১২১) অতএব সংসারে যত জৈবিক পদার্থ আছে—সকলের মূলেই এই পুরুষ—এই চৈতন নিহিত আছে। (সূত্র ৬।৬০) শুধু তাহাই নহে, এই চিৎ শক্তি জড়কে ব্যাবৃত্ত করিয়া তাহাকেও প্রকাশ করে, (৬।৫০) বলিয়াছিত পুরুষের এই জগন্ময় ব্যাবৃত্তি জন্যই তাহার বহুরূপ হইয়াছে। জগতের মধ্যে এই চিৎশক্তি অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই ইহার বিকাশ হয়।

অতএব সাংখ্যমতে যদিও পৃথিবী ভূতের সহিত অন্যান্য ভূতের সংমিশ্রণে সমস্ত জৈবিক শরীর ও জড় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মূলে সেই এক শক্তি নিহিত আছে, ইহাই তাহাদের মূল কারণ, তাহাদের প্রকৃত আধার—ইহাই শরীর স্রষ্টা। এই মূল শক্তিই সাংখ্যমতে পুরুষ। শুধু সাংখ্য বলিয়া নহে, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রেরই এই মত। এই (ব্যষ্টি) পুরুষের অত্যন্ত নৈকট্য বশতই প্রকৃতি হইতে সত্ত্বাংশে আমাদের মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই প্রকৃতির "পরা" অংশ। ইহা হইতেই অহঙ্কার—ইহারই সত্ত্বাংশে মন। এই তিনের সম্মিলনেই আমাদের অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। মনুষ্যে এই অন্তঃকরণের পূর্ণ বিকাশ হয়, কারণ মনুষ্যে পুরুষের অত্যন্ত সান্নিধ্য থাকে অথবা পুরুষ অল্পমাত্র আবৃত থাকে। পশুতে ইহার অল্প মাত্রায় উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কারের রাজসিক অংশেই আমাদের দশ ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। এই ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারাই আমাদের ঈশ্বরাংশ বা পরাপ্রকৃতি মহত্তত্ত্ব আবৃত হইয়াছে। (কারণ বলিয়াছিত সাংখ্যমতে মহত্তত্ত্বই ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ)। এই দশ ইন্দ্রিয় চক্রে আবৃত হওয়াতেই সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্বের তামস পরিণামে স্থূল ভূতের সহিত আমাদের সংশ্রব হয়—এবং তাহা হইতেই আমাদের শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। বলিয়াছিত এই স্থূল শরীর ভৌতিক। এই জন্যই কথায় বলে, "দশচক্রে ভগবান ভূত"। মহত্তত্ত্ব, মন, দশেন্দ্রিয় ও পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সহিত পুরুষের সংশ্রবে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি হয়। ইহা প্রলয় পর্য্যন্ত

বিদ্যমান থাকে, যত দিন না পুরুষ মুক্ত হয়—ততদিন এই সূক্ষ্ম শরীর পুরুষকে আবৃত করিয়া রাখে। এই সূক্ষ্ম শরীরের সহিত স্থূল শরীরের বীজ সংযোগেই আমাদের দেহের উৎপত্তি হয়। এই স্থূল শরীরের বীজ আমরা পিতা মাতা হইতে পাইয়া থাকি, (৩।৭) তৎপরে কর্ম্ম জন্য, বা পূর্ব্ব সংস্কার জন্য, সূক্ষ্ম শরীর মধ্যে এই স্থূল শরীরের যেরূপ বীজ বা যেরূপ শক্তি নিহিত থাকে, তাহা হইতেই পরিস্ফুট ও বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের শরীর উৎপন্ন হয়।

অতএব যেরূপে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, ঠিক সেইরূপেই মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে,—আবার ঠিক সেই নিয়মেই পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাদি, স্থাবর, জঙ্গম সমুদায় শরীরী জীব, সৃষ্টি হইয়াছে। সামান্য, জড় ভৌতিক পদার্থও সেই নিয়মে জাত। সকলেরই মূলেতে মন প্রভৃতি পুরুষের সংক্রামিত শক্তির সাত্ত্বিক বিকাশ, ইন্দ্রিয়াদি রাজসিক বিকাশ আর ভূতাদি তামসিক বিকাশ দেখিতে পাই। ব্যষ্টি সৃষ্টি ও সমষ্টি সৃষ্টি একই নিয়মে সংসাধিত হয়। (১) তবে কোথাও তামসিক শক্তির আধিক্যে সত্ত্ব ও রজঃশক্তি অভিভূত—কোথাও রাজসিক শক্তির আধিক্যে তমঃ ও সত্ত্বশক্তি অভিভূত—কোথাও বা সত্ত্ব শক্তির আধিক্যে রজঃ ও তমঃ শক্তি আবৃত হইয়া থাকে, এই মাত্র বিশেষ। সকলেরই মধ্যে আত্মা বা পুরুষ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে—চৈতন্য "কুটস্থ" থাকে। আমরা যাহাকে প্রাণ বা জীবন বা Vitality বলি, সাংখ্যমতে তাহা স্বতন্ত্র শক্তি নহে, তাহা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের সামান্য বা সাধারণ ক্রিয়া মাত্র। (২।৩১।) আধুনিক বিজ্ঞানও এক্ষণে এ কথা বুঝিয়াছে। তাহা আর vital force বা organic force বলিয়া একটা স্বতন্ত্র জীবনী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। (২)

---

(১) এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখি, যে, আধুনিক দর্শন একথা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। পণ্ডিত স্পেন্সর বলেন,—

"The entire process of things as displayed in the aggregate of the visible universe is analogous to the entire process of things as displayed in the smallest aggregatse."

First Principles. P. 536

শ্রুতি মতেও, "এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে।"

একবস্তুর জ্ঞানদ্বারা সকল বস্তুর জ্ঞান পাওয়া যায়।

(২) গত ভাদ্র মাসের নব্যভারতে "আদি সৃষ্টি শক্তি ও তাহার তিনরূপ বিকাশ" শীর্ষক প্রবন্ধে এবিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য মত বুঝান হইয়াছে।

২০। ভূত সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত।

আমরা সাংখ্যের জগৎ সৃষ্টির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। কোন কোন স্থলে সাংখ্যমতের সহিত আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতের সাদৃশ্য আছে তাহা দেখাইয়াছি। পঞ্চভূতের স্বরূপ কি,—কি কারণে আর্য্য-পণ্ডিতগণ পঞ্চভূত স্থির করিয়াছেন—ব্যক্ত-জগতের মূলকারণ স্বরূপ পাঁচটি মাত্র মূল পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ক্রমে ক্রমে দেখাইব। এক্ষণে তাহার পূর্ব্বে ভূত সৃষ্টি সম্বন্ধে আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মত কি, তাহাই দেখাইব। পূর্ব্বে যেরূপ বিস্তৃত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, আমরা স্বমত সমর্থন করিতেছিলাম, সাধারণ পাঠকগণের নিকট তাহা সুবোধ্য, সুখপাঠ্য বা রুচিকর হয় না বলিয়া আমরা সে পন্থা পরিত্যাগ করিলাম। এস্থলে আমরা মূল কথাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। কৌতূহলী পাঠকগণ ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিয়া লইবেন।

প্রথম কথা—সাংখ্যকার যেরূপ পরমাণু নিত্য নহে, (১) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও সেইরূপ স্বীকার করেন, যে, ইহারা নিত্য নহে—সৃষ্ট। ম্যাক্‌স্‌ওয়েল, ফ্যারাডে, হর্সেল প্রভৃতি আধুনিক সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে পরমাণুগুলি "Manufactured Articles" তবে কিরূপে, কোথা হইতে পরমাণু সৃষ্ট হইল—কিরূপে দ্ব্যণুক ত্র্যণুক প্রভৃতি যৌগিক পরমাণুগুলি উৎপন্ন হইল,—তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারে না।(২)

শুধু তাহাই নহে। সাংখ্যকার যেরূপ সূক্ষ্মতর আকাশ হইতে অন্যান্য ভূতসৃষ্টি হইয়া তাহাদেরই সংমিশ্রণে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে কল্পনা করিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানও সেইরূপ আকাশ বা Ether হইতে ভূত সৃষ্টি কল্পনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে পণ্ডিতবর টমসন সাহেব গণিতের সাহায্যে ও চমৎকার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন,

---

এ প্রবন্ধে বাহুল্যভয়ে জৈবিক সৃষ্টি সম্বন্ধে সাংখ্যের মূল সূত্রগুলি উদ্ধৃত হইল না—অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিয়া লইবেন।

(১) সাংখ্যকার বলেন, "নাণু নিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ। ৫।৮৭।

(২) পণ্ডিতবর Clerk Maxwell বলিয়াছেন,—

"Science is incompetent to reason upon the creation of matter out of nothing. We have reached the utmost limit of our thinking faculties when we have admitted that because matter cannot be eternal it must have been created."

যে, পরমাণুগুলি কঠিন পদার্থ নহে—ভৌতিক জগৎ কঠিন পরমাণু হইতে সৃষ্ট নহে,—তাহারা কোন তরল পদার্থের আবর্ত্ত মাত্র। এই তরল পদার্থকে Ether বা আকাশ বলা হইয়াছে। (১) আজ কাল এই মত Vortex theory of atoms নামে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কাছেই পরিচিত ও আদৃত হইতেছে। সুতরাং এস্থলে আমরা ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না।

টেট প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও বিশ্বাস করেন, যে,—

"Material molecule is some kind of knot or coagluation of Ether."

ইহা ব্যতীত ফ্যারাডে, হেলম্‌হল্‌টস, টমসন্, ম্যাকসওয়েল, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, যে, আকাশ হইতে (আকাশের রজঃশক্তি হইতে, আলোক, তাপ তড়িত, প্রভৃতি ভৌতিক শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ব্যতীত দার্শনিক পণ্ডিতগণও একথা স্বীকার করেন। ডেঃ কার্তের সময় হইতে স্পেন্সর পর্য্যন্ত, অধিকাংশ বিবর্ত্তনবাদী দার্শনিক পণ্ডিতগণই আকাশ বা Ether হইতে ভূতসৃষ্টি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শুধু আকাশ হইতে ভূতসৃষ্টি কেন—সাংখ্যকার যেরূপ তমঃ প্রভৃতি শক্তির বিকারে ভূত সৃষ্টি হইয়াছে—মহত্তত্ত্বরূপ সত্ত্ব শক্তির তামসিক বিকারে ভূত সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনা করেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণও সেইরূপ স্বীকার করেন যে ভূত শক্তির বিকার বা ক্রিয়া মাত্র। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে পরমাণু সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত আছে। একটি Dynamical theory বা শক্তিবাদ, আর একটি Corpuscular theory বা জড়বাদ।

প্রায় সমস্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণই প্রথম মতের পক্ষপাতী। প্রায় সমস্ত প্রাকৃত বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণই এই মত বিশ্বাস করেন। এইমতানু-

(১) "The ether in (now) called in to explain, the atoms. Matter is now alleged to be made up of rapidly revolving rings of ether, which if ether be indeed frictionl ss, are proved by hydrodynamics to be indestructible."

Fortnightly Review. Vol. XVIII. P. 787.

সারে আলোক প্রভৃতি শক্তির ক্রিয়াতত্ত্ব সুন্দররূপে বুঝা যায়। শক্তিবাদী পণ্ডিতগণের মতে পরমাণুগুলি কেন্দ্রীভূত শক্তি—অথবা শক্তির ক্ষুদ্রতম গোলক মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের atmo-mechanical theoryও ইহার উপর সংস্থাপিত। (১) তবে কতকগুলি রাসায়নিক পণ্ডিত দ্বিতীয় মত বা পরমাণুর জড়বাদ বিশ্বাস করেন মাত্র।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বস্কোবিচ সাহেব প্রথমে এই Dynamical theory প্রকাশ করেন—পরে পণ্ডিত ফ্যারাডে ইহার পোষকতা করেন। পণ্ডিত হর্ণেলও এই মত স্বীকার করিয়া বলেন যে—

"To ascribe to such atoms any magnitude, becomes not only superfluous but embarrassing."

টেট্, আম্ফিয়ার, মাক্স্ওয়েল (আর কত নাম করিব) প্রভৃতি আধুনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে, পরমাণুগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির কেন্দ্র মাত্র। (২)

এক্ষণে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের কথা থাক। স্পেন্সর, বেণ, কক্স্ প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন যে, পরমাণুগুলি শক্তির ক্রিয়া বা শক্তির কেন্দ্র মাত্র, ইহাদের মতে—

"Matters are *centres of force* attracting and repelling each other in all directions."

অতএব শক্তি হইতে আকাশ সৃষ্টি, এবং আকাশ হইতে ভূত সৃষ্টি সম্বন্ধে সাংখ্যের মতের সহিত, আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের মতের বিশেষ প্রভেদ নাই।

এখন রাসায়নের পঁচষট্টি ভূতের কথা উল্লেখ করা যাউক। সাংখ্যকার অথবা কোন আর্য্য পণ্ডিতগণই ত পাঁচটির অধিক ভূত স্বীকার করেন নাই—

---

(১) এই atmo-mechanical theoryর সার মর্ম্ম এইরূপ;—

'The resolution of all changes in the material world into motion of atoms, caused by *their constant central force* would be the completion of natural science."

Concepts of Modern Physics. P. 22.

(২) ইহারা বলেন—

"We might reasonably suppose, not merely that an atom *carries* an electric current—but that *it is nothing else*."

কেন পাঁচভূত স্বীকার করেন তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে রাসায়ন শাস্ত্রের পঁয়ষট্টিটি মূলপদার্থের কথা সঙ্গত কি না তাহা দেখা যাউক।

আজ কাল কি দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক প্রায় সমস্ত পণ্ডিতগণই মূল পদার্থ যে একমাত্র ইহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কি কি কারণে এক্ষণে পণ্ডিতগণ পঁয়ষট্টিটি মূল পদার্থ অস্বীকার করেন, কেন তাহা অযৌক্তিক মনে করেন, তাহা এস্থলে বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা শুধু এস্থলে বিজ্ঞান ও দর্শনের মতের উল্লেখ করিব মাত্র। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, মূলভূত এক—তবে তাহার বিভিন্ন ক্রিয়া জন্য বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক বিবর্ত্তনবাদ স্বীকার করিলে একাধিক মূলভূত কল্পনা করা যায় না।

প্রথমে ডাক্তার প্রাউট্ এই মত প্রতিপন্ন করেন। তাহার পর পণ্ডিত ষ্টাস্ সাহেব পরীক্ষার দ্বারা—এবং জ্যোতির্ব্বিদ লকিয়ার সাহেব, নাক্ষত্রিক জগতের রাসায়নিক অবস্থা, আলোক-বিশ্লেষণী যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া, এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

গ্রেহাম, রাইট, ডুমা, কার্ক প্রভৃতি রাসায়নিক পণ্ডিতগণ এই মত সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদেরও মতে মূল পরমাণু একমাত্র—

"There is but one kind of primordial atom."

টেট, টম্সন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। ইঁহাদের মত,—

"The so called elements may be really nothing more than combination differing in numbers and in tactical arrangements *of some one kind of primordial atoms.*"

Unseen Universe P. 160

স্পেন্সর প্রভৃতি দার্শনিকগণও এইরূপ বুঝিতেছেন। (১)

আর কত দেখাইব। রাসায়নের পঁয়ষট্টি ভূত যে মূল ভূত নহে—উত্তাপে তাহাদের যে মৌলিক অবস্থা ঘুচিয়া যায়, ("the elements in

---

(১) স্পেন্সর বলেন,—

"The properties of the different elements result from the differences of arrangement arising by the compounding and recompounding of *ultimate homogeneous units.*"

H. Spencer. Cont. Rev. June, 1878.

tensely heated shall be broken up—Lockyer.") ইহা আজ কাল প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতই স্বীকার করেন। সুতরাং রাসায়নের পঁয়ষট্টি ভূততত্ত্বের দোহাই দিয়া আর্য্যপণ্ডিতগণের পাঁচ ভূতের কল্পনা যে ভ্রমপূর্ণ তাহা বলিতে পারা যায় না।

মূল কথা—এক্ষণে বিবর্ত্তনবাদ—প্রকৃতির আপূরণবাদ—বা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়বাদ—পূর্ব্বেকার বিজ্ঞান ও দর্শনের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা বিবর্ত্তনবাদ বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই স্বীকার করেন যে, পরমাণু বা ভূত সৃষ্ট—ইহারা কোনরূপ শক্তির ক্রিয়া বিশেষ মাত্র—এই শক্তির কোনরূপ বিকারেই আকাশ উৎপন্ন হয়, এবং আকাশ হইতেই ক্রমে ক্রমে ভূত সৃষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যের এই সমস্ত মতের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের বা দর্শনের বিবর্ত্তনবাদের বিশেষ মতভেদ নাই। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে বিবর্ত্তনবাদ আরও বুঝাইযা দিয়াছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের মূলভিত্তি Conservation of energy বা Indestructibility of matter সাংখ্যের "নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ" অথবা অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হয় না—এই মূল তত্ত্ব হইতে প্রতিপাদ্য সত্য মাত্র। ইহার বিস্তারিত উল্লেখ এস্থলে সম্ভব নহে। স্পেন্সর প্রভৃতি বির্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণ একথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। (১)

২১। বিজ্ঞান মতে ভূত সৃষ্টির ক্রম।

এই বিবর্ত্তনবাদ হইতে আমরা সাংখ্যের আর একটি তত্ত্ব বুঝিতে পারি। বলিয়াছিত আর্য্যপণ্ডিতদিগের মতে সৃষ্টি কালে প্রথমে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্, এবং অপ্ হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। তৎপরে, "পৃথিবীরূপ বীজ অণ্ডরূপে পরিণত হয়। এবং এই অণ্ডরূপে পরিণতা পৃথিবী আবরণের দশ ভাগের এক ভাগ মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ স্বয়ম্ভুর স্থূল শরীর উৎপন্ন হইয়াছে।"

(সাংখ্যসার ১।৩।৩।)

কাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিক ও লাপ্লাস্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এক্ষণে জগৎ সৃষ্টি তত্ত্ব যেরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন—তাহার সহিত সাংখ্যের এই মতের অনেক সাদৃশ্য আছে। এক্ষণে বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতদিগের মতে

(১) স্পেন্সর সাহেব বলিয়াছেন—
"The indestructibility of matter and the continuity of motion, we saw to be really corollaries from the impossibility of establishing in thought a relation between something and nothing.

সৃষ্টির প্রারম্ভে মূল পরমাণুসমষ্টি (?) Nebulæ ভাবে চারিদিকে ব্যাপ্ত ছিল। তৎপরে আকর্ষণ শক্তি বলে তাহারা ক্রমে ক্রমে তাহাদের কেন্দ্রের চারিদিকে ঘূরিতে আরম্ভ করিয়া অধিকতর ঘন হইতে লাগিল। এই অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত অবস্থাকে বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণ মূল পরমাণুর বায়ুরূপ বলিয়াছেন। এই সময়েই ঘনীভূত বায়ুরাশি হইতে এক একটি অংশ সাধারণ আবর্ত্ত হইতে পৃথক্ হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে গ্রহগুলির সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রথমে নেপচুন, পরে ইউরেনস্—এবং সর্ব্বশেষে শুক্র, বুধ প্রভৃতি সমস্ত গ্রহও সৌর-জগতের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তখনও এই সমস্ত গ্রহগণের বায়ুরূপ দূর হয় নাই। তাহার পর যখন এই গ্রহগুলি এবং কেন্দ্রস্থিত সৌরমণ্ডল আরও ঘনীভূত হইল, তখন তাহা, বায়ুরূপ হইতে তেজোরূপে পরিণত হইল। এইরূপেই সূর্য্য এখনও বর্ত্তমান আছে, তবে তাহার পূর্ব্বতেজ অনেক হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য গ্রহগণ আরও ঘনীভূত হওয়ায় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তর্ভূত তেজঃ শূন্য পথে বিলীন হওয়ায়, তাহাদের তেজরূপ প্রথমে তরল তেজোময় পদার্থরূপে, এবং তৎপরে তাহা আরও ঘনীভূত হইলে, কতক অংশ জলীয় বাষ্পরূপ হইতে জলরূপ, এবং তাহার সহিত গ্রহ-গণের উপরিভাগ ক্ষিতিরূপ কঠিন আবরণে আবৃত হইল। সৌরমণ্ডল অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া সহজে শীতল হয় নাই। চন্দ্র অতি ক্ষুদ্র এজন্য তাহার অন্তর্ভূত সমুদয় তাপ দূর হইয়া সমস্তই কঠিন ক্ষিতিরূপে পরিণত হইয়াছে। চন্দ্রে এক্ষণে জল নাই, তেজ নাই, বায়ু নাই, অথবা ইহার কিছুই আমাদের অনুভূত হয় না। শনি কি ইউরেনস্ প্রভৃতি গ্রহগুলি সবে মাত্র তেজঃরূপ হইতে জলীয় বাষ্প ও কঠিন ক্ষিতি আবরণে আবৃত হইয়াছে—ইহারা এখনও তাপের ক্রীড়া ভূমি। সে যাহা হউক, যখন গ্রহগণের সকল তাপ দূর হইবে, তখন তাহারা চন্দ্রের মত কঠিন ক্ষিতি-রূপে পরিণত হইবে, তখন তাহাদের সূর্য্যাভিমুখে গতি আরম্ভ হইবে প্রলয়ের প্রাক্‌কাল উপস্থিত হইবে।

এই নিয়মে সৌর জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। এই নিয়মে সম্ভবত সমস্ত নাক্ষত্রিক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। এখনও অনেকগুলি গ্রহ-নীহারিকা আছে, তাহারা ক্রমে ক্রমে এইরূপে নাক্ষত্রিক জগৎরূপে পরিণত হইবে।

সম্ভবত ধূমকেতুগুলিও গ্রহ-নীহারিকার মত। অনেকে বলেন যে, সেগুলি সৌরজগৎ সৃষ্টিকালে মূল বায়ুরাশি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আজিও সেই

নীহারিকা অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, এই ধূমকেতুগুলি এত বৃহৎ হইলেও—লক্ষ লক্ষ যোজন ব্যাপিয়া তাহাদের বিস্তৃতি হইলেও, সম্ভবত তাহাদের mass বা জড় পরমাণুর পরিমাণ এত অল্প, যে তাহা ওজনে বোধ হয়, আধ সেরের অধিক নহে। কিছুদিন হইল আমাদের সমস্ত পৃথিবী একটা ধূমকেতুর পুচ্ছ মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহা অনুভব করিতেও পারি নাই! অতএব যদি ধূমকেতুর মত গ্রহ-নীহারিকা হয়,—তবে নীহারিকা অবস্থায় তাহার জড় পরমাণুর পরিমাণ অধিক থাকে না। নীহারিকা যতই ঘনীভূত হইতে থাকে, যতই তাহা হইতে বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, ততই বোধ হয়, এই জড় অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্ষিতি পরিণামেই জড় অণুর সমুদায় ক্রিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়।

বলিয়াছিত,অধিকাংশ পণ্ডিতদিগের মতে আবার গ্রহনীহারিকাগুলি আকাশ বা ইথর হইতে জাত। টম্‌সন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন,যে,এক শত কোটি ঘনবর্গ মাইল ইথরের ভার আধ সেরের অধিক নহে। অতএব বিবর্ত্তনবাদ মানিতে গেলে পরমাণুগুলি যে ভারী জড় পদার্থ (Corpuscular), তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় না। ইহারা যে কোন শক্তির বিকারে জাত ইহাই অধিক যুক্তি সঙ্গত। শুধু তাহাই নহে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্, এবং অপ্ হইতে ক্ষিতি সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও সিদ্ধান্ত করিতে হয়। বিবর্ত্তনবাদ বুঝিয়াছে,—

"The molecular evolution of matter conforms to the law of all evolution in proceeding from the indeterminate to the determinate, from the simple to the complex, from the *Gaseous* to the *solid* form."

Concepts of Modern Physics. P. 174

এই মতের সহিত সাংখ্যের বিবর্ত্তনবাদ মতের কোন প্রভেদ নাই বলিলেও চলে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য।

গুপ্ত কবির সমালোচনায় আমরা সাধারণত বলিয়াছি, যে, তাঁহার গরীয়সী ভাষার রূপচ্ছটায় এবং অলঙ্কার ঘটায়, অনেক সময় তাঁহার কিশোরভাব বিলীন হইয়া যায়। বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যের এটিই প্রধান দোষ। এমন সময় সময় হয়, যে মজ্‌লিসে ধ্রুপদ শুনিতে গিয়া কেবল মৃদঙ্গীর হস্তের করতপের কেরামত দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম; সেইরূপ অনেক সময় হয়, যে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পড়িলাম, ভাবাতে ছন্দেতে মেশামিশি করিয়া কাণের ভিতর দিয়া হিয়ার মাঝারে ঝড় বহিয়া গেল, অথচ কবিতার যে একটা স্থায়ীভাব তাহার কিছুই পাইলাম না। কিন্তু যেখানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কথার করতপের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন, সেখানে তাঁহার কবিতা প্রকৃতই রসময়ী। নিম্নোদ্ধৃত এই কয় পংক্তিতে কেমন একটি মনোহর চিত্র আছে দেখুন;—

রজনীতে ভাগীরথী।

আহা মরি তরঙ্গিনী, কিবা শোভা ধরেছে।
রজত রঞ্জিত শাটী, অঙ্গ বেড়ি পরেছে॥
শূন্য পরে শশধরে, হেমছটা ক্ষরিছে।
সুশীতল নিরমল করদান করিছে॥
তটিনী তরঙ্গে তারা, কত রঙ্গে খেলিছে।
পবন হিল্লোল যোগে, ঘন ঘন হেলিছে॥
যেন কোন বিয়োগিনী, নিদ্রাভরে রোয়েছে।
স্বপ্নযোগে পতিলাভে, প্রমোদিনী হোয়েছে॥
হাস্য বশে সুবদন, ঝল মল করিছে।
থর থর কলেবর, নিথর শিহরিছে॥

চাঁদনী রজনীতে তটিনীর ঢুলু ঢুলু কুলু কুলু ভাবের সহিত, তরতর লাবণ্যের ভাব মিশ্রিত, থাকে; প্রবাস গত স্বামীর সুখস্মৃতিতে উৎফুল্লা বিয়োগিনীর স্বপ্নাবস্থার উপমায়, সেই আবেশ-উল্লাস মিশ্রিত ভাব কেমন উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে! তটিনী আপনার বশে আপনি নাই; দূরে শশধর সুশীতল নিরমল কিরণ বিকীরণ করিতেছেন, সুমন্দ সমীরণ মৃদু মৃদু বহিতেছে, আর সেই সকল কিরণমালা ঝিকি ঝিকি ঝাঁকি ঝাঁকি

চলিতেছে। বিয়োগিনী মহিলাও আপন বশে নাই; স্বামী সমাগম স্মৃতি, দূরস্থিত শশধর কর মত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভাসিত করিতেছে, বদনে মৃদু হাস্য ঝলমল করিতেছে। আর 'থর থর কলেবর নিথর শিহরিছে।' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ঐ কয় পংক্তি পড়া থাকিলে, জ্যোৎস্না রাত্রিতে তটিনী তটে দণ্ডায়মান হইয়া সেই আবেগের প্রশান্তির সঙ্গে মৃদু উল্লাসের চাক্ চিক্য দেখিলে, এই 'নিথর শিহরিছে' কথাটি আপনা আপনি মনে পড়ে।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণন প্রসিদ্ধ; এবারকার এই ঘোরতর বর্ষার দুর্দ্দিনে, তাঁহার বর্ষা বর্ণনের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভয়ঙ্কর জলধর, কলেবর গর গর,
নিরন্তর গরজে সঘনে।
দীপ্তি হীন দিবাকর, শোভা শূন্য শশধর,
তারা হারা হইল গগনে॥
গগনের উচ্চদেশ, রৌদ্রের উজ্জ্বল বেশ,
পরিধান নাহি করে আর।
বুঝে তার দম্ভ রীতি, সম্প্রতি বাড়ায় প্রীতি,
বরষার প্রীতি চমৎকার॥
ভয়ঙ্কর মেঘাম্বর, পরিলেক অতঃপর,
ত্যজি উগ্র গ্রীষ্মের কিরণ।
সোণার দামিনী হার, গলায় দুলিছে তার,
পরিহার তারার ভূষণ॥
বরষার কিবা ভাব, ক্ষেত্রের নির্ম্মল ভাব,
নাহি আর কর্দ্দম দর্শনে।
স্থলে জল, জলে জল, কেবল জলের দল,
চলাচল প্রবল বর্ষণে॥
হেরিয়া জলের বল, আনন্দে মীনের দল,
কল কল রবে করে খেলা।
সমূহ শাবক সঙ্গে, ইতস্ততো মহা রঙ্গে
ভ্রমে, ভ্রম ক্রমে নাহি হেলা॥
প্রচণ্ড মারুত বীর, নহে স্থির, যেন তীর,
বৃক্ষের শরীর করে চূর্ণ।

পর্ব্বতের অঙ্গ নড়ে, অট্টালিকা ভেঙ্গে পড়ে,
সিন্ধু জলে শূন্য হয় পূর্ণ ॥
গলাগলি তরুগণ, গাঁথিয়া গহন বন,
পবনের পথ ঢেকে আছে।
ঘন ঘন শিরোপরে, মত্ত বায়ু নৃত্য করে,
তরুর তরঙ্গ তায় নাচে ॥
সাজিয়া ভীষণ সাজে, বরষা গগন মাঝে,
বিরাজ করেন অতঃপর।
মাঝে মাঝে শুভ কাজে, বজ্রের বাজনা বাজে,
বিবহীর বুকে বাজে শর ॥
গ্রীষ্মের প্রতাপ বলে, পূর্ব্বে ছিল ধরাতলে,
কৃশা নদী বালিকার প্রায়।
না ছিল রসের রঙ্গ, ধূলায় ধূসর অঙ্গ,
তরঙ্গের রসহীন তায় ॥
রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার,
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার।
হেলে হেলে চলে যায়, বিপুল সংগ্রাম তায়,
সলিলে সুখের নাহি পার ॥
বরষার আবির্ভাবে, দিবা নিশি সমভাবে,
হরিষে বরিষে বৃষ্টিধার।
আনন্দে অবনী ভাসে, স্বভাবে সন্তোষে হাসে,
জ্যোতি রাশি নাশে অন্ধকার ॥
সতত শঙ্কার সঙ্গে, অন্ধকার মহারঙ্গে,
সমূহ প্রতিভা করে গ্রাস।
দিক্‌দশ অপ্রকাশ, পরিয়া কালীর বাস,
করে কাল দৃষ্টির বিনাশ ॥
তমো মাখা নিশি প্রায়, দৃষ্টিপথে দীপ্তি পায়,
অর্দ্ধরূপী শরীর সকল।
নির্ণয় করিয়া রূপ, উথলে সংশয় কূপ,
সময়ের এমনি কৌশল ॥

সমগ্র বর্ণনে বর্ষার ললিত ভৈরব দুই মূর্ত্তিই চিত্রিত আছে, আমরা কেবল ভৈরব মূর্ত্তির চিত্রই উদ্ধৃত করিলাম। ময়ূর ময়ূরী, কদম্ব ডাহুক,— ছাঁটিয়া ফেলিয়া কেবল ভয়ঙ্কর জলধরের ঘন ঘটা, প্রচণ্ড মারুতের লীলা খেলা, এবং অন্ধকারের মহাবঙ্গ দেখাইতেছি। দেখিবেন উৎকট বর্ণনে গুপ্ত কবি কেমন প্রতিভাশালী।

গলাগলি তরুগণ, গাঁথিয়া গহন বন,
পবনের পথ ঢেকে আছে।
ঘন ঘন শিরোপরে, মত্ত বায়ু নৃত্য করে,
তরুর তরঙ্গ তায় নাচে॥

এই একটি শ্লোকে বর্ষাবাত্যার কেমন অপূর্ব্ব উৎকট দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছে।

আর ;—

তমোমাখা নিশি প্রায়, দৃষ্টিপথে দীপ্তি পায়,
অর্দ্ধরূপী শরীর সকল।

এই অর্দ্ধ শ্লোকে বর্ষার অন্ধকার রাত্রির কেমন একরূপ ভীষণ বিভীষিকা যেন মাখান রহিয়াছে।

বর্ষা বর্ণনের কথায় গুপ্ত কবির আনারস ও তপ্‌সে মাছ বর্ণনার কথা মনে আসে। খাদ্য সামগ্রী আদি ভোগ্য বস্তুর ঈশ্বর গুপ্ত যখন বর্ণন করিতেন, তখন মনে হইত, তিনি বুঝি এতকাল কেবল সেই সকল জিনিস খাইয়াই বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার বর্ণনীয় বস্তুর সহিত তিনি যেন অভেদ আত্মা। তাঁহার তপ্‌সে মাছ ;—

কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গাল ভরা গোঁপ দাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥

আর তাঁহার আনারস ;—

লুণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি॥
টুকি টুকি খেলে পরে, রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল, মুখে পড়ে লাল॥

এ সকল অতুল্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্বদেশ প্রীতি, এবং মাতৃ ভাষায় ভক্তি তাঁহার সহজ ধর্ম্ম ছিল। টেনে বুনে বা পেটের দায়ে পেট্রিয়টি তাঁহাকে করিতে হয় নাই। তাঁহার সময়ে স্বদেশ ভক্তির এত মুখভারতি ছিল না, এত আস্ফালন ছিল না। পিতৃ ভক্তি, মাতৃ ভক্তি, তখন তন্ত্র বা কোম্‌ত পড়িয়া শিখিতে হইত না; স্বজাতির প্রতি বা স্বভাষার প্রতি ভক্তি তখনকার একরূপ সহজ ধর্ম্ম, স্বভাব ধর্ম্ম ছিল। সে ভক্তি রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল নহে। হিন্দু মুসলমান, জৈন বৌদ্ধ—সমগ্র ভারতবাসী একজাতি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া একরূপ জাতিভক্তি উঠিতেছে, পূর্ব্বকার লোকে সে জিনিসটা যে কি, তাহা বুঝিতেন না। অথচ স্বদেশভক্তি, স্বজাতিভক্তি একরূপ ছিল। গুপ্ত কবির কাব্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা একস্থান হইতে উদ্ধৃত করিলাম;—

স্বদেশ।

জান না কি জীব তুমি, জননী—জনম-ভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
ভূমেতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী জঠর পরিহরি॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ॥
প্রসূতি তোমার যেই, তাঁহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির প্রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার॥
কত শস্য ফল মূল, না হয় যাহার মূল
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।

বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ।
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষত নিজ দেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহ মদে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গ ভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাস ধাম, শিব পূর্ণ বটে নাম,
শিব ধাম স্বদেশ তোমার॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার।
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশ বাসীগণে,
প্রেম পূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপে স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

বিদেশের ঠাকুর অপেক্ষা স্বদেশের কুকুরও ভাল;—জিজ্ঞাসা করি এখন কার ম্যাটসিনিগণ এই কথা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন কি? হৃদয়ে হাত দিয়াই উত্তর দিবেন।

ঈশ্বর গুপ্তের মাতৃ ভাষায় ভক্তিও তাঁহার সহজ ধর্ম্ম; রাজনীতির দায় নহে। মাতৃ ভাষার সেবাতেই ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি হরু ঠাকুরের মত সহজ বিশ্বাসেই বুঝিতেন যে,—

নানান্ দেশে নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশীয় ভাষা,
পূরে কি আশা?

মাতৃ ভাষার সেবা ও মাতৃ সেবা তিনি সমান জ্ঞান করিতেন। মাতৃ-ভাষা সেবার পক্ষে তাঁহার যুক্তি এক, লক্ষ্যও এক। তিনি বলেন, তুমি শৈশবে অসহায় অবস্থায় যে ভাষার সাহায্যে আত্মকষ্ট বেদন করিয়াছিলে,

আবার বার্দ্ধক্যে অসহায় অবস্থায়, যে ভাষায় অসহায়ের সহায় ভগবান্‌কে ডাকিবে, তুমি সেই মাতৃ ভাষার সেবা করিবে না ত, আর কাহার সেবা করিবে?

মাতৃভাষা।

মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে,
খন খন সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদু স্বরে,
আধো আধো বচন রচন॥
কহিতে, অন্তরে আশা, মুখে নাহি ফুটে ভাষা,
ব্যাকুল হোয়েছ কত তায়।
মাম্মা মা-মা, বাব্বা বা-বা, আধো, আধো আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়॥
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো পিসে, খুড়া বাপ, জুজু ভূত, ছুঁচো সাপ,
স্থল জল আকাশ অনল॥
ভাল মন্দ জানিতে না, মল মূত্র মানিতে না,
উপদেশে শিক্ষা হোতো যত।
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত॥
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার॥
যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ গুণ গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃ সম মাতৃ ভাষা, পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে॥

'খাও, দাও, থাওয়াও, দেওয়াও' ঈশ্বরগুপ্তের সামাজিক ধর্ম্ম। হাসি খুসি প্রফুল্লতা, তাঁহার নিত্য ধর্ম্ম। অতি সহজ ভাষায় তাঁহার ফিলজফি তিনি পরিস্ফুট করিয়াছেন।

প্রভাতে উঠিয়া করি, হাস্য পরিহাস।
সে দিন করিতে হয়, যদি উপবাস॥
যায় যায়, উপবাসে, দিন যায় যাবে।
সাধুসহ সদালাপে, কত সুধা খাবে॥
অমৃত ভোজন করি, যদি যায় দাঁত।
হরিগুণ লিখিয়া যদ্যপি যায় হাত॥
যায় দাঁত, যায় হাত, কিছু ক্ষতি নাই।
লেখ লেখ হরিগুণ, সুধা খাও ভাই॥
লক্ষ্মীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে॥

বাস্তবিক কথা;—যদি খেতে খাওয়াতে গিয়া লক্ষ্মী ছাড়াইতে হয়, ওতে যদি লক্ষ্মী ছাড়েন, তাহা হইলে তিনি আলোয় আলোয় দিন থাকিতে তাঁর সখের পেঁচা লইয়া সরে পড়ুন, সেই ভাল।

ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বর বাদ,—যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা চলিতেছে। এবিষয়ে তিনি রামপ্রসাদের নিকৃষ্ট হইলেও এখনকার ভুমানন্দ-বাগীশ-গণ অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গুপ্তকবি একস্থলে বলিতেছেন. তিনি জগদীশ্বরের জনক। কল্পনা অতি বিষম, সন্দেহ নাই, কিন্তু কথা কয়টি শুনুন,—

নাস্তিকেরা "নাস্তি" বোলে, করিছে নিধন।
"অস্তি" বলে আমি করি, তোমার স্থাপন।
তোমার "অস্তিত্ব বাদ" করেছি যখন।
পাকাপাকি একখানা করিব তখন।
জন্ম দিয়ে "বাপ" তুমি হয়েছ আমার।
জন্ম দিয়া আমি তবে কে হব তোমার?
যদ্যপি আদর কর মনেতে বিচারি।
এ সুপাদে তোমার ত বাবা হতে পারি।

বারবার 'বাবা' বলে ডেকেছি তোমায়।
একবার 'বাবা' বলে ডাক না আমায়॥
ছেলের এ আবদারে আদর ত চাই।
'বাপ' বলে ডাকিলে তো লজ্জা কিছু নাই
প্রথমে বলিতে 'বাপ' লজ্জা যদি হয়।
যা বলিবে তাই বল, বিলম্ব না সয়।
ছেলে বল, দাস বল, বলা কিন্তু চাই।
না বলিলে কোন মতে ছাড়াছাড়ি নাই।
ফুটে না বলিতে পার, ভঙ্গি করে কও।
"ওরে বাবা আত্মারাম" হাবা কেন হও?
যেরূপে জানাতে হয়, সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয় সেরূপে মানাও॥

নানা বিষয়ে গুপ্ত কবির রচনা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু স্থান সঙ্কুলান হয় না। এবার যুগ মাহাত্ম্যের নানারূপ বিড়ম্বনা বর্ণন উদ্ধৃত করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

আচার ভ্রংশ।

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব।
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লা-ভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বসে মুর্গি মাস নিয়া।
এক দিকে কোষাকুষী, আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেবিলে খায় খানা।
ভূতের সংসারে, এই, হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ, ছোঁড়া পূজে ভূত।
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র ফেলে কেটে
বাপ পূজে ভগবতী, ব্যাটা দেয় পেটে।
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব, জন্তুভাব শিশু।
বুড়া বলে রামকৃষ্ণ, ছোঁড়া বলে যীশু॥
হাসি পায় কান্না আসে, কব আর কাকে।
যায় যায় হিন্দুয়ানী আর নাহি থাকে॥

বোধেন্দু-বিকাশ হইতে, ঐ মর্ম্মের একটি গানও এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

প্রাণে, জ্বোল্‌তে হোলেই, বোল্‌তে হয়।
পোড়া দেশের্‌ লোকের্‌, আচার্‌ দেখে,
চোল্‌তে পথে করি ভয়॥
ঢুকে কারাগারে, সাধু হোলো চোর্‌,
বন্দি-গুলো ফন্দি কোরে, পালায়্‌ ভেঙ্গে দ্বোর্‌।
এক্‌ ফাকা-ঘরে, সোল্‌তে জ্বলে,
জোর্‌ বাতাসে সে, কি, রয়? ।১।
ওরে "পাঁচ্‌ ঘরা" আর্‌ "দশ্‌ ঘরার্‌ মেলা,
সাৎগাঁয়ের কাছে "এক্‌ গাঁয়েতে,"
কোর্চ্ছে খেলা।
কোরে ঢলাঢলি দশ্‌ দিকেতে,
ঢোল্‌তে থাকে সমুদয়। ।২।
এরা, অগ্রদ্বীপের মেলা কোরে সায়্‌,
নেড়া হোয়ে নবদ্বীপে, চোলে যেতে চায়্‌,
কেটা জলের্‌ ঘরে আগুন্‌ জ্বালে?
সহজ্‌ বড় সহজ্‌ নয়। ।৩।
হয়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাৎ সমুদ্র পার্‌,
কাছে থাক্‌তে পারে, রাখ্‌তে পারে,
শক্তি আছে কার্‌,
ওরে, মুখের্‌ বাহির্‌ হোলে পরে,
সাধ্য কি আর্‌ কথা কয়? ।৪।
সুখে, প্রেমানন্দ-হাটে কর হাট্‌, আমার্‌,
আমার, তোমার্‌ তোমার্‌, ছাড়ো মিছে ঠাট্‌,
এই ভাঙা হাটে, ঢেঁড়্‌ড়া পিটে,
দিচ্ছ কারে পরিচয়? ।৫।
দেখি সমভাবে, সব্‌-গুলো অসৎ,
কেউ বেঁচে থেকে সৎ হোলো না, মোরে হবে সৎ,
যার মাথা নাই তার্‌ মাথা ব্যথা,
ব্যেপেছে সব্‌ জগৎময়। ।৬।

গুপ্ত কবির পুরাণপঞ্জী হইতে লুপ্ত উদ্ধার করিয়া আমরা আমাদের পাঠিকাগণকে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম; তাঁরা যেন না বলেন, যে কই, আমাদের কথা গুপ্ত কবি কি কিছু বলেন নাই? বলেছেন বৈকি। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শুনুন;—

আগে মেয়ে গুলো ছিল ভালো,
ব্রত কর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
এক বেথুন্ এসে শেষ করেছে,
আর্ কি তাদের্ তেমন্ পাবে?
যত ছুঁড়ী গুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
তখন এ, বি, শিখে, বিবি সেজে,
বিলিতি বোল্ কবেই কবে।
এখন্ আর্ কি তারা, সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে!
সব্ কাঁটা চাম্‌চে, ধোর্ব্বে শেষে,
পিঁড়ে পেতে আর্ কি খাবে?
ও ভাই, আর্ কিছু দিন বেঁচে থাক্‌লে,
পাবেই পাবেই দেখ্‌তে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
আছে গোটাকত বুড়ো যদিন,
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই, তারা মলেই দফা রফা,
এককালে সব্ ফুরিয়ে যাবে।

নবজীবন।

২য় ভাগ } কার্ত্তিক ১২৯২। { ৪র্থ সংখ্যা।

বৈষ্ণব তত্ত্ব।

রাগমার্গে বৈরাগ্য।

প্রকৃত প্রস্তাবে আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের বিশেষ কোন সাধন নাই। ভক্ত বিশেষের অনুগত হওয়া, তাহার শ্রীমুখ হইতে নাম শ্রবণান্তর শ্রীমুখোক্ত গুরুপ্রণালীর অধীন হইয়া নাম জপ করা, ভক্ত সংসর্গে সর্ব্বদা বাস করা এবং সকল বিষয়ে আচার্য্য সাধুর আজ্ঞাধীন হইয়া চলাই তাঁহার সমস্ত সাধন। ইহাই তাঁহার সমস্ত ধর্ম্ম। এই উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি চিদভিমুখ স্রোতে পতিত হন এবং এই উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি পরা প্রকৃতির নির্ম্মল চিদগত অবস্থা লাভ করেন এবং নিজে নির্ম্মল চৈতন্য লাভ করিয়া, অন্তর্বাহ্যে নির্ম্মল চৈতন্যরূপ নিরবচ্ছিন্ন দর্শন করেন। রাগমার্গই আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের একমাত্র সাধন পথ। বিধিমার্গ তাঁহার অবলম্বনীয় নহে। এই রাগমার্গ কি, তাহা পশ্চাৎ বিবৃত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, নর নারীর অন্তরে যেমন স্বভাবত দাম্পত্য-স্পৃহা উপস্থিত হয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানুষের সেইরূপ একটি অবস্থা আছে। পূর্ণ যৌবনাবস্থায় নর নারীর অন্তরে দাম্পত্যস্পৃহা সচরাচর অত্যন্ত বলবতী হয়। সে স্পৃহা সচরাচর কিছুতেই আবরিত হইবার নহে। ধন দেও, মান দেও, বিদ্যা দেও, সংসারের যাবতীয় সুভোগ্য সামগ্রী দেও, নির্ঝরিণীসন্নিহিত মলয়-মারুত-সেবিত রাজসদৃশসুখদপ্রাসাদ দেও,

সুদুর্লভফলপুষ্পেরমনোজ্ঞউদ্যান দেও, রাশি রাশি সুন্দর সুতৃপ্তিকর পুস্তক দেও, কিছুতেই তাহাদের সেই নবানুভূত দাম্পত্যাভাব পূর্ণ করিতে পারে না। কিন্তু যখন তাহাদের জীবনপথে সে যৌবনাবস্থা দেখা দেয় নাই, তখন সামান্য ধূলা খেলাও সামান্য ভোগ্য সামগ্রীও তাহাদের চিত্তকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে।

প্রত্যেক মনুষ্যের চিদ্বিমুখ অবস্থার একটি নির্দ্দিষ্ট পূর্ণকাল বা অবসান কাল আছে। সেই অবস্থা সমাগত হইলে তাহার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে প্রলয়ের প্রাক্কাল উপস্থিত হয়। যে ভাবে তাহা উপস্থিত হয়, তাহা দেখিয়া লোকে তাহাকে অকারণ বা কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ সম্ভূত ঘটনা বলিয়া অনুমান করে। সেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যে একটি বিষম পরিবর্ত্তন বা যুগান্তরকাল সত্বর উপস্থিত হইবে, এ সময় তাহার পৌর্ব্বাহ্লিক আয়োজন হইতে থাকে;—যে বিষম চিদ্‌ভিমুখ ঝটিকা শীঘ্র সেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে কোন্ কিম্ভূত অবস্থায় উড়াইয়া লইয়া যাইবে, তাহা তখন নিঃশব্দে অতি গোপনে ঘনাইতে আরম্ভ করে। এই অবস্থার নাম মনুষ্যের বৈরাগ্যাবস্থা। যত দিন মনুষ্যের জীবনে এইঅবস্থার উদয় না হয়, ততদিন তাহার প্রকৃত ধর্ম্মলাভের প্রকৃত সময় সন্নিহিত হয় নাই। এই বৈরাগ্যকাল সমুপস্থিত না হইলে, মানুষ কোন না কোন প্রকার বিধিমার্গ অবলম্বন করিয়া তাহার মনের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এক প্রকারে চরিতার্থ করিয়া থাকে। তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের মানসিক শান্তি লাভ হইতে পারে, জনসমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা পাইতে পারে, দেশের ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, এবং ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা সংলব্ধ হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম অর্থাৎ মানুষের নির্ম্মল অবস্থা তদ্দ্বারা করতলন্যস্ত হয় না। তদ্দ্বারা মনের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যথাবিধানে প্রতিপালন করিলাম ভাবিয়া মানুষ সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে। মানুষের মনে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে, বাহিরে সে প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করিবার ও উৎসাহ দিবার সহস্র প্রকার উপায় আছে, মৃত্যুর ভয় আছে, শাস্ত্রের শাসন আছে, পারত্রিক চিন্তা আছে, তাই বাধ্য হইয়া, তাহাকে কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে হয়। তাই বিধিমার্গের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিধিমার্গ মানুষের নির্ম্মল অবস্থা লাভ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে না হউক, পরোক্ষ ভাবে বা প্রকারান্তরে সহায়তা করিয়া থাকে।

আমরণ কোন বিশেষ বিধিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মরণান্তে প্রত্যাশিত ফলের অন্যথা লক্ষিত হইলে মানুষের অন্তরে অন্ততঃ এই সংস্কার বদ্ধমূল হয়, যে, সেই বিশেষ বিধিমার্গ মুক্তি লাভের পক্ষে নিষ্ফল; তাহা প্রকৃত ধর্ম্মমার্গ নহে। সে ব্যক্তি জন্মান্তর পরিগ্রহণ করিলে তাহার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশত সে আর সে বিধিমার্গ অবলম্বন করে না। যদিও পূর্ব্বজন্মের কোন কথা কাহারও স্মরণ থাকে না, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সমস্ত অভিজ্ঞতার ফল জীবের সংস্কার দেশে স্থায়ীরূপে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। মৃত্যুর পরও জন্মান্তর পরিগ্রহের পূর্ব্বপূর্ব্ব জীবনের সমস্ত কর্ম্মাকর্ম্ম আলোচনানন্তর ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বিত পন্থা স্থিরকরত অন্তরে বদ্ধমূল প্রতিজ্ঞা লইয়া মানুষের আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ করে। সে জন্মে তাহার সমস্ত জীবন স্বতঃই সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করে; কিছুতেই তাহা হইতে সহজে প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহে না। ইহাই মানুষের সংস্কার বদ্ধতার কারণ। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারবশত পূর্ব্বপরিচিত বিধিমার্গে স্বভাবতই মানুষের বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। সে সেজন্মে স্বীয় প্রতিজ্ঞানুযায়ী অন্যবিধ ধর্ম্মমার্গ অন্বেষণ ও অবলম্বন করে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিধিমার্গে তাহার অবিশ্বাস ও বিরক্তি জন্মিয়া প্রকৃত ধর্ম্মমার্গ প্রাপ্তির উপযুক্ত বৈরাগ্য কাল মানুষের জীবনে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃত বৈরাগ্য কাল সমাগত হইলে মানুষ কোন মতেই বিধিমার্গে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না;—উপধর্ম্মে বা কল্পিত ধর্ম্মে, বা সামাজিক ধর্ম্মে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না।

প্রকৃত বৈরাগ্য জীবনে সহসা উপস্থিত হইলে তাহা অকারণ সম্ভূত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবমতে তাহা পূর্ব্বগত বহুজন্মার্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফল মাত্র। সংসার সম্বন্ধে কেবল তাহারই প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মে, যে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে পার্থিব সুখ সকল আস্বাদন পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া তৎপ্রতি বিরক্ত বা বিমুখ হইয়াছে;—বিধিমার্গ সম্বন্ধেও প্রকৃত বৈরাগ্য কেবল তাহারই জন্মে, যে পূর্ব্বপূর্ব্ব জীবনে বিধিমার্গ সকল যথাক্রমে ও যথানিয়মে প্রতিপালনান্তর অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হইয়া তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ ও আস্থাহীন হইয়াছে।

অভিজ্ঞতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যের ভূমিও ক্রমশ প্রশস্ত ও বিস্তৃত হইতে থাকে। কিন্তু তাহা আংশিক বলিয়া প্রকৃত বৈরাগ্যনামে অভিহিত হয় না। অভিজ্ঞতার পূর্ণতাতেই বৈরাগ্যের পূর্ণতা হইয়া থাকে এবং

তাহা বহুজন্মে সঞ্চিত হইয়া জীবনে সহসা প্রকাশ পায়। প্রত্যেক মানুষে এই আংশিক বৈরাগ্য অল্পাধিক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; তাহা ক্রমশ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। কখন কখন মানুষের অভিজ্ঞতা অপূর্ণ থাকিতেও তাহার উপর অসময়ে সাধুকৃপা পতিত হয় এবং সেই কৃপাবলে আত্মচৈতন্যের সঞ্চার হয় এবং তাহার বহির্মুখী প্রকৃতি সাধুর তুরীয় সাহায্যে ও আকর্ষণে অন্তর্মুখের চিদভিমুখ পথে প্রেরিত হয়। যে কোন প্রকারেই হউক, প্রকৃতি অন্তর্মুখী হইলে, সমস্ত বহির্ব্যাপারের উপর স্বভাবতই বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে। অসময়ে আকৃষ্ট বলিয়া সে তাহার চিদভিমুখ যাত্রা সে জন্মে সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারে না। পরজন্মে তাহার পূর্ব্বাস্বাদিত রস আস্বাদন করিবার জন্য বহির্বিষয় ও বহির্ব্যাপারের উপর অবস্থানুযায়ী বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে। কোন প্রকার বিধি মার্গানুসরণ বা অনিত্য সুখভোগ তাহার তৃপ্তিকর হয় না। এইরূপে অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণতা না হইতেও সাধুকৃপাতে অপ্রাপ্ত কালেও বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে।

প্রকৃত বৈরাগ্যকাল উপস্থিত হইলে মনুষ্য অন্তরে একটি গভীর অতৃপ্তি অনুভব করে। তাহার সংসার ধর্ম্ম ভাল লাগে না; সংসারে বিচিত্র সুখ সম্ভোগও ভাল লাগে না; ধর্ম্ম কর্ম্মও ভাল লাগেনা; যেন পৃথিবীর সমস্ত তাহার নিকট শুষ্ক মরুভূমি বা শ্মশান হইয়া গিয়াছে। সে যে দিকে তাকায় সকলই শূন্য দেখে সকলই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বলিয়া তাহার বোধ হয়। যেন পৃথিবীর সঙ্গে, চারিদিকের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে হয়ত তখন জানে না কি জন্য তাহার অন্তরে ভাবান্তর উপস্থিত হইল,—কি জন্য—কার জন্য তার প্রাণ এরূপ আকুল ও ব্যাকুল হইল। ক্রমে তাহার বৈরাগ্য আর একটু গাঢ় ও ঘনীভূত হইলে সে তাহার অন্তরের ভাব কিয়ৎপরিমাণে বোধগম্য করিতে পারে। ক্রমে এই বৈরাগ্য একটি নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়া রাধা বা কৃষ্ণাভিমুখ হইয়া দণ্ডায়মান হয়। যাহাদের বৈরাগ্য নূতন অর্থাৎ বর্ত্তমান জীবনে আরম্ভ হইয়াছে তাহাদের বৈরাগ্য স্বভাবতই উদ্দেশ্যহীন অথবা একটু অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণ অপার্থিব বিষয়াভিমুখ হইয়া থাকে; আর যাহাদের বৈরাগ্য পুরাতন অর্থাৎ পূর্ব্ব কোন জীবনে আরম্ভ হইয়া ভক্ত সংসর্গে নির্ম্মল মনুষ্যের মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়াছে অথচ দৈব প্রতিবন্ধকতা বশত সে জীবনে পরম নির্ম্মলাবস্থা লাভ করিতে পারে নাই তাহাদের বৈরাগ্য

পরিণামে রাই অভিমুখ হইয়া বিকশিত হয়। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবমতে এই রাই অভিমুখ বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠতম বৈরাগ্য বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত পুরাতন অভিজ্ঞতাপূর্ণ বলিয়াই শ্রেষ্ঠ; এবং উদ্দেশ্যহীন অথবা কৃষ্ণাভিমুখ বৈরাগ্য অপেক্ষাকৃত নূতন এবং তজ্জন্য অভিজ্ঞতাংশে হীন বলিয়া তুলনায় নিকৃষ্ট গণ্য হইয়া থাকে। যে মানুষে রাই অভিমুখী বৈরাগ্যের স্ফূর্ত্তি হয় সে পূর্ব্বজন্ম লব্ধ সংস্কার ও চৈতন্যবলে তাহার প্রাণের মানুষ, তাহার হারানিধি, তাহার হৃদয়ের পূর্ব্বপরিচিত পরমধন, তাহার পূর্ব্বাস্বাদিত হৃদয়ের মনোজ্ঞ সামগ্রী, তাহার চেনামানুষ, তাহার নির্ম্মল প্রকৃতি, তাহার প্রকৃত আপনাকে প্রবল অনুরাগে অন্বেষণ করিতে থাকে। আর যাহার বৈরাগ্য পরিণামে কৃষ্ণাভিমুখ হইয়া প্রকাশ পায়, নিত্যধন লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই লোলুপ; চারিদিকের অনিত্য বিষয় চিরটাকাল তাহাকে জ্বালাতন করিয়াছে; এখন তাহার নিত্যধামে লোভ জন্মিয়াছে, কিন্তু ধনীর প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণই নাই। কাহারও হয়ত পূর্ব্বজীবনে সাধুভক্তের সহবাসে সহসা তুরীয় আস্বাদন অনুভূত হইয়াছিল কিন্তু কোন্ তুরীয় ফুলের সুগন্ধে তাহার মন প্রাণ বিমোহিত হইয়াছিল তাহা ধরিতে ও লক্ষ্য করিতে না পারাতে সে পূর্ব্ব জীবনে অনর্থক আকাশ পানে তাকাইয়াছিল, এজীবনেও পূর্ব্বাস্বাদিত সামগ্রী প্রাপ্ত হইবার জন্য বৈরাগ্য প্রণোদিত হইয়া সেই আকাশ পথে তাকাইয়া আছে। কাহারও হয়ত সাধুভক্তের শ্রীমুখ হইতে নাম শ্রবণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে জীবনে সেই সাধু ভক্তের প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হয় নাই; নামরস মাত্র আস্বাদন করিয়াছিল এবং নাম-প্রতিপাদ্য স্বরূপ-দর্শন-পিপাসু হইয়া নিমীলিত নেত্রে আকাশপথে তাকাইয়া থাকিত। এ জীবনে তাহার বৈরাগ্য কৃষ্ণাভিমুখে অভিব্যক্ত হইয়া সেই পূর্ব্বাস্বাদিত রস-সম্ভোগ লোভে তাহার দৃষ্টি অন্তর্পথে—আকাশ পানে চাহিয়া আছে। নির্ম্মল প্রকৃতির সঙ্গে—নির্ম্মলাত্মা সাধু ভক্তের সঙ্গে তাহার বিশেষ পরিচয় পূর্ব্ব জীবনে না হওয়াতে, এজীবনে তাহার বৈরাগ্য লোভ ও কামগন্ধ শূন্য হইতে পারে নাই। সে ধনীকে উপেক্ষা করিয়া ধন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে, পুষ্পকে তাচ্ছিল্য করিয়া তাহার সুগন্ধ সম্ভোগ করিতে চায়, ইক্ষুদণ্ডকে অবজ্ঞা করিয়া তাহার মিষ্ট রসে লোভ আকৃষ্ট হয়, নির্ম্মল প্রকৃতিকে অবহেলা করিয়া তদঙ্গবিহারী পুরুষের সংসর্গ কামনা করে, ভক্তকে বাদ দিয়া ভগবৎ সঙ্গে আত্মকাম চরিতার্থ করিতে

লুব্ধ হয়, প্রেমময়ী রাধাকে আমলে না আনিয়া ধ্যানাদিযোগে কৃষ্ণ সঙ্গ আরম্ভ করিবার চেষ্টা করে, সে পূর্ব্ব জীবনে নির্ম্মল মানুষের কোন প্রকার সঙ্গগন্ধ উপলব্ধি করে নাই, এ জীবনে সে নির্ম্মল মানুষের সঙ্গগন্ধ পাইলেও সেই গন্ধে বিমোহিত হইয়াও মানুষের প্রতি লক্ষ্য করিতে সহসা সক্ষম হয় না। আর যাহার বৈরাগ্য শুদ্ধ বা ঔজ্জ্বল্য হীন বৈরাগ্য মাত্র, রাই বা কৃষ্ণাভিমুখে আজিও অভিব্যক্ত হয় নাই, সে জানে না যে, সে কি চায়। সে এই মাত্র জানে, যে, পার্থিব কোন বিষয় তাহার আরামপ্রদ নহে। সে যেন জগতের সকল সুখ আস্বাদন করিয়া দেখিয়া, সকল সামগ্রী ভাল করিয়া চিনিয়া শুনিয়া তৎপ্রতি বীতরাগ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে। পার্থিব বিষয় সকল তাহার অভিজ্ঞতাতে নীরস ও অশেষ দুঃখের আকর বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে তাহার পরিত্যজ্য হইয়াছে—কিন্তু গ্রহণযোগ্য কিছুই তাহার অন্তরকে আজিও আকর্ষণ করিতেছে না। তাহার পূর্ব্ব জীবনে সে কোন প্রকার তুরীয় সুখ আস্বাদন করে নাই, সুতরাং এজীবনে সে কোন পতিকে তুরীয় বিষয়ের গন্ধ পাইলেও তাহা তাহার চেনা সামগ্রী না হওয়াতে সে তৎপ্রতি সহসা অনুরাগী হইতে ও তদ্বিষয়ে কোন প্রকার ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। সে সর্ব্বদা চঞ্চল, সর্ব্বদা অস্থির। এই চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার কারণ তাহার নিজের কি প্রয়োজন তাহা বুঝিতে না পারা; এজন্য তাহার গরজ মেটাই ভার। এই বৈরাগ্য শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক স্বতঃই কৃষ্ণাভিমুখে পরিণত হয়।

কিন্তু কৃষ্ণাভিমুখে পরিণত হউক আর না হউক এরূপ বৈরাগ্যে কেহ মানুষকে সহসা বিশ্বাস করিতে পারে না। সে যদিও কাহারও অনুগত হয়, সে সন্দেহ করিতে করিতে অনুগত হয়। সে কোথাও সহসা প্রাণার্পণ করিতে পারে না। সন্দেহ ও অবিশ্বাস সর্ব্বদাই তাহার অনুসরণ করে। শুদ্ধ নীরস বিরক্ত বৈরাগ্যে বা অপ্রার্থিব বিষয় বা কৃষ্ণ লালসায় তাহার চিত্তকে সর্ব্বদাই আন্দোলিত করে। কিন্তু রাই অভিমুখ বৈরাগ্যে এরূপ কোন চাঞ্চল্য ও অবিশ্বাস নাই। সে পূর্ব্ব জীবনে সাধুভক্তের মুখশশীতে যে তুরীয় জ্যোতি দেখিয়াছে তাহা তাহার চক্ষে এখনও যেন কতকটা লাগিয়া আছে;—মোহান্ত সাধুর কণ্ঠস্বরে যে বংশীধ্বনি শুনিয়াছে, তাহা তাহার শ্রবণকুহরে এখনও যেন কিয়ৎ পরিমাণে বাজিতেছে। তাঁহার মধুর সহবাসে সে তুরীয় গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছে, এ জীবনেও যেন তাহার সৌরভ

অন্তরান্ধে কতকটা প্রবিষ্ট হইয়া আছে; মোহান্তের দৃষ্টিবানে পূর্ব্বজীবনে যে অনুক্ষণ মর্ম্মবিদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাহার মর্ম্মদেশে এখনও যেন, কতকটা বিঁধিয়া আছে। কেবল দেখিবার ও শুনিবার অপেক্ষায় এই সকল পূর্ব্ব পরিচিত বিষয়ের পুনঃপরিচয় লাভে বঞ্চিত হইয়া আছে। দেখিবা ও শুনিবামাত্র তাহার পূর্ব্ব চৈতন্য জাগিয়া উঠে এবং সে সমস্তই চিনিয়া ও বুঝিয়া লইতে সক্ষম হয়। এই বৈরাগ্যদশা উপস্থিত হইলে মানুষ তাহার প্রাণের প্রকৃত মানুষকে কোথায় পাইবে, তাহার জীবনের পূর্ণাঙ্গকে কেমন করিয়া লাভ করিবে। তাঁহার মোহান্ত দেহের সঙ্গে কেমন করিয়া মিলন হইবে, তাহার প্রাণারাম হৃদয় রমণের সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, তাহার প্রকৃত আপনার সঙ্গে কেমন করিয়া সংযোগ হইবে, সে তজ্জন্য যারপরনাই আকুল, অস্থির ও ক্ষুব্ধ। সেই জন্য তাহার কিছুই ভাল লাগে না, আহার নিদ্রা ভাল লাগে না, স্ত্রী পুত্র ভাল লাগে না, সুখ সম্ভোগ ভাল লাগে না, বন্ধু বান্ধব ভাল লাগে না, আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগে না, পড়া শুনা ভাল লাগে না, কোন প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মও ভাল লাগে না। তাহার এ বৈরাগ্য প্রথম বৈরাগ্যের ন্যায় প্রবল বিরক্তি নহে,—তাহা শুদ্ধ উপেক্ষা মাত্র। তাহার অন্তরের মানুষকে পাইবার জন্য সকল বিষয়ে তাহার উপেক্ষা জন্মিয়াছে; সে চারি দিকে তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাওয়াতে তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। তাহার প্রাণের এই প্রবল বৈরাগ্য হেতু সে যে কোন গতিকে হউক, আপনার মানুষকে চিনিয়া লয় এবং অবিলম্বে তাহার অনুগত হইয়া তাহার চরণে দেহ প্রাণ সমর্পণ করে।

এই বৈরাগ্য প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার জন্য আপনার বৈরাগ্য। আপন মাধুরী হেরিবার জন্য, আপনার প্রকৃত মুখশ্রী ও মোহনরূপ দর্শন করিবার জন্য,—আপনার স্বরূপে আপনি মিশাইবার জন্য,—আপনার পূর্ণতা আপনি লাভ করিবার জন্য আপনার নির্ম্মল প্রকৃতিতে আপনি অঙ্গ ঢালিবার জন্য, তাহার বৈরাগ্য এখানে জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু সে মুখশ্রী, সে মাধুরী, সে মোহনরূপ, সে পূর্ণতা, সে স্বরূপ, সে আপনার মধ্যে দেখিতে না পাইয়া স্বকীয় আমিত্বের প্রতি হতাদর হইয়া, যেখানে আপনার প্রকৃত স্বরূপ প্রকৃত মাধুরি ও প্রকৃত পূর্ণতা বিরাজ করে, সেইথানে তাহার প্রাণ টানিতে থাকে। এবং যে মোহান্ত দেহে তাহার

প্রকৃত স্বরূপ প্রযুক্ত পূর্ণ ও পরম নির্ম্মল ভাবে বিরাজ করিতেছে সেই দেহের অভিমুখে তাহার হৃদয় মন আকৃষ্ট হইতে থাকে। সে স্বকীয় বদ্ধ অপূর্ণ ও মলিন আমিত্বের (আপনার) উপর বীতরাগ হইয়া পরকীয় প্রকৃত আমিত্ব (আপনাকে) লাভ করিবার জন্য অভিলাষী। তাহার 'আপন মাধুরী হেরিতে না পাই, সদাই অন্তর জ্বলে" এবং জীবনের বৈরাগ্য পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন আপন মাধুরী প্রকৃত আমিত্বের (আপনার) সহিত ভাগ্যবান মিলিত হইল, তখন তাহার আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখে কে! সে এত দিনের পর এত অন্বেষণের পর প্রকৃত আপনাকে দেখিতে পাইয়া তাহার হৃদয় মন একেবারে তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছে। সে আর কি তাঁহাকে ছাড়ে? সে বলে "আমি তোমার নিত্যদাস হইয়া থাকিব আমাকে চরণে স্থান দেও। তোমাকে দেখিবা মাত্র, আমার প্রাণ যেন কি এক অপূর্ব্বধন পাইয়াছে, আমি কস্মিন্‌কালে তোমাকে ছাড়িব না, প্রত্যহ তোমার চরণ সেবা ও চরণ দর্শন করিব। এই দুর্ল্লভ অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না এই সুখের দাসত্ব হইতে আমাকে ঠেলিয়া ফেলিও না। আমি আমরণ তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া সহচর অনুচর হইয়া থাকিব। তোমাকে দেখিয়া আমার কতকালের পরিচিত আত্মীয় বলিয়া—আমার অন্তরঙ্গ বলিয়া বোধ হইয়াছে।" আমাকে তাড়াইলেও আমি যাইব না।"

ভারত ভ্রমণ।

৫।

নাসীকের এক ষ্টেশন পরেই 'বেয়াল গেওন;" এই ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া এক শৈলমালা দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে যেটি সর্ব্বোচ্চ তাহার নাম "থাল্‌সিবাই।" এইটিকে ইংরাজেরা দক্ষিণাপথের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ গিরি-শৃঙ্গ কহেন। ইহা প্রায় ৫৪২৭ ফিট উচ্চ। এই বেয়াল গেওনের দশ মাইল দূরে বন্দারা অরণ্য, এ অরণ্যে বন্যজন্তু বিস্তর। বেয়াল গেওনের ১২ মাইল দূরে আঞ্জিনারা নামক পার্ব্বত্য স্থানে গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলের বিস্তর অধিবাসীরা

অবস্থিতি করেন। এখানকার জল হাওয়া অতি উত্তম। এই বেয়াল গেওনের কিয়দ্দূর পরে যাইয়া প্রসিদ্ধ "থল্ ঘাট" নামক শৈলমালার উপর ট্রেণ উঠিতে আরম্ভ করে। এই পর্ব্বতের একস্থানে "ইগাটপুরী" নামে এক স্বাস্থ্যকর ষ্টেশন আছে।

বোম্বাই হইতে মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারতে যাইবার দুইটি রেল পথ আছে। মধ্য ভারতে আসিবার পথে রেল যে স্থানে পশ্চিম মাঠের উপর দিয়া আসিয়াছে, সে স্থানের নাম "থলঘাট," এবং দক্ষিণ ভারতে যাইতে রেলের পথ যে স্থানে পশ্চিম ঘাটের উপর দিয়া গিয়াছে, সে স্থানের নাম "বোর ঘাট।" এই দুই স্থানে রেলের পথ প্রস্তুত করিতে ইংরাজ যে কি বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে ইংরাজ জাতিকে অবনত হৃদয়ে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। যাঁহারা থল্ ঘাট ও বোরঘাট দর্শন করেন নাই, তাঁহারা একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখেন নাই। বোর ঘাটের কথা পরে বলিব, সম্প্রতি থল ঘাটের কথা একটু বলিতেছি। "ইগাটপুরী ছাড়াইয়া "রিভর্সি ষ্টেশন" এইখানে বোম্বাই হইতে আসিবার সময় এঞ্জিন পশ্চাৎভাগ হইতে ট্রেণের সম্মুখে জুড়িয়া দেয়, এবং মধ্য ভারত হইতে বোম্বাই যাইবার সময়, সম্মুখ হইতে পশ্চাতে জুড়িয়া দেয়। এই-খানে ১০ টি টনেল আছে, অর্থাৎ পর্ব্বতোপরিস্থ ১০টি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া ট্রেণ গমন করে। "ইহিগেওন" নামক এক বৃহৎ(viaduct)পুল ইহার পরেই। এই পুল দুই গিরিশাখা মধ্যস্থিত এক বিশাল উপত্যকার উপর। "ইহিগেওন" ভয়াডক্ট ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার উপর হইতে নিম্নে চাহিয়া দেখিলে একেবারে অনুমাণিক ১৯০ ফিট গহ্বর দৃষ্টি গোচর হয়। থল্ ঘাটের উপর দিয়া রেলের পথ ১৮৫৯ সালে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৫ সালে শেষ হয়। থলঘাটের উপর সর্ব্বসমেত ২৩টি সুড়ঙ্গ অর্থাৎ টনেল আছে, কোন কোনটি দীর্ঘে প্রায় ১॥০ মাইল হইবে। পুল (viaduct) ৬ ছয়টি, কোন কোনটি ৭৪১ গজ দীর্ঘ, কোনটি বা ১৯০ ফিট উচ্চ; তদ্ভিন্ন মাঝারি ও ছোট পুল (viaduct) আছে। এই থল-ঘাটে উঠিবার সময় দুই পার্শ্বের প্রাকৃতিক শোভা এত সুন্দর যে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য; দেখিতে দেখিতে মন অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে মগ্ন হইয়া পড়ে। এই পথ উন্মুক্ত হইয়া বাণিজ্য ও পথিকের পক্ষে যে কত উপকার হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করা বাহুল্য। "রিভর্সি" ষ্টেশন

হইতে "খাসাড়া" ষ্টেশন যাইতে ট্রেণ কয়েকটি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া যায়। তাহার পরেই "ওয়াশিন্দ ষ্টেশন" এইখানেই থলঘাট শেষ হইয়াছে। বোম্বাই হইতে আসিবার সময় ট্রেণ এই স্থানে থলঘাটে উঠিতে আরম্ভ করে। ইহার দুইটি ষ্টেশন পরে "খালিয়ান জংসন।" এই ষ্টেশনের ৪ মাইল দূরে বিখ্যাত অম্বরনাথ মন্দির, উহা দর্শনযোগ্য স্থান। এ ষ্টেশনে ধর্ম্মশালা আছে। মান্দ্রাজ রেলের পথ এই স্থানে জি, আই, পি রেলপথের সহিত মিশিয়াছে। খালিয়ানের শুটি দুই ষ্টেশন পরেই "থানা।" থানায় দর্শনোপযোগী কয়েকটি স্থান আছে। এস্থানের জেল, প্রাচীন পর্টুগীজ দুর্গ এবং ছয় মাইল দূরের "কেনেরি গুহা" সকলগুলিই দর্শন উপযুক্ত। যখন বোম্বাইয়ের কথা বলিব তখন এই গুহার কথা বলিব. কারণ বোম্বাই হইতেই এ গুহা দেখিতে যাইবার সুবিধা। থানায় প্রতি বৎসর শ্রীগুণ্টালি বলিয়া একটি মেলা হয়, তাহাতে বিস্তর হিন্দুর সমাগম হইয়া থাকে। থানার পরেই "বান্ধব ষ্টেশন।" এখান হইতে কেনেরি গুহা নিকট বটে, কিন্তু পথ তত ভাল নহে, সেইজন্য দেখিতে যাইবার সুবিধা হয় না। ইহার ৪ মাইল দূরে বিহার হ্রদ, উহা দর্শন যোগ্য। বান্ধবের ১০টি ষ্টেশন পরে বোম্বাই ট্রেণ সহরের ভিতর বুড়ি বন্দর ষ্টেশনে থামে।

কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ একত্রিত হইয়া বোম্বাই সহর। ইহার একধারে সমুদ্র, অপর তিন ধারে খাড়ি, খাড়ির উপর দিয়া পদব্রজে যাইবার ও ট্রেণ যাইবার পৃথক পৃথক পুল আছে। প্রাচীন লেখকেরা বোম্বাইকে "বম্বাইম" কহিতেন। ইউরোপীয় লেখকেরা কহেন, যে, পর্টুগীজদিগের সংস্রব বিধায়ে ইহার নাম বম্বে হইয়াছে। ব্রিগস্ (briggs) নামক একজন ইংরাজ লেখক কহেন, যে, বম্বের এক অংশের নাম "মাহিম" ও অপর অংশের নাম "মম্বাই" ছিল; মম্বাই অত্রস্থ কোন এক দেবীমূর্ত্তির নাম ছিল। মাহিম বলিয়া স্থান এখনো রহিয়াছে এবং বোম্বাইয়ের যে স্থানকে এস্প্ল্যানেড কহে, তথায় পূর্ব্বে মাম্বা দেবীর এক মন্দির ছিল; এখন ঐ দেবীমূর্ত্তি ঐ স্থান হইতে সরাইয়া মাড়োয়ারি বাজারের একস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাই সম্বন্ধে যখন পর্টুগীজদিগের পূর্ব্বকার ইতিহাস নাই তখন বোম্বাই নাম কেন হইল? মাম্বা দেবী কাহা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত এ সকলের মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাওয়া বৃথা।

পর্টুগীজেরা অধিকার করিবার পূর্ব্বে বোম্বাই—গুজরাটের অধীন থানার রাজার অধিকারে ছিল। সে সময় গুজরাটের নাম "বিদার" ছিল। অনুমাণিক ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে "নগ্নদাকুন্হা" নামক পর্টুগীজ রাজপ্রতিনিধির দ্বারায় বোম্বাই পর্টুগীজদিগের অধিকারে আইসে; পরে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে "বেসিন" স্যালসিটি, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপ গুজরাটের সুলতান বাহাদুর কর্ত্তৃক পর্টুগীজদিগকে রীতিমত প্রদত্ত হইয়াছিল। পর্টুগীজ অধিকারে বোম্বাই কিছু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরাজেরা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া বোম্বাইয়ের প্রতি লোভ পরবশ হইয়াছিলেন এবং ইহা আত্মসাৎ করিবার জন্য দুই একবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। শেষে ইন্ফ্যান্টা কেথিরাইনের সঙ্গে দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ উপলক্ষে যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই ইংলণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ব্রিটিশ অধিকারে সেই অযত্নপরিত্যক্ত ও দস্যুপ্লাবিত বোম্বাই পশ্চিম ভারতে অথবা সমগ্র ভারতে এক কারণে শ্রেষ্ঠতম স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেও বোম্বাই উপকূলে বিলক্ষণ দস্যুর হাঙ্গাম ছিল, পরে ইংরাজেরা উহাদের দলপতিকে রীতিমত যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দস্যুর উপদ্রব নিবারণ করেন। *

---

* দ্বিতীয় শতাব্দীর ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত লেখক টলেমি এই উপকূলের নাম Pirate Coast রাখিয়াছিলেন এবং তৃতীয় শতাব্দীর Marco polo এই দস্যুদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন:—

"From this kingdom of Malabar, from the kingdom of Janna and from another near it calld Guzrat, there go forth every year more than a hundred corsair vessels on cruise. These pirates take with them their wives and children, and stay out the whole summer. Their method is to join in fleets of twenty or thirty of these pirate vessels together, and they then form what they call a sea cordon—that is, they drop off till there is an interval of five or six miles between ship and ship, so that they cover some thing like 100 miles of sea, and no merchant ship can escape them. For, when any one corsair sights a vessel, a signal is made by fire or smoke, and then the whole of them make for this, and seige the merchants and plunder them." ইনিই আর

বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান সমৃদ্ধিও অতি অল্প দিনের মধ্যে হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ৩টি প্রধান প্রধান রেলের সম্মিলন স্থান হইয়া বোম্বাইয়ের গৌরব হঠাৎ বৃদ্ধি হইয়া পড়িল।

সাহেবেরা কহেন,যে,ইউরোপীয় ভারত প্রবাসীদিগের পক্ষে বোম্বাইয়ের মত স্বাস্থ্যকর স্থান ভারতে আর কোথাও নাই। বোম্বাইয়ের মৃত ব্যক্তির তালিকা দেখিয়া অন্য স্থানের সহিত তুলনা করিলে, এখানে মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প বোধ হইবে। সাহেবেরা ইহাও কহেন, যে, কি স্বাভাবিক দৃশ্য, কি ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা পৃথিবীর আর কোন বন্দরেই এরূপ নাই। বম্বে হইতে দেখিবার যে কয়টি প্রধান বিষয় তাহার এক তালিকা নিম্নে দিতেছি,—

১। সমুদ্র।

২। কেনেরি গুহা।

৩। এলিফ্যান্টা গিরিগুহা।

৪। বেসিন।

৫। বিহার ও তুলসিহ্রদ।

৬। লাইব্রেরি ও মিউজিয়ম্।

৭। ট্যাকশাল। (Mint Master এর অনুমতি পত্র লইয়া দেখিতে যাইতে হয়।)

এক স্থানে বলিয়াছেন—"The people of Guzrat are most desperate pirates in existense, When they have taken a merchant vessel, they force the merchants to swallow a stuff called tamarind, mined in sea water, which produces violent purging. This is done in ease the merchants, on seeing their danger, should have swallowed their most precious stones and pearls, and in this way they seeme the whole."

† ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জি, আই, পি লাইন, ১৮৮১ সালে বোম্বাই হইতে আজমির লাইন, খোলা হয়। এই দুই রেলপথ উন্মুক্ত হইয়া বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সহিত বোম্বাইয়ের সম্বন্ধ নিকটতর হইয়া উঠে। মান্দ্রাজ লাইন খুলিয়া দক্ষিণ ভারতের সহিত বোম্বাইয়ের খুবই নিকট সম্বন্ধ হইয়াছে। তুলার ব্যবসায় দেখিতে দেখিতে ভারতে অধিক হইয়া পড়িল। উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের যাবতীয় উৎপন্নের রপ্তানি ও বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানি বোম্বাইয়ের বন্দরেই হইতে লাগিল, এই সকল কারণে দেখিতে দেখিতে বোম্বাইয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

৮। সেণ্ট টমাস কেথিড্রল। (অবারিত দ্বার।)

৯। গবর্ণমেণ্ট ডক্ইয়ার্ড ও ফ্যাক্টরি।

১০। পব্লিকওয়ার্কস আফিস (এস্প্ল্যানেডে।)

১১। টেলিগ্রাফ্ আফিস।

১২। সেক্রেটরিয়েট আফিস।

১৩। পোষ্ট আফিস।

১৪। এল্ফিনিসটোন্ সার্কলের উদ্যান। (এই উদ্যানে Lord Wellesley সাহেবের সম্মানার্থ শ্বেত প্রস্তরের সিংহাসনের উপর তিনটি শ্বেত প্রস্তর মূর্ত্তি তাঁহার নামেই প্রতিষ্ঠিত আছে। যে মূর্ত্তি সর্ব্বাধিক উচ্চে তাহার নাম জ্ঞান, উহার একপার্শ্বে এক সশস্ত্র যুবামূর্ত্তি উপবিষ্ট তাহার নাম উৎসাহ, অপর পার্শ্বে এক সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি তাহার নাম ন্যায়পরতা। এই ত্রিমূর্ত্তির পশ্চাতে সিংহ ব্যাঘ্র নতশিরে উপবিষ্ট, অর্থাৎ এই ত্রিগুণে হিংস্র পশুও বশীভূত হইয়া থাকে। সম্মানার্হ ব্যক্তির স্মরণ চিহ্ন এইরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠা করায় ভক্তির গভীরত্ব লক্ষিত হয়)

১৫। ক্রফোর্ড বাজার।

১৬। সেসুন সাহেবের শিল্প শিক্ষাগার (Sasoon's Mechanism Institution. Rampart Row, Esplanade.)

১৭। জেম্ সেট্জি, জিজিবাই হাঁসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ। (এই কলেজের অধ্যক্ষ কিম্বা হাঁসপাতালের সার্জ্জনের নিকট হইতে অনুমতিপত্র লইয়া দেখিতে যাইতে হয়।)

১৮। ভিক্টোরিয়া উদ্যান ও আলবার্ট মিউজিয়ম। (প্রতিদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবারিত দ্বার। ঘোড়া গাড়ী বা কুকুর প্রভৃতির প্রবেশ নিষেধ।)

১৯। Colaba Memorial church। (আফ্গান যুদ্ধে যাঁহারা নিহত হন, তাঁহাদের স্মরণার্থ ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দ্বার মুক্ত।)

২০। David sasoon's school of Industry; chemabaty. (এই স্কুলের সেক্রেটরির নিকট হইতে অনুমতি লইলে দেখিতে পাওয়া যায়।)

২১। সূতা প্রস্তুত করিবার ও কাপড় বুনিবার মিল্। (ইহার অধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে অনুমতিপত্র লইলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা

অতি ভদ্রলোক, অনুমতি চাহিলেই প্রদান করেন এবং যন্ত্রের বিবরণ বুঝাইয়া দিবার জন্য অনেক উপযুক্ত কর্ম্মচারিও সঙ্গে দিয়া দেন। আমরা যে কয়টি মিল দেখিয়াছি, সকল গুলির কর্ম্মচারীরা আমাদের বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।)

২২। Framjee Cowasjee Institute ; Dhobee Talas.

২৩। Panjrapool অর্থাৎ পীড়িত. ও অথর্ব্ব পশুদিগের হাঁসপাতাল। (এ স্থান ভোলেশ্বরে।)

২৪। মহারাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি। (Esplanade এ)

২৫। Northbrook উদ্যান। (Grant Road.)

২৬। যুবরাজ প্রিন্স্‌ অব্‌ ওয়েল্‌সের প্রতিমূর্ত্তি। (Esplanade এ)

২৭। Sir Cowasjee Jahangir University Hall.

২৮। Rajabye University Tower। (ইহার উপর হইতে বম্বের ও চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য বড় সুন্দর। সেট প্রেমচাঁদের মাতার নাম "রাজাবাই।" সেট প্রেমচাদ বহু অর্থব্যয়ে মাতৃনামে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

২৯। কেনেরি লাইট হাউস।

৩০। Tower of sibnee। (পার্সিদের সমাধিস্থান।)

৩১। Malabar Hill.

এই কয়েকটি দৃশ্য ও স্থানের মধ্যে দুই একটির বিষয় পরে কিছু বিশেষ করিয়া বলিব।

বোম্বাই সহরের ভিতর বুড়ীবন্দর ষ্টেশনে প্রাতে ৯টা ১৫ মিনিটের সময় পোঁছিলাম। সেখানকার ৯টা ১৫ মিনিট, এখানকার ১০টা ১৫ মিনিট, ১ ঘণ্টার প্রভেদ। ট্রেন হইতে নামিবা মাত্র পার্সি হোটেলওয়ালারা আসিয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, যে তাহাদের হোটেলে অবস্থান করিব কি, না। "না" বলিলেও নিষ্কৃতি নাই, কোথায় থাকিব তাহা না বলিলে তাহারা প্রশ্ন করিতে ক্ষান্ত হয় না। প্ল্যাটফরমের ধারে যাইতে না যাইতে গাড়োয়ানেরা আসিয়া ঘেরিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা পার্সি তাহারা ইংরাজি কথা কহে। ইহাদের সঙ্গে দরদস্তুর না করিয়া যেমন গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে বিলক্ষণ ঠকিতে হইয়াছিল। বিলক্ষণ অনুচিত ভাড়া আদায় করিয়া লইয়াছিল। ইহারা সরললোক নহে। আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিলাম, সে স্থানের নাম Elphinistone Row বলিয়াই জানি-

তাম; কিন্তু গাড়োয়ানের মুখে শুনিলাম, যে, "Row" বলিয়া উক্ত স্থান বম্বেতে নাই, Elphinistone circle বলিয়া স্থান আছে, সেইখানেই যাইলাম। আমার সমবিভ্যারি বন্ধু আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাটীর উপরে আমাদের বোম্বাই-প্রবাসী বন্ধুর অনুসন্ধানে গেলেন, আমি চারি দিকের নূতন ধরণের বাড়ীগুলি দেখিতে লাগিলাম। বোম্বাই নগরের বা উপনগরের বাড়ীগুলি ঠিক পৃথিবীর মত, বাড়ীগুলির বহির্ভাগ অধিকাংশ কাষ্ঠের ফ্রেমে কাঁচে নির্ম্মিত, কাঁচ-গুলিও নানা বর্ণের। বাড়ী যতই বৃহৎ হউক না কেন, এমন কি লাট সাহেবের কুঠি অথবা গবর্ণমেণ্টের আফিস প্রভৃতি সকলেরি খোলার চাল। বঙ্গদেশের খোলার চাল অপেক্ষা বোম্বাইয়ের এ সকল খোলার চালের শোভা আছে।

ভজহরির বিয়ে।

দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ, ভজগোবিন্দ, গুরুগোবিন্দ, ভজহরি, কৃষ্ণহরি, রামহরি, পঞ্চু ন্যায় চুঞ্চু, হাবু বিদ্যালঙ্কার, গোবর্দ্ধন শিরোমণি, কেংলু, নীলু চাকর—সকলেই পাকা মেম্বর। আড্ডা ভারি গুলজার—মহা সরগরম। কেউ গাঁজা টিপচে, কেউ আগুণ চড়াচ্চে—কেউ নল্‌চে ফাটাচ্চে, কেউ দম মেরে ভোঁ হয়ে বসে আছে, কেউ রাজা উজির মার্চ্চে;—ধূমে ঘর অন্ধকার। গান বাজানা, নৃত্য—খোস গল্প—সকলেরই হৃদয়ে যেন সুখের সাগর উথ্‌লে উঠছে!

ভজহরি একজন সর্দ্দার মেম্বর—সকলেরই খুব প্রিয়। গরিবের ছেলে। বাড়ীতে এক বিধবা মা—আর ত্রিকুলে কেউ নাই। একদিন দুপুর বেলা বাড়ীতে ভাত খেতে গেলে, মা চোখের জল মুচ্‌তে মুচ্‌তে বল্লেন "ভজ! তুই গাঁজা খেয়ে একেবারে ব'য়ে গেলি। এখন ডাগর ডোগরটি হয়েছিস্, আজও তোর বোদ সোদ হ'ল না? কত সাধ ছিল—মনে করেছিলুম তোর বে'টি দিয়ে, বউটির মুখ দেখে মোর্ব্বো, আমার কপালে তা হ'ল না! কে তোকে মেয়ে দেবে? গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দে, মেলা কল হয়েছে, কাল

একটা কলে যা। দু টাকা আস্তে পাল্লে আমার যে রূপার পঁইছে আছে, বেচে কিনে তোর বে'টি দিয়ে বউটি এনে দিন কত সুখে ঘর করি।"

"বউ" কি মজার জিনিস্! বউর নাম শুনে ভজর মনে সুখের তরঙ্গ উছলে উঠলো। ব'ল্লে "মা! তুমি আর দুঃখু করো না, আমি আর গাঁজা খাব না। কাল সকালই কলে যাব যাতে টাকা রোজগার হয় তার চেষ্টা কর্ব্বো।"

এই বলে পেটটি ভরে বেশ ক'রে খেয়ে দেয়ে ভজ ঘরে গিয়া শয়ন করিল, এপাশ ওপাশ কত পাশ ফিরিল, ঘুম আর আসে না। পুঁথিগত বিরহিণীর ন্যায় তাহার শয্যাকণ্টক উপস্থিত— মনটি আড্ডায় পড়ে—কেমন করেই বা ঠাণ্ডা হবে! ক্রমে প্রাণটি যেন ঠোটের আগায় এল। গা দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগলো। শুয়ে থাকা ভার হয়ে উঠলো, ভাব্‌তে লাগলো,—"গাঁজা খাব না, বেশ; কিন্তু দূর থেকে দেখে আস্তে দোষ কি। মরি মরি আড্ডায় এখন কত মজা—কত ইয়ারকি উড়ছে, হাবাতের কপালে সুখ নাই। যাহোক চুপি চুপি একবার গিয়ে দূরে থেকে দেখে আসি।"

এই ভেবে ভজ আস্তে আস্তে উঠিয়া আড্ডার অভিমুখে চলিল। বাগানের ভিতর আড্ডাঘর, চারিধারে পগার। দূর থেকেই ভজাই আনন্দের নৃত্যের ও গীতের ধ্বনি শুনিল; ভাবে গদ গদ—চক্ষে দু এক ফোঁটা জলও আসিল—তার কপালে আর ও সুখ নাই; মা কলে যেতে বলেচেন। না গেলে বউ পাবে না। দুঃখে যেন বুক ফেটে গেলো। চুপি চুপি সেই পগার পাড়ে বসিয়া সঙ্গীদের নাচ তামাসা দেখ্‌তে লাগলো। কিন্তু তেমন করে কে কতক্ষণ থাক্তে পাবে—পাথরে কার বুক বাধানো? ভজাই উঠিল—মনকে ডেকে বলিল, 'বেশ খাব না, কিন্তু দেখ্‌তে কি দোষ, দেখতেই বা মানা কি।'

ভজাই সকলের অতি প্রিয়, আজ এতক্ষণ যে ভজাই আসে নাই, আড্ডা যেন অন্ধকার, সকলের মুখেই ভজাইয়ের কথা। কি হয়েছে? ভজাই কেন এল না? এমন সময় মলিন মুখে ভজাই তথায় উপস্থিত! অমনি সকলে ধরে ভজাইকে টানাটানি—কাঁধে করে নিয়ে নৃত্য। চাঁদের উপর থেকে যেন মেঘ সরিয়া গেল সকলেরই মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কেউ গাঁজা সাজিয়া আনিয়া দেয়, কেউ কোলাকুলি করে, মহা আনন্দ পড়ে গেল।

ভজহরির কিছুতেই সুখ নাই,—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো, বল্লে,—"ভাই আর আমি গাঁজা খাব না, আর এখানে আস্‌বো না; তোমরা আমাকে বিদায় দেও!" ভেউ ভেউ ভেউ করিয়া ভজাই কেঁদে আকুল।

ভেউ ভেউ ভেউ—ভজাইয়ের কান্না দেখে সকলেই কাঁদিতে—আরম্ভ করিল। কে কারে থামায়, কে কারে বুঝায়, কারণ কি, কেই বা জিজ্ঞাসা করে।

কতক্ষণ পরে দোলগোবিন্দ কান্না ফেলে লাফিয়ে উঠে ভজাইকে কাঁধে করে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বল্লে—'ভজাই! তুই বয়ে গেলি নাকি? গাঁজা খাবিনি! এই নে ধর্, গাঁজা, মার্ দম!"

অমনি আবার সকলেই নেচে উঠ্‌লো—সকলেই গাঁজা সেজে এনে ভজাইকে ধরে টানাটানি, 'ভজাই গাঁজা খা। তুই কি একেবারে অধঃপাতে গেলি।'

ভজাই কাঁদ কাঁদ ভাবে আবার বল্লে—"না ভাই আমি আর গাঁজা খাব না। মা মানা করেছেন, কাল আমি কলে যাব, টাকা আন্‌বো, মা বে দেবেন বলেছেন, বউ এনে ঘর কর্ত্তে তাঁর বড় সাধ হয়েছে। তোমাদের কি ভাই, আমি গরিবের ছেলে, টাকা না হলে বে হবে না।'

দোলগোবিন্দ গাঁজায় দম মেরে হুঁকা ভজর হাতে দিয়ে হেসে বল্লে "দূর্ বোকা! বে কর্ত্তে কি টাকা লাগে? নে ধর্, গাঁজা খা। সাম্‌নে রোব্‌বার তোর বে হবে। সে জন্যে আর ভাব্‌না কি? বের জন্যে তুই গাঁজা খাওয়া ছাড়্‌বি!"

অমনি ভজাই গাঁজা টানিল—ধোঁয়ে চারি দিক ধোঁয়াকার। একশো ছিলিম গাঁজা উড়িল। চারিদিকে হাততালি পড়ে গেল। নাচ গানের তো কথাই নাই। আড্‌ডা খুব জেঁকে উঠিল।

পরদিন রাত পোহাল। সকলে তাড়াতাড়ি দুটি নাকে মুখে গুঁজে মেয়ে খুঁজ্‌তে চলিল। ভারি আমোদ—ভজর হৃদ্ মাঝারে মহা তুফান—দোলগোবিন্দ বলেছে, সাম্‌নে রোব্‌বার তোর বিয়ে! এ আনন্দ আর কি রাখ্‌বার জায়গা আছে! ভজ, ভাবে গদ গদ—গাঁজায় তর্।

এগাঁ সেগাঁ ওগাঁ বেড়াইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় সকলে দশ ক্রোশ ঘুরে কাণাই গ্রামে পৌঁছিল। তথায় কসাই ঠাকুর নামে এক চক্রবর্ত্তীর একটি পনর বছরের মেয়ে আছে। কসাই ঠাকুর আহারান্তে তামাক খাইতেছেন, এমন সময় সকলে তাঁর বাটীতে উপস্থিত। মেয়ে দেখ্‌তে

এসেছেন, শুনে কর্ত্তা বাবু গুমরে মুখ ভারি করে বল্লেন "মেয়ে একটি আছে সত্য। কিন্তু সে মেয়ে বে করা তোমাদের কাজ নয়।"

দোলগোবিন্দ বলিল,—"মশাই! কাজ নয় কি না তা আপনি কেমন করে জান্‌লেন?

কানাই। "ওহে বাপু, এতে ঢের টাকা চাই—বে অমনি হয় না। এলে, আর পনর বছরের মেয়ে বে করে গেলে, তা হয় না।"

দোল। "ভাল, কি দিতে থুতে হবে, তাই কেন বলুন না। আমরা পরে বিবেচনা কর্ব্বো।"

কর্ত্তাবাবু তামাক টান্‌তে টান্‌তে বল্লেন—"ওহে বাপু বলে কি হবে! তোমাদের মতন অনেকেই এসে এসে ফিরে গেছেন—মিছে বলে কি হবে! এটি আমার ছোট মেয়ে, বড় আদরের—বড়টিকে দেড় হাজার টাকায় পার করেছি। এই আদরের মেয়েটিকে দুই হাজারের একটা কাণাকড়ি কমে ছাড়্‌বো না! শুন্‌লে, টাকা আছে?—আমি আর বল্‌তে পারি না। একটু শয়ন কর্ত্তে হবে।"

কর্ত্তা উঠে যান, পঞ্চুন্যায়চুঞ্চু বল্লেন,—"মশাই! বসুন বসুন। দুট কথা ত শুনুন। আমরা সত্যি ফিরে যেতেও আসিনি, খেলা কর্ত্তেও আসিনি। মেয়েটিকে দিতে হবে।"

কর্ত্তা চটে একটু উচ্চস্বরে বল্লেন,—"তুমি বল্লেই কি মেয়ে একটা অমনি হয়? না এখন আর বক্‌বার সময় নাই, তোমাদের যত মুরদ তা টের পেয়েছি।"

দোলগোবিন্দ বলিল "মশাই চটেন কেন। কিছু কম করুন, তাহলেই হবে।"

"এক পয়সা কম করিব না। তোমরা যাও যাও—এ আমার অতি আদরের মেয়ে। এত বড় মেয়ে আর কোথা পাবে বল দেখি? দুপয়সা যদি না পাব, তবে এত খাইয়ে দাইয়ে এত ডাগর কল্লুম কেন? মেয়ে ভেসে আসে, বটে?"

পঞ্চুন্যায়চুঞ্চু বল্লেন "তা মশাই! যা বল্লেন, সব সত্যি বটে, যাহোক দেড় হাজার পর্য্যন্ত আমরা দিতে পারি। আপনার কি মত বলুন?"

কর্ত্তা খানিক চুপ করে থেকে বল্লেন—"না তা হবে না। আরো কিছু বেশি চাই। তোমাদের খাতিরে আমি একশত টাকা ছেড়ে দিতে পারি।

এক হাজার নয় শত টাকার এক কড়া কড়ি কমে হবে না। ওরে বাবুদের তামাক দে।”

কর্ত্তা এতক্ষণ মনে করেছিলেন এরা এত টাকা দিতে পার্ব্বে না। তামাকেরও নাম হয় নাই। আপনিই মজাকরে খাচ্ছিলেন। এখন দেখ্‌লেন এরা যে সে নয়; অমনি তামাক ডাকিলেন। কিন্তু দেবে কে? ডাক্‌লেন ঐ পর্য্যন্ত।

অনন্তর অনেক বকাবকি, দরদস্তুর, কসা মাজা করে দেড় হাজার দরেই বে ঠিক হল। আব আস্‌চে ররিবার ২২ শে কার্ত্তিক বিয়ে হবে, তাও ধার্য্য হল। এ বের আর কালাকাল। একদিকে ভজহরি—তাব যখন হয়, একটা বে হলেই হল, যেহেতু তার কোন পুরুষেই কারো বে হয় নাই। তার ঠাকুর দাদারা পাঁচ ভাই—চাব ভাই আইবুড়ো বুড়ো হয়ে মবেন, কাকা জেঠা, আট ভাই—৭ জন আইবুড়ো বুড়ো হয়ে মবেন। তাব আবার দিন অদিন কাল আর অকাল। ওদিকে কর্ত্তা বাবুব টাকা হলেই হল।

দিনস্থির করে সকলে চলে গেলেন।

রবিবার আসিল। আড্ডা ডাবি সরগরম। ভজার গায়ে হলুদ। হলুধ্বনিতে চাবিদিক স্তব্ধ—গাঁজাব ধমে আকাশ আচ্ছন্ন। যথা সময়ে আইবুড়োভাত হল। সকলের মহা আনন্দ। ভজ পৃথিবী সরাখানা দেখ্‌চে।

দোলগোবিন্দ মার আদরেব ছেলে। নাই পেয়ে সে একপ্রকার বয়ে গেছে। তাব মার হাতে কিছু পয়সাও আছে। খেতে গিয়ে মাকে ধরিল—যা মুখে আসিল বলিয়া গালি দিল। হাঁড়ি কুঁড়ি ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌ করিল—তাকে একশো টাকা দিতে হবে, মা কি কর্ব্বেন, একশো টাকা দিলেন।

দোলগোবিন্দ টাকা পেয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আড্ডায় গেল। আর ভয় কি।' টাকার যোগাড় হয়েছে। সকলেই দোলকে ধন্নি ধন্নি বলিল।

বেলা দুটার সময় সকলে মহাসমারোহে বাজনা বাদ্দি, পাল্কি বেহারা, একমোণ চিঁড়ে মুড়কি, আধমোণ দই, দুই শত কলাপাত, পাঁচসের গাঁজা নিয়ে বে দিতে চলিল। আমোদ দেখে কে?

রাত দশটার সময় অর্দ্ধেক পথ গিয়া সকলে এক ঠাঁই আড্ডা গাড়িল। মুহুর্মুহু গাঁজা চলিল। ধোঁয়ে চারিদিক অন্ধকার করিল। ভজর আর সে আহ্লাদ নাই—তার প্রাণ ধড় ফড় কর্চ্চে। যত রাত্রি হচ্চে—দেরি হচ্চে

ততই তার মন কেঁদে কেঁদে উটচে—ভয় হচ্ছে। "ভাই গোধূলী লগ্নে বে, আর দেরি করো না।" এই কথা বলে কেবল সকলকে খ্যাঁচ্‌কাচ্চে।

এদিকে গোধূলী লগ্নে বে। কর্ত্তা অনেক টাকা পাবেন—ভারি খুসি; আয়োজন একরকম করেচেন আদরের মেয়ে নাই বা কর্ব্বেন কেন। ক্রমে রাত হল। বরের দেখা নাই। মেয়ের গায় হলুদ হয়েছে, বে দিতেই হবে, না দিলে জাত যাবে। মহাবিপদ। এই আসে এই আসে করে রাত দশটা বাজিল, কাহারও দেখা নাই। কর্ত্তার মাথা ঘুরে গেল—জাত যাবে বলে নয়, পাছে টাকা গুনো মারা যায় এই ভয়ে। কামিনী, ভামিনী, গোলাপ, আতর, কুমুদ, নিস্তারিণী, তরঙ্গিনী—যত সব রসবতী নারী বাসর জাগ্‌বে বলে এসে আসব করে বসেছিল। হতাশ হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে একে একে ঘরে ফিরে গেল। কর্ত্তার মুখে কেবল "সর্ব্বনাশ হল, সর্ব্বনাশ হল।" দেড় হাজার টাকা—!" এই কথা। পুরুৎঠাকুর ও পাড়ার আর আর মুরুব্বিগণ এসে বল্লেন,—"তা যখন কন্যার গায় হলুদ হয়েছে, বে দিতেই হবে। জাতটে তো রাখা চাই। তা আপনি এই গ্রাম থেকেই একটি পাত্র খুঁজে এনে বিয়েটি দিন। ওপাড়ার ঐ কেনারাম চক্রবর্ত্তী আছে, সে না হয়, ঘোষালদের শান্তিরাম আছে—তারা ছেলে মন্দ নয়। যারে হয় একটিকে এনে কন্যা সমর্পণ করুন। জাত কুল সব বজায় থাকবে। এর আর ভাবনা কি! আপনি এত অধৈর্য্য হবেন না।"

কর্ত্তা রেগে টং। "আমার মেয়ে—আমার জাত, আমি বুঝবো। আমি তো তোমাদের সালিসি ডাকি নাই—তোমাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি নাই। তোমাদের মতন গণ্ডমূর্খ—আহাম্মক আমি দুনিয়ায় দেখি নাই। আমি কি জাতের জন্যে ভাব্‌চি—না বের জন্যে ভাব্‌চি? ডেড়রটি হাজার টাকা যায় তার উপায় কি বল দেখি? সেজে গুজে বড় কর্ত্তামো কোর্ত্তে এসেছ!"

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য বল্লেন,—"মশাই পাগল হলেন নাকি! আপনি বুদ্ধিমান, প্রাচীন, এখন কি টাকার ভাব্‌না আগে, না—কিসে জাতকুল থাক্‌বে তার ভাবনা আগে। আপনি কেনারামের ছেলে তিনকড়ির সঙ্গে মেয়েটির বে দিন। সে বেশ সুপাত্র।"

কর্ত্তা রেগে বল্লেন,—"তোমরা আমাকে আর জ্বালিও না। আমি তো তোমাদের ডাকি নাই। যদি কোথায় বরাৎ থাকে যাও। আমি মেয়ের

বে দোব না। আমার জাত যাবে তা তোমাদের কি? আমি কি জন্যে খাইয়ে দাইয়ে মেয়েটিকে পনর বছরের করিছি বল দেখি! আহা আদরী আমার বড় আদরের ধন—আমি তারে জলে ফেলে দিতে পার্ব্বোনা। দেড় হাজারের এক কড়ি কমে এ মেয়ে আমি ছাড়বো না। তা জাতই যাক আর কুলই যাক।"

কত লোকে কত বুঝাইল—কত শাস্ত্র কথা উঠিল। কর্ত্তা কিছুতেই রাজি হলেন না। রাত্রি বারটা বাজিল। দেখে শুনে পুরুৎ ম্লানমুখে ঘরে ফিরে গেলেন, তাঁর বিদায়ের টাকা মারা গেল। ফলারে ব্রাহ্মণ গাল দিতে দিতে ফিরে গেল। ফক্কে ছোঁড়ারা হাততালি দিয়ে ধূলো ছড়াতে ছড়াতে—ছড়া বাঁধ্‌তে বাধ্‌তে চলে গেল। কর্ত্তাও গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্দরে গেলেন। ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়লেন। বে বাড়ী নীরব।

রাত পোহায় পোহায় কর্চ্চে এমন সময় চুপে চুপে দোলগোবিন্দরা দলেবলে বর নিয়ে নিঃশব্দে এসে উপস্থিত। রাত্রি জেগে—গোলমালে গ্রামের ও বে বাড়ীর সকলেই অকাতরে ঘুমুচ্চে। নীলু চাকর পাঁচিল টপ্‌কে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দরজা খুলে দিল, সকলে ভিতরে গিয়ে উঠানে, রকে—স্থানে স্থানে সঙ্গে যে সকল কলাপাত ছিল পাতিয়া দই চিঁড়ে মাখিয়া খাইল—ছড়াইল এবং পরিশেষে পাতাগুলা বাড়ীর চারিদিকে ফেলিল।

যেন বে হয়ে চুকে বুকে গেছে এই ভাবে ভজহরিকে সাজাইয়া চণ্ডিমণ্ডপে বসাইয়া আপনারা পাশে বসিল। সঙ্গে তামাকত ছিলই—মুহুর্মুহু গাঁজা ও তামাক চলিতে লাগিল। সকলেই বেশ ভদ্রলোক বিজ্ঞ পঞ্চু ন্যায়চুঞ্চু, গোবর্দ্ধন শিরোমণি ও হাবু বিদ্যালঙ্কার, চতুর দোলগোবিন্দ—কে এক কথা বলে যায়?

সকাল হল। পুরুৎ ঠাকুর টাকাটা মারা গেছে—মন উস খুস কর্চ্চে, ঘরে থাক্তে পাল্লেন না, রাত পোয়াতে তাড়াতাড়ি দেখতে এলেন বের কি হ'ল। দোলগোবিন্দ আকার প্রকার ভাবভঙ্গি দেখেই ঠিক ঠাউরে সসম্ভ্রমে উঠে নমস্কার কল্লে—বরও তাড়াতাড়ি পদধূলি লইল।

তখন পুরুৎ ঠাকুরকে সমাদরে বসাইয়া দোলগোবিন্দ বলিল "মশাই আসুন আসুন—বস্‌তে আজ্ঞা হয়। আপনি মনে কর্ব্বেন না আমরা আপনার টাকা মার্ব্বো। আমরা সেরূপ লোক নই। আপনি থাকুন

আর নাই থাকুন আপনার পাওনা গণ্ডা কোথা যাবে। এই ধরুন—আমরা দরিদ্র—তবে যথাসাধ্য আপনার সম্মান রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ দিতেছি, গ্রহণ করুন বলিয়া ৫ পাঁচটি টাকা পুরুতের হাতে দিলেন। পুরুৎ একটি কি দুটি টাকা পাইতেন—একেবারে পাঁচ টাকা! পুরুতের বুক বার হাত—হাতে যেন স্বর্গ পাইল। দোলগোবিন্দরা তাঁহার চক্ষে সাক্ষাৎ ভদ্রতার মূর্ত্তি! পুরুৎ ঠাকুর কত আশীর্ব্বাদ—কত ধন্নি ধন্নি কল্লেন।

এ কথা সে কথার পর হাবু বিদ্যালঙ্কার বল্লেন "কিন্তু মশাই! সে যা হোক, কর্ত্তা মশাইয়ের রীত চরিত্র দেখে আমরা অবাক হয়েছি। আমরা ভদ্রসন্তান—উনিও বিজ্ঞ, প্রাচীন ও ভদ্রসন্তান—বিশেষ এখন আমরা কুটুম্ব. আমাদের সঙ্গে এরূপ ব্যাভার করা ভাল নয়। পারাপারের পথ, বুঝ্‌তেই পারেন,—আমরাও নদীর কূলে উপস্থিত—আর ঝড় বলে কোথা ছিল—বড় বড় গাছ আমাদের চোখের ওপর ভেঙ্গে পড়্‌লো! পার হই কেমন করে, সুতরাং বিলম্ব হলো। আপনারাও চলে গেছেন আমরাও তার পর উপস্থিত হয়েছি। যাহা হউক, শিরোমণি মশাই ছিলেন, তাই কোনরূপে বেটা হয়ে গেল, আপনাকে আর কষ্ট দিলাম না। কর্ত্তা মশাইকে কথামত দেড় হাজার টাকা গুণে দিলাম,—এখন তিনি দেরি হওয়ার দরুন আরো দুই শত টাকা চান! আপনি ত বিবেচক বলুন দেখি, এটি কি অন্যায় কথা নয়? কর্ত্তা বল্লেন আর দুইশো না দিলে তিনি কখনও কোনে পাঠাবেন না! কি অন্যায়! আমাদের কাছে যে টাকা নাই এমন 'কথা নয়' বলি আপনারা পাঁচজন আছেন, আপনাদেরও ত সম্মান রাখা চাই!"

পুরুৎ ভট্‌চার্জ্জি বামুন—চালকলালোভী—তাঁর ধর্ম্মাধর্ম্ম কাণ্ডজ্ঞান কোথা! পাঁচটা টাকা পেয়েছেন। এখন তিনি অনায়াসে তাঁবা তুলসী গঙ্গাজল হাতে করে বল্‌তে পারেন, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে 'বে দেছেন। হাবুর কথা শুনে চটে লাল্—হাত নেড়ে—টিকি নেড়ে বল্লেন "আমি জানি কর্ত্তার ঐরূপ স্বভাবই বটে—কিন্তু গাঁয়ে কি ভদ্রলোক নাই, তিনি যা ইচ্ছে—তাই কর্ব্বেন! এমন না হলে লোকে কসাই ঠাকুর বল্‌বে কেন! যা হোক্ আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, দেখ্‌চি কেমন করে তিনি মেয়ে না পাঠান। আপনারা যেরূপ ভদ্রলোক—আপনাদের মাথায় করে রাখ্‌তে হয়,—

দোলগোবিন্দ বলিয়া উঠিল "মশাই! ওকথা বল্‌বেন না।"

পুরুতের গলা,—ভট্‌চাজ বামুন রেগেছে—মহাগোল উঠিল। কামিনী ভামিনী প্রভৃতি যে সকল রসিকা এসে ফিরে গিয়েছিল তারাও গোল শুনে একে একে এসে উঁকি ঝুঁকি মার্ত্তে লাগ্‌লো। শুন্‌লে বে হয়ে গেছে—কর্ত্তা মেয়ে পাঠাবেন না বলে পুরুৎ ঠাকুর বকাবকি কচ্চেন। তারা ঠান্‌দিদিকে ডাকিল, বাসর জাগানির দাবি করিল। দোলগোবিন্দ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ঝনাৎ করিয়া দশ টাকা দিল। সকলেই খুবখুসি।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কয়েক জন যণ্ডামার্ক বারোইয়ারির পাণ্ডা উপস্থিত। দোলগোবিন্দ খুব খাতির করে বসাইয়া কি চান জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা দশ টাকা চাহিল, দোলগোবিন্দ তৎক্ষণাৎ দশটাকা বাহির করিয়া দিল। পাণ্ডা বাবুরা ভারি খুসি—বলিল এমন ভদ্রলোক আর হয় না।'

পুরুৎঠাকুর বল্লেন "এমন ভদ্রলোক হয় না সত্যি, কিন্তু তোমাদের কসাই ঠাকুরের ব্যাভারটা একবার ভাব দেখি! দেড় হাজার টাকা মেয়ের দর হয়—বাবুরা দেড় হাজার টাকা সে বল্‌তে গেলে আমার সামনেই বটে—গুণে দিলেন, বে হলো। তবে দেবতার দুর্য্যোগে এঁদের আস্তে একটু দেরি হয়। কর্ত্তা তাই বলে আরো দুই শত টাকা চান। টাকাও এঁদের কাছে আছে, সে কেবল আমাদের পাঁচজনকে দিবার জন্য; আর তাইবা ওঁরা দেবেন কেন? কর্ত্তা পণ করেছেন আর দুশো না দিলে মেয়ে পাঠাবেন না। আপনারা ভদ্রলোক, ভাল সময়েই এসেছেন, এর কি কোন উপায় হবে না?

একে বারোইয়ারির পাণ্ডারা স্বভাবত যণ্ডামার্ক গোঁয়ার—মূর্খ ও দাঙ্গাবাজ। গাঁয়ের সকলেই তাদের ভয় করে, তাহাতে কালরাত্রিতে কর্ত্তা তাহাদের সঙ্গে ভাল করিয়া কথাই কন নাই, তারা রেগে তালঠুকে বল্লে "কি! এদের সঙ্গে অভদ্রতা! কর্ত্তার কি মাথার উপর দুট মাথা—তিনি কি দিগ্বিদিক হয়েছেন? দেখি তাঁর কোন্ বাপ রাখে, আমরা মেয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি।"

পুরুৎ সহায়, মেয়েরা সহায়—শেষকালে গাঁ বিখ্যাত বারোইয়ারির পাণ্ডারা সহায়—আর "বউ" যায় কোথা।"

পাণ্ডারা দলবেঁধে বগল বাজিয়ে তালঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বাড়ীর ভিতর গিয়ে মেয়েকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে বাইরে নিয়ে এলো। মহা গোল উঠিল।

কর্ত্তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি কাচা খুলে পড়্ছে, বুক্ চাপ্ড়াতে চাপ্ড়াতে "আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল! বলে পুলিশের দিকে ছুটিলেন। "ওগো মেয়ের বে হয় নি—আমি এক পয়সাও পাই নি—আহা আমার দেড় হাজার—দেড় হাজার টাকা—বাবাগো আমার সর্ব্বনাশ হল! তোমাদের পায়ে পড়ি—মেয়ে ছেড়ে দাও," বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কে তাঁর সে কথায় কাণ দেয়, মেয়েকে টেনে এনে পাল্কিতে তুলিল। কর্ত্তা অন্য উপায় না দেখে পুলিশে ছুটিলেন। আত্তা উল্লা হেড্ কনেষ্টবল এসে উপস্থিত—তারও একটা দাঁও! এসে দেখ্লে বে বাড়ী—চারিদিকে ভদ্রলোক উপস্থিত। কারে কি বলিবে। দোলগোবিন্দ বলিল,—"জমাদার মশাই এসেছেন, বেশ হয়েছে, আসুন আসুন। এ শুভ কার্য্যে আপনারাও কিছু পেয়ে থাকেন। আমরা চোর নই—ডাকাত নই—বে দিতে এসেছি—তা যা হোক এই ধরুন" বলে, পাঁচটি টাকা জমাদারের হাতে দিল। টাকা পেয়ে জমাদার সাহেব ভারি খুসি—একেবারে গলে গেলেন, বল্লেন "বাস্তবিকই তাই, আপনারা অতি ভদ্রলোক কর্ত্তা পাগল হয়েছেন। আপনারা ওঁর কথা শুনিবেন না; বউ নিয়ে যান। আমি দাঁড়িয়ে থেকে পাঠাচ্চি।" কর্ত্তা অবাক।

বউ পাল্কিতে উঠিল পাশে ভজ বসিল। জমাদার কহিল পাল্কি উঠাও। বেহারারা 'হিমপ্লো" "হিমপ্লো" কোক্তে কোর্ত্তে ছুটিল। দোলগোবিন্দ বলিল, 'বাজন্দারগণ! খুব জোরে বাজানা বাজাও। অমনি ঢোল কাঁশি, শানাই—জোরে বাজিয়া উঠিল। বাড়ীর ভিতর হতে এয়োরা,—বাহিরে দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি করতালে "হুলধ্বনি" করিতে লাগিল। ভজর বিয়ে হল মহা সাড়া পড়ে গেল। দোলগোবিন্দ কেনারাম চক্রবর্ত্তী নামে কন্যাকর্ত্তার একজন জ্ঞাতিকে সঙ্গে করিয়া লইল। কর্ত্তা বুক চাপ্ড়াতে লাগ্লেন।

সেই রাত্রি ভজর বাড়ী মহা ধুম। ভজর মার মহা আনন্দ। পাড়া পড়শীর মেয়েরা ভজর বাড়ীতে মহা ব্যস্ত। ভজর বাড়ীতে বিবাহের সকল উদ্যোগই হইয়াছে। কেনারাম কন্যা সম্প্রদান করিলেন, ভজহরির বিবাহ হইল। ভজ আপন বাসরে বাসর সজ্জা করিয়া বসিল। আপন মনে গুণগুণ করিয়া গান গাহিল, কিন্তু এমন শুনা গিয়াছে, যে, পর দিনের কুশণ্ডিকা পর্য্যন্ত ভজহরি গাঁজা খায় নাই। কিন্তু এমনও

শুনা গিয়াছে, যে, বৌভাতের সময় গাঁজার ধূমের অন্ধকারে নববধূ পরিবেশন করিবার সময় পাতভাত কিছুই দেখিতে পায় নাই। ইতি ভজহরির বিয়ে। এই বিবাহের কথা শুনিলে ও পড়িলে মহা বংশজেরও অচিরাৎ বিবাহ হয়।

এবার আসিল বঙ্গে দারুণ ভাদর।

এসেছিল বঙ্গে বটে দারুণ ভাদর!
সারিয়া চাষের কাজ, চাষী এল গৃহমাঝ,
আলিঙ্গন দিল তারে ম্যালেরিয়া জ্বর।
এবার আসিল বঙ্গে দারুণ ভাদর।
সেই একদিন ছিল হায়রে যখন
সরল কৃষক মনে, কৃষিকার্য্য সমাপনে,
উপজিত আনন্দের কৌমুদী কিরণ!
নব শ্যাম শস্যাসনে, কৃষকের চিত্তবনে
ফুটিত আশার চারু কলিকা রতন।
কোথায় সে দিন হায় কোথায় এখন?
বঙ্গের কোমল শিশু ছাড়ি ধুলাখেলা,
ছাড়ি জননীর কোল, অঞ্চলের চেল,
ঐ যে লুটাইয়া পড়ে লতা যেন ভীম ঝড়ে;
পিতা মাতা বুকে যেন বাজিতেছে শেল।

শারদ পার্ব্বণ আসে, পাইবেন পতি পাশে
এহেন আশার কুঞ্জে হর্ষের চন্দ্রিকা
ছড়ায়ে বেড়ায় অই কিশোরী বালিকা,
গৃহস্থের চণ্ডীপাট নীরব নিথর ঠাট
তাস, পাশা, সতরঞ্চ ঐ পড়ে আছে,
বঙ্গের কিশোর আশা যুবা কোথা গেছে?

সান্ধ্য সংগীতের ধ্বনি কোন স্থানে নাহি শুনি,
সুতার সেতার, বীণা, মৃদঙ্গের রব
একা মহাজ্বর সব করেছে নীরব!
সেই এক দিন ছিল হায়রে যখন,
শরতের সন্ধ্যাগমে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে
অমল প্রমোদ লীলা করেছি দর্শন!
বাহির রোয়াকে বসে কৃষকের দল,
যুবা বৃদ্ধ এক ঠাঁই, আনন্দের সীমা নাই,
কহিত শস্যের কথা সবে অনর্গল,
অধরে আশার হাসি মধুর সরল।
পল্লীর সংগীত প্রিয় যুবক নিকর
মিলিত হইয়া সবে, উৎসাহের মহোৎসবে
জ্যোৎস্না মাখা সমীরণে ঢালিত সুস্বর।
দেবী আগমনী গান কেমন সুন্দর।

বৎসরের মধ্যে ঋতু শরৎ সুন্দর,
দেবের অধরে যেন হাসি সুধাকর।
নিসর্গ সুন্দরী কোলে বিভোর সরসী দোলে
ভাসে যেন বৃষ্টি ধৌত অমল কমল।
শরৎ কি মনোহর ঋতু নিরমল।
বর্ষার বারিদগণ বারি করি বরিষণ
ধুইয়াছে প্রকৃতির বিশাল প্রাঙ্গণ
সুমার্জিত তরুলতা, মার্জিত গাছের পাতা,
সুস্নিগ্ধ চিকণ আভা করেছে ধারণ।
গ্লানি বিগলিত অঙ্গ বিধৌত পর্ব্বত শৃঙ্গ,
জল ধৌত মাঠ, ঘাট, বন, উপবন,
মলিনতা নির্ব্বাসিত হয়েছে এখন।
নির্ম্মল গাছের পাতা, নির্ম্মল কুসুম লতা,
চারিদিক সুচিকণ অতি মনোহর;
বৎসরের মধ্যে ঋতু শরৎ সুন্দর।

হাসিছে অমল চাঁদ আকাশ মণ্ডলে,
ভুলিছে কিরণ তার সরসীর জলে।
আকাশে চাঁদের খেলা, ধরায় কিরণ মেলা
পরিতেছে তরুলতা অতি কুতূহলে,
জলে ধোয়া সুচিকণ চারুশ্যাম গলে।
সকলি হাসির ঘটা অতি মনোহর।
হাসে চাঁদ, হাসে তারা, সুনীল গগন ভরা,
হাসে ধরা, হেসে নদী বহে তর তর,
হাসিয়া আকুল ফুল ফুলায়ে অধর।
বনে, উপবনে, মাঠে, তটিনীর তীরে
হাসিয়া বিভোর কাশ কুসুম নিকরে।
চারু সরোবর কোলে হাসি আর কত দোলে,
কমলিনী, কুমুদিনী সরস অম্বরে
নববালা কুবলয় কোকনদ কোলে
হাসিয়া চপল হাসি পড়িতেছে ঢোলে।
সরতীরে কেতকিনী, হাসে চির সুহাসিনী,
নিরমল সুচিকণ দন্ত পাঁতি খলে।

তনয় তনয়া নিয়ে, হরপুর তেয়াগিয়ে
আসিবেন হৈমবতী হিমালয় ঘরে,
ধরার অধরে তাই হাসি নাহি ধরে।
আসিবেন ভগবতী তাইতে প্রকৃতি সতী
বরষার জলধারে ধরণী গগন
ধুইয়া মাজিয়া এত করেছে চিকণ।
চিকণ গগন গায়, পার্ব্বতীর প্রতীক্ষায়
হর্ষ অবসাদে ভোর তারা শশধর
ধরায় কিরণ কণা ঢালে ঝরঝর।
চিকণ গাছের পাতা, চিকণ দোলনি লতা,
সুচিকণ ফুলফল, শ্যাম শস্য তৃণ দল;
উমার বদন ইন্দু দেখিবার আশে
শারদী-শিশির-সুখ-প্রেম-নীরে ভাসে।

হের দেখ ভিন্ন ভাব বাঙ্গালির ঘরে,
কারো মুখে নাই হাসি, উৎসাহের পৌর্ণমাসি
লুকায়েছে বিষাদের আঁধার উদরে।
জীবিত শবের রাশি শয্যার উপরে,
জর-জীর্ণ কলেবর, কাঁপিতেছে থর থর,
মুখে জলদিতে লোক নাই কারো ঘরে!
কর্ত্তা গিন্নী দুই জন অন্তিম শয্যায়,
হতাশ দৃষ্টিতে হায়, এ উহার পানে চায়,
পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণগণ্ডে মন্দাকিনী ধায়!
ভাই ভগ্নী এক ঠাঁই গড়া গড়ি যায়,
ননীর পুতলী দেহ, দারুণ জরের দাহ;
সহিতে না পেরে তাপ, ধূলায় লুটায়!
শিশু বলে 'দেমা জল পিপাসায় মরি,'
চাঁদ মুখে দিতে জল মায়ের নাহিরে বল,
হায় কষ্ট নিদারুণ অহো মরি মরি!
সোণার প্রতিমা ওই বঙ্গ কুল বধূ
জরে জীর্ণ স্বর্ণকায়, রক্তমাংস নাহি তায়,
বিছানায় আছে পড়ে হাড় গুলি শুধু!
কারো ঘরে বাসি মড়া পড়ে আছে জোড়া জোড়া,
দাহ কার্য্য দূরে থাক, টানিয়া ফেলিতে!
সুস্থ কায় লোক গ্রামে না পাবে দেখিতে!
ঘরে ঘরে ক্ষীণস্বরে রোদনের রোল;
শিয়াল কুকুর ফিরে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে;
বাগানে খিড়্‌কির ঘাটে শ্মশানের গোল!
সুখের শরৎ কালে এ বঙ্গ আলয়ে,
বাঙ্গালি ভুগিছে জরে, মরা কান্না ঘরে ঘরে,
কে দিবে মা পুষ্পাঞ্জলি তোর রাঙা পায়ে?
নিজ গুণে দয়া করে এস দুর্গে বঙ্গপুরে
দেখে যাও ঘরে ঘরে বাঙ্গালির দশা;
এ পাপ জাতির তুমি অন্তিমের আশা।
এসেছিল বঙ্গে বটে দারুণ ভাদর।
আশ্বিনে অম্বিকা মাগো সবে রক্ষা কর॥

ঋগ্বেদের দেবগণ।

তৃতীয় প্রস্তাব। আলোক দেবগণ।

অদিতির পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলেই আমাদের শকুন্তলা নাটকের শেষ অংশটুকু মনে পড়ে। দুষ্মন্তরাজা ভ্রান্তিবশত শকুন্তলার সহিত অনেক দিন বিচ্ছেদ সহ্য করিলে পর সেই শকুন্তলাকে পাইলেন। হীনমতি কবি এরূপস্থলে কেবল প্রণয়ী সমাগম সুখ বর্ণনা করিতেন, কিন্তু কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস সেই সম্মিলন সুখ সম্পূর্ণ করিবার জন্য সেই প্রণয়ী দম্পতিকে ইন্দ্রের পিতা মাতা, দেব ও মনুষ্যের পিতা মাতা, কশ্যপ ও অদিতির নিকট লইয়া গেলেন। কশ্যপ মরীচির পুত্র, অতএব ব্রহ্মার পৌত্র; অদিতি দক্ষের তনয়া, অতএব তিনিও ব্রহ্মার পৌত্রী। পবিত্রাত্মা কশ্যপ ও অদিতি দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং পবিত্ররসে পাঠকদিগের হৃদয় প্লাবিত করিয়া কালিদাস নাটক শেষ করিলেন।

অদিতির এই পৌরাণিক মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর, কিন্তু অদিতির বৈদিক মূর্ত্তি ইহা অপেক্ষাও সরল, পবিত্র ও মহৎ। ঋগ্বেদের অদিতি কে? ঋগ্বেদের ঋকেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

"অদিতিই আকাশ, অদিতিই অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, অদিতি পিতা, অদিতিই পুত্র। অদিতিই সমস্ত দেবমণ্ডলী, অদিতিই পঞ্চ শ্রেণী মনুষ্য; যাহা কিছু জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে সমস্তই অদিতি, যাহা কিছু জন্মগ্রহণ করিবে সে সমস্তই অদিতি।"

১ মণ্ডল, ৮৯ সূক্ত, ১০ ঋক্।

দো ধাতু অর্থে ছেদন বা খণ্ডন, অদিতি অর্থে এই অখণ্ড অসীম ব্রহ্মাণ্ড! আকাশ ও পৃথিবী, সূর্য্য ও আদিত্যগণ, ঋগ্বেদের দেবগণ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, অতএব অদিতির সন্তান। অনন্ত আকাশ ও অনন্ত পৃথিবীতে মনুষ্য দৃষ্টি যতদূর যায়, তাহার বহির্ভূত স্থলে মনুষ্য কল্পনা যতদূর সঞ্চরণ করে, সেই অসীমতা, সেই অনন্ততা, সেই অননুভবনীয় মহত্ত্বকে সরল হৃদয় প্রাচীন ঋষিগণ অদিতি বলিয়া উপাসনা করিতেন। দিবাকরের গৌরবান্বিত মণ্ডল দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া সবিতা বা সূর্য্য

বলিয়া ডাকিতেন, বৃষ্টিদাতা আকাশের হিতকর কার্য্যে স্নিগ্ধ হইয়া তাঁহারা সেই আকাশকে ইন্দ্র বলিয়া ডাকিতেন, কিন্তু যখন সমস্ত আকাশ পৃথিবী, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একেবারে দর্শন বা কল্পনা করিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইতেন, তখন তাঁহারা সেই অনন্ততাকে অসীম বা "অদিতি" ভিন্ন অন্য নাম দিয়া ডাকিতে জানিতেন না। অদিতি দেবীর এই আদিম অর্থ,—আজি চারি সহস্র বৎসর পর ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাকে Infinite বলেন।

বৈদিক অদিতির কথাটি পুরাণে যেরূপ ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে "দিতিরও" সেইরূপ। অদিতির নামের দেখাদেখি "দিতির" নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদে এই "দিতি" শব্দটি তিনবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। একবার অদিতি অর্থে দিতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, আর দুইবার অদিতি শব্দের সহিত একত্র দিতির ব্যবহার হইয়াছে, দিতি শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই। শব্দটি এইরূপে উৎপন্ন হইল, কিন্তু ক্রমে উপাখ্যান বাড়িতে লাগিল এবং পুরাণে আমরা সে উপাখ্যানের চরম অবস্থা দেখিতে পাই। পৌরাণিক দিতি অদিতির ন্যায় ব্রহ্মার পৌত্রী এবং দৈত্যদিগের মাতা।

মরীচির পুত্র কশ্যপ ঋগ্বেদে একজন ঋষিমাত্র, অন্যান্য ঋষির ন্যায় মন্ত্রের দ্বারা দেবদিগের স্তুতি করিতেছেন। (১ মণ্ডল, ৯৯ সূক্ত দেখ।) পুরাণে সেই কশ্যপ অদিতির পতি এবং দেবদিগের পিতা।

আবার আমরা পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা পাইয়া থাকি। পৌরাণিক সে দ্বাদশ আদিত্য এই।

ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জন্যো দশমঃ স্মৃতঃ॥
তত স্ত্বষ্টা ততো বিষ্ণুরজঘন্যো জঘন্যজঃ।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা নামভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

কিন্তু ঋগ্বেদ রচনার সময় দ্বাদশ আদিত্য ছিলেন না, সাতজন মাত্র আদিত্য ছিলেন। দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তের প্রথম ঋকে ছয়জন আদিত্যের নাম আছে, যথা মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। এবং প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তের ১২ ঋকে ও ১৯১ সূক্তের ৯ ঋকে ও অন্যান্য স্থানেও সূর্য্য বা সবিতাকে আদিত্য বলা হইয়াছে। দশম মণ্ড-

লের ৮ সূক্তের ৯ ঋকে স্পষ্টই লিখিত আছে, যে, অদিতির আট সন্তান ছিল, তাহার মধ্যে তিনি মার্ত্তণ্ডকে ত্যাগ করিয়া আর সাতজনকে দেবদিগের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানটির আদিম প্রাকৃতিক অর্থ কি, তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আমাদিগের স্বদেশীয় টীকাকারগণ এ উপাখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন নাই এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহা আমাদিগের সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। *

যে সাতজন আদিত্যের নাম উপরে দেওয়া হইল তাহার মধ্যে বরুণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দিয়াছি। দক্ষ অর্থে ক্ষমতা বা শক্তি, শতপথব্রাহ্মণে (২।৪।৪।২) এই দক্ষ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির নামান্তর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এবং পুরাণে দক্ষ শক্তির পিতা, এবং শিবের শ্বশুর। এই পৌরাণিক গল্পের অর্থ দুর্ব্বোধ নহে, শক্তি অর্থে সৃষ্টি ক্ষমতা, সে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিরই কন্যা, এবং ধ্বংস ক্ষমতার (শিবের) সহিত সর্ব্বদাই সংযুক্ত আছে। অংশও একজন আদিত্য; অংশ অর্থে বিভাগ,—অনন্ত আলোকের বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিভাগ বা অংশ। 'ভগ' সূর্য্যের নামান্তর মাত্র, পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী বলেন "অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, 'ভগ' সেই কালের সূর্য্য।" অবশিষ্ট তিনজন আদিত্য, অর্থাৎ মিত্র অর্য্যমা ও সূর্য্য সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিবরণ আবশ্যক।

মিত্র আর্য্যদিগের একজন পুরাতন দেব, সুতরাং হিন্দু আর্য্যদিগের মধ্যে তাঁহার যেরূপ উপাসনা দেখা যায়, ইরাণীয় আর্য্যদিগের মধ্যেও তাঁহার উপাসনা দেখা যায়। হিন্দুদিগের 'মিত্র" দিবা বা আলোক, † ইরাণীয়দিগের মধ্যে "মিথ্র" সূর্য্য বা সূর্য্যালোক।

মিত্র সম্বন্ধে 'জেন্দ অবস্থা' হইতে আমরা একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করিব।

"অহুরো মজ্দ স্পিতিমা জারা থস্ত্রকে কহিলেন, 'যখন আমি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি মিথ্রকে সৃষ্টি করি, হে, স্পিতিমা! আমি, তাঁহাকে আমার ন্যায় যজ্ঞ ও উপাসনার যোগ্য করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলাম।' * *

---

* See Max Muller's translation of the Hymns to the Maruts, Vol 1. (1859) P. 241.

† "মৈত্রং বৈ অহরীতি শ্রুতেঃ।" সায়ণ।

"আমরা মিথ্রকে যজ্ঞ প্রদান করি, তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি, তিনি সত্যবাদী, সভায় সভাপতি। তাঁহার সহস্র সুন্দর কর্ণ আছে, তাঁহার দশ সহস্র চক্ষু আছে, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান আছে। তিনি বলবান, অনিদ্র, চির জাগরুক।" জেন্দ অবস্থা। মিহির যাস্ত।

ঋগ্বেদে মিত্রের স্বতন্ত্র স্তুতি প্রায় নাই, বরুণের সহিত মিত্রের একত্র স্তুতি আছে,—বরুণ নৈশ আকাশ বা নৈশ অন্ধকার, মিত্র দিবার আলোক। জেন্দ অবস্থায় অনেক স্থলে অহুর মজ্‌দের স্তুতির সহিত মিথ্রের স্তুতি একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন ইরাণীয় অহুর মজ্‌দ হিন্দুদিগের বরুণের প্রতিরূপ।

মিত্র যেরূপ আর্য্যদিগের প্রাচীন দেব অর্য্যমা ও সেইরূপ, এবং হিন্দু আর্য্য ও ইরাণীয় আর্য্যদিগের মধ্যে তাঁহারও উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের অর্য্যমা সূর্য্যের একটি নাম। সায়ণ বলেন তিনি দিবা ও রাত্রির বিভাগকারী সূর্য্য অর্থাৎ প্রাতঃকালের সূর্য্য। * পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে অর্য্যমা কহেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে মিত্র ও বরুণের সহিত অর্য্যমার স্তুতি একত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

"প্রকৃষ্ট জ্ঞান যুক্ত বরুণ এবং মিত্র অর্য্যমা যাহাকে রক্ষা করেন, কেহ তাহার হিংসা করিতে পারে না।

"তাঁহারা যে মনুষ্যকে নিজ হস্ত দ্বারা ধনপূর্ণ করেন ও হিংসুক হইতে রক্ষা করেন, সে মনুষ্য কাহারও দ্বারা হিংসিত না হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"বরুণাদি রাজাগণ সেই মনুষ্যদিগের জন্য শত্রুদিগের দুর্গ বিনাশ করেন, শত্রুদিগকেও বিনাশ করেন, পরে সেই মনুষ্যদিগের পাপ অপনয়ন করেন।

"হে আদিত্যগণ! তোমাদিগের যজ্ঞে আসিবার পথ সুগম্য ও কণ্টক রহিত; এই যজ্ঞে তোমাদিগের জন্য মন্দ খাদ্য প্রস্তুত হয় নাই।

"হে নেতা আদিত্যগণ! যে যজ্ঞে তোমরা ঋজু পথ দিয়া আইস, সেই যজ্ঞে তোমাদিগের উপভোগ হউক।

---

* "অর্য্যমা অহোরাত্রি বিভাগস্য কর্ত্তা সূর্য্যঃ।" সায়ণ। মিত্র ও বরুণ দিবা ও রাত্রি; "অর্য্যমা উভয়ো মধ্যবর্ত্তী দেবঃ।" সায়ণ।

"হে আদিত্যগণ! তোমাদের অনুগৃহীত মনুষ্য কাহারও দ্বারা হিংসিত না হইয়া সমস্ত রমণীয় ধন সম্মুখেই প্রাপ্ত হয়।

"সখাগণ! মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণের মহত্ত্বের অনুরূপ স্তোত্র কি প্রকারে সাধন করিব?"

১ মণ্ডল, ৪১ সূক্ত, ১ হইতে ৭ ঋক্।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইরাণীয়দিগের মধ্যেও অর্য্যমার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের মধ্যেও যেরূপ, ইরাণীয়দিগের মধ্যেও সেই রূপ "অর্য্যমন্" প্রথমে আলোক বা সূর্য্যদেব। তিনি অনেক রোগের ঔষধি জানিতেন ইরাণীয়দিগের বিশ্বাস। যখন পাপমতি অঙ্গ্রমৈন্যু ৯৯৯৯৯ প্রকার রোগ সৃষ্টি করিলেন, তখন ইরাণীয়দিগের প্রধান দেব অহুর মজ্দ তাহার প্রতিকারের জন নৈরসংঘকে (সংস্কৃত নরাশংস অগ্নির নাম) দূত করিয়া অর্য্যমনের নিকট পাঠাইলেন।

"পরম কমনীয় অর্য্যমন্ সকল প্রকার রোগ ও মৃত্যু ও যাতু ও পৈরিক ও জৈনিদিগকে ধ্বংস করুন।" জেন্দ অবস্তা, ২১ ফার্গার্দ।

সূর্য্য আদিম আর্য্য জাতির আরও পুরাতন দেব, সুতরাং আর্য্য জাতির অনেক শাখার মধ্যে তাঁহার একই নামে উপাসনা হয়, এরূপ দেখা যায়। গ্রীকদিগের Helios, লাটিনদিগের Sol, টিউটনদিগের Tyr, এবং ইরাণীয়দিগের "খোরশেদ" এই "সূর্য্য" শব্দের রূপান্তর মাত্র!

আমরা পুরাণে সূর্য্যের হরিৎ নামক অশ্বের কথা শুনিতে পাই, ইন্দ্রের হরি নামক অশ্বের বিষয় পাঠ করি, অগ্নির রোহিত নামে অশ্ব আছে—তাহা জানি। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি? অর্থ অতি সরল এবং ঋগ্বেদ পাঠ করিলেই অনায়াসে বোধগম্য হয়। সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, অগ্নির আলোক চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, বৃষ্টি পতনের পর আকাশের আলোক পুনরায় চারিদিকে বিস্তারিত হয়, এই জন্য ঋগ্বেদের কবিগণ সেই ধাবমান বা বিকাশমান আলোককে অশ্বের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সেই আলোক সমূহ লোহিত বা উজ্জ্বলবর্ণ সুতরাং অশ্ব সমূহের হরিৎ, অরুণ, অরুষ, হরি, রোহিত, ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছিল, এ সকল শব্দ গুলিই উজ্জ্বল বর্ণব্যঞ্জক। কালে ক্রমে আমরা এ সুন্দর উপমাটি ভুলিয়া যাইলাম এবং সূর্য্যের অশ্বের নাম হরিৎ, ইন্দ্রের অশ্বের নাম হরি ইত্যাদি বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। বেদের সকল প্রকৃতি সম্বন্ধীয় উপমা গুলিকে প্রকৃত

বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমরা পুরাণের বিস্তীর্ণ ভাণ্ডার উপন্যাস ও উপাখ্যানে পরিপূরিত করিয়াছি।

কেবল যে আমরাই এরূপ করিয়াছি তাহা নহে। সূর্য্যের প্রথম সুন্দর কিরণকে ঋগ্বেদের ঋষিগণ "হরিৎ" নাম দিয়াছিলেন; আমরা প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, যে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে সেই নামটি লইয়া গ্রীকগণ Charites (The three Graces) সম্বন্ধে সুন্দর গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং অগ্নির অশ্ব "অরুষের" নামটি লইয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমের দেবতাকে Eros (Cupid) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইরাণীয়গণও সূর্য্যের ধাবমান কিরণ দেখিয়া সূর্য্যকে অশ্ববান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"অন্ধকার ও অন্ধকার জাত দেবগণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, যাতু ও পৈরিকদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, অদৃষ্টভাবে আগন্তুক মৃত্যুকে প্রতিরোধ করিবার জন্য যে মনুষ্য অমর দীপ্তিমান্ শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত সূর্য্যকে যজ্ঞ প্রদান করে সে অহুরো মজ্দাকেই যজ্ঞ প্রদান করে।"

জেন্দ অবস্তা। খোরশেদ যাস্ত।

সূর্য্য সম্বন্ধে আমরা ঋগ্বেদ হইতে একটি সুন্দর স্তুতি এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি; প্রকৃতির শোভা দর্শনে প্রাচীন ঋষিদিগের হৃদয় কতদূর ভক্তিরসে আলোড়িত হইত, এই স্তুতি পাঠে আমরা অবগত হইব।

"সূর্য্য দীপ্তিমান্ ও সকল প্রাণীদিগকে জানেন, তাঁহার অশ্বগণ তাঁহাকে সমস্ত জগতের দর্শনের জন্য উৰ্দ্ধে বহন করিতেছে।

"সমস্ত জগতের প্রকাশক সূর্য্যের আগমনে নক্ষত্রগণ তস্করের ন্যায় রাত্রির সহিত চলিয়া যায়।

"দীপ্তিমান অগ্নির ন্যায় সূর্য্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে এক এক করিয়া দেখিতেছে।

"হে সূর্য্য! তুমি মহৎ পথ ভ্রমণ কর, তুমি সকল প্রাণীদিগের দর্শনীয়, তুমি জ্যোতির কারণ, তুমি সমস্ত দীপ্তিমান অন্তরীক্ষে প্রভা বিকাশ করিতেছ।

"তুমি দেবলোকগণের সম্মুখে উদয় হও, মনুষ্যদিগের সম্মুখে উদয় হও, তুমি সমস্ত স্বর্গ লোকের দৃষ্টির জন্য উদয় হও।

"হে শোধণকারী অনিষ্ট নিবারক সূর্য্য! তুমি যে আলোক দ্বারা প্রাণীগণের পোষণকারী রূপে জগৎকে দৃষ্টি কর, "সেই আলোক দ্বারা রাত্রির

সহিত দিবাকে উৎপাদন করিয়া এবং প্রাণীদিগকে অবলোকন করিয়া তুমি বিস্তীর্ণ দিব্য লোকে ভ্রমণ কর।

"হে দীপ্তিমান্ সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য! হরিৎ নামক সপ্ত অশ্ব রথে তোমাকে বহন করে, জ্যোতিই তোমার কেশ।

"সূর্য্য রথবাহক সাতটি অশ্বীকে যোজিত করিলেন সেই স্বয়ংযুক্ত অশ্বীদিগের দ্বারা তিনি গমন করিতেছেন।

"অন্ধকারের উপর উত্থিত জ্যোতি দৃষ্টি করিয়া আমরা দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান্ দেব সূর্য্যের নিকট গমন করি। তিনিই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ।"

১ মণ্ডল, ৫০ সূক্ত, ১ হইতে ১০ ঋক্।

সবিতা সম্বন্ধে আমরা আর একটি ঋক্ মাত্র এস্থানে উদ্ধৃত করিব; সেটি জগদ্বিখ্যাত গায়ত্রী। গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম এবং এই ছন্দে ঋগ্বেদের অনেক স্তুতি রচিত হইয়াছে, কিন্তু যে পবিত্র ঋক্‌টি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি, সেটি ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যহ উচ্চার্য্য এবং সেইটিকেই এক্ষণে সাধারণত "গায়ত্রী" বলিয়া লোকে জানে। সেটি এই।

"তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

৩ মণ্ডল, ৬২ সূক্ত, ১০ ঋক্।

ইহার অর্থ,

"যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন আমরা সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করি।"

আদিত্যদিগের কথা এই স্থানে শেষ করিলাম। ভবিষ্যতে অন্যান্য আলোক—দেবদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

(ক্রমশ।)

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

মৈত্রী।

(৪)

শেষ কথা।

হিন্দুর আতিথেয়তা সর্ব্বলোক পসিদ্ধ। হিন্দুর ন্যায় আতিথেয় বুঝি জগতে আর কেহ নাই। হিন্দুর মতে অতিথি সৎকার অতি উচ্চ অতি পবিত্র অবশ্য পালনীয় ধর্ম্ম। হিন্দুর গৃহে যখনি অতিথি আসিবেন তখনি তিনি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবেন। যে গৃহস্থ উপস্থিত অতিথিকে ভোজন না করাইয়া আপনি ভোজন করেন তাঁহার বড়ই অধোগতি হইয়া থাকে।

সুবাসিনীঃ কুমারাংশ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদ বিচারয়ন্॥
অদত্ত্বা তু য এতেভ্যঃ পূর্ব্বং ভুঙ্ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
স ভুঞ্জনো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ॥

মনু, ৩অ— ১১৪ ও ১১৫।

কিন্তু নব পরিণীতা বধূ, দুহিতা, বালক রোগী ও গর্ভবতী ইহাদের বিষয় কিছু বিচার না করিয়া অতিথি ভোজনের পূর্ব্বেই ইহাদিগকে ভোজন করাইবে। যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অতিথি হইতে দাস পর্য্যন্ত লোকদিগকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে আপনি ভোজন করে সে জানেনা যে মরিলে তাহার দেহ শকুনি ও কুক্কুরেরা ভোজন করিবে।

এই অতিথিসেবারূপ ধর্ম্মচর্য্যা বোধ হয় প্রাচীন ভারতে বড়ই প্রবল এবং প্রীতিকর ছিল। গৃহস্থের ত কথাই নাই, তাঁহারা অতিথি পাইলে যেন চরিতার্থ হইতেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণে যেন বৈকুণ্ঠের পবিত্র আনন্দ উথলিয়া উঠিত। গৃহস্থ, গৃহিণী, পুত্র, পুত্রবধূ, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, পিতামহী, বালক, বালিকা, দাস, দাসী সকলেই সেই অতিথিকে লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন; গৃহস্থের গৃহ যেন বৈকুণ্ঠপতির আনন্দোৎফুল্ল বৈকুণ্ঠধাম হইয়া উঠিত। কিন্তু যাঁহারা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরপদে আত্মসমর্পণ করিয়া বনেবাস করিতেন তাঁহারাও মহা আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে অতিথি সেবা করিয়া আপ-

মাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আতিথ্য, ভরদ্বাজের আতিথ্য, কণ্বের আতিথ্য, আরো কত মহামুনির আতিথ্যের কথা সংস্কৃত কাব্যে ও পুরাণে দেখিতে পাই। হিন্দুর সে সব দিন গিয়াছে। হিন্দুর হিন্দুত্ব আর নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এত যে অধম, এত যে অধঃপতিত, এত যে ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দু তাহারও যে অতিথিসেবা দেখিয়াছি তাহা আজকাল আর দেখিতে পাই না। আমারা শৈশবে পল্লীগ্রামস্থ গৃহস্থ হিন্দুর ঘরে অতিথিসেবায় যে উৎসাহ, উল্লাস ও উন্মত্ততা দেখিয়াছি, এখন আর তাহা দেখিতে পাই না। যাঁহাদের অতিথি সেবা দেখিয়াছিলাম তাঁহারা অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধরেরা এখন ইংরাজি শিখিয়া সভ্যও উন্নত হইয়াছেন। তাঁহারা আপন আপন সেবা শুশ্রূষা লইয়াই উন্মত্ত! এই যে আতিথেয়তার কথা বলিতেছি ইহা প্রেম বা মৈত্রীর ফল। আপন পর নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যের প্রতি সদ্ভাব বা মৈত্রী না থাকিলে অতিথি সেবায় লোকের এত আনন্দ, উৎসাহ এবং আগ্রহ হয় না। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু সকল মনুষ্যকে ভালবাসিতেন বলিয়া অতিথির প্রতি তাঁহার এত স্নেহ, যত্ন ও শ্রদ্ধা, অতিথিসেবায় তাঁহার এত আগ্রহ ও উন্মত্ততা, অতিথিপূজা এবং দেবতাপূজা তাঁহার কাছে এতই তুল্যমূল্য। আর হিন্দুধর্ম্মচ্যুত নব্য হিন্দু, মুখে যাহাই বলুন, প্রকৃত পক্ষে আপন পর নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যের প্রতি মৈত্রী বা সদ্ভাব বিশিষ্ট নন বলিয়া, আজিকার উন্নতির দিনে হিন্দুসমাজে অতিথির প্রতি এত বিরাগ, এবং হিন্দুর গৃহে অতিথির এত অভাব। হিন্দুশাস্ত্রকারের সোহংবাদ মূলক মৈত্রীবাদ ভুলিয়া হিন্দুর জীবন পশুবৎ হইয়া পড়িতেছে। হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীবাদ শুধু শাস্ত্রের কথা নয়। হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীবাদ হিন্দুর জীবন এবং সমাজ নিয়ামক মহামন্ত্র। হিন্দুজাতির এই অধঃপতনের দিনে আমারা শৈশবে ও বাল্যকালে অনেক হিন্দুর গৃহে একটি অন্নদান প্রথা দেখিয়াছিলাম। সে প্রথা পারিবারিক প্রণালীর ফল নয়। অনেক হিন্দুর গৃহে এমন অনেক লোক প্রতিপালিত হইত যাহারা গৃহস্থের জ্ঞাতি কি কুটুম্ব কিছুই নয়, দরিদ্র বলিয়া প্রতিপালিত, গৃহস্থের সহিত কোন সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, হয় ত গৃহস্থ যে জাতীয় সে জাতীয়ই নয়। তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে গৃহকর্ত্তার বড়ই আনন্দ, বড়ই উৎসাহ, বড়ই আগ্রহ। তাহাদিগকে খাওয়াইতে পরাইতে যদি ফকির হইতে হয়, সপরিবারে পথের

ভিখারি হইতে হয়, গৃহকর্ত্তা এবং গৃহিণী তাহাতেও স্বীকৃত। তাহারা পর বটে, কিন্তু গৃহকর্ত্তা এবং গৃহিণীর কাছে তাহারা আপনার হইতেও আপনার। গৃহকর্ত্তার এবং গৃহিণীর আপনার-পুত্র কন্যা যেমন খাইবে পরিবে তাহারাও তেমনি খাইবে পরিবে। যদি ইতর বিশেষ করিতেই হয় তবে আপনাদের পুত্র কন্যা বরং খারাপ খাইবে তবু তাহারা খারাপ খাইবে না। তাহাদিগকে পুত্র কন্যা অপেক্ষাও প্রিয়বৎ প্রতিপালন করিতে গৃহকর্ত্তার শক্তি যদি কমিয়া যায়, সাবিত্রীসমা সহধর্ম্মিণী পরের জন্য স্বামীর ন্যায় সমান কাতর হইয়া প্রফুল্লচিত্তে এবং আগ্রহ সহকারে আপন অঙ্গ হইতে এক এক খানি করিয়া সমস্ত অলঙ্কার মোচন করিয়া স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিবেন *। আপন পর নির্ব্বিশেষে মনুষ্যের প্রতি কত প্রেম হইলে তবে মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের এমন ব্যবহার হইতে পারে! কিন্তু হিন্দু জাতির এবং হিন্দু ধর্ম্মের এই অধোগতির দিনেও হিন্দু সমাজে মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের এরূপ ব্যবহার যেরূপ বহুল পরিমাণে দেখিয়াছি তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয় প্রাচীন ভারতে যখন হিন্দু জাতির এবং হিন্দু ধর্ম্মের অধোগতি হয় নাই তখন হিন্দু সমাজে মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ব্যবহারে প্রীতি বা মৈত্রী প্রকৃত পক্ষে অপরিমেয় ও অপরিসীম ছিল। সেই জন্যই বলি যে হিন্দু শাস্ত্রকারের মৈত্রী শুধু মুখের কথা নয়, হিন্দুর সংসারক্ষেত্রে একটি অতি প্রবল কার্য্যকরী শক্তি।

বাস্তবিক হিন্দুর পরহিতেচ্ছা এবং পরের প্রতি মৈত্রী বা সদ্ভাব এমনি প্রবল যে কিছুতেই তাহার বাধাবিঘ্ন ঘটাইতে অথবা তাহার বেগের বা পরিমাণের হ্রাস করিতে পারে না। হিন্দুর কাছে দরিদ্র ভিক্ষুক যে প্রকার ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাতে এই কথার অতি প্রচুর এবং পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু হিন্দুর কাছে কি হিন্দু ভিখারি

---

* যে পতিপত্নীর জীবন প্রবাহ এইরূপে একটি পবিত্র ধারায় প্রবাহিত হয় তাহাদের বিবাহ বা মিলনকেই আধ্যাত্মিক বিবাহ বলে। এরূপ পতিপত্নী এখন আর এদেশে বড় নাই. কিন্তু বাল্যকালে বুড়োদের মধ্যে অনেক দেখিয়াছি। অতএব নিশ্চয় বলিতে পারি, যে, প্রাচীন ভারতে যখন হিন্দুর অধঃপতন হয় নাই তখন এরূপ এবং ইহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট পতিপত্নী বিস্তর ছিল। হিন্দু বিবাহকে আধ্যাত্মিক মিলন বলিলে যে সকল কৃতবিদ্য বাঙ্গালি উপহাস করিয়া থাকেন তাঁহারা কেমন করিয়া সমাজ দেখেন ও শাস্ত্র বুঝেন বলিতে পারি না।

কি মুসলমান ফকির কি বিলাতি বেগর (Beggar) সকলেই সমান। হিন্দুর কাছে হিন্দু ভিখারির যে ভিক্ষামুষ্টি, মুসলমান ফকিরেরও সেই ভিক্ষামুষ্টি, বিলাতি বেগরেরও সেই ভিক্ষামুষ্টি। হিন্দু অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শাক্ত শৈব, বৈষ্ণব, ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দুর কাছে শাক্ত ভিখারিরও যে আদর, শৈব ভিখারির ও সেই আদর, বৈষ্ণব ভিখারিরও সেই আদর। সকল দেশে এমন হয় না। ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশের কথা বলি শুন। বৃদ্ধ ভিখারি অদি অচিলট্রী আর্ল অব গ্লেনালন নামক রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ধনাঢ্যের প্রাসাদে গমন করিয়া দেখিল প্রাসাদের সম্মুখে তিন দল ভিক্ষুক দাঁড়াইয়া আছে। পরিচ্ছদ দৃষ্টে বোধ হইল যে প্রথম ভিক্ষুক দল রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। সেই দলে প্রবেশ করিলে পর তাহারা তাহাকে Triple man (তিন গুণ ভিক্ষা পাইবার যোগ্য) নয় বলিয়া মহা আস্ফালন করিয়া তাড়াইয়া দিল। অদি অচিলট্রী তখন দ্বিতীয় দলে গমন করিল। তাহারা Episcopal সম্প্রদায়ের ভিখারি, to whom the noble donor allotted a double portion of his charity, তাহাদের জন্য দাতা দুই গুণ ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহারাও তাহাকে তাড়াইয়া দিল। তখন অদি ক্ষুদ্র তৃতীয় দলে প্রবেশ করিল। তাহারা Presbyterian সম্প্রদায়ের ভিখারি who had disdained to disguise their religious opinions for the sake of an augmented dole, তাহারা বেশি ভিক্ষার লোভে আপন আপন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত গোপন করে নাই। তাহার পর ভিক্ষাদান আরম্ভ হইল। প্রথম ভিক্ষুকদল দাতার আপনার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতএব একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাহাদের ভিক্ষাদান কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিল। দ্বিতীয় ভিক্ষুকদল রাজার সম্প্রদায়ভুক্ত। দাতার দ্বার রক্ষক তাহাদের ভিক্ষাদান তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিল। তৃতীয় দল দাতার সম্প্রদায়ভুক্তও নয়, রাজার সম্প্রদায়ভুক্তও নয়। অতএব একজন সামান্য বৃদ্ধ ভৃত্য সেই দলের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিল *। হিন্দু ভিক্ষুকের মধ্যে এমন ইতরবিশেষ করিতে পারেন না। তাঁহার কাছে সকল ভিক্ষুক সমান। সাম্প্রদায়িকতা লইয়া মানুষ নয় ব্রহ্মপদার্থ লইয়া মানুষ। ভিক্ষুক হিন্দুই হউক, মুসলমানই হউক, খৃষ্টা-

---

* সর ওয়াল্টর স্কটের Antiquary নামক উপন্যাসের সপ্তবিংশতি অধ্যায় দেখ।

নই হউক, শৈবই হউক, বৈষ্ণবই হউক, সকল ভিক্ষুকই ব্রহ্মপদার্থে নির্ম্মিত, অতএব সকল ভিক্ষুকই সমান। আবার ভিক্ষুক দুঃখী। জাতি বা সম্প্রদায়ভেদে দুঃখের প্রকৃতিভেদ হয় না। অতএব কি হিন্দু ভিক্ষুক, কি মুসলমান ভিক্ষুক, কি ইংরাজ ভিক্ষুক, কি খৃষ্টান ভিক্ষুক, কি শাক্ত ভিক্ষুক, কি বৈষ্ণব ভিক্ষুক সকল ভিক্ষুকই সমান। তাই সকল ভিক্ষুক হিন্দুর সমান দয়ার পাত্র। মৈত্রীবাদে ভেদাভেদের কথা নাই। তাই মৈত্রীবাদাবলম্বী হিন্দু সকল ভেদাভেদ তুচ্ছ করিয়া সকল দরিদ্রকে সমান দয়া করেন। আজিও সুসভ্য ইংরাজ সকল দরিদ্রকে সমান দয়া করিতে পারেন না। ভারতবাসীকে একথার প্রমাণ দিতে হইবে না। তাই বলি যে হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীবাদের গুণে হিন্দুর জীবন পৃথিবীর অপর সকলের জীবন অপেক্ষা অশেষ গুণে উন্নত পবিত্র ও প্রেমময় হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীবাদ শুধু মুখের কথা নয়।

আবার হিন্দুর মৈত্রী শুধু মনুষ্যমধ্যে সম্বদ্ধ নয়, সমস্ত প্রাণীতে প্রসারিত। হিন্দুশাস্ত্রকারের ব্যবস্থানুসারে প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞ করিতে হয়। তন্মধ্যে একটি যজ্ঞের নাম ভূতযজ্ঞ বা বলিকর্ম্ম।

স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৃনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা॥

মনু, ৩অ—৮১।

অধ্যয়ন দ্বারা ঋষিদিগকে, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণকে, অন্ন দ্বারা মনুষ্যদিগকে এবং বলিকর্ম্মদ্বারা ভূতদিগকে যথাবিধি পূজা করিবেন।

অর্থাৎ গৃহস্থকে প্রতিদিন প্রাণীদিগকে আহার দিতে হয়। সকল প্রাণীকেই আহার দিতে হয়।

শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিনাং।
বায়সানাং কৃমীনাঞ্চ শনকৈর্নির্বপেদ্ভুবি॥ মনু, ৩অ—৯।

তৎপরে অপর অন্ন পাত্রে লইয়া কুকুর, কুকুরোপজীবি, পাপারোগী, কাক ও কৃমিদিগকে প্রদান করিবে।

যে প্রতিদিন সকল প্রাণীকে আহার দেয় তাহার গতিও বড় উত্তম হয়।

এবং যঃ সর্ব্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্যমর্চ্চতি।
স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তি পথার্জুনা॥

মনু, ৩অ—৯৩।

যিনি প্রত্যহ এইরূপে সকল প্রাণীকে বলি প্রদান করেন তিনি জ্যোতির্ম্ময় পথদ্বারা ব্রহ্মধামে গমন করেন।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্নের অনুবাদ।

হিন্দুর এই অধঃপতনের দিনে কেহ যে প্রতিদিন শাস্ত্রোল্লিখিত পঞ্চযজ্ঞ করেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু এখনও যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিবেচনা করিলে নিশ্চয় বোধ হয়, যে, এক সময়ে ভারতের হিন্দু মহা আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে প্রতি দিন পৃথিবীর সকল প্রকার জীবকে ক্ষুধায় অন্নদান করিতেন। আজিও প্রায় সকল হিন্দুমতাবলম্বী হিন্দু প্রতি দিন আহারান্তে এক মুষ্টি করিয়া অন্ন বাটীর বাহিরে পশুপক্ষীদিগকে ফেলিয়া দিয়া থাকেন। ভোজনপাত্রে শেষান্ন রাখিবার প্রথারও সেই অর্থ পশুপক্ষী পিপীলিকা প্রভৃতি তাহা খাইয়া ক্ষুধার শান্তি করিবে। জগতের মধ্যে সর্ব্বজীবে দয়া সর্ব্বজীবের দুঃখে দুঃখ সর্ব্বজীবের সুখে সুখ হিন্দুর যেমন দেখিয়াছি আর কাহারও তেমন দেখি নাই। সমস্ত প্রাণীতে হিন্দুর মৈত্রী। তাই ভারতে মানুষ শুধু মানুষ লইয়া সম্পূর্ণও পরিতৃপ্ত নয়। নিকৃষ্ট প্রাণী সকল মানুষের সহিত অতি ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ। সে সকল প্রাণী মানুষের অংশ স্বরূপ। মানুষ তাহাদিগকে লইয়া সম্পূর্ণ, তাহাদিগকে ছাড়িলে অসম্পূর্ণ। তাই ভারতের হিন্দুর কাছে নিকৃষ্ট প্রাণীর এত আদর ও সম্মান। তাই নিকৃষ্ট প্রাণী ভারতের হিন্দুর সমাজের ও পরিবারের অন্তর্গত। তাই হিন্দুর সাহিত্যে মানুষ এবং নিকৃষ্ট প্রাণী একত্র জীবনলীলা অভিনয় করে এবং নিকৃষ্ট প্রাণী ব্যতিরেকে হিন্দুর ক্রিয়া কলাপ হয় না। ভারতের হিন্দুর কাছে নিকৃষ্ট প্রাণীর সম্মান ও আদর দেখিয়াই সুবিখ্যাত জীববৎসল ফরাসি পণ্ডিত মিশালা (Michelet) বলিয়াছেন :—'Beneath human castes there lies an immense caste, the poor brute world, to be delivered, to be lifted up. This is the triumph of India, of Rama and the Ramayana. Hanuman is the Ulysses and Achilles of this epic war. More than any one else he delivers Sita After the victory, Rama crowns and celebrates him. Between the two armies, before men and gods, *Rama and Hanuman embrace.* Talk no more of castes. The lowest of men may say, Hanuman has freed me." *

তাই বলি যে হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীবাদ শুধু মুখের কথা বা শাস্ত্রের লিপি নয়।

---

* জন্সন সাহেবের Oriental Religions নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৩৫ পৃষ্ঠা।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীর অর্থ কেবল প্রাণীর প্রতি প্রেম নয়, গাছ পালা লতা পাতা ফুল ফল সরিৎ সরোবর পাহাড় পর্ব্বত জগতে যাহা কিছু আছে, সকলেরই প্রতি প্রেম। হিন্দুর সাহিত্যে সেই অপূর্ব্ব প্রেমের অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। অযোধ্যাবাসীরা রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করিতে না পারিয়া শোকোচ্ছলিত অন্তঃকরণে বলিতেছে ;—

আপগা কৃতপুণ্যাস্তাঃ পদ্মিন্যশ্চ বনে শুভাঃ।
যাসু পাস্যতি কাকুৎস্থো বিগাহ্য সলিলং শুচি॥
বিচিত্র কুসুমাপীড়া মঞ্জরী মধুধারিণঃ।
পাদপাঃ পর্ব্বতাগ্রস্থা রময়িষ্যন্তি রাঘবং॥
অকালে হ্যপি মুখ্যানি মূলানি চ ফলানি চ।
দর্শয়িষ্যন্তি সানুনি গিরীণাং রামমাগতং॥
কাননং বাপিশৈলং বা যং রামোঽভি গমিষ্যতি।
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যতি নার্চ্চিতুং॥

অযোধ্যা কাণ্ড, ৪৫ সর্গ।

অরণ্য মধ্যে বিকশিত পঙ্কজ সমূহে সুশোভিত সেই সকল জলাশয় কতই বা পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে, যাহাতে শ্রীরামচন্দ্র অবগাহন করিয়া তাহাদিগের সুশীতল জলপান করিবেন। কানন বিভাগে পর্ব্বতের শিখরস্থিত পাদপেরাই সুজাত ও কৃতপুণ্য, যেহেতু তাহারা বিচিত্র কুসুম সমূহে সুশোভিত হইয়াও মঞ্জরি হস্তে মধুধারণ পূর্ব্বক রঘুনাথের মনোরঞ্জন করিবে। এক্ষণে পর্ব্বতসানু সকল শ্রীরামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া তাহারা অকালেও সুস্বাদু সমুচিত ফল ও মূল দর্শন করাইবেক। কাননেই হউক আর পর্ব্বতেই হউক, শ্রীরামচন্দ্র যেখানে গমন করিবেন সমাগত প্রিয়তম অতিথিজ্ঞানে কি তাহারা সমাদরে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে শক্ত হইবে না? অবশ্যই হইবে।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননের অনুবাদ।

পর্ব্বত সরোবর বৃক্ষ লতা ফুল ফল—ইহারা মানুষের ন্যায় চৈতন্য বিশিষ্ট। মানুষের ন্যায় ইহাদের সুখ দুঃখ আছে। মানুষের ন্যায় ইহাদের পাপ পুণ্য আছে। মানুষের ন্যায় ইহাদের প্রীতি প্রণয় আছে। মানুষের ন্যায় ইহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আছে। মানুষের ন্যায় ইহাদের ঘরকন্না আছে। মানুষের ন্যায় ইহাদের আতিথেয়তা প্রভৃতি গৃহধর্ম্ম আছে।

ইহাদের এক একটি পৃথিবীতে মানুষের ন্যায় এক এক জন। মানুষের সুখ-সম্ভোগের বস্তু বলিয়া এক এক জন নয়; আপনারা সুখ সম্ভোগের-অধিকারী বলিয়া এক এক জন। মানুষ যেমন ইহাদিগকে লইয়া সংসার-ধর্ম্ম করে, ইহারাও তেমনি মানুষকে লইয়া সংসারধর্ম্ম করে। মানুষের জীবন যেমন ইহাদের জীবনের অন্তর্গত, ইহাদের জীবনও তেমনি মানুষের জীবনের অন্তর্গত। ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তজীবনে মানুষ এবং ইহারা সকলেই এক আকারে একভাবে এক তানে এক লয়ে মিশিয়া রহিয়াছে। তাই কাননে ফুল ফুটিলে মনুষ্যহৃদয়ে প্রেম ফুটিয়া উঠে, স্রোতস্বতীতে স্রোত বহিলে মনুষ্যহৃদয়ে ভক্তিস্রোত উথলিয়া উঠে, মধ্যরাত্রে চাঁদ ডুবিলে মনুষ্যহৃদয় কাঁদিয়া উঠে। হিন্দুর সাহিত্যে যে রকম পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষ লতা ফুল ফল জল স্থল দেখিতে পাই আর কোন সাহিত্যে সে রকম দেখিতে পাই না। অন্য সাহিত্যে বৃক্ষলতা পাহাড় পর্ব্বত ফুল ফল সরিৎ সরোবর আছে, কিন্তু হিন্দুর সাহিত্যে যে পরিমাণে আছে তাহার এক শতাংশ পরিমাণেও নাই। আর যা দুই চারিটা আছে তাহা মানুষের ভোগ সুখের উপকরণ বলিয়া আছে, মানুষের ন্যায় স্বয়ং ভোগসুখের অধিকারী বলিয়া নাই। হিন্দুর সাহিত্যে মানুষ যে অসীম প্রাণ সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে, ফুল ফল পাহাড় পর্ব্বত সরিৎ সরোবরও সেই অসীম প্রাণ সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। অন্য সাহিত্যে সমুদ্রে প্রাণ নাই। প্রাণ বলিয়া একটা ছোটখাট মাপাজোঁকা ঘেরাঘোরা জিনিস আছে। তাহা মানুষের একচেটিয়া. ফুল ফল বৃক্ষলতা সরিৎ সরোবর পাহাড় পর্ব্বতের সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই *। হিন্দু সাহিত্য এবং অপর সাহিত্যের মধ্যে জড়জগৎ লইয়া এই যে আশ্চর্য্য প্রভেদ দেখিতে পাই. ইহা হিন্দুর সোহংবাদ মূলক মৈত্রীবাদের ফল। ব্রহ্মভক্ত-হিন্দু সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মপদার্থ নির্ম্মিত জানিয়া জগতে যাহা কিছু আছে সকলকেই সমান জ্ঞান করেন এবং সমান ভালবাসেন। তাই হিন্দুর প্রেম বা মৈত্রী মনুষ্য মধ্যে আবদ্ধ নয়. জীবমাত্রেই প্রসারিত। কিন্তু জীবে প্রসারিত বলিয়া জীব মধ্যে আবদ্ধ নয়। জীব-জগৎকে অতিক্রম করিয়া বৃক্ষ লতা ফুল ফল সরিৎ সরোবর পাহাড়, পর্ব্বতপূর্ণ

---

* আজকাল রস্কিন প্রভৃতি দুই একজন ইউরোপীয়ের লেখায় কিঞ্চিৎ অন্যরূপ দেখিতেছি। কিন্তু হিন্দু সাহিত্যে যা দেখা যায় তাহার সহিত তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলেও হয়।

জড় জগতে প্রসারিত। এইজন্য হিন্দুর কাব্যে—বাল্মীকির রামায়ণে, ব্যাসের ভারতে, কালিদাসের কুমারে মেঘদূতে শকুন্তলায় রঘুবংশে ভবভূতীর চরিতে কিরাতার্জ্জুনীয়ে, ভাগবতে, পুরাণে—জড় জগতের সমাবেশ এত বেশি এবং মূর্ত্তি এত জীবন্ত জড়তাশূন্য, চৈতন্যময়, ভাবময়, মনোহর। হিন্দুর মৈত্রী হিন্দুর সাহিত্যকে অপর সাহিত্য হইতে এতই-ভিন্ন-প্রকৃতি বিশিষ্ট এতই উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আবার হিন্দুর সাহিত্য ছাড়িয়া তাঁহার সংসারধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রীবাদ তাঁহার জীবন ও চরিত্রকে কতদূর গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুজাতি বৃক্ষলতা ফলফুলের বড়ই অনুরাগী। সকল হিন্দুর বাড়ীতেই কতকগুলি করিয়া বৃক্ষলতা সযত্নে রক্ষিত হইতে দেখা যায়। ইউরোপীয়েরাও বৃক্ষলতার অনুরাগী এবং তাহাদের বাড়ীতেও বৃক্ষলতা সযত্নে রক্ষিত হয়। কিন্তু দুইজাতির বৃক্ষলতার প্রতি যত্ন ও অনুরাগের কারণ এক নয়। ইউরোপীয়েরা বৃক্ষলতার শোভার জন্য বৃক্ষলতার অনুরাগী; হিন্দু বৃক্ষলতা পালনীয় এবং স্নেহের পদার্থ বলিয়া বৃক্ষলতার অনুরাগী। বৃক্ষলতা জল না পাইলে শোভাহীন ও পুষ্পহীন হইয়া গৃহ প্রাঙ্গণের শোভা এবং গৃহস্থের সুখ বৃদ্ধি করিতে পারিবে না বলিয়া ইউরোপীয়েরা বৃক্ষলতার গোড়ায় জল দেয়। জল বিনা বৃক্ষলতা পাছে তৃষ্ণায় কাতর হয় এবং শুকাইয়া মরিয়া যায়, এই ভাবিয়া হিন্দুনরনারী বৃক্ষলতার মূলে জল দেয়। জড় জগতের সহিত ইউরোপীয়ের কেবল মাত্র বাহ্যেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক। জড়জগতের সহিত হিন্দুর আত্মার ও হৃদয়ের সম্পর্ক। জড়জগতের সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারের মৈত্রীবাদ হিন্দুকে অপর সকলের অপেক্ষা এতই শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রাচারী করিয়াছে। হিন্দুর মৈত্রী কেবল কথার কথা বা শাস্ত্রের বচন নয়।

অতএব মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্ব্বত, জল, স্থল জগতে যাহা কিছু আছে, হিন্দুর কাছে সকলই সমান, সকলই ভালবাসার পাত্র। এক ব্রহ্ম-পদার্থ এই সকলেতেই আছে, অতএব হিন্দুর মতে এসমস্তই এক ও অভিন্ন। হিন্দুর মতে মানুষ বল, পশু বল, পক্ষী বল, জল বল, স্থল বল, কেহই কেহ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, সকলেই সকলের সহিত মিশ্রিত, সকলে জড়াইয়া একটি জীবন। তাই জগতে যত কিছু আছে সকলের জীবনের সহিত হিন্দুর জীবন মিশ্রিত। তাই জগতে যত কিছু

আছে—পশু বল, পক্ষী বল, বৃক্ষ বল, জল বল, স্থল বল—সকলের সুখ দুঃখে হিন্দুর সুখ দুঃখ। হিন্দুর জীবনও জগদ্ব্যাপী হৃদয়ও জগদ্ব্যাপী। হিন্দুর মৈত্রী হিন্দুকে জগদ্ব্যাপী এবং জগৎরূপী করিয়াছে।

আজিকার অধঃপতিত হিন্দুর জীবনও কার্য্য পরীক্ষা করিয়াও বুঝিলাম, যে, হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রী শুধু মুখের কথা নয়, হিন্দুর জীবনও সমাজ নিয়ামক শক্তি। যখন হিন্দুর অধঃপতন হয় নাই, তখন সেই শক্তি হিন্দুর জীবন ও সমাজকে কত যে উজ্জ্বল উন্নত ও পবিত্র করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীন হিন্দুর সেই উন্নত উজ্জ্বল ও পবিত্র জীবন ও সমাজ স্মরণ করিয়া আমাদের মনে যদি কিছুমাত্র আনন্দ ও আত্মগৌরবের উদ্রেক হয়, তবে নতশিরে সেই প্রাচীন হিন্দুর মৈত্রীবাদ গ্রহণ করিয়া আমাদের জীবন ও সমাজকে সেইরূপ উন্নত উজ্জ্বল ও পবিত্র করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের পার্থিব অবস্থা বড়ই হীন হইয়াছে, আমাদের মনের অবস্থা তদপেক্ষাও হীন হইয়াছে। আমরা সভ্য ও শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, কিন্তু সভ্যও শিক্ষিতের কোন গুণ আমাদের নাই। জীবন যাহাতে উন্নত ও পবিত্র হয়, জগৎ যাহাতে সুখময় ও পবিত্র হয় সেই বিশ্বব্যাপী প্রেম আমাদের নাই। আমরা পরস্পরের সহিত সহানুভূতির কথা, বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের (Fraternityর) কথা বলিয়া থাকি বটে। কিন্তু আমরা হিন্দুই হই, ব্রাহ্মই হই, নাস্তিকই হই, প্রকৃত পক্ষে আমাদের পরের সহিত সহানুভূতি, বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বব্যাপী প্রেম কিছুই নাই। আমরা কেবল আমাদের সুখ সুখ্যাতি লইয়া আছি। যদি পরের জন্য কোন কাজ করি সেও হয় আপনার সুখ নয় সুখ্যাতির আশায় করি। পরের প্রতি প্রেম আমাদের একেবারেই নাই। আমরা কেহ কাহাকে দেখিতে পারি না, মুখে যাই বলি মনে মনে আমরা পরস্পরকে বড়ই হিংসা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করি। পরের ভাল হইলে আমাদের আনন্দ হয় না, মনে বড়ই কষ্ট হয়। আমরা বলিয়া থাকি, যে, আমরা পরস্পরের মিত্র। কিন্তু আমরা সকলেই মনে মনে জানি, যে, আমরা পরস্পরের শত্রু। লোকে আমাদিগকে শিক্ষিত সম্প্রদায় বলে। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ন্যায় বন্ধুরূপী শত্রুর সমষ্টি কোন কালে কোন দেশে হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। ইহা আমাদের বড়ই দুঃখের ও লজ্জার কথা। একথা বলিতেও কষ্ট হয় শুনিতেও কষ্ট হয়।

কিন্তু দুঃখ হউক কষ্ট হউক লজ্জা হউক যাই হউক, একথা বলিতেও হইবে শুনিতেও হইবে স্বীকার করিতেও হইবে। নহিলে আমাদের এই দুরবস্থা হইতে নিষ্কৃতি নাই। এ অবস্থায় থাকিয়া আমরা কিছুই করিতে পারিব না। আমরা ধর্ম্মসংস্কারের ও সমাজসংস্কারের চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু সমাজস্থ লোককে যাহারা প্রকৃত পক্ষে ভালবাসে না, প্রকৃত পক্ষে সম্মান করে না তাহারা কেমন করিয়া সমাজস্থ লোকের ধর্ম্মসংস্কার ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবে? আমার সমাজস্থ লোক যদি এমন না বুঝে, যে, আমি তাহাদিগকে যথার্থই ভালবাসি এবং তাহাদের ব্যথার ব্যথী তবে আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহাদের কণামাত্র উপকার ও উন্নতি সাধন করিতে পারিব না। কথার জোরে মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করা যায় না। হৃদয়ের ঢেউ ঢালিয়া না দিলে হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া লওয়া যায় না। হৃদয়ে হৃদয় না মিশিলেও কেহ কাহার উপকার বা উন্নতি সাধন করিতে পারে না। এই যে এত দিন ধরিয়া আমাদের মধ্যে কত লোকে দেশের লোককে সংস্কারের ও উন্নতির পথে আসিতে বলিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিয়া কেহ ত সে পথে আসিতেছে না। কেনই বা আসিবে? সে কথা জ্ঞানের কথা, রাগের কথা, রোকের কথা, তেজের কথা, অহঙ্কারের কথা, জোরের কথা, অলঙ্কার প্রিয়তার কথা, সুখ্যাতি প্রিয়তার কথা। কিন্তু সে কথা প্রকৃত প্রেমের কথা নয়—সে কথা বেশি নয়, দুই চারিটি মাত্র, নিঃশব্দে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়া অজ্ঞাতসারে অভাবনীয়রূপে কি জানি কতই মিঠে রকমে হৃদয়ের অন্তস্তলে গিয়া প্রবেশ করে, সে প্রথমে কথা ত নয়। তেমন কথা চৈতন্যদেবের পর বঙ্গে আর কেহ কয় নাই। তাই চৈতন্যদেবের পর আর কেহ বঙ্গবাসীকে ধর্ম্মের পথে কি সামাজিক জীবনের পথে বিশেষ 'আগাইয়া' দিতে পারে নাই। তাই বলি এই ঘৃণিত ও শোচনীয় অবস্থা হইতে না উঠিলে আমাদের নিস্তার নাই, আশা ভরসাও নাই। আমাদের হৃদয়ের দোষে এই অবস্থা হইয়াছে, অতএব আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার, পবিত্র ও প্রেমপূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের হৃদয় পরিষ্কার পবিত্র ও প্রেমপূর্ণ হইলে আমরা পৃথিবীর অসীম উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইব। আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকে আমাদিগকে ইংরাজের ন্যায় অসমসাহসিক বাণিজ্যপটু অসুরের ন্যায় শ্রমশীল ইত্যাদি হইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। কিন্তু হৃদয় বিশুদ্ধ এবং প্রেমপূর্ণ না করিয়া

পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে দক্ষতা লাভ করিতে গেলে মানুষ শঠ প্রতারক পীড়নশীল নিষ্ঠুর নির্ম্মম ইত্যাদি হইয়া উঠে। তাই মনে করি, যে, আগে আমাদের ইংরাজের গুণগুলি শিক্ষা করিলে আমাদের শোচনীয় অবস্থা আরো শোচনীয় হওয়াই সম্ভব। আমাদের ভাল হইতে হইলে, জগতে মান্য গণ্য কীর্ত্তিশালী হইতে হইলে আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই অপূর্ব্ব মৈত্রীগুণ শিক্ষা করিয়া জগতে যাহা কিছু আছে সকলের প্রতি প্রেমবান হইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা আমাদের সমবেত চেষ্টায় আমাদের আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে পারিব এবং সাহস অধ্যবসায় নির্ভীকতা প্রভৃতি যে সকল গুণ এখন ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বেশি লক্ষিত হয় তাহাও আমরা সহজেই লাভ করিতে পারিব এবং সেই সকল গুণের সাহায্যে যে সব বড় বড় কার্য্য করিব তাহা সর্ব্বলোক হিতকর হইবে কাহারো অহিতকর হইবে না। অপ্রেমিক ইউরোপবাসী আপন অসমসাহসিকতাগুণে উৎসাহিত হইয়া আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রলিয়ায় কি নিষ্ঠুরতার ও লোক-নিগ্রহের কার্য্যই না করিয়াছেন! তাই বলি, আগে সেই প্রাচীন হিন্দুর মৈত্রীবাদ গ্রহণ করিয়া জগতে যাহা কিছু আছে সকলের প্রতি প্রেমিক হইয়া বিশ্বনাথের রাজ্যে বিশুদ্ধ পদ লাভ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর

কুন্তী।

১

কতকাল দুর্দ্দশায় রাখিবি মায়েরে?
নানা চিন্তা ভাবনায়, হইতেছে জীর্ণ কায়;
না দেখে তোদের সুখ, বুঝি মুদি আঁখি।
অজ্ঞাত বাসের আর কত আছে বাকি?

২

সূচ্যগ্র মেদিনী শূন্য! তায় বনবাসী!
পুত্রদের এ বিষাদে, মা'র প্রাণ কত কাঁদে,
কেমন বুঝিবি তোরা,—কেমনে বুঝিবি
বুঝিলে সে পাপ খেলা কেন খেলাইবি

৩

ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই কাটাইলি কাল।
চিন্তা করি পরমার্থ, ভুলিলি সকল স্বার্থ!
শত্রুকেও মিত্র বলি আদর করিলি!
রাজপুত্র হয়ে রাজনীতি না বুঝিলি!

৪

জানিরে সংসারে ধর্ম্ম বড়ই মধুর।
কিন্তু পেয়ে কোন্ যুক্তি, ধর্ম্মের পবিত্র মূর্ত্তি—
ধরিস্ লোভীর কাছে? বীরপুত্র যাঁরা—
লোভীর মস্তকে দণ্ড প্রহারিবে তাঁরা।

৫

অন্য দোষ দূরে থাক্! কত বা কহিব,—
লক্ষ্মী বধূ মাকে মোর, দিল যেই লজ্জা ঘোর,—
সভা মাঝে! তাও তোরা সহিয়া রহিলি!
সে দৃশ্যও—মূর্খ তোরা ধর্ম্মে দেখাইলি!

৬

হইয়া তোদের পক্ষ, একটিও কথা
কেহ বলিল না হায়! ভীষ্ম, দ্রোণ মৃত প্রায়,—
নীরবে দেখিল তাহা! তাঁদের দ্বারায়—
নিশ্চয় জানিবি—কোন হবে না উপায়।

৭

তোদের ভিখারি করি কৌরব চতুর,
লুটে লয় রাজ্য ধন! অবশেষে দেয় বন!
তথাপি খেলার অর্থ কিছু না বুঝিলি!
কেবল আমার বুকে কলঙ্ক ঢালিলি!

৮

কুন্তীর কুপুত্র তোরা!—কেনা ইহা কয়?
খেদে বুক ফেটে যায়! এত দুখ দিবি হায়!
তাই কি তোদের গর্ভে করিয়া ধারণ
সহিলাম প্রসবের যন্ত্রণা—ভীষণ!

৯

গর্ভধারিণীকে দিলে অনন্ত যাতনা,
কিরূপেতে ধর্ম্ম থাকে? হায় ইহা কব কাকে!
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি তোরা নরকে ডুবিলি!
স্বর্গের পবিত্র দ্বার চক্ষে না দেখিলি!

১০

কতবার দেখাইয়া কত প্রলোভন,
তোদের অনিষ্ট যাহা তোদের হস্তেই তাহা,
করায়েছে,—ধূর্ত্তরাজ কুটিল কৌরব!
হায় রে এমন তোরা অবোধ পাণ্ডব!

১১

রে পুত্র! রে পার্থ! বীর চূড়ামণি!
বল্ বীর পুত্র হেন, প্রসব করিনু কেন?
অন্তিমে মরিব যদি পেয়ে এত দুখ!
কি সুখ লভিনু বাছা, দেখে তোর মুখ?

১২

অস্ত্রশিক্ষা করিয়া বা কি লভিলি ফল?
গাণ্ডীব টঙ্কারে যার, স্তব্ধ হয় ত্রিসংসার!
মাতা তার পরাধীনা! বনে তার স্থান!
এ লজ্জায়, ইচ্ছা হয় বিষ করি পান!

১৩

জিনিয়া কিরাত রূপী—মৃত্যুঞ্জয় শিবে,
পাশুপত—কালান্তক, লভিলি কি অনর্থক?
ভুবন বিজয়ী হয়ে, এই কি করিলি,—
পরম শত্রুর পদে শির নোয়াইলি?

১৪

রে পুত্র! রে ভীম! কেন ধরিস্ রে গদা?
প্রতিজ্ঞা পালিলি কই? কৌরব যে হাসে অই!
বীর-পুত্র বীর হয়ে, প্রতিজ্ঞা সাধন
কেননা করিলি তুই, থাকিতে জীবন?

১৫

মহা ধূর্ত্ত কৌরবের শাস্তি দিলি কই ?
কই করি রণরঙ্গ, করিলি সে উরু ভঙ্গ ?
বক্ষঃ চিরি, কই করি সদ্য রক্ত পান,
যুড়াইলি অভাগীর তাপিত পরাণ ?

১৬

হা পুত্র ! হা যুধিষ্ঠির ! কি বলিব তোরে ?
মোর সুখে দিলি ছাই, ইন্দ্র, যম তুল্য ভাই
থাকিতে সংসারে তোর ! জানিস্ নিশ্চয়,
এ পাপে হইবে তোর সর্ব্ব ধর্ম্ম ক্ষয় !

মহামায়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বালিকার প্রেম।

বৃদ্ধ অমূল্যরতনের সহিত ক্ষণেক কথাবার্ত্তা কহিয়াই নিতান্ত প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে তাঁহার আশ্রমে পর দিবস আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

অমূল্যরতন বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া, ধীরে ধীরে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নিশীথ রাত্রি ; তখনও অমূল্যের চক্ষে নিদ্রা নাই। কত কি ভাবিতেছেন ; দর্শন বেদান্তের কথা মনে আসিতেছে ; কখন বা তপস্যা করিতেছেন ; কখন বা যোগ শিক্ষা করিতেছেন ; আরও কত কি ভাবিতেছেন ; হঠাৎ প্রভাবতীর সরলতা মাখা বদন কমল মানসপটে সমুদিত হইল। তাঁহার বিশাল নয়ন প্রান্তে বারিবিন্দু দেখা দিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন "প্রভা বালিকা, প্রভার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, প্রভাবতী অপরকে বিবাহ করিয়া সুখিনী হইতে পারে, কিন্তু আমার আর কোথাও সুখ নাই।"

অমূল্যরতন এইরূপ নানা চিন্তায় অভিভূত, এমত সময় তাঁহার শয়ন কক্ষ পার্শ্বস্থ রাজপথে কে গগনস্পর্শী গলায় কোমল স্বরে গাহিল—

কেন প্রেমে এত বিড়ম্বনা।
যে যাহারে চায়, কেন তাহারে পায় না।
জানে নাহি পাবে তারে,
তবু তারি পূজা করে,
কেনরে প্রণয়ী মন, সহে এত যাতনা?
আঁখি মুদে তারে হেরি,
মনে মনে পূজা করি,
প্রেম সুখ মনে স্মরি, করে তারি আরাধনা।

অমূল্যরতন ত্রস্তভাবে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; গীতটি তাঁহার রমণীকণ্ঠ বিনির্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি বাতায়ন পথ হইতে গায়িকার অনুসন্ধানে ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, কিন্তু তিনি রাজপথে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। গায়িকা আবার হয় ত গাহিবে ভাবিয়া অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, কিন্তু সে শ্রুতি-মধুর কণ্ঠ ধ্বনি আর তাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিল না। শয়ন করিলেন, ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল।

অতি প্রত্যূষে, সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বে অমূল্যরতনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া বাতায়নের নিকট গেলেন, আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই প্রভাত হইয়াছে। অমূল্যের মহা আনন্দ হইল, এমন সময়ে সেই গৃহ দ্বারে প্রভাবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমূল্যরতন প্রথমত প্রভাকে দেখিতে পাইলেন না, প্রভা তাঁহার নিকটে আসিলেন। অমূল্যরতন যেন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন "প্রভা।"

প্রভা। হ্যাঁ।

অমূল্য। এত সকাল?

প্রভা। রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নি।

অমূল্য। কেন প্রভা?

প্রভাবতী বালিকা স্বভাব সুলভ মধুমাখা কথায় বলিলেন "আমার সঙ্গে কথা কওনি কেন?"

অমূল্যরতন সবিস্ময়ে বলিলেন "কখন?"

প্রভা। কেন কাল রাত্রে।

অমূল্য। কই কাল ত তুমি এস নি।

প্রভা। না আসি নি বই কি, আমি কতক্ষণ দোয়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

অমূল্য। আমি দেখ্‌তে পাই নাই, তুমি রাগ করেছ?

প্রভাবতী প্রফুল্ল বদনে বলিলেন "না।"

অমূল্য। তবে ঘুমোও নি কেন?

প্রভা। ঘুম যে হ'লো না।

অমূল্য। কেন?

প্রভা। তা জানিনে।

অমূল্য অন্য মনস্ক ভাবে অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রভাবতীর মুখাবলোকন করিয়া বলিলেন; "হাঁ! প্রভা, তুমি আমায় বড় ভাল বাস, নয়?"

প্রভাবতী মৃদু হাসিয়া বদন ঈষৎ অবনত করিয়া বলিলেন "না বাসিনে বই কি।"

অমূল্য। ভালবাসা কি রকম, প্রভা জান?

প্রভা আবার মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন "তা আমি জানিনে।"

অমূল্য। তবে আর ভাল-বেস না।

প্রভা কেন?

অমূল্য। ভাল বাসায় কষ্ট বই ত নয়।

প্রভা। তবে তুমি বেসনা, আমি বাস্‌ব, আমি কষ্ট সইতে পারি।

প্রভা চলিয়া গেলেন।

অমূল্যরতন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। স্থানান্তরে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিবেন বলিয়া পিতা মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মধ্যে মধ্যে অমূল্য স্থানান্তরে যাইতেন। পর্ব্বত গহ্বরস্থ বহ্নির কেহ স্ফুলিঙ্গও দেখিতে পাইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দ স্বামী।

এখন কানপুরের যেখানে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সহিত আউড এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়ের সম্মিলন হইয়াছে, ঠিক তাহার একক্রোশ পশ্চিমে রহমৎপুরা নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। আমরা যে সময়ের উল্লেখ করিতেছি, সে

সময় কাণপুরে কেন, ভারতের কোন স্থানে রেলওয়ে হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

রহমৎপুরার প্রান্তভাগে একটি সুন্দর কুসুম কানন পরিশোভিত গৃহ ছিল, তাহার একমাত্র অধিকারী নিত্যানন্দস্বামী। নিত্যানন্দের ইহ সংসারে একমাত্র মাহামায়া ব্যতীত অপর কেহই নাই।

নিত্যানন্দ ধনী সন্তান ছিলেন, বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হয়, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার একমাত্র প্রেমাধার প্রাণাধিকা পত্নীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। পত্নী বিয়োগে নিত্যানন্দ বড়ই শোক পাইয়াছিলেন, সেই অবধি তিনি সংসার ত্যাগী।

পত্নী বিয়োগের অব্যবহিত পরেই স্বামী তাঁহার অতুল বিষয় বিভবাদি বিক্রয় করিয়া বিরাগী হন, তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর; বিংশতি বৎসর নানাবিধ শাস্ত্রানুশীলনের পর প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর হইল রহমৎপুরায় বাস করিয়াছেন। নিত্যানন্দ স্বামীর দানের সীমা ছিল না। তেমন পরদুঃখ কাতর ব্যক্তি সংসারে নিতান্ত বিরল। রহমৎপুরার ও তাহার চতুপার্শ্বস্থ লোকেরা তাঁহাকে মনে মনে অতীব ভক্তি করিতেন, পূজা করিতেন।

আজি প্রায় একাদশ বৎশর হইল স্বামী মহামায়াকে পাইয়াছেন। মহামায়া ব্রাহ্মণ কন্যা, তাঁহার বয়ঃক্রম যখন এক বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়—পিতার মৃত্যুর পর অভাগিনী মাতৃ যত্নেই প্রতিপালিতা হন, মহামায়ার পিতা দরিদ্রলোক ছিলেন, সুতরাং বলা বাহুল্য যে তাঁহার মৃত্যুর পর মহামায়ার মাতার ক্লেশের আর অবধি ছিল না। মহামায়া যখন দুই বৎসরের তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত পথে তাঁহার অত্যন্ত পীড়া হয়। সেই অবস্থায় নিত্যানন্দ স্বামী তাঁহাকে আপন আশ্রমে আনিয়া চিকিৎসা ও যথাবিধি সেবা শুশ্রূষা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। অভাগিনী আপন একমাত্র স্নেহাধার কন্যাকে জন্মের মত অনাথিনী করিয়া অনন্তনাথের অনন্তাশ্রয় গ্রহণ করেন।

এত দিনের পর নিত্যানন্দর চক্ষু আবার সজল হইল, তিনি মাতৃহীনা বালিকা মহামায়াকে ক্রোড়ে করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন। অনেক সংসারীর আত্মীয় বিয়োগেও চক্ষে জল আইসে না, কিন্তু আজি নিত্যানন্দ স্বামী একটি অপরিচিত রমণীর মৃত্যুতে আকুল নেত্রে কাঁদিলেন। কেন এমন হয়, তোমরা কেহ বলিতে পার?

সেই অবধি মহামায়া নিত্যানন্দ স্বামীর আশ্রমে আছেন, স্বামী তাঁহাকে পিতার ন্যায় স্নেহ করেন, এবং মহামায়াও তাঁহাকে আপনার পিতা বলিয়াই জানেন, ও ভক্তি করেন।

নিত্যানন্দ পূর্ব্বে অত্যন্ত শ্রম শীল ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু এখন সে প্রকৃতির কতক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। এখন যেখানে নিত্যানন্দ স্বামীর আবাস আজি একাদশ বৎসর পূর্ব্বে তথায় একটি সামান্য কুটীর মাত্র ছিল, কিন্তু এখন তথায় চারি পাঁচটি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থান বন ছিল, এখন তথায় নয়নাভিরাম কুসুমকানন শোভা পাইতেছে, মহামায়াকে পাইয়া অবধি স্বামী কতক পরিমাণে যেন সংসারী হইয়া উঠিয়াছেন।

নিত্যানন্দ ও মহামায়া কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময় তথায় অমূল্যরতন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামী মহা যত্নে অমূল্যকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন, মহামায়াও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

* * * * *

নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় দিবা যেন অতি সত্বরই ফুরাইল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাসমাগত হইল, স্বামী মহামায়া ও অমূল্যকে লইয়া সন্ধ্যা সমীরণ সেবনে বহির্গত হইলেন, বাটীর সম্মুখে কানন, তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানের মনোহর পবন, মনোহর দৃশ্য অমূল্যকে মুগ্ধ করিতেছিল, অমূল্য যেন কোন স্বপ্ন রাজ্যে স্বপ্ন সুখানুভব করিতেছিলেন, সে সুখের তুলনা নাই ইয়ত্তা নাই তিনি ইহ জীবনে এত সুখ কখন অনুভব করেন নাই। মনুষ্য যে কখন এত সুখী হইতে পারে এ ধারণাও তাঁহার ছিল না—তাঁহার বিগত জীবন যেন কেমন তমোময় সুখ-শূন্য অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ক্ষণেক পরে অমূল্য দেখিলেন তিনি গত কল্য যে স্থানে মহামায়াকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর অমূল্যরতন বিদায় লইলেন।

কিন্তু, নিত্যানন্দ স্বামীর প্রথম সাক্ষাতের তিনটি কথা তাঁহার কর্ণে অবিরত ধ্বনিত হইতেছিল; স্বামী বলিয়াছিলেন, "মহামায়া, আসন দাও" অমূল্য ভাবিতেছিলেন, এটি কি স্বামীর ভবিষ্যদ্বাণী?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

একি পাগল?

প্রভাত কাল কুসুম কাননে হাসি মুখে ফুলের রাশি হাসিতেছে, মৃদুমন্দ শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া কুসুমকুঞ্জ হেলাইতেছে দুলাইতেছে, নাচাইতেছে.—মহামায়া বৃক্ষতলস্থ একটি বেদীর উপরে উপবিষ্ট। স্বামী অতি প্রত্যূষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, সেইজন্যই বুঝি আজি মহামায়া এত বিষণ্ণা। মহামায়া নির্জ্জনে একাকিনী করকপোলিত হইয়া চিন্তায় মগ্না, এমত সময়ে কে পশ্চাৎদিক হইতে তাঁহার সেই সুন্দর কোমল মনোহর সুচারু করপল্লব ধারণ করিল। মহামায়া চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু নামিল, মুখমণ্ডল রক্তাভ হইল।

অমূল্য বলিলেন, "মহামায়া—"

মহামায়ার কথা সরিল না।

অমূল্য বলিলেন, "মহামায়া অমন করিয়া যে" মহামায়া অমূল্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। কোন কথা কহিতে পারিলেন না। এমত সময়ে তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশ হইতে কে গাহিল,—

"ভূখা হামে শ্যাম তুয়া দুয়ারে,
রাধা মাঙ্গত হ্যায় প্রেম আধারে।
দেহ গুণাকর
কালা নটবর
কাঙ্গালিনী তু দুয়ারে মাঙ্গত যারে।"

অমূল্যরতন চমকিয়া উঠিলেন, সেই রমণীর কণ্ঠস্বর তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল—সে দিন রঙ্গনীতে যে কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন সেই স্বর নয়? তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, একটি যুবক বা বালক বলিলেও হয়। যাহা রমণীর কলকণ্ঠ ভাবিয়াছিলেন তাহা একটি সুন্দর বালকের সঙ্গীতে পরিণত হইল। যুবকটি হিন্দুস্থানীর বেশে পরিহিত।

মহামায়া ক্ষণেক যুবকটির আপাদ মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কে?"

যুবক হা হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল "আমি কে?"

মহা। বল না।

যুবক। তুমি কে?

মহামায়া মৃদু হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

যুবক বলিল "তুমি কে, তা যখন জান না, তখন আমি কে, তা বল্‌বে কেন।"

অমূল্য। কি চাও?

যুবক। চাব আবার কি, গান গাই, আর যে যা দেয়, তাই নি—একটি বাদে

অমূল্য। কি?

যুবক। পরের প্রাণ।

অমূল্য। কেন?

যুবক হাসিয়া কহিল "রাখিবার স্থান নাই।"

অমূল্য হাসিলেন। মহামায়া বিস্মিত হইলেন।

অমূল্য কহিলেন "তুমি গান শিখলে কোথা?"

যুবক। শিখবো আবার কোথা, লোকের দেখে শিখেছি।

অমূল্য। গান কি দেখে শেখে না শুনে শেখে?

যুবক। আমি দেখে শিখি।

অমূল্য। তবে একটি গাও দেখি।

যুবক। গান দেখে, না শোনে?

অমূল্য হাসিয়া কহিলেন "আচ্ছা শুনি।"

যুবক। আহা কি সুখ, আমি গাই আর উনি শোনেন।

অমূল্য। তবে গাবে না?

যুবক। গাব না কেন, বল্‌লেই গাই।

অমূল্য। গাও।

যুবক। কি গাব?

অমূল্য। যা ইচ্ছা।

যুবক হাসিতে হাসিতে গাহিল,—

"অবলারে করি ছলা, মিছে কেন কাঁদাও প্রাণ,
উজান বহিছে নদী—কেন রে লুকায়ে বান?
আমি প্রাণ দেবো না,
প্রাণ নেবো না,
প্রেমের কাছে আর যাব না,

প্রেমের কথা প্রাণের ব্যথা
প্রাণটা গেল সঁপে প্রাণ।”

অমূল্য। কাকে প্রাণ সঁপে ?

যুবক। তোমায়।

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন “তবেই বক্ষে।”

অমূল্য। ভাল আর কোন গান জান ?

যুবক হাসিয়া কহিল “কেন জানব না ?”

অমূল্য। তুমি যে হেসেই সারা।

যুবক “কেন হাস্‌বো না’ বলিয়া গাহিল,—

‘ফুল দেখি ফুল হাসে,
নাচে মৃদুল বাতাসে,
কপোত কপোতী হাসে,
আমি কেন হাসিব না।”

অমূল্য। তবে হাস।

যুবক। না কাঁদব।

অমূল্য। কেন ?

যুবক। কাঁদ্‌ব না ?

গাহিল ;—

যে হাসে সে হাসে হাসে,
সদা মন সুখে ভাসে,
আমি হৃদে দুখ পুষে
কেন বল কাদিব না।”

অমূল্য। তোমার আবার দুঃখ কি ?

যুবক। না, আমার কোন দুঃখ নেই, যা আছে তোমারই।

অমূল্য। আমি ত তাই জানি।

যুবক। তা ত এই দেখিতেই পাচ্চি।

অমূল্য। তুমি রোজ এস।

যুবক। কেন ?

অমূল্য। পাবে।

যুবক। আমার লাভ ?

অমূল্য। পয়সা পাবে।

যুবক। তবে আস্‌বো, তুমি এখানে রোজ থাক?

অমূল্য। না হয় থাকবো।

যুবক। আমার গান শুন্‌তে নয়?

অমূল্য। হ্যাঁ।

যুবক। তবে আমিও আস্‌বো।

এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিল। অমূল্য বলিলেন "পয়সা নিয়ে যাও।" যুবক পশ্চাৎ ফিরিয়া "কেন জলে ফেল্‌বে?" বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

অমূল্য মহামায়াকে বলিলেন ";ওকে আর কখন দেখেছিলে?"

মহা। না।

স্বপ্নে আমার দুর্গোৎসব।

কখন ফলিবে না কি?

অরে জীর্ণ; দুর্ভাবনায় দুর্বলতায় মাথা ঘুরে; কলির বন্ধুবান্ধবেরা কিন্তু সর্ব্বদাই অনর্থক ব্যস্ত করিতে নিরস্ত নহেন; প্লীহা যকৃতে স্ফীতোদর লম্বোদর ভায়া আসিয়া নিয়তই বলেন, যে, 'দাদা আহারটা বুঝিয়া সুঝিয়া করিবেন, যত রোগের মূলই আহার।' থিয়েটরে, গ্রীণরূমে, ক্লবে, ব্যাক্‌রূমে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে ঢুলুঢুলু চক্ষে আমার বিছানার পার্শ্বে আসিয়া নিবারণ ভায়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন, যে, 'দেখ দাদা রাত টাত জেগে শরীরটা মাটি করিও না।' কাজেই মুখ বুজিয়া, চক্ষু মুদিয়া, প্রাণ গুঁজিয়া—দিন কাটাই। রাত্রি—আমি কাটাইতে পারি না, ভগবান্ কাটাইয়া দেন। তোমরা বলিলে বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু সত্যসত্যই আমি প্রত্যহই মিরাকল (miracle) দেখিয়া থাকি। এই দুর্জ্জয় রাত্রি যে আসিতেছে, ও কাটিতেছে—এগুলি আমার পক্ষে জীবন্ত মিরাকল ব্যতীত আর কি বলিব?

এইরূপেই মাসাবধি যাইতেছে, সে দিন উহারই মধ্যে একটু সুস্থ বোধ করিলাম। জিহ্বার যেন জড়তা ভাঙ্গিয়াছে; কাণের যেন তালা খুলিয়াছে, মাথার যেন ভার কমিয়াছে, শরীর যেন আপনারই বটে; প্রাণ যেন শরতের নির্ম্মল আকাশে এক এক বার উড়িয়া আসিতেছে; মনের ভিতর যেন আলেয়া লাগিতেছে। দুর্ব্বল প্রাণে একটু স্ফূর্ত্তি বোধ হইল। অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া * * * রহিলাম। চাহিয়া দেখি, আকাশে যেন কেমন একরূপ নীল মাখান জরদের স্রোত চলিতেছে; সুদূরে যেন মৃদু মধুর ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে যেন এক প্রকার মিঠা মিঠা সৌরভ আসিতেছে। পূর্ব্বের সেই কাতরতা, আর এখনকার ক্ষণিক স্ফূর্ত্তি উভয়ই লুপ্ত হইল। মন উদাস হইল, * * * * * মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। উপাধানে মস্তক ন্যস্ত করিলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

পুত্র পার্শ্বে বসিয়া নবানুরাগে প্রকোষ্ঠ-প্রাচীর বিলম্বিত ভারতের মানচিত্র পর্য্যালোচনা করিতে ছিলেন, তাঁহার জিজ্ঞাসার সাগ্রহ ধ্বনি আমার কাণে বাজিল। "বাবা! এখানটা মাইসোর রাজ্য বলে কেন?" আমি আস্তে আস্তে চাহিয়া বলিলাম, ওটা 'মাহিষর' রাজ্য।" "মাহিষর কি?" আমি বলিলাম "মহিষাসুর।" তখন পিতা পুত্রে উভয়েই খল খল হাস্য করিতে লাগিলাম। তাহার পর, "গোদাবরীর" 'গোদা' মানে কি, 'বরী' মানেই বা কি? "কৃষ্ণার" জল কাল কি না? ভূ নয় বলিয়া কি 'অভু' পর্ব্বতের নাম হইয়াছে? 'হিমালয় পর্ব্বতের কোরটা উলটাইয়া দিলেই চাল-চিত্রের মত হয়।" এইরূপ কত সওয়ালই হইল, আর কত মীমাংসাই শুনিতে লাগিলাম।

দেখিতে দেখিতে শরতের আকাশে শরতের মেঘ উঠিল; এখানটা কাল, ওখানটা শাদা। এখানটা হন্‌হন্ করিয়া যাইতেছে; ওখানটা মৃদু বাতাসে পাল-ভরে নৌকার মত গদাইলস্করি চালে চলিয়াছে। পরিবার মধ্যে মহা রোল উঠিল, "এবড়ী কয়টা আর শুকোয় না।" আমার মাথার টিপ্‌টিপ্ ক্রমে টুপ্‌টুপ্ করিতে লাগিল। আবার আমার চিরবন্ধু উপাধানের সহিত নিগূঢ় পরামর্শ জন্য সন্তর্পণে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পার্শ্বোপবিষ্ট পুত্রের কণ্ঠ নিঃসৃত বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, হিমাচল, নীলাচল, কাশ্মীর কাণৌজ—শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

দেখিলাম,—স্বর্ণাক্ষরে রঞ্জিত একখানি অপূর্ব্ব সুবিস্তৃত ভারতের মাণচিত্র পটে শারদীয়া দুর্গা প্রতিমা যেন জীবন্ত শরীরে ঝলমল করিতেছে। অঙ্গ কণ্টকিত হইল, হৃদয় পুলকিত হইল; হৃদয় স্নর ধীরগতির শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে মূর্ত্তি আর কখন ভুলিতে পারিব কি? সে জীবন্ত মাণচিত্র কখন ভুলিতে পারিব কি?

উর্দ্ধে কৈলাস হইতে কামরূপ,—সমস্ত কাশ্মীর ও তিব্বৎ ভূমি—অগণিত দেব দেবীর রূপচ্ছটায় বিভাসিত হইতেছে. তাঁহাদের অলঙ্কার আভায় বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত হইতেছে; উজ্জ্বল কিরীট ঝক্‌মক্ করিতেছে; আর তলদেশে, ভারত সাগর, বঙ্গসাগর অসংখ্য স্থির উর্ম্মি তুলিয়া নীল নৈবেদ্যে বেদীপীঠ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ধূপ ধূম গন্ধে চারিদিক পরিপূরিত; মৃদু মধুর ধীর গম্ভীর অসংখ্য ঘণ্টা রবে দিঙ্মণ্ডল শব্দিত। এ সকল আর ভুলিতে পারিব কি?

বিদ্রূপচ্ছলে মাহিষর রাজ্য মহিষাসুর বলিয়াছিলাম; দেখিলাম, সত্য সত্যই সেইখানে,—

অধস্তান্ মহিষং তদ্বৎ
বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বৎ
দানবং খড়্গ পাণিনং॥

প্রকাণ্ড মহিষাসুর অর্দ্ধশায়িত রহিয়াছে. চোরমণ্ডলে তাহার ক্ষুর চতুষ্টয়; বিজয়পুরে তাহার শৃঙ্গ। আর অর্দ্ধচ্ছিন্ন গ্রীবাদেশ হইতে সশস্ত্র নিজাম অসুর উদ্ভূত হইয়া আরক্তলোচনে উর্দ্ধমুখে রহিয়াছে। তখন পুরাণে ইতিহাসে আমার মনোমধ্যে মেশামিশি হইল। ভাবিলাম, মাহিষর রাজ্য ধ্বংশ করিয়াই ত এই বিষম দানবের উৎপত্তি বটে। ও দিকে সেতারা সুরাট হইতে দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্র সিংহ বিষম আস্ফালন করিয়া তেজোবিস্ফারিত লোচনে, ভীষণ দংষ্ট্রে, অসুরকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। সেই সিংহের উপরি সদর্পে দক্ষিণ পাদ রাখিয়া, বাম পদাঙ্গুষ্ঠে মহিষ পৃষ্ঠে ভর দিয়া—ধবলাচল-শিখর-কিরীটিনী দশভুজা দেবীমূর্ত্তি।

জটাজূট সমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাং।
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাং॥
অতসীপুষ্প বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।

নবযৌবন সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাং ॥
মৃণালায়ত সংস্পর্শ দশবাহু সমন্বিতাং।
শত্রু ক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানব দর্পহাং ॥

আবার,—

প্রসন্ন বদনাং দেবীং সর্ব্বকাম ফল প্রদাং।
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপ মমরৈঃ সন্নিবেশয়ৎ ॥

কিন্তু,—

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাচ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা ॥

সেই প্রসন্না অথচ চণ্ডিকা মূর্ত্তি; সেই যুবতী, অথচ যোগিনী মূর্ত্তি; সেই দেবী অথচ মাতৃকা মূর্ত্তি; সেই গৌরী অথচ শ্যামা মূর্ত্তি; সেই সাত্ত্বিকী রাজসী, তামসী মূর্ত্তি;—আর কখনও ভুলিতে পারিব কি? সেই যে জটাঘটা মধ্য হইতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ত্রিবেণী বাহির হইয়া সাগর সঙ্গমে মিলিত হইতেছে, সেই যে দেবীর তুষার-মণ্ডিত কিরীট মণ্ডল কৈলাসে দেবাদিদেবের চরণচুম্বন করিতেছে,—এ সকল কখন ভুলিতে পারিব কি?

সে প্রতিমার অন্যান্য মূর্ত্তিও ভুলিতে পারিব না। পঞ্জাব পীঠে (সাম্রাজ্যের) বিঘ্নবিনাশন গজপতি গজানন যোগাসনে ধ্যান নিমগ্ন; তাঁহার শঙ্খ চক্র শিথিল হস্তে নিদ্রিত জড়বৎ রহিয়াছে। লম্বোদর,—অসাড়, অচেতন, নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল। লম্বমান বৃহৎ শুণ্ড কচ্ছ ভূমিতে সাগর জল শোষণ করিতেছে। বিশাল গণ্ডস্থলের পঙ্কক্ষত হইতে নিঃসৃত পঙ্ক ধারা শুণ্ডে সংমিলিত হইয়া. শুণ্ড বাহিয়া সিন্ধুনদ ধারায় সিন্ধু লীন হইতেছে বোধ হইল যেন, যোগাসনে গজপতি মহেশের মহা সমাধিতে চিত্ত স্থির করিয়াও অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল। ভাবিলাম—স্বয়ং বিঘ্নবিনাশন এত উদ্বিগ্ন! দেবত্বেও এত বিড়না!

গজানন বামে গজমতি কণ্ঠে লক্ষ্মীমূর্ত্তি। বরদা ইন্দোবের শতদলদ্বয়ে চরণ ভর করিয়া দেবী বঙ্কিম ঠামে মহাদেবী পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। কটিকিঙ্কিণীতে রাজপুতানার রত্নরাজি বিভাসিত হইতেছে; পাতিয়ালায় শ্বেত হীরক মুকুট অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। মথুরার শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠীর প্রকোষ্ঠে লীলাকমল স্থাপন করিয়া দেবী আপন মনে বিভোরে অবস্থান করিতেছেন। দৃষ্টি যেন, পাণিপথ ক্ষেত্রে আকর্ষিত রহিয়াছে। দেবী তোমার ও চমক কি ভাঙ্গিবে না? আবার পানিপথে মা তুমি কি দেখিতেছ?

মহাদেবীর বামে সরস্বতী মূর্ত্তি। মায়ের রূপচ্ছটায় বারাণসী হইতে মিথিলা অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত। বক্ষে গৌতমক্ষেত্র; শতহীরক আভায় উজ্জ্বলী-কৃত। নবদ্বীপে কচ্ছপীতুম্বী রাখিয়া একমনে বাগীশ্বরী আলেয়া আলাপ করিতেছেন। আমি যেন শুনিলাম;—

আবাহন।

কত নিদ্রা যাবে মা গো রাজ রাজেশ্বরি,
ভোগচক্ষু মেল মা গো যোগ পরিহরি॥
চৌদিকে সন্তানগণ স্তন্যবিনা ক্ষুণ্ণমন
শ্রীমুখ নেহারে সবে যুগ যুগ ধরি;
উঠ উঠ জগন্মাত কর গো কটাক্ষপাত
রক্ষ রক্ষ রক্ষাকর্ত্রী ভারত ঈশ্বরী।

সর্ব্বশেষে, পূর্ব্বাঞ্চলে বাঙ্গালায় কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি। শিখণ্ডী বাহনের শিখীপুচ্ছ ব্রহ্মদেশের উপকূল পর্য্যন্ত প্রলম্বিত, চন্দ্রক কলাপ জ্যোতিতে চট্টগ্রাম চন্দ্রশেখর চাকচিক্য ময়। সেই দেবতার বাবু,—বাবুর দেবতা,—যেমন চিরদিন দেখিয়াছি, তেমনই দেখিলাম। সেই আম্বা করিয়া লম্বা কোঁচা নটবর-নিন্দিত বেশে রক্ত-কুসুম-শোভিত বুট বক্ষে লটপট লুণ্ঠিত হইতেছে। সেই মাথার উপর ট্রঙ্করোড—বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জ দিয়া টেরা হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই ভ্রমর পাঁতির রেখা—ঈষৎ গোফের দেখা। সেই সব। তবে এখন ধনুদণ্ডের গুণ গুটাইয়া বাবুগিরির বন বিহারের যষ্টি করিয়াছেন। আর পক্ষীপক্ষযুক্ত শরটি চাঁচিয়া ছুলিয়া লেখনী করিয়া মসীপেষণের যন্ত্র করিয়াছেন। এখন এই বাবুদেব মূর্ত্তি দেখিয়াই পুরাণ গানটি আমার মনে পড়িল।

গান।

ষড়ানন ভাই রে! তোর কেন নবাবি এত!
তোর বাপভিখারী, মা যোগিনী, তোর পায়ে যোড়তোলা জুতো।

দেব সেনাপতির এইরূপ পরিণাম চিন্তা করিতেছি;—এমন সময়ে তিনি যেন আমার অন্তরের কথা জানিতে পারিয়া আমার উপর ভ্রূকুটি করিলেন; তাঁহার ময়ূরবাহন পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিয়া উঠিল; অসুর স্কন্ধস্থিত সর্প-রাজ ফণা বিস্তার করিল; সুরাষ্ট্রের সিংহ-রাজ গর্জ্জন করিয়া উঠিল; গণপতি শুণ্ড সঞ্চালন করিলেন; মহাদেবীর মহাযোগ ভঙ্গ হইল; তিনি শৈল

শিখর হইতে আমার উপর সস্নেহ কটাক্ষপাত করিলেন। বাগ্‌দেবী মহাতানে আবার বীণালয়ে ধ্বনিত করিলেন ;—

রক্ষ রক্ষ রক্ষাকর্ত্রী ভারত ঈশ্বরী—

সাগরের মহানৈবেদ্য সকল স্ফীত হইয়া উঠিল ; মধ্যস্থিত মহানৈবেদ্য সিংহল দ্বীপ ঝলমল করিতে লাগিল। মহাবোধনের কাংস, ঝাঁঝর, ঘণ্টা শঙ্খরবে চারিদিক শব্দিত হইল। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল ; শুনিতে পাইলাম যেন একদিকে দেবকণ্ঠে গীত হইতেছে ;—

বোধন।

যা দেবী মাণচিত্রেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

অন্য দিকে শত নরকণ্ঠে এইরূপ মহাস্তোত্র ধ্বনিত হইতেছে ;—

স্তোত্র।

সিংহস্কন্ধ সমারূঢ়াং দৈত্যদর্প বিনাশিনীং।
সুরেন্দ্র বন্দিতাং নিত্যাং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং ॥
নানাভরণ শোভাঢ্যা বিচিত্র বসনা শিবাং।
ত্রিলোকজননী মাদ্যাং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং ॥
বালার্কারুণ বর্ণাভাং কেয়ূরাঙ্গদ ভূষিতাং।
রত্ন দীপ্তি কিরীটীঞ্চ তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং ॥
ভবার্ণব নিমগ্নানাং তারিণীং ভবসুন্দরীং।
ভীমাং শক্তি স্বরূপানাং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং ॥
পারিজাত বনান্তস্থাং সিদ্ধচারণ সেবিতাং।
মুনিভিঃ সেবিতাং দেব্যাং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং ॥
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহ সন সমন্বিতে।
প্রফুল্ল কমলারূঢ়াং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং ॥
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বকর্ত্রীং বিশ্বস্য পালনীং পরাং।
বিশ্ববন্দ্যা বিশ্বহন্ত্রীং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং ॥
হিমালয় সুতাং নিত্যাং হিমালয় নিবাসিনীং।
ব্রহ্মাদি বিষ্ণুনমিতাং তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং ॥
দুর্গতীনাং গতি ত্বংহি দুর্গসংসার তারিণীং।
ঘোর দুর্গাচ্চ পাপাচ্চ ত্রাহি মাং পরমেশ্বরি ॥

আর বাহিরে একজন ভিক্ষুক ক্ষীণস্বরে গাহিতেছে ;—

আগমনী।

মোহাড়া।

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্‌তে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে,
রাজ-রাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই॥
শিবা এসে বলে মা,
শিবের সে দিন এখন আর নাই।
যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে,
সকলে দিলে ধিক্কার,
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বিভব,
কুবের ভাণ্ডারি তার।
এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে,
আনন্দ কাননে জুড়াবার ঠাঁই॥

চিতেন।

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়ে যার।
তোমার সেই উমা, এই এলো,
সঙ্গে শিব-পরিবার॥
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ,
গঞ্জনা দূরে গেলো,
আমার মা কৈ, মা কৈ, বলে উমা ঐ,
ব্যগ্রা হোয়ে দাঁড়ালো।
বলে, তোমার আশীর্ব্বাদে, আছি মা ভালো,
দুখিনীরো দুখ ভাব্‌তে হবে নাই।

ভাবিলাম, সত্য সত্যই কি তবে আর আমাদিগকে মায়ের ভাবনা ভাবিতে হইবে না? আমার এই স্বপ্ন সত্য সত্যই কি সফল হইবে?

নবজীবন।

২য় ভাগ } অগ্রহায়ণ ১২৯২। { ৫ম সংখ্যা।

বৈষ্ণবতত্ত্ব।

রাগমার্গে ভজন।

রাগমার্গে গুরু শিষ্যের মধ্যে কঠিন পরীক্ষা নাই; এখানে আপনার জনকে পাইয়া, অন্তরে অন্তরে পরস্পরের সহিত মিলন হয়, এবং বাহিরে অল্পক্ষণ আলাপ পরিচয়ের পর, চিরকালের জন্য সংঙ্ক সূত্রে উভয়ে সম্বদ্ধ হয়। আগন্তুক বহির্ম্মুখে মোহান্তের শরণাপন্ন হইল; কিন্তু মোহান্তের স্বধর্ম্ম তাহাকে চিদভিমুখ কৃষ্ণাভিমুখ স্রোতে ফেলিয়া অন্তর্পথে;—অন্তর্ম্মুখে তুরীয় ধামের দিকে আকর্ষণ করা। রাধা না কৃষ্ণ প্রণয়িনী ও একমাত্র কৃষ্ণধনে ধনী; সেইজন্য তিনি স্বানুগত ও স্বভক্ত সখীদিগকে স্বভাবতই কৃষ্ণাভিমুখে প্রেরণ করেন।

> "যদ্যপি সখীদের কৃষ্ণ সংসর্গে নাহি মন।
> তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥"

মোহান্ত প্রথমে তাহাকে নাম শ্রবণ করাইলেন; তাহাতে তাহার সমস্ত শরীর মন জুড়াইয়া গেল। নাম রসে আর্দ্র হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইল।

> "সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম
> কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
> আকুল করিল মোর প্রাণ।
> না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
> বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে?
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো
স্বরূপ হেরিলে কিবা হয়?
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো
কুলের ধরম কৈছে রয়?
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়?"

ইহা প্রায় সকলেই অনুভব করিয়াছেন, যে, কখন কখন কোন একটি সংগীত বা সঙ্কীর্ত্তন বা তাহার কোন অংশ বিশেষ শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া এরূপ ভাবে হৃদয়ের অভ্যন্তরে ঠিক হইয়া থাকে, যে গান থামিলেও এবং কার্য্যান্তরে অভিনিবিষ্ট হইলেও, তাহা স্বতঃই প্রাণের মধ্যে পুনঃ পুনঃ উদয় হইয়া ধ্বণিত হইতে থাকে। ইচ্ছা করিলেও যেন তাহাকে থামান যায় না। তাহা যেন হৃদয়ের সঙ্গে কি এক সম্বন্ধ সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছে, যে তাহা আপনা হইতে পুনঃ পুনঃ অন্তরের মধ্যে আসিয়া নিনাদিত হইতে থাকে। এভাব অবশ্যই অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিন্তু পূর্ণকালে শ্রদ্ধান্বিত শুদ্ধচিত্তে, নির্ম্মল প্রকৃতিস্থ সাধুর শ্রীমুখ হইতে তুরীয় ভাবাত্মক নাম শ্রবণ হইলে, তাহা অন্তর্দ্দেশে এরূপ প্রগাঢ়-প্রোথিত হইয়া যায়, যে, তাহা আমরণ কখন ছাড়ে না, হৃদয় মন প্রাণকে স্বতঃই অধিকার করিয়া রাখে এবং অন্তর মধ্যে সর্ব্বদাই তাহার উদয় হইতে থাকে, সর্ব্বদাই তাহার স্মরণ হইতে থাকে। এ নাম আজীবন প্রাণে বিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্তরে স্বতই এই নামের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইয়া থাকে।

"তুরীয় সমুদ্র হ'তে উঠেছে এক নামের ঢেউ
ও সে আপনি ওঠে, আপনি মেটে, নিবারিতে নারে কেউ।"

সচরাচর এই নামরস আস্বাদন করিতে করিতে সাধু ভক্তের সদয় ঈক্ষণে অনুগত জনের অন্তরে নামের—গুরুদত্ত বীজ মন্ত্রের—সঞ্চার হইয়া থাকে। এই সঞ্চার কি, তাহা বর্ণনা করা মাদৃশ অনভিজ্ঞ জনের সাধ্যায়ত্ত নহে। অষ্ট সাত্ত্বিকী ভাবের সঙ্গে ইহা সহসা উপস্থিত হইয়া লোকাতীত পরাক্রমে হৃদয় মন প্রাণকে আচম্বিতে অধিকার করে। এ সময় মানুষ আপনাতে আপনি থাকে না; কাহারও কাহারও চৈতন্য পর্য্যন্ত অন্তর্হিত

হইয়া যায়, এবং যখন সে চৈতন্যের প্রত্যাবর্ত্তন হয়, তাহা তখন পুরাতন ভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয় না; নব বেশ ধারণ করতঃ তুরীয় ভাবাত্মক নির্ম্মল অনন্ত চৈতন্যে পরিণত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। সঞ্চার কালে জীবদেহস্থ কূটস্থ পরাপ্রকৃতি সহসা জাগ্রত হইয়া উঠে এবং অবিলম্বে জীবের হৃদয় মন প্রাণ চিদভিমুখ স্রোতে নিপতিত হয়। সঞ্চার কালে অষ্টম-বিকৃতি-গত চিদ্বিমুখ জীব সহসা তুরীয় সাহায্যে, তুরীয় ভাবে, জাগ্রত হইয়া চিদভিমুখে—কৃষ্ণাভিমুখে অভিসারোদ্যত হয়। এই সঞ্চার কাল অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী থাকে। পলকে যেন প্রলয় হইয়া গেল,—চকিতে কি এক চমৎকার কাণ্ড হইয়া গেল।

"কি আর বলব তোরে সই,
চকিতে চমৎকার হেরে, আমায় আমি নই।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে এই জীবচৈতন্য চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব পার হইয়া আত্মস্থ হইল—চিন্ময় আনন্দ চৈতন্যে মিশাইয়া গেল। কিন্তু আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। সেখানে থাকিতে পারিল না। তার পর সেই জীব-দেহে বাস্তবিকই প্রলয় উপস্থিত হইল। তাহা প্রলয়ই বটে; কেন না অবিলম্বেই প্রলয়ের হুঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে এবং জীবচৈতন্য জাগ্রত পরাশক্তিবলে তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি—পরম চৈতন্যের অভিমুখে—কৃষ্ণাভিমুখে যাত্রারম্ভ করে। এ অবস্থায় মানুষের বৈরাগ্য যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া নব-বেশ ধারণ করিল। পূর্ব্বে না দেখে বৈরাগ্য সঞ্চার হইয়াছিল; এখন দেখিয়া—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া তদনন্তর তাহা হারাইয়া সেই বৈরাগ্য নব-জীবন লাভ করিল। শ্রীচৈতন্যদেব এই অবস্থায় "কৃষ্ণরে বাপ্‌রে, এই যে দেখা দিয়াছিলি, কোথায় লুকালিরে" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। এই প্রলয়ের সূত্রপাত হইতে রাগমার্গে যাত্রারম্ভ হইল। কিন্তু এই প্রলয়ান্তে জীবদেহ ধ্বংশ হয় না,—তাহা নির্ম্মল ভাবাঙ্গে পরিণত হইয়া—প্রেমময় দেহ হইয়া, নির্ম্মল তুরীয় পরাপ্রকৃতির অঙ্গলগ্ন হইয়া যায়। তার পর? তার পর সেই দেহ পরাপ্রকৃতি ও পরম চৈতন্যের লীলাভূমি হইয়া—সচ্চিদা-নন্দ বিগ্রহ হইয়া প্রকাশ পায়।—সৃষ্টির মধ্যে—সৃষ্টি ছাড়া তুরীয় ফুল ফুটিয়া সৌরভে ভক্তবৃন্দের প্রাণাকুল ও চিত্তাকর্ষণ করিতে থাকে।

"পরম পুরুষকারে একা কে বিহরে ধরায়?
বিবরিয়ে কহ সখি! একি অপরূপ দেখি তায়?

না জানি কি ভাব অন্তরে, একাধারে একাকারে,
যুগল বিলাস করে, শুনিতে পাই পরম্পরায়।
কাল নয় গৌর-অঙ্গ, ভাব ধরে যেন ত্রিভঙ্গ,
না রাখে যোষিৎ-সঙ্গ, ভঙ্গ নাই তার ব্রজলীলায়।
সর্ব্বকাল-অবস্থিতি, সহজ মানুষাকৃতি,
শীতল উজ্জ্বল-ভাতি, জীবে গতি মুক্তি বিলায়।"

সঞ্চারে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি উপলব্ধি হয়, অন্তর্চৈতন্যের উন্মেষ হয়। তখন বাহ্য-স্ফূর্ত্তি হয় না,—অন্তর্বাহ্য এক হয় না। সে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি সাধকের অনায়ত্ত রহিল, আয়ত্তাধীন হইল না। যেমন একটি রাগ কি রাগিনী গাহিতে শুনিলে একজন সংগীতানভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা না সাধিয়া নিজে আয়ত্ত করিতে পারে না গাহিতে পারে না। তেমনি সে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি না সাধিলে, আয়ত্ত হয় না। এক-বারমাত্র গুরুকৃপায় তুরীয় কৃষ্ণরূপ—বিমল চিদানন্দরূপ প্রতিভাত হইল। কিছুই বুঝিল না, কিছুই জানিল না সকল বিষয় অবিদিত রহিল অথচ অন্তরে বিমল চিদানন্দের উৎস সহসা উৎসারিত হইল। যে প্রেমময়ী রাধার কৃপায় যে মোহান্ত দেহের তুরীয় প্রভাবে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইল, তাঁহাকে তখন লক্ষ্য হইল না,—তাঁহার দিকে তখন দৃষ্টি পড়িল না। কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে অন্তরে প্রবল কৃষ্ণা-নুরাগ জন্মিল এবং রাগমার্গে—কৃষ্ণাভিমুখে অভিসার আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে অনায়ত্তে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগও নবীভূত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

প্রবর্ত্তাবস্থায় প্রাণ সচরাচর কৃষ্ণানুরাগে কৃষ্ণাভিমুখে আপনা আপনি ছুটিতে থাকে। সাধনাবস্থায় প্রাণ সেই কৃষ্ণাভিমুখ থাকে বটে; কিন্তু নির্ম্মল অন্তঃকরণে সে সময় যখন মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন গুরুস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে—কখন কখন গুরুরূপ —রাইরূপ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তির সহানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এ অবস্থায় এই যুগলস্ফূর্ত্তি ভঙ্গপ্রবণ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি সর্ব্বদাই অঙ্গহীন থাকে। সাধন সিদ্ধাবস্থায় অন্তরে যুগলস্ফূর্ত্তি সংস্থিত হয়। তখন যখনই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়, তখনই গুরুস্ফূর্ত্তি,—রাধাস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তখন এই উভয় স্ফূর্ত্তিই সর্ব্বদা একত্র বিরাজিত থাকে;—তখন আর এই যুগল ভঙ্গ হয় না।—চিদানন্দের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে, গুরুস্ফূর্ত্তি রাধাস্ফূর্ত্তি কখন অসংযুক্ত থাকে না। গুরুস্ফূর্ত্তি অন্তরে সংস্থিত হইলে সাধকের অন্তর্দৃষ্টি আর কৃষ্ণাভিমুখে থাকে না স্বভা-

যতই সেই রাই অভিমুখে বিস্ফারিত হয়। সিদ্ধাবস্থায় প্রবর্ত্ত হইলে অন্তরে গুরুস্ফূর্ত্তি ও কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি এক হইয়া নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—রাধাস্ফূর্ত্তির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন অন্তরে কেবল শ্রীরাধারই স্ফূর্ত্তি; কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—চিদানন্দস্ফূর্ত্তি তাহার অন্তর্গত, তাহার অনুগত—তাহার অবশ্যম্ভাবী অন্তরঙ্গ। কিন্তু আজও সে স্ফূর্ত্তি অন্তরে আছে—আজও বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। আজও বাহিরে গুরু দর্শন,—মানুষ দর্শন—জগৎ দর্শন হয় নাই। এখনও সাধক আত্মতত্ত্ব পার হইয়া পরতত্ত্বে উপনীত হইতে পারে নাই। সাধক এখন নির্ম্মল প্রকৃতিকে ও তাহার অন্তরঙ্গ পুরুষকে অন্তরের মধ্যে দর্শন বা আস্বাদন করিয়াছেন মাত্র; অন্তর্ম্মুখে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পারস্থ হইয়া পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) উপলব্ধি করিয়াছে মাত্র। এখন তাহার অন্তর হইতে বাহিরে আশা অবশিষ্ট আছে। এখনও সে জননী গর্ভে-গর্ভস্থ; তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন। ভাবদেহের গঠন সম্পূর্ণ হইয়া তাহাতে ইন্দ্রিয় সংস্থান না হইলে সাধকের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয় না। যে জাতীয় ইন্দ্রিয়ের সংস্থান হইলে এই বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়, চৈতন্য—চরিতামৃতে তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়াছে।

গুরু মন্ত্র দিয়া, শিষ্যের অন্তরে ভাবদেহের বীজ বপন করেন। সঞ্চারে সেই বীজে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়—সেই বীজ অঙ্কুরিত হয় প্রবর্ত্ত সাধন ও সিদ্ধাবস্থায় সেই ভাবদেহের সঙ্গঠন হইতে থাকে। সাধকের দৃষ্টিতে তাহা অন্তরঙ্গরূপে প্রকাশ পায়। শুদ্ধচিত্তে সেই তৃতীয় দেহ সেই চিন্ময় আনন্দ দেহ প্রকাশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে, গুরুস্ফূর্ত্তি রাধাস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। সঙ্কুচিত সংকীর্ণ চিত্তে তাহা হয় না গুরুস্ফূর্ত্তি রাধাস্ফূর্ত্তিযুগলস্ফূর্ত্তি কেবল মাত্র নির্ম্মল অন্তঃকরণেই সম্ভাবিত হয়। গুরুস্ফূর্ত্তির রাধাস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব দেহের—এই চিন্ময় আনন্দ দেহের গঠন পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে ধাবিত হইতে থাকে।

এখানে একটি প্রশ্ন অনেকের মনে স্বভাবতই উত্থাপিত হইতে পারে, যে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তির সঙ্গে আবার রাধাস্ফূর্ত্তি কেন?—চিদানন্দের বিকাশের সঙ্গে আবার গুরুস্ফূর্ত্তি কেন?—নিরাকার চিন্ময় আবির্ভাবের সঙ্গে আবার এ আবর্জ্জনা কেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ নির্ম্মলতান্তঃকরণে এই ভাব যোগ অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য্য ও স্বভাব সিদ্ধ। নির্ম্ম-

নান্তঃকরণ স্বভাবতই কৃতজ্ঞ। যেখানে ওরূপ অন্তঃকরণ কোন আত্মীয় প্রদত্ত ঐশ্বর্য্য বা বিষয় সুখ সম্ভোগ করে, তখন তাহা আত্মসুখে ভোগান্ধ ও বিহ্বল হইয়া প্রদাতা সুহৃদকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। সম্ভোগ কালে স্বভাবতই সুহৃজ্জন সেই অন্তঃকরণে সাদরে আমন্ত্রিত হয়, এবং সেই সূত্রে সুন্দর ভাব যোগ সংস্থাপিত হইয়া তাঁহার রূপ গুণ সম্ভোক্তার বিমল চিত্তে তৎকালে প্রতিভাত হইতে থাকে। বিশেষতঃ যখন কোন এক ব্যক্তি, ব্যক্তি বিশেষের কৃপাগুণে সৃষ্টি ছাড়া অতীন্দ্রিয় বিমল ঐশ্বর্য্য অজস্রধারে সম্ভোগ করিতেছে, তখন সেই কৃতজ্ঞ চিত্তে এই ভাবযোগ যে অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু শুদ্ধ এই কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধ এই গুরুস্ফূর্ত্তির কারণ নহে। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইবার অব্যবহিত পরক্ষণ হইতে গুরুদেহের চিদ্গত নির্ম্মল পরা প্রকৃতি শিষ্যদেহে সর্ব্বদাই অখণ্ডিত অবস্থায় অনুপ্রাণিত হইতে থাকে। শিষ্যের দেহ মন প্রাণ যে পরিমাণে নির্ম্মল, সেই পরিমাণে সেই অনুপ্রাণিত চিদ্গত নির্ম্মল প্রকৃতি শিষ্যদেহের সঙ্গে সুমিশ্রিত হইয়া—তাহার ভাবাঙ্গ—তাহার অন্তরস্থ গঠন করিতে থাকে। তন্নিবন্ধন শিষ্যের হৃদয় মন প্রাণ সেই অখণ্ড সম্বন্ধ সূত্রে গুরুদেহের অভিমুখে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইতে থাকে। গুরুদেহ হইতে যে নির্ম্মলাংশ অখণ্ডিত অবস্থায় নিঃসৃত হইয়া অনুক্ষণ শিষ্যদেহের ভাবাঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, এবং তাহাকে সর্ব্বদা পোষণ করিতেছে, তাহার যে স্বভাবতই মূল আকরের দিকে গুরুদেহের দিকে—আকর্ষণ থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গুরু শিষ্যের মধ্যে এরূপ অমোঘ অখণ্ড সম্বন্ধ যোগ থাকাতে শিষ্যের নির্ম্মল চিত্তে স্বভাবতই, গুরু ভক্তি গুরু অনুরাগ ও গুরু সঙ্গ পীপাসা জন্মিয়া থাকে, এবং এই অমোঘ অখণ্ড সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হেতু গুরুদেহের সঙ্গে প্রগাঢ় ভাবযোগ সমুৎপন্ন হইয়া, অন্তরে এই গুরুস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এই গুরুস্ফূর্ত্তি কেবল যে অপরিহার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী তাহা নহে, তাহা শিষ্যের সুসিদ্ধি লাভের পক্ষে—বিমল প্রেমভক্তি, প্রকৃত ভজনতত্ত্ব, চিদ্গত নির্ম্মল অবস্থা লাভের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যদিও প্রবর্ত্তাবস্থায় কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে অন্তরে আনন্দস্ফূর্ত্তি ও ভাব রস থাকে বটে, কিন্তু তাহা কেবল প্রবর্ত্তাবস্থারই স্বধর্ম্ম হেতু। সাধনাবস্থায় এই রাধাস্ফূর্ত্তি—

গুরুস্ফূর্ত্তি না সহকারী হইলে আনন্দস্ফূর্ত্তি ও ভাব লাভ করিয়া যায়। শুদ্ধ নিরাকার কৃষ্ণ চিন্তায়, শুদ্ধ অদৃশ্য চিৎ-সত্তার ভাবনায় অন্তরে কেবল মাত্র তেজের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি অন্তর্চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি কেবল মাত্র তেজেতে পরিণত হয়। পরিণামে এই তেজ প্রভাবে বিবিধ প্রকার চিৎ-শক্তির বিকাশ সংঘটনা হইয়া অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, অথবা যদি এই অষ্টসিদ্ধির বিকাশকে অবহেলা করিয়া বাধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই আবির্ভূত তেজঃপ্রভাব প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান বা সোহং জ্ঞান লাভের কারণ হয়। প্রবর্ত্তাবস্থার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, পূর্ণকালে রাধাস্ফূর্ত্তির সাহায্য না পাইলে, এই শুষ্ক নীরস পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শুদ্ধ অদৃশ্য ভাবনায় প্রকৃত প্রেমভক্তি, প্রকৃত ভজনতত্ত্ব, প্রকৃত গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব ভজন কখনই মিলিতে পারে না। সাধনাবস্থায় যে ভাব লাভের অভাব হয়, এই রাধাস্ফূর্ত্তি এই গুরুস্ফূর্ত্তি হেতু সেই অভাব অপর্য্যাপ্তরূপে পূর্ণ হইয়া থাকে। গুরুদেহ শুদ্ধ নির্ম্মল চিদ্গত পরাপ্রকৃতি মাত্র; সেই দেহ ভগবৎ লীলার নিত্যক্ষেত্র; সেই দেহে নির্ম্মল মাধুর্য্যের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইয়া থাকে; প্রেমভক্তির অযত্নসিদ্ধ অবিশ্রান্ত স্ফূরণ হইয়া থাকে। এরূপ দেহ অবলম্বন করিয়া নিরঞ্জন অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ, শিষ্য সাধকের নিকট ব্যক্তিরূপে ব্যক্ত হন। সেই অব্যক্ত যুগল, এই ব্যক্তরূপ ধারণ করিয়া সাধকের অন্তরে ব্যক্তিরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়াতে সেখানে ভাবদেহের গঠন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সেই স্ফূর্ত্তির অভাবে সেই ভঙ্গ হইয়া যায় এবং সেই উপকরণে সাধকের তেজঃপ্রভাব বর্দ্ধি হইয়া অষ্টসিদ্ধি অথবা জ্ঞানের স্ফূরণ হইতে থাকে। সাধকের ভাবাঙ্গ যে উপকরণে নির্ম্মিত হয়, তাহা নির্ম্মল চিদ্গত পরাপ্রকৃতি মাত্র। সঞ্চারে কূটস্থ পরাপ্রকৃতির স্ফূর্ত্তি হওয়াতে, প্রবর্ত্তাবস্থায় অন্তরে স্বতই চিদানন্দের সম্ভোগ হইতে থাকে। সেই পরাপ্রকৃতি স্বভাবতই বিকারপ্রবণ, সাধনাবস্থায় রাধা বা গুরুস্ফূর্ত্তির সাহায্য না পাইলে, সেই পরাপ্রকৃতি ও তন্নির্ম্মিত অসম্পূর্ণ অবস্থা ভাবাঙ্গ স্বভাবতই মায়া ও অবিদ্যা প্রকৃতিতে বিকৃত হইয়া যায়। গুরুদেহ হইতে যে নির্ম্মল পরাপ্রকৃতি অনুপ্রাণিত হইয়া আইসে, তাহাও সেই ভাবাঙ্গের বিকৃতি হেতু শিষ্যদেহে উপযুক্ত স্থান না পাইয়া অবিলম্বেই সেইরূপ বিকার-গ্রস্ত হইতে থাকে। সুতরাং সেই আধারে সাধনাদি হেতু সেই ভাবাঙ্গের স্থলে মায়া শক্তি বা শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে। পক্ষান্তরে এই গুরুস্ফূর্ত্তি-

হেতু সাধনাবস্থায় এই ভাবাঙ্গ সুচারুরূপে সংগঠিত হইতে থাকে; গুরুদেহ হইতে যে নির্ম্মলাংশ অনুপ্রাণিত হইয়া শিষ্যদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে, তাহা, তাহার ভাবাঙ্গে উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হওয়াতে, আর বিকৃত বা বিষদৃশ পরিণাম প্রাপ্ত হয় না তাহাকেই সুন্দররূপে পোষণ করিতে থাকে।

সিদ্ধ সিদ্ধাবস্থা সম্পূর্ণ হইলে এই ভাব দেহ সচ্চিদানন্দ ময় গুরুদেহ হইয়া প্রকাশ পায়। তখন তাহাতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংস্থান হয়। জীবদেহ গুরুদেহে মিশিয়া যায়; জীবের ইন্দ্রিয় সকল স্বস্ব স্বভাব ভ্রষ্ট হইয়া গুরুদেহের—তুরীয় দেহের নবজাত ইন্দ্রিয় সমূহে লয় পায়। সাধকের এই অন্তরঙ্গ,—এই ভাব দেহ, এই গুরুদেহ, ইন্দ্রিয় সম্পন্ন হইলে পর বাহ্যস্ফূর্ত্তি লাভ হয় তখন জগৎ সাধকের ইন্দ্রিয় দ্বারে স্বরূপে প্রকাশিত হয়। তখন এই নবজাত ইন্দ্রিয়দ্বারে জগতের শব্দ স্পর্শরূপ রস ও গন্ধ সচ্চিদানন্দ ময় অমৃতময়, রাধাময় গুরুময় হইয়া প্রকাশ পায়। প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এক সচ্চিদানন্দ ময় পরমতত্ত্বে পরিণত হয়। আত্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত এক পরতত্ত্বে, গুরুতত্ত্বে আসিয়া অনুপ্রবিষ্ট ও আত্মহারা হয়:

"কে আমি চিনিতে নারি, সখি! কে চিকন কালা?

* * * * * *

যেরূপ মম অন্তরে, নিরখি সই! তাই বাহিরে,
তুমি যে দেখিছ মোরে—পুরুষ কি অবলা?"

এই বাহ্যস্ফূর্ত্তি লব্ধ হইবার পর, প্রকৃত গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব ভজন, সাধকের মধ্যেস্ফূর্ত্তি পায় এবং প্রকৃত মানুষভজন মানুষসেবা ও মানুষ-দরদ জীবনে প্রকাশ পায়। সাধকের এই অবস্থার ভাব দেহ নিত্য কাল অবিকৃত থাকে; মহাপ্রলয়েও তাহা ভঙ্গ হয় না এবং কখনও কোন প্রকার বিসদৃশ পরিণামের অধীন হয় না, তাহা পরা প্রকৃতির অঙ্গে নিত্য বিগ্রহ হইয়া নিত্যকাল অচ্যুত পদে বিরাজ করে।

আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব মতে উল্লিখিত অবস্থাই তাঁহার সাধনের পরিণাম। ইহা হইতে উচ্চ ও উচ্চতর পরিণাম থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি এখন তাহার সংবাদ দানে অশক্ত।

যে ব্যক্তিরাই অভিমুখ বৈরাগ্য প্রণোদিত হইয়া, সদ্গুরু আশ্রয় লাভ করে, সে প্রথমে আশ্রয় লাভ করে, সে প্রথমে অন্তর্পথে কৃষ্ণাভিমুখে প্রেরিত হইলেও তাহার গুরু-অনুরাগ ও গুরু ভক্তি প্রথম হইতেই স্ফূর্ত্তি পায় এবং

সে প্রথম হইতেই গুরু সেবাতে নিরত হয় এবং তাহাতে অপার আনন্দ সম্ভোগ করে। অন্তরে যে কিছু স্ফূর্ত্তি হইতেছে তৎপ্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখে না। গুরুই তাহার সর্ব্বস্বধন গুরুকে ছাড়িয়া,—গুরুর কাছছাড়া হইয়া সে তিলার্দ্ধকাল থাকিতে চাহে না—থাকিতে পারে না। সে এতদিনের পর আপনার প্রকৃত রূপের—আপনার প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছে, এখন তাহার স্বভাবতই সেইরূপ ধ্যান, সেইরূপ জ্ঞান, সেইরূপ সাধনা। কে আপনাকে প্রকৃত আপনা হইতে দূরে রাখিতে পারে? কে আপনার প্রকৃতরূপকে অন্তর হইতে দবত্র রাখিয়া প্রাণধারণ করিতে পারে? কে প্রকৃত আপনা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে? সে প্রকৃত আপনার জনকে কোথায় রাখিবে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারে না। সে তাঁহাকে সহস্র যত্ন করিয়াও যত্ন করিলাম বলিয়া বুঝিতে পারে না, অতি আদরে রাখিয়াও আদরে রাখিয়াছি বলিয়া জানিতে পারে না। সে এখন আপনার প্রকৃত মাধুরীর সন্ধান পাইয়াছে, তাহার প্রাণ এখন সেই দিক্‌পানে অনায়ত্তে দৌড়িতেছে। সে এখন আপনার প্রকৃত মানুষের সন্ধান পাইয়াছে তাহার প্রাণ এখন তাহাকে অন্তরের মানুষ করিবার জন্য দুর্জ্জয় বেগে ছুটিতেছে। গুরু দর্শনে তাহার ভজন, গুরুস্মরণে তাহার ভজন, গুরুর কণ্ঠস্বর শ্রবণে তাহার ভজন, রাগমার্গে ধাবমান হইতে থাকে। পরম নির্ম্মলাবস্থা লাভ করিলেও এ ভজনের বিরাম হয় না, তখন ইহা নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইহাই প্রকৃত রাগমার্গে ভজন। এ ভজনে প্রাণই অগ্রসর;—মনাদি ইন্দ্রিয়গণ তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এ ভজন সকাম বা কামনা-প্রসূত নহে। প্রাণের অনুরাগেই ইহার উৎপত্তি; প্রাণের অনুরাগেই ইহার গতি ও স্ফূর্ত্তি। ইহাই প্রকৃত আত্ম-ভজন, স্বকীয় ভাবে নহে, কিন্তু পরকীয় ভাবে। স্বকীয় ভাবে আত্ম-ভজন স্বসুখ সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু পরকীয় ভাবে আত্ম-ভজন, প্রেম নাম ধারণ করে। মানুষ যে কামনা-প্রণোদিত হইয়া ভজে মানুষ যে মুক্তি মোক্ষ কৈবল্য ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ভজে, তাহা প্রকৃত ভজন নহে। এ সমস্ত ভজনই আত্মসুখ তাৎপর্য্য—স্বার্থ সাধন—কাম্য সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃত যে আত্ম প্রেম, তাহা কদাপি স্বকীয় ভজনে স্ফূর্ত্তি পাইবার নহে;—তাহা একমাত্র পরকীয় ভজনে স্ফূর্ত্তি পায়। সে পর,পর নহে, সে প্রকৃত আপনি। যে ব্যক্তি অন্তরে স্বকীয় অভিসন্ধি লইয়া

ইচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া, কাহাকে ভজে তাহা প্রকৃত ভজন নহে। প্রকৃত ভজন অকামে প্রাণের দুর্জ্জয় আকর্ষণে,রাগমার্গে, অকারণে, সম্পাদিত হইয়া থাকে। সে যাহাকে ভজে সে পরদেহস্থ হইলেও তাহার প্রকৃত পর নহে,—সে তাহার সম্পূর্ণ স্বরূপ সে তাহার সম্পূর্ণ নির্ম্মলাত্মা। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব মতে নির্ম্মলাত্মাই মানুষের প্রকৃত ভজনীয় সামগ্রী। তাহা আপনার মধ্যে মেলে না, সৃষ্টির জড়রাজ্যে মেলে না, উদ্ভিদ রাজ্যে মেলে না,—জৈবিক বিকাশেও মেলে না,—মেলে শুদ্ধ নির্ম্মল মানুষের মধ্যে। সে মানুষ ঐতিহাসিক নির্ম্মল মানুষ হইলে চলিবে না, নির্ম্মল মানুষের প্রপঞ্চ-মুক্ত বিদেহ আত্মা হইলেও চলিবে না, সে মানুষ প্রপঞ্চ দেহধারী বর্ত্তমান নির্ম্মল মানুষ হওয়া চাই, সে মানুষ সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও অতীত হওয়া চাই; কায়াস্থ থাকিয়াও মায়ার পারস্থ হওয়া চাই। সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর হইতে সমস্ত চেতন পদার্থ সকামে মোহিত—সকলেই স্বকীয় ভাবে বিমুগ্ধ সকলেই চিদ্বিমুখ। তাহাদিগকে ভজিলে কামনা পূর্ণ হয়, কিন্তু নির্ম্মল চৈতন্য স্ফূর্ত্তি হয় না, চিদ্গত অবস্থা লাভ হয় না। সৃষ্টির এ পারে চিদ্গত নির্ম্মল মানুষই চিদ্গত নির্ম্মল অবস্থায় লইয়া যাইবার একমাত্র কাণ্ডারী। যে ব্যক্তি ভাগ্যবলে এমন নিধি প্রাপ্ত হইয়াছে বিধিমার্গে সকাম ভজন তাহার ছাড়িয়া গিয়াছে এবং সুবিমল রাগমার্গই তাহার একমাত্র ধর্ম্ম মার্গ হইয়াছে। "সে রাগমার্গে ভজে ছাড়ি বৈকুণ্ঠ বৈভব।" "ভজে তায় অন্তরেতে, মজে রয় তায় দিনে রেতে ত্যজে তায় কোন মতে, কুলে রইতে পারে না।" "ব্রজের যত ব্রজাঙ্গনা, তাদেরই এইরূপ ভাবনা, মনে হ'লে কে বা শোনা, ধড়ে চেতন থাকে না।"

বৈষ্ণব মতে ইহাই রাগমার্গে ভজন। এ রাগ অকারণ অনুরাগ, এ ভজন অকারণ ভজন। এ ভজন বেদ বিধিতে মেলে না। ইহা বেদ বিধির অতীত। লৌহ যেমন চুম্বকের অভিমুখে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় এবং অবশেষে তৎসংসর্গে ও তৎপ্রভাবে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। এ ভজনে সমল মানুষ প্রাপ্তকালে নির্ম্মল মানুষের প্রতি অকারণে প্রেমানুরাগে আকৃষ্ট হয় এবং অবশেষে তৎসংসর্গে ও তৎপ্রভাবে পরম নির্ম্মলত্ব লাভ করিয়া তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে নিত্যকাল গাঁথিয়া রাখে। এ ভজনে কি অপরূপ—কি চমৎকার লীলা-দেদীপ্যমান! ঠাকুর এখানে লীলাদেহ ধারণ করিয়া আপনি আপনাকে ভজিতেছেন! ঠাকুর এখানে এক লীলাদেহে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গুরু ভাবে শিষ্য বাৎসল্যে পরিপূর্ণ হৃদয় এবং অপর লীলাদেহে বিরাজিত

থাকিয়া শিষ্যভাবে গুরুসেবা ও গুরুভক্তি পরায়ণ এবং রাই আমায় কৃপাকর বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রোরুদ্যমান! এ ভজনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সকামে বিমোহিত জনে কি বুঝিবে? এখানে "রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুইরূপ ধরি, অনন্যো বিহরে সুখ আস্বাদন করি।" ইহা নরপূজা নহে;—ইহা বৃন্দাবন লীলা;—ইহা সুনির্ম্মল রাস লীলা। ইহা পরের অধীনতা নহে;—ইহা লীলাভাবে পরদেহস্থ প্রকৃত আপনার অধীনতা। ইহা পরের চরণে স্বকীয় বিবেক ও বুদ্ধির বিসর্জ্জন নহে;—ইহা পরদেহস্থ প্রকৃত আপনার বিমল বিবেক ও বুদ্ধির অনুগত হওয়া। এখানে পরের আনুগত্য নাই, পরের দাসত্ব নাই, পরের আজ্ঞাধীনতা নাই, পরের ভজন নাই; এখানে ঠাকুর লীলাময় হইয়া প্রকৃত আপনার অনুগত আপনি হইতেছেন, প্রকৃত আপনার দাসত্ব আপনি করিতেছেন, প্রকৃত আপনার আজ্ঞাধীন আপনি হইতেছেন, প্রকৃত আপনার ভজন আপনি করিতেছেন।—এখানে ঠাকুর লীলার্থ দ্বিরূপধারী হইয়া আপনার প্রেম আপনি আস্বাদন করিতেছেন। নতুবা এ সংসারে গরজ ভিন্ন কে কারে ভজে বা ভজিতে পারে। "তুমি তার, সে তোমার, অভেদ অঙ্গ পরস্পর, পরের পরিশ্রম সার, পায় না তোমারে; ফিকিরে বঞ্চিত কর ন্যায় ব্যবহারে।" পর, বিনা গরজে কখনও পরের ভজন করে নাই ইহা অভ্রান্ত ও সমীচীন কথা।

বেদান্তের শুষ্ক নীরস ব্রহ্মজ্ঞান এইরূপে অতি আশ্চর্য্যভাবে ও অনির্ব্বচনীয় কৌশলে পরকীয় প্রেমে ও সুনির্ম্মল ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে; ভজনহীন সোহংবাদ, সুমধুর গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব ভজনে অনুবাদিত হইয়াছে; প্রেমরসাস্বাদন বিমুখ ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপের রাধাস্তজীবন, রাধাগত, ভক্তিমাখা, প্রেম কলেবর গৌরাঙ্গে পরিণত হইয়াছে; তুরীয় ধামের নিরঞ্জন প্রকৃতি ও পুরুষ ভক্তের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, প্রেমলীলা উদ্‌যাপন করিবার জন্য, এই মায়ার দেশে তুরীয়স্রোত রক্ষা করিবার জন্য একাধারে,—একাকারে,—নির্ম্মল প্রপঞ্চ দেহবিশিষ্ট হইয়াছে। এই রাগমার্গীয় ভজনের কথা বলিবার কথা নহে। উপরে যাহা কিছু ব্যক্ত হইল তাহাতে এই ভজনের গুরুত্ব ও মহত্ব সকলই অব্যক্ত রহিল। এই গুরুতর বিষয় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা মাদৃশ অনভিজ্ঞজনের পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা মাত্র। বস্তুত ইহার বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ।

যাহাদের বৈরাগ্য কৃষ্ণাভিমুখে স্ফূর্ত্তি পাইয়া স্থির হইয়াছে, তাহারা যদি ভাগ্য বলে নির্ম্মল মানুষের অনুগত হয় এবং মানসিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহ-

কায়ে আজ্ঞাধীন, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত হইয়া চলে, তাহা হইলে তাহারা একদিন পরম নির্ম্মলাবস্থা লাভ করিতে পারে।

আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব মতে প্রকৃত গুরু-পদাশ্রিত সাধকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহারা ভক্ত বিশেষের অকারণ দুর্জ্জয় আকর্ষণে পড়িয়া সেই ভক্তের অনুগত হয়েন এবং অতি সহজে তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া সকল বন্ধন ছিন্ন করত সকল বাধা অতিক্রম করত ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করেন এবং সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বস্ত চিত্তে তাহার আজ্ঞা পালন করেন তাঁহারাই প্রথম বা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাধক। আর যাঁহারা মুক্তি মোক্ষ পরিত্রাণ, ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বর পিপাসু হইয়া প্রথমত ভক্ত বিশেষের অনুগত ও আজ্ঞাধীন হয়েন কিন্তু সাধন পথে অগ্রসর হইবার সময় সহসা প্রথম সঙ্কল্প বিস্মৃত হইয়া প্রথম লক্ষ্য হইতে দৃষ্টিচ্যুত হইয়া ভক্তপ্রেমে আত্মহারা ও বীতকাম ও বীতসঙ্কল্প হয়েন, তাঁহারা মধ্যম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক। আর যাঁহারা নিম্মল ভক্তানুগত হইয়াও গুরুর প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত দৃষ্টি ও তাঁহার আজ্ঞার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার অভাব হেতু অহেতুক ভক্ত প্রেম উপার্জ্জন করিতে অশক্ত হন এবং তন্নিবন্ধন প্রথম সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্যে চিরদিন সুস্থির থাকেন তাঁহারাই নিকৃষ্ট বা তৃতীয় শ্রেণীর সাধক। উৎকৃষ্ট ও মধ্যম শ্রেণীর সাধকেরা পরকীয় পরম নিম্মলাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হন; আর নিকৃষ্ট শ্রেণীর সাধকেরা স্বভাব দোষে স্বকীয় ভাবে আত্মসুখে সন্তুষ্ট থাকেন। পরকীয় পরম নিম্মলাবস্থা লাভ ইহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণাতে বলিয়াছি, যে, আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের বিশেষ কোন সাধন নাই। তাঁহার সমস্ত সাধনতত্ত্ব ভক্তানুগত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই ভক্তানুরাগে এবং নির্ম্মল ভক্তের সহবাস ও সাক্ষাৎ কৃপা প্রভাবে তাঁহাকে যে আভ্যন্তরিক পথ দিয়া বামমার্গে চলিতে বাধ্য হইতে হয় তাহা একটি নির্দ্দিষ্ট চিহ্নিত পথ। যাঁহারা আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের সৃষ্টি তত্ত্ব আমাদের প্রথম প্রস্তাবে মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন কিরূপে ও কোন্ পথ দিয়া নির্ম্মল পরাপ্রকৃতি চিদ্বিমুখ স্রোতে সৃষ্টির এই অষ্টম বিকৃতির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রলয় কালে কিরূপে এই অষ্টমবিকৃতিগত চিদ্বিমুখ প্রকৃতি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগ্রত হইয়া, চিদভিমুখ আকর্ষণে উপাদান কারণ পরম্পরায় লয়

হইতে হইতে নির্ম্মল পরাপ্রকৃতির অঙ্গে বিমিশ্রিত হইবে। প্রলয়ারম্ভের পূর্ব্বে এই অষ্টম বিকৃতিগত প্রকৃতির কূটস্থ পরা প্রকৃতি সহসা জাগ্রত হইয়া উঠে, সমস্ত জড় জগত সহসা চৈতন্যময় হইয়া উঠে। অবিলম্বেই প্রলয়ের হুঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হইয়া চিদভিমুখ যাত্রা আরম্ভ হয়। ক্রমে প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ গুণ যথাক্রমে প্রবল তমোগুণের প্রকোপে আচ্ছাদিত হইয়া লয় পায়, তমোগুণ স্বকার্য্য-সাধন করিয়া অবিলম্বেই অস্তমিত হয়। সমগ্র প্রকৃতি পুনরায় ত্রিগুণাতীতে নির্ম্মল অবস্থা লাভ করিয়া তুরীয় পরাপ্রকৃতির অঙ্গগত হয়। মানুষ এখন এই চিদ্বিমুখ অষ্টম বিকৃতির মধ্যে। মানুষ যদি তাহার এই চিদ্বিমুখ বিকৃতি ভাব পরিহার করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকেও তুরীয় প্রভাবে জাগ্রত হইয়া চিদভিমুখ স্রোতে স্বস্থান প্রাপ্ত হইতে হইবে। যে পথ দিয়া চিদ্বিমুখ স্রোতে নিম্নাভিমুখে অষ্টম বিকৃতির মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে চিদভিমুখ আকর্ষণে সেই নির্দ্দিষ্ট পথে উর্দ্ধাভিমুখে পুনরারোহণ করিতে হইবে, এক একটি বিকৃতি পরিহার করিয়া অন্তঃশুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। তাঁহার অষ্টমবিকৃতি বদ্ধ জীব চৈতন্যকে সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখিয়া তুরীয় প্রভাবে ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্ব্যোমের বন্ধন অতিক্রম করত অবিদ্যা ও মায়াজাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত পরাপ্রকৃতিগত হইয়া পরম চৈতন্যবান হইতে হইবে। ইহাই আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের সাধন পথ। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব মতে ইহাই মানুষের একমাত্র ধর্ম্মপথ। মুক্তি, নিষ্কৃতি ও পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। নির্ম্মলাবস্থা লাভের একমাত্র পন্থা। মানুষের আর দ্বিতীয় গতি নাই দ্বিতীয় সাধন পথ নাই। "নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" তুমি যদি হিন্দু হও, খৃষ্টান হও, বৌদ্ধ হও, মুসলমান হও; তুমি যদি মুক্তি, মোক্ষ, পরিত্রাণ বা নির্ম্মলাবস্থা লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি এই পথদিয়া চলিয়াই তাহা লাভ করিয়াছ। অথবা যদি তুমি মুক্তি, মোক্ষ, পরিত্রাণ বা নির্ম্মলাবস্থার আকাঙ্খী হও, তোমার এই পথ দিয়া চলা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। যিনি এপথে পদার্পণ করেন নাই তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মের বর্ণমালাও আরম্ভ হয় নাই। যাঁহার প্রাণ ও দৃষ্টি চিদভি-মুখ স্রোতের আকর্ষণে অন্তর্ম্মুখ হইতে পারে নাই তাঁহার ধর্ম্ম-সাধন সংসার সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষ যে সমস্ত কারণে বদ্ধজীব হইয়া পড়িয়াছে সে সমস্ত কারণ অতিক্রম করা ভিন্ন আর কিরূপে তাহার নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে? যে পথ দিয়া এই মায়ার দেশে আসিয়াছে সেই

পথে প্রত্যাবর্ত্তন ভিন্ন তাহার সধামস্থ হইবার আর কি উপায় থাকিতে পারে? মানুষ শাস্ত্র পাঠে বা সাধুর মুখে এই পথের সন্ধান পাইয়া, তাহা স্বকীয় অথবা পরকীয় শক্তিবলে বা বুদ্ধি বা সাধন কৌশলে আয়ত্ত করিবার জন্য কত প্রকার ষট্‌চক্রভেদী যোগমার্গ আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু মায়ার দুর্জ্জয় বন্ধনী সকল স্বকীয় অথবা পরকীয় শক্তি বলে ছেদন করিয়া উর্দ্ধপথে আরোহণ করা জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। তুরীয় আকর্ষণ ও তুরীয় সাহায্য ভিন্ন এই চিদভিমুখ উর্দ্ধপথে আরোহণ করা আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব মতে ঈশ্বরাদি পক্ষেও অসাধ্য। জীব অথবা ঈশ্বর সকলেই সৃষ্টিকাল হইতে বহির্ম্মুখ। অন্তরে তুরীয় সৌন্দর্য্য প্রতিভাত না হইলে কাহারও দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী হইতে পারে না এবং তুরীয় আকর্ষণও সাহায্য ভিন্ন কেহই সেই অন্তর্পথে চলিয়া স্বধামস্থ হইতে পারে না। এই পথে আপনা আপনি নামিয়া আসা যায় কিন্তু কোন কৌশলে আপনা আপনি কি জৈবিক বা ঐশ্বরিক সাহায্যে উঠিতে পারা যায় না।

হরিদ্বার।

শুয়ে হিমালয় দিগন্ত ব্যাপিয়া
উঠে শৃঙ্গমালা গগন ভেদিয়া
স্তরে স্তরে যেন সোপান বাঁধিয়া
ঘেরেছে স্বর্গের পথ।

দেখিতে সুন্দর শিখর উপর
রবিকরে ছায়া খেলে স্তরেস্তর
সুদূর শূন্যেতে ধবলা ভূধর
কিরণে যেন রজত॥

পৃষ্ঠদেশে শৈল শিবালিক শ্রেণী,
কলকল নাদে চলে সপ্তবেণী,
দ্বীপপুঞ্জে সাজি সুরতরঙ্গিনী
নামিছে ধরণী গায়।

হরিদ্বার বুকে ধারা পড়ে ঝরি,
ছাড়িতে না চায় রাখে কোলে ধরি,
আরো যেন তায় কলকল করি
প্রসারে জাহ্নবী কায়।
মনোহর বেশ পুরী হরিদ্বার,
চণ্ডীর পাহাড় শোভে পরপার,
নীলধারা চলে ধারে ধারে তার,
চূড়াতে চণ্ডীর মঠ।
গগনের কোলে দিবানিশি স্থির
শ্বেত ক্ষুদ্রকায় দেবীর মন্দির,
দূরলক্ষ্য সদা সে মঠ-শরীর
শূন্যে কি সুন্দর পট!
হরিপদ চিহ্ন ধরিয়া শরীরে *
হরি-গৌরি-ঘাট শোভে গঙ্গাতীরে
পরশনে শুচীদেহ যার নীরে
স্নানে পুনর্জন্ম ক্ষয়
কুম্ভমেলা যোগে যে ঘাট উপর
লক্ষ লক্ষ প্রাণী—ফিরে নিরন্তর
বহে যেন তাহে প্রাণীর সাগর
দুকূল অদৃশ্য হয়।
সে মেলা সংযোগে যে নাম শুনিয়া
জাগে হিন্দুজাতি ভারত ভরিয়া
চলে নদী বন কন্দর ভাঙিয়া
সুদৃঢ় কামনা ধ'রে
কিবা সে সন্ন্যাসী মুনি মৌনী নর
কিবা সাধুজন পাষণ্ড পামর
জাতি বর্ণভেদ সকলি অন্তর
সবাই আনন্দে ভরে॥

* আদিঘাট উহাকে ব্রহ্মকুণ্ডও বলে। এখানে মেলার সময় স্নান করিতে হয়।

সেই পুণ্যক্ষেত্র অঙ্কেতে তোমার
পুণ্যভূমি সার তুমি হরিদ্বার
মহাতীর্থ যত (মধ্যে তুমি তার)
চৌদিকে বিরাজ করে।

তোমারি সে কোলে মন্দাকিনী জল
সুখে চিরদিন বহে নিরমল
তোমারি সম্মুখে নীল গিরিস্থল,
বিস্তৃত পশ্চিমে স'রে॥

উত্তরে তোমার বদরিকা স্থান
ঋষিকুল যেথা কৈলা সামগান,
কেদার মাহাত্ম্য আজো সে সমান,
গঙ্গোত্রি আরো সে আগে।

দক্ষিণে কংখল সতীদাহ স্থল,
দক্ষ প্রজাপতি যেখানে ছাগল,
হায় রে সে দিন হলো কত কাল,
সে কুণ্ড আজিও জাগে॥

কে বলে পুরাণ তোমার আখ্যান
মূলহীন বাক্য কল্পনার ভাণ
ভারত মণ্ডলে ভ্রমি যত স্থান
আজো সত্য হেরি সব।

তব তথ্য মূলে মিথ্যা কিছু নাই,
আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি এখনও রে তাই,
আগেকারি মত সব চিহ্ন পাই
যেখানে যা কিছু তব॥

তোমারি কোলে সে গঙ্গার উদ্ভব
চলেছেন সুখে করি কলরব,
ছড়ান ভারতে সুশস্য পল্লব,
আজো তাঁর দয়া সেই।

সেই হৃষিকেশ অদূর শোভিছে
বাল্মীকির বন আজো বিরাজিছে
হিমালয় কোলে আজো সে ঢুলিছে
লছমন ঝোলা সেই।
দেবপুণ্যভূমি তুমি হরিদ্বার
এত দিন পরে জানিলাম সার
তুমি স্বর্গপথ ধরণী মাঝার
জানিনু আগে যা ছিল।
জানিলাম হায় আমরা সে মরা
ভারত কতকাল কালগর্ভে ভরা
জানিলাম আরো বৃথা আশা করা,
কালেতে সকলি নিল॥
এত দিন পরে জানিলাম মাতঃ!
ভারত আগে কি ছিল!

প্রীতি।

শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থের ভক্তি ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তাহা এই অনুশীলন ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবত পুরাণেও ভক্তিতত্ত্বের অনেক কথা আছে। কিন্তু ভগবদ্গীতাতেই সে সকলের মূল। এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থেও যাহা আছে সেও গীতামূলক। অতএব সে সকলের পর্য্যালোচনায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু অনুশীলন ধর্ম্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ আছে। অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

---

* হৃষিকেশের উত্তর ইহার নাম তপোবন।

শিষ্য। তবে এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন।

গুরু। ভক্তিবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে প্রীতিরও আসল কথা বলিয়াছি। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। অন্য ধর্ম্মের এ মত হোক না হোক, হিন্দু ধর্ম্মের এই মত। প্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্রণালী আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় আর একটি আধ্যাত্মিক বা ভারতবর্ষীয়। আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বুঝি তাহা বুঝাইতেছি। প্রীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি প্রীতি আমাদের স্বভাব সিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামির স্বামির প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর প্রভুর প্রতি ভৃত্যের বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই তাহাই প্রীতি। পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে স্বতই প্রবৃত্ত, এইজন্য পরিবার হইতে প্রথম প্রীতি বৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধার্ম্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তাই হিন্দু শাস্ত্রকারেরা শিক্ষানবিশীর পরেই গার্হস্থ্য আশ্রম অবশ্য পালনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন।

পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে স্ফূরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা করে। বাস্তবিক যে প্রীতিবৃত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় অধিকতর স্ফূরণক্ষম, সুতরাং অনুশীলিত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্রসীমা ছাপাইয়া বাহির হইতে চাহিবে। অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত ও আশ্রিতে গোষ্ঠীতে, গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতেও অনুশীলন থাকিলে ইহার স্ফূর্ত্তিশক্তি সীমা প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ, মনুষ্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয় তখন ইহা সচরাচর দেশ-বাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এইবৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। হইলে ইহা জাতি বিশেষের বিশেষ মঙ্গলের

কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রীতিবৃত্তির এই অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা যায়। ইউরোপীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশি হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ।

শিষ্য। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাই তাহার কারণ কি আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন?

গুরু। উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম্ম বিশেষত পূর্ব্বতন ইউরোপের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মত উন্নত ধর্ম্ম নহে, ইহাই সেই কারণ। একটু সবিস্তারে সেই কথাটা বুঝাইতেছি তাহা শুন।

দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির স্ফূর্ত্তির চরমসীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। যতদিন প্রীতির জগৎপরিমিত স্ফূর্ত্তি না হইল ততদিন প্রীতিও অসম্পূর্ণ—ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ।

এখন, দেখা যায়, যে, ইউরোপীয়দিগের প্রীতি আপনাদের স্বদেশেই পর্য্যবসিত হয় সমস্ত মনুষ্য লোকে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভালবাসেন, অন্য জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব। অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, তাহারা স্বধর্ম্মীকে ভাল বাসে বিধর্ম্মীকে দেখিতে পারে না। মুসলমান ইহার উদাহরণ। কিন্তু ধর্ম্ম এক হইলে জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ করে না। মুসলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য; কিন্তু ইংরেজ খ্রীষ্টিয়ান ও রুষ-খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে বড় গোলযোগ।

শিষ্য। এস্থলে মুসলমানেরও প্রীতি জাগতিক নহে ইউরোপের প্রীতিও জাগতিক নহে।

গুরু। মুসলমানের প্রীতি বিস্তারের নিরোধক তাহার ধর্ম্ম। জগৎশুদ্ধ মুসলমান হইলে জগৎশুদ্ধ সে ভাল বাসিতে পারে, কিন্তু জগৎশুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হইলে, জর্ম্মাণ জর্ম্মাণ ভিন্ন, ফরাসি ফরাসি ভিন্ন আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য কথা এই,—ইউরোপীয় প্রীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠিতে পারেনা কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে হইবে প্রীতিস্ফূর্ত্তির স্বাভাবিক বিরোধী কে? প্রীতির বিরোধী আত্মপ্রীতি। পশুপক্ষির ন্যায় মনুষ্যেতে আত্মপ্রীতিও অতিশয় প্রবলা। প্রীতির অপেক্ষা আত্মপ্রীতি প্রবলা। এই জন্য উন্নত

ধর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শাসিত না হইলে প্রীতির বিস্তার আত্মপ্রীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরে প্রীতি যতদূর আত্মপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত হয় ততদূরই তাহার বিস্তার হয়, বেশি হয় না। এখন পারিবারিক প্রীতি আত্মপ্রীতির সঙ্গে সুসঙ্গত; এই পুত্র আমার, এই ভার্য্যা আমার, ইহারা আমার সুখের উপাদান এইজন্য আমি ইহাদের ভালবাসি। তারপর কুটুম্ব, বন্ধু, স্বজন, জ্ঞাতি, গোষ্ঠী, গোত্র ও আমার, আশ্রিত অনুগত ইহারাও আমার, ইহারাও আমার সুখের উপাদান এই জন্য আমি ইহাদের ভালবাসি। তেমনি, আমার গ্রাম, আমার নগর, আমার দেশ আমি ভাল বাসি। কিন্তু জগৎ আমার নহে জগৎ আমি ভাল বাসিব না। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহার দেশ আমার দেশ হইতে ভিন্ন, কিন্তু এমন কেহই নাই যাহার পৃথিবী আমার পৃথিবী হইতে ভিন্ন। সুতরাং পৃথিবী আমার নহে আমি পৃথিবী ভাল বাসিব কেন?

শি। কেন? ইহার কি কোন উত্তর নাই?

গুরু। ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। ইউরোপে হিতবাদিদের "Greatest good of the greatest number," কোমতের Humanity পূজা, সর্ব্বোপরি খ্রীষ্টের জাগতিক প্রীতিবাদ, মনুষ্য মনুষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে।

শি। এই সকল উত্তর থাকিতে বিশেষ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে ইউরোপে প্রীতি দেশ ছাড়ায় না কেন?

গুরু। তাহার কারণানুসন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম্ম ছিল না, যে পৌত্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তিমানের পূজা মাত্র, তাহার উপর আর কোন উচ্চধর্ম্ম ছিল না। জগতের লোক কেন ভাল বাসিব, ইহার কোন উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের প্রীতি কোন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই দুই জাতি অতি উন্নতস্বভাব আর্য্যবংশীয় জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহত্বগুণে তাহাদের প্রীতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতী ও মনোহারিণী হইয়াছিল। দেশবাৎসল্যে এই দুই জাতি পৃথিবীতে বিখ্যাত।

এখন আধুনিক ইউরোপ খ্রীষ্টিয়ান হোক আর যাই হোক, ইহার শিক্ষা প্রধানত প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে। গ্রীস ও রোম ইহার চরিত্রের

আদর্শ। সেই আদর্শ আধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে যীশু ততদূর নহে। আর এক জাতি আধুনিক ইউরোপীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। য়িহুদী জাতির কথা বলিতেছি। য়িহুদী জাতিও বিশিষ্ট রূপে দেশবৎসল, লোক বৎসল নহে। এই তিন দিকের ত্রিস্রোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইয়া পড়িয়াছে লোকবৎসল হইতে পারে নাই। অথচ খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ইউরোপের ধর্ম্ম। তাহাও বর্ত্তমান। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম এই তিনের সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই রহিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল অন্তরে ও কার্য্যে দেশবৎসল মাত্র। কথাটা বুঝিলে?

শিষ্য। প্রীতির বৈজ্ঞানিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম ইহাতে প্রীতির পূর্ণস্ফূর্ত্তি হয় না। দেশ বাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না তায় আত্মপ্রীতি আসিয়া আপত্তি উত্থাপিত করে, যে, জগৎ ভাল বাসিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ কি সম্পর্ক? এক্ষণে প্রীতির পারমার্থিক বা ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের মর্ম্ম কি বলুন।

গুরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবর্ষীয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি তাহা মনে করিয়া দেখ। খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জর্ম্মণি বা রুষিয়ার রাজা, সমস্ত জর্ম্মাণ বা সমস্ত রুষ হইতে একটা পৃথক ব্যক্তি, খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বরও তাই। তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃথক থাকিয়া রাজ্যপালন রাজ্যশাসন করেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এবং লোকে কি করিল পুলিষের মত তাহার খবর রাখেন। তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইলে পার্থিব রাজাকে ভাল বাসিবার জন্য যেমন প্রীতিবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে হয় তেমনই করিতে হয়।

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্ব্বভূতময়। তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড়জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক, কিন্তু জগৎ তাঁহাতেই আছে। যেমন সূত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাঁহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিদ্যমান। আমাতে তিনি বিদ্যমান। আমাকে ভাল বাসিলে তাঁহাকে ভাল বাসিলাম। তাঁহাকে না ভালবাসিলে আমাকেও ভাল বাসিলাম না। তাঁহাকে ভাল বাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভাল বাসিলাম। সকল মনুষ্যকে না ভাল বাসিলে, তাঁহাকে ভালবাসা হইল না আপনাকে ভালবাসা হইল না। অর্থাৎ সমস্ত জগৎ

প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগতই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে সর্ব্বলোকে আর আমাতে অভেদ ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের মূলেই আছে, অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই। ভগবানের সেই মহাবাক্য পুনরুক্ত করিতেছি:—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মানি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়িপশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্যতি।

"যে যোগযুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে দেখেও সর্ব্বত্র সমান দেখে, যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে, আমাতে সকলকে দেখে আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।

* এই ধর্ম্ম বৈদিক। বাজসনেয় সংহিতোপনিষদে আছে।

স্থূল কথা, মনুষ্যে প্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই; ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধর্ম্মে অভিন্ন, অভেদ্য। ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে ইহা দেখাইয়াছি; ভগবদ্গীতা এবং বিষ্ণু পুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্র হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে ইহা দেখিয়াছ। প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, শত্রুর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, "শত্রু কে? সকলই বিষ্ণু (ঈশ্বর) ময়, শত্রু মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়!' প্রীতিতত্ত্বের এইখানে একশেষ হইল। এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্ম্মের উপর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা করি। প্রহ্লাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে যে

যস্তু সর্ব্বাণিভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানস্ততোন বিজুগুপ্সতে।
যস্মিন্ সর্ব্বাণিভূতান্যেষ্মৈ বাভূদ্বিজানতঃ,
ত একো মোহঃ কঃশোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

ভক্তি শাস্ত্রেরও মূল—বেদে। তাই হিন্দুধর্ম্ম যে বেদমূলক একথা সর্ব্বাংশে সঙ্গত।

সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা পুনর্ব্বার স্মরণ কর। স্মরণ না হয় গ্রন্থ হইতে পুনর্ব্বার অধ্যায়ন কর। তদ্ব্যতীত হিন্দু ধর্ম্মোক্ত প্রীতিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। এই প্রীতি জগতের বন্ধন, এই প্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশূন্য বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ড সকলের সমষ্টি মাত্র। প্রীতি না থাকিলে পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত, অনেক কাল হয় ত পৃথিবী মনুষ্যশূন্য, নয় মনুষ্য লোকের অসহ্য নরক হইয়া উঠিত। ভক্তির পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চবৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে প্রীতিতেও তেমনই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,—বৃত্তি স্বরূপ জগদাধার হইয়া তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞানে আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং অজ্ঞানেই আমাদিগকে ভক্তি প্রীতি ভুলাইয়া রাখে। অতএব ভক্তি প্রীতির সম্যক অনুশীলন জন্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। ফলে সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলনও সামঞ্জস্য ব্যতীত সম্পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ হয় না।

শিষ্য। এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির ভারতবর্ষীয় বা পরমার্থিক অনুশীলন পদ্ধতি বুঝিলাম। জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়া, জগতের সঙ্গে তাঁহার এবং আমার অভিন্নতা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ক্রমে সর্ব্বলোককে আপনার মত দেখিতে শিখিলে প্রীতিবৃত্তির পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইবে ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মপ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা নাই—কেননা সমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র হইতে পারে না,—সর্ব্বলোক বাৎসল্যই ইহার ফল। বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ফল ইউরোপে কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র জন্মিয়াছে—কিন্তু ভারতবর্ষে কি লোক বাৎসল্য জন্মিয়াছে?

গুরু। আজি কালির কথা ছাড়িয়া দাও। আজি কালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর বড় বেশি হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশবৎসল হইতেছি লোকবৎসল আর নহি। এখন ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। কিন্তু এতকাল তাহা ছিল না; দেশ বাৎসল্য জিনিসটা দেশে ছিল না কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি ভিন্ন ভাব ছিল না। হিন্দু রাজা ছিল, তার পর মুসলমান হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না, হিন্দুর কাছে হিন্দু মুসলমান সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ

রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি, ইংরেজের হইয়া লড়িয়া হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেননা হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে হিন্দু দুর্ব্বল বলিয়া কৃত্রিম প্রভুভক্ত।

শিষ্য। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বা ইংরেজের সিপাহিরা যে বুঝিয়াছিল ঈশ্বর—সর্ব্বভূতে আছেন, সকলই আমি, একথা ত বিশ্বাস হয় না।

গুরু। তাহা বুঝে নাই। কিন্তু জাতীয় ধর্ম্মে জাতীয় চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় চরিত্র বুঝে না সেও জাতীয় ধর্ম্মের অধীন হয়, জাতীয় ধর্ম্মে তাহার চরিত্র শাসিত হয়। ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে, যে কয়জন বুঝে তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধর্ম্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে তাহার বেশি ভরসা আমি এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে মনস্বীগণ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হইলে ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্ম্মের মুখ্যফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয় কিন্তু গৌণ ফল সকলেই পাইতে পারে।

শিষ্য। তার পর আর একটা কথা আছে। আপনি যে প্রীতির পারমার্থিক অনুশীলন পদ্ধতি বুঝাইলেন তাহার ফল এই লোক বাৎসল্যে দেশ বাৎসল্য ভাসিয়া যায়। কিন্তু দেশ বাৎসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে।

গুরু। সেই নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের দ্বারাই হইবে। যাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে। যে কর্ম্ম ঈশ্বরানুমোদিত তাহাই অনুষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পরপীড়িতের রক্ষা, অনুন্নতের উন্নতি সাধন সকলই ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম সুতরাং অনুষ্ঠেয়। অতএব নিষ্কাম হইয়া আত্ম রক্ষা, দেশরক্ষা, পীড়িত দেশীয়বর্গের রক্ষা, দেশীয় লোকের উন্নতি সাধন করিবে।

শিষ্য। নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আত্মরক্ষাইত কাম্য।

গুরু। যদি আত্মরক্ষার অনুষ্ঠান কালে তোমার মনের ভাব এরকম হয়, যে, "আত্মরক্ষা ঈশ্বরানুজ্ঞাত, সুতরাং অনুষ্ঠেয় বলিয়া করিতেছি;

রক্ষা সিদ্ধ হউক বা না হউক, আমার পক্ষে সে তুল্য কথা, তবে তাঁহার কার্য্য তাঁহার ভৃত্য স্বরূপ আমি যতদূর সাধ্য করিব, এই পর্য্যন্ত।" তাহা হইলে আত্মরক্ষা নিষ্কাম হইল। রোমক ইতিহাসে কথিত আছে, যে, রেগুলস কার্থেজীয়দিগের সঙ্গে রোমকদিগকে সন্ধি করিবার পরামর্শ দিতে স্বীকৃত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে অসম্মত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ভগবদ্গীতা না পড়িয়াও এ ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্মী। কিন্তু কোন সদুপায়ে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে রেগুলস্ যে করিতেন না, এমত নহে।

ত্রিগুণ ও সৃষ্টি।

২২। জগৎ সম্বন্ধে আমরা কি জানিতে পারি।

ভূত সম্বন্ধে আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মত কি তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তাঁহারা স্বীকার করেন যে কোন একরূপ শক্তির বিকার বিশেষে প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হইয়া তাহা হইতেই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, একথা বুঝান হইয়াছে। এ বিষয়ে সাংখ্যমতের সহিত যে আধুনিক পাশ্চাত্য মতের কোন প্রভেদ নাই তাহাও দেখান হইয়াছে। এক্ষণে আর্য্য পণ্ডিতগণ কেন রাসায়ণের পঁয়ষট্টি ভূতের পরিবর্ত্তে পাঁচটি মাত্র মূলভূত বিশ্বাস করিতেন তাহা দেখাইব।

একথা বুঝাইতে হইলে আধুনিক দর্শনের একটা গূঢ়তত্ত্বের অবতারণা করা আবশ্যক। আমরা এই বাহ্য জগৎ কিরূপে জানিতে পারি—এবং তাহার কতটুকুই বা জানিতে পারি—তাহা বুঝা উচিত। একথা বুঝিতে হইলে দর্শনের মায়াবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ বুঝিতে হয়। কিন্তু এস্থলে সে বিস্তৃত বিষয়ের অবতারণা না করিয়া এক্ষণকার দার্শনিকগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে মায়াবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ সামঞ্জস্য করিয়া যেমত স্বীকার করেন তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

এক্ষণে অধিকাংশ দার্শনিক পণ্ডিতই বিশ্বাস করেন যে বাহ্য জগতের স্বরূপ কি তাহা আমরা জানি না - অথবা সামান্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জানিতে পারি না। আমরা কেবল আমাদের মনের অবস্থা (states of concious-ness বা modes of feeling) উপলব্ধি করি—মনের মধ্যে যে ভাব পরম্পরা

উদয় হয়—যে ক্রিয়া জ্ঞান হয়, -তাহাই অনুভব করি মাত্র। (১) আর কিছুই প্রত্যক্ষ করি না—আর কিছুই জানিতে পারি না। বাহ্য জগৎ কি, পরমাণু কি, শক্তি কি, গতি কি,—মানসিক ভাব ব্যতীত তাহাদের আর কিছু আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়াছেন,

We class experiences and inferences under the general head of Matter and Motion and thus form conception of objects and forces.

G. H. Lewis.

. কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের দেশের শুন্যবাদী বৌদ্ধগণ অথবা শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে বেদান্তবাদীগণ যে জগৎ মিথ্যা মায়াময় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—অথবা ইউরোপে হিউম, ফিক্তে, হিগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে জগতকে মিথ্যাস্বপ্ন কল্পনা করিয়াছেন আমরা সে জগতকে মিথ্যা বলিতে পারি না। এই অজ্ঞাত জগতের অন্তরালে এরূপ কিছু নিহিত আছে, যাহার সহিত মনের ঘাত প্রতিঘাতেই মানসিক ভাব পরম্পরার পরিবর্ত্তন হয়; তাহা হইতেই আমাদের বাহ্য জগতের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। সত্য বটে, আমাদের চিত্তবৃত্তির বিপর্য্যয় (illusion) বিকল্প (idea without reality) নিদ্রা (বা স্বপ্ন) ও স্মৃতি (memory) এই চারি অবস্থায় (পাতঞ্জলদর্শন ১৬ সূত্র দেখ।) বাহ্য জগতের যে স্পষ্ট অথবা ধূয়া ধূঁয়া ভাব উদয় হয়, তাহাতে বাহ্য জগতের কোনরূপ স্বতন্ত্র সত্তা দ্বারা আমাদের এসকল বৃত্তিস্ফূরণ হওয়ার আবশ্যক করে না—কিন্তু বৃত্তির প্রমাণের অবস্থায় (অথবা যখন আমাদের মন বাহ্য জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়া অনুমান দ্বারা তাহা উপলব্ধি করে সেই অবস্থায়) আমাদের Experience এবং inrefuce করিবার অবস্থায়, বাহ্য জগতের অন্তরালে যে অস্তিত্ব আছে, তাহার সহিত মনের ঘাত প্রতিঘাত হয়। নতুবা প্রায় সকল সময়ে, সকলের মনে অবস্থা ভেদে বাহ্য জগতের সেই একরূপ ভাব উপলব্ধি

(১) জড়বাদী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন,

"What we called the material process is simply the objective aspect of the subjective proeess."

Vide G. H. Lewis, Essay on
Spiritualism and Mtterialism.

হইত না। এই অস্তিত্ব এই permanent possibilities of senstion (J. S. Mill) স্বীকার না করিলে আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। (২) সাংখ্যকারও বাহ্যজগতের এইরূপ অস্তিত্বস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে,

"অবাধাৎ অদুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বম্।১।৭৯

আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণও এই জন্যই বাহ্যজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। (৩) অতএব,

The active antecedent of every primary feeling exists, and that is the only thinkable hypothesis.

Fiskes 'Cosmic Philosophy.'

জগত কিরূপে জানিতে পারি।

সে যাহা হউক বাহ্য জগতের যে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়—আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ই তাহার দ্বার স্বরূপ। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা ব্যতীত বাহ্য জগতের আর কিছুই আমরা অনুভব করিতে পারি না। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি। সুতরাং এই ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আমরা পাঁচ রূপ পদার্থ জ্ঞান উপলব্ধি করি মাত্র। চক্ষুর দ্বারা রূপ উপলব্ধি হয়, কর্ণের দ্বারা শব্দ উপলব্ধি হয় এইরূপ। সুতরাং এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহাই উপলব্ধি করি, ইহা ব্যতীত আর কিছুই আমরা প্রত্যক্ষ করি না—প্রত্যক্ষ করিবার আমাদের কোন উপায়ও নাই। সুতরাং বাহ্যজগতের আমরা যে পদার্থই অনুভব করি না কেন—তাহাকে আমরা এই পাঁচ ভাবেই

---

(২) পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন,

"Not a step can be taken towards the truth that our states of conscousness are the only things we know, without tacitly or avowedly postulating an unknown Something beyond consciousness."

(৩) The denial of all reality apart from our mind is a *two-fold* mistake ; it confounds the concept on of general relations, with particular relations, declaring that because the external in relation to the sentient organism, can only be what it is felt to be, therefore it can have no other relations to other individual reals. This is the first mistake. The second is the disregard of the constant presence of the objective real in every part of feeling The not-self is emphatically present in every conscionsness of self.

G. H. Lewis on "Spiritualism and Materialism."

অনুভব করি। অতএব আমাদের সমস্ত বাহ্যজগৎ জ্ঞান এই রূপ রস গন্ধ—মূলক মাত্র। একথা আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত বিবর্ত্তনবাদী দার্শনিক পণ্ডিত ফিস্কের কথা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন যে:—

"We admit that matter does not exist as matter, save in relation to our intelligence; since what we mean by matter is a congeneries of qualities, which have been severally proved to be merely names for divers ways in which our consciousness is affected by an unknown external agency. Take away these qualities, and we freely admit with the idealist, that the matter is gone: for by *matter* we mean with the idealist the phenomenal thing which is seen tasted, and felt * * We freely admit that what we mean by a tree is merely a congeneries of qualities that are visual and tactual, and perhaps odorous, sapid and sonorous."

Fiske's cosmic Philosopny Vol .I. P. 80.

অতএব এই ভৌতিক জগতের যতটুকু আমাদের সহজ জ্ঞানের বিষয়ীভূত—তাহাতে আমরা কেবল তাহাদের রূপ রস প্রভৃতিই জানিতে পারি—আর কিছুই আমাদের জানিবার উপায় নাই। (৪) আধুনিক সমস্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণই একথা স্বীকার করেন। (৫)

দার্শনিক মিলও বলেন —

"The true nature and meaning of the externality is that our sensation occur in groups, held together by permanent law, which come and go independently of our volitions or mental process."

(৪) কিন্তু আর্য্য ঋষিদিগের জ্ঞান এস্থলে সীমাবদ্ধ নহে। সহজ জ্ঞানে যাহা বুঝা যায় না—যোগ বলে তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইতেন। যখন যোগে মন নির্ব্বিষয়-হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনরূপ ক্রিয়া থাকে না মন আত্মার স্বরূপে অবস্থান করে—তখন ইচ্ছা করিলে সবিকল্প যোগে প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। প্রথমে স্থূলভূতের রূপরস হইতে সূক্ষ্মভূতের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় এবং তাহা হইতে তাহার মূল তামসিক অহঙ্কার উপলব্ধি হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রকৃতি ও পুরুষ বা আত্ম ও অনাত্ম পদার্থের জ্ঞান হয়। আমাদের যোগবল নাই—আমরা ইহা বুঝিতে পারিব না।

(৫) সকলের মত উদ্ধৃত করা সম্ভবে না। আমরা কেবল দুই একজন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মত দেখাইয়াছি। পণ্ডিত ম্যাক্স্ ওয়েল্ বলেন,

এইরূপ রস গুলি কি—তাহা আমরা ক্রমে দেখাইব। এক্ষণে একমাত্র বলিয়া রাখি যে আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারে কোনরূপ ক্রিয়া বা আঘাত হইতে যে অনুকম্পন উৎপন্ন হয়—তাহা হইতেই আমাদের শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি জ্ঞান হয়। (ক) এই জন্যই রূপ, রস প্রভৃতিকে তন্মাত্র বলা হইয়াছে। কারণ ইহা ব্যতীত আমাদের জ্ঞেয় আর কিছুই নাই। সাংখ্যের তন্মাত্র, ন্যায় ও বৈশেষিকের পরমাণু আর বিজ্ঞানের এটম্ একই পদার্থ, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন যে যাহা আমরা কঠিন পদার্থ মনে করি—তাহা প্রকৃত কঠিন নহে। যত চাপ দেওয়া যায় ততই তাহারা ঘনীভূত হইতে থাকে। আবার উত্তাপে তাহারা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হয়, ও শৈত্যে সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। এইরূপ নানা কারণে বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে কখনই কোনরূপ পদার্থে একটি পরমাণুর সহিত আর একটি পরমাণু সংযুক্ত হয় না—প্রত্যেক পরমাণুর চারিদিকে কতক স্থান ব্যবধান থাকে,—যৌগিক পদার্থেরও এই নিয়ম। এই ক্ষুদ্রতম পরমাণুগুলিকেই বিজ্ঞান এটম্ বলিয়াছে। এক্ষণে বিজ্ঞান স্থির করিয়াছে—ইহারা শারীরিক নহে—শক্তির কেন্দ্র মাত্র। সে যাহা হউক এই পরমাণুর অন্তর্গত শক্তি বিশেষ হইতে যে বিশেষ বিশেষ গতি বা ক্রিয়া হয় তাহাই কখন তাপ, কখন গন্ধ বা কখন শব্দরূপে আমাদের অনুভূত হয়। তবে এ গুলি পরমাণুর স্বরূপ কি তাহাদের ক্রিয়া বিশেষ তাহা বলা সহজ নহে। পরমাণুর

"All that we know about matt r relates to a series of phenomena in which......we become conscious of a sensation."

হিগেল প্রভৃতি মায়াবাদী দার্শনিকদিগের ন্যায় বারকলিও বলিয়াছেন,

"If by matter you understand that which is seen, felt, tasted and touched, then I say matter exists : I am as firm a believer of its existence as any one can be."

পণ্ডিত স্পেন্সর বলিয়াছেন,

"From the sychological point of view however matter in all its properties is the unknown cause of the sensations, it produces in us."

(ক) দার্শনিক পণ্ডিত Hobbes বলিয়াছেন,

"All the qualities called sensible are—in the object which causeth them—but so many *motions* of the matter by which it pre-seth upon our organs diversely

—তন্মাত্র, পরমাণু বা এটম্ একই হইল। বিভিন্নরূপ ক্রিয়া ধর্ম্মযুক্ত পরমাণুও বিভিন্ন—এইজন্য পাঁচ তন্মাত্র—এবং ইহাদের এই পাঁচ প্রকার বিভিন্ন ক্রিয়া হয় বলিয়া এই পাঁচ বিভিন্ন ক্রিয়ার আধার ভূতকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (৬) ইহাই আর্য্য পণ্ডিতগণের পঞ্চ সূক্ষ্মভূত। ইহাদেরই পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া জন্য—বিভিন্নরূপ সংযোগ বিয়োগের দ্বারা পঞ্চ স্থূলভূত স্পষ্ট হইয়া ক্রমে এই ভৌতিক ও জৈবিক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। (৭)

২৪। বাহ্য জগতের আমরা কতটুকু জানিতে পারি?

এখন কথা হইতেছে যে যখন আমরা পদার্থের রূপ রস ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি করি না—তখন পদার্থের যেরূপ ক্রিয়া দ্বারা আমাদের মনে এই রূপ রস প্রভৃতির জ্ঞান হয়—এই সকল ক্রিয়া ব্যতীত পদার্থের আর কোনরূপ ক্রিয়া আছে কি না? কারণ যদি ইহার অপেক্ষা অন্য-

---

(৬) সম্প্রতি দার্শনিক পণ্ডিত Romnes তাঁহার রিড্ লেক্‌চারে বলিয়াছেন, "It is a demonstrated fact that all our knowledge of the external world is of necessity only a knowledge of motion and implies 'some kind of motion, agitation or alteration which worketh in the brain. For all the forms of energy are now proved to be modes of motion and even matter, if not in its ultimate constitution vortical motion, at all events is known to us as changes of motion."

(৭) অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মত এই যে পদার্থ সকল পাঁচরূপে আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় বলিয়া তাহাদের ক্রিয়া (বা তন্মাত্র) পাঁচ রূপ নহে। একরূপ ক্রিয়াই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারে বিভিন্নরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে। একরূপ অনুকম্পনে আমরা তাপ অনুভব করি—আবার অবস্থা বিশেষে তাহা হইতেই আমাদের রূপ জ্ঞান হয়। আবার একরূপ অনুকম্পন হইতে শব্দ জ্ঞান হয় ইত্যাদি সুতরাং এক অনুকম্পন হইতেই বিভিন্নরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইল। অতএব মূল পদার্থ পাঁচরূপ বা তাহাদের ক্রিয়া পাঁচরূপ ইহা সিদ্ধান্ত করা যুক্তি সঙ্গত নহে। আর্য্য পণ্ডিতগণ এ কথা এরূপে স্বীকার করেন না। বিজ্ঞান অনুকম্পনের স্বরূপ কি তাহা বুঝে না—সুতরাং তাহার কথা এস্থলে বিশেষ প্রামাণ্য নহে। আবার বিবর্ত্তনবাদ আমাদের ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি যেরূপে বুঝাইয়া দিয়াছে তাহাতে পদার্থের পাঁচরূপ বিভিন্ন ক্রিয়া সিদ্ধান্ত না করিলে চলে না। সুতরাং আর্য্য পণ্ডিতগণ বলেন যে একরূপ অনুকম্পন হইতে দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয় জ্ঞান হয় না—রূপ অনুকম্পন ও শব্দ অনুকম্পন—এক হইতে পারে না—তাহাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

রূপ ক্রিয়া থাকে—বা থাকিবার সম্ভব হয় তবে পাঁচ ভূত কল্পনা যুক্তি-সিদ্ধ হইবে না। ইহার দুইরূপ উত্তর আছে। আধুনিক অনেক দার্শনিক পণ্ডিত বলেন যে বাহ্য পদার্থের অন্যরূপ ক্রিয়া থাকিতে পারে—তবে তাহা আমাদের সহজ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। যদি পাঁচটির পরিবর্ত্তে আমাদের দশটি জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকিত (অথবা যদি আমরা four-dimensional being হইতাম) তবে হয়ত পদার্থের অন্যরূপ ক্রিয়াও আমরা অনুভব করিতে পারিতাম। দর্শনের এই তত্ত্বকে relativity of knowledge অথবা জ্ঞানের সসীমতা বলা হয়। কথাটা দর্শনবিদ্‌মাত্রেই জানেন সুতরাং এস্থলে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই।

কিন্তু সাংখ্যকার প্রভৃতি আর্য্য দার্শনিকগণ একথা একরূপ ভাবে স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে কোন পদার্থেরই আর ইহা ব্যতীত অন্যরূপ ক্রিয়া শক্তি নাই—থাকিলে আমাদের ইন্দ্রিয়ও তদনুসারে অধিক হইত। কারণ সাংখ্যমতে যে শক্তির একরূপ বিকারে ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই অন্যরূপ বিকারে পঞ্চ তন্মাত্র ও তাহা হইতেই পঞ্চভূত সৃষ্টি হইয়াছে। (খ) বেদান্তবাদীরাও বলেন পঞ্চভূতের সত্বাংশ হইতেই ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক বিবর্ত্তনবাদ বুঝিয়াছে যে বাহ্যজগতের বিভিন্নরূপ ক্রিয়া ও শক্তির সহিত জৈবনিকের ঘাত প্রতিঘাতেই ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হইয়াছে। (ঙ)

(খ) "There is no idealism in the system of Kapila, both consciousness and all existing external forms have a real objective being independent of the soul. In one respect he coincides with the view of kant for both agree that we have no knowledge of the external world, except as by the action of our faculties, it is represented to the soul, and take as granted the objective reality of our sense-perceptions. In one respect there seems to be in the Hindu theory a germ of the system of Hegel in which subject and object are made one by an obsolute synthesis. for the substratum of thought and consciousness, and of the external world—is the same in kind."

Davies 'Hindu Philosoyhy.' P. 20.

(ঙ) 'In lowest organisms we have a kind of tactual sense diffused over the entire body—then through the impression from without and their corresponding adjustments, special portions of the surface become more responsive to the stimuli than others.

যদি ইহা সত্য হয়, কুম্ভকার যেরূপ মাটি লইয়া পুঁতুলের চক্, নাক্ প্রভৃতি গড়ে—যদি পরমেশ্বর সেইরূপে ইন্দ্রিয় সৃষ্টি না করিয়া বিবর্ত্তন, নিয়মানুসারে প্রকৃতিকেই ইন্দ্রিয় সৃষ্টির ভার দিয়া থাকেন—তবে সাংখ্য প্রভৃতি আর্য্য পণ্ডিতদিগের ন্যায় বলিতেই হইবে—যে বাহ্য জগতের যে কয়টি শক্তি আমাদের উপর ক্রিয়া করিতে পারে—সেই কয়টি শক্তির দ্বারাই অথবা তাহাদিগকে অনুভূত করিবার জন্যই প্রকৃতি আমাদের ইন্দ্রিয় গড়িয়া লইয়াছে। হেগেল প্রভৃতি জর্ম্মাণ দার্শনিকগণ, এই কথাই বলেন। (৯) প্রত্যেক মায়াবাদীকেই একথা স্বীকার করিতে হয়। আবার বিবর্ত্তনবাদীকে জ্ঞানের সমীমতা স্বীকার করিলেও এমত সমর্থন করিতে হয়।

আর এক কথা, যে, কারণানুসন্ধায়ী যুক্তির (subjective method) কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—তাহারও মূলভিত্তি এই, যে, বস্তুর স্বরূপ আর আমাদের জ্ঞেয় বিষয় একই—আমরা সেইজন্য স্বত প্রতিভা বলে পদার্থের স্বরূপ বুঝিতে পারি, ভূয়োদর্শন বা পরীক্ষা দ্বারা তাহার বিশেষ অন্যথা হয় না। এইজন্যই সাংখ্যকার আশ্চর্য্য প্রতিভা অথবা যোগ বলে যাহা স্থির করিয়াছেন, বিজ্ঞানও দর্শন যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। অতএব প্রকৃতির বিকৃতি হইতে যে বাহ্য জগৎ হইয়াছে —ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা তাহাই আমরা উপলব্ধি করি।

অতএব এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। জগৎ যে সত্য তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও—আমাদের হইতে তাহার ভিন্নও স্বতন্ত্র সত্ত্ব থাকিলেও যতটুকু আমরা প্রত্যক্ষ করি—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা

The senses are nascent......The actions of light in the first instance appears to be a mere distrubance of the chemical processes in animal orgainsms......By degrees the action becomes localised in a few pigment cells more sensitive to light than the surrounding tissnes. The eye is here incepient......and through the operations of infinite adjustments at length reaches the perfection that is displayed in the nawk and eagle. So of the other senses."

Tyndall's Inuaygural address. P. 47—48.

(৯) হিগেল বলিয়াছেন, "Possibilities of thought are not only co-extensive but identical with the possibiities of things."

ফিস্কে বলিয়াছেন, "Possibillties of things are limited by the possibilities of thought—this sort of idealism cannot be overturned."

তাহার যতটুকু উপলব্ধি করি—তাহা জগতের স্বরূপ নহে ইহা প্রকৃতির বিকৃত অবস্থা মাত্র। সুতরাং জগতের এই প্রত্যক্ষরূপটি অসত্য। বাস্তবিকই আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সসীম বা অজ্ঞানে জড়িত তবে ইহা বিকৃত জগতের স্বরূপ বটে। ইহার যতটুকু বিকৃত অবস্থা তাহা আমরা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই উপলব্ধি করি—এই বিকৃত অবস্থার পাঁচরূপ মূল ক্রিয়াই আমরা এই ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি—আর এই পাঁচ ক্রিয়ার আধারকেই আমরা পাঁচ ভূত বলিয়া থাকি। এই ভৌতিক অবস্থা এই বাহ্য বা ব্যক্তাবস্থার মূলে যে সত্য যে অনন্ত সত্তা নিহিত রহিয়াছে তাহা হইতে ইহা প্রক্ষিপ্ত মাত্র। অতএব ইহার স্বরূপ নহে। ইহা হইতেই মায়াবাদের উৎপত্তি। তবে এই অসত্যের মূলে যে সত্যজগৎ নিহিত রহিয়াছে জগৎ যে সদসৎ জড়িত, অসত্য যে সত্যের ছায়া মায়াবাদীরা তাহা বুঝেন না। এই সৎস্বরূপ পাঁচ ইন্দ্রিয় কেন পাঁচশত ইন্দ্রিয় থাকিলেও আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অথবা প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানের দ্বারা আমরা ইহা কখনই প্রমাণ করিতে পারিব না, ইহা আমাদের সহজ জ্ঞানের অতীত—কারণ বিকৃত প্রকৃতির বিকৃত ভাব ব্যতীত কিছুই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে। বিকৃত প্রকৃতির ক্রিয়া বিশেষ হইতেই আমাদের ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অজ্ঞেয়। এইজন্যই অজ্ঞেয়তাবাদ। এই জন্যই বাহ্য জগৎজ্ঞান আমাদের অজ্ঞান মাত্র ইহাই বেদান্তের অজ্ঞান বা অবিদ্যাবাদ। তবে এই অজ্ঞানের মধ্যে কতকটা সদসৎ জ্ঞান মিশামিশি হইয়া থাকে। (অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ত্বং - বেদান্তসার।) এইরূপেই হিন্দু দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষবাদ ও মায়াবাদ সামঞ্জস্য করিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান যে সসীম বা অজ্ঞান সম্পন্ন একথা কেন বলা হয় তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আধুনিক দর্শনের Relativity of knowledge এইরূপেই বুঝা উচিত।

তবে জগৎ এইরূপে অজ্ঞেয় হইলেও আর্য্য পণ্ডিতগণ দেখাইয়া দিয়াছেন যে এরূপ উপায় আছে যাহাতে আমরা ইহার স্বরূপ বুঝিতে পারি। সে উপায় যোগ। সাংখ্য যোগেই ইহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। সেশ্বর সাংখ্য ভগবান পতঞ্জলি এই যোগবিজ্ঞান বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রকৃতির লিঙ্গ, অবিশেষ ও বিশেষ অবস্থায় ইহার যে চতুর্বিংশতি প্রকার অবয়ব হয় যোগেই তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এখানে সে সকল বিষয়ের অবতারণা অনাবশ্যক।

বেদ কাব্য না বিজ্ঞান?

আমি ব্রাহ্মণ। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বেদের মাহাত্ম্যে মোহিত হইয়া বেদ অবলম্বনেই তাঁহাদের দীর্ঘজীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে সকল কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে তাহাতে তাঁহারা যে অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কপিল, পতঞ্জলি, বেদব্যাস প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন লোক সকল বেদকে সত্যমূলক বলিয়া বুঝিতেন এবং বেদের আলোচনাই যে তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই। সেই বেদ লইয়া আমি যদি গুটিকত কথা বলিতে চাই, তবে আমার উপর কেহ রাগ করিও না।

এদিকে ইয়ুরোপে আজকাল বেদ আলোচনা হইতেছে। ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ—বেদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া বেদকে যেরূপ চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত নবজীবনে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। রমেশ বাবুর ঐ প্রবন্ধ লেখার পর হিন্দু সমাজে একটি বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে আমি বেদ সম্বন্ধে যাহা বুঝি তাহাই মোটামুটি বলিতে চাই।

কেহ কেহ বলেন যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্র সকলের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন বেদের সেরূপ অর্থ হিন্দু সমাজে প্রচার করাই উচিত নহে। কিন্তু ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সত্যের দিকে যে কিছুই অগ্রসর হন নাই একথা আমি বলিতে চাই না। তবে তাঁহারা যে বেদের প্রকৃত রহস্য বুঝিয়াছেন তাহাও স্বীকার করি না। ম্যাক্সমূলর আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি বেদের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারেন নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রাচীন আর্য্যগণ যখন সভ্যতার প্রথম সোপানে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বেদ সেই সময়ের লোকের রচনা। কিন্তু আমি বুঝি যে ঋষিগণ আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়া বেদবাক্য সকল প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ কাল যাহাকে সভ্যতা বলে সেরূপ সভ্যতার সঞ্চার প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে আদৌ হয় নাই এবং হয় নাই বলিয়াই তাঁহারা বেদ বিজ্ঞান

রহস্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিষয় সুখাভিলাষ হইতে আধুনিক সভ্যতার উৎপত্তি। কিন্তু বেদ নিহিত সত্য সকল যাঁহারা আলোচনা করিতেন তাঁহাদের মনে বিষয় সুখ তৃষ্ণা অমন জন্মে নাই। আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমা প্রাপ্ত ঋষিগণ বৈষয়িক সুখপ্রদ সভ্যতার সোপানে পদক্ষেপ করিতে ভয় পাইতেন। আজ কাল যাহাকে সভ্যতা বলে প্রকৃত পক্ষে ঋষিগণ—সে সভ্যতার কোন সোপানেই উঠেন নাই—এবং উঠিবার প্রয়োজনও কখন দেখেন নাই। আজ কাল সভ্যতা অর্থে যেরূপ সভ্যতা বুঝায় প্রাচীন আর্য্যগণ যে, * সেরূপ সভ্যতার আস্বাদন পান নাই,—এসম্বন্ধে বেদ আলোচনা করিয়া ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহা বুঝিয়াছেন তাহা ঠিকই বুঝিয়াছেন। ভূকৈলাসে যে যোগীকে সুন্দরবন হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছিল আজকালকার সভ্যতার অর্থে—তিনি যে অসম্পূর্ণ অসভ্য লোক, তাহা ঠিক কথা। এখনকার সভ্যগণ ঋষিগণকে অসভ্য বলিবেন, বিচিত্র নহে।

বেদ প্রণেতা ঋষিগণ বৈষয়িক সভ্যতা শিখেন নাই—ইহার প্রমাণ (Intrinsil evidence) বেদ হইতেই পাওয়া যায় এবং তাঁহারা যে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমসীমায় উঠিয়া বেদবাক্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রমাণও বেদ হইতে পাওয়া যায়; † আজ কাল আমরা যেরূপ ইন্দ্রিয়শক্তি লইয়া ঘর করি, তাহাতে বেদের আধ্যাত্মিক ভাব বুঝিয়া প্রকৃত ঋষি-মাহাত্ম্য ঠিক বুঝিতে পারা দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং অন্য কোন উপায়ে ঋষিমাহাত্ম্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়া তবে বেদমাহাত্ম্য বুঝিতে যাওয়াই আমাদের পক্ষে ঠিক পথ। যদি ঋষিদের মাহাত্ম্য থাকে তবে বেদেও মাহাত্ম্য আছে;—ইহা বুঝিতে—বেশি বুদ্ধির দরকার নাই।

আমি ঋষিগণকে মহৎ ভাবাপন্ন লোক বলিয়া বুঝিয়াছি এবং ঋষিগণ সম্বন্ধে এইরূপ ভক্তি জন্মানতে বেদকে সত্যমূলক বিজ্ঞান বলিয়া বুঝিয়াছি। চিন্তা সম্বন্ধে, জ্ঞান পথের পথিক হওয়ায় ঋষিমাহাত্ম্য মনে লাগিয়াছে তাহাই একটু বলিতে চাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানদেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া আমিও এক কালে আর্য্যবিজ্ঞান সুন্দরীর কিছুই ভাল দেখিতে পাই নাই, কিন্তু

* ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহা দেখাইয়াছেন।

† ঋষি শিষ্যরা এইরূপ কথা বলিয়া থাকে।

আজকাল আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। এই পরিবর্ত্তন যেরূপে হইয়াছে তাহা পাঠকগণকে জানাইতে চাই।

প্রথমে এইটি বুঝি যে হিন্দুরা যেরূপ পথ অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম্মরহস্য মধ্যে প্রবেশ করিতে বলেন হিন্দুধর্ম্মরহস্য বুঝিতে গেলে সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়। সেই পথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ঋষিমাহাত্ম্য এবং বেদমাহাত্ম্য মনে লাগিয়াছে।

হিন্দু বিজ্ঞান আলোচনার পথ আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনার পথ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই প্রথমে বলিতে চাই। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সত্য সকল অনুসন্ধান করা উভয় বিজ্ঞানেরই উদ্দেশ্য। ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি সকলের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ বৈষম্য ও কিরূপ সাম্য আছে, (Diversity and Unity) তাহার আলোচনা করা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিজ্ঞানেরই উদ্দেশ্য। কিন্তু পাশ্চাত্যগণ ঐ বৈষম্য যেরূপে বুঝিতে যান এবং প্রাচীন ঋষিগণ ঐ বৈষম্য যেরূপে বুঝিতে যান তাহা একরূপ নহে। মনে কর তাপ (Heat) সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাপমান ইত্যাদি যন্ত্র সাহায্যে ঐ তত্ত্ব বুঝিতে যাইবেন, কিন্তু প্রাচ্যগণ আপনার স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই তাপ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। ইলেক্ট্রিসিটি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকল আলোচনা করিবার জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান (Galvanometer) তাড়িৎমান যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন ঐ যন্ত্রের (magnetic needle) সূচির উপর কোন শক্তির কিরূপ ক্রিয়া হয়, তাহার আলোচনা দ্বারা ইলেক্ট্রিসিটি তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করেন কিন্তু হিন্দুযোগী যখন তড়িৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যান তখন শরীরের ক্রিয়া অন্তরে কিরূপে প্রকাশ পায় তাহাই তাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে যে শক্তি তাড়িতমান যন্ত্রের সূচি নড়াইয়া দেয় তাহাই ইলেক্‌ট্রিসিটি, আর যে শক্তি অন্তরে তড়িৎজনিত ভাব উৎপাদন করে প্রাচ্য পণ্ডিতের কাছে তাহাই তাড়িৎ শক্তি। প্রাকৃতিক শক্তি সকল ভৌতিক পদার্থের উপর যেরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহার আলোচনা দ্বারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তি সকলের পরস্পরের মধ্যে যে বৈষম্য ও যে সাম্য আছে তাহা আলোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণ ঐ প্রাকৃতিক শক্তি সকল চেতন মনুষ্যের অভ্যন্তরে যেরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহারই বিচার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিসম্বন্ধীয় বৈষম্য ও সাম্য আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বর নির্ম্মিত চেতন মনুষ্য, হিন্দু ঋষিদের বিজ্ঞানের সাধন, আর নানাবিধ মনুষ্যনির্ম্মিত যন্ত্র সকল পাশ্চাত্যগণের বিজ্ঞান আলোচনার যন্ত্র। নাড়ীর গতি দেখিয়া রোগ পরীক্ষা করিতে হইবে,—একজন প্রাচীন হিন্দু বৈদ্য স্পর্শসম্বন্ধীয় অনুভব শক্তির সাহায্যে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রোগীর অবস্থা বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু একজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ নাড়ী পরীক্ষার জন্য একটি (Spygmograph) যন্ত্র বাহির করিবেন। বিজ্ঞান আলোচনার পদ্ধতি দ্বয়ের মধ্যে এই যে প্রভেদ, তাহার প্রধান কারণ এই যে,—প্রাচীন ঋষিগণের অনুভূতি শক্তি বড়ই সূক্ষ্ম ছিল আর আজকাল, লোকের অনুভূতি শক্তি বড় ভোতা হইয়া পড়িয়াছে। যন্ত্র যতই সূক্ষ্ম হইবে বিজ্ঞান আলোচনায় ততই সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকলের ভিতর প্রবেশ করা যাইবে। হিন্দু যোগীগণ সেই জন্য প্রকৃতিতত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য আপনাদের অনুভব শক্তির সূক্ষ্ম বিকাশ সাধনে যত্নবান হইতেন। আজকালকার বিজ্ঞানবিদ্দের কাছে অনুভব শক্তির সূক্ষ্ম বিকাশ সাধন করিবার জন্য কষ্ট করা অপেক্ষা একটা যন্ত্র নির্ম্মাণ করা সহজ, আর সোজা পথেই মানুষের মন যায়। জর হইলে গায়ের তাপ কত বেশি হইল স্পর্শশক্তির সাহায্যে আজকালকার লোক সেটি বুঝিতে পারেন না তাই (Clinical thermometer) বগলে দিবার কাঁচের নল নির্ম্মিত হইয়াছে।

হিন্দুদের বিজ্ঞান আলোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম * তাহা হইতে এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় যে বৈদিক ঋষিগণের সূক্ষ্মানুভূতি শক্তি কতদূর বিকাশ প্রাপ্ত ছিল তাহা বুঝিলে বেদমন্ত্রের মধ্যে কিরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বসম্বন্ধীয় কথা আছে তাহা এক রকম বুঝিতে পারা যায়।

মনুষ্যের সূক্ষ্মানুভূতি ক্ষমতার কতদূর বিকাশ হইতে পারে এবং হিন্দু-যোগী ঋষিদের সেই সূক্ষ্মানুভূতি ক্ষমতা কতদূর বিকাশ পাইয়াছিল এ সম্বন্ধে যিনি কখনও কোন আলোচনা করেন নাই তিনি ঋষিমাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন না, এবং ঋষিমাহাত্ম্য না বুঝিলে বেদমাহাত্ম্যও বুঝিতে পারিবেন না।

---

* হিন্দুদের বিজ্ঞান আলোচনা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যিনি জগত্তত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইবেন তিনিই হিন্দু বিজ্ঞানরহস্য, বেদরহস্য ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল আলোচনা করিবার জন্য হিন্দুদের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। পণ্ডিত রিসনব্যাক্ বিজ্ঞান আলোচনায় এইরূপ পথ অবলম্বন করিয়া যেসকল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা একবার সকলেরই দেখা কর্ত্তব্য।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে যোগবিভূতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। যোগমার্গ অবলম্বনে আভ্যন্তরিক শক্তি সকলের বিকাশ হইলে যোগী যোগবিভূতি প্রাপ্ত হন। একজনের মনের কথা জানিতে পারা ইহা একটি যোগবিভূতির মধ্যে। পাতঞ্জল শাস্ত্রে লিখিত বিভূতি সকলের কথা পড়িলে প্রথমে মনে হয় হিন্দুরা কি গাঁজাখোরই ছিল। কিন্তু আজকাল যাঁহারা চারিদিকে নিজর রাখেন তাঁহারা আর যোগবিভূতির কথা সব যে গাঁজাখুরি, ইহা ভরসা করিয়া বলিতে পারেন না। সেদিন বিলাতের সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি, (বড় বড় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ যাহার মেম্বর) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে অনুভূতি শক্তির বিকাশে একজন মানুষ যে আর এক একজনের মনের কথা বলিতে পারেন,—ইহা সত্য। যে কথার ভিতর প্রবেশ করিতে পারি নাই সে কথাটা গাঁজাখুরি মনে হইত কিন্তু তাহার একটিকে যদি কেহ সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেয় তবে অন্য কথাগুলিও যে সত্য হইতে পারে এইরূপই মনে হয়। জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় (semuambolism বা Traull-lstate) মনুষ্যের সূক্ষ্মশক্তি সকল যেরূপ বিকাশ পায় তাহা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন; যিনি শুনেন নাই—তাঁহাকে আমি (animal এবং mesmerism) বীরস্থ চৌম্বক শক্তি সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

এই সব আলোচনা করিয়া এই বুঝা যায়, যে, যেটুকু অনুভব শক্তি লইয়া আমরা নাড়া চাড়া করি তাহাই যে মানুষের কেবলমাত্র পুঁজি, তাহা নহে। যত্ন ও অভ্যাস দ্বারা যোগ শাস্ত্র কথিত বিভূতি সকল যে লাভ করা যায় ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

যদি অসঙ্গতই নাই হইল তবে পতঞ্জলি, কপিল, বেদব্যাস প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রণেতা সমাজের নেতাগণের কথায় একেবারে অশ্রদ্ধা করিব কেন? তাঁহারা যোগ বিভূতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা মিথ্যা একথা বলিবার আমাদের কি অধিকার আছে? বরং সত্যই যাঁহাদের জীবনের অবলম্বন ছিল, তাঁহাদের কথা সকল সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য।

যদি যোগী পতঞ্জলিকে বিশ্বাস কর তবে যোগীর সূক্ষ্মানুভূতি শক্তি যে কত দূর পর্য্যন্ত বিকাশ পাইতে পারে তাহা বুঝিতে পারিবে এবং ঐরূপ শক্তি বিশিষ্ট লোকের কাছে প্রাকৃতিক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে কতদূর সূক্ষ্ম হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারিবে।

আমাকে তোমরা মূর্খই বল আর কুসংস্কারান্ধই বল, আমি স্বীকার করি যে, কপিল পতঞ্জলি বেদব্যাস প্রভৃতির উপর আমার ভক্তি বড় গাঢ় হইয়া পড়িয়াছে। কপিল বেদব্যাস পতঞ্জলি গৌতম প্রভৃতি লোকের বেদে ভক্তি দেখিয়া আমিও ঋষিবাক্য সকল যে বিজ্ঞানমূলক ইহা বুঝিতে শিখিয়াছি। তবে আমাদের মোটা ইন্দ্রিয় লইয়া সেই সকল সত্য সকল সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

আর্য্যঋষিগণ সম্বন্ধে ভক্তি থাকিলে বেদের মন্ত্র লইয়া আলোচনা করিতে গেলে সেই সেই মন্ত্র সকলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গূঢ় রহস্যের আভা দেখা যায়, গায়ত্রী মন্ত্র লইয়া ইহার দৃষ্টান্ত দিব।

তৎ সবিতুর্বরেণং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধীয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ ॥

যিনি আমাদিগকে ধীশক্তি দান করেন আইস সেই সবিতা দেবের বরণীয় তেজ চিন্তা করি। এই মন্ত্রটিতে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য এতদূর মাহাত্ম্য দেখিয়াছিলেন, যে, তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে এই মন্ত্রটি সমস্ত বেদের সারভাগ। যিনি এই মন্ত্ররহস্য কিছুই বুঝেন না তিনি ইহার মধ্যে জোর একটু "সরল" কবিত্ব দেখিতে পাইবেন।

গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা সবিতা। এই সবিতা সূর্য্যেরই একটি নাম। ম্যাক্সমূলরও সবিতা অর্থে সূর্য্য বুঝিয়াছেন, ঋষিগণও সবিতা অর্থে সূর্য্যকেই বুঝিতেন।* তবে প্রভেদ এই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সূর্য্যকে যে চক্ষে দেখেন, ঋষিগণ সে চক্ষে দেখিয়া গায়ত্রী মন্ত্র প্রকাশ করেন নাই।

ঐ সূর্য্য যাহা প্রতিদিন সকালে উদয় হয়, উহাকে সে চক্ষে দেখেন না ইহা নিশ্চয়। মনে কর পণ্ডিত টিণ্ডল এক স্থলে সূর্য্যকে জগৎ প্রসবিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। একজন মূর্খ যে বিজ্ঞানরহস্য কিছুই বুঝে না, সে টিণ্ডল সূর্য্যকে কেন যে জগৎ প্রসবিতা বলিয়াছেন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না। একজন কবি যিনি টিণ্ডেলর নাম শুনিয়াছেন কিন্তু তিনি কিরূপ দরের লোক তাহা জানেন না তিনি হয়ত উহার এইরূপ অর্থ করিবেন—"সূর্য্য উদয় হইলেই জগৎ আমাদের চক্ষে প্রকাশ পায় সুতরাং সূর্য্যই এক রকম জগৎ প্রসব করিল বলিতে হইবে; কবির কি সুন্দর ভাব! টিণ্ডল একজন সুন্দর কবি বটেন।" কিন্তু যিনি টিণ্ডলকে বিজ্ঞানবিদ্ বলিয়া জানেন তিনি উহার ভিতর যে কোন বৈজ্ঞানিক কথা আছে, ইহাই বুঝিবেন

এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে উহার বৈজ্ঞানিক ভাব বুঝিতে পারিলে উহার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন মনে করিবেন। টিণ্ডল যে বিজ্ঞানের চক্ষু দিয়া দেখিয়া সূর্য্যকে জগৎ প্রসবিতা বলেন সেইরূপ চক্ষু দিয়া সূর্য্যকে দেখিতে শিখিলে তবে টিণ্ডলের কথার অর্থ বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ ঋষিগণও যে চক্ষে সূর্য্যকে দেখিয়া সূর্য্যকে ধীশক্তির আধার এবং জগৎ প্রসবিতা বলিয়া গিয়াছেন সূর্য্যকে সেই চক্ষে দেখিতে না শিখিলে সবিতা দেবতার প্রকৃত অর্থ কেহ বুঝিতে পারিবেন না। ম্যাক্সমূলর সূর্য্যকে ঋষিচক্ষে দেখিতে শিখেন নাই সুতরাং তিনি সবিতা দেবতা কথার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত সুইডেনবর্গ সূর্য্যকে ঋষিচক্ষে দেখিতে শিখিয়াছিলেন তিনি সবিতা দেবতার অর্থ বুঝিয়াছিলেন।

এই ঋষিচক্ষু কথাটি কি অর্থে ব্যবহৃত করিতেছি তাহা একটু বলা চাই। কবিকল্প সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ যে জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় বিচারশক্তি প্রবুদ্ধ থাকে সেই অবস্থায় সূর্য্যশক্তি অন্তরে যেরূপ প্রতিবিম্বিত হয় তাহা যিনি জানেন তিনিই সবিতা দেবতার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন যে সূর্য্যশক্তি যাহা তেজ ও আলোকশক্তির আধার, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জড় শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ সূর্য্য সম্বন্ধে আরও কিছু বেশি বুঝিয়াছিলেন। সূর্য্যকে তাঁহারা ধীশক্তির আধার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং সূর্য্যের তাপ ও তেজ শক্তি তাঁহারা সেই ধীশক্তির বিকারস্বরূপ বুঝিতেন। সাংখ্যকার যাহাকে বুদ্ধিতত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন, সূর্য্য সেই বুদ্ধিতত্ত্বের আধার স্থল। সাংখ্যশাস্ত্র পাঠ করিলে ইহা দেখা যায় যে হিন্দুঋষিগণের বিজ্ঞানানুযায়ী তাপ ও তেজোশক্তি এই বুদ্ধিতত্ত্বের বিকার মাত্র। সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে এই বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই জগতের প্রসব হইয়াছে, সেই জন্যই সূর্য্যকে জগৎপ্রসবিতা বলা হইয়াছে। সূর্য্যকে ধীশক্তির আধার স্বরূপ বুঝাইয়াছিলেন বলিয়াই, ঋষিগণ সবিতা মন্ত্রে ধীয়োয়োনং প্রচোদয়াৎ কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল কথা কবির কথা নহে, হিন্দু দর্শনের সহিত এই সকল কথার ঐক্য দেখিয়া ইহা যে বিজ্ঞানের কথা তাহাই মনে লাগে।

ধীশক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা এখনও আরম্ভ হয় নাই সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে লোকে সবিতা দেবতার অর্থ কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে?

আবার বেদমন্ত্র বুঝিতে গেলে মন্ত্রের প্রধান অঙ্গ যে ছন্দ, তাহার মাহাত্ম্য বুঝিতে হইবে। ছন্দ না জানিলে মন্ত্রমাহাত্ম্য বুঝা যায় না ঋষিগণ এইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

অন্তরে কোন ভাবের প্রাবল্য হইলে যখন সেই ভাব বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য চাঞ্চল্য জন্মে তখন মনুষ্যের কথাগুলি তালে তালে বাহির হয়। ইহা হইতেই সঙ্গীতের জন্ম। আন্তরিক ভাবের সহিত তালের কি একটা সম্বন্ধ আছে অন্তরের সমস্ত ক্রিয়াই তালে তালে কার্য্য করিতে থাকে। আমরা যে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি তাহাও কেমন তালে তালে ফেলিয়া থাকি। জগতের সমস্ত শক্তির ক্রিয়াই এরূপ তালে তালে হইয়া থাকে। *

কোন দেবতার সহিত পূর্ণ সহানুভূতি জন্মিলে অন্তরে সেই দেবশক্তির ক্রিয়া যেরূপ তালে আরম্ভ হয়, কথা সকল যেরূপ তালে স্বতই নির্গত হয়, তাহাই সেই দেবতা সম্বন্ধীয় ছন্দ। একই দেবশক্তি আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সাধন ব্যবহার করিতে গেলে ছন্দের বিভিন্নতা জন্মে। যখন দেখিবে যে সূর্য্যশক্তির সহিত পূর্ণ সহানুভূতি উপস্থিত হইয়া অন্তরে গায়ত্রী-ছন্দে ধীশক্তির প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে তখনই জানিও যে অন্তরে সবিতা দেবতার উদয় হইয়াছে। তখনই তুমি সবিতা দেবতাকে চিনিতে পারিবে। †

পূর্ণ সহানুভূতি কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছি তাহা এই বারে বলিব। একটি পতঙ্গ যখন অগ্নির আলোকে মুগ্ধ হইয়া কেই আলোকে ঝাঁপ দিতে যায় তখন সেই পতঙ্গটিকে দেখিয়া পূর্ণ সহানুভূতি কথাটির অর্থ বুঝিয়াছি। রূপের আভায় যখন মনুষ্য সেই রূপের সহিত আকর্ষণ সূত্রে বদ্ধ হয়, তখন সেই রূপের সহিত তাহার দর্শকেন্দ্রিয়ের সহানুভূতি জন্মিয়াছে বলা যায়। কবি প্রণয়ী, বিরহ কালে মনোমধ্যে যখন প্রণয়িনী সম্বন্ধীয় কল্পনা লইয়া চঞ্চল হন, তখন তিনি যে চাঁদের দিকে চাহিয়া একটু তৃপ্তিলাভ করেন ইহা অনেকে জানেন চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহার সে দিক হইতে

---

* এই তালকে ইংরাজিতে Rythm বলে। প্রাকৃতিক শক্তির Rythm actm সম্বন্ধে Herbert Sphencer তাহার First Principles নামক পুস্তকে যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলেরই একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য।

† সবিতা দেবতা কথাটি ইংরাজিতে বুঝাইতে গেলে এইরূপে বলা উচিত—The thought energy, the source of which is the sun, the action of which is in the Gayatriv rythm from which has sprung all the differentiated energies of nature, is Savita Devata.

নয়ন ফিরাইতে আর ইচ্ছা হয় না; এই অবস্থায় তাঁহার চাঁদের সহিত সহানুভূতি জন্মিয়াছে বলা যায়। সেইরূপ ধীশক্তির বিকাশ জন্য চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে মনুষ্যের সূর্য্যশক্তির সহিত সহানুভূতি জন্মে আর্য্যগণ এইরূপ বুঝিয়াছিলেন।

অন্তরে যখন জ্ঞান লালসা অত্যন্ত প্রবল হয় তখন সূর্য্যালোকের জন্য মনুষ্য যে আকুল হয় ইহা একটু একটু বুঝা যায়। কিন্তু সূর্য্যের সহিত পূর্ণ সহানুভূতি যাহারে বলে তাহা ঋষি বিশ্বামিত্রের জীবনী হইতে শিখিতে হয়। ঋষি বিশ্বামিত্রের জ্ঞান লালসা যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল যখন রাজর্ষি দেবর্ষি হইয়াও তাঁহার জ্ঞান লালসা নিবৃত্ত হয় নাই তখন তিনি সূর্য্য প্রেমের প্রেমিক হইতে পারিয়াছিলেন। তখন বিশ্বামিত্র সূর্য্যদেবকে বুদ্ধির আধার জগৎ প্রসবিতা বুঝিতে পারিয়া গায়ত্রীচ্ছন্দোময় সূর্য্য শক্তির সহিত মিশিয়া অন্তরের আকাঙ্খা মিটাইয়াছিলেন। তখন বিশ্বামিত্রের মুখ হইতে

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—

ধীয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

এই মন্ত্রটি নির্গত হইয়াছিল। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সহিত পূর্ণ সহানুভূতি সূত্রে বদ্ধ হওয়ায় ঋষিগণ অন্তরের ছন্দোময় ক্রিয়া সকল আলোচনা করিয়া ছন্দোময় বেদবাক্য সকল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বেদবাক্যের অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছি। আরও কথা আছে।

সূক্ষ্মানুভূতি শক্তি কথাটি অনেকবার ব্যবহার করিয়াছি। এক্ষণে সূক্ষ্মানুভূতি সম্বন্ধীয় আমার মনের ভাব আর একটু পরিষ্কার করিতে চাই। মনে কর একখানি রাঙ্গা কাপড় আছে, আর একটি ঠিক সেই রকম রাঙ্গা গোলাপ ফুল আছে, আরও মনে কর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথায় দুইটি বর্ণই (solar spectrum) সৌরকর ছবির একই স্থান অধিকার করিতে পারে অথচ আমরা ঐ দুইটি বর্ণের ভিতর একটু কি প্রভেদ দেখিতে পাই।—গোলাপের জ্যোতি—আছে কাপড়ের বর্ণের সেই জ্যোতিটুকু নাই। গোলাপের বর্ণে এমন একটি কি আছে যাহা কাপড়ের বর্ণে নাই।—এই কি জিনিসটি কি, তাহা ঠিক বুঝিবার জন্য দর্শনেন্দ্রিয়ের যেরূপ বিকাশ হওয়া উচিত,—তাহাকেই দর্শনানুভূতি শক্তির একটু সূক্ষ্ম বিকাশ বলা যায়।

হিন্দুরা যাহাকে মণি বলিয়া থাকেন, দর্শনেন্দ্রিয়ের একটু সূক্ষ্ম বিকাশ হইলে অন্ধকারে সেই মণি হইতে এক প্রকার আলোক বহির্গত হইতে দেখা যায় এইরূপ কথা শুনা আছে। সকলে কিন্তু সে আলোক দেখিতে পায় না। এই বিষয় লইয়া পণ্ডিত রিসনব্যাক্, এবং বিলাতের সাইকিক্যাল রিপোর্ট সোসাইটির বিজ্ঞানবিদ্ মেম্বরেরা অয়স্কান্ত মণি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। একখানি অয়স্কান্ত মণি (magnet) খুব অন্ধকার ঘরে রাখিলে সাধারণের চক্ষে কিছুই দেখা যায় না. কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ কতক সূক্ষ্মানুভূতি শক্তি বিশিষ্ট লোক লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে অয়স্কান্ত মণির দুই প্রান্ত হইতে দীপশিখার ন্যায় আলোক বাহির হইতে দেখা যায়। রিসনব্যাক্স রিসার্বেক্ নামক গ্রন্থে এই আলোক সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। গোলাপের বর্ণে আর রাঙ্গা কাপড়ের বর্ণে যে প্রভেদটুকু দেখিতে পাই,—তাহার কারণ গোলাপ হইতে ঐরূপ সূক্ষ্ম আলোক (গোলাপকে অন্ধকারে লইয়া গেলে সাধারণ চক্ষে যে আলোক দেখা যায় না) বহির্গত হয় কিন্তু রাঙ্গা কাপড়খানি হইতে তাহা হয় না।

আবার দেখ, বালিকার চক্ষের জ্যোতি, যুবতীর চক্ষের জ্যোতি, একটি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির চক্ষের জ্যোতির মধ্যে পরস্পর যে প্রভেদ আছে ইহা আমরা সাধারণে যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। এই সকল প্রভেদ কোথায় এবং কিরূপ, ইহা যিনি ঠিক বুঝিতে পারেন তাঁহার দর্শনানুভূতি সূক্ষ্মতা পাইয়াছে বলা যায়। আর্য্যগণ এইরূপ আলোচনা দ্বারা রূপ গুণবিশিষ্ট তেজঃ পদার্থের স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ইত্যাদি ৭ রকম অবস্থা দেখিতেন। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ জনঃ তপ মহঃ সত্য লোক ভেদে তেজের এই প্রকার ৭ রকম অবস্থা হইয়া থাকে। এ সব কথা আমরা কেবল স্থূল ইন্দ্রিয় শক্তি লইয়া বুঝিতে পারি না। সেইরূপ পাশ্চাত্যগণ ঋষি সাহায্য ব্যতীত প্রকৃত বেদার্থ বুঝিতে পারেন না। তবে পাশ্চাত্যগণ বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের যেটুকু উপকার করিয়াছেন সেই জন্য তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্যগণ বেদ আলোচনা করিতেছেন বলিয়াই ত আমরা বেদ আলোচনা করিতে আজি যত উৎসুক হইয়াছি;—আমাদের সমাজে ধর্ম্মের অবস্থা আজি কাল বড়ই শোচনীয়; এ সময়ে ধর্ম্মের পুনরোদ্ধার জন্য যেখান হইতে সাহায্য পাইতে পারি সেখান হইতেই সাহায্য লওয়া

কর্ত্তব্য। বেদে যদি সত্য থাকে, তবে রমেশ বাবুর অনুবাদে বেদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। সত্যই সত্যকে রক্ষা করিবেন।

আমি বেদমন্ত্র সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম তাহা দ্বারা আমার মনের ভাব আমি স্পষ্টরূপে বুঝাইতে পারি নাই—সে জন্য পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। বেদমন্ত্রের কথা আরম্ভ করিয়াই যে স্পষ্ট বুঝাইতে পারিব সেরূপ সাধ্যও নাই তবে ক্রমে ক্রমে যতদূর পারি ততদূর করিতে ইচ্ছা রহিল।

শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ঋগ্বেদের মন্ত্র সকলকে পরমাত্মাপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে চান কিন্তু রমেশ বাবুর ব্যাখ্যা পরমাত্মা পক্ষের ব্যাখ্যা নহে। এ সম্বন্ধে আমি যাহা বুঝি তাহা বলিব।

কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্র সকলের বিষয় দেবতা—পরমাত্মা নহেন জ্ঞান কাণ্ডের লক্ষ্য—পরমাত্মা। যখন কর্ম্মকাণ্ড আলোচনা করিব তখন দেবতার অর্থ পরমাত্মা বুঝিলে চলিবে না। পদার্থ সকলের মধ্যে বৈষম্য আলোচনা করিয়া তাহার পর অনুসন্ধান করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য to Find out unity in diversity বেদে যে প্রাকৃতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা আছে তাহাও ঠিক ঐ নিয়মানুযায়ী কর্ম্মকাণ্ডে বৈষম্য আলোচনা করা হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডে সকল তত্ত্বের সাম্য বুঝান হইয়াছে। ইংরাজি বিজ্ঞান শাস্ত্র যাহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন যে পাশ্চাত্যগণ প্রথমে (Heat Light Electricity Magneitsm ইত্যাদি) ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সকলকে ভিন্ন ভাবে দেখিয়া সেই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন গুণ সকল আলোচনা করিয়া তাহার পর যখন (Corelation of forces) শক্তি সামঞ্জস্য বুঝিতে পারিলেন তখন সকল শক্তিই যে এক শক্তির রূপান্তর তাহাই বুঝিতে পারিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ যদিও এই কথা বলেন যে এক শক্তি হইতে অন্যান্য শক্তি সকল উদ্ভূত হয়, তথাপি তাহার মতে ইলেকট্রিসিটি অর্থে হিট একথা বলা সঙ্গত হয় না। যদিও সবিতা শক্তি, বিষ্ণু শক্তি ইত্যাদি বেদের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সকল এক পরমাত্মারই বিকার মাত্র, তথাপি সবিতা অর্থে পরমাত্মা বুঝা ঠিক কথা নহে। এক সূর্য্যরশ্মিরই বিকারে নীল পীত ইত্যাদি বর্ণ সকল প্রকাশ পায়, কিন্তু তাই বলিয়া নীল অর্থে সূর্য্যের শুভ্ররশ্মি বলা যায় না।

হিন্দুবিজ্ঞান পদ্ধতি কিরূপ তাহা বুঝিতে গেলে একটি কথা সতত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। হিন্দুরা মনুষ্যকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বুঝিতেন এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যাহা বুঝিতেন সমস্ত জগতকে ঠিক সেই ভাবে দেখিতেন।

চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে কি সম্বন্ধ ইহা বুঝিতে গিয়া ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে চন্দ্র ও সূর্য্য শক্তির ক্রিয়া আলোচনা করিয়া চন্দ্রজনিত ভাব ও সূর্য্যজনিত ভাবের সম্বন্ধ বুঝিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ বুঝিতেন। ক্ষুদ্র জগতের সবিতা দেবতাকে বুঝিয়া তাঁহারা সৌর জগতের সবিতা দেবতাকে বুঝিতেন। আবার ক্ষুদ্র জগতের সূর্য্য তত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহারা প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, জড় জগৎ সম্বন্ধীয় সবিতা দেবতাকে বুঝিতেন। সবিতা দেবতার কার্য্যক্ষেত্র অনুযায়ী আবার সবিতা দেবতার নানারূপ অর্থ করা যায়। ইংরাজি বিজ্ঞানের (wave motion) কথাটিতে যেমন কখনও শব্দ, কখনও তেজ, কখনও আলোক এইরূপ অর্থ বুঝায় অথচ (wave motion উর্ম্মীগতি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গণনা সকল উর্ম্মীগতির যে অর্থ লও তাহাতেই ঠিক খাটে, বেদের দেবতা সকল সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। বেদের দেবতা সকল সম্বন্ধীয় ভাবকে ইংরাজি কথায় (Abstract Ideas) নির্ব্বিশেষ ভাব বলা যায়। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে এই (Abstract idea) নির্ব্বিশেষ ভাব সকলের সম্বন্ধ বুঝান আছে। এক দুই তিন এই সকল কথা (Abstract idea) নির্ব্বিশেষ ভাবের উদাহরণ। এক এই কথাটি যেমন দ্রব্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবে সেইরূপ অর্থ বোধ হইবে। যেমন একটি ফল একটি ফুল। সেইরূপ বিষ্ণু দেবতা কথাটিতে একটি (abstract idia) বুঝিবে। তাহার পর স্থূল জগতের বিষ্ণু, ক্ষুদ্র জগতের বিষ্ণু, প্রাণী জগতের বিষ্ণু এই সকল কথায় যেমন অর্থ বুঝায় সেইরূপ বুঝিতে হইবে। সুতরাং তুমি একটি মন্ত্রের অর্থ যেরূপ জগৎ লইয়া বুঝিতে যাইবে সেইরূপ ভাবে সেই মন্ত্রের অর্থ বুঝিবে। আর এক জন হয়ত অন্য জগৎ লইয়া বুঝিতে গিয়া অন্যরূপ ভাবে সেই মন্ত্রের অর্থ বুঝিবেন। বেদমন্ত্র সম্বন্ধীয় (abstract) নির্ব্বিশেষ ভাবটি অন্তরে ধারণা করিতে পারিলেই বেদ মন্ত্র ঠিক বুঝা গিয়াছে বলা যায়। ইহাকেই মন্ত্র সিদ্ধ হওয়া বলে।

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।

অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।

এই মন্ত্রটির অর্থ লইয়া সংবাদ পত্রে অনেক গোলমাল করা হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুর ত্রিপাদ সম্বন্ধে আমি যেরূপ বুঝি তাহাই সংক্ষেপে বলিতে চাই। হিন্দুরা সকল শক্তির ক্রিয়াতেই চক্রের গতি দেখিতেন। কোন দেব শক্তির বশে সকল পদার্থকেই চক্রপথে ঘুরিতে হয়। এই স্থূল পদার্থ পৃথিবী যে

দৈবশক্তির বশে ঘুরিতেছে, প্রতি ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড বাদে আবার যেখানকার পৃথিবী সেইখানে আসিতেছে, আমি চেতন পদার্থ মনুষ্য সেই দৈব শক্তির বশে আজ যে অবস্থায় আছি—সেই অবস্থায় ক্রমশ পরিবর্ত্তন হইয়া আবার ৩৬৫ দিন বাদে ঘুরিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইব। এই চক্রের গতি তালে তালে হইয়া থাকে হিন্দুরা এইরূপ বুঝিতেন। বিষ্ণুশক্তি চক্র তালে ঘুরিয়া থাকে; তাই বিষ্ণুশক্তি ত্রিপাদ। তাই বিষ্ণু দেবতার তিন পা। এখন যিনি একদিনের চক্রে বিষ্ণু ক্রিয়া দেখিতে যাইবেন তাঁহাকে প্রাতঃ সূর্য্য, মধ্যাহ্ন সূর্য্য এবং সায়ং সূর্য্য দেখিয়া উহা বুঝিতে হইবে। যিনি বর্ষচক্রে বিষ্ণুর ত্রিপাদ দেখিতে যাইবেন তিনি গ্রীষ্মের প্রারম্ভে, শরতের আরম্ভে এবং শীতের আরম্ভে বিষ্ণুর তিন পা দেখিতে পাইবেন। আবার যিনি জীবের ভূলোক ভুবলোক স্বর্লোক ভ্রমণ চক্রে বিষ্ণুর পদ দেখিতে যাইবেন, তিনি ভূলোকে এক পা, ভুবলোকে এক পা, এবং স্বর্লোকে এক পা দেখিতে পাইবেন। আমি এই সব ভাবিয়া বুঝিয়াছি যে রমেশ বাবুর অর্থও এক-রকম ঠিক; আর চূড়ামণি মহাশয়ের অর্থও একরকম ঠিক। আইস, মিছে ঝগড়া ঝাটি ছাড়িয়া দিয়া সকলে মিলিয়া মিশিয়া হিন্দুধর্ম্মের পূর্ব্ব গৌরব-স্থাপন করিবার চেষ্টা করি। আমাদের হিন্দু সমাজ অধঃপাতে গিয়াছে। হিন্দু সমাজে প্রকৃত ধর্ম্মভাব লোপ পাইয়াছে; হিন্দু সমাজের অবস্থা দেখিয়া প্রাণ কাঁদিতে থাকে; আমাদের ভিতর বৈষয়িক সভ্যতা নাই—এবং আধ্যাত্মিক সভ্যতার জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় দেহটি আছে। আমাদের সমাজের বন্ধন নাই,—বন্ধন আলগা হইয়া পড়িয়াছে, আইস সকলে মিলিয়া মিশিয়া বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করি।

হিন্দু

ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা।

জগতে জড়ের পরিমাণ ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যে দিকে ফিরি সেই দিকেই দেখি জড়। এই যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি ইহাতে কতই জড়—কতই মাটি, কতই জল, কতই প্রস্তর, কতই

কাষ্ঠ, কতই অস্থি, কতই মাংস কতই রক্ত, কতই ফুল, কতই ফল, কতই বাতাস, কতই বহ্নি—জড়ের সীমা নাই, সংখ্যা নাই, শেষ নাই। আবার এমন কত পৃথিবীই আছে—এ পৃথিবী অপেক্ষা দশ গুণে বড, শত গুণে বড, সহস্র গুণে বড। এক একটা সূর্য্যমণ্ডল কি ভয়ানক জড় পিণ্ড! এমন কত সূর্য্যমণ্ডলই আছে। এক একটা নক্ষত্র কি প্রকাণ্ড জড় রাশি। এমন কত নক্ষত্রই আছে। শূন্য আকাশটা ও শূন্য নয়। তাহা জড় বায়ুতে, জড় বিদ্যুতে জড় আলোকে, জড় ঈথারে ভরা। জগতে সবই জড়। জড় অনন্ত, জড় অসীম। সেই পরম চৈতন্যময় মহাপুরুষ ই ত এই প্রকাণ্ড জড় রাশি সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে এই প্রকাণ্ড জড় রাশি কি শুধুই জড়? জড়ে কি কেবল জড়ত্বই আছে? জড়ে যদি শুধু জড়ত্বই থাকে তবে জড় ত চৈতন্যময়ের সৃষ্টি হইতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্ট পদার্থে থাকিবেনই থাকিবেন। কার্য্যে কারণ থাকিবেই থাকিবে তবে কেন বল জড় কেবলই জড়?

না, না, জড় কেবলই জড় নয়। তাহা হইলে এত জড়ের মধ্যে থাকিয়া চৈতন্য-বিশিষ্ট মানুষের অধোগতির কি সীমা থাকিত না? স্বয়ং চৈতন্যময়ের চৈতন্য অবিকৃত থাকিত? না, না, জড় শুধু জড় নয়। জড়ের আত্মা আছে, জড়ের আধ্যাত্মিকতা আছে। জড়ে আত্মা আছে বলিয়াই, জড়ে আধ্যাত্মিকতা আছে বলিয়াই জগতে জীব এবং জগতে চৈতন্যবিশিষ্ট মানুষ উৎপন্ন হইতে পারিয়াছে। জীবে যে চৈতন্য আছে নির্জ্জীবে তা নাই। চৈতন্যের গুণে জীবের চৈতন্য, একথা সত্য। কিন্তু জীবের জড়ত্ব নির্জ্জীবের জড়ত্ব হইতে ভিন্নও ত বটে। জীবের জড়ত্বের গুণ প্রকৃতি এবং মূর্ত্তি নির্জীবের জড়ত্বের গুণ প্রকৃতি এবং মূর্ত্তি হইতে বড় ভিন্ন। জীবের জড়ত্ব এবং নির্জীবের জড়ত্ব দুই ভিন্ন শ্রেণীর জড়ত্ব বলিয়া মনে হয়। গোড়ায় দুই জড়ত্ব এক, কিন্তু গোড়ার জড়ত্ব জীবে এতই পরিবর্ত্তিত যে তাহাকে আর গোড়ার জড়ত্ব বলিয়া চেনা যায় না। খানিকটা মাটি বা পাথর বা জল আর জীব-শরীর তুলনা করিয়া দেখিলে জড়ের এই যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছি তাহা উপলব্ধি হইবে। মাটি পাথর বা জল কি জিনিস আর জীবশরীরই বা কি জিনিস? কে বলিবে দুই জিনিস এক রকমের, এক প্রকৃতির, এক শ্রেণীর? না, জীবের জড়ত্ব নির্জীবের জড়ত্ব হইতে ঢের বিভিন্ন। এই বিভিন্নতায় জড়ের আত্মা আধ্যাত্মিকতা এবং আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই।

চৈতন্যের সহিত থাকিতে হইলে, চৈতন্যকে পুষিতে হইলে, চৈতন্যকে ধারণ করিতে হইলে নির্জীব জড়কে অনেক পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হয়। সেই পরিবর্ত্তনই জড়ের উন্নতি। সে উন্নতি আত্মার সহিত সহবাসের জন্য এবং আত্মাকে আশ্রয় দিবার জন্য। জড়ের সেই পরিবর্ত্তনরূপ উন্নতি না হইলে জগতে আত্মার আবির্ভাবও হয় না আশ্রয় স্থানও থাকে না। আত্মার উপযোগী জড়ত্ব ব্যতীত জগতে আত্মার বিকাশ হয় না। নির্জীব জড় চিরকাল সেই উপযোগিতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই আত্মার-উপযোগী-জড়ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। Evolution বা ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতিতে সেই চেষ্টা এবং অগ্রবর্ত্তিতা ব্যক্ত হইতেছে। সেই উপযোগিতা লাভ করিতে চেষ্টা করাব এবং সেই আত্মার-উপযোগী-জড়ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার নামই জড়ের আধ্যাত্মিকতা বা আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। জড়ে আত্মা না থাকিলে তাহার কি এই আধ্যাত্মিকতা বা আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা থাকিত? জড়ে আত্মা আছে বলিযা তাহাতে আধ্যাত্মিকতাও আছে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাও আছে। এবং জড়ে আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়া মানুষ ও এই বিপুল জড় রাশির মধ্যে থাকিয়া জড়ে পরিণত হয় না, চৈতন্যময়ের চৈতন্য বিকার প্রাপ্ত হয় না। জড় জগৎও সেই জন্য চৈতন্যময়কে দেখাইতে এত ভালবাসে এবং মানুষ জড় জগতে চৈতন্য-ময়কে দেখিলে মানুষের চৈতন্যময়ও বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। যে জড়ের প্রকৃতি এবং আকাঙ্ক্ষা বুঝে কেবল সেই জড়ত্ব কর্ত্তৃক পরাভূত হয় না, কেবল সেই এই বিপুল জড় রাশির জড়ত্বকে অতিক্রম করিয়া তাহার আধ্যাত্মিকতাকে আপনার আধ্যাত্মিকতার সহিত মিশাইযা লয় এবং কেবল সেই আপনার অন্তরেও যে চৈতন্যময়কে দেখে, জড়েও সেই চৈতন্যময়কে দেখে। তাহার কাছে চৈতন্যময়ের ধ্যানের সাকার নিরাকার উভয় পদ্ধতিই সমান।

সমস্ত জড় জগতের যেমন মানব দেহেরও তেমনি আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা আছে। মনুষ্যের এমন একদিন গিয়াছে যখন মনুষ্যের হস্ত পদ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় কেবল দেহের সেবায় নিযুক্ত থাকিত। তখন আহার বিহার বই মনুষ্যের অন্য কাজ ছিল না। তখন আহার বিহারে এবং আহার বিহারের উপকরণ সংগ্রহেই মনুষ্যের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আনন্দ আসক্তি এবং পরিতৃপ্তি ছিল। ক্রমে সে দিন গিয়া মনুষ্যের অন্য দিন হয়। তখন আহার বিহার ছাড়া জ্ঞানোপার্জ্জন প্রভৃতি উন্নত বিষয়েও মনুষ্যের ইন্দ্রিয়

নিযুক্ত হইয়াছিল। শুধু আহারবিহারে তখন আর মানবেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয় নাই—আহারবিহারকে কিঞ্চিৎ তুচ্ছ করিয়া মানবেন্দ্রিয় তখন জ্ঞানোপার্জন প্রভৃতি উচ্চ বিষয়ের অনুরাগী হইয়া তাহারই অনুধাবনে সম্পূর্ণ আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। এইরূপ মানুষের মানসিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিক আসক্তিও বিকশিত হয়। ইন্দ্রিয়ের এই আধ্যাত্মিক আসক্তির বিকাশ কেবল মাত্র মানসিক শক্তির বিকাশের ফল বা অনুসরণ নয়। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আসক্তি না থাকিলে মন আপন বিকাশ-ক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়ের সহায়তা পাইত না এবং তাহা হইলে সে বিকাশ ক্রিয়া অত্যল্প পরিমাণে সম্পন্ন হইয়া বন্ধ হইয়া যাইত। অতএব ইন্দ্রিয়ের নিজের আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আসক্তি স্বীকার করিতেই হয়। আর যদি ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আসক্তিকে মানসিক শক্তির ফল বা অনুসরণ মাত্র বিবেচনা কর, তবে ইন্দ্রিয় এবং মানসিক শক্তিকে এতই সম্বদ্ধ পদার্থ বলিয়া বুঝিতে হয় যে মনকে আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে ইন্দ্রিয়কেও আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার না করিলে চলে না। অতএব যে ভাবেই দেখা যায়, ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আসক্তি অস্বীকার করা যায় না। তাই বলি যে মানব মনের আধ্যাত্মিকতা যত বৃদ্ধি হয় মানবেন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আসক্তিও তত বৃদ্ধি হয়। মনুষ্য জাতির ইতিহাস ও এই সত্য ঘোষণা করে। মনুষ্যের মনের এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই অপূর্ব্ব যোগ আছে বলিয়া মনুষ্যের মন যখন ভগবানে ভোর হয় তাহার ইন্দ্রিয় ও তখন ভগবানকে লইয়া থাকে, তাহার ইন্দ্রিয় তখন ভগবান ছাড়া আর কিছুতেই সারবত্তা দেখে না এবং আর কিছু লইয়া আনন্দিত বা পরিতৃপ্ত হয় না। তখন মন ও ভগবানময় হয়, ইন্দ্রিয় ও ভগবানময় হয়। তখন জড় ও চৈতন্যের প্রভেদ থাকে না। তখন কি জড় কি চৈতন্য কি ইন্দ্রিয় কি মন সকলই প্রেমভক্তিতে গলিয়া এক ভেদ-শূন্য ভক্তরূপে ভগবানের পাদপদ্মে লুটাইতে থাকে। তখন জড়ও থাকে না চৈতন্যও থাকে না, ইন্দ্রিয়ও থাকে না মনও থাকে না। তখন এক ভক্তি, ভক্তি, ভক্তিই থাকে। তখন ভগবানের পদে ভক্তির আহুতিতে জড়ও লয় হইয়া যায়, চৈতন্য ও লয় হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়ও লয় হইয়া যায়, মনও লয় হইয়া যায়। ভগবদ্ভক্তিরূপ উৎসর্গে জড় ও যা চৈতন্য ও তাই, ইন্দ্রিয় ও যা মন ও তাই। সে উৎসর্গে জড় ও চৈতন্য, মন ও

ইন্দ্রিয় একই বস্তু—প্রভেদ শূন্য আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা মাত্র। ভাগবতে ইন্দ্রিয়ের এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতা দেখিতে পাই।

বিলেবেতোরুক্রম বিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্ট কিরীট যুষ্ট মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমে মুকুন্দং।
শাবৌ করৌনো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎ কাঞ্চন কঙ্কনৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্নিনিরীক্ষতোযে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্ম ভাজৌ ক্ষেত্রানি নানু ব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রি রেণুন্ নজাতু মর্ত্ত্যোহভি লভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু নবেদ গন্ধং॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমানৈ হরিনামধেয়ৈঃ।
নবিক্রিয়েতাথ যদাবিকারং নেত্রে জলং গাত্ররুহেষুহর্ষঃ॥

(২ স্কন্ধ, ৩ অধ্যায়, ২০—২৪)

যে মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে তাহার দুইটি কর্ণপুট বৃথা ছিদ্র মাত্র, আর যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান না করে তাহার দুষ্টা জিহ্বা ভেক জিহ্বার তুল্য। আর যে মস্তক মুকুন্দ চরণারবিন্দে প্রণত না হয় তাহা পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কীরিটে সজ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র, আর যে দুই হস্ত হরির সপর্য্যা না করে তাহা কাঞ্চন কঙ্কণে দেদীপ্যমান হইলেও সেই দুই হস্ত মৃতকের হস্ত তুল্য হয়। অপর যে দুই নয়ন শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির দর্শন না করে তাহা ময়ূর পুচ্ছের সদৃশ বস্তুত তাহার কোন কার্য্যকারিতা নাই, আর যে দুই পদ হরিক্ষেত্রে গমন না করে তাহারা বৃক্ষবৎ জন্ম লাভ করিয়াছে। অপর হে সূত! যে ব্যক্তি কখন ভগবদ্ভক্তের পাদরেণু ধারণ না করে সে ব্যক্তি জীবঞ্ছব অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই মৃতক তুল্য, আর যে মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর পদলগ্না তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত না হয় সে নিশ্বাস সত্বেও শবশরীরী সদৃশ। হে সূত! হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে এবং বিকার হইলেও যদি নেত্রে অশ্রু এবং গাত্রে লোমাঞ্চ না হয় তবে সে হৃদয় পাষাণের তুল্য কঠিন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদ।

ভক্তের দেহের ও ইন্দ্রিয়ের এই আকাঙ্ক্ষা, এই আধ্যাত্মিকতা। ভক্তের সবই ভগবানের—মনও ভগবানের দেহও ভগবানের। তাই ভক্তের মনও

ভগবানের পাদপদ্মে লুটায় দেহও ভগবানের পাদপদ্মে লুটায়। ভক্ত এক ভগবানকে বই আর কাহাকেও জানে না, তাই তাহার যা কিছু আছে সবই সে ভগবানকে উৎসর্গ করে। তুমি ভগবদ্ভক্ত, ভাগবতকারের ন্যায় তোমার যদি ভগবানের গঠিতমূর্ত্তি না থাকে তথাপি তুমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ ভগবানের মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার চক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। ভগবদ্ভক্ত সাকারবাদীই হউক আর নিরাকারবাদীই হউক, প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত বৃক্ষলতায় সমুদ্র-সরোবরে পাহাড়-পর্ব্বতে ভগবানের সৌন্দর্য্য দেখাকে চক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রিয় কার্য্য মনে করে, পক্ষীর কূজনে এবং নির্ঝরিণীর ঝর ঝর শব্দে স্রোতস্বতীর কলকল কল্লোলে ভগবানের মধুর সম্ভাষণ শ্রবণ করাকে কর্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রিয় কার্য্য মনে করে, পুষ্পের সৌরভে ভগবানের সৌন্দর্য্যের সৌরভ আঘ্রাণ করাকে নাসিকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রিয়-কার্য্য মনে করে। ইংরাজ কবি কাউপর ও বার্দস্বার্থ এইরূপ মনে করিয়া জগতে জগদীশ্বরকে দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। তাহা না করিলে তাঁহাদের চক্ষু কর্ণাদির সার্থকতা ও পরিতৃপ্তি হইত না। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত জড় চৈতন্যের প্রভেদ জানে না। প্রভেদ থাকে তাহার ভগবানই তাহা জানেন। সে তাহার মনও যেমন ভগবান হইতে পাইয়াছে, দেহও তেমনি ভগবান হইতে পাইয়াছে। অতএব তাহার মনকেও যেমন সে তাহার ভগবানকে আহুতি দেয়, দেহকেও তেমনি তাহার ভগবানকে আহুতি দেয়। দেহকে আহুতি না দিয়া সে থাকিতে পারে না। তাই সে বাহ্যজগতে ভগবানকে না দেখিয়া না শুনিয়া অঞ্জলি ভরিয়া পুষ্পোৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার ভগবানের এত সাধের এত সুন্দর এত বৈচিত্রময় এত ঐশ্বর্য্যভরা জগতে ভগবানকে চক্ষু ভরিয়া না দেখিলে, কর্ণ ভরিয়া না শুনিলে, অঞ্জলি ভরিয়া জগৎ উপহার না দিলে তাহার মনের সাধই বা মিটে কৈ, তাহার দেহের সাধই বা মিটে কৈ ? তুমি, জ্ঞানী, সাকারবাদের নিন্দা কর; কিন্তু সে প্রেমিক ও ভক্ত, ভগবানকে চক্ষু দিয়া না দেখিয়া থাকিতে পারে কৈ ? তাহার ভগবান সাকার বল নিরাকার বল সবই। মন বল দেহ বল ভগবান তাহাকে দেখিবার জন্য যত রকম যন্ত্র দিয়াছেন সেই সব যন্ত্র দিয়া ভগবানকে না দেখিলে তাহার ভগবানকে দেখিয়া আশ্ মিটে কৈ ? সে প্রেমিক ও ভক্ত—সে তোমার সাকার নিরাকারবাদের অত সব মারপ্যাঁচ বুঝে না—অত সব অসীমত্ব-সসীমত্বের গণ্ডগোল, বুঝে না—সে এক ভগবানের নেশায় ভোর, সে এক

অসীম ভগবানই বুঝে, এক অসীম ভগবানই ভরা, এক অসীম ভগবদ্বস্তু লইয়াই বিহ্বল। সে সীমা সরহদ্দের ধার ধারে কি? সীমা সরহদ্দই বা তাহার করিতে পারে কি? তাই সে তোমার সব বাদাবাদের সীমানা সরহদ্দ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে সীমা বহির্ভূত হইয়া তাহার যা আছে, মন বল, আত্মা বল, চক্ষু বল, কর্ণ বল, নাসিকা বল, হৃদয় বল, সমস্ত ভরিয়া তাহার ভগবানকে দেখে এবং ধ্যান করে। তাই ঘোর ভগবদ্ভক্ত তাহার মনকেও যেমন ভগবানকে আহুতি দিয়া পবিত্র করে, তাহার দেহকেও তেমনি ভগবানকে আহুতি দিয়া পবিত্র করে। তাহার মনেরও যেমন পবিত্র হইবার বাসনা, তাহার দেহেরও তেমনি পবিত্র হইবার বাসনা। সে বাসনার কাছে মনেরও দেহের প্রভেদ নাই। প্রভেদ থাকিলেও সে বাসনার বলে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং নিকৃষ্ট দেহ উৎকৃষ্ট মনের যে উৎকৃষ্টতা সেই উৎকৃষ্টতা লাভ করে। যে ছোট, ভক্তি বলে সে বড় হইয়া যায়। জগতের দুইটি দৃশ্যমান উপাদান—জড় ও চৈতন্য—ভক্তিবলে এক হইয়া সেই এক-কে প্রাপ্ত হয়। ইহাতেই জগতের মুক্তি। ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে হইলে, ভগবানের কাছে যাইতে হইলে শুধু মনকে পবিত্র করিয়া লইয়া গেলে চলিবে না, দেহকেও পবিত্র করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। ফলত দেহকে পবিত্র না করিলে মনকেও পবিত্র করিতে পারিবে না। দেহকে ভগবদ্ভক্ত না করিলে মনকেও ভগবদ্ভক্ত করিতে পারিবে না। দেহকে মুক্ত করিতে না পারিলে মনকেও মুক্ত করিতে পারিবে না। কঠোর তপস্বীর ন্যায় দেহকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলে পাপ হইবে। নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করাই মুক্তি। নিকৃষ্ট দেহকে নষ্ট করা অধর্ম্ম। নিকৃষ্ট দেহকে উৎকৃষ্ট করিয়া উৎকৃষ্ট আত্মায় মিশাইয়া ফেলাই প্রকৃত ধর্ম্ম এবং মুক্তি। দেহকে আত্মার আকাঙ্ক্ষায় ভরাইয়া ফেলিতে না পারিলে দেহও আত্মায় মিশে না, মানুষের মুক্তিও হয় না অতএব দেহ বল মন বল তোমার যা আছে সমস্তকে ভগবদ্ভক্ত করিলে তবে তুমি ভগবানকে পাইবে। ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহকে সেই জন্য উন্নত করিয়া আত্মার আধ্যাত্মিকতায় মিশাইয়া দেওয়া চাই। নিকৃষ্ট জড় উৎকৃষ্ট চৈতন্যে না মিশিলে সমস্ত জগৎ জগদীশ্বরে মিশিতে পারিবে না বলিয়া ভগবান জড়কে এবং মানবেন্দ্রিয়কে আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন। সেই আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া মনুষ্যের

মনের ন্যায় মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ও ভগবানের পদে আপনাকে আহুতি দেয়। সে আহুতিকে সাকার উপাসনা বলে না—প্রেমভক্তির ভরামাত্রা বলে। মনের আহুতির সহিত ইন্দ্রিয়ের সেই আহুতি যোগ হইলে তবে ভগবানের কাছে মনুষ্যের আহুতি পূর্ণতা লাভ করে, নচেৎ মনুষ্যের ভক্তিও পূর্ণ হয় না, ঈশ্বরাহুতিও পূর্ণ হয় না। ভগবানকে পূর্ণাহুতি দিবার জন্য মনুষ্যের মনও যেমন আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট হইয়াছে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ও তেমনি আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয়ের সে আকাঙ্ক্ষা নাই তাহার ঈশ্বর পূজাও অসম্পূর্ণ ঈশ্বরাহুতিও অসম্পূর্ণ ঈশ্বরভক্তিও অসম্পূর্ণ। সে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

———:০০:———

মহাতরঙ্গ।

এই জগৎ এক মহাতরঙ্গ। তুমি আমি কি তাহার বুদ্বুদের মধ্যেও গণ্য নহি?

ঐ যে সান্ধ্য প্রদোষে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া প্রকৃতির অঙ্গে রজত কিরণ ঢালিয়া দিতেছে; সান্ধ্য সমীরণ থাকিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কুসুম রেণু বহন করিয়া তাপিত প্রাণে অমৃত ধারা সিঞ্চন করিতেছে; অদূরে কলনাদিনী তরঙ্গিণী কুল কুল রবে বহিয়া প্রশস্ত হৃদয়ে চন্দ্রকান্তি ধারণ করিয়া স্বর্ণতরঙ্গের লহরীর সহিত তোমার চিন্তাকুল মানস সরসে অবিচ্ছিন্ন উর্ম্মীমালা তুলিতেছে; প্রকৃতির এই অনুপম লাবণ্য বিকাশ, সৌন্দর্য্যের এই অলৌকিক স্ফূরণ, বল দেখি ইহা আসিল কোথা হইতে? ইহার উদ্ভব কোথায়? ইহার লয় কোথায়? বিজ্ঞান বলিবে ইহা এক বিশাল সৌন্দর্য্য সাগরের ক্ষণবর্ত্তী তরঙ্গ মাত্র; পূর্ব্ববর্ত্তী উর্ম্মীতে ইহার জন্ম, পরবর্ত্তী উর্ম্মীতে ইহার নাশ। আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাউক।

জগতের তাবৎ বস্তুই গতিশীল। ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে মহাকায় সৌরমণ্ডল মহাবেগে অসীম আকাশ পথে ধাবমান। জড়রূপী মহাদেবের বিরাট শরীরের উপর মহাশক্তির যে বিকট নৃত্য চলিতেছে, সেই বিকট নৃত্যের ফল এই গতি

ক্রিয়া—সৃষ্টির এই বিচিত্র লীলা, জগতের এই জীবন। কিন্তু এই প্রকাণ্ড জগদ্-যন্ত্র কি অনিয়ন্ত্রিত? এই বিশাল গতিক্রিয়ার কি কোন নিয়ম নাই? বিজ্ঞান বলিবে, আছে। দেখা যাউক সে নিয়ম কি।

মহামতি নিউটনের নামে প্রচলিত গতির প্রথম নিয়মানুসারে কোন জড়-পিণ্ড একবার চালিত হইলে যদি তাহার গতি অপর শক্তি কর্তৃক প্রতিহত না হয় তবে চিরকালই সমান বেগে একই দিকে চলিতে থাকিবে। যেখানে দেখিবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম সেই খানেই বুঝিবে কোন এক বহিঃস্থ শক্তির বলে এই ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। পথের উপর এই মৃৎপিণ্ড গড়াইয়া দাও, একটু পরেই ইহা স্থির হইল। তুমি যে গতি ইহাতে প্রয়োগ করিয়াছিলে তাহার সমস্তই পথের ঘর্ষণজনিত প্রতিক্রিয়ায় পিণ্ড হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আবার সেই পিণ্ডটি লইয়া শূন্যপথে নিক্ষেপ কর, কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তাহা বক্র পথে ভূতলে পতিত হইল। এখানে পৃথিবীর আকর্ষণে তাহার সরল গতির ব্যত্যয় ঘটাইল এবং তাহার গতির কিয়দংশ বায়ুরাশিতে সংক্রামিত ও অপরাংশ পতন স্থলের তাপবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইল। বস্তুত সর্ব্বত্রই কোন পদার্থে শক্তি প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সমান বেগে একই মুখে ধাবিত হইবে এবং যদি বহিস্থঃ কোন শক্তি তাহার প্রতিকূলে না দাঁড়ায় তবে চিরকালই সেই একই বেগে ও একই মুখে চলিতে থাকিবে কিন্তু শক্তির ক্রীড়াভূমি এই জগতে এই নিয়ম অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা কোথায়? শক্তি যেখানে সর্ব্বব্যাপিনী, প্রত্যেক পরমাণু যেখানে এক এক স্বতন্ত্র শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ centre of foource সেখানে এইরূপ অব্যাহত গতি প্রদর্শনের স্থল কোথায়? যেখানে প্রত্যেক পরমাণু atam প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে। প্রত্যেক অণুর সহিত প্রত্যেক অণুর Moluculc সংঘর্ষণ হইতেছে * যেখানে কোন পরমাণ অপর পরমাণুকে আঘাত না করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না; সেখানে এই অপ্রতিহত বেগে ধাবিত জড়পদার্থ দেখিতে পাইব কিরূপে? তবে সেরূপ স্থলে গতির নিয়ম হইবে কি রূপ?

একটি সামান্য উদাহরণ লইয়া দেখা যাক। মনে কর দুইটি গোলক পরস্পর আকর্ষণ করিতেছে। অন্য কোথাও কোন শক্তি বা জড় নাই। মনে কর একটি গোলককে নির্দ্দিষ্ট বেগে নির্দ্দিষ্ট মুখে চালান গেল। কিন্তু অপর

* According to the kinetic theory of gases..

বর্ত্তুলটি তাহাকে অবিরত নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে। স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে এইরূপ চলিতে চলিতে ধাবমান বর্ত্তুলের বেগ ক্রমশই কমিতে থাকিবে এবং তাহার পথও ঠিক সরল রেখা না হইয়া ক্রমশ স্থির বর্ত্তুলটির দিকে বক্রীভূত হইবে। এইরূপে তাহার পূর্ব্বতন বেগ কমিতে কমিতে একবারে লোপ পাইলে বর্ত্তুলটি ক্ষণমাত্র স্থির থাকিবে ও পরক্ষণেই অপর বর্ত্তুলের আকর্ষণে ক্রমশ বর্দ্ধমানবেগে বিপরীত দিকে ধাবমান হইবে। মনে কর এইরূপে তাহা আবার আকর্ষক বর্ত্তুলের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন তাহা নিশ্চল হইবে?—না। আকর্ষণী শক্তিবলে ইহা এত বেগ পাই-য়াছে, যে আর সেস্থানে স্থির থাকিতে না পারিয়া সেই বেগেরই প্রভাবে সেই আকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে আকর্ষণ গোলকের পার্শ্বস্থল অতিক্রম করিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত চলিবে। আবার সেই চিরন্তন নিয়মবশে সেই বেগ কমিয়া গেলে আবার বিপরীত মুখে গতি আরম্ভ, আবার সেই আকর্ষকের পার্শ্বদেশ প্রাপ্তি, আবার বর্দ্ধিতবেগে সেইস্থল অতিক্রম করিয়া গমন, এইরূপে সেই বর্ত্তুলকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার চারিদিকে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। একবার নিকটে আসিবে, একবার দূরে যাইবে, আবার বর্দ্ধমানবেগে নিকটে আসিবে, আবার হ্রাসমান বেগে দূরে যাইবে, এইরূপ একবার দূরে একবার সমীপে একবার ঊর্দ্ধে একবার নীচে, এই তরঙ্গভঙ্গী ক্রমে পরিক্রমণ করিতে থাকিবে। (গণিত বেত্তারা জানেন যে এই গতির পথ একটি conicsection, এবং স্থির গোলকটি সেই পথরেখার এক অধিশ্রয়ে focus এ অবস্থিত।)

ঘটিকা যন্ত্রের পরিদোলক উল্লিখিত গতিক্রিয়ার সহজ উদাহরণ স্বরূপ দর্শিত হইতে পারে। * পরিদোলকটি একবার নাড়িয়া দিলেই সেই বল প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কিছুদূর উত্থিত হয়, কিন্তু শীঘ্রই মাধ্যাকর্ষণ তাহার সেই বেগ নষ্ট করিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া ফেলে। কিন্তু নীচে নামিতে নামিতে তাহার বেগ পৃথিবীর আকর্ষণ বলেই এত বৃদ্ধি পায় যে স্থির থাকিতে না পারিয়া অপর দিকেও কিছুদূর উত্থিত হয়। আবার উত্থান-কালে মাধ্যাকর্ষণ বলে সে বেগ ক্ষয় হইলে ক্রমে নীচে নামিয়া পুনরায় অপর দিকে উঠিতে থাকে। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত গতি বায়ু ও অপরা-

---

* উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের পথরেখাও ঐ নিয়মের অধীন। পৃথিবীর পার্শ্বে চন্দ্রের সূর্য্যের পার্শ্বে পৃথিবীর সামান্যত জ্যোতিষিক গতিমাত্রই এই পর্য্যায়ভুক্ত।

পর পদার্থের ঘর্ষণে অন্তর্হিত না হয় ততক্ষণ একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া দুলিতে থাকে; ও একবার উপরে উঠিয়া একবার নীচে নামিয়া তরঙ্গ গতির (Rythm) সরল উপভাব প্রদর্শন করে।

এই গেল আকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া এখন একবার বিপ্রকর্ষণ শক্তি লইয়া দেখা যাউক। এই বিপ্রকর্ষণ শক্তিবলে সকল দ্রব্যই স্থিতিস্থাপকতাগুণ বিশিষ্ট। কোন পদার্থকে বলদ্বারা সঙ্কুচিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেই এই বিপ্রকর্ষণ বলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ধর্ম্মেরই নাম Elastic মনে কর কতিপয় Elastic জড়াণু পাশাপাশি রহিয়াছে একটিকে সঙ্কুচিত করিয়া ছাড়িয়া দিলাম সে তৎক্ষণাৎ প্রসারিত হইয়া সন্নিকটস্থ অণুকে আঘাত করিবে ও তৎকর্তৃক প্রতিহত হইয়া সাম্যাবস্থা Equilibrium প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তৎকর্তৃক আহত অণুটি আঘাতবশত আকুঞ্চিত ও পরক্ষণেই প্রসারিত হইয়া পরবর্ত্তী অণুকে আঘাত করিবে। এরূপ ক্রমিক আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা সেই গতি অণু হইতে অণুতে সংক্রামিত হইয়া আণবিক গতির তরঙ্গমালা উৎপাদন করিতে থাকিবে। কতকগুলি গোলক সূত্রদ্বারা পাশাপাশি বিলম্বিত করিয়া এক প্রান্তে আঘাত করিলে অপর প্রান্তস্থ গোলকটি নড়িবে ও মধ্যস্থ সবগুলি স্থির থাকিবে এই সেই আণবিক গতির স্থূল উদাহরণ। *

আমরা এত জটিল তত্ত্ব যথাসাধ্য সরল করিয়া লইয়াছি। পাঠক জানেন যথা এই বিশ্বে দুইটি বা চারিটি মাত্র পদার্থ নাই এবং দুইটি বা চারিটি মাত্র স্থলে শক্তি কাজ করিতেছে না জড়পদার্থ সর্ব্বব্যাপী, শক্তিও সর্ব্বব্যাপিনী। সুতরাং এই শক্তি নিচয়ের পরস্পর সংঘর্ষে যে গতি তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহাও নিরতিশয় জটিল ও সর্ব্বথা দুরধিগম্য। তথাপি প্রণিহিত চিত্তে দেখিলে বোধ হইবে যে এই বিশ্বস্থ কোন জিনিষ সমান ভাবে সরল রেখায় চলে না। সর্ব্বত্রই তরঙ্গ ভঙ্গীতে বক্র রেখায় এই বিশাল প্রবাহ চলিয়াছে। তরঙ্গের উপর তরঙ্গউর্ম্মীর উপর উর্ম্মী, অনন্ত শক্তির অনন্ত ক্রিয়া

* শব্দ এই গতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিকীর্য্যমান তাপ Radiant heat এবং আলোক ব্যোম নামক পদার্থের আণবিক তরঙ্গ বই কিছুই নহে। clerk Maxwell এর মতে তাড়িত ও চৌম্বক প্রবাহও আলোকের রূপান্তর মাত্র। সাধারণত যাহাকে উত্তাপ বলে তাহাও অণুসকলের আন্দোলনের ফল মাত্র।

পারম্পর্য্যে এই লহরীলীলা সকল সময়ে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান না হইলেও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

ঐ যে তরঙ্গিণীর সৈকতভূমে উপবেশন করিয়া তাহার কলধ্বনি শুনিতে শুনিতে তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ক্রিয়া ভাবিতে বসিয়াছ, ঐ তরঙ্গিণীকে কি কখন সোজা পথে যাইতে দেখিয়াছ? প্রস্তর ভূমি সানুমানের পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়া তটিনী কতই না বিবিধ ভঙ্গীতে বাঁকিয়া বাঁকিয়া সাগরোদ্দেশে চলিয়াছে। আবার দেখ ঐ লীলাময়ী স্রোতস্বিনীর বক্ষের উপর জলরাশি কেমন তরঙ্গমালা উৎপাদন করিয়া চলিয়াছে। উর্ম্মির পর উর্ম্মি তার পর উর্ম্মি, অগণিত উর্ম্মিমালা অনন্ত প্রবাহে অনন্তমুখে ছুটিয়াছে। ঐ দেখ কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিগলিত পত্রটি কেমন দুলিতে দুলিতে নদীবক্ষে পতিত হইয়া কেমন নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া গেল। আবার দেখ তোমার হস্ত নিক্ষিপ্ত লোষ্টখণ্ড সেই উর্ম্মিমালা মধ্যে পতিত হইয়া কিরূপ তরঙ্গমালা উৎপাদন করিতে লাগিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া নদীর জল তরঙ্গের উপর দিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে কূলে গিয়া প্রতিহত হইতে লাগিল। যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত হইত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে তোমার হস্ত নিক্ষিপ্ত লোষ্টখণ্ড জলের ভিতর কেমন দুলিতে দুলিতে যাইয়া নদী গর্ভে পতিত হইল। ঐ যে প্রবাহিনীর কুল কুল গীতিশব্দ যাহা তোমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত স্রোতে ইন্দ্রিয় সকল অবশ করিতেছে, তাহাও ত এই প্রান্তরস্থিত বায়ুরাশির আণবিক তরঙ্গ বই আর কিছুই নয়। স্রোতস্বতীর স্রোতের মাঝে উৎপন্ন অগণিত তরঙ্গমালা সঙ্গে সঙ্গে বায়ুরাশিতে তরঙ্গরাজি উৎপাদন করিতেছে, সেই তরঙ্গরাজি আবার চারিদিকে প্রসারিত হইয়া আকাশ প্রান্তর পূর্ণ করিয়া দিগন্তে প্রধাবিত হইতেছে। আবার দেখ যে মেদুর সমীর শব্দ বহিয়া তোমার কর্ণ কুহর তৃপ্ত করিতেছে, গন্ধ আনিয়া তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জন্মাইতেছে এবং শীতস্পর্শে তোমার সর্ব্বাঙ্গে সুধা ধারা ঢালিয়া দিয়া কবিকল্পিত অমরাবতীর অপূর্ব্ব সুখের পূর্ব্বাস্বাদ দিতেছে, উহাও ত হিল্লোলময়। উপরে নীল নভপটে স্তিমিতপ্রভ তারকাবলীর মধ্যস্থলে পূর্ণ গৌরবে প্রভান্বিত সুধাকর অকাতরে অবিরত সুধা ধারা ঢালিতেছে। বসুন্ধরা বিভোর ভাবে পান করিয়া তৃপ্তি পায় না, সেই বিমলোজ্জ্বল বিমল প্রভা কবির চক্ষে যাহা রজত তরঙ্গ বলিয়া প্রতীয়মান বিজ্ঞানের চক্ষে সেও ত

তরঙ্গমালা বই আর কিছুই নয়। বিশ্বব্যাপী ব্যোম সাগরে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসীম উর্ম্মিমালা প্রবল বেগে বহিতেছে, ওত সেই উর্ম্মিরই প্রবাহ মাত্র।

তরঙ্গিণীর সৈকতভূমি ত্যাগ করিয়া দূর দেশে চাহিয়া দেখ, যে পর্ব্বত শ্রেণীর ক্রোড় দেশ হইতে নির্ঝরিণী ঝুরু ঝুরু নাদে নিপতিত হইয়া তরঙ্গ ভঙ্গীতে চলিয়াছে সেই পর্ব্বত মালার আকার কিরূপ—সেও ত তরঙ্গমালা, এখানে উচু ওখানে নীচু, এখানে অধিত্যকা ওখানে উপত্যকায় পরিণত। আবার সে সাগরে গিয়া তরঙ্গিণী সঙ্গতা হইয়াছে সে সাগর ত তরঙ্গেরই সমষ্টি, পূর্ব্বে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে তরঙ্গময়। কোথাও নদী, কোথাও চন্দ্র, কোথাও সূর্য্য, কোথাও বায়, নূতন নূতন তরঙ্গ তুলিয়া সাগরের বক্ষ আন্দোলিত রাখিয়াছে। যোজনব্যাপী বড় বড় ঢেউ, তাহার উপর তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ঢেউ, তার উপর আরো ছোট, একের উপর শত, শতের উপর সহস্র, ক্রমে অগণ্যে গিয়া পরিণত। সমুদ্রের বেলাতে, নদীর সৈকতভূমি, সৈকতে বালুস্তর কেমন মনোহর ভঙ্গী ক্রমে বিন্যস্ত। বিশাল দেশ ব্যাপী প্রান্তর উচ্চনীচ ক্রমে প্রসারিত প্রান্তরে শস্যক্ষেত্রে শস্যনিচয় সমীরণের মৃদুলদোলে দোলায়মান।

এইরূপ এ জগতে যেখানে যাইবে সেই খানেই দেখিবে সকল দ্রব্যই তরঙ্গায়িত গতিতে চলিয়াছে। তাহার একটি উর্ম্মি কোথাও যুগব্যাপী, কোথাও বর্ষব্যাপী, কোথাও আবার পলকের মধ্যে সহস্র উর্ম্মি উথলিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের গতির নিয়ম এই, ইহা কোথাও সরল পথে চলে না, ইহার গতি একবার এ ধারে, একবার ওধারে, একবার উত্তরে একবার দক্ষিণে, একবার উন্মুখী একবার অধোমুখী।

একবার অনন্ত আকাশে নিরীক্ষণ কর, মহা মহা সৌর মণ্ডল কাহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া প্রবলবেগে এ দিক ও দিক ছুটিতেছে। দেখ, কত সৌর-মণ্ডল কতদিন মহাতেজে জ্বলিয়া আবার স্তিমিতপ্রভ হইয়া গেল। আবার দেখ, কিছুদিন পরে নববলে জ্বলিয়া উঠিল। আমাদের পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে কখন সূর্য্যের নিকটে (peri-helion) আসিতেছে; কখন দূরে (aphelovion) যাইতেছে। তাহার অক্ষরেখা আবার যুগব্যাপিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবর্ত্তন করিতেছে। *

---

* যে কারণে Precession of equinoxes ঘটে।

পৃথিবীর উপরেই বা গতির কি বিচিত্র নিয়ম। গ্রীষ্মের পর শীত, শীতের পর গ্রীষ্ম, এই ঋতুবর্ত্তনও তরঙ্গ ভঙ্গিতে। বায়ুর প্রবাহ, জলের প্রবাহ তরঙ্গে; দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি তরঙ্গে; আবার দিনের মধ্যেই উত্তাপের ন্যূনাতিরেক, পার্থিব তাড়িত প্রবাহ, লৌহে চুম্বকে প্রবাহ—সেও তরঙ্গ। ভূগর্ভস্থ তরল প্রবাহ থাকিয়া থাকিয়া ভূপৃষ্ঠ আন্দোলিত করে, থাকিয়া থাকিয়া লেলিহান অগ্নিজিহ্বা প্রকট করে, ভূপিঞ্জরের স্তরাবলীকে তরঙ্গের ন্যায় বাঁকাইয়া দেয়, আবার সাগর গর্ভকে হিমালয় করিয়া, প্রশস্ত মহাদেশকে প্রশান্ত মহা সাগরে পরিণত করিয়া মহাকালের সঙ্গে সঙ্গে চপল চরণে নৃত্য করে। শীতের পর বসন্ত আইসে, বসন্ত আগমে রাশি রাশি সৌরকিরণ তরঙ্গের আস্ফালনে তরুলতা নবমাধুরী বিকাশ করে, বনের লতা মলয় মারুতে ধীরে ধীরে দুলিতে থাকে, পাপিয়া কোকিল হর্ষস্রোতে গা ঢালিয়া সঙ্গীত তরঙ্গে বনভূমি ভাসাইয়া দেয়। গ্রীষ্ম বর্ষা ফুরাইয়া গিয়া আবার যখন শীত আইসে তখন লতার সেই মোহন মাধুরী, পিকের সেই স্বরলহরী কোথায় যায়? বর্ষাগমে ভেককুল কলরব করে, জলচর পক্ষিকুল জলের উপর নাচিয়া বেড়ায়, তার পর বর্ষা ফুরাইলে তাহাদের উল্লাস পুনর্ব্বর্ষাগম পর্য্যন্ত নিবাইয়া থাকে। জীবের শারীরক্রিয়ায় শ্রমের পর বিরাম, বিরামের পর শ্রম, উল্লাসের পর অবসাদ, অবসাদের পর উল্লাস। জীবের শরীর মধ্যে শোণিত প্রবাহ তরঙ্গে বহে হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্র যখনই কুঞ্চিত হয়, তখনই আবার প্রসারিত হয়; স্নায়ু যন্ত্রের ক্রিয়াপ্রণালী সেইরূপ আকুঞ্চন প্রসারণেই সম্পাদিত হয়। মনুষ্যের চিন্তা প্রবাহ মস্তিষ্কের তরলমালা সঙ্গে বহিতে থাকে, মানুষের ভাবের গতি সেই স্নায়ুমণ্ডলের তরঙ্গ গতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হাসি কান্না যে নিয়মে মাংসপেশীর কুঞ্চন প্রসারে সঞ্জাত, শোক দুঃখ হর্ষ আহ্লাদেও কি সেই নিয়মের অধীন নয়? আজ তুমি হাসিতেছ, কাল কাঁদিবে, পরশু আবার উচ্চ হাস্যে গৃহ প্রাচীর ধ্বনিত করিবে। সমাজের মধ্যে আইন, বাজারের দর, বাণিজ্যের গতি; রুচি পরিচ্ছদ; আচার ব্যবহার; সাহিত্য, কাব্য; সবই সেই নিয়মের অধীন। আজ ধর্ম্ম লইয়া লোকে পাগল হইল, কাল অধর্ম্মের তরঙ্গে গা ঢালিয়া নরকের পথে ভাসিতে লাগিল। আবার কোন পুণ্যাত্মা আসিয়া স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিল। আজ দাসত্বের কঠিন নিগড়ে সাধারণের হস্তপদ শৃঙ্খলিত রহিয়াছে কালি দেশ অত্যাচারী মহারাজের ছিন্ন

মুণ্ড রাজপথ শোণিতাক্ত করিতেছে। আজ কবিতার উন্মাদিনী মাধুরীতে পুলকিত হইয়া মোহন চাঁদের শুধু কুলের মধু লইয়াই বিভোর; কালি আবার বীণাপাণিকে বিসর্জ্জন দিয়া উদারান্নের জন্য ঐহিকার্থে লালায়িত। সমাজের উত্থান পতনও কি ঐ নিয়মের অধীন নহে? গ্রীস গিয়াছিল গ্রীস উঠিয়াছে ইতালি গিয়াছিল ইতালি উঠিয়াছে, ভারত গিয়াছে ভারত কি আর উঠিবে না! বিধাতঃ, ভারত কি আর উঠিবে না?

এইখানে একটি একাদশ বর্ষব্যাপী তরঙ্গের কথা বলা আবশ্যক। আকাশস্থ নক্ষত্রের মধ্যে অনেকগুলি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল (variable stars) এইগুলি কিছুকাল উজ্জ্বল থাকে এবং ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আবার কিছুকাল পরে দীপ্তিমান হয়। আমাদের সূর্য্যমণ্ডলও এই শ্রেণীর নক্ষত্রের অন্তর্গত। অনেকেই জানেন চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যেও কাল কাল "কলঙ্ক" দৃষ্ট হয়। যে কারণেই হউক এই চিহ্নের সংখ্যা কখন বাড়ে, কখন কমে, এগার বর্ষের মধ্যে একবার বৃদ্ধির সীমা একবার হ্রাসের সীমা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এগার বৎসরের মধ্যে সূর্য্যালোক কিছুদিন বেশি পরিমাণে কিছুদিন অল্পপরিমাণে বিকীর্ণ হয়। Balanstewart অনুমান করেন চন্দ্র যেমন পৃথিবীর জলরাশিতে তরঙ্গমালা উৎপন্ন, সেইরূপ সূর্য্যমণ্ডলের পরিবেষ্টিত বাষ্পরাশিতে পার্শ্বস্থ গ্রহগণ কর্ত্তৃক কোনরূপ নিয়মিত তরঙ্গমালা উৎপন্ন হওয়ায় এরূপ ঘটে। যাহা হউক সূর্য্যের এই কলঙ্কের সহিত অনেক পার্থিব ঘটনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সূর্য্যের চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব তাড়িত ও চৌম্বক স্রোতে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যখন সূর্য্যের কলঙ্ক সংখ্যা বেশি হয় তখন ঠিক সেই সময়েই চুম্বক জলাশয় "আবর্ত্ত" (storms) উপস্থিত হয়, এবং সেই সময়েই মেরুপ্রদেশ our a borelies নামক আলোকের আধিক্য দেখা যায়। আবার পৃথিবীর শস্যখণ্ড সূর্য্যালোকের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। কাজেই আমাদের দেশে ১০।১১ বৎসরান্তে দুর্ভিক্ষ, ও ইউরোপে শস্যের প্রাচুর্য্য উপস্থিত হয়। আবার পৃথিবীর উর্ব্বরতাশক্তি সভ্য সমাজের বাণিজ্য ব্যবসায়ের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে বাণিজ্য ব্যবসায়ের গতিও প্রায় ১০।১১ বৎসরের মধ্যে এক চক্র ঘুরিয়া আইসে। যাহাকে commercial crisis or cllapse বলে সেও প্রায় ১১ বৎসরান্তে ঘটিয়া থাকে।

বিবর্ত্তবাদী বৈজ্ঞানিক জানেন এই জৈবজগতে সৃষ্টিপ্রণালী কিরূপ দেবা-

সুরের মহাসমরে সমুদ্ভূত। তিনি জানেন কেমন এই মহাযুদ্ধ এই মুহূর্ত্তেও সর্ব্বত্র চলিতেছে; কোন জাতি উঠিতেছে কোন জাতি নামিতেছে; বাঘের বংশ মৃগজাতি ধ্বংস করিয়া অবশেষে খাদ্যাভাবে নিজেই লোপ পাইবার উপক্রম করিতেছে; এবং হতাবশিষ্ট মৃগকুল কেমন আবার সুবিধা পাইয়া দলেদলে বাড়িয়া উঠিতেছে। দেবের জয় অবশ্যম্ভাবী হইলেও এই যুদ্ধ-লীলা কেমন জটিলপথে চলিয়াছে। কখন দেবের জয়, কখন অসুরের জয়; নন্দনবনে শচীপতি ক্রীড়ামগ্ন, বৃত্রাসুর আসিয়া ছত্রদণ্ড কাড়িয়া লইয়া মহেন্দ্রকে কেমন পথের ভিখারি করিতেছে। সৃষ্টির আদি হইতে এই অপূর্ব্ব যুদ্ধলীলা তরঙ্গভঙ্গীতে চলিয়াছে কে জানে ইহার শেষ কবে? এই ধরণীতলে এককালে মৎস্যকুল আধিপত্য করিয়াছে, তার পর ইহা উভয়চর জীবের আবাসভূমি হইয়াছে; পরে স্তন্যপায়ী আসিয়া তাহার আবাস ভবন কাড়িয়া লইয়াছে। এই মানুষই একদিন ম্যামথ ও ম্যাষ্টোডনের সহিত লতাপাতা লইয়া বিবাদ করিত; কিন্তু মানবের এই বৈভবের দিনে মানবের সেই আদি শত্রু কোথায়? মানুষ আজি পৃথিবীর রাজা, সৃষ্টির তরঙ্গে ভাসমান দর্শনীয় জীব। তরঙ্গের পর তরঙ্গ গিয়াছে, এ তরঙ্গও চলিয়া যাইবে, পর তরঙ্গে মানুষ কোথায়?

আর মানুষের জীবন? কে জানে মানুষের জীবন কি? মানুষের জীবন কত বড় বড় ছোট ছোট তরঙ্গের সমষ্টি;—কত আশা ভালবাসা এই মনুষ্য জীবনে স্রোতের ন্যায় বহিয়া যাইতেছে কে জানে? কত প্রাণের পুত্তলী সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, কার সাধ্য সে গতি রোধ করে? জীবনের প্রতি ঊর্ম্মি আবার কত ক্ষুদ্রতর ঊর্ম্মির সমষ্টি, সেই ক্ষুদ্রতর ঊর্ম্মিতেই আবার কত আরও ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি চলিয়াছে। মনুষ্যের জীবন, প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনুষ্যের জীবনও কি একটি বিশালতর স্রোতের কি একটি ঊর্ম্মিমাত্র!

ঐ যে জলাশয়ে একটি ঊর্ম্মি দেখিতেছ, ওটি কি ঠিক উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঊর্ম্মির প্রতিরূপ নহে? কিন্তু যাহা দেখিতেছ সে কেবল আকারগত সাম্য। পূর্ব্বগত তরঙ্গের একটি জলকণাও হয়ত পরবর্ত্তী তরঙ্গে নাই; সাদৃশ্য যে কিছু সে আকৃতিতে শক্তিতে ধর্ম্মে,— পার্থক্য জড় উপাদানে। একটির পর আর যে একটি ঢেউ আইসে, সে তাহার পূর্ব্বগামীর নিকট হইতে তাহার আকার' তাহার শক্তি, তাহার প্রাণ গ্রহণ করে; তাহার উপাদানভূত অণু-

গুলি মাত্র তাহার নিজের সম্পত্তি। দীপশিখা অবিরাম জ্বলিতেছে; উহার আকার উহার ধর্ম্ম ঠিক সমানই রহিয়াছে; কিন্তু যে তৈল যে জড়াণু যে caroo-hydrate উহার উপাদান, তাহা পলকে পলকে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মনুষ্যও কি তাহাই, মনুষ্যও কি একটি তরঙ্গ মাত্র, মনুষ্যও কি একটি দীপশিখা মাত্র? দীপশিখার ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তে ইহার শরীর উপাদান বাহ্য জড়জগৎ হইতে সংগ্রহ করিতেছে; প্রতিনিয়ত পুরাতন উপাদান বিসর্জ্জন দিয়া নূতন উপাদানে গঠিত হইতেছে, কিন্তু ইহার আকার ইহার ধর্ম্ম ইহার প্রাণ কি দীপশিখার মত, জলাশয়ের উর্ম্মিটির মত কোন পূর্ব্বগামী অবিনাশী প্রাণের অংশমাত্র? মনুষ্যের ''ন কি কোন বিরাট জীবনের অংশীভূত একটি উর্ম্মি মাত্র? বৈজ্ঞানিক, তুমি ঘরে বসিয়া সূর্য্যরশ্মিমালার একপ্রান্ত বিশ্লেষণ করিয়া অপর প্রান্তে সূর্য্যমণ্ডলস্থ পর্‌াণু পুঞ্জের তরঙ্গগতি গণিয়া দিতেছ; বৈজ্ঞানিক, তুমি বলিতে পার এই মনুষ্য জীবনের পূর্ব্বগত তরঙ্গ কি? কে বলিবে এই জীবনের পূর্ব্বগত জীবন কি? কে বলিবে ইহার পরস্থিত তরঙ্গ কেমন? সেরূপ বৈজ্ঞানিক আসিবে কি?

এই জগৎও একটি মহাতরঙ্গ মাত্র। বিশ্বব্যাপী নিরবয়ব পরমাণু রাশির ক্রমিক ঘনীভবনে গঠিত, এই অপূর্ব্ব বিচিত্র চিত্রিত জগৎ কালক্রমে আবার সূর্য্যে সূর্য্যে সংঘর্ষ হইয়া নক্ষত্রে নক্ষত্রে আঘাত লাগিয়া পূর্ব্বাবস্থা পাইবে, বৈজ্ঞানিক একথা গণিয়া বলিয়াছেন। আবার যখন সেই অবস্থা আবারওত তবে সৃষ্টি সম্ভব। তবে কি অপূর্ব্ব জগৎও এক বিশাল স্রোতের একটি বিশাল উর্ম্মিমাত্র। মহাশক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া মহাকাল ব্যাপ্ত করিয়া যে মহাস্রোত চলিয়াছে এই জগৎ তাহারই একটি মহাতরঙ্গ মাত্র। তুমি আমি কি তাহার বুদ্বুদ মধ্যেও গণ্য নহি?

শ্মশানের-প্রেমছায়া।

১

আবার আবার কেন
মরমে আঘাত হেন,
নিচল নিথর হিয়া
নাচিবারে চায়!
ভাঙা মন ভেঙে দিয়ে,
বিষে বিষ মিশাইয়ে,
আঁধারে আঁধার ঢালি
আছি বেঁচে হায়!

২

নীরব তটিনী-তীরে
নীরব নিরাশা নীরে
নীরব নয়ন মম
গাহিয়াছে গান—
নীরবে ঢ'লায়ে কায়া
বারি মাঝে তারাছায়া
নীরবে শুনেছে তাহা,
এলাইয়া প্রাণ!

৩

নীরব প্রকৃতি পেয়ে,
নীরব নীলিমা চেয়ে
স্বপনে কহেছি কথা,
স্বপনের—কোলে!
ছায়া মুখে শুনি কথা,
ছায়ায় শুনায়ে গাথা—
ছায়া হ'য়ে আছি, শুধু
ছায়া পা'ব ব'লে!

৪

আলোকেতে মুদি আঁখি,
আঁধারেতে চেয়ে দেখি,
আঁধারেতে নাচে প্রাণ!
আলোকেতে মরে!
প্রাণ হারা—প্রেম হারা—
পথ হারা—দিশে হারা—
শুধুই পাগল পারা
পাগলের তরে!!

৫

শরতের-নীলাকাশে
যথায় মাধুরী ভাসে,
তথায় খুঁজেছি কত
সেই ছায়া হায়!
পাইতে ফুটন্ত ছায়া,
পাইতে জ্বলন্ত ছায়া,
জীবন্ত নিবন্ত ছায়া—
ছায়া পথ গায়!

৬

কি জানি কিসের আশে,
কি জানি কিসের পাশে
পোড়া মন—সদা—ভাসে
কোথায় মিশায়—
কি জানি কিসের আশে
চ'লে যায়—ফিরে আসে—
ফিরে চায়, ধীরে ধীরে
পুন—চলে যায়!

৭

প্রাণের নয়নে মোর
বিষম ঘুমের ঘোর !
জাগিয়া র'য়েছে তাহে
জীবন্ত স্বপন !
কভু কাঁদে, কভু হাসে,
আনন্দে—বিষাদে ভাসে,
কত খেলা খেলে, হ'য়ে—
আপনা মগন !

৮

হেরিলাম ক্ষণে হায় !
বিজলি কমল গায়,
অনলে অমিয় ধার,
ছায়া মাঝে ছটা,
শ্মশানের প্রেম হাসি
প্রেত মুখে সুধা রাশি
চাঁদেতে মিলায় যেন
নব ঘন ঘটা !

৯

আবার দেখি রে কেন
কুসুমে গরল ঘন,
তটিনীর হৃদে শুধু
বিষের লহর !
নভ মাঝে যায় দেখা—
যথা সুষমার রেখা,
সেখানে অশনি ধার
বহে তর্ তর্ !

১০

দেখিয়াছি—জানিয়াছি—
বুঝিয়াছি—মজিয়াছি—
ম'রিয়াছি কত বার—
মরিব না আর !
কুহকের কুহু কুহু
নাচাইত মুহু মুহু,
বিভোর রহিত প্রেম
হৃদয়ে আমার !

১১

মম রুচি প্রাণ খুলে,
কিসের কুহকে ভুলে—
রোপেছিনু তরু এক
শোভায় অতুল—
প্রেম আঁকা—প্রেম মাখা—
প্রেম রসা—প্রেম মাতা—
ফুটিত মুকুতা সারি
সোহাগের ফুল !

১২

নাহি সেই প্রাণ হায় !
নাহি সেই তরু হায় !
খান খান করি তাহা
শূন্যে ছড়ায়েছি !
হৃদয়ের ছায়া ল'য়ে
আছি ছায়া পানে চে'য়ে
ছায়ার হৃদয়ে ছায়া,
মিশা'ত রয়েছি !

১৩

শ্মশানের কূলে ফুল
লইয়ে ছায়ার চুল
গাঁথিয়া কুসুম হার
পরাব ছায়ায়
শ্মশানের ধার দিয়ে
ছায়ার তরঙ্গ লয়ে
ঢালিব যতন করে
অনন্তের কায় !

১৪

আবার আবার কেন
মরমে আঘাত হেন—
নিচল—নিথর হিয়া
নাচিবারে চায় ?
ভাঙামন ভেঙে দিয়ে
বিষে বিষ মিশাইয়ে,
আঁধারে আঁধার ঢালি
আছি বেঁচে হায় !

নবজীবন।

২য় ভাগ } পৌষ ১২৯২। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ব্রিটিশ ও বঙ্গীয় চিত্রাবলী।

আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে ব্রিটিশ কবি আল্‌ফ্রেড টেনিসনের কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রের সহিত বঙ্গীয় কবি বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইতে চাহি। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ বিজ্ঞ সমালোচনা আমাদিগের এ প্রস্তাবের লক্ষ্য নহে, আমরা এই চিত্রগুলি সদৃশ অথচ পৃথক দেখিয়া যেরূপ বিস্ময় লাভ করিয়াছি, পাঠকবর্গকে তাহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। ঠিক একই মাল মসলা লইয়া, দুইটি ভিন্ন দেশীয় শিল্পী, কিরূপ দুইটি সদৃশ অথচ সম্পূর্ণ বিভিন্ন চিত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাই আমরা ইহাতে দেখাইতে চেষ্টা করিব। কবি টেনিসনের "আইডিল্‌স্‌ অব্‌ দি কিং" এবং বঙ্কিম বাবুর 'চন্দ্রশেখর" আমাদিগের লক্ষ্য ভূমি, আমরা ঐ দুই হইতে তিন প্রকারের তুলিক চিত্র লইয়া আমাদের বলিবার কথা বলিব।

(১) আর্থর (Arthur) ও চন্দ্রশেখর।

(২) গুইনিবিয়ার (Guinevere) ও শৈবলিনী।

(৩) ল্যান্‌সেলট্‌ (Lancelot) ও প্রতাপ।

তুলনায় সমালোচনা আমাদিগের উদ্দেশ্য না হইলেও আমাদিগকে উক্ত পুস্তক দুখানি হইতে অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া, দুই এক কথা লিখিতে হইবে।

(১) আর্থর (Arthur) ও চন্দ্রশেখর।

দুইটিই দুই মহাকবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হৃদয়ের মহান ভাব, চিত্তের ঔদার্য্য, প্রণয়ের প্রগাঢ়তা, দুইটি চিত্রেই অতি মনোহর রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। মনুষ্যের সহিত সমান ক্ষেত্রে রাখিয়া প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষমতাশালী কবি যতদূর মহৎ ও উন্নত চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন, আর্থর এবং চন্দ্রশেখরের চরিত্র ততদূরই উন্নত ও মহৎ হইয়াছে। আর একটু রঙ্ ফলাইতে গেলেই যেন উহা আর সেরূপ মনোহর হইতে পারিত না —যেন চিত্রদ্বয়ের স্বাভাবিকতা (Reality) সম্যক্ বিনষ্ট হইয়া যাইত, এবং আমরা ঐ দুইখানিকে অলৌকিক বলিয়া বোধ করিতে বাধ্য হইতাম। তবে কি আর্থর এবং চন্দ্রশেখর কাল্পনিক আদর্শ চরিত্র নহে? অবশ্যই কাল্পনিক চরিত্র বটে, কিন্তু কাল্পনিক চিত্রমধ্যেও আবার শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে, ইহার মধ্যেও আবার স্বাভাবিকতা ও কাল্পনিকতা আছে। একশ্রেণীর চরিত্র দেখিলে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহা কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়, কাজেই সেইগুলি আমাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সম্যক্ সমর্থ হয়না; আর এক শ্রেণীর চরিত্র কাল্পনিক হইলেও, তাহা দেখিয়া স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। আমাদিগের বিবেচনায়, যিনি যে পরিমাণে এই শেষোক্ত প্রকারের চরিত্র সৃজন করিতে পারেন— যাঁহার কাল্পনিক চিত্রে যতদূর স্বাভাবিকতার চিহ্ন থাকে, তিনি সেই পরিমাণে প্রতিভাশালী ও চরিত্রসৃজনে ক্ষমতাপন্ন। স্বাভাবিক চরিত্র চিত্রনে যে একেবারেই নৈপুণ্য প্রকাশিত হইতে পারেনা আমরা এ কথা বলিতেছি না, জীবন চরিত লিখিতে গিয়াও চিত্রনৈপুণ্য দেখান যাইতে পারে, কিন্তু সে চাতুর্য্য ও সে কৌশলে, আর আমরা যাহার কথা বলিলাম সে কৌশলে—প্রভেদ বিস্তর। একের প্রশংসা নির্ব্বাচনে,—অন্যের প্রশংসা কল্পনায়। একের প্রশংসা প্রকৃতিরাজ্য হইতে মনোহর ও অভীষ্ট ফলোৎপাদক চিত্রগুলি নির্ব্বাচন করিয়া, তাহাই অবিকৃত ভাবে সাধারণ্যে উপস্থিত করায়; অন্যের প্রশংসা প্রকৃতিরাজ্য হইতে কতকগুলি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট রঙ্ বাছিয়া লইয়া তদ্দ্বারা একটি অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত করায়। তাঁহার চিত্রের রঙ্গুলি সকলই আমাদিগের পরিচিত, কিন্তু সেগুলির মিশ্রণ আমরা কোথায়ও দেখিতে পাইনা এবং তাহা শুদ্ধ উৎকর্ষরূপেও জগতে বিরাজ করে না। আমাদিগের বর্ণনীয় অন্যান্য চরিত্র গুলির ন্যায়, আর্থর এবং চন্দ্র

শেখরও এই শ্রেণী চরিত্র। চন্দ্রশেখরের চরিত্র মানবীয় উদারতা ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতার পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার দুই একটি মানবীয় দুর্ব্বলতা রাখিয়া দিয়া; কতকগুলি স্বাভাবিক রঙকে অতি সুন্দর করিয়া মার্জ্জিত করিয়া, আবার কতকগুলি স্বাভাবিক রঙ অমার্জ্জিতাবস্থায় রাখিয়া দিয়া, কবিবর একটি স্বাভাবিক অথচ কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়াছেন। আর্থরও প্রায় এইরূপ। যদিও স্থূলদৃষ্টিতে ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ কাল্পনিক চিত্র বলিয়া কাহারও বোধ হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে আর্থরকেও উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র বলিয়া বোধ করিতে হইবে। আর্থর এবং চন্দ্রশেখর কাল্পনিক হইয়াও স্বাভাবিক। ইহাই কবির কৌশল, ইহাই শ্রেষ্ঠ কবির আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয়।

বাহিরের অবস্থাগুলি পরিত্যাগ করিয়া লইলে, আর্থর এবং চন্দ্রশেখর একই রঙে রঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। যাহা কিছু পার্থক্য, তাহা চিত্রকরের শিক্ষার ও মানসিক ভাবের পার্থক্য জন্য। আর্থর এবং চন্দ্রশেখর দুজনেই ভাগ্যবান, অনিন্দিতকান্তি, প্রেমপ্রবণা যুবতী ভার্য্যার ধর্ম্মত স্বামী। পত্নী প্রীতে উভয়েরই প্রেম অনন্ত, অপরিমেয় ও প্রগাঢ়। অন্তঃসলিলবাহিনী ফল্গুনদীর ন্যায় তাহা আপন মনেই বহিয়া যাইতেছিল; বাহিরে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাতে জোয়ার ভাটা নাই, ঈষৎ বায়ু বহিলেই সেখানে তরঙ্গ উঠিবার সম্ভাবনা নাই। তাহা নিবাত নিষ্কম্প প্রশান্ত সাগরের ন্যায় স্থির, গম্ভীর, ও মহান্ ভাবোদ্দীপক। যেদিন কবি আমাদিগকে [illegible] করাইয়া তাহাদিগের অন্তরের অন্তরতম [illegible] দিলেন, সেইদিনই আমরা সে স্নেহরাশির অপরিমেয়তা ও প্রগাঢ়তা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু যতক্ষণ না সে বালুকারাশি ঘটনাচক্রে স্থানচ্যুত হইল ততক্ষণ তাহা প্রচ্ছন্ন, অতি প্রচ্ছন্নভাবে হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে লুক্কায়িত ছিল, বুঝি বা তাঁহারাও তাহা প্রথমে সম্যক্ জানিয়া উঠিতে পারেন নাই। উভয়েই আবার এ সম্বন্ধে সমান অভাগ্যশালী— প্রণয়ের প্রতিদান কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগের বনিতাদ্বয় অন্য প্রেমে আসক্ত, সুতরাং একদিনের তরেও তাঁহারা ভার্য্যার মনোরাজ্যে একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। প্রথমে বুঝি উঁকিটাও মারিতে পারেন নাই। উভয়েরই আবার এ ভাবটি বুঝিবার অবকাশ ছিল না যদি তাঁহারা অন্য কার্য্যে এত ব্যাপৃত না

থাকিতেন, তাহা হইলে হয়ত চন্দ্রশেখরের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন লোকের নিকট, ইহা লুক্কায়িত থাকিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্য ব্যাপৃত উন্নত মনে এ সকল সন্দেহ পুষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এ পর্য্যন্ত আমরা দুইটি চিত্রই একরূপ দেখিতে পাই; কিন্তু এখান হইতেই দুইটি চিত্রে দুই বিভিন্ন রকম হাত পড়িয়াছে। দুইটি চরিত্রই মহৎ, উন্নত ও আদর্শচরিত্র করা কবির অভিপ্রায় এবং সেই অভিপ্রায় সাধনার্থ দুই দেশের বিভিন্নরূপে শিক্ষিত, বিভিন্ন অবস্থাপন্ন, বিভিন্ন মানসিকভাব বিশিষ্ট দুই কবি—দুইটি পৃথক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

আর্য্যদেশের আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রিয় দরিদ্র বাঙ্গালি কবির চন্দ্রশেখর জ্ঞান-পিপাসু। গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি আমাদিগকে এ জ্ঞানতৃষা সুন্দররূপে দেখাইবার জন্য বলিয়া লইলেন,—

"তিনি গৃহস্থ অথচ সংসারী নহেন। এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই। দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহ ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিক কাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমত স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। * * * চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।" চন্দ্রশেখর অবশেষে বিবাহ করিলেন। কিন্তু তাহা জ্ঞানতৃষা নির্ব্বিঘ্নে পরিতৃপ্ত হইবে বলিয়া। আর্য্যদেশের কবি ভিন্ন এরূপ চরিত্র অন্য কোথায়ও সৃষ্ট হইতে পারে না।

তাঁহার চন্দ্রশেখর স্বীয় জীবনের একজন কঠোর সমালোচক। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, তিনি সর্ব্বদাই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ড ধরিয়া আছেন। তিনি শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া অনুতপ্ত। চন্দ্রশেখরকে আমরা একদিন ভাবিতে দেখিয়াছি—

"হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলন-ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত। আমি

কি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশ সঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া, রমণীমুখপদ্ম কি ইহ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধা শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?"

চন্দ্রশেখর শান্তিপ্রিয়—তিনি ক্ষমাগুণের আধার; তাঁহার নিকট শত্রু মিত্র ভেদ নাই। প্রতিহিংসা তাঁহার নিকট নিকৃষ্ট ধর্ম্ম। চতুর প্রতাপ যখন "ফষ্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম" বলিয়া চন্দ্রশেখরকে যুদ্ধ গমনের একটি কারণ দেখাইয়া, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, চন্দ্রশেখর বলিলেন,—

"ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে, যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।"

দেখিলে উদারতা! দেখিলে ক্ষমাগুণ! আর্য্যদিগের কবির কল্পনাতেই এইরূপ চিত্র সৃষ্ট হইতে পারে। খৃষ্টিয়ান হইলেই হয়না, চির কালের মনের ভাব দুই এক দিনের শিক্ষা বা দুই এক জনের দৃষ্টান্তে অপসারিত হয়না। আর্য্যদেশে খৃষ্টের অভাব নাই, আর্য্যদেশের শিক্ষা পূর্ব্বাবধিই অন্যরূপ, তাই এরূপ ক্ষমাগুণের কথা কেবল সেই খানেই সম্ভব পায়। রক্তপিপাসু, প্রতিহিংসাপরায়ণ কোন জাতির কবি এই স্থলটি কিরূপ করিয়া তুলিতেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদিগের ব্রিটিশ কবি টেনিসনের আর্থরকে ল্যান্সেলটের প্রতিহিংসার্থ যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি।

আরও একটি কথা এখানে না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে জ্ঞানার্জনের জন্য চন্দ্রশেখর প্রথমে দারপরিগ্রহ কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই এবং যে জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই আবার তাঁহার দারপরিগ্রহণার্থ ইচ্ছা হইল, সে জ্ঞানের ফল এইরূপ; বোধ হয়, ইহা দেখিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর 'সুশিক্ষিত' ইংরাজি-চালে-শিক্ষিত যুবকগণও চন্দ্রশেখরের জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিবাহ করার অপরাধটি মার্জ্জনা করিবেন।

তাঁহার চন্দ্রশেখর জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক। তিনি "তত্ত্বজ্ঞ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু।" জ্ঞান ও ভক্তি দুইই তাঁহাতে দেখিতে পাই। চন্দ্রশেখর গৃহ প্রত্যাগমনের সময় ভাবিতে লাগিলেন—

"কেন, বিদেশ হইতে আগমন কালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এতদিন আহার নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কিসুখে সুখী হইব? এবয়সে আমাকে গুরুতর মোহ-বন্ধে পড়িতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এইজন্য আমার এ আহ্লাদ? লোকে বলে সকলই মায়া! কিছুই মায়া নয়, তাহারাই মায়ার মায়ায় মুগ্ধ। ভগবান্ বলিয়াছেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আমি। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য—কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ। আমার যে তল্পী লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্ল কমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন? আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহ জালে জড়িত হইয়েছি। এ মোহজাল কাটিতে ইচ্ছা করে না—যদি অনন্ত কাল বাঁচি, তবে অনন্ত কাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।"

এই স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে কঠোর সমালোচক রূপে স্বীয় অন্তর পর্য্যবেক্ষণ করিতে আমরা দেখিতে পাই। ভগবান বলিয়াছেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আমি। যদি তাই, তবে তিনি (চন্দ্রশেখর) তাঁহার তল্পীদার অপেক্ষা শৈবলিনীর কথা এত ভাবিতেছেন কেন? কথাটা তাঁহাকে কিছু গোলে ফেলিল। তাঁহার নিকট যেন বোধ হইল, যে, ইহা না করিয়া পারা যায় না। সর্ব্বভূতে সমানজ্ঞান কোন কাজের কথা নহে। তাড়াতাড়ি আবার চন্দ্রশেখর বলিয়া বসিলেন—"ভগবদ্বাক্যে আমি অশ্রদ্ধা করি না—কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইয়াছি।" ধন্য চন্দ্রশেখর! ধন্য আর্য্যদেশ! যেখানে এই চরিত্র কল্পিত হইতে পারে। এত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে জীবনের কার্য্যগুলি আর কোথায় কে দেখিতে পারে? যতই আমাদিগের স্থূল বিষয়ের জন্য ভাবনা কমিয়া আইসে, ততই আমরা সূক্ষ্মবিষয়ের জন্য ভাবিতে অগ্রসর হই। লোকের অন্তঃকরণ যে পরিমাণে

উন্নত হইবে, লোকের স্বভাব যে পরিমাণে মার্জ্জিত হইবে, এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁহার ততই দৃষ্টি পড়িবে। আমার নিকট একটি নরহত্যার যে পাপ ও গ্লানি বোধ হইবে, অপেক্ষাকৃত উন্নতমনা একটি ধার্ম্মিক লোকের নিকট একটি কীট মাড়াইতেও সেই রূপ পাপ ও সেইরূপ গ্লানি বোধ হইবে। চন্দ্রশেখর যে কতবড় ধার্ম্মিক, চন্দ্রশেখর যে তাঁহার জীবনের কার্য্য কিরূপ তুলেতে মাপিয়া লয়েন, আত্মার প্রতি তাঁহার কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কবি এই উক্তিতেই তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অন্যদেশের কাব্যে আমরা ধর্ম্মের এরূপ সূক্ষ্মভাব দেখিতে আশা করিতে পারি না।

টেনিসনের আর্থরও একটি উন্নতি চরিত্র বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন দেশে কল্পিত। যেখানে আধ্যাত্মিকভাব অপেক্ষা জড়ভাব (Materialistic tendency.) অধিক, সেখানে আমরা এরূপ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ চিত্রে কিরূপে দেখিব?

চন্দ্রশেখর যেরূপ জ্ঞান লইয়া ব্যস্ত, কার্য্যময় জীবন, চঞ্চল প্রকৃতি ব্রিটিশ কবির আর্থর সেইরূপ কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ নাইটহুডের (Knighthood) উৎকর্ষ সাধনেই তিনি সর্ব্বদা নিযুক্ত। এই বীরসম্প্রদায়ের উন্নতি লইয়াই তিনি সতত বিব্রত।

"To break the heathen and uphold the Christ,
To ride abroad redressing human wrongs,
To speak no slander, no, nor listen to it,
To honour his own word as if his God's
To lead sweet lives in purest chastity,
To love one maiden only, cleave to her,
And worship her by years of noble deeds,
Until they won her ;———"

ইহাই তাঁহাদিগের কার্য্য—ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। আর্থর ইহাই তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন—এই ধর্ম্ম প্রচারার্থই আর্থরের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইত। এই উদ্দেশ্য কি কম মহৎ? আমাদিগের শান্তিপ্রিয়, আর্য্য চন্দ্রশেখর ঘরে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে জ্ঞানার্জ্জন করাকেই জীবনের মহদুদ্দেশ্য মনে করিতেন, আর কার্য্যময় জীবন ব্রিটিশরাজ আর্থর ঐরূপে জগতের মঙ্গল সাধনাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করিতেন। বাঙ্গালি কবি

চন্দ্রশেখরকে শান্তিপ্রিয়, জ্ঞানপিপাসু ও আপনা লইয়া বিব্রত করিয়া আঁকিয়াছেন; আর ব্রিটিশ কবি আর্থরকে তেজস্বী, কার্য্যপ্রিয় ও দেশহিতৈষী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। দুইয়েরই ধারণা (conception) মহতী—কিন্তু স্থান ও শিক্ষা ভেদে তাহা দুইদিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা একস্থলে তাঁহাকে অনুতপ্ত দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু আর্থরের এরূপ ভাব কোথাও দেখিতে পাই না। ইহার কারণ অনেকগুলি। চন্দ্রশেখরকে যে কারণে অনুতপ্ত হইতে হইয়াছিল, আর্থরের তাহার কোনটিই ঘটিয়া উঠে নাই। চন্দ্রশেখর জানিতেন তিনি শৈবলিনীকে আদর করিতে জানিতেন না, আর্থরের মনে সর্ব্বদাই বিশ্বাস ছিল, যে তিনি তাঁহার স্থাপিত বীর সম্প্রদায়ের নেতা (Knight among his knights) এবং

To love one maiden only, cleave to her
And worship her by years of noble deeds
Until they won her———

ইহা সেই সম্প্রদায়ের একটি প্রধান ধর্ম্ম। সুতরাং ঐরূপ ভাবনা কখনও তাঁহার মনে উঠিতে পারে নাই। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছেন, হিন্দুমতে,—তাঁহার মনের সম্মতি না লইয়া; আর্থর কিন্তু তাহা করেন নাই। চন্দ্রশেখর দরিদ্র সন্তান—শৈবলিনীকেই তাঁহার গৃহ কার্য্যাদি করিতে হইত—আর্থর রাজাধিরাজ এবং গুইনিবিয়ার তাঁহার একমাত্র রাজ্ঞী। যে সকল কারণে চন্দ্রশেখরকে কিছু না কিছু অনুতপ্ত করাইয়াছিল—আর্থরের তাহার একটিও ঘটে নাই। কিন্তু আমরা শুদ্ধ এই কারণগুলিতেই সন্তুষ্ট নহি। আমরা বলিতে চাহি, যে চন্দ্রশেখরের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও আত্মবোধ ও আর্থরের উদারতাবই ইহার একটি প্রধান কারণ। যদি আর্থর চন্দ্রশেখরের মত তীক্ষ্ন-দৃষ্টি সম্পন্ন হইতেন, তবে তাঁহার বুঝিতে বাকি থাকিত না, যে তাঁহার এইরূপ আসক্তিতে (devotion) গুইনিবিয়ারের "প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই।" কিন্তু বিষয়বুদ্ধি আর্থর যখন দেখিলেন, যে, গুইনিবিয়ারের বাহ্যিক সুখের উপাদানের অসদ্ভাব নাই, তখন আর তাঁহার চন্দ্রশেখরের মত ভাবিতে ক্ষমতা থাকিল না। আর্থর আত্মাভিমানী—তিনি কখনও ভাবিতে পারেন নাই, যে, গুইনিবিয়ার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারেন। তাঁহার মত ভালবাসার বস্তু আর কোথায়?,

আমরা দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালি কবির চন্দ্রশেখর জ্ঞানপিপাসু—ব্রিটিশ কবির আর্থর কর্ম্মপ্রিয়; বাঙ্গালি কবির চন্দ্রশেখর শত্রুকেও ক্ষমা করা ধর্ম্ম মনে করেন তাঁহার নিকট ভগবানই সব দণ্ডের বিধাতা—ব্রিটিশ কবির আর্থর শত্রুকে দমন করা, দোষীর শাস্তি বিধান করা ধর্ম্ম মনে করেন, তিনি ভগবানের উপর অতটা নির্ভর করিতে জানেন না। বাঙ্গালি কবির চন্দ্রশেখর শান্তিপ্রিয়—ব্রিটিশ কবির আর্থর যুদ্ধপ্রিয়। উভয়েই ক্ষমাগুণশালী, উভয়েই ধার্ম্মিক; কিন্তু চন্দ্রশেখরের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্মভাবও লুক্কায়িত থাকিবার নহে, আর্থরের স্থূলদৃষ্টিতে ধর্ম্মের বিষয়গুলি ও মোটা মোটা—অতি সাধারণ। উভয়কেই মহৎ করিতে গিয়া, একজনে তাঁহার চরিত্রকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ প্রদান করিয়াছেন, অন্যজন তাঁহাকে জড়ভাব প্রধান of materialistic tendency করিয়াছেন। সত্য বটে, আর্থর টেনিসনের মৌলিক কল্পনাপ্রসূত নহে, আর্থর সম্বন্ধে কতকগুলি কথা তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করার যো ছিল না; কিন্তু ইহাও সত্য যে, তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে, তাঁহার আর্থরকেও আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত করিতে পারিতেন, কিন্তু আর্য্যদেশের ন্যায় শুদ্ধ আধ্যাত্মিক উন্নতি লইয়াই আর কোন দেশ ব্যস্ত নহে—তাই আমরা বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতম চরিত্রে সেই উন্নতিই বেশি অবলোকন করি।

আর্থর এবং চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখাইয়া, আমরা এই চরিত্র দুইটির আলোচনা শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে, চন্দ্রশেখর ও আর্থরের স্নেহরাশি অন্তঃসলিলবাহিনী ফল্গুনদীর ন্যায় আপন মনে বহিয়া যাইতেছিল। প্রথমে আমরা তাহা দেখিতে পাই নাই—কিন্তু শেষে কবি তাহা আমাদিগকে সুন্দর রূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহাতেও বড় আশ্চর্য্য পার্থক্য দেখা যায়। আমাদিগের বঙ্গীয় কবি নিজে কোন কথাটি না কহিয়া, চন্দ্রশেখর দ্বারা কোন কথাটি না বলাইয়া, নিঃশব্দে অতি সুকৌশলে আমাদিগকে তাহা দেখাইয়াছেন। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সুন্দরী তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যাগত হন নাই, চন্দ্রশেখর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সকল শুনিলেন। "তখন, চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদের ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত এই সকল

কার্য্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিত তুল্য প্রিয়, গ্রন্থগুলি একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণ মধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোন খানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন।

"অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ; ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য, প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ্ একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহু যত্ন সংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত, সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

"রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।"

আমরা ইহা পড়িয়াই দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলাম, চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে কি আছে। ইহা দ্বারা চন্দ্রশেখরের প্রগাঢ় প্রণয় যেরূপ দেখান হইয়াছে, শত পাতা লিখিয়া মরিলেও সেরূপ হইত না। শিল্পীর এই ত এক প্রধান গুণ। ঘটনাতেই কার্য্যেতেই তাঁহার চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ হয়। সেই পুঁথি পোড়ান, সেই শালগ্রাম-শিলা বিতরণ, সেরূপ করিয়া গৃহত্যাগী হওন, ইহাতে চন্দ্রশেখরের হৃদয়খানি বড়ই খুলিয়াছে। এইখানেই তাঁহাকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় এবং এইখানে তাঁহার দেব ভাব, মহত্ত্ব ও প্রণয়ের প্রগাঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, এবং সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীকে একবার বলিতে ইচ্ছা হয়—

"জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা আর কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কিনা, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কিনা, বিধাতা তাঁকে সংগড়িয়া রাংতা দিয়া সাজান নাই—মানুষ গড়িয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা; তাঁহাকে তোমার মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভাল বাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে।"

টেনিসন আর্থরের হৃদয়ের এই ভাবটুকু দেখাইতে অন্য এক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার উপায়টিতে কৌশল কম, চাতুর্য্য কম, কিন্তু ফলোপধায়ক বেশি। তিনি আর্থরের স্বমুখ হইতে বহির্গত একটি উক্তি দ্বারাই তাঁহার মনের ভাব দেখাইয়া দিয়াছেন। এই উক্তিই তাঁহার বিশাল ও মহতী উদারতার পরিচয়। ইহাতেই তাঁহার সমস্ত ভাব অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে এবং তাহা সহজেই পাঠকের মনে উক্ত ভাব অঙ্কিত করিয়া দেয়।

গুইনিবিয়ার অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া Almesbury পবিত্র মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আর্থর সেখানে গিয়া উপস্থিত—তাঁহার সম্মুখেই উপস্থিত। তিনি সব শুনিয়াছেন, সব বুঝিয়াছেন। তিনি গুইনিবিয়ারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"Liest thou here so low, the child of one
I honour'd, happy, dead before thy shame?
Well is it that no child is born of thee
The children born of thee are sword and fire
... ... "

পাপের প্রতি ঘৃণা আর্থরের অস্তিত্বের সহিত দৃঢ় জড়িত। আজ তাঁহার গুইনিবিয়ার তাঁহার নিকট সেই অপরাধে অপরাধিনী; তাঁহার প্রেমময়ী বনিতা গুনির্বিয়ার আজ অসতী বলিয়া তাঁহার নিকট পরিচিত—আর্থরের মনে ঘৃণার ভাব প্রথমে উঠিল না, প্রথমে স্নেহে চিত্ত উছলিয়া উঠিল; আর্থর বলিলেন—liest thou here so low আর্থর গুইনিবিয়ারকে দেখিয়া একটু সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহার সেই গুইনিবিয়ার আজ এই রূপ দুর্দ্দশায় পতিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাপের প্রতি ঘৃণা তাঁহার অতিশয় প্রবল। তাই তিনি দুই একটি ঘৃণা সূচক, দুই একটি তিরস্কার ব্যঞ্জক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। কি রূপে তাঁহার বীর সম্প্রদায় একে একে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিরূপে তাঁহার স্বহস্তে নির্ম্মিত বীরগণ তাঁহারই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন; গুইনিবিয়ারকে আর্থর তাহা বলিতে লাগিলেন। আর বড় অধিক সংখ্যক অনুগত বীর সন্তান জীবিত নাই; কিন্তু যাহা আছে তাহাই তিনি গুইনিবিয়ারকে রক্ষার্থ নিযুক্ত করিবেন।

"Lest but a hair of this low head be harmed"

ধীরে ধীরে ভূত কথা সব মনে পড়িল—বীর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, তাহাদিগের উন্নতি, তাহাদিগের অবনতি, সব কথা মনে পড়িল। আর্থরের মর্ম্মদেশ বিদ্ধ হইল, আর্থর বলিলেন—

"And all this throve before I wedded thee,
Believing, "lo mine helpmate, one to feel
My purpose and rejoicing in my joy."
Then came thy shameful sin with Lancelot,
Then came the sin of Tristram and Isolt ;
Then others, following these my mightiest knights,
And drawing foul example from fair names,
Sinn'd also till the loathsome opposite
Of all my heart had destined, did obtain,
And all this thro' thee !—— "

ভূত কথা চলিয়া গেল। বর্ত্তমানও ভবিষ্যতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। এত সুখ, এত সম্পদ হারাইয়া কি জীবন ধারণ করা যায়?

"How sad it were for Arthur. should he live,
To sit once more within his lonely hall,
And miss the wonted number of my knights,
And miss to hear high talk of noble deeds
As in the golden days before thy sin."

শুদ্ধ ইহাই কি তাঁহার কষ্ট? শুদ্ধ তাঁহার যত্নের ধন, প্রাণস্বরূপ বীর-সম্প্রদায় হারানতেই কি তাঁহার জীবন এত হেয় হইয়াছে? শুদ্ধ তাহা নহে। গুইনিবিয়ারকে তিনি ভুলিতে পারিবেন না—তাহার বিচ্ছেদ তাঁহার নিকট অসহ্য। তাই আর্থর বলিতেছেন

And in my bowers of Camelot or of Usk
Thy shadow still would glide from room to room,
And I should even more be vext with thee
In hanging robe or vacant ornament

কারণ, আর্থরের ভালবাসা অনন্ত, অপরিসীম, অগাধ।

"Eor think not, tho' thou wouldst not love thy bird,
Thy lord has wholly lost his love for thee
I am not made of so slight elements.

আর্থরের ভালবাসা বালকের ভালবাসা নহে,

এ কথা মনে উঠিতে উঠিতে তাঁহার আর এক কথা মনে পড়িল—তবে কি গুইনিবিয়ার পুনর্গ্রহণের যোগ্যা? অতদূরে ইহকাল লইয়া ব্যস্ত আর্থরের ক্ষমাগুণ পৌঁছিল না। তিনি বলিলেন—

Yet must I leave thee, woman, to thy shame.

আর্থর তাহার কারণ বলিলেন। তাঁহার যেন বড় কষ্ট হইল যে, গুইনিবিয়ারকে তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না—তাঁহার মনে হইল যে কথা-প্রসঙ্গে গুইনিবিয়ারকে তিনি অনেক মর্মভেদী কথা বলিয়াছেন—আর্থরের দয়া হইল; আর্থর স্নেহসিক্ত স্বরে গুইনিবিয়ারকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন—

"Yet think not that I come to urge thy crimes,
I did not come to curse thee, Guinevere,
I, whose vast pity almost makes me die
To see thee, laying there thy golden head,
My pride in happier summers, at my feet.
The wrath which forced my thoughts on that fierce law,
The doom of treason and the flaming death,
(When first I learnt thee hidden here) is past
The pang—which while I weigh'd thy heart with one
Too wholly true to dream untruth in thee
Made my tears burn—is also past—in part
And all is past, the sin is sinn'd, and I,
Lo ! I forgive thee, as eternal God
Forgives : do thou for thine own soul the rest.
But how to take last leave of all I loved ?
O golden hair, with which I used to play
Not knowing ! O imperial-moulded form,
And beauty such as never woman wore,
Until it came a kingdom's curse with thee—
I cannot touch, thy lips, they are not mine,
But Lancelot's : nay, they never were the King's.
I cannot take thy hand ; that too is flesh,
And in the flesh thou hast sinn'd ; and mine own flesh,
Here looking down on thine polluted, cries
"I loathe thee ." Yet not less, O Guinevere,
For I was ever virgin save for thee,
My love thro' flesh hath wrought into my life
So far, that my doom is, I love thee still.
Let no man dream but that I love thee still.
Perchance, and so thou purify thy soul,
And so thou lean on our fair father Christ,
Here aflee in that world where all are pure,

We two may meet before high God, and thou
Wilt spring to me, and claim me thine and know
I am thine husband—not a smaller soul,
Nor Lancelot, nor another. Leave me that,
I charge thee, my last hope. I hear the trumpet blow.
They summon me their king to lead mine hosts
Far down to that great battle in the west,
Where I must strike against the man they call
My sister's son—no kin of mine, who leagues
With Lords of the white Horse, heathen, and knights,
Traitors—and strike him dead, and meet myself
Death, or I know not what mysterious doom.
And thou remaining here will learn the event;
But hither shall I never come again,
Never lie by thy side; see thee no more—
Fare well!"

কি সুন্দর চিত্র আমরা দেখিতে পাইলাম। দুই একটি রেখাপাত করিয়াই কবি কেমন সুকৌশলে তাঁহার চরিত্র বিকাশ করিয়া দিলেন। এরূপ সংক্ষেপে এরূপ মনোহর চিত্র অঙ্কিত, আমরা কোথায়ও দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। গুইনিবিয়ারের প্রতি আর্থরের উক্তিই তাঁহার প্রশংসাপত্র; ইহাই আর্থরের চিত্র কৌশল। আর্থর কেমন সুন্দর আরম্ভ করিলেন—

'Yet think not that I come to urge thy crimes,
I did not come to curse thee, Guinevere
I whose vast pity almost makes me die
To see thee, laying thy golden head,
My pride in happy summers at my feet.

তাঁহার হৃদয় এক এক স্তর উপরে উঠিতে লাগিল। আর্থর ক্ষমা-গুণের সর্ব্বোচ্চশিখরে উঠিলেন, তাঁহার হৃদয় এখন উন্নত, উদার ও মহৎ। আর্থর গুইনিবিয়ারকে বলিলেন—

Lo I forgive thee, as eternal God
Forgives, do thou for thine own soul the rest.

আমরা ইহা পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। আর্থরের এ অভিমান যুক্ত কথা শুনিয়াও আমরা বলিলাম যে আর্থর বাস্তবিক দেবতা। সত্য বটে, আর্থরের গুইনিবিয়ারের প্রতি উক্তিটি স্থানে স্থানে আত্মাভিমানে পূর্ণ। কিন্তু

এ অভিমানটুকু সুন্দর হইয়াছে। এটুকু আমাদের এখনকার—এটুকু আমাদের মানবস্বভাবসুলভ। যদি তুমি কাহাকেও ভাল বাসিয়া থাক, কল্পনা কর, সে তোমাকে ভাল বাসিতেছে না; শুদ্ধ তাহাও নহে, তোমাকে অন্যরূপেও মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা দিতেছে; যদি তাহাতেও তোমার ভালবাসা পূর্ব্বরূপ স্থির থাকে, যদি তখনও তোমার ভালবাসা পূর্ব্ববৎ অসীম ও অনন্ত থাকে, তোমার এ অভিমানটুকু হইবেই—এইরূপে তোমার হৃদয় স্ফীত হইবেই। আর্থর এখন এইরূপ উদারতায় দাম্ভিক—আর্থর এখন এইরূপ মহত্বে অভিমানী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তুলনায় সমালোচনা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং আমরা বলিতে চাহি না, কোন চরিত্রটি ইহার মধ্যে ভাল হইয়াছে। আর্থর ভাল, না চন্দ্রশেখর ভাল, তাহা বলিতে আমাদিগের শক্তি নাই। আমরা এইখানেই এই সুবিখ্যাত চরিত্র দুটির আলোচনা শেষ করিলাম।

শক্তি পূজা।

দুর্গোৎসব গিয়াছে, কিন্তু সে সুখতরঙ্গের মৃদু হিল্লোল আজিও হৃদয়ে মিলাইয়া যায় নাই। কত ব্যথার ব্যথীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, কত হৃদয়ের বন্ধুর সহিত বৎসরের পর, হৃদয়ের কবাট খুলিয়া সদালাপ হইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্গসুখের আনন্দ হিল্লোল আজিও হৃদয়কে এক একবার হিল্লোলিত করিতেছে। সমুদায় দেশময় উল্লাসের ছবি দেখিয়াছি, আনন্দ উৎসব দেখিয়াছি, দেখিয়া হৃদয় কি অপ্রমত্ত থাকিতে পারে?

বঙ্গধামে এইতো আনন্দ উৎসবের সময়। শস্যপ্রধান বঙ্গদেশ আজি ধন ধান্যে পরিপূর্ণ, কৃষি প্রধান বঙ্গ ধামের আজি কৃষি শ্রমের কিছু বিরাম হইয়াছে। বঙ্গ সহস্র নয়নে শস্য পূর্ণ রজত কাঞ্চনময় প্রসারিত ক্ষেত্রের প্রতি তাকাইয়া পুলকিত হইতেছে। হৃদয়ের আনন্দস্রোত ধীরি ধীরি উঠি-

তেছে। এ আনন্দ কি মুখে ধরে, না সাধারণ উৎসবে প্রকটিত হইতে চায়? কৃষীবল বঙ্গবাসীগণ কত আশার উল্লাসে নাচিতেছে। দুর্গোৎসব বঙ্গজাতির উল্লাস, হাস্যময় শস্যপূর্ণ ক্ষেত্ররাজির প্রতিচ্ছায়া, শরতের বিধুবদনের শুভ্রময় বিকাশ, মানবপ্রকৃতির উৎসব ও নৃত্য, অন্তরধামে বাহ্যজগতের প্রতিবিম্ব, একতন্ত্রে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির নৃত্য।

এরূপ নৃত্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। যে হৃদয় এ নৃত্যে না নাচিয়া উঠে, সে হৃদয় বড় কঠিন, সে হৃদয় কিছুতেই নাচিয়া উঠে না। হৃদয় যখন এই রূপে নাচিয়া উঠে, তখন কি লইয়া আমোদ করি? বাহ্যজগতে চারি দিকে দেখি, হাস্যময় প্রকৃতির প্রফুল্ল বিকাশ। রঞ্জত কাঞ্চন বর্ণে চারিদিকেই মহাশক্তি হাসিতেছে; হাসিয়া মানবের হৃদয়ে কত আশার সঞ্চার করিয়া দিতেছে। এই হাস্যময় মহাশক্তির পদতলে হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়া আপনা আপনি প্রশস্ত হইতে চায়। অন্তরে আপনা আপনি মহাশক্তির স্রোতে সঙ্গীত হইতে থাকে। অন্তরে শঙ্খ ও ঘণ্টারোল বাজিয়া উঠে। হৃদয় আপনা আপনি এই রোলে উৎসর্গিত হইতে চায়। সাধারণ সর্ব্বজন হৃদয়ে এক বাজনা বাজিয়া উঠে। অন্তরে দুর্গোৎসব আইসে। মহাশক্তির সকল মূর্ত্তিতে দুর্গোৎসব উদয় হয়। কাঞ্চনময় শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের বেশে লক্ষ্মীপূজা হৃদয়ে স্বতঃই সমুদ্ভূত হয়। যে কালে হৃদয়ে এমত দেবভাবের সঞ্চার হয়, সেকালে কি বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, বঙ্গদেশ মহাশক্তির পূজার সহিত একবার সরস্বতী ও লক্ষ্মী পূজা করিবে না? একবার ঐ শুভ ও সিদ্ধিদাতার লোহিত মূর্ত্তির পূজা করিবে না? একবার কুমারের শৌর্য্য ও বীর্য্যবান মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া শৌর্য্যশালী হইতে চাইবে না? একবার এই শক্তিসমুদায়কে অন্তরে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের ভাবে উদ্বোধিত হইয়া দুঃখ ও সন্তাপজনক প্রমত্ততা ও পাপাসুরকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া দিবে না? প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা সেই আভ্যন্তরিক ব্যাপারের বাহ্য বিকাশ মাত্র। নহিলে পূজা অন্তরেই হয়। সকলে মিলিয়া একত্র আমোদ ও পূজা করিব বলিয়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বাহিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া দেয়।

যিনি পৌত্তলিকতা ভাবিয়া দুর্গোৎসবে মিশেন না, তিনি অতি ভ্রান্ত। এদেশে পৌত্তলিকতা নাই, সব হৃদয়ের ব্যাপার। এদেশের পৌত্তলিকতা হৃদয়ের প্রতিরূপ—গুণ গরিমার প্রতিষ্ঠা। হিন্দুর পূজা, ধ্যান, স্তব ও স্তুতি

যাহা, তাহা সর্ব্বজাতির প্রায় সর্ব্ব লোক দিন রাত্রি করিতেছে। জ্ঞানের গরিমা, শক্তির উপাসনা কে না করে? কে না সহস্র মুখে বিদ্যা, জ্ঞান, ও বুদ্ধিমত্তার সমাদর করে? কে না বলিবে "বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে?" ধন ও ঐশ্বর্য্যের বলে এ পৃথিবীতে কে না বশীভূত হয়? ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে কি না সম্পন্ন হইতেছে? এ পৃথিবীতে ধন বল ও ঐশ্বর্য্য বল এক একটী মহতী শক্তি। বিদ্যাপ্রভাব যতদূর, ধন ও ঐশ্বর্য্যের প্রভাব কিছু তদপেক্ষা ন্যূন নহে! লোক সমাজের এই দুইটি মহাবল। ধন বলে ও বিদ্যা বলেই পৃথিবীতে প্রভুত্ব। যেমন বিদ্যাবান পণ্ডিতের পূজা, তেমনি ধনবান ভাগ্যবানের পূজা। কিন্তু আরও এক শক্তির প্রভাব সমাজে সময়ে সময়ে অনুভূত হয়। সে শক্তি শৌর্য্য। যে শৌর্য্যের প্রভাবে ভারত উঠিয়াছিল, সেই শৌর্য্য,—যে শৌর্য্যের প্রভাবে রোম উঠিয়াছিল সেই শৌর্য্য,—যে শৌর্য্যশূন্য হইয়া ভারত পতিত হইয়াছে,—সেই শৌর্য্য। এই শৌর্য্য প্রভাবে আজি ইউরোপীয় জাতি পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রধান। তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় সাহস উৎসাহ, ও শৌর্য্যের প্রশংসা কে না করিবে? তাঁহারা যেরূপ অকুতোভয়ে সকল বড় বড় কাজ সমাধা করিতেছেন, সেইরূপ শৌর্য্যের সমাদর ও পূজা কে না করে? শৌর্য্য না থাকিলে দেশ রক্ষা হয় না, জাতি, কুল, মান, কিছুই রক্ষা হয় না। যাহার মান ও আত্মাদর নাই, সে কাপুরুষ ও নির্লজ্জ। বীরের প্রশংসা ভারত একদিন শতমুখে করিয়াছে। পুরুষকার ভারতের একদিন মহাধন সম্পত্তি ছিল। সেই পৌরুষ লোক সমাজের সাক্ষাৎ শক্তি। বীর্য্যবান লোকের প্রভাব লোক সমাজে অতুল্য। বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, একত্র মিলিত হইলে যে মহাশক্তি সমুৎপন্ন হয় তাহার জয় অনিবার্য্য। তাহার জয় পশু বলের উপর তাহার জয় যথেচ্ছাচারিতার উপর, তাহার জয় পাপের উপর। এই ত্রিবিধ শক্তি একত্রিত হইলে আর কোন রিপুর ভয় নাই, সকল শত্রু শাসিত হয়, সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যে দেশে, যে লোক সমাজে এই ত্রিবিধ শক্তি মিলিয়াছে, সকল দেব দেবতারা সকল সাধুজন সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সহস্র নয়নে অবলোকন করিতেছেন। এইরূপ শ্রীবৃদ্ধি একদিন ভারতের ছিল। যে দিন ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ছিল, সেদিন ভারত সেই শ্রীবৃদ্ধিতে দিব্য চক্ষু পাইয়া দুর্গা পূজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

দুর্গাপূজা আর কিছুই নহে, ইহা মহাশক্তির উপাসনা মাত্র। জগতে শক্তি যে কতিপয় রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে, দুর্গাপূজা সেই সকল

শক্তির মিলিত পূজা মাত্র। আমরা দুর্গা পূজায় একত্র সর্ব্ববিধ শক্তির পূজা করি। পূজা করি কি? তাঁহাদের পাদপদ্মে মস্তক অবনত করি। তাঁহাদের স্তুতিগান করি, তাঁহাদের প্রভাব কতদূর, তাহা স্বীকার করি। তাঁহাদের সমাদর করি, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা করি, তাঁহাদের গুণ গান করি। এই দুর্গোৎসব, এই দুর্গাপূজা, পৌত্তলিকতা নহে। ইহা যদি পৌত্তলিকতা হয়, তবে ইহা আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা; এই পৌত্তলিকতায় পৃথিবী পরিপূর্ণ। এই পৌত্তলিকতায় জগৎ শুদ্ধ সর্ব্বক্ষণই লিপ্ত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া লোক নাই, উপাসক নাই। প্রতি লোকে প্রতিদিনই দুর্গা পূজা করিতেছেন।

প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হিন্দুজাতির কবিত্ব ও কল্পনার বিকাশ মাত্র। যে বিশ্ব-শক্তি জগৎব্যাপিনী, তাহাই মহাশক্তি। তাহাই শক্তির সমষ্টি। সেই শক্তি শতরূপিণী হইয়া জগতে বিকাশ হইয়াছে। সেই মহাশক্তি ভগবতী দুর্গা। সেই শক্তিরই উন্নত বিকাশ চেতনা, চেতনার উন্নত বিকাশ জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধি। বুদ্ধিজীবী প্রাণী সমাজের বল,—বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য এবং বীর্য্য। সেই বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও শৌর্য্য সম্বলিত মহাশক্তি পাপ ও যথেচ্ছাচারিতার পশুবল স্বরূপ মহিষাসুরকে শাসনে রাখিয়াছেন। এই দুর্গা প্রতিমা। এই ভগবতী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্ত্তিকেয়; দেব দেবতারা এই পূজাতে প্রসন্ন। যাহাতে পাপের সম্যক্ দমন, যাহাতে অত্যাচার, যথেচ্ছাচার, পশুবলের দমন, তাহাতে কোন্ সাধুব্যক্তি না প্রসন্ন হন। এই দুর্গা পূজার প্রতিমা কল্পনাও কবিত্ব। এই হিন্দুজাতির শক্তি পূজা। এই শক্তি পূজা হিন্দুজাতি একবার করেন না। একবার করিয়া তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হয় না। বারবার তাঁহারা এই শক্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। একবার সকল শক্তিকে মিলিয়া পূজা করা আবার তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে পূজা করা। একবার একত্রিত ভাবে মহাশক্তির পূজা, আবার তাঁহার স্বতন্ত্র ভাবে পূজা। সেই শক্তি পূজা,—কালী, শ্যামা, ও জগদ্ধাত্রী পূজা। লক্ষ্মীকে, সরস্বতীকে, কুমারকে আবার স্বতন্ত্র ভাবে হিন্দু পূজা করেন, নহিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। যাঁহারা একত্র সর্ব্বশক্তির পূজা করিতে না পারেন, তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে পূজা করেন। যাঁহার প্রীতি যে শক্তিকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাঁহার প্রীতি সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে। এই জন্য বঙ্গ হিন্দু সমাজে সকল শক্তি পূজার হুলস্থূল একেবারে পড়িয়াযায়।

মহাশক্তির দুই পার্শ্বে অতি মোহিনী মূর্ত্তিতে চারুহাসিনী সরস্বতী ও লক্ষ্মী শোভা পান কেন? আর শক্তির যে দুই কঠোররূপ, তাঁহারাই বা লক্ষ্মী সরস্বতীর পার্শ্বদেশে গণেশ ও কার্ত্তিকেয়রূপে নিয়োজিত কেন? এ কল্পনার কবিত্ব কি? রহস্য কি?

লোকসমাজে বিদ্যার দুই মূর্ত্তি। বিদ্যা লোককে মোহিত করে, বিদ্যা লোককে চমকিত ও স্তম্ভিত করে। বিদ্যা যেরূপে মোহিত করে, সেইরূপে বিদ্যা সরস্বতী,—সেই সরস্বতী সুন্দরী, বিমল শ্বেতরূপিণী, বীণাবাদিনী, চারুহাসিনী সরস্বতী। আবার বিদ্যা যখন দার্শনিক পণ্ডিতরূপে গম্ভীরভাবে লোককে বিজ্ঞতার উপদেশ দেন, যে, বিজ্ঞতা সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ, তখন বিদ্যা গম্ভীর, সিদ্ধিদাতা, বিজ্ঞতা-সম্পন্ন গণপতি। গণপতি গজানন, যেহেতু ঐরাবত, বোধ হয়, এককালে মহাজ্ঞানী বলিয়া প্রথিত ছিল। সরস্বতী,— কবিত্ব, বাগ্মীতা, সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যার মূর্ত্তি, গণেশ—পণ্ডিতের মূর্ত্তি। লোক সমাজে সুকুমার বিদ্যার আদর অধিক, অধিক লোক তাহার উপাসক, অধিক লোক বাগ্মীতায় ও কবিত্বে চালিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত হিন্দুদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। সিসিরো, ডিমস্থিনিস, বর্ক, চ্যাটাম দেশশুদ্ধ লোককে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। সঙ্গীতের বলে, চালিত হইয়া সেনানীদল রণরঙ্গে প্রাণবিসর্জ্জনেও ধাবিত হইতে পারে। সাধারণ সমাজ কেবল বিদ্যা প্রভাবেই চালিত হয়। বিদ্যার এই শক্তি অতি প্রধান। এই শক্তি প্রভাবে বিদ্যা সর্ব্বজন প্রিয়। কবি, বাগ্মী প্রভৃতি বিদ্বজ্জনগণ জগতে সাধারণপূজ্য। দার্শনিক পণ্ডিত ততদূর নহে। বিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য, দর্শনতত্ত্ব কিছু কর্কশ। এইজন্য সরস্বতী দেবীর স্থান, মহাশক্তির পার্শ্বে; কিন্তু গজাননের তাঁহার পরে। সরস্বতী দেবী; গণেশ পুরুষ ও দেব। যে কথা সরস্বতী ও গণেশ সম্বন্ধে বলা হইল লক্ষ্মী ও কার্ত্তিকেয় সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। লোকসমাজে ধন এবং ঐশ্বর্য্যের যে প্রভুত্ব ও শক্তি, শুদ্ধ শৌর্য্য বলের ততদূর নহে। ঐশ্বর্য্য সুশ্রী ও মনোহর, এজন্য লক্ষ্মী দেবী; কিন্তু পৌরুষ পুরুষোচিত; এজন্য কার্ত্তিকেয় পুরুষ ও দেব। ঐশ্বর্য্য সুবর্ণে মণ্ডিত, এজন্য লক্ষ্মী সুবর্ণবর্ণা। লক্ষ্মী কমলালয়ে অবস্থিত। চমৎকার কবিত্ব! চমৎকার কল্পনা!

চারি বেদ যে জ্ঞানের আধার, সেই গজানন চতুর্ভুজ। দশদিকেই বিস্তৃত যে শক্তি, সেই মহাশক্তি দশভুজা। এই দশভুজা লক্ষ্মী, সরস্বতী,

কার্ত্তিকের ও গণেশজননী; সত্ত্বরূপিণী ভগবতী। এই প্রাকৃতিক মহাশক্তি একাধারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণধারিণী। জন্ম, মৃত্যু, ও পালন প্রকৃতির ধর্ম্ম। প্রাণীজগৎ জন্মিতেছে, পালিত ও ধ্বংস হইতেছে। বিশ্বশক্তি প্রভাবে বিশ্ব আপনি আপনাকে গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে এবং আপনিই রক্ষিত হইতেছে। বিশ্বশক্তির এই ত্রিগুণ তাহার অন্তর্নিহিত। যে কল্পনা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরে বিকাশ প্রাপ্ত, সেই কল্পনা দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, ও কালীমূর্ত্তির সৃষ্টিকারিণী। মহেশ্বরের হৃদ্দেশ হইতে সংহাররূপিণী কালীমূর্ত্তি সমুদ্ভূতা। প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি, এইজন্য পুরুষরূপ মহেশ্বরের জায়া সত্ত্বরূপা ভগবতী, তমোরূপিণী কালী ও রজোরূপিণী জগদ্ধাত্রী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একই পুরুষ, জগতের একই মূলতত্ত্ব; সেই মূলতত্ত্ব প্রকৃতিরূপে প্রকটিত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছে। যখন বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছে, তখন তাহা শক্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই মহাপ্রকৃতিশক্তি পরিণাম-রূপিণী; ইহা ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, জ্ঞানে সম্পন্ন, এবং শৌর্য্য ও বীর্য্য ইহার অন্তর্নিহিত মহাবল। এই ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে ও শৌর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া প্রাকৃতিক ব্যভিচাররূপ পাপকে ইহা নিয়তই বিনাশ করিতেছে। সেই পশুবলকে বশ করিয়া জগদ্ধাত্রী সিংহবাহিনী। জগতে পাপ ও ব্যভিচার রক্তবীজের ন্যায় নিয়তই উদয় হইতেছে, নিয়তই কালীরূপিণী শক্তি ধর্ম্মঅসি করে ধারণ করিয়া তাহা সংহার করিতেছেন। পরিণাম-রূপিণী প্রকৃতি—উৎপত্তি, পালন ও প্রলয় মূর্ত্তিতে নিয়তই দেখা দিতেছেন, এজন্য বৎসর বৎসর ফিরিয়া আবার দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রীর উদয় এবং পূজা হইতেছে।

হিন্দু-কল্পনা শুদ্ধ প্রকৃতির পরিণাম-রূপিণী শক্তির রূপ ভাবিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। মানুষ আবার এই শক্তির সাধনা করিয়াছে। সাধনায় সিদ্ধ হইয়া প্রকৃতির মহা সৃষ্টির ভিতর মানুষ আবার আর একটি জগৎ গড়িয়াছে। ঐশী বিশ্বশক্তির মহা সৃষ্টি,—প্রকৃতিরাজ্য; মানুষের মহাসৃষ্টি—শিল্পরাজ্য। কিন্তু মানুষ নিজে কিছুই করিতে পারে না, প্রকৃতি-শক্তিকেই তিনি যখন নিজ প্রয়োজনে আনিতে চেষ্টা করেন, তখন প্রকৃতি স্বীয় পালনী শক্তিগুণে মানুষের আয়ত্তীভূত হইয়া অশেষ উপায়ে মানুষকে প্রতিপালন করেন। লোকসমাজ নিজ রক্ষার কারণ প্রকৃতিকে অশেষরূপে শিল্পরূপিণী মূর্ত্তিতে পরিণত করে। প্রকৃতি এইরূপ পরিণত হইলে মানুষ সাধনায় সিদ্ধ হয়। সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ প্রকৃতির এই ঐশী শক্তিকে তখন অতি মনোহররূপে সন্দর্শন করেন।

এই বিশ্বের যমুনাকূলে সংসাররূপ কদম্বমূলে শক্তি যেন সাধককে বীণাধ্বনিতে আকর্ষণ করিয়া মোহিত করিতেছেন। দূরে বংশীধ্বনি শুনিতে কত মধুর বোধ হয়। এই ঐশীশক্তি সাধককে যেন সেইরূপ মধুর রবে আকর্ষণ করিতেছেন। সাধক দূর হইতে ঐশীশক্তিকে অনুভব করিতে পারেন মাত্র। এই ঐশীশক্তি কি, তিনি কিছু বুঝিতে পারেন না। কিন্তু এই ঐশীশক্তি বংশীধ্বনির ন্যায় মনোমুগ্ধকরী ও সিদ্ধিদাত্রী। সেই শক্তির স্বরূপ তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ রূপে অনুভূত করেন। সেই শক্তির সাধনায় সিদ্ধ হওয়া কঠিন, সুতরাং তাঁহাকে কোন মতে ঋজু ও সরল ভাবে অনুমান করিতে পারেন না। এজন্য সাধক তাঁহাকে ত্রিভঙ্গ মুরারিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সাধকের নিকট তাহা মসীময়, এজন্য শ্যামাশক্তি কৃষ্ণমূর্ত্তি। যে শক্তি শ্যামা, সেই শক্তিই শ্যাম। শিবশঙ্করী শ্যামার মনোহর রূপ শ্যাম বংশীধর। আরাধনা রূপিণী রাধার কলঙ্ক ভঞ্জনের সময় এই শ্যাম শ্যামা রূপে প্রতীত হইয়াছিলেন। কে বলে, আমরা বিভিন্ন শক্তির পূজা করি? জগতে সকলই একমাত্র শক্তিরূপ। জগতে শক্তি ভিন্ন আর কিছুই পূজিত হইতে পারে না। সেই শক্তিই শ্যাম, সেই শক্তিই শ্যামা। সাধক ভেদে কল্পনা ভেদ মাত্র। প্রকৃত সাধকের নিকট কিছুরই ভেদাভেদ নাই। এই ভেদাভেদ লইয়া জগতে সাধকের (রাধার) যে কলঙ্ক ঘোষণা করে, সে কিছুই জানে না। তাহাকেই জ্ঞান দিবার জন্য শ্যাম শ্যামারূপিণী হইয়াছিলেন। সাধক এই শক্তিকে এতদূর আয়ত্ত করিতে পারেন, যে ইহা করতলস্থ আমলকবৎ জ্ঞান হইতে থাকে। যে দিকে ইচ্ছা সেইদিকে এই শক্তিকে লইয়া যাইতে পারেন। এই শক্তিকে আকাশে তাড়িত বার্ত্তাবহ রূপে নিয়োজিত করিতে পারেন; শত সহস্র যোজনে সংবাদ আনাইতে পাঠাইতে পারেন, এবং শত সহস্র যোজনে আপনার শকট বাহিনী করিতে পারেন। সাধক এই শক্তিকে এতদূর বশীভূত করিতে পারেন। যোগী এই শক্তিকে আপনার যোগসাধনায় নিয়োজিত করেন। কি উপায়ে শক্তি এত বশীভূত হয়? সে উপায় আরাধনা, সাধনা, ধারণা, চিন্তা, ভাবনা সহকৃত ভক্তি। সে উপায় গোপাঙ্গনাসহকৃত রাধারূপে প্রকটিত। রাধার বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ, সাধনার বশীভূত ঐশীশক্তি। ভক্তির ভগবান। রাই রাজা। কৃষ্ণ রাধার অনুবর্ত্তী দাস, রাধার পদতলে। রাধাতে শ্যাম কেমন অনুরক্ত, যেমন প্রেমপূর্ণ স্বামী—সতীতে অনুরক্ত। কৃষ্ণ-রাধার ক্রীড়নক। রাধার

কাছে শ্যাম রমণ-ময়, লীলাময়। কৃষ্ণ রাসবিহারী। এই রাধা কৃষ্ণের রাস-লীলায়, সাধকের নিকট ঐশীশক্তির এই লীলাময় মনোহর মূর্ত্তি আমরা সন্দর্শন করি। কখন সন্দর্শন করি? একদিন অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে কালী মূর্ত্তির পূজা করিয়া, এক দিন নবমীর অর্দ্ধ জ্যোৎস্নালোকে জগদ্ধাত্রী পূজা করিয়া, পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোৎস্নায় আর এক দিন রাধার রাস বিহার দেখি। হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে শক্তি কুসুম ফুটিয়া উঠে। কৃষ্ণ কেমন রাস বিহারে রাধার নিকট আগমন করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে উদয় হইতেছেন, জ্যোৎস্না ফুটিতেছে, আর রাধার রাস যাত্রা আসিতেছে, পূর্ণিমার পূর্ণবিকাশে রাধার মনে শ্যাম নৃত্য করিতেছেন, এই নৃত্য সন্দর্শন করিবার জন্য, হিন্দু একদিন কালভয়ঙ্করী কালী মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াই মনোহর শ্যাম শশধরের মোহন মূর্ত্তি কল্পনা ও ধারণা করিয়া তবে শান্ত হইলেন, তখন চারুচন্দ্র হাসিতে লাগিল। রাস বিহারে ফুল ফুটাইলেন। মহাশক্তির ত্রিগুণাত্মিকা কল্পনার পূজা করিয়া পরে সেই শক্তির মোহন মূর্ত্তি সকল কল্পনা করিলেন। সাধকের মনে বৃন্দাবন ফুটিল। মহাশক্তির পূজার পর কৃষ্ণের পূজা আরব্ধ হইল। রাস ও দোলের ঘটা পড়িল। সম্বৎসর ধরিয়া আমরা এইরূপে শক্তিকে পূজা করিতেছি। সম্বৎসর কি, সাংসারিক ও বিষয় কার্য্য কালে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই শক্তির পূজা করিতেছি। এক একবার বিশ্রাম ও আমোদ করিবার জন্য শক্তির রূপ কল্পনা করি মাত্র। এক একবার মন কবিত্বে ফুটিয়া উঠে। বিষয়ের হৃদয়ে পদ্মফুল ফুটে, জ্যোৎস্নালোক উদ্ভাসিত হয়। যখন যখন এইরূপ জ্যোৎস্নালোকে আমাদের হৃদয় প্রভাসিত হয়, তখনই আমরা হৃদয়ের কবিত্ব ও কল্পনা বাহিরে প্রকটিত করি। বাহিরে প্রকটিত করিয়া হৃদয়ের আনন্দ উৎস উৎসারিত করি। এই আনন্দ উৎস জন্মাষ্টমীতে প্রথম উৎসারিত হয়। ঘোর পাপান্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন থাকিলেও আমাদের হৃদয়ে একবার নবগ্রহের উদয় হয়। জন্মাষ্টমীতে শক্তির প্রথম রূপ বিকাশ হয়। একদা হৃদয়ের ঘনঘটার মধ্যে জ্যেৎস্না বিকাশিত হয়; অর্দ্ধরাত্রের ঘন অন্ধকারের পর হৃদয়ে অষ্টমীর আধ আধ জ্যোৎস্না ফুটে, হৃদয়ে দেবভাব সঞ্চারিত হয়। দেবভাব রূপী দেবকীর গর্ভে সর্ব্ব ভূতের বাসস্থান স্বরূপ বাসুদেব উদয় হন। কৃষ্ণের জন্ম হয়। যেন কি মহার্হ রত্ন লাভ হয়। এ রত্ন কাহাকে দিবার নয়। ইহা যেন চুরি করা ধন। ঐ পাপের কংস মহাবৈরি; পুণ্যের অন্তরঙ্গ পাপ, হৃদয়ের শত্রু হৃদয়,

এখনি এই শক্র নবোদিত এই দেবরত্নকে হরণ করিবে, এ ধন রাখি কোথায়! এত আনন্দ হৃদয়ে ধরে না! এ ধন রাখিবার একমাত্র স্থান আনন্দধাম ও নন্দালয়। নন্দালয় গোপালয়, গোপাল হৃদয়ের দেবালয় ও আনন্দধাম। সেই আনন্দধাম ও নন্দালয়ে নবোদিত আনন্দময় কৃষ্ণচন্দ্রকে লুকাইয়া রাখি। বিষয় বাসনারূপী যমুনা পার করিয়া হৃদয়ের দেবমন্দিরে তাঁহাকে স্থাপন করি। যেন ইহা হৃদয়ের কতই গুপ্তধন, কতই অমূল্য রত্ন! জন্মাষ্টমীতে এক দিন এইরূপে কৃষ্ণের জন্ম হয়।

যখনি মানবহৃদয়ের তমোরাশি তিরোহিত হইয়া হৃদয়ে দেবভাবের জ্যোৎস্না ফুটে, তখনই কৃষ্ণজন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্মাষ্টমী হয়তো প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ঘটিতেছে। কিন্তু ইহার স্বরূপ কি প্রকার, তাহা বাহ্য জন্মাষ্টমীতে প্রকাশিত হইয়াছে। মানবহৃদয়ে যে শক্তির বিকাশ, ইহ জগতে মানব চেতনায় যে শক্তি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই শক্তি ভগবতী; তাহাই শ্যামা, তাহাই শ্যাম। বাহ্যজগতে জড়শক্তি যেমন দুর্দ্দমনীয়, চেতন জগতে মানবহৃদয়ের দেবভাব ও বলবিক্রম তেমনি দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রমেয়। এই হৃদয় শক্তি, গঙ্গার ন্যায় বেগবতী। সেই বেগে ঐরাবত ভাসিয়া যায়। এই দেব বল, এই কৃষ্ণশক্তি একদিন গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয় পীড়ন রূপ ইন্দ্রের কোপনিবারণ করিতে পারে। এই কৃষ্ণশক্তি এক দিন বিরাট মূর্ত্তিতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অপেক্ষাও খরতর রূপে প্রতীয়মান হইতে পারে। এই শক্তি এত বৃহৎ, যে ইহা বিষ্ণুনাম ধারণ করিয়াছে। ইহা হৃদয়ের প্রমত্ততাকে দমন করিয়া মধুসূদন নামে প্রথিত হইয়াছে। মানবহৃদয়ের বলের নিকট মানবের দেহ বল অতি সামান্য জ্ঞান হয়। এই নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ দ্বারকাপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধন, মণি ও মাণিক্য, বসন ও ভূষণ, বল ও বীর্য্য সকলই কৃষ্ণশক্তির সহিত তুলনায় লঘু হইয়া পড়ে। রুক্মিণীর কৃষ্ণভক্তি সত্যভামার দর্পচূর্ণ করে। হৃদয়ে বিক্রম যখন দেবভাবে শাসিত হইয়া কার্য্য করে তখন তাহা অজেয় হইয়া পড়ে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি যখন হন, তখন এই সংসারের কুরুক্ষেত্র রূপ কার্য্যক্ষেত্রের যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ হয়। পাপের দুর্য্যোধন ভীম গদাঘাতে পরাজিত হয়। দ্রৌপদীর অপমান লাঞ্ছিত হয়। ধর্ম্মরাজের সিংহাসন পুনঃস্থাপিত হয়। দ্বৈপায়ন ব্যাস এই কৃষ্ণশক্তির মাহাত্ম্য বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি এই রূপে কৃষ্ণগীত গাইয়াছেন :—

"মহাত্মা বাসুদেব অপ্রমেয়, তিনি সর্ব্বভূতের বাসস্থান ও দেবসম্ভব বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব। তিনি বৃহৎ বলিয়া বিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মা শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃদ্ধি; তিনি মৌনধ্যান ও যোগদ্বারা আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মাধব। তিনি সর্ব্বতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া মত্ততারূপ মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া মধুসূদন নামে প্রথিত হইয়াছেন। কৃষিশব্দের অর্থ সত্ত্ব ও ন শব্দের অর্থ আনন্দ, মহাত্মা মধুসূদন সৎ ও আনন্দময়, রমণ ও লীলাময় বলিয়া কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পরম স্থান ও অক্ষ শব্দের অর্থ অব্যয়; বাসুদেব পরম স্থানে বাস করেন ও তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাহার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ হইয়াছে। তিনি দস্যুগণকে বিত্রাসিত করেন বলিয়া জনার্দ্দন নাম বিখ্যাত হইয়াছেন। বৃষভ শব্দের অর্থ বেদ ও ঈক্ষণ শব্দের অর্থ জ্ঞাপক; বেদ তাঁহার জ্ঞাপক বলিয়া তাঁহার নাম বৃষভেক্ষণ। তিনি কাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন না, বলিয়া তাঁহার নাম অজ। তিনি সাতিশয় দান্ত ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার নাম দামোদর। তিনি সর্ব্বভূতের পূরণকর্ত্তা ও সর্ব্বভূত তাঁহাতেই অবসন্ন হয় বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষোত্তম। তিনি জয়শীল বলিয়া জিষ্ণু। নিত্য বলিয়া অনন্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।"

এই কথায় ব্যাস কৃষ্ণশক্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। সঞ্জয় এই সকল বাক্যে কৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন করিয়া পুত্রবৎসল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনে ধর্ম্ম ও কৃষ্ণভক্তি উৎপাদিত করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য ধৃতরাষ্ট্রও একদিন দুর্যোধনকে ধর্ম্মবিরোধী যুদ্ধ বিপক্ষে উপদেশ দিয়াছিলেন। হৃদয়ের এই সাত্ত্বিক ভাব, এই দেবভাব, এই ঐশীশক্তির সঞ্চার যখন অবিচলিত থাকে তখনই তাহা কৃষ্ণশক্তি ও ভগবচ্ছক্তি। যোগীরা এই কৃষ্ণশক্তি ও ভগবচ্ছক্তি লাভ করিবার জন্য শরীর পতন করিতেন। ব্যাস ভগবদ্গীতায় যোগ সিদ্ধির চরম ফল ও মোক্ষ বলিয়া ইহাঁকেই উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণ লাভের জন্য যোগসাধনা। ব্যাসের এই মহদ্বাক্য শাঙ্কর ভাষ্যে প্রতি ধ্বনিত হইয়াছে। যে হৃদয় এই কৃষ্ণশক্তি ও সাত্ত্বিক বলে বলীয়ান হইয়াছে, তাহা পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। সাধক প্রতি বৎসরে কৃষ্ণশক্তি প্রাপ্ত হন। জন্মাষ্টমীতে প্রতি বৎসরে সাধক মণ্ডলীর হৃদয়ে কৃষ্ণের

* মহাভারতীয় যানসন্ধি পর্ব্বান্তর্গত একোন সপ্ততিতম অধ্যায়—দেখ।

পুনর্জন্ম হয়। জন্মাষ্টমীতে শক্তির পুনর্জন্ম হয়। যখন ঘোর প্রাবৃট্‌-কালে, ঝঞ্ঝাবাত ও বর্ষা ঋতুতে সংসারধ্বংস হইবার উপক্রম হইতেছে, তখন সাধক ভাবেন আবার প্রলয়ের পর সৃষ্টি হইবে। শুষ্কপত্র পড়িলে শরতের বৃক্ষলতায় আবার নবপত্র মুঞ্জরিত হইবে। মহাশক্তি আবার জন্মলাভ করিবেন। আবার সংসার সুচারুরূপে এক বৎসর চলিবে। এই এক বৎসরে বারে বারে শক্তির রূপ দেখ, আর শক্তিকেই পূজা কর। কখন শক্তির বিকট মূর্ত্তি দেখ, কখন শক্তির মোহন মূর্ত্তি দেখ। যখন শক্তির সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন তাহার মোহন মূর্ত্তি। তখন তিনি কৃষ্ণমূর্ত্তিতে জন্মলাভ করেন। সাধকের মনে এই মূর্ত্তিতে ঐশীশক্তি প্রথম উদয় হন। বালার্কের ন্যায় এই ঐশীশক্তির প্রথম আভাস। হৃদয় গগনে এই শক্তি যেমন উদিত হইতেছেন, তেমনি ইঁহার আলোক প্রভা দেখা দিতেছে। শক্তি যেমন বিকাশ প্রাপ্ত হইলেন, যেমন তাঁহার তেজ বাড়িল, হিন্দু অমনি দুর্গাপূজা করিলেন। আবার ঋতু ক্রমে যেমন শক্তির বাহ্য বিকাশ হইতে লাগিল, শক্তি নব নব ভাবে, নব নব মূর্ত্তিতে বিকশিত হইলেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার নব নব পূজার ব্যবস্থা হইল। শরতে, বসন্তে, পূর্ণিমায়, অমাবস্যায় শক্তির নব নব মূর্ত্তি দেখা যায়, সুতরাং সেই সেই কালে তাঁহার নববিধানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ও পূজা। সম্বৎসর ধরিয়া এইরূপে হিন্দুরা শক্তির পূজা করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ জগতে শক্তি ভিন্ন আর কিছুরই পূজা হয় না। বিকটমূর্ত্তিতেও শক্তি, অতি মোহিনী মূর্ত্তিতেও শক্তি। শক্তি ভয়ঙ্করী, শক্তি মোহকরী, শক্তির এই হরিহর মূর্ত্তি। শক্তিকে শুদ্ধ ভয় করি না, তাঁহার প্রভাবে মোহিতও হইয়া যাই। শক্তি কখন ভয় দেখাইতেছেন, কখন চমকিত করিতেছেন ধীরে ধীরে হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছেন, কখন হৃদয়কে নাচাইতেছেন, কখন ভক্তির উৎস উৎসারিত করিতেছেন। যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই শক্তির বিকাশ মাত্র। আইস আমরা মহাশক্তিকে পূজা করি। তাঁহার পদে প্রণত হইয়া তাঁহার সাধনা করি। সাধনা করিলেই সিদ্ধি হয়। জগতে শক্তির সাধনায় সকলই সম্পন্ন করা যায়। ভারতের পূর্ব্বতন উন্নতি সকলই শক্তির সাধনা প্রভাবে। আজি ইউরোপীয় সভ্যতা শক্তির মাহাত্ম্য শতমুখে ঘোষণা করিতেছে।

আমাদের পূর্ব্বতন আর্য্যজাতি যে শক্তিপূজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা অলীক কল্পনা নহে। জগতে যদি কিছু সৎ ও নিত্য পদার্থ থাকে, তাহা

মহাশক্তি, তাহা সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির সমষ্টি-মূলতত্ত্ব, তাহা বেদান্তের মায়াশ্রিত একমেবাদ্বিতীয়ং। তাহা একদা জগতের আশ্রয়, আবার তাহারই পরিণাম জগৎ। তাহা নিজে নিত্য ও অপরিণামী; কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ এই, তাহা অসংখ্য পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে, অথচ অপরিবর্ত্তনীয়রূপে আবার দেখা দেয়। এইজন্য তাহাকে নিত্য সৎপদার্থ কহে। তাহা সৎ বটে, অথচ মায়া তাহার রূপ। তাহা নিত্য পুরুষ বটে, অথচ প্রকৃতি তাহার পরিণাম। জগৎ তাহার রূপ। তাহা চিরকালই বর্ত্তমান, চিরকালই পুরুষ প্রকৃতির অভিন্ন ভাব। যিনি ভিন্ন ভাবেন, তিনি কল্পনায় ভিন্ন ভাবেন মাত্র। প্রকৃতি পুরুষ নিজে অভিন্ন। কল্পনায় ভিন্ন ভাবিতে পারা যায়, বলিয়া বাস্তবিক প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন নহে। আমরা ভিন্ন করিয়া ভাবি মাত্র। এই মহাশক্তির তুলনা নাই। এজন্য এই মহাশক্তির প্রকৃতি ও ধর্ম্ম তুলনা অথবা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যায় না। যিনি তুলনা ও দৃষ্টান্ত দেখাইতে যাইবেন, তিনি নিশ্চয় ভ্রমে পতিত হইবেন।

আমরা জ্ঞানে এই শক্তিকে অনুভব করি। শক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহার আভাস পাই মাত্র। ইহাই জ্ঞানের অনুভব ও উপলব্ধি। এই উপলব্ধি মিথ্যা কল্পনা নহে। ইহাকে যিনি মিথ্যা বলিবেন, তাঁহার নিকট কিছুই সত্য নাই। জ্ঞান ইহাকে বাস্তবিক পদার্থ বলিয়া উপলব্ধি করে, ইহার গুণাগুণ বিচার করে, ইহার মাহাত্ম্য, প্রকাণ্ডতা সৌন্দর্য্য, ভীষণতা, ইহার অনন্ত ও নিত্যভাব উপলব্ধি করে। কিন্তু মানবের মন শুদ্ধ উপলব্ধি করিয়া ক্ষান্ত হয় না। উপলব্ধিতে এই মহাশক্তির যে সকল গুণাগুণ অনুভূত হয়, কল্পনা তাহাদিগকে সাজাইতে বসে। কারণ, মানুষ শুদ্ধ জ্ঞানবান প্রাণী নহে। মানুষের কল্পনা, বোধ হয়, জ্ঞানবৃত্তি অপেক্ষাও তেজস্বী। জ্ঞানার্জ্জিত সামগ্রী সকল কল্পনা মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইতে চায়। কেন দেখাইতে চায়? মানুষ শুধু জ্ঞানবান নহে, কল্পনাসম্পন্নও নহে। মানুষ জ্ঞান, কল্পনা ও প্রবৃত্তিময়। তিনি এই তিন গুণে সমগ্র মনুষ্য। জ্ঞান যাহা উপলব্ধি করে, ভক্তি বলে, আমি তাহা পূজা করিব। প্রীতি বলে, আমি তাহা ভালবাসিব। অনুরাগ বলে, আমি তাহা যতনে ধারণ করিব। দয়া বলে, আমি তাহাকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া রত্নময় সিংহাসনে বসাইয়া তাহার জন্য দেবমন্দির গড়িয়া দিব, সেই মন্দির চত্বরে অন্নসত্র করিব। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অতুল ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান যে সকল

রত্ন আহরণ করিয়া হৃদয়রাজ্যে আনয়ন করে, অনুরাগ, প্রীতি, দয়া ও ভক্তি অমনি তাহা দেখিতে পায়। কল্পনা জাগরিত হইয়া উঠে, শোভার উপর শোভার সৃষ্টি করে, সৌন্দর্য্যকে মূর্ত্তিমান করে। অনুরাগ, প্রীতি ও ভক্তির সামগ্রীকে মূর্ত্তিমান করে। এই সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার অলীক স্বপ্ন নহে। এই আন্তরিক ব্যাপার প্রতিক্ষণে প্রতি লোকে ঘটিতেছে। কল্পনা যে মূর্ত্তি দেয়, তাহা অলীক সৃষ্টি নহে। তাহা বাস্তবিক জ্ঞানোপলব্ধির সামগ্রী। কল্পনা যখন ভক্তির আদেশক্রমে এই মূর্ত্তি সকল গড়িতে থাকে, তখন হৃদয় দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হয়। হৃদয়ে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়। সেই হৃদয়-প্রতিমার বাহ্য বিকাশ মাত্র দুর্গোৎসব, সরস্বতী ও লক্ষ্মীপূজা, কালী ও জগদ্ধাত্রী পূজা, রাধা ও কৃষ্ণলীলা। হৃদয়ে যে মূর্ত্তি আগে কল্পনা স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়াছে, ভক্তি আগে যে মূর্ত্তিকে ফুল ও চন্দনরসে চর্চ্চিত করিয়াছে, বাহিরে, পরে আমরা সেই প্রতিমাকে মূর্ত্তিমান করিয়া পূজা করি। এ কি মিথ্যা কল্পনা? এ কি ভ্রান্তি? এ কি পৌত্তলিকতা, এ কি পুতুল পূজা ছেলে খেলা? যে একথা বলে, সে মহা ভ্রান্ত।

এ যদি পৌত্তলিকতা হয়, জগৎ এই পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ, প্রতি লোক এই পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ। যে দোষারোপ করে, সেই নিজে পৌত্তলিক; সে নিজেই প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে শক্তির উপাসনা করিতেছে। এই শক্তি পূজা শুদ্ধ হিন্দুর পূজা নহে; ইহা সর্ব্বজাতির সম্পত্তি। প্রাচীন হিন্দুরা সাধারণ হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব তন্ন তন্ন বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া, যে প্রতিমা পূজা, যে শক্তিপূজা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এক দিন তাহা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইবে এমত আশা করা যাইতে পারে। জগৎ যখন হিন্দুর ব্যবস্থা ও পূজা পদ্ধতির প্রকৃত অর্থ ও গূঢ় তত্ত্ব গ্রহণ করিবে, তখন জগৎ সেই পদ্ধতিতে নিশ্চয় মাতিবে। এই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। এখন শুদ্ধ এই চাই, প্রাচীন হিন্দুরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণে সমর্থ হই, ও তদনুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর হই। শক্তির প্রকৃত পূজা আরম্ভ করি। রাধাকৃষ্ণে সাধকের ভক্তিভাব দেখি, বৈজ্ঞানিকের শক্তিসাধনা দেখি। সরস্বতী ও গণেশ পূজায় জ্ঞানালোচনা করি। লক্ষ্মীপূজায় ভারতকে ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করি। কার্তিক পূজায় প্রকৃত পুরুষকার ও কুমারের শৌর্য্য লাভে যত্নবান হই। মহিষমর্দ্দিনী ভগবতী দুর্গা পূজায় পাপাচারী মহিষাসুরকে বিনাশ করিতে শিখি। কালী পূজায় পাপের রক্তবীজের ধ্বংস করিতে শিখি। জগদ্ধাত্রী

পূজায় পশুবলকে শাসন করিতে শিখি এবং যাহাতে লোক সমাজের পরিত্রাণ ও রক্ষা হয়, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, এরূপ সদনুষ্ঠানে দিন রাত ব্যাপৃত হই। এরূপ শক্তি পূজার প্রতিষ্ঠা না হইলে ভারত উঠিবে না,—আমাদের উন্নতি সাধন হইবে না। আইস আমরা এক প্রাণে, এক মনে সকল হিন্দু ও ভারত-বাসী মিলিয়া প্রকৃত শক্তিপূজায় প্রবৃত্ত হই। আর এক বার জগতে ভারতের জয় ঘোষণা করি।

বঙ্গে ইংরেজাধিকার।

৩।

ওয়াট্‌সন সন্ধিপত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া যখন সিরাজউদ্দৌলাকে চন্দননগর আক্রমণের অনুমতি দানে সম্মত করাইতে পারিলেন না, তাঁহার চাতুরী, তাঁহার কৌশল-জাল, যখন সমস্তই সিরাজের কাছে ব্যর্থ হইল, তখন তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া ভয় প্রদর্শনে উদ্যত হইলেন। অষ্টাদশ বর্ষ-বয়স্ক তরুণমতি নবাবের মনে আতঙ্ক জন্মাইয়া আপনাদের স্বার্থ সাধন করিতে এখন তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি ৭ই মার্চ্চ নবাবকে লিখিলেন "যদি দশ দিনের মধ্যে সন্ধি অনুসারে কার্য্য করা না হয়, তাহা হইলে, তিনি আরও অধিক রণতরী আনাইবেন এবং তাঁহার রাজ্যে এমন অগ্নি প্রজ্বালিত করিবেন, যে সমস্ত ভাগীরথীর জলেও তাহা নির্ব্বাপিত হইবে না।" সিরাজ-উদ্দৌলা যখন আফগানগণের আক্রমণ আশঙ্কায় অস্থিরচিত্ত ছিলেন, তখন কঠোরমতি ইংরেজের এই কঠোরতাময় পত্র তাঁহার নিকট পঁহুছিল। পত্র পাইয়া তিনি অধিকতর অস্থির হইলেন। গভীর আশঙ্কায় তাঁহার পূর্ব্বক্রোধ তিরোহিত হইল। তিনি এখন বিনয়ের সহিত ওয়াটসনকে লিখিলেন যে, ফরাসীদিগকে কোনরূপ সাহায্য করা হয় নাই। সন্ধিপত্রের নিয়ম সমূহ

---

* এই প্রবন্ধ বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ রাত্রিকালে এঁড়িয়াদলস্থ 'ধর্ম্মসাধন' সমাজে পঠিত হয়।

প্রতিপাদন করিতে তাঁহার বিশেষ যত্ন আছে। ইহার পর চন্দননগর আক্রমণের সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন "আপনারা সদ্বিবেচক ও সাধুস্বভাব, যদি আপনাদের কোন শত্রু সরল হৃদয়ে আপনাদের আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহা হইলে আপনারা অবশ্য তাহার জীবনের কোন হানি করিবেন না। কিন্তু এইরূপ দয়া প্রদর্শনের পূর্ব্বে আপনাদিগকে সেই শত্রুর হৃদয়ের সরলতা ও অভিপ্রায়ের সাধুতার সম্বন্ধে সন্তোষকর প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ আপনারা যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিতে পারেন।" ওয়াটসন নবাবের এই শেষ বাক্যই, চন্দননগর আক্রমণে তাঁহার সম্মতি বলিয়া ধরিয়া লইলেন। পরদিন সিরাজের চিত্তবৃত্তি আবার পরিবর্ত্তিত হইল। সিরাজ পরদিন জানিতে পারিলেন যে, আফগানেরা আর বাঙ্গালা আক্রমণ করিবে না। সুতরাং তিনি নিঃশঙ্ক ও নিরুদ্বেগ হইলেন। যে গভীর আশঙ্কা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, ইংরেজের গর্হিত আচরণেও তাহাদের কাছে তাঁহাকে অনুনয় বিনয় দেখাইতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা অনেকাংশে দূর হইল। তিনি এখন দৃঢ়তার সহিত ওয়াটসনকে চন্দননগর আক্রমণে নিরস্ত থাকিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় কোনও ফল হইল না। ওয়াটসন ক্লাইবের ন্যায় চন্দননগর আক্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এখন কিছুতেই বিচলিত হইল না। নবাবের দ্বিতীয় পত্র তাঁহার নিকট অপমানসূচক বলিয়া বোধ হইল। তিনি অবিলম্বে চন্দননগরের বিরুদ্ধে আপনার রণতরী পরিচালিত করিলেন।

কূটবুদ্ধি ইংরেজ কিরূপ চাতুরী অবলম্বন করিয়া অল্প বয়স্ক সিরাজউদ্দৌলাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন, এই ঘটনাতেও তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ছলে হউক, বলে হউক, কোনরূপে নবাবকে আপনাদের ক্ষমতার আয়ত্ত করিয়া রাখিতেই তখনকার ইংরেজ কোম্পানির বিশেষ চেষ্টা ছিল। ক্লাইব ও ওয়াটসনের সময়ে এই চেষ্টা অধিকতর প্রসারিত হয়। ইংরেজ কোম্পানির ব্যবহারে সিরাজউদ্দৌলা বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দূরদর্শী মাতামহ মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত ছিল *। তিনি ইংরেজ হইতেই নানা অনিষ্টের আশঙ্কা

---

* যখন আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয়, তখন মারহাট্টাদিগের প্রবল প্রতাপ। মহারাষ্ট্র সৈন্য সময়ে সময়ে বাঙ্গালায় আসিয়া উপদ্রব করিত। এই সময়ে ইংরেজেরাও প্রবল হইতেছিলেন। তাঁহাদের সুদৃঢ় রণতরী ও জলযুদ্ধের

করিতেন। ইংরেজ তাঁহাকে সন্ধি পত্রের যে অর্থ বুঝাইয়া দেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হন। ঘৃণা ও বিরাগের সহিত তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়া উঠে। তিনি প্রথমে ইংরেজের কোন অনিষ্ট করিতে উদ্যত হন নাই; ইংরেজ কোম্পানিই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াস পান। বিদেশীর এরূপ আস্পর্দ্ধা রাজ্যাধিপতির সহনীয় হয় নাই। এই অসহিষ্ণুতা কখনও অপক্ষপাত ঐতিহাসিকের কাছে নিন্দনীয় হইবে না। যাহারা কোনও রাজ্যাধিপতির আশ্রয়ে বাস করিয়া শেষে নানা চাতুরীতে সেই রাজ্যাধিপতিরই ক্ষমতা নাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা লোকত ও ন্যায়ত দণ্ডনীয়। ইংরেজ সিরাজউদ্দৌলার নিকট অবশ্য এইরূপ দণ্ডনীয় হইয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজ তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করেন নাই। তাঁহাদিগের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, সিরাজ সমস্ত ক্ষতিরই পূরণ করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় নাই। ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, বিবেকের মর্য্যাদা বিনষ্ট করিয়া, আত্ম সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া, তাঁহারা কেবল আত্ম স্বার্থের তৃপ্তি সাধনেই উদ্যত হইয়াছিলেন। কিছুতেই এই দুরাকাঙ্ক্ষার অবসান হয় নাই এই উদ্যমও কিছুতেই প্রতিহত হইয়া উঠে নাই। ইংরেজ এক সময়ে অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবককে আপনাদের চাতুরী-জালে আবদ্ধ করিয়া, আর এক সময়ে, তাঁহাকে ঘোরতর আশঙ্কা ও উদ্বেগের আবর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া, আপনাদের স্বার্থ-সাধন করিতেছিলেন। তরুণবয়স্ক নবাব এক সময়ে ইংরেজের অনুচিত 'প্রার্থনায় অধীর হইয়া অপরিসীম ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, আর এক সময়ে, তাঁহাদের ভয়ে ভীত হইয়া অনুনয় বিনয়-পূর্ণ পত্র লিখিতে বাধ্য হইতেন। ইংরেজের কূট মন্ত্রণার ঘোরতর আবর্ত্তে পড়িয়া নির্দ্দোষ যুবক এইরূপে এদিক ওদিক পরিচালিত হইতেছিলেন। আর ইংরেজও এইরূপে এই নির্দ্দোষ যুবকের বুদ্ধি বিভ্রম জন্মাইয়া দিয়া, আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ও প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখিতেছিলেন। বঙ্গে ইংরেজের রাজত্ব স্থাপন এইরূপ

সুপ্রণালী দেখিয়া আলিবর্দ্দী খাঁর বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। তিনি মারহাট্টাদিগের পরাক্রম ও ইংরেজদিগের জলযুদ্ধ-কৌশল লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুসময়ে সিরাজ উদ্দৌলাকে কহিয়াছিলেন "এখন স্থলে অগ্নি জ্বলিতেছে, জলে উহা জ্বলিলে কে নিবাইতে সমর্থ হইবে?" আলিবর্দ্দী খাঁ ইহা কহিয়া সিরাজকে ইংরেজের সহিত সদ্ভাব রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

অনুদারতা ও অবিবেচনায় কলঙ্কিত হইয়াছিল। এইরূপ অপরিসীম প্রাধান্য স্পৃহা ও অনন্ত দুরাকাঙ্ক্ষার স্রোতে বিবেক ও ন্যায়পরতা ভাসিয়া গিয়াছিল। চন্দননগর আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইল। পরাজিত ফরাসিগণ কাশিমবাজারে আসিয়া আশ্রয় লইল। নবাব চন্দননগর পতনের সংবাদে যারপরনাই, ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধের আবেগে তিনি ইংরেজদিগকে শান্তির বিরোধী বলিয়া ভৎর্সনা করিতে ক্রটি করিলেন না। ফরাসিদিগের উপর এখন তাঁহার প্রগাঢ় সমবেদনার সঞ্চার হইল। তিনি পরাজিত ফরাসিদিগকে কাশিমবাজারে আপনার রক্ষাধীনে রাখিলেন। কিন্তু তিনি ফরাসিদিগের প্রতি সমবেদনা দেখাইতে গিয়া ইংরেজদিগের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হন নাই। লর্ড ক্লাইব আপনার গোপনীয় পত্র সমূহে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, নবাব সন্ধিপত্রের সমস্ত নিয়ম যথাযথ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট ওয়াট্‌স সাহেবকে তিন লক্ষ টাকা দিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। ইংরেজ কোম্পানির যে সমস্ত কুঠি ও দ্রব্যাদি নবাবের অধিকারে আসিয়াছিল, তৎসমুদায়ই ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এসম্বন্ধে নবাবের কোনরূপ অযত্ন বা ক্রটি লক্ষিত হয় নাই।* কিন্তু সিরাজের এই সদাচরণেও লর্ড ক্লাইব সন্তুষ্ট হন নাই। অপরিণত বুদ্ধি অপরিণতবয়স্ক রাজ্যাধিপতি জগতের সমক্ষে যেরূপ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছিলেন, বিদেশী ইংরেজ কোম্পানির একজন কূটবুদ্ধি কর্ম্মচারী সে সত্যনিষ্ঠার অবমাননা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। লর্ড ক্লাইব গোপনে সিরাজের সত্যবাদিতার প্রশংসা করেন, কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহার অনিষ্ট সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন। ন্যায় ও ধর্ম্মের অবমাননা করিয়াও তিনি আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিছুতেই তাঁহার এই দুরভিসন্ধি প্রতিহত হয় নাই, এবং কিছুতেই তাঁহার এই দুরাশা দূরীভূত হইয়া যায় নাই। সিরাজ ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি ধীরে ধীরে চতুর ইংরাজের চাতুরী-জালে জড়িত হইতেছেন। সুতরাং একদিন তাঁহার ক্ষমতা অন্তর্হিত ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই দুশ্চিন্তায় ইংরেজদিগের উপর ক্রমে তাঁহার অবিশ্বাসের সঞ্চার হইল। তিনি রাজা রায়দুর্লভকে সৈন্যদল লইয়া ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী পলাশী গ্রামে থাকিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু এই আদেশ প্রচারে ইংরেজদিগের উপর তাঁহার কোনও শত্রুতা

* Torrens' Empire in Asia, P. 33.

প্রকাশ পায় নাই। পলাশী গ্রাম কলিকাতা বা চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী নহে; রায়দুর্লভ ও ইংরাজ সৈন্যদলের সমক্ষে আপনার সৈন্যস্থাপন করেন নাই। সিরাজ সমগ্র দেশের অধিপতি ছিলেন। অধিকৃত ভূখণ্ডের যে কোন স্থানে তিনি আপনার সেনাপতিদিগকে রাখিতে পারিতেন। এই কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণে কাহারও কোনও অধিকার ছিল না। তথাপি লর্ড ক্লাইব পলাশীতে নবাবের সৈন্যদল আছে শুনিয়া, তাহার বিরুদ্ধাচরণে সমুত্থিত হইলেন। নবাবের অধিকারে আর যে সকল ফরাসি উপনিবেশ ও ফরাসি প্রজা ছিল, তৎসমুদায় তিনি আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে নবাবকে কঠোরভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন। ক্রমে তাঁহার এ কঠোরভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে হতভাগ্য সিরাজের অধঃপতনের সূত্রপাত ঘটিল।

সিরাজ উদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় তাঁহার একাধিপত্য ছিল। তথাপি একদল বিদেশীর অধীনস্থ সেনাপতি তাঁহাকে তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্যসাধনে আদেশ দিতে লাগিলেন। রাজ্যাধিপতির সমক্ষে যেরূপ বিনয় ও শিষ্টাচার দেখাইতে হয়, লর্ড ক্লাইব তাহার কিছুরই পরিচয় দেন নাই। ফরাসিগণ নবাবের অধিকারে আশ্রয় লইয়াছিলেন। নবাব তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে ধর্ম্মত বাধ্য ছিলেন। কিন্তু লর্ড ক্লাইব এই রাজধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্রও সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তিনি সেই আশ্রিত ফরাসিদিগকে আপনার হস্তে সমর্পণ জন্য নবাবকে কঠোর ভাবে আদেশ দেন। বিদেশীর এইরূপ আস্পর্দ্ধা ও এইরূপ অনধিকার-প্রিয়তায় রাজ্যাধিপতির মনে কিরূপ অপমান ও ঘৃণা, ক্রোধ ও বিরাগের আবেগ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এদিকে সিরাজ উদ্দৌলা অতি তরুণবয়স্ক ছিলেন। বয়সের তারল্য প্রযুক্ত তাঁহার চিত্তবৃত্তির চাপল্য সর্ব্বাংশে তিরোহিত হয় নাই। ইহার উপর বণিকবৃত্তি বিদেশীর নানা উপদ্রবে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধীরতা অন্তর্হিত হইল; ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং অপরিসীম অপমান-বিষে তাঁহার হৃদয় কালিমাময় হইয়া পড়িল। দিবসে তাঁহার শান্তি ছিল না, রাত্রিতেও নিদ্রা আসিয়া তাঁহার শ্রান্তি বিনোদনে সমর্থ হইত না। আফগানদিগের আক্রমণ-ভীতি এখনও তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তিনি আপনার শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া ক্রমে উদ্বিগ্ন, ক্রমে শঙ্কিত ও ক্রমে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। সন্তোষ ও শান্তি চিরদিনের জন্য

তাঁহার নিকট হইতে অপসারিত হইল। তিনি একদিন ইংরেজ দূতকে কঠোর ভাবে ভর্ৎসনা করিতেন, আর একদিন অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইতেন; একদিন আফগানের আক্রমণ সংবাদে সন্ত্রস্ত হইতেন, আর একদিন ইংরেজদিগের কোনরূপ ন্যায় বিগর্হিত অভিনব প্রার্থনায় দিশাহারা হইয়া পড়িতেন; একদিন তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, আর একদিন দুশ্চিন্তা ও বিষাদে তাঁহার মুখে গভীর কালিমার রেখাপাত হইত। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধিপতি এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। পর-প্রতারণা ও পরলাঞ্ছনায় হতভাগ্য অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের সুখ ও শান্তি এইরূপ তিরোহিত হইয়াছিল। রাজ্যাধিপতির ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর সম্ভবে না। এই শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া আজ কেনা হতভাগা সিরাজের প্রতি সমবেদনা দেখাইবে? অপমানের কঠোর দংশন, নিরাশার গভীর আর্ত্তনাদ, প্রভুশক্তির শোচনীয় অধঃপতন ও বিষাদের অনন্ত কালিমার ছবি স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া আজ কে না এই আঠার বৎসরের হতভাগ্য বালকের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে? কিন্তু আজ অধিকাংশ ইংরাজের ইতিহাসে সিরাজ ঘোর দুর্বৃত্ত নরাধম বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। ইংরাজের অঙ্কিত সিরাজের এই কলঙ্কময় চিত্র আজ বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে। কলঙ্কের অকথ্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আজ অনেকেই এই হতভাগ্য সিরাজের পরলোকগত আত্মার তর্পণ করিতেছেন। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার অদৃষ্ট-চক্র এক সময়ে সহসা এইরূপই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল!

সিরাজ উদ্দৌলা যখন বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন, এবং পরে যখন ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি হয় তখন রঙ্গ ক্ষেত্রে দুই প্রধান রাজপুরুষের আবির্ভাব হইয়া উঠে। ইহারা উভয়েই সিরাজের সমক্ষে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন; উভয়েই কার্য্যক্ষম ও ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। নবাব দরবারে উভয়েরই ক্ষমতা ও প্রাধান্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। ক্রমে ইহাদের চক্রান্তেই সিরাজের কপাল ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়। ইহাদের একজন চক্রান্তের সূত্রপাত করেন, আর একজন সেই চক্রান্তের গতি বিস্তার করিয়া, সিরাজের স্থলে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া উঠেন। ইহাদের একজন ওয়াট্‌স সাহেব, আর এক জন মীরজাফর খাঁ।

ওয়াটস সাহেব মুর্শিদাবাদে ইংরেজ কোম্পানির রেজিডেন্ট ছিলেন।

লর্ড ক্লাইব এই রেসিডেণ্ট দ্বারা অনেক সময়ে নবাবের মনোগত ভাব জানিতে পারিতেন। সুতরাং নবাবের দরবারে যে সকল ঘটনা উপস্থিত হইত, তাহার কিছুই ক্লাইবের অবিদিত থাকিত না। ক্লাইব এই সূক্ষ্মদর্শী কর্ম্মচারী হইতে সকল বিষয় জানিয়া, আপনার দুরভিসন্ধি সিদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিতেন। ওয়াটস সাহেব যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানির সহিত ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, মীরজাফর তেমন ছিলেন না। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিতই মীরজাফর খাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মীরজাফর নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং সিরাজ উদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি হইয়া 'বক্সী' উপাধিতে বিশেষিত হন। তাঁহার অধীনে অনেকগুলি সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই, সমর-ক্ষেত্রে এই সকল সৈন্য একত্র করিয়া আপনার রণ-পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন। ঘটনা-চক্রে সিরাজ উদ্দৌলার রক্ষিত এই প্রধান সেনাপতিরও মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। আলিবর্দ্দী খাঁ যাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং আপনার দুহিতা-রত্নকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, যিনি সিরাজ-উদ্দৌলার আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার অবস্থার উন্নতি করিতেছিলেন, তিনিই শেষে ইংরেজের সহিত একযোগ হইয়া আপনার সেই আশ্রয়দাতা প্রতিপালন-কর্ত্তা প্রভুর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন। দুর্নিবার লোভে, অপার বিশ্বাস-ঘাতকতায়, মীরজাফরের চরিত্র এইরূপে কলঙ্কিত হইয়াছিল। এইরূপ কলঙ্কের ভার মাথায় লইয়া মীরজাফর সিরাজের সর্ব্বনাশ-সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলা তাঁহার মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর ন্যায় দূরদর্শী বা সদ্বিবেচক ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট ছিল। প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরাও সহসা তাঁহার কোনও অব্যব-স্থিততা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। এই সময়ে জগৎশেঠ, মহাতাপচাঁদ, রাজা রায় দুর্লভ ও মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি বাঙ্গালার রাজকার্য্যের প্রধান পরিচালক ছিলেন। জগৎশেঠ মহাতাপ চাঁদ নবাবের ধন-তৃষ্ণায় অসন্তুষ্ট হন। নবাবের একজন তরুণবয়স্ক প্রিয়পাত্র রায় দুর্লভের উপর ক্ষমতা প্রকাশ করাতে, রায়দুর্লভও নবাবের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। যখন রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ রাজ্যাধিপতির উপর কোনও বিষয়ে

অসন্তুষ্ট হন, তখন সহজেই কোন একটি গুরুতর ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হইতে পারে। উপস্থিত সময়েও সিরাজের বিরুদ্ধে এইরূপ ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রথমে জার লতিফ খাঁ নামে একজন রাজপুরুষ রঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তিনি রেসিডেন্ট ওয়াটস সাহেবের নিকট প্রস্তাব করেন, যে, নবাব ইংরেজদের বিনাশ সাধনে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। যে পর্য্যন্ত আফগানদিগের আক্রমণ-ভয় দূর না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি ইংরেজদিগের সহিত মৌখিক বন্ধুতা দেখাইতেছেন মাত্র। তিনি শীঘ্রই সৈন্যদল লইয়া পাটনায় যাত্রা করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ইংরেজগণ সহজে মুর্শিদাবাদ অধিকার করিতে পারেন। জার লতিফ খাঁ অতঃপর নবাব হইবেন ইহা স্থির হইলে, জারলতিফ রাজা রায় দুর্লভ ও জগৎশেঠদিগের সহিত মুর্শিদাবাদ অধিকারে ইংরেজদিগের সাহায্য করিতে পারেন। ইহার পর ইংরেজেরা যে কোন প্রস্তাব করিবেন, জার লতিফ তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইবেন।

ওয়াটস সাহেব এই সকল ক্লাইবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব এ বিষয়ে ওয়াটস সাহেবকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করিলেন না। ক্লাইবের এই উৎসাহসূচক পত্র যখন ওয়াটস সাহেবের নিকট পঁহুছে, তখন আর একজন অধিকতর ক্ষমতাপন্ন রাজ পুরুষ হইতে আর একটি অধিকতর অনুকূল প্রস্তাব উপস্থিত হয়। মীরজাফর পিত্রস্ নামক একজন আরমাণি দ্বারা ওয়াটস সাহেবের নিকট এই প্রস্তাব করেন, যে, যদি তিনি সিরাজের স্থলে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগের যথোচিত সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। উপস্থিত প্রস্তাব ক্লাইবের নিকট সাদরে পরিগৃহীত হইল। ক্লাইব ওয়াটস সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে মীরজাফর নবাব হইলে, ইংরাজ কোম্পানিকে যথোচিত অর্থ পুরস্কার দিতে হইবে, এবং ইংরাজ কোম্পানির ও সর্ব্বসাধারণের যে সকল ক্ষতি হইয়াছে তৎসমুদায়ের পরিপূরণ করিতে হইবে।

যাঁহারা হতভাগ্য সিরাজের অধঃপতন-সাধন-জন্য ইংরাজদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়। ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি; আমরা ভারতবর্ষীয় বলিয়া অনেক বিষয়ে জগতের সমক্ষে অভিমান প্রকাশ করিতে পারি; সমস্ত ভারতবাসীর উপরই আমাদের প্রগাঢ়

ভ্রাতৃভাব আছে; সকল বিষয়েই স্বদেশীয়দিগের সহিত একমত হইতে পারিলে, সকল সময়ে স্বদেশীয়দিগের গুণোৎকীর্ত্তনে সমর্থ হইলে, আমাদের হৃদয়ে অপরিসীম আহ্লাদের সঞ্চার হয়। কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমাদের যে সকল স্বদেশী এক সময়ে বিদেশীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া হতভাগ্য সিরাজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিলেন, তাঁহারা সদ্বিবেচনা, বিশ্বস্ততা বা ধীরতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সিরাজউদ্দৌলা যখন মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন বঙ্গের অধিবাসীগণই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-দণ্ডের পরিচালক ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার জাতি বিদ্বেষ ছিল না। তিনি স্বজাতির পক্ষপাতী হইয়া বিজাতির অবনতি সাধনে উদ্যত হইতেন না। তাঁহার সময়ে রাজা রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্ত্তা, জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ ধনরক্ষক ও মন্ত্রিসভার সদস্য, ও রাজা রায় দুর্লভ প্রধান রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী সিরাজের রাজ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর উচ্চ পদ, উচ্চ সম্মান ছিল। হিন্দুগণ সৈন্য পরিচালনা করিতে পারিতেন, সন্ধি বিগ্রহের মন্ত্রণা দিতে সমর্থ হইতেন, এবং রাজ্যের ধন-বৃদ্ধি করিয়া রাজার ও জনসাধারণের উপকার করিতে পারিতেন। তথাপি এক সময়ে ইঁহারাই সিরাজের সর্ব্বনাশ করিয়া শ্বেত পুরুষের হস্তে সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা দিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ইঁহাদের ধারণা ছিল যে, ইংরেজগণ ক্ষমতাপন্ন হইলেই ইঁহারা অত্যাচার ও অবিচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আত্ম-প্রাধান্য সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারণা শেষে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। চক্রান্তকারীগণ মায়াবিনী মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইয়া যে সুখ ও শান্তির উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছিলেন, সে সুখ ও শান্তি তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহারা আপনারাই আপনাদের পায়ে কুঠারাঘাত করেন, এবং আপনারাই আপনাদের স্বদেশীয়ের উন্নতির পথ কণ্টকিত করিয়া তুলেন। ইংরেজের ক্ষমতায় তাঁহাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়; ইংরেজের প্রাধান্যে তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়া যায়। একশত বৎসরেরও অধিক কাল হইল, বাঙ্গালায় ইংরেজের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছে। ইংরেজ-বর্ণিত-দুরাত্মা সিরাজের রাজ্যে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য বাঙ্গালির হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছিল, এই একশত বৎসরের অধিক কালেও সুসভ্য ইংরেজ অধিকারে সে দৃশ্যের আবির্ভাব হয় নাই। ইংরেজের রাজ্যে আজ অস্ত্র স্পর্শ

করা বাঙ্গালীর মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত, আজ ইংরেজের সন্ধি-বিগ্রহের মন্ত্রণা-গৃহে বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার নাই, আজ রাজনৈতিক বিষয়ে বাঙ্গালী ইংরেজের নিকট অবিশ্বস্ত, রাজ্যের শাসন-দণ্ড-পরিচালনে আজ বাঙ্গালী ইংরেজের সমক্ষে অশক্ত। ইংরেজের ক্ষমতাদাতা জগৎশেঠের বংশধর আজ ইংরেজের রাজ্যে দীনদশাগ্রস্ত, রাজবল্লভের বংশধর আজ হীন ভাবে সাধারণের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থী। চক্রান্তকারীগণ যদি জানিতেন যে ইংরেজের অধিকারে, ইংরেজের সুবিচারে তাঁহাদের স্বদেশের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতন ঘটিবে, তাহা হইলে, বোধ হয় তাঁহারা লর্ড ক্লাইবের পরিপোষক হইতেন না, এবং সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনাদের অধিকারচ্যুতির পথ পরিষ্কার করিতেন না। ঘটনাচক্রে তাঁহাদের মতি-বিভ্রম ঘটিয়াছিল। তাঁহারা পরিণাম-দর্শিতায় পরিচালিত হন নাই; সদ্বিবেচনা তাঁহাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দেয় নাই। তাঁহারা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া একটি তরুণ-বয়স্ক যুবকের বিরুদ্ধাচরণ করেন, এবং অদূরদর্শিতা ও অসমীক্ষকারিতায় আপনাদের পবিত্র প্রভুভক্তি কলঙ্কিত করিয়া তুলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস-ঘাতকতায়, তাঁহাদের জন্মভূমির যেরূপ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা অনন্তকাল অপক্ষপাত ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লেখা থাকিবে।

সখার নিকট শেষ বিদায়।

যাও সখে, ফিরে যাও, কেন আর বাধা দাও
বিজন ভ্রমণে মম—জীবনের সাধ!
তুষিত হে প্রিয়তম, জানহ অন্তর মম,
তবে কেন আজি পুন সাধিছ হে বাদ?

জিজ্ঞাসহ বারবার— "কি দুখ সখে, তোমার
কি দুঃখে সংসার ছাড়ি পশিবে কানন?"

জীবন।

তা' যদি বুঝাতে পারি, তবে আর অশ্রুবারি
কি হেতু বরষে আঁখি, ক্লান্ত কিসে মন?

মন ব্যথা যদি হায় অপরে বুঝান যায়—
নিজে বুঝি, তবে আর কি দুখে কাতর!
মরমের পরপর দেখিতাম থর থর—
দেখাতাম তোরে, সব গরলের স্তর।

বলেছিত কতবার, হৃদি মোর অন্ধকার—
কভু না বিকাশে তথা সুখ-সূর্য্যভাতি—
আঁধারে কাটাই কাল, পোহা'ল না রাতি!

অন্তর অন্তর স্তলে কি জ্বালা যে সদা জ্বলে
আমি তা বুঝিনা—তোরে বুঝাব কেমনে?
জীবনের ভার আর সহে না জীবনে।

জীবনের যত আশা, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা
বাল্য জীবনের সনে সকলি ত গত;
কি ডোরে বাঁধিবে বল, সংসারীর মত!

সংসারের সহ যার সম্বন্ধ মিটেছে, তার
কি সুখে অনলে বাস—অনল অন্তরে?
সন্ন্যাসী কি সাধে র'বে সংসার ভিতরে?

বিগত স্বপন যথা— বাল্যলীলা সুখ কথা
থেকে থেকে মনে উঠে ভাসি অশ্রুনীরে,—
এ সুখ সংসার ডোরে বাঁধে সন্ন্যাসীরে!

সরল সুহৃদসহ খেলাতাম অহরহ,
ভ্রমিতাম মন সুখে তরঙ্গিণী তীরে,
মধুর আলাপে ভাসি' সুখসিন্ধুনীরে।

ভানু যবে অস্ত যায়, পশ্চিম আকাশ গায়
ছোট ছোট মেঘগুলি চারু শোভা ধরে,
প্রতিবিম্ব পড়ে তা'র সলিল ভিতরে।

সবে মিলি সমস্বরে, গাইতাম প্রাণ ভরে,
দিবা অবসান গীতি-মানস মোহন ;
সেই দিবা অবসান হ'য়েছে এখন।

শারদী পূর্ণিমা শশী দেখিতাম সবে বসি'
দেখিতাম সরোবরে প্রফুল্ল নলিনী,
মধুর জ্যোৎস্না ভাতি—মানস মোহিনী।

বাল্য জীবনের কথা স্মরিয়া মরম ব্যথা
বাড়াইয়া কাজ নাই—কি ফল তাহায়,
সুখের শৈশবকাল কে বা ফিরে পায় ?

কিন্তু অভাগার মত জীবনের আশা যত
একেবারে পরিহরি গিয়াছে কাহার ?
কাহার অন্তরে নাই আশার সঞ্চার ?

ক্রমে বাল্যকাল গেল, দারুণ যৌবন এল,
বাল্যসহচর সবে সংসারে মগন,
দেখিলাম সংসারের ভ্রুকুটি ভীষণ !

রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ভয় মূর্তিমান রিপু ছয়,
হেরিনু বীভৎস মূর্তি স্বার্থপরতায়,
অনৈক্য বিকট বেশে ঘুরিয়া বেড়ায় !

'সংসার আশ্রম সার' ! শুধু তার সঙ্‌সার,
যৌবনে নরের বটে নরত্ব বিকাশ—
পূর্ণ মন অঙ্গে পূর্ণ শক্তি প্রকাশ।

কিন্তু নরগণ কেন, লভিয়া যৌবন হেন
অহর্নিশি ভাসে বল, নয়ন আসারে ?
প্রবেশি সংসারে বল, কে সুখী সংসারে ?

যাক্ ইথে কাজ নাই, ফিরে যাও, আমি যাই,
অভাগা সখার ভোর পুরা রে কামনা,
অন্তিম বিদায়, ভাই, অন্তিম বাসনা।

কভু মনে ভাবি হেন, পথহারা হ'য়ে যেন
পশিয়াছি এ সংসারে—অজানিত স্থান,
কোন ঠাঁই সুখ নাই, আকুল পরাণ।

যা' দিয়া সংসার ভাই, আমাতো তা' কিছু নাই,
সংসারের উপাদান সকলি কর্কশ,
অসম্পূর্ণ সমুদায়—চঞ্চল, নীরস।

কি যেন হৃদয়ে নাই, সদা আমি খুঁজি তাই,
কি অভাবে প্রাণ মন সদা উচাটন,
ভাবিয়া ভাবিয়া তার না পাই কারণ।

তাই ভাবিয়াছি মনে, পশিয়া বিজন বনে,
দেখিব কি লাগি সদা কাঁদে মোর মন,
অন্তরের অন্ধকার দেখিব কেমন।

সংসারেতে নাহি যাহা, বিজন বিপিনে তাহা
পাইলেও পেতে পারি ; শান্তিসুধাময়
বিরলে নিবসে সদা, হেন জ্ঞান হয়।

আকাশ কুসুম প্রায়, সদা প্রাণ শান্তি চায় !!
নরক ভিতরে সুধা, সম্ভবে কখন ?
সংসার মাঝারে কোথা শান্তি নিকেতন ?

কোথা শান্তি সুধাময় কাননে কি শান্তি রয় ?
মানুষের মন(ই) বটে শান্তির আধার,
মনে শান্তি না রহিলে কোথা নাহি আর।

একি হ'ল প্রিয়তম ! নিবিড় নিবিড়তম
আঁধারে আবার হায়, ঢাকিল আমায়,
নৈরাশ্য সাগরে পুন ডুবিনু রে হায় !

তবে কি সংসার হ'তে যেতে আমি কোনমতে
পারিব না, পারিব না, হায়রে কপাল !
শূন্য মন দেহে হেন রব কতকাল !

আরত সহে না ভাই, বুক ফাটে—মরে যাই,
পরাণ কেমন করে—কহিতে জানি না।
পৃথিবী ঘুরিছে যেন হ'য়ে কেন্দ্র হীনা।

যাব ভাই, যাব চলি, যাও তুমি গৃহে চলি;
আর না রহিব এই মানব ভবন,
ভ্রমিব সমগ্র ধরা—গিরি, গুহা, বন।

নিখিল জগৎ ধরা, সদা বিশ্ব-কার্য্য-পরা,
দর্শকের বেশে সদা ভ্রমিব কেবল,
মিশিব না কা'র সনে- অন্তর গরল।

অহর্নিশি কাঁদিবারে আসিয়াছি এ সংসারে,
কাঁদিব পরাণ খুলি, গিরি গুহা বনে;
পশিবে না সে রোদন মানবশ্রবণে।

সংসারী মানবগণ বুঝিবে না এ রোদন
সুখের কণ্টক মোরে ভাবিবে সবাই,
পরদুঃখ পরে বুঝা, কঠিন রে ভাই।

যেখানে সৌন্দর্য্য আছে, যাব না তাহার কাছে
লতাপত্র ফুল ফল ছোঁব না কখন,
দেখিব না সুধাকর মাধুরী মোহন।

রমণী বদন আর হেরিব না সুধাধার,
দেখিব না ফুল্লানন শিশুর বদন,
শুনিব না প্রণয়ের সঙ্গীত মোহন।

নিরঞ্জন তপোবনে মুনি ঋষি এক মনে
ভাবেন ভবের ভাব, অন্তর জগতে,
পরাণী সৃজন কিসে, বিলয় কি মতে।

শুভাশুভ, পুণ্য, পাপ, ব্যাধি, জরা মৃত্যু, তাপ,
পরজন্ম, পুনর্জ্জন্ম, ললাট লিখন,
ভাবিয়া কারণ সব পুলকিত মন।

যাব হেনে নিরজনে, সুধাব বিভুর সনে—
থাকেন ঈশ্বর যদি জগৎ কারণ।
'কি হেতু মানব মনে যন্ত্রণা এমন ?

থাকেন ঈশ্বর যদি, জানি'ছেন নিরবধি,
মানবের মনে কত মরম যাতনা !
শিবময় শিব-করে (এ) অশিব ঘটনা !

'পূর্ব্ব জন্ম পাপ ফলে পরাণী সদাই জ্বলে',
বিশ্বাসীর বটে সদা এ যুক্তি ধারণা।
পাপ কেন ভূমণ্ডলে —ফল যার যাতনা ?

যেদিন আস্তিক হ'ব একে একে বুঝে ল'ব ;
ভয়ে বুঝি, ভবনাথ, মোরে দেখা দাও না ?
সংসার কারায় রাখি' দাও সদা যন্ত্রণা !

সুখের হাট ও সৌন্দর্য্যের মেলা।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবকাল হইতে মানুষ সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ চিরকাল বলিয়া আসিতেছে যে সুখ পৃথিবীতে নাই, যদিও থাকে, বড়ই দুষ্প্রাপ্য। পৃথিবী মানুষের কান্নায় ভরা। মানুষ বলে ভগবান মানুষের অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই, দুঃখই লিখিয়াছেন। তাই মানুষ চিরকাল দুঃখের কান্না কাঁদিতেছে।

ধর্ম্মযাজকেরা সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সময়ে বলিয়া থাকেন যে পৃথিবীতে সুখ নাই, সুখ স্বর্গে—এজন্মে সুখ নাই, সুখ মৃত্যুর পর পরলোকে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা বলিয়া থাকেন যে এ জন্মটায় মানুষের কেবল পরীক্ষা, সেই পরীক্ষার ফল স্বরূপ মানুষের সুখ দুঃখ মানুষের মৃত্যুর পর পরলোকে। এ পৃথিবীতে সুখ নাই।

যাঁহারা ধর্ম্মযাজক নহেন, এমনি তোমার আমার মতন মানুষ, তাঁহারা সুখ খুঁজিয়া বেড়ান, মনে করেন বুঝি সুখ কোন স্থানে বা কোন জিনিসে লুকান আছে। আবার কোন্ স্থানে বা কোন্ জিনিসে সুখ লুকান আছে ঠিক করিতে না পারিয়া, তাঁহারা সুখের জন্য সর্ব্বদাই অস্থির, সর্ব্বদাই লালায়িত, সর্ব্বদাই সন্তপ্ত! তাঁহারা কখনও এ জিনিসটা দেখিতেছেন, ইহাতে সুখ আছে কি না, কখনও ও জিনিসটা দেখিতেছেন, উহাতে সুখ আছে কি না, কখনও এ কাজটা করিয়া দেখিতেছেন, ইহাতে সুখ পাওয়া যায় না, কখনও ওকাজটা করিয়া দেখিতেছেন, উহাতে সুখ পাওয়া যায় কি না। এত দেখিয়াও হয়ত সুখ পান না, আর যদিও পান, হয়ত সে সুখ দুঃখের সহিত মিশ্রিত, নয় দুই দিনের বেশি থাকে না! তাই তাঁহারা বলেন যে পৃথিবীতে সুখ নাই থাকিলেও না থাকারই মধ্যে।

কিন্তু প্রকৃত কথাটা কি? সুখ কি সত্য সত্যই পৃথিবীতে নাই? থাকিলেও, তাহা কি এতই দুষ্প্রাপ্য, পরিমাণে এতই কম? সুখকে কি এতই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়? না, তা নয়। পৃথিবীতে সুখের পরিমাণ নাই— সুখ যথার্থ ই অপরিসীম। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে, এই অনন্ত জগতে সুখের ছড়াছড়ি, সুখের ঢালাঢালি, সুখের গড়াগড়ি। এই অসীম অনন্ত জগৎ— অসীম অনন্ত সুখের অসীম অনন্ত হাট। এ অসীম অনন্ত ব্রাহ্মণ্ডরূপ সুখের হাটে কত জিনিস আছে বল দেখি? কত রকমের জিনিস আছে বল দেখি? কার সাধ্য বলে কত জিনিস, কার সাধ্য বলে কত রকমের জিনিস! আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র দেশের একটা ক্ষুদ্র বিভাগের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের একটা ক্ষুদ্র পল্লীতে কত জিনিস এবং কত রকমের জিনিস আছে বল দেখি? কত গাছ এবং কত রকমের গাছ আছে বল দেখি? কত লতা এবং কত রকমের লতা আছে বল দেখি? কত পাতা এবং কত রকমের পাতা আছে বল দেখি? কত পাখী এবং কত রকমের পাখী আছে বল দেখি? আর জিজ্ঞাসাই বা করিব কত? জগতে জিনিসের সংখ্যারও সংখ্যা নাই, জিনিসের রকমেরও সংখ্যা নাই। তাই বলি যে এই অসীম অনন্ত জগৎ একটি অসীম অনন্ত হাট, এবং এই অসীম অনন্ত হাট অসংখ্য দ্রব্যে ভরা। এই অসংখ্য-দ্রব্য-পূর্ণ হাটের বিশালতা ভাবিয়া দেখিতে গেলে মন স্তম্ভিত হইয়া যায়, অন্তঃকরণ আনন্দমাখা-গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া উঠে। এই অসীম অনন্ত হাটের অসংখ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্য অসীম অনন্ত

অপূর্ব্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে। অভ্রভেদী অসীমকায় হিমাচলও যেমন অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে, ক্ষুদ্রতম বালুকাকণাও তেমনি অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে। কথাটা কি কিছু অসঙ্গত বোধ হইল? তবে বুঝাই শুন। অসীমকায় হিমাচলে জগদীশ্বরের অসীম শক্তি দেখিতে পাও বলিয়া হিমাচল দেখিলে অন্তঃকরণে এত সুখ উছলিয়া উঠে। কিন্তু বিন্দু-বৎ বালির কণাতেও কি জগদীশ্বরের অসীমশক্তি দেখিতে পাও না? তবে কেন হিমাচল দেখিলে অন্তঃকরণেও যেমন সুখ উছলিয়া উঠে, বালির কণাটি দেখিলেও অন্তঃকরণে তেমনি সুখ উছলিয়া উঠে না? তবেই ত বলিতে হয় যে অসীমকায় হিমাচলকে যে চক্ষে দেখ, বিন্দুবৎ বালির কণা-টিকে সে চক্ষে দেখ না। অতএব এ কথা ঠিক যে, যে চক্ষে হিমাচল দেখ, সেই চক্ষে বালির কণা দেখিলে হিমাচল হইতে যত সুখ পাও বালির কণা হইতেও তত সুখ পাইবে। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে জগতে যাহা কিছু আছে সকলই অসীম, সসীম কিছুই নাই। অনন্ত বিশ্বমণ্ডলও যেমন অসীম, বিন্দুবৎ বালির কণাটিও তেমনি অসীম। বালির কণাটিকে যে ক্ষুদ্র বা সসীম বল, সে কেবল চর্ম্মচক্ষের ভাষায় বল, মনশ্চক্ষের ভাষায় সেও অসীম। রবীন্দ্র বাবু তাঁহার আলোচনা নামক গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে বিশ্বের প্রত্যেক বিন্দু প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্ত্তমান। কথাটা বড়ই ঠিক—কিন্তু আরও একটু বাড়াইয়া লওয়া যায়। বিশ্বের প্রত্যেক বিন্দুতে বা প্রত্যেক বালির কণাতে শুধু বিশ্ব বর্ত্তমান নয়, স্বয়ং বিশ্বনাথ বর্ত্তমান। অতএব চর্ম্মচক্ষের মোহ এবং দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া মনশ্চক্ষে দেখিলে জগতের কোন পদার্থকে সসীম বলিয়া দেখিবে না, জগতের সকল পদার্থকেই অসীম বলিয়া দেখিবে. জগতে সীমা বলিয়া একটা জিনিসই দেখিতে পাইবে না। তখন ক্ষুদ্রতম বিন্দুবৎ বালির কণাতে ও অসীমত্ব দেখিবে এবং অসীমত্বে মজিলে যে অসীম সুখ ও অসীম আনন্দ হয়, ক্ষুদ্রতম বালির কণা দেখিলেও সেই অসীম সুখ ও অসীম আনন্দে মজিবে। তাই বলিতেছি যে এই অসীম অনন্ত হাটের অসংখ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্য অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিক্রয় করি-তেছে। এ হাটে সুখের সামগ্রী খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না, চক্ষু মেলিলেই অসংখ্য সুখের সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। যেটিকে ইচ্ছা লও, সেইটিকে লইয়াই অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ পাইবে। আর, সকল গুলিকে লইতে

ইচ্ছা হয়, সকল গুলিকেই লও, অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ পাইবে। আবার এই অসীম অনন্ত সুখের হাটে যে অসংখ্য দ্রব্য সুখ বিক্রয় করিতে বসিয়াছে, তাহারা সুখের বিনিময়ে তোমার কাছে আর কোন মূল্য চায় না, কেবল ঈশ্বরে তন্ময়ত্ব চায়। সেই তন্ময়ত্ব লাভ কর. ঈশ্বরের এই অসীম অনন্ত সুখের হাটে যে অসংখ্য দ্রব্য সুখ বিক্রয় করিতে বসিয়াছে তাহারা সকলেই তোমাকে অকাতরে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিনামূল্যে অসীম মাত্রায় বিক্রয় করিবে। জগৎ কাহাকে বলে, জগদীশ্বর কাহাকে বলে, সুখ কাহাকে বলে মানুষ বুঝে না বলিয়া এই অসীম অনন্ত সুখের হাটের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া 'জগতে সুখ নাই' 'জগতে সুখ নাই' বলিয়া সে চিরকাল কাঁদিতেছে এবং অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে!

জগতে যত দ্রব্য আছে সকলেই অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ দান করে, এ কথাটা ঠিক্ কি না একটু ভাল করিয়া দেখা যাক্. যাঁহারা ইংরাজি সাহিত্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে একটা গোলাপ ফুল দেখিলে যে আনন্দ যে সুখ হয়, একটা আকন্দ ফুল দেখিলেও কি সেই আনন্দ সেই সুখ হইতে পারে? একটা পর্ব্বত দেখিলে যে আনন্দ যে সুখ হয় একটা মাটির ঢিবি দেখিলে কি সেই আনন্দ সেই সুখ হইতে পারে? গোলাপ ফুল সুন্দর, পাহাড় সুন্দর, অতএব পাহাড় ও গোলাপ ফুল দেখিলে সুখ হয়; আকন্দ ফুলও সুন্দর নয়, মাটির ঢিপিও সুন্দর নয়, তবে কেমন করিয়া আকন্দ ফুল বা মাটির ঢিবি দেখিলে সুখ হইবে? Beauty বা সৌন্দর্য্য বলিয়া একটা জিনিস আছে। সেটা কিন্তু পৃথিবীর সকল পদার্থে নাই। যে পদার্থে তাহা আছে মানুষ সেই পদার্থ হইতে সুখ ও আনন্দ লাভ করে; যে পদার্থে তাহা নাই, মানুষ সে পদার্থ হইতে সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে না। ইউরোপীয় সাহিত্যের যে ভাগকে æsthetic বা fine-art বলে, সেই ভাগে এই সকল কথা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইউরোপীয় সাহিত্যের সেই ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য বলিতে পারেন যে সকল পদার্থ যখন সুন্দর নয়, তখন সকল পদার্থই যে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ দান করিতে পারে, এ রকম কথা বলা অন্যায় ও অসঙ্গত। কিন্তু একথার একটি উত্তর আছে। জগতে যে সকল পদার্থ আছে, সেই সকল পদার্থকে যদি কেবল চর্ম্মচক্ষু দিয়া দেখ তবে তাহাদের অনেককে সুন্দর এবং অনেককে অ-সুন্দর বা কুৎসিত বলিয়া বোধ হইবে।

চর্ম্মচক্ষে একটা গোলাপ ফুল বা একটা পর্ব্বত যেমন সুন্দর, একটা মাটির ঢিবি বা একটা আকন্দ ফুল তেমন সুন্দর নয়। অতএব পর্ব্বত বা গোলাপ ফুল দেখিলে যেমন সুখ হইবে, মাটির ঢিবি বা আকন্দ ফুল দেখিলে তেমন সুখ হইবে না। কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখিলে গোলাপ ফুলও যেমন সুন্দর, আকন্দ ফুলও তেমনি সুন্দর দেখিবে। চর্ম্মচক্ষে আকার অবয়ব বর্ণ প্রভৃতি দেখা যায়। আকার অবয়ব বর্ণ প্রভৃতির কমবেশী ভালমন্দ ইতরবিশেষ আছে। অতএব যে সকল জিনিস চর্ম্মচক্ষে দেখ, তাহা সমান সুন্দর এবং সমান প্রীতিকর না হইতে পারে এবং প্রকৃত পক্ষে হয়ও না। কিন্তু সকল পদার্থের মধ্যে যে ব্রহ্ম-শক্তি বা ব্রহ্ম-পদার্থ মানসচক্ষে দেখ, তাহার আর কমবেশী ভালমন্দ ইতরবিশেষ নাই, তাহার পরিমাণও অসীম, সৌন্দর্য্যও অসীম। অভ্রভেদী অনন্তকায় হিমাচলস্থিত ব্রহ্ম পদার্থও যেমন অসীম ও সুন্দর, বিন্দুবৎ বালুকা-কণাস্থিত ব্রহ্ম পদার্থও তেমনি অসীম ও সুন্দর। কোকিলের কলকণ্ঠস্থিত ব্রহ্মপদার্থও যেমন অসীম ও সুন্দর, কাকের কর্কশ কণ্ঠস্থিত ব্রহ্মপদার্থও তেমনি অসীম ও সুন্দর। নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জলস্থিত ব্রহ্মপদার্থও যেমন অসীম ও সুন্দর, পঙ্কিল পল্বলের জলস্থিত ব্রহ্মপদার্থও তেমনি অসীম ও সুন্দর। অতএব মনশ্চক্ষে দেখিলে জগতে যত পদার্থ আছে সবই সমান সুন্দর। এবং মনশ্চক্ষে দেখিলেই এই অসংখ্য পদার্থ-পূর্ণ অসীম অনন্ত জগৎ একটি অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্যের মেলা। উপরে যে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখের হাটের কথা বলিয়াছি, সে এই অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মেলারই নাম। এই অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব জগৎ, অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মেলা বলিয়াই অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখের হাট হইয়াছে। এমন হাটে আসিয়া আবার সুখ খুঁজিতে হয়, না সুখের জন্য কাঁদিতে হয়!

তবে চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখা যায় তাহা কি কিছুই নয়? কিছু নয় এমন কথা বলি না। তাহাও খুব ভাল জিনিস এবং তাহা দেখিলেও খুব সুখ হয়। কেনই বা না হইবে? তাহাতেও ত সেই অসীম অনন্ত সুন্দর ব্রহ্মপদার্থ রহিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা আছে। চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখা যায়, সে সৌন্দর্য্য যদি তোমাকে আর কোন রকম সৌন্দর্য্য না দেখিতে দেয়, তবে সে সৌন্দর্য্যকে সৌন্দর্য্য বলিয়া গণনা না করাই ভাল, সে সৌন্দর্য্য না দেখাই উচিত। চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া

যায়, সেই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যে পদার্থে সে সৌন্দর্য্য নাই সে পদার্থে যে ব্যক্তি কোন রকম সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, তাহাকে যত বড় কবি বা সুরুচি সম্পন্ন মানুষ বল না কেন, সে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষ নয়। তাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় নাই বলিলেই হয়। যে সৌন্দর্য্য চর্ম্মচক্ষে দেখা যায়, আমার বোধ হয় যে ইউরোপীয় সাহিত্যের æsthetic ভাগ মানুষকে সেই সৌন্দর্য্যের কিছু বেশী পক্ষপাতী করিয়া তুলে। এবং সেই জন্য ইউরোপীয়েরা পদার্থকে সুন্দর এবং অসুন্দর বলিয়া যত পৃথক্ করিয়া থাকে, এদেশের লোক তত করে না, এবং ইউরোপীয় সাহিত্যেও সুন্দর অসুন্দর বলিয়া পদার্থের যত প্রভেদ এবং সুরুচি কুরুচি লইয়া যত গণ্ডগোল দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু সাহিত্যে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সংস্কৃত কাব্যে সে সৌন্দর্য্যের অপরিমিত সমাবেশ আছে। কিন্তু যে পদার্থে তাহা নাই, সে পদার্থের প্রতি ইউরোপীয় সাহিত্যে যেরূপ ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং সংস্কৃত ও ইউরোপীয় সাহিত্য কিছু বেশী অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বাহ্য জগৎ এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু বেশী মনের দিক্ দিয়া বর্ণিত এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে কিছু বেশী চর্ম্মচক্ষের দিক্ দিয়া বা বাহ্যেন্দ্রিয়ের দিক্ দিয়া বর্ণিত হয়। ইউরোপীয় কবি সূর্য্যাস্তের শোভা কেবল চোক্ দিয়া দেখিতে বলেন; হিন্দু কবি ম্রিয়মাণ কমলিনীর জন্য এবং বিচ্ছেদগ্রস্ত চক্রবাক চক্রবাকীর জন্য না কাঁদিয়া শুধু চর্ম্মচক্ষে সূর্য্যাস্ত দেখিতে বলেন না। রং শুধু রং বলিয়া আকার শুধু আকার বলিয়া, অবয়ব শুধু অবয়ব বলিয়া, রূপ শুধু রূপ বলিয়া, লাবণ্য শুধু লাবণ্য বলিয়া,ইউরোপীয় সাহিত্যে যত প্রশংসিত সংস্কৃত সাহিত্যে তত প্রশংসিত হয় না। হিন্দু সকল পদার্থে ব্রহ্মপদার্থ দেখেন বলিয়া তাঁহার সাহিত্যে সুন্দর অসুন্দর বলিয়া পদার্থের প্রভেদ নাই এবং চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, সে সৌন্দর্য্যের একাধিপত্যও নাই। ইউরোপবাসী জগৎ হইতে জগদীশ্বরকে পৃথক দেখেন বলিয়া তাঁহার সাহিত্যে সুন্দর অসুন্দর বলিয়া পদার্থের এত প্রভেদ এবং চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার এত আধিপত্য। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সংস্কারের

প্রভেদ বশত নানা বিষয়ে কত গভীরতর গুরুতর প্রভেদ ঘটিয়া পড়ে এখন বুঝিতে পারিবে।

তাই বলি যে, যে শাস্ত্র মানুষকে বাহ্য সৌন্দর্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী করে, সে শাস্ত্র বড়ই অনিষ্টকর, সে শাস্ত্র অতি সাবধানে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। বাহ্য সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হইলে তোমাকে সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে, কেন না সকল পদার্থের বাহ্য সৌন্দর্য্য নাই। অতএব যে শাস্ত্র তোমাকে বাহ্য সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী করে, সে শাস্ত্র তোমার সুখের ভাণ্ডার কম করিয়া দেয়, এবং সুখের ভাণ্ডার কম করিয়া তোমাকে অস্থির এবং অসুখী করে। সে শাস্ত্রের ভক্ত হইলে এই যে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মেলা ইহাও ভাঙ্গিয়া যাইবে, এই যে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখের হাট ইহাও ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আর তুমি জীব-প্রধান মানুষ, তুমি কি কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের গুণে জীব-প্রধান? তোমার মন, তোমার জ্ঞান, তোমার হৃদয় লইয়াই কি তুমি জীব মধ্যে প্রধান নও? তবে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা জগৎ দেখিলে জীব মধ্যে তোমার প্রাধান্যই বা কেমন করিয়া হয়, আর তোমার জগৎ-দেখা কার্য্যটা মানুষের জগৎ-দেখা কার্য্যই বা কেমন করিয়া হয়? চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখা যায় সে সৌন্দর্য্যেও ব্রহ্মপদার্থ আছে, অতএব সে সৌন্দর্য্যও দেখ, সে সৌন্দর্য্যও ভালবাস। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া মনশ্চক্ষু এবং হৃদয় দিয়া যে বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্য দেখা যায়, সে সৌন্দর্য্য দেখিতে যদি না পাও, তবে জানিও যে মানবোচিত উৎকৃষ্ট প্রকৃতিও তুমি পাও নাই এবং উৎকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষের জন্য যে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখের হাট এবং সৌন্দর্য্যের মেলা খোলা রহিয়াছে সে হাটে এবং মেলায় প্রবেশ করিবার অধিকারও তোমার হয় নাই। হিন্দু ঋষিরা উৎকৃষ্ট প্রকৃতি সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া জগৎকে প্রধানত মানসচক্ষে দেখিতেন, এবং মানসচক্ষে দেখিয়া জগৎকে সুখময় দেখিতেন, জগতে সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেন না। ইউরোপের মহাপুরুষেরা খুব মহৎ হইয়াও মানব প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ লাভ করেন নাই বলিয়া জগৎকে প্রধানত মানস চক্ষে না দেখিয়া চর্ম্মচক্ষে দেখেন, এবং সেইজন্য জগৎকে সুন্দর, অসুন্দর, সুখময়, দুঃখময়, দুইভাগে বিভক্ত করিয়া জগতে সুখ ও সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বেড়ান, এবং সুখের অনুসন্ধানে সদাই অস্থির ও অসুখী হইয়া থাকেন। ইউরোপে মানবের আধ্যাত্মিকতা

কিছু নিকৃষ্ট বলিয়া তথায় æsthetic বিদ্যার এত প্রাধান্য; ভারতে মানবের আধ্যাত্মিকতা বড়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া তথায় æsthetic বিদ্যা নাই বলিলেই হয় এবং æsthetic বিদ্যা পরমার্থ বিদ্যায় এক রকম লয় হইয়া গিয়াছে। আজি-কার দিনে আমরা æsthetic বিদ্যাকে পরমার্থ বিদ্যায় তত লয় করিয়া দিতে পারিব কি না, ঠিক বলিতে পারি না, এবং ততটা লয় করিয়া দেওয়াও আব-শ্যক কি না ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু æsthetic বিদ্যাকে পরমার্থ বিদ্যা হইতে পৃথক করি আর নাই করি, উহাকে পরমার্থ বিদ্যার সম্পূর্ণ অধীন না করিলে আমরা মানব প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারিব না এবং এমন যে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখের হাট এবং সৌন্দর্য্যের মেলা খোলা রহিয়াছে ইহাতেও প্রবেশ করিতে পারিব না। সুখ খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরিব, অসুখেই কাল কাটিবে!

মহামায়া।

নবম পরিচ্ছেদ।

পিতা পুত্রী।

প্রভাত হইয়াছে,—মহামায়া একাকিনী তাহার চিরপ্রিয় কুসুম কাননে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মনে মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া এই গানটি গাহিতে-ছিলেন,—

"হরি বলে যানা চলে স্ববাসে;
যেথা শোক তাপ নাই রে কার
সবে সুখ-নীরে ভাসে।
যেথা ঘনঘটা নাই আকাশে,
শত শশী প্রকাশে।

দুঃখ-তিমির নাইক সেথা—
সুখ-রবি বিকাশে।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,
হরি বল রে—
হরি বলে যাবি চলে'
সেখানেতে অনা'সে।

এমত সময়ে স্বামী আসিলেন, মহামায়া ত্রস্ত ভাবে তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা—আমি আজ—ক-দিন কোথায় গিয়াছিলাম জান?"

মহা। না।

স্বামী। তোমার কার্য্যে।

মহা। আমার কার্য্যে!

স্বামী। হাঁ তোমারই কার্য্যে।—

তুমি কি অমূল্যকে ভাল বাসিয়াছ?—

মহামায়ার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, আকুল নয়নে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

স্বামী। মা, কাঁদিও না, ভাবে বোধ হয় তুমি তাহাকে ভাল বাসিয়াছ, সে দোষ তোমার নয়, আমার কপালের।

মহামায়ার হৃদয় আরও বিকলিত হইল, মনে হইল পিতা তাঁহার সম্বন্ধে কি ভীষণ কথাই না শুনাইবেন। কিন্তু স্বামী একটি কথাও না কহিয়া বিমর্ষ-ভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। মহামায়া উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তাঁহার সেই বিষণ্ণ বদন প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

স্বামী মহামায়ার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "মা, আমার একটি অনুরোধ রাখিবে?"

মহা। বলুন।

স্বামী। অমূল্যকে ভুলিতে পারিবে?

মহামায়া তাহার কোন উত্তর না দিয়া অধোবদনে রহিলেন।

স্বামী। যদি তাহা নিতান্তই না পার, তবে তাহার আশা জন্মের মত ত্যাগ করিতে হইবে।

মহামায়া সজল চক্ষে কহিলেন "এত সামান্য কথা।"

স্বামী—আহ্লাদে কহিলেন "কথা সামান্য নয়, তবে এ কথাটা আমার কন্যার উপযুক্ত কথা বটে।"

মহামায়া স্পন্দন-রহিত চক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

স্বামী—স্নেহভরে মহামায়াকে বক্ষে ধারণ করিলেন, মহামায়া সজোরে কাঁদিয়া স্বীয় হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ গুরুভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু স্বামীর চক্ষে বিন্দুমাত্রও জল দেখা দিল না। তিনি নানা প্রকার মধুর বাক্যে শোক সন্তাপিনী মহামায়াকে কতক পরিমাণে সান্ত্বনা করিয়া কক্ষ মধ্যে গমন করিলেন।

আহারাদির পর স্বামী কহিলেন "এখানে আর থাকা হইবে না।"

মহামায়া ভাবিতেছিলেন আজি অমূল্য আসিলে সকল কথা তাঁহাকে বলিবেন এবং তিনি কি বলেন তাহা শুনিবেন। কিন্তু স্বামী বলিলেন "তোমার কি কি লইবে লও।"

মহা। কেন?

স্বামী। যাইবে না?

মহা। আজই?

স্বামী। এখনই—

মহামায়া আর একটিও কথা না কহিয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। মহামায়া দেখিলেন দ্বারদেশে শিবিকা। তিনি তাহাতে আরোহণ—করিলেন। স্বামী শিবিকার অনুসরণ করিলেন। বাটীতে চাবি পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ।

এই নিরুদ্দেশ বার্ত্তা পাইয়া অমূল্যের মহা পীড়া হইল; এক সপ্তাহ পরে অমূল্যের জ্ঞানের সঞ্চার হইল,—চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার শয্যাপার্শ্বে প্রভাবতী ও মাতা দুর্গাবতী উপবিষ্টা। উভয়েরই নয়ন সজল। অমূল্যকে চক্ষু চাহিতে দেখিয়া দুর্গাবতী সজল চক্ষে বলিলেন "বাবা বাবা অমূল্য" তাঁহার আর কথা বাহির হইল না। চক্ষু সজল হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

অমূল্য আকুল ভাবে কহিলেন "কেন মা কি হয়েছে!"

দুর্গাবতী বসনাঞ্চলে স্বীয় বামচক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে কহিলেন "আজ সাত দিন তোমার চাঁদ মুখের কথা শুনিনি, বাবা আমাতে কি আর আমি ছিলাম।"

তখন অমূল্য বুঝিলেন যে তিনি অজ্ঞান অচৈতন্য ভাবে ছিলেন, মনে হইল "এতদিন মহামায়া কোথায় গিয়াছে তাহার স্থির কি, আর আমার মহামায়া দেখা হইল না।"

অমূল্যর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইল।

দুর্গা। কেন বাবা, ষাট।

অমূল্য পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, প্রভাবতীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন না। প্রভাবতী অনেক কষ্টে এ যাতনা সহ্য করিল,—চক্ষের জল সম্বরণ করিল।

এমত সময়ে সেই কক্ষ মধ্যে ইংরাজ ডাক্তারের সহিত সর্ব্বানন্দ প্রবেশ করিলেন, তিনি অমূল্যর জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন "কেমন আছ বাপ্?"

অমূল্য। ভাল আছি।

ডাক্তার সাহেব অনেকক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পরীক্ষার পর বলিলেন "আর কোন ভয় নাই।"

সর্ব্বা। দেখিবেন, ভাল করিয়া দেখিবেন, আর আমার কেহ নাই ওকে নিয়েই আছি।

দুর্গাবতী অন্তরাল হইতে কাঁদিলেন, প্রভাবও চক্ষে জল আসিল।

এমত সময়ে প্রভাবতীর পিতামহী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "সাহেব, তুমি আমার অমূল্যকে ভাল করে দাও, আমি তোমায় হাজার টাকা সন্দেশ খেতে দেব, আহা, আমার প্রভার আর শরীর নেই।"

বৃদ্ধা চক্ষের জল মুছিলেন।

ডাক্তার সাহেব এই কয় দিনে সকল বিষয়ই শুনিয়া ছিলেন, তিনি প্রভাবতীর দিকে ফিরিয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন "Ah! she has suffered much—poor little creature!"

কথাটি অমূল্যের কাণে গেল, তিনি আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

ডাক্তার অমূল্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোন কষ্ট হইতেছে কি ?"

অমূল্য। না. কিন্তু আমি কবে বেড়াইতে পারিব বলিতে পারেন ?

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন "এখনি। আবও ১০।১৫ দিন থাক।

অমূল্যর বদন বিবর্ণ হইল, মনে করিলেন, হয়ত পীড়িতাবস্থায় তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন ; আবার সে চিন্তা দূর করিয়া বিমর্ষ ভাবে অস্ফুট স্বরে বলিলেন "১০।১৫ দিন ?

ডাক্তার। হাঁ।

ডাক্তার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। অমূল্যর পীড়া দিন দিন ক্রমে ক্রমে সারিতে লাগিল, সর্ব্বানন্দ দুর্গাবতীর আনন্দের পরিসীমা নাই, তাঁহারা ঈশ্বরকে তাহার জন্য শত ধন্যবাদ দিলেন। প্রভাবতীর বড় আনন্দ, তাহার মুখে আবার হাসি দেখা দিল, সে হাসি দেখিয়া তাঁহার পিতামাতার প্রাণ জুড়াইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অমূল্য ও প্রভাবতী।

অমূল্য এখন বেশ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বড় দুর্ব্বল,— সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি দ্বিতলের ছাদে একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন. এমত সময় তথায় সহসা প্রভাবতী উপস্থিত হইলেন। প্রভাবতীর আর এখন কোন পীড়া নাই—তাঁহার শরীর বেশ সবল হইয়াছে—সেই মনোহর বর্ণ বসন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, বদনের মনোহর ভাব চক্ষু নাসা কর্ণ ওষ্ঠ প্রভৃতির অতুল শোভায় সুশোভিত, তাহাতে আবার মধুর যৌবনের আবির্ভাব।

অমূল্য এতদিনের পর স্বইচ্ছায় প্রভাবতীকে নিকটে ডাকিলেন। প্রভাবতী আসিলেন।

অমূল্য। প্রভা তোমার সহিত আমার গুটিকত কথা আছে।

প্রভা। কি কথা ?

অমূল্য। শোন, তুমি এখন বালিকা নও, আশা করি কথাগুলি ভাল করে শুনবে।

প্রভা। এতদিন একদিনের জন্যওত তুমি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কওনি, তোমার কি হয়েছে? আমার মাথা খাও, আমায় সব বল।

অমূল্য। তাই বলতেই তোমায় ডেকেছি।

প্রভা। এই! তা এর জন্যে এত কথা কেন?

অমূল্য। প্রভা তুমি আমায় ভালবাস?

প্রভা। আচ্ছা তুমি থেকে থেকে ওকথা জিজ্ঞাসা কর কেন?

অমূল্য। কেন করি—

অমূল্যর চক্ষে জল আসিল। প্রভাবতী বিস্মিত হইয়া কহিলেন "একি তুমি কাঁদ্‌ছ?

অমূল্য। না।

প্রভা। তোমার এক চোক জল, তবু বল্‌ছ কাঁদিনি!

অমূল্য। হাঁ আমি কাঁদ্‌ছি।

প্রভা। কেন?

অমূল্য। তোমার সে কথা শুনে কাজ নাই।

প্রভা। কেন কাজ নাই?

অমূল্য। শুনলে হয়ত তুমিও কাঁদবে?

প্রভা। হয়ত,—তবে কাঁদবো কি না তার ঠিক নেই। আমি বল্‌ছি আমি কাঁদবো না, তুমি বল।

অমূল্য। না প্রভা, তোমার মন মানবে না, তুমি না কেঁদে থাক্‌তে পারবে না।

প্রভাবতী অনেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "না ভাই, কথা শুনে আমার চোকে জল আসবে এমন কোন কথা আছে বলেত আমার স্মরণ হয় না।"

অমূল্য। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি বল্‌বে?

প্রভা। বল্‌ব।

অমূল্য। তুমি আমায় ভালবাস?

প্রভা। আবার ঐ কথা?

অমূল্য। আচ্ছা কেন ভালবাস?

প্রভা। কেন তা জানিনে।

অমূল্য। আমায় বিয়ে করবে ?

প্রভা অধোবদন হইলেন, কোন কথা কহিলেন না।

অমূল্য। আমি যদি তোমায় ভাল না বাসি তা হলেও কি আমায় ভালবাস ?

প্রভা। আমার যদি দাদা থাকতেন, আর তিনি যদি আমায় ভাল না বাসতেন, তা হলে কি তাঁকে আমি ভাল বাসতাম না।

অমূল্য। কথাটা কি সত্যি ?

প্রভা। তোমার প্রভা মিথ্যে জানে না।

অমূল্য। আচ্ছা আমি যদি আর কাকেও বিয়ে করি।

প্রভা। বেশত তা হলে আমরা দুজনে রোজ বিন্তি খেলি।

অমূল্য। আমি উপহাস করিনি।

প্রভা গম্ভীর ভাবে বলিবেন "তুমি ত আমার উপহাসের পাত্র নও।"

অমূল্য। তবে শোন প্রভা, আমি আর একজনকে বিবাহ করতে স্থির করেছি।

প্রভা। কাকে ?

অমূল্য। যদি ঈশ্বর দিন দেন তবে শুনবে।

প্রভা। আমায় বল্‌বে না ?

অমূল্য। তুমি যদি শুনতে পার, তা হলে কেন বলব না।

প্রভা। কেন, শুনলে কি আমার হিংসে হবে ?

অমূল্য। কষ্টওত হতে পারে।

প্রভা। তুমিত জান যে আমি তোমায় ভালবাসি।

অমূল্য। সেটা ভুলে যাও।

প্রভা। ছি তোমার এমন মন!

অমূল্য। কেন ?

প্রভা। আমি তোমায় কি বললাম, তুমি কি বুঝলে ?

অমূল্য। কি বল্‌লে ?

প্রভা। যে যাকে ভালবাসে সে তার ভাল দেখে যদি সুখী না হতে পারে, তবে আর সে ভালবাসা কি ?

অমূল্য বিস্মিত হইয়া প্রভাবতীর ঈষৎ রক্তাভ বদন প্রতি তাকাইলেন।

প্রভাবতী বলিলেন, "এ কথা বাবা জানেন ?",

অমূল্য। না।

প্রভা। মা?

অমূল্য। না।

প্রভা। আমি বল্‌বো?

অমূল্য। বলো।

প্রভা। কবে বিবাহের দিন স্থির করেছ?

অমূল্য। বিবাহ হবে কি না জানিনে। যদি হয়, তা হলে সবই শুনবে, নইলে আর কাকেও বিবাহ কর্‌বো না?

প্রভ। তবে কি তাকে পাবার আশা কম?

অমূন্য। বড় কম।

প্রভা! তবে এখন একথা যেন কেউ শোনেন না, বিশেষত বাবা।

অমূল্য। কেন প্রভা।

প্রভা। আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হলে, পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন এটা তাঁর বড় আশা। দেনায় তাঁর মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।

অমূল্য। মিছে আশায় থেকে ফল?

প্রভা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "মিছে সত্তি তুমি কিসে জান্‌লে?"

অমূল্যর বদন গম্ভীর হইল, বলিলেন, "প্রভা আমিত পূর্ব্বেই বলেছি যে, তার সঙ্গে বিয়ে না হলে আর কাকেও বিয়ে করবো না।"

প্রভা। তুমি কি মনে করেছ যে, আমি সেই আশায় বুক বেঁধেছি? ছি তা মনে কোরো না,—তুমি যে আমার দাদা হও, তোমায় আমায় আর বিবাহ হওয়া অসম্ভব।

অমূল্য। এই ভাব থাক্‌বে?

প্রভা। চিরকাল।

অমূল্য বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে প্রভার বদন প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন চক্ষের ভাব ঠিক পূর্ব্ব মত, বিন্দুমাত্র বিকৃত হয় নাই। ভাবিলেন—প্রভাবতী দেবী।

——oo——

গগন পটো।

গগন পটোকে তোমরা সবাই দেখেছ; পথে ঘাটে দাঁড়াইয়া কতবারই দেখিয়া থাকিবে; কিন্তু তোমরা সকলে তাহার গুণাগুণ জান না, তাই আমাদিগকে আজি তোমাদের কাছে, সেই পরিচিতের পরিচয় দিতে হইতেছে।

কারিগর লোক প্রায়ই একটু খাম্‌খেয়ালি হয়; কেহ—বদ্‌-মেজাজের উপর খাম্‌খেয়ালি; আর কেহ বা—রস্‌ক্ষেপার উপর খামখেয়ালি। কিন্তু গগন পটোর মত খাম্‌খেয়ালি রস্‌-ক্ষেপা লোক আর দুনিয়ায় নাই। অভাগার বেটা যদি কখনও কাহারও ফর্‌মাস্‌ মত চিত্র করিল! আপনার মনে আপনার ঝোঁকে নিয়তই আঁকিতেছে, আর পুঁছিতেছে; কিন্তু যখন যেটা দাঁড় করাবে, সেটা একেবারে চূড়ান্ত। যেমন রঙ, তার তেমনি শেড, যেমন ভাব ভঙ্গি, তেমনি অঙ্গ সোষ্ঠব; তাহাতেই বলিতেছিলাম, যে, গগন পটো, খামখেয়ালি বটে, কিন্তু মস্ত কারিগর।

তবে গগনের অনেক সময়, সময় অসময় বোধ নাই। প্রথম আলাপে সেই জন্য গগনের উপর বড়ই বিরক্ত হইতে হয়। কিন্তু তাহার পর ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝা যায়, যে, লোকটা অসাময়িক হইলেও বদ্‌রসিক নহে; রস্‌ক্ষেপা বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে লুকান ছাপান সহৃদয়তা বিলক্ষণ আছে। তবে সহিষ্ণুতা না থাকিলে, ঘনিষ্ঠতা না হইলে, তাহার সেই ভাবটুকু কিন্তু বুঝে উঠা ভার।

তুমি স্বজনের সদ্য নাশে শোকে জরজর; সংসার আঁধার দেখিতেছ, থাকিয়া থাকিয়া তলদেশে—মেদিনী ঘুরিতেছে;—বাতাসে হু হু করিয়া সেই স্বজনের নাম ধ্বনিত হইতেছে; বুকের ভিতর বামদিকে কে যেন কীলক পুঁতিয়া দিয়াছে। ঘোরতর বিষাদে তুমি অবসন্ন হইয়াছ। আকুলস্বরা, কুল-কুল-নাদিনী কল্লোলিনীর তীরে তুমি অবসাদে উপবিষ্ট হইয়া আছ। দূরে গগন পটোর চিত্রপটে তোমার দৃষ্টি পড়িল। সে যেন তোমাকেই ভুলাবে বলিয়া রঙ্‌ ফলাইয়া বসিয়াছিল; তুমি চাহিবা মাত্রই অমনই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার পটে আঁকিতে বসিয়া গেল। শোক-গম্ভীর হৃদয় সহজেই এক-মনস্ক হয়; তুমি এক মনে সেই অপূর্ব্ব চিত্রণ দেখিতে লাগিলে। তোমার সেই স্বজনের সৌম্যমূর্ত্তিই বা আঁকিবে! তাও নয়!! জীবন-

দংষ্ট্র একটা বিষম ব্যাঘ্র কাহাকে যেন কামড়াইয়া রহিয়াছে। তোমার বোধ হইল, সেই ব্যাঘ্র দষ্ট ব্যক্তিই যেন তোমার স্বজন। তোমার বুকের শেল কে যেন নাড়িয়া দিল; তোমার মর্ম্মজ্বালা হইল; গগন চিত্রকরকে মহা নিষ্ঠুর স্থির করিয়া মহা বিরক্ত হইলে; তুমি মুখ ফিরাইবে, এমন সময় চকিতের মধ্যে দেখিলে, যে চিত্রপটে আর সে ভয়ানক ব্যাঘ্র নাই, তোমার সেই ভূপাতিত বন্ধু সৌম্যমূর্ত্তিতে গগনের পট শোভা করিতেছেন, আর একখানি সুন্দর হস্ত, যেন তাহাকে আস্তে আস্তে কোথায় মন্দ মন্দ লইয়া যাইতেছে। তোমার প্রাণ যেন একটু শীতল হইল; তুমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে। ভাবিলে গগন পটো ক্ষেপা হোক, আর যাই হোক, মনের কথা বুঝিতে পারে; পোড়ামন একটু শীতল করিতে পারে। মনে যদি একবার ধারণা হয়, যে, লোকটা সহৃদয় এবং তোমার ব্যথার ব্যথী,— তাহা হইলেই তাহাকে ভাল বাসিতে হয়। যার হৃদয় যখন শোকে তাপে গম্ভীর, তখন সেই ভালবাসাও একদিনে,—এক মুহূর্ত্তে—প্রগাঢ় হইয়া পড়ে। তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিলে, যে, গগন তোমার ব্যথার ব্যথী, অমনই যেন তাহার উপর তোমার একটু ভাল বাসা জন্মিল। তুমি, নদী তীরস্থ শষ্প-শয্যায় শায়িত হইয়া, একমনে, স্থির নয়নে, গগনের খাম-খেয়ালির কারিগরি পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলে। গগন আঁকিল—একটা বৃহৎ কুম্ভীর; সচল মুখ, কর্কশগাত্র, কণ্টকিত লাঙ্গুল, কপিশবর্ণ, ভয়ঙ্কর ভঙ্গি—সব ঠিক্ ঠাক্ হুবহু; যেন অগাধ নীল জলে সাঁতার দিতেছে। হঠাৎ কুম্ভীর দিখণ্ডীকৃত হইল; গায়ের কাঁটাগুলি, তুলার মত ফুলো ফুলো হইল; মুখ কোণ সংযত হইল; রঙটা কেমন একটু ঘোলা ঘোলা হইল। পরক্ষণেই দেখ দুইটি নিরীহ মেষ পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি সেই নীল প্রান্তরে শনৈঃ শনৈঃ বিচরণ করিতেছে। তুমি ভাবিতেছ, ভয়ঙ্কর কুম্ভীর যমজ মেষ শিশু হইল; ভাবিতে না ভাবিতে, সে চিত্র নাই, সেই মেষদ্বয়ের স্থলে, বিচিত্র বর্ণের বৃহৎ এক সদণ্ড পতাকা। খর খর বাতাসে যেন ফর্-ফর্ করিয়া উড়িতেছে। স্বজন-বিয়োগ চিন্তা তোমার মন হইতে ক্ষণেকের তরে অন্তর্হিত হইল। বিষম রস্‌ক্ষেপা গগন তোমাকে আপনার পাগলামির কীর্ত্তি দেখাইয়া তোমাকে হাসাইল। তোমার সেই মলিন ম্লানমুখের অধর প্রান্তে সেই অন্তরের হাসি ঈষৎ দেখা দিল। তুমি অন্তরে বলিলে, পাগলা পটোর ভিতরের কথাটা ঠিক্; সংসারের সকলই এই-

রূপ পরিবর্ত্তনশীল, তা ঐ কেবল স্থাবর চিত্র আঁকিবে কেন? এই চিন্তায় তুমি অন্যমনস্ক হইয়াছিলে,—দেখিলে সে বিচিত্র নিশান আর নাই; মৃদু আভায়, একটি স্থির চিতা যেন ধীরিধীরি জ্বলিতেছে। সেই চিতার মধ্যে অস্পষ্ট অবয়বে তোমার সেই স্বজনের শবমূর্ত্তি। শবদেহ, কিন্তু নিষ্প্রভ নহে। সূর্য্যাস্ত কালের পূর্ব্বদিকের পাতলা মেঘের উপর ক্ষীণ রামধনুর ন্যায়, একটু হাসি যেন সেই মুখ প্রান্তে দেখা দিতেছে। চক্ষুদ্বয়ের, প্রশান্ত, শীতল জ্যোতি গগনের চিত্রান্তরে যেন স্থাপিত রহিয়াছে। সে চিত্র গগনের আর এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। স্বর্ণ-বর্ণময়ী একটি দিব্যাঙ্গনা, সতী-স্বভাব-সুলভ লজ্জায়, অথচ প্রৌঢ় প্রোষিত ভর্ত্তৃকার স্বামী সমাগমের আগ্রহে এবং বনশোভিনী সদ্যঃকুসুমিতা বসন্ত লতার প্রফুল্লতা ভরে, সেই চিতার সজীব, সহাস্য শবদেহটিকে সুকোমল হস্ত প্রসারণে আহ্বান করিতেছেন। সেই কাঞ্চনময়ী দিব্যমূর্ত্তিতে তুমি তোমার বন্ধুর মৃতা পত্নীর মুখশ্রী লক্ষ্য করিলে। সেইরূপ পুরু পুরু জোড়া ভুরু, যেন তেমনই করিয়াই নীচের দিকে নামান আছে; সেই স্থির নয়নে যেন তেমনই করিয়াই জ্যোৎস্না মাথান আছে। উপর স্তরে দিব্যাঙ্গনা ভাসিয়া ভাসিয়া নিম্নস্তরের চিতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নিম্নস্তরের চিতাও শবদেহ লইয়া দিব্যাঙ্গনার দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল; কাছাকাছি হইল, তোমার চক্ষে জল আসিল; চক্ষু মুছিয়া, চাহিয়া দেখিলে সে সব আর কিছু নাই; গগন পটো নীল পটের এখানে সেখানে কেবল কাঁচা সোণার স্তবক আটিতেছে, আর তাহাতে জরদ, ধূমল, পাংশুর কত বিচিত্র রঙের শেড্ দিতেছে। তুমি উঠিয়া বসিলে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে; এবার মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিলে—"গগন সকলকেই জানে, সকলকেই চেনে, আমরা কিন্তু উহাকে কেহই চিনিতে পারিলাম না, দেখ আমাদের সকল সংবাদই রাখে, আমরা কিন্তু উহার কিছুই জানি না।"

গগনের কার্য্য সাধন হইয়াছে। তাহার সহিত একবার ঘনিষ্ঠতা করিলেই সে তাহার অদ্ভুত পট দেখাইয়া তোমার কিছু না কিছু ভাল করিবেই। হয় তোমার মনের কবাট খুলিয়া দিবে; নয়, তোমার শোকের সান্ত্বনা করিবে। কখন হয়ত তোমার আনন্দের সম্বর্দ্ধন করিবে; আবার কখন হয়ত তোমাকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিবে। আজি সে তোমার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিয়াছে। তোমার মাথা হাল্‌কা হইয়াছে বটে

কিন্তু এখন আর ঘুরিতেছে না; বাতাস এখনও হু হু করিতেছে, এখনও পিলুবারোঁয়াতে ভরিয়া আছে, কিন্তু এখনত আর তোমার বন্ধুর নাম করিয়া কাঁদিতেছে না। বুকে এখনও শেল বিঁধিয়া আছে বটে, কিন্তু তেমন করিয়া আরত কেহ তাহাতে মোচড় দিতেছে না। গগনের কার্য্য সাধন হইয়াছে। গগন তোমার শোকবহ্নির প্রখরতা নষ্ট করিয়াছে। তুমি এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া দেখিলে—পশ্চিমের দিক্-চক্রবাল ব্যাপিয়া ঘন-সন্নিবেশিত শাল-বিটপাচ্ছাদিত পর্ব্বত-বেদীর উপরি জ্বলন্ত কাঞ্চন-রাগে এক অপূর্ব্ব প্রতিমা দীপ্তি পাইতেছে। গগন পটোর সেই এক প্রিয় প্রতিমা। মাস মাস ধরিয়া প্রত্যহই আঁকে, আর প্রত্যহই পুঁছিয়া ফেলে; তাহার বিরক্তিও নাই, তৃপ্তিও নাই।

ঐ প্রতিমা, একখানি আশ্চর্য্য ছবি। গগন পটো প্রায়ই প্রত্যহ আঁকে, আর আমরাও ত প্রায়ই প্রত্যহ দেখি; তবু নিত্যই নূতন। পুরাণের পুরাণ মহাপুরাণকে নূতন করিয়া দেখাইতে গগন পটো যেমন পটু, এমন আর দ্বিতীয় কেহ নাই। কিন্তু কেবল তাই বলিয়া যে পশ্চিমের প্রতিমা আশ্চর্য্য ছবি, তাহা নহে। ও এক আজগুবি কাণ্ড। মুখ নাই, অথচ দেখ কেমন হাসিতেছে; চোখ নাই, ভ্রূ নাই, তবু দেখ কেমন চোখ রাঙ্গাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া রহিয়াছে। আর আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য, ঐ মধুর হাসিতে আর ঐ ভীষণ ভ্রূকুটিতে, দেখ, দেখি, কেমন মাখামাখি! কেমন মেশামেশি! পৌরাণিকী অন্ধকারময়ী কালী মূর্ত্তিতে একবার প্রসন্নাং স্মিতাননাং করাল বদনাং দেখিয়াছ; আর একবার গগন পটোর ঐ জ্বলন্ত চিত্রে ললিতে ভৈরবে, —কোমলে ভীষণে—অপূর্ব্ব মিলন দেখ। ঐ দেখ কেমন অপূর্ব্ব হাসি! ঢল ঢল তপ্ত কাঞ্চন সাগরে যেন অমৃতের লহরী উঠিল। ঐ দেখ কেমন রাগ; ব্রহ্ম-কোপানলে যেন খাণ্ডব দাহ হইবে। ঐ দেখ নিঃশব্দ তবু যেন তোমাকে স্বর্গের বার্ত্তা ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিতেছে; চক্ষু নাই, তবু যেন তোমার মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। আর দেখ, নিশ্চল, সুস্থির, তথাপি যেন হাত তুলিয়া তোমাকে অভয়দান করিতেছে, আশীর্ব্বাদ করিতেছে। আইস আমরা প্রণত হই। সঙ্গে সঙ্গে মহাশিল্পী গগন চিত্রকরকে নমস্কার করি; এবং তাহার ওস্তাদকে একবার দেখাইবার জন্য তাহার কাছে প্রার্থনা করি।

গগন দাদা! তোমার ক্ষেপামিতে ক্ষান্ত দিয়া একবার আমাদের দুটিকত কথা শুন! গঙ্গার উপর তোমার প্রভাতচ্ছবি, পর্ব্বত পৃষ্ঠে তোমার

এই সন্ধ্যার প্রতিমা, প্রাবৃটের সেই ঘনকৃষ্ণ সিংহাসন, নিদাঘের সেই রৌদ্র মূর্ত্তি,—ওসকল কারিগরি—তোমার অনেকবার দেখিয়াছি। তোমার বিচিত্র পট দেখিয়া অনেক বার জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি, কিন্তু ঐ সকল বিচিত্র চিত্রে আত্মহারা হই বটে, অথচ পরমার্থ পাই না, তুষ্টি হইলেও তৃপ্তি হয় না। না দাদা, আর ক্ষেপামি করিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। তোমার এই সকল ছায়াময়ী প্রতিমার অন্তরস্থ প্রতিমা আমাকে সেই সে দিনের মত আর একবার দেখাও। তোমার এই বিষম ভেল্কি আর একবার ভাঙ্গিয়া দাও। এই ছায়া বাজীর ছায়া পট একবার ক্ষণ মুহূর্ত্ত জন্য সরাইয়া দাও; আমি আর একবার তোমার সেই নীল, নীল, অতি নীল বাজী ঘরের অভ্যন্তরস্থ তোমার ওস্তাদ্‌কে প্রাণ ভরিয়া দেখিব। সে দিন তুমি দেখাইলে বটে, কিন্তু আমি যে কি দেখিলাম, তাহার কিছুই বুঝিলাম না। কোমলের কোমল, অতি কোমল বংশীরবে আমার মোহ হইল; নীল মধ্যে অতিনীল দেখিতে ছিলাম; সমস্ত জগৎ নীল আভায় প্রতিভাত হইল, আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর তুমি তোমার ছায়া পটে তুলারাশি ছড়াইয়া হাসিতে লাগিলে। না দাদা! তোমার পায়ে পড়ি এবার আর ওসময়ে ক্ষেপামি করিও না। ভাল করিয়া তোমার ওস্তাদ্‌কে একবার দেখাও।

তপোবন। *

স্থান—হিমাচল শৃঙ্গে তপোবন।

সময়—হেমন্ত পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বকাল।

১

কি আলো ফুটিছে ওই শিখরের অন্তরালে
খুলিছে কি স্বর্গের দুয়ার!
দিক্‌ হ'তে দিগন্তরে গলিয়া পড়িছে যেন
অন্তরের হাসিটি কাহার!

---

* এই তপোবন হৃষিকেশ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে। বিগত সংখ্যার নবজীবনের ২৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।

জগতের ফুলরাশি মিশাইয়া হাসি যেন
ধীরে ধীরে খুলিতেছে প্রাণ!
কল্পনার বুকে যেন উথলি উঠিছে ধীরে
প্রণয়ের প্রথম তুফান!

(চন্দ্রোদয়)

কি মৃদু!—কি নিরমল! কত প্রাণে ঢল ঢল!
কি বিপুল আপনা প্রদান!
কি আশা!—কি ভালবাসা! কোথা আদি—কোথা অন্ত
কি অকূল!—কি অতল—প্রাণ;
এত রূপে—এত প্রাণ এত প্রেমে—এত দান!
এত ভরা প্রেমের বিকাশ!
এত খোলা!—এত ভোলা! এত পবিত্রতা ঢালা!
উল্লাসের এতই উচ্ছ্বাস!
নবীনে পূরন্ত হেন ঘুমন্ত বিজলি যেন
দেখে নাই কখন এ আঁখি।
সাধ যায় শশী তোরে এখনি এ বুক চিরে
প্রাণেতে জড়া'য়ে ধ'রে রাখি।
তপোবন! বুকে তব ফুটিয়া পড়েছে শান্তি
আশা যেন হ'য়েছে নির্ব্বাণ!
ছায়া যেন নাহি আর জীবনের পিপাসার
তৃপ্তিতে পড়িছে গলি প্রাণ।
গাহিছে অলকনন্দা† আনন্দ ঝঙ্কার তুলি
ঝঙ্কারে উথলি পড়ে হাসি।
এ মহা অচল পুরি প্রেমের উচ্ছ্বাসে যেন
গ'লে গ'লে পড়িছে বিকাশি!
এই প্রেম—এই প্রীতি এই তৃপ্তি—এই শান্তি!
জীবনের পিপাসা আমার!
ইহারি ভিখারি করি সৃজিলা বিধাতা মোরে
কিন্তু তৃপ্তি হয়নি আমার!

---

† এই স্থানে গঙ্গাকে "অলকনন্দা" কহে।

ইহারি কামনা করি অর্দ্ধেক জীবন ধরি
করিতেছি অবনী ভ্রমণ।
হেন মূর্ত্তি নিরমল গগনে ভূতলে জলে
দেখে নাই কখন নয়ন।
এস বুকে তপোবন! এস মুহূর্ত্তের তরে
তৃষ্ণায় অস্থির মম প্রাণ!
ভুলি জ্বালা নিরাশার ভুলি জ্বালা পিপাসার
শান্তি তব কর মোরে দান!

৩

মানবের কাছে নাই হেন শান্তি নিরমল
মোর মত তারাও অভাগা!
দেখিয়াছি একে একে খুলিয়া তাদের বুক।
নিরাশা কেবলি প্রাণে মাখা!
হাসে-খেলে-নাচে-গায় পিপাসা মেটে না তায়
সে শুধু মনেরে দেয় ফাঁকি!
আহা সেই বুকে বুকে প্রাণ যে রহে কি দুখে
হেরিলে সলিলে ভাসে আঁখি!
যাতনা জুড়াবে বলি প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি
দিবানিশি করে নারী নরে!
কত মোহ—কত মায়া কত স্নেহ—কত প্রেম
নিরন্তর বুকে টেনে ধরে।
তবু প্রাণ সেই একা সেই ব্যথা তায় মাখা
এ পিপাসা মেটে না তাহার!
কিবা রাজরাজেশ্বর! কিবা সে পণ্ডিতবর
এই দশা—প্রাণ আছে যার!
সে অভাগা মানবের অধম মানব আমি
সংসারে না জুড়াইল প্রাণ!
কৃপা করি তাপিতেরে মরুময় বুকে মম
তপোবন শান্তি কর দান

৪

না জানি হে ঋষিকুল! বিরাজিছ কত সুখে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিজন গুহায়!
কি কবিত্ব উছলিছে সে পবিত্র হৃদিতলে
ভাবিতে না পারি কল্পনায়!
এ নিশিতে এইখানে এই আকাশের তলে
সংসার হইতে এত দূরে!

এ দিগন্ত প্রধাবিত অনন্ত-শিখর মাঝে
এ বিজন পাষাণের পুরে !
কানন ছায়ায় ঢাকা আঁধার গুহায় পড়ি
ঔদাস্যের সুধা প্রাণে মাখি।
এ চন্দ্রিকা বিভাসিত হিমাদ্রি-জগৎ পানে
প্রাণের নয়ন দুটি রাখি।
ধরিয়া প্রেমের ধ্যান কি সুধা যে কর পান !
হায় রে সে কল্পনা এখন।
পারি যদি কোন কালে মুছিতে চিত্তের মলা
তখন করিব আকিঞ্চন !
আশার সে তুষানল নিবিয়া না নেবে বুকে
দহিছে সে আজো হৃদিতলে।
থাকিয়া থাকিয়া আজো অন্তরের অন্তরেতে
প্রাণের পিপাসা উঠে জ্বলে।

৫

দেহ শান্তি তপোবন ! দেহ শান্তি ঋষিগণ
এ পিপাসা করি নিবারণ।
হৃদয় ভরিয়া দেহ সংসারে ফিরিয়া গিয়া
চিরদিন করিব সেবন !
জীবনের আদি অন্ত হাসি কান্না জীবনের
জীবনের সর্ব্বস্ব আমার,
অঙ্কে অঙ্কে বিরাজিছে যেই সংসারের বুকে
সে সংসার নহে ত্যজিবার !
কত ইন্দিবর আঁখি হেরিয়াছি অশ্রুভরা
কুসুমিত কতই পরাণ—
বৃন্ত হ'তে পড়ি খ'সে শুকাইছে দিবানিশি
রাখিয়া এসেছি তাহে প্রাণ ?
কত তাপে কত পাপ কত পাপে—কত তাপ
প্রাণে মাখা রয়েছে এখন !
বিধবার অশ্রুধারা কাঙ্গালের দীর্ঘশ্বাস
ভুলিব না থাকিতে জীবন !
এই প্রীতি—সে সংসারে মরুভূমে—মন্দাকিনী
তপোবন ! কর প্রীতিদান !
মানব মণ্ডলী মেলি মিলিয়া প্রাণের হাটে
আনন্দে করিগে নিত্য পান।

ঈশান।

নবজীবন।

২য় ভাগ } মাঘ ১২৯২। { ৭ম সংখ্যা।

আর্য্যধর্ম্মের ভাবী রূপ।

প্রথম অধ্যায়—দূরদৃষ্টবাদের অপনয়ন।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্ম হানিঃ প্রজায়তে ॥

ইতি অঘোর নাথ ধৃত বৃহস্পতি বচন।

"কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া কোন বিষয় নির্ণয় করিবে না, যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়।"

বৃহস্পতির যেমন অলৌকিক ধীশক্তির খ্যাতি, এই বচন তাঁহার তেমনই উপযুক্ত। বিবেকশক্তি দ্বারা মনুষ্য পশু হইতে বিভিন্ন। অতএব যিনি যে পরিমাণে বিবেক বা যুক্তিমার্গ ত্যাগ করেন, তিনি সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট হন। শাক্য মুনির শিক্ষার প্রভাবে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে অনেকেই ভক্তিমার্গ একবারে ত্যাগ করিয়া যুক্তি-মার্গ-মাত্র অবলম্বন করিয়া নিরীশ্বর বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। এজন্য বৌদ্ধাধিকারের শেষ হইতে এতদ্দেশে জনসাধারণের যুক্তি মার্গের উপর বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। কিন্তু এই বিদ্বেষ অমূলক। স্ত্রীপুরুষের যাদৃশ সম্বন্ধ, ভক্তি ও যুক্তির তাদৃশ সম্বন্ধ। ইহাদের বিচ্ছেদ হইলে সুফল উৎপন্ন হইবে না। ইহাদিগকে সম্পৃক্ত রাখিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে।

আমাদের কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা ও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতি-পন্ন করিতে গিয়া, কয়েকটি যুক্তি দর্শাইয়াছেন; অর্থাৎ মুখে যুক্তি অকর্ম্মণ্য বলিয়া কার্য্যে তাহার কর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মহাসমুদ্র স্বরূপ। ইহাতে অনেক রত্ন আছে, এবং মনুষ্যের অনিষ্টকর বস্তুরও অভাব নাই। এই রত্নাকর হইতে রত্নোদ্ধার করিতে হইলে যুক্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

এতদ্দেশীয় ধর্ম্মার্থীর পক্ষে বাইবেল বা কোরাণের আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই। বিবেকশক্তি অপ্রতিহত রাখিয়া স্বদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে।

ব্যাস-সংহিতায় লিখিত আছে যে, যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়, তথায় বেদই প্রমাণ। আর স্মৃতি ও পুরাণে পরস্পরে বিরোধ হইলে—স্মৃতিই প্রমাণ (১)।

এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত, যে, সত্যের সহিত সত্যের কখনই বিরোধ হইতে পারে না। সত্যের সহিত অসত্যের নিত্য বিরোধ আছে এবং অসত্যের সহিত অসত্যেরও বিরোধ হইতে পারে। সুতরাং ব্যাসের বচনে বেদের অভ্রান্ততা এবং স্মৃতি ও পুরাণের আংশিক অসত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে।

বেদ সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত কি না, ইহার মীমাংসা করিবার অধিকার বাঙ্গালিদের এখনও হয় নাই। আমরা মুখে বেদের প্রাধান্য স্বীকার করি; কিন্তু বহুকাল আমাদের দেশে বেদানুশীলন নাই। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল নহে; বরং সম্প্রতি যে দুই চারি জন বাঙ্গালি বেদাধ্যয়ন করিতেছেন, তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। বেদ দূরে থাকুক, অনেক স্মার্ত্তের মনুসংহিতাতেই অধিকার নাই। বাঙ্গালার ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের পক্ষে রঘুনন্দন সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছেন। এখন "মোগল পাঠান হদ্দ হলো, পার্সি পড়ান তাঁতি"। যেখানে বেদচর্চ্চা একবারে লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়, সেখানে বৈদিক বচনের বিচারের সময় উপস্থিত হয় নাই। তবে এস্থলে এইমাত্র বলিব, যে, মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থ বেদের উল্লেখই নাই। মনু বলিয়াছেন, যে, ব্রহ্মা অগ্নি হইতে ঋক্, বায়ু হইতে যজুঃ, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন (২)।

---

(১) শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ বিদ্যাসাগর ধৃত ব্যাসবচন।

(২) অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃ সামলক্ষণং॥ মনু ১অ। ২৩

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭৬।৭৭ শ্লোকে লিখিত আছে, যে বেদত্রয় হইতে প্রণব ও গায়ত্রী উদ্ধৃত হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে লিখিত আছে, যে শিষ্য গুরুকুলে বাস করিয়া ১৮ বা ৩৬ বৎসর বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবেন। সপ্তম অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট আছে, যে ত্রিবেদীর নিকট বেদত্রয় পাঠ করিবে। শ্রুতির একটি নাম ত্রয়ী; ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে মনুর সময়ে অথর্ব্ববেদ শ্রুতি বলিয়া পরিগণিত ছিল না। এক্ষণে তাহা শ্রুতি বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে কি না, বেদপারগ পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিবেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, যিনি ধর্ম্মোপদেশক বলিয়া বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, মুখে মহর্ষি মনুকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যদ্বারা তিনি দেখাইতেছেন, যে, মনুর কোন কোন উপদেশ তিনি আদৌ গ্রাহ্য করেন না। মনুর মতে শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে উপদেষ্টার উপদিষ্টের সহিত অসংবৃত্ত নরকে বাস করিতে হইবে (১)। ইহা জানিয়াও তর্কচূড়ামণি মহাশয় শূদ্রাকীর্ণ সভায় ধর্ম্মোপদেশ দিতে-ছেন এবং শূদ্রের সম্পাদিত সংবাদ পত্রে শূদ্র ম্লেচ্ছাদি পাঠকদিগের হিতার্থ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। ইহাতে প্রতীত হইতেছে, যে, কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেই লোকে মনুর দোষ ধরে না। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিদ্বেষী তাঁহারাও সর্ব্বতোভাবে মনুকে অভ্রান্ত বলিয়া মানেন না। মনুর প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি আছে। তিনিই নিষ্কাম ধর্ম্মের আদি শিক্ষাগুরু (২)। মনু ও বেদব্যাসের ন্যায় মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে অত্যল্প জন্মিয়াছেন; কিন্তু মহাপুরুষ হইলেও তাঁহারা মানুষ। মানুষ মাত্রেই ভ্রমপ্রবণ। ঈশ্বর ব্যতীত কেহই অভ্রান্ত নাই। অতএব আমার সদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি যদি উক্ত মহাপুরুষদিগের ভ্রম দেখাইবার চেষ্টা করে, সদাশয় ব্যক্তিরা আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। যাহাতে চন্দ্রের

---

(১) ন শূদ্রায়মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতং।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥
যোহ্যস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতং।
সোহসংবৃতং নামতমং সহতেনৈব মজ্জতি॥

মনু ৪অ, ৮০।৮১।

(২) কামাত্মতা ন প্রশস্তা ইত্যাদি মনু ২অ ২।৩।৪।৫

সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই, সেও চন্দ্রকলঙ্ক দেখিতে পায় এবং তাহারও চন্দ্র-কলঙ্কের কথা বলিবার অধিকার আছে।

১—দুরদৃষ্টবাদ*। সাধারণ হিন্দুদের মত ও বিশ্বাসের বিষময়তম ভ্রম। কালে এই ভ্রম অপনীত হইবে।

সাধারণ হিন্দুদের বিশ্বাস এই যে, কলিযুগের প্রভাবে মনুষ্যগণ ধর্ম্মে, বুদ্ধিতে, বলে, এবং আয়ুতে উত্তরোত্তর অবনত হইতেছে এবং হইবে। যদি এইমত সত্য হয়, তবে আমাদের উন্নতির চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি আমরা যুগধর্ম্মে নিশ্চয়ই অধার্ম্মিক হইব তবে আমাদের পুরুষকার কোথায়? আর পুরুষকার না থাকিলে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম দুইটি অনর্থক শব্দমাত্র। এমত সত্য হইলে, তর্কচূড়ামণির ধর্ম্মোপদেশ, হরি-সভা ও ধর্ম্মসভা উপহাসের বস্তু মাত্র। যখন কলি আমাদিগকে নিশ্চয় ভবসাগরে নিমগ্ন করিবে, তখন আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া কেন চীৎকার করি? আমরা কি মনে করি, বক্তৃতার ভেলায় ভবসাগর পার হইতে পারিব? এমন অবস্থায় চার্ব্বাক হওয়াই ভাল। বস্তুত দুরদৃষ্টবাদ আমাদের মহা অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। যে সময়ে তেজ ও উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতে হইবে, সে সময়ে আমরা নিস্তেজ, নিশ্চেষ্ট, নিরুৎসাহ ও জড়বৎ হইয়া পড়ি; তাহার কারণ এই যে আমাদের নিজ শুভাদৃষ্টে আমাদের বিশ্বাস নাই। মনুর মতে (১) সত্যযুগে সকল ধর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ছিল। মনুষ্য মাত্রেই মিথ্যা কথা কহিত না। অধর্ম্মদ্বারা কেহ কিছু উপার্জ্জন করিত না। ক্রমশ ধর্ম্মহানি হইতে লাগিল। ত্রেতায় ত্রিপদ, দ্বাপরে দ্বিপদ ও কলিতে এক পদ মাত্র ধর্ম্ম রহিল। সত্যযুগে লোকে নীরোগ ও সর্ব্বসিদ্ধার্থ ছিল, এবং তাহাদের পরমায়ু চারিশত বৎসর ছিল।

---

* Pessimist Fatalism

(১) চতুষ্পাৎ সকলোধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতেযুগে।
নাধর্ম্মেনাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ত্ততে॥
ইতরেম্বাগমাদ্ধর্ম্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃত মায়াভির্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ॥
অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষ শতায়ুষঃ।
কৃতেত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ॥

মনু. ১ অ ৮১।৮২।৮৩।

ত্রেতায় পরমায়ু ৩০০ বৎসর, দ্বাপরে ২০০ বৎসর এবং কলিতে ১০০ বৎসর হইল।

মহাভারতে লিখিত আছে (১) যে কলিযুগে মনুষ্যগণ স্বল্পায়ু, স্বল্পবল, স্বল্পবীর্য্য, খর্ব্বদেহ ও মিথ্যাবাদী হইবে। ব্রাহ্মণ সর্ব্বভক্ষ্য ও অজপ হইবে, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ম্মহীন হইবে। ঐ যুগে শক যবনাদি অনেক মৃষানুশাসী, মিথ্যাবাদী ম্লেচ্ছরাজাদের অধিকার হইবে।

সমগ্র মহাভারত বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রায় সকল হিন্দুরই বিশ্বাস এই, যে, বনপর্ব্বে কলিযুগ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। পুনশ্চ বেদব্যাসের বাক্য প্রায় বেদবাক্য স্বরূপ আদৃত। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বচন সমূহ মহা অনিষ্টের কারণ হইয়াছে (২)।

যখন মুসলমানগণ ভারতাক্রমণ করিল, হিন্দুরাজারা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যুদ্ধ হতাশের যুদ্ধ। হিন্দুদের মনে হইল আমরা মানবের সহিত যুদ্ধ করিতেছি না—অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিতেছি। এযুদ্ধ দেশের জন্য নহে; কারণ বেদব্যাসের বাক্য বিফল হইবার নহে; ম্লেচ্ছাধিকার

---

(১) ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বভক্ষ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌযুগে।
অজপাব্রাহ্মণাস্তাত শূদ্রা জপ-পরায়ণাঃ॥
বহবো ম্লেচ্ছারাজানঃ পৃথিব্যাং মনুজাধিপ।
মৃষানুশাসিনঃ পাপা মৃষবাদ পরায়ণাঃ॥
অন্ধ্রাঃ শকাঃ পুলিন্দাশ্চ যবনাশ্চ নরাধিপাঃ।
কাম্বোজা বহ্লীকাঃ শূরাস্তথাভীরা নরোত্তম॥
যুগান্তে মনুজব্যাঘ্র তথাকারাশ্চ ভারত।
ন তদাব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ স্বধর্ম্মমুপজীবতি॥
ক্ষত্রিয়াশ্চাপি বৈশ্যাশ্চ বিকর্ম্মস্থা নরাধিপ।
অল্পায়ুষঃ স্বল্পবলাঃ স্বল্পবীর্য্যপরাক্রমাঃ।
অল্পসারাল্প দেহাশ্চ তথা সত্যাল্পভাষিণঃ॥
মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮৮ অধ্যায়।

(২) কল্কি পুরাণেও ম্লেচ্ছাধিকারের প্রসঙ্গ আছে; কিন্তু এই পুরাণ যে নিতান্ত আধুনিক এবং ভারতে ইংরেজাধিকার স্থাপিত হওয়ার পর রচিত, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত তিন পংক্তি পাঠ করিলেই বিদিত হইবে।
কলেঃ পঞ্চসহস্রাব্দে কিঞ্চিন্ন্যূন দ্বিজর্ষভা।
ম্লেচ্ছানীকাশ্বেতবর্ণা শূরাবক্ত্রোপশোভিনঃ।
ভবিষ্যন্তি মহিপালাঃ কলৌ বৈ বেদনিন্দকা॥

হইবেই হইবে। এ যুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য নহে, কারণ আমরা যাহাই করি না কেন, কলিযুগে ধর্ম্ম এক পাদের অধিক থাকিবে না। তবে যদি বল কেন যুদ্ধ করি? আমরা মান রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতেছি। ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধং দেহি বলিয়া কেহ আহ্বান করিলে পরাজয় নিশ্চয় জানিয়াও যুদ্ধ দিতে হইবে। যাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে তাহারা পরাজিত হইয়া ম্লেচ্ছাধীন হইবে, তাহারা কোন কোন সময়ে চিতোর দুগরক্ষক বীরদিগের ন্যায় পৌরুষ দেখাইতে পারে, কিন্তু প্রায়ই এরূপ ঘটে, যে তাহাদের বাহু হইতে অর্দ্ধবল চলিয়া যায় এবং তাহাদের পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া উঠে। আশান্বিতের বল হইতে হতাশের বলের অনেক পার্থক্য আছে। ওদিকে মুসলমানগণ শুভাদৃষ্টবাদ জনিত বলে বলীয়ান হইয়াছিল। তাহাদের ধ্রুব ও জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল "আমাদের যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, আল্লা আমাদের সহায়। আমরা পৌত্তলিকদিগকে পরাজিত ও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আল্লার পবিত্র নাম বিস্তৃত করিব। এ যুদ্ধে আমাদের মৃত্যু হইলে নিশ্চয় স্বর্গলাভ হইবে; আর যদি বাঁচি, তবে ইহলোকে রাজ্যলাভ, পরলোকে সুরনারী সহবাস লাভ হইবে (১)।

এই বিশ্বাস যতকাল প্রবল ছিল, ততকাল তাহারা আসিয়া ইউরোপ ও

---

(১) A religion of peace was incapable of withstanding the fanatic cry of "Fight! fight! Paradise! paradise!", that re-echoed in the ranks of the Saracens..............In an action under the walls of Edessa, an Arabian youth, the cousin of Caled, was heard to exclaim "Methinks I see the black-eyed girls looking upon me, one of whom, should she appear in this world, all mankind would die for love of her"—*Gibbon.*

দুরদৃষ্টবাদ যেমন ভারতের স্বাতন্ত্র্য নাশের একটি প্রধান কারণ, তেমনই পারস্যের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল। After the defeat of Cadesia, a country intersected by rivers and canals might have opposed an insuperable barrier to the victorious cavalry, and the walls of Ctesiphon and Madyan which had resisted the battering rams of the Romans would not have yielded to the darts of the Saracens; but the flying Persians were *overcome by the belief that the last day of their religion and empire was at hand.*

Gibbon.

আফ্রিকায় দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল। পরে তাহারা রাজ্য-ভোগ-মদে বিলাস-পরায়ণ হইয়া উঠিল এবং তাহাদের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসও দুর্ব্বল হইয়া তাহাদের অধঃপতনের কারণ হইল।

অনেকে বলিতে পারেন বিশ্বাসে কি আসিয়া যায়? প্রায় সকল মানবেরই বিশ্বাস এই, যে, পরলোকে পাপকর্ম্মের শাস্তি আছে; অথচ নিষ্পাপ মনুষ্য এমন বিরল কেন? ইহার উত্তর এই যে, পরলোক সম্বন্ধে অধিকাংশ মনুষ্যের বিশ্বাস অতি দুর্ব্বল; আর যাহাদের প্রবল বিশ্বাস আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে মনে করে, যে, প্রায়শ্চিত্তে, গঙ্গাস্নানে, তীর্থ যাত্রায়, মক্কাদর্শনে বা ঈশার রক্তে পাপ ধৌত হইয়া যায়। বিশ্বাস দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইলে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবেই হইবে। বাঙ্গালায় ধ্রুবদৃষ্টবাদ এমন প্রবল ছিল, যে, বঙ্গরাজ ম্লেচ্ছাধিকার অবশ্যম্ভাবী জানিয়া যুদ্ধই করিলেন না, এবং চোরের মত গোপনে পলাইয়া স্বদেশ ও স্বজাতিকে কলঙ্কিত করিলেন। ধ্রুবদৃষ্টবাদ ভারতের অধোগমনের একমাত্র কারণ নহে; কিন্তু ইহা যে প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। যাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে মনুষ্যের ক্রমশ অধোগতি হইতেছে, তাহাদের অধোগতিই হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল শিখগণ ঐ ভ্রমাত্মক ও অনিষ্টকর বিশ্বাস অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং কেবল শিখরাই বিশিষ্টরূপে দেখাইয়াছিল, যে, ভারত পরজাতির পদে বহুকাল দলিত হইয়াও একেবারে বীরশূন্য অথবা নির্জ্জীব হয় নাই। যে পাঠানদের ভয়ে সমস্ত ভারত কম্পিত হইত, শিখব্যতীত অন্য হিন্দু সে পাঠানদের দৌরাত্ম্য দমন করিতে পারে নাই। গুজরাণওয়ালার তুমুল সংগ্রামে চরৎসিংহ মহারাষ্ট্রবিজয়ী পাঠানদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন,* এবং তাঁহার পৌত্র রণজিৎ সিংহ যুদ্ধে পাঠান-দিগকে বারম্বার পরাভূত করিয়া পেসবার অধিকার করিয়াছিলেন। শিখ ব্যতীত ব্রিটিশসিংহের উপযুক্ত শত্রু ভারতে ছিল না। ইহার প্রধান কারণ শিখেরা মুসলমানদের ন্যায় শুভাদৃষ্টবাদী ছিল; ধ্রুবদৃষ্টবাদ তাহাদিগকে নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট করে নাই (১)। লাল সিংহ ও তেজ সিংহ প্রভৃতি

---

* এই যুদ্ধ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের এক বৎসর পরে হইয়াছিল।

(১) They are persuaded that God himself is present with them, that He supports them in all their endeavours, that

দুরাত্মা স্বদেশদ্রোহী না হইলে বোধ হয় পঞ্জাব অদ্যাপি স্বাধীন থাকিতে পারিত। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শিখদিগের যে প্রবল ও অনন্ত বিশ্বাস ছিল, তাহা এক্ষণে নাই; তথাপি যদি ভাবতোদ্ধার কেবল উষ্ণমস্তিষ্ক যুবক কতিপয়ের স্বপ্নমাত্র না হয়, তাহার সূত্রপাত পঞ্জাববাসী শিখদিগের মধ্যেই হইবে। কোন মত অনিষ্টকর বলিয়াই যে তাহা অমূলক হইবে, তাহা আমি বলি না। দুরদৃষ্টবাদদ্বারা আমাদের পৌরুষের হানি হইয়াছে বলিয়াই যে তদ্বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক ইহা সিদ্ধান্ত করা ন্যায়সঙ্গত নহে। এক্ষণে দুরদৃষ্টবাদ যে অমূলক, তদ্বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

(ক) ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবীতে নাই। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া এই গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সমালোচন করিতেছেন। আমরা কার্য্যদ্বারা এই গ্রন্থের প্রতি এত আদব দেখাই না; কিন্তু আমাদের মৌখিক আদরের ক্রটি নাই। আমরা বলিয়া থাকি ব্রহ্মা স্বয়ং এই গ্রন্থের প্রণেতা। এই বেদের প্রথম মণ্ডলের ২৪ সূক্তে বরুণের নিকট এই প্রার্থনা আছে, "হে রাজন্ আমাদিগের এই যজ্ঞে বাস করিয়া আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর।" প্রথম মণ্ডলের ১০০ সূক্তে ইন্দ্রের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা আছে। যদি সত্যযুগে পাপ ছিল না, তবে পাপ হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা কেন? ঐ বেদে দস্যু, রাক্ষস ও অসুর কর্তৃক গবাপহরণ ও অন্যান্য প্রকার দৌরাত্ম্যের উল্লেখ আছে। তাহাতে যুদ্ধেরও উক্তি আছে। উভয় পক্ষে ন্যায় যুদ্ধ হইতে পারে না। একথা স্বতঃসিদ্ধ; হয় উভয় পক্ষের অন্যায়াচরণ থাকে, অথবা কোন এক পক্ষের অন্যায়াচরণ থাকে। যাহারা অন্যায় যুদ্ধ করে, তাহারা নরহত্যার পাপে পাপী হয়। অতএব ঋগ্বেদ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সত্যযুগে নরহত্যাদি পাপ ছিল।

---

sooner or later He will confound their enemies for His own glory. Those who have heard a follower of Guru Govind declaim on the destinies of his race, his eye wild with enthusiasm and every muscle quivering with excitement, can understand that spirit which impelled the naked Arab against the mail-clad troops of Rome and Persia—*Cunningham's History of the Sikhs. 2nd Ed. P. 13.*

(খ) পরাশর-সংহিতায় লিখিত আছে, যে, মনু সত্যযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা। "কৃতেতু মানবা ধর্ম্মাঃ" এই বচন প্রায় সর্ব্বহিন্দু গ্রাহ্য; কারণ মনু চারিযুগের ধর্ম্মপ্রয়োজক হইলে, এক্ষণে ব্রাহ্মণ,শূদ্রাণীকে বিবাহ করিতে পারে না কেন? অথবা গোপাল ও নাপিতের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে না কেন? মনুসংহিতায় প্রায় সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডবিধান আছে। যদি সত্যযুগে পাপ ছিল না, তবে মনু পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় ও দণ্ডবিধান কেন করিলেন? সংহিতার সপ্তমাধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে কথিত আছে, যে. বেণ, নহুষ, যবনকুলসম্ভূত সুদাস, সুমুখ ও নিমি ইঁহারা অবিনয় দোষে নষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই সত্যযুগের রাজা; তাঁহাদের অবিনয়াতিশয্য যে পাপ তাহার সন্দেহ নাই। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে, সুদাসবংশ বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যবন হইয়াছিল। সত্যযুগে ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইলে, ঐ যুগে যবনাচার কিরূপে হইল?

(গ) পৌরাণিক আখ্যায়িকা সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে বিদিত হইবে, যে, সত্যযুগে পাপের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। ইন্দ্র ও চন্দ্র যে পাপ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আমাদের এখনও কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। তবে যদি কেহ বলেন,—

"দেবতাদের লীলা খেলা,
পাপ হয় মানুষের বেলা"

তাঁহার সহিত আমাদের তর্ক নাই। দুর্ব্বাসা দুর্জ্জয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দেবরাজ হইতে অতি ক্ষুদ্র মানব পর্য্যন্ত সকলকেই শাপ দিতেন। ক্রোধাতিশয্য কি পাপ নহে? হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর দৌরাত্ম্য সত্যযুগেই হইয়াছিল। দৈত্যের পাপদ্বারা কি সত্যযুগের ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা খর্ব্ব হয় নাই? কচ, দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠার উপাখ্যান পাঠ করিলে বিদিত হইবে, যে, সত্যযুগে দ্বেষ ও হিংসা বিলক্ষণ ছিল। বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের শত্রুতার উক্তি কেবল রামায়ণে আছে এমন নহে, ঋগ্বেদেও আছে।

বিশ্বামিত্রের বিদ্বেষ বিলক্ষণ ছিল; কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া তপোবলে ব্রহ্মর্ষি হইলেন, এই কারণেই বোধ হয় বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিদ্বেষানল প্রথমত প্রজ্বলিত হইয়াছিল। ফলত যাঁহাদের আমাদের ন্যায় রক্তমাংসের শরীর ছিল, তাঁহারা সত্যযুগে জন্মিয়া ছিলেন বলিয়াই নিষ্পাপ ছিলেন, একথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

(ঘ) সত্য যুগের মনুষ্যগণ বৃহৎকায় ও দীর্ঘায়ু ছিল কি না, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। পৌরাণিক হস্তীর কঙ্কাল (elephas primigenius) আধুনিক হস্তীর কঙ্কাল অপেক্ষা বৃহৎ। শিবালিক পর্ব্বতোপত্যকায় অধ্যাপক ফকনার যে মহাকূর্ম্মের কঙ্কাল পাইয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষীয় চিত্র শালিকায় আছে। চৌরঙ্গিতে গিয়া সকলেই তাহা দেখিতে পারেন। তাহার পা গণ্ডারের পার ন্যায় স্থূল। তাহার পৃষ্ঠাবরণের পরিধি ১০।১২ হাত হইবে। তাহাকে দেখিলে মহাভারতোক্ত গজকচ্ছপের যুদ্ধ ব্যাসদেবের স্বকপোলকল্পিত বর্ণনা বলিয়া বোধ হয় না।

পৌরাণিক গো (Bos primigenius & Sivatherium giganteum) এবং পৌরাণিক আয়র্লণ্ডীয় মহামৃগ (Megaceros Hibernicus) আধুনিক গো ও মৃগ হইতে বড় ছিল। অতএব সত্যযুগের মনুষ্য আধুনিক মনুষ্য হইতে মহাকায় হওয়া অসম্ভব নহে (১)। তবে খনিকারগণ এবং ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আধুনিক নরকঙ্কাল অপেক্ষা বৃহত্তর নরকঙ্কাল অদ্যাপি প্রাপ্ত হন নাই। পুরাণে লিখিত আছে,যে, কোন কোন রাজা ৮,০০০, কেহ বা ১০,০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ সমস্ত কবির অত্যুক্তি মাত্র। মনু স্বয়ং বলিয়াছেন, যে সত্যযুগে মনুষ্যের পরমায়ু ৪০০ বৎসরের অধিক ছিল না। স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ হইলে, স্মৃতিই মাননীয়, সুতরাং মনুর বচনই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। দুর্ভাগ্যবশত এতদ্বিষয়ে মনু সংহিতাতেই ব্যাঘাত দোষ দৃষ্ট হইতেছে (২)। সত্যযুগে ৪০০ বৎসর পরমায়ু ছিল, একথা প্রথমাধ্যায়ে বলিয়া, মনু তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজ সন্তানগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তিচ শতঃ সমাঃ॥ ৩অ।৪০।

"তাহারা রূপবন্ত, ধনবন্ত, সদ্গুণবিশিষ্ট, যশস্বী, ভোগসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক হয়, এবং শত বৎসর জীবিত থাকে।"

---

(১) We live in a zoologically impoverished world from which all the largest, fiercest & strangest forms have recently disappeared—*Wallace, Geographical Distribution of Animals—P. 150.*

(২) কোন এক গ্রন্থে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন থাকিলে, নৈয়ায়িকগণ তাহাকে ব্যাঘাত দোষে দূষিত বলেন।

মনু যখন সত্যযুগের ধর্ম্মপ্রয়োজক এবং তিনি যখন আপন সংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ে স্বীকার করিতেছেন, যে, ১০০ বৎসর আয়ু দীর্ঘায়ু, তখন যে সত্যযুগে ১০০ বৎসরের অধিক বয়সেঅনেক লোক মরিত,এমন বোধ হয় না। মনুর সময়ে যে যক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্রি, কুষ্ঠাদি মহাব্যাধি ছিল, তাহা মনুসংহিতার ৩য় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পাঠে বিদিত হইবে। ঐ সময়ে যে অকাল মৃত্যু ছিল, দুই বৎসরের বালকও মরিত, তাহা ৫ম অধ্যায়ের ৬৭। ৬৮ শ্লোকে প্রকাশিত আছে।

ইংলণ্ডের টমাস্ পার্ ১০০ বৎসরের অধিক বয়সে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিল এবং প্রায় ১৫০ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং কলিযুগেও মনুর প্রথমাধ্যায়োক্ত দ্বাপরের পরমায়ু প্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভব নহে। অনেক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়া থাকেন, যে, সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু দম্পতির সন্তান যদি বাল্যকাল হইতে সমস্ত শারীরিক নিয়ম উত্তম রূপে পালন করে, সে ২০০ বৎসর জীবিত থাকিতে পারে।

(ঙ) সত্যযুগে মহাতপা বিশ্বামিত্র ঋষি মেনকা অপ্সরাকে দেখিয়া কিয়ৎকাল বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। কলিযুগে যবন-কুলোদ্ভব বৈষ্ণব চূড়ামণি হরিদাস ঠাকুর পরম সুন্দরী রমণী কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও বিশ্বামিত্র অপেক্ষা সংযম দেখাইয়া ছিলেন! কলিযুগের শাক্যমুনি বুদ্ধ ও চৈতন্য,মহাপ্রভু প্রাচীন ঋষিদের অপেক্ষা ধর্ম্মবিষয়ে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। অতএব যিনি বলেন, যে কলিতে সকলেরই দুর্ব্বল প্রকৃতি, এবং সত্যযুগে সকলেই ধর্ম্ম কর্ম্মে দৃঢ় ব্রত ছিলেন, তাঁহার উক্তি ভ্রান্তিমূলক। ক্রোধজ, দ্বেষজ ও কামজ পাপের প্রাদুর্ভাব যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নাই। তবে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে, এক মহাপাপে আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের অপেক্ষা পাপী। এই মহাপাপ মিথ্যাকথন ও কট লেখন। যদি পূর্ব্ব কালে আর্য্যজাতির সত্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিত, তাহা হইলে রামায়ণের ন্যায় গ্রন্থ কখনই প্রণীত হইত না। আমরা মুখে রামচন্দ্রের প্রতি গাঢ় ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছি,"বেটা কি মূর্খ! স্ত্রৈণ পিতার সত্য পালন জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গেল!" সকল যুগেই মিথ্যা কথন ছিল। তাহা না হইলে মনু সত্যযুগে মিথ্যা কথনের দণ্ডবিধান করিতেন না। তবে যে অধুনা মিথ্যার অধিকতর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

যখন যুনানী বীর আলেক্‌জাণ্ডার পঞ্জাবের পুকরাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তৎকালে এবং তৎপর মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত যুনানীদিগের (গ্রীক্‌দিগের) ভারতবর্ষে যাতায়াত ছিল। যুনানী গ্রন্থকারগণ ভারতবাসীদিগের সত্যানুরাগের ভূয়োভূয় প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব প্রতীত হইতেছে যে মিথ্যার বিশিষ্টরূপ প্রাদুর্ভাব আধুনিক। মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে পরাজিত করিলে. হিন্দুদিগের প্রকৃত আত্মাদর অন্তর্হিত প্রায় হইল। যাহাদের সিংহ প্রতাপ ছিল, তাহারা শৃগালবৎ হইয়া পড়িল। শৃগাল ব্যাঘ্রের সহিত এক বনে বাস করিয়া ধূর্ত্ত হইয়া পড়ে; ধূর্ত্ততা ব্যতীত শৃগালের রক্ষা নাই। যতকাল আমরা পরাধীন থাকিব, অন্তত যতকাল কানেডীয় ও অষ্ট্রেলীয় ঔপনিবেশিকদিগের ন্যায় ইংরেজদিগের সমকক্ষ না হইতে পারিব, ততকাল আমাদের প্রকৃত আত্মাদর হইবে না। আমাদের মৌখিক বড়াই বিলক্ষণ আছে। আমরা মুখে বলিয়া থাকি, "আমরা আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠ, আমাদের জেতারা ম্লেচ্ছ"; কিন্তু যখন আমাদের অবস্থা ভাবি, যখন ভাবি, যে একটি শ্বেতমুখ দেখিয়া একখানি গ্রামের সমস্ত লোক কম্পিত হয়, তখন মনে হয় গড্ডলিকা হইতে আমাদের কিছুই পার্থক্য নাই। এমন অবস্থায় প্রকৃত আত্মাদর থাকিতে পারে না। যখন আমাদের দৃঢবিশ্বাস হইবে যে আমরা মানুষ, মিথ্যাকথন দ্বারা মনুষ্যত্বের হানি করিয়া শৃগালবৎ হইয়া পড়িতেছি, তখন মিথ্যার হ্রাস হইবে। আমাদের সমাজের অনেক প্রাচীন ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে কলিযুগের দোহাই দিয়া বলিয়া থাকেন, "ভায়া হে! একি সত্যযুগ? বিষয় কর্ম্মের জন্য দুই চারিটা মিথ্যা না বলিলে কলিতে বিষয়কর্ম্ম চলে না" (১)। আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এই ভাবের কতকটা হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সুলক্ষণ। শিক্ষিত যুবকদের আত্মাদর সঞ্চার সুখের বিষয়, কিন্তু ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলা ভাল, যে ভারত

---

(১) ইঁহাদের নিন্দা করা অথবা নব্যসম্প্রদায়ের প্রশংসা করা—আমার উদ্দেশ্য নহে। ইঁহাদের অনেক গুণ ছিল, সে সকল আমাদের মধ্যে বিরল হইয়া উঠিতেছে। আমরা স্বাবলম্বনের দোহাই দিয়া অধিকতর স্বার্থপর হইতেছি। ইংরেজদিগের গুণের অনুকরণ করিতে পারি না পারি, মদ্যপান আদি দোষের অনুকরণ করিতেছি। আমাদের পিতৃ পিতামহগণ উৎকোচ গ্রহণে দোষ দেখিতেন না; কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থ আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিপালনে এবং দেব সেবায় ব্যয় করিতেন। আমরা উৎকোচ গ্রহণ গর্হিত কার্য্য বলি, কিন্তু নিজের উদর তৃপ্ত এবং গৃহিণী অলঙ্কারে ভূষিতা হইলেই সন্তুষ্ট হই।

অন্তত কানেডা বা অষ্ট্রেলিয়ার সমকক্ষ না হইলে, ভারতবাসীদিগের প্রকৃত আত্মাদর জন্মিবে না।

(৮) সম্প্রতি কেহ কেহ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে 'শিক্ষাবিভ্রাট' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। "আমরা অধঃপাতে যাইতেছি এবং যাইব"—ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, মনু এবং বেদব্যাস যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহাই যথার্থ শিক্ষাবিভ্রাট। যাহাই হৌক, পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা যদি আমরা আর কিছু না শিখি, কেবল এইমাত্র জানিতে পারি, যে, আমাদের পুরুষকার আছে, এবং আমরা সাধনা করিলে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উত্তরোত্তর উন্নত হইতে পারিব, তাহা হইলে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিফল হইবে না।

শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ফুলের স্বপ্ন ভঙ্গ।

এমন সাধের ঘুমে,
কে মোরে জাগা'ল রে!
সে বড় নিষ্ঠুর।

আধ-দেখা স্বপ্ন টুকু,
কে মোর ভাঙিল রে!
করে চুর চুর।

স্বপন সুধার ধারা,
অৰ্দ্ধেক মরমে রে,
গড়াইয়ে ছিল!

অতৃপ্ত স্বপনে,—হেন
প্রাণভরা ঘুমে রে
কেন দাগা দিল!

আমি তো কাহারো প্রাণে
জনমে কখন গো
দিই নাই ব্যথা।

জগতের এক ধারে
বনের আঁধারে গো
গুঁজে থাকি মাথা।

এমন সাধের ঘুমে,
কে মোরে জাগা'ল রে!
সে বড় নিষ্ঠুর।

আধ-দেখা স্বপ্ন টুকু,
কে মোর ভাঙিল রে!
করে চূর চূর।

লতার মধুর দোলে, পাতার কোমল কোলে
ঘুমা'য়ে ছিলাম চির সুখের আবেশে।

পরাণেতে ধীরে ধীরে, মরমের শিরে শিরে
স্বপনের ছায়া এক পড়েছিল হেসে।

পূরিয়ে প্রাণের ক্ষুধা, সেই স্বপনের সুধা
পিতেছিনু—হতেছিনু হরষে বিভোর।

সহসা বহিল বায়, শিহরি উঠিল কায়;
সুখ স্বপনের নিশি হয়ে গেল ভোর!

নয়ন পল্লবপুটে প্রভাত কিরণ ফুটে
প্রাণের সে দ্রব ভাব তরল করিল;

চকিত হইল প্রাণ, অশ্রুত প্রভাত গান
সুধামাখা বিষ মত মরমে পশিল!

কেন নিশি হ'লি ভোর, কেন রে প্রভাত চোর
হরিয়া লইলি মোর স্বপনের সুধা?
না পূরিতে পরাণের আবেশের ক্ষুধা!

হায় হায় একি একি,— কেন বা এমন দেখি,
স্বপনের স্মৃতিটুকু হারাইনু কোথা!—
হারাইনু কোথা মোর প্রাণের মত্ততা!

যে দিকে তাকা'য়ে থাকি, নূতনে নয়ন রাখি
এ নূতন দৃশ্য—ভাল লাগে না নয়ানে,
এ নূতন ভাব—ভাল থাপে না পরাণে।

কোমল প্রাণের সেই ঘুমন্ত আবেশ,
অস্ফুট প্রাণের সেই ফুটন্ত জোচ্ছনা,
হ'ল বুঝি একেবারে সকলেরি শেষ!
এ জীবনে সে স্বপন আর দেখিব না!

হায় সে স্বপন কোথা!— স্বপনের স্মৃতি কোথা!
কি বাদ সাধিলি ও রে প্রভাত অনিল!
কেন রে মরম-গ্রন্থি করিলি শিথিল?

আমারি প্রাণের সুধা
মিটা'ত আমার ক্ষুধা,
স্বপনের ভালবাসা
পুরা'ত আমার আশা,

হেসেছি খেলেছি আমি আপনার মনে,
আমি তো চাই না কভু কারো মুখপানে।
পাতার আঁধার ছায়ে, লতার সরল কায়ে
আপন সংকোচে আমি ছিনু জড় সড়,
আপন গরবে ছিনু মনে মনে বড়।

এ ঘোর নিকুঞ্জে পশি' সাধের আঁধারে মিশি
কেন জ্বেলে দিলে, উষে, খরতর আল?
এ আলো আমার প্রাণে লাগে না গো ভাল

———

সমীরণ, স্বার্থপর পেয়ে বড় অবসর
সরমের কলি মোর ফুটাইয়ে দিলে,
সুরভি ভাণ্ডার মোর উড়াইয়ে নিলে।
রবিকর, স্বার্থপর পেয়ে বড় অবসর
কোমল পরাণে মোর প্রবেশ করিলে,
সুধার ভাণ্ডারে মোর আগুন জ্বালিলে।

———

সরমের কুঁড়ি আমি স্বপন পরাণী,
স্বপন টুটিল যবে, সে কুঁড়ি ফুটিল তবে,
কি সুখে বাঁচিয়া এবে রবে অভাগিনী?
কাঁদিয়া কুসুম বালা
ভিজা'ল পাতার কোল;
যতই বাড়িল বেলা
নীরব হইল বোল।
মুর্চ্ছিত হইয়া শেষে
পড়িল পাতার কোলে!
বায়ু গন্ধ হরে নিল,
রবিকর ঝলসিল,
একেকটি পাপ্‌ড়ি খসে পড়িল রে তরুমূলে;
বৃন্তটি কাঁদিল তার লতা সঙ্গে দুলে দুলে।

ঋগ্বেদের দেবগণ।

তৃতীয় প্রস্তাব। আলোকদেব। (সমাপ্ত)

আলোক দেবদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ভিন্ন ঋগ্বেদে পূষা, অশ্বিদ্বয়, এবং উষার অনেক স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন ঋভুগণও সূর্য্যের রশ্মিস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়।

পূষা সূর্য্যের একটি নাম। সায়ণাচার্য্য প্রথম মণ্ডলের ৪২ সূক্তের টীকায় পূষাকে পৃথিবী অভিমানী দেব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু এটি তাঁহার ভ্রম। যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন, পূষা "সর্ব্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতা আদিত্যঃ," এবং এই অর্থই প্রকৃত। সূর্য্যই পূষা তাহা বেদের অনেক সূক্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সরলহৃদয় গোমেষপালকগণ সূর্য্যের যে প্রকৃতিক অর্চ্চনা করিত, পূষা সেই প্রকৃতির সূর্য্য। তাহারা সর্ব্বদা এক গোচর হইতে অন্য গোচরে গমনাগমন করিত, এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে ভ্রমণ করিত, এবং পথে অনিষ্ট বা বিপদ না হয়, ভোজনীয় অন্ন ও পানীয় জল পাওয়া যায়, এই জন্য সরলহৃদয়ে পূষাকে সর্ব্বদাই স্তুতি করিত; সুতরাং পূষা একরূপ পথভ্রমণকারীদিগের বিশেষ দেব হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক পূষার স্তুতিগুলি পাঠ করিলে তৎকালে পথভ্রমণে কি বিপদ আপদ ছিল তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; আমরা এখানে একটি স্তুতি উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে পূষা! পথ পার করাইয়া দাও বিঘ্নহেতু পাপ বিনাশ কর। হে মেঘ-পুত্র-দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও।

"হে পূষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী, যে কেহ আমাদিগকে বিপরীত পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দাও।

"সেই মার্গ প্রতিবাধক তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও।

"যে কেহ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অপহরণ করে, এবং অনিষ্ট সাধন ইচ্ছা করে, হে পূষা! তাহার পর-সন্তাপক দেহ তোমার পদ দ্বারা দলিত কর।

"হে শত্রু বিনাশী ও জ্ঞানবান্ পূষা! যেরূপ রক্ষণদ্বারা পিতৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলে তোমার সেই রক্ষণা প্রার্থনা করিতেছি।

"হে সর্ব্বধন সম্পন্ন, অনেক সুবর্ণায়ুধযুক্ত, ও লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূষা! তুমি ধনসমূহ দানে পরিণত কর।

বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাও সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদিগকে লইয়া যাও, হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবলম্বন কর।

"শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়। হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবলম্বন কর।"

১ মণ্ডল, ৪২ সূক্ত, ১ হইতে ৮ ঋক্।

অন্যান্য স্থানেও পূষার এইরূপ আরাধনা আছে। আমারা আর দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।

"পূষা আমাদিগের গো সমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাইস্রন, পূষা আমাদিগের অশ্বসমূহ রক্ষা করুন, পূষা আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন।

"হে পূষা! অভিষবকারী যজমানের গো সমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস, আমরা স্তব করিতেছি, অতএব আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ কর।

"(পথে) যেন কিছু নষ্ট না হয়, কিছু ক্ষত না হয়, কিছু গর্ত্তে পতিত না হয়, সমস্ত (গাভীর) সহিত নিরাপদে আইস।

"পূষা আপন দক্ষিণ হস্ত চারিদিকে বিস্তৃত করুন, আমাদিগের নষ্ট (গাভী সকল) পুনরুদ্ধার করিয়া দিন।"

৬ মণ্ডল, ৫৪ সূক্ত, ৫, ৬, ৭ ও ১০ ঋক্।

"ছাগই পূষার বাহন, তিনি পশুসমূহ পালন করেন তিনি অন্নের ঈশ্বর, আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির উত্তেজক, এবং বিশ্ব ভুবনে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।" ইত্যাদি।

৬ মণ্ডল, ৫৮ সূক্ত, ১ ঋক্।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ পূষারূপী সূর্য্যকে কিরূপে আরাধনা করিতেন, কি ভাবে পূজা করিতেন, তাহা উপরিউক্ত ঋক্ গুলি হইতেই প্রতীয়মান হইবে। চারিদিকে অনার্য্য শত্রু বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্য্যপল্লীর অধিবাসীগণ আপনাদিগের গো অশ্বাদির রক্ষার জন্য, পথে বিপদের অপনয়নার্থ, এবং সুন্দর তৃণপূর্ণ

যে সকল "আঘাতকারী, অপহরণকারী, দুষ্টাচারীর" কথা উল্লিখিত হইয়াছে, বোধ হয় তাহারা অনার্য্য আদিমবাসীগণ ভিন্ন আর কেহ নহে। আর্য্যগণ আসিবার পূর্ব্বে তাহারাই ভারতবর্ষের অধীশ্বর ছিল, আর্য্যগণ সিন্ধুতীরে বাস করিলে পর সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা উপদ্রব করিত। অদ্য ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের শাসন স্থিরীকৃত হওয়াতেও যে তাস্তিয়া ভিল সচ্ছন্দে কয়েক বৎসরাবধি গো অশ্ব ও ধন অপহরণ করিতেছে, পথে ও গ্রামে লোকের অর্থ অপহরণ করিতেছে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যপল্লীগুলিতে সেই রূপ উপদ্রব করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি আছে?

ঋভুগণ সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক বলিবার নাই। একটি বৈদিক প্রবাদ আছে, যে, ঋভুগণ প্রথমে মনুষ্য ছিলেন পরে ত্বষ্টৃনির্ম্মিত একখানি সোম পাত্র নিজ শিল্পচাতুর্য্যে চারিখান করিয়া দেবদিগকে তুষ্ট করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং সূর্য্যালোকে বাস করিতে লাগিলেন। সায়ণাচার্য্য ১ মণ্ডলের ১১০ সূক্তের ৬ ঋকের ব্যাখ্যায় একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যে, ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি। যদি ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি হয়েন, তবে তাহাদিগের শিল্পচাতুর্য্যের প্রবাদ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? পণ্ডিতপ্রবর মক্ষমূলর বলেন, যে, পূর্ব্বকালে বৃবু নামে এক সূত্রধারবংশ কার্য্যগুণে ঋত্বিক্ সম্প্রদায় প্রবেশ পাইয়া ঋত্বিক্ হইয়াছিল। তাহাদিগের বিশেষ কোনও উপাস্য দেব ছিল না অতএব তাহারা ঋভুগণের উপাসনাপরায়ণ হয়েন এবং কালক্রমে সেই বৃবুবংশীয়দিগের পাত্রাদি নির্ম্মাণে নৈপুণ্য হইতে সেই কুলের দেব ঋভুগণও সেই নৈপুণ্যের খ্যাতি লাভ করিলেন। এই মীমাংসাটি ঠিক—কি না, তাহার বিচার করিতে আমরা অক্ষম।

গ্রীকদিগের মধ্যে একটি গল্প আছে যে Orpheus নামক এক গায়কের স্ত্রীর কাল হইলে তিনি তাহার গীত দ্বারা মৃত্যু রাজকে তুষ্ট করিয়া স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু পথে তিনি ঔৎসুক্যের সহিত স্ত্রীর দিকে চাহাতে তাঁহার স্ত্রী পুনরায় অদৃশ্য হইলেন। মক্ষমূলর বলেন যে Orpheus ঋভু বা অর্ভুর রূপান্তর মাত্র, এবং গল্পের মূল অর্থ এই যে সূর্য্য উষার দিকে চাহিলেই, অর্থাৎ উদয় হইলেই উষা অদৃশ্য হইয়া যান।

এক্ষণে আমরা অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। পুরাণে তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে পরিচিত এবং তাঁহাদিগের অশ্বিনীর গর্ভে জন্ম হওয়ার

উপাখ্যান আছে। কিন্তু বেদ রচনার প্রথমাবস্থায় সে উপাখ্যান সৃষ্ট হয় নাই, বেদে তাঁহাদিগের নাম অশ্বিনীকুমার নহে, তাঁহাদিগের নাম "অশ্বিন্" অর্থাৎ অশ্ববিশিষ্ট।

প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে প্রথম আর্য্যেরা অশ্বিদ্বয় বলিয়া পূজা করিত, সে বিষয়ে অনেক প্রাচীন পণ্ডিতের অনেক প্রকার মত আছে। যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন "অশ্বিদ্বয় কাহারা ? কেহ কেহ বলেন আকাশ ও পৃথিবীই অশ্বিদ্বয়। কেহ কেহ বলেন দিবা ও রাত্রি। কেহ কেহ বলেন চন্দ্র সূর্য্য, কেহ কেহ বলেন অশ্বিদ্বয় দুইজন পুণ্যবান্ রাজা ছিলেন।"

যাস্কের নিজের মত যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বোধ হয় শেষ রাত্রিতে আকাশে যে অন্ধকার ও আলোকে বিজড়িত থাকে, তাহাকেই প্রথম আর্য্যগণ অশ্বিদ্বয় বলিয়া উপাসনা করিতেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত, আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু, গোল্ডষ্টুকর এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। মক্ষমূলর বলেন উভয় সন্ধ্যা, অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যাকেই আর্য্যগণ অশ্বিদ্বয় বলিয়া উপাসনা করিতেন।

যদি সায়ংকালের বা প্রথম উষার আলোকই যমবদেব বলিয়া উপাসিত হইলেন, তবে তাঁহাদিগের অশ্বিদ্বয় নাম দেওয়া হইল কেন? বেদজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন যে এটি বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, ইন্দ্রের (অর্থাৎ—আকাশের) আলোক ধাবমান হয়, অগ্নির আলোক ধাবমান হয়, সেই জন্য সেই আলোক সমূহকে সর্ব্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে হরি, হরিৎ, বা রোহিত নামক যে ইন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির অশ্ব আছে, তাহার প্রথম অর্থ উজ্জ্বলবর্ণ আলোক ভিন্ন আর কিছুই নহে। এটি অতি প্রাচীন বৈদিক উপমা এবং বেদের সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। "অশ্বিন্" শব্দের ও সেই অর্থ—অশ্বযুক্ত, অর্থাৎ আলোক যুক্ত। কালক্রমে লোকে সে বৈদিক উপমার প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গেল, এবং "অশ্বিদ্বয়" নাম হইতে একটি গল্প উৎপন্ন হইল যে সূর্য্য ও উষা—অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগেরই পুত্র অশ্বিদ্বয়! তখন বেদের "অশ্বিদ্বয়" পুরাণের "অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে" পরিণত হইলেন!

অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৭ সূক্তে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে যথা;—"ত্বষ্টা কন্যার বিবাহ দিতেছেন এই বলিয়া বিশ্বভুবন একত্র হইল। যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় বৃহৎ বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু

হইল; মর্ত্ত্যগণের নিকট হইতে অমর দেবীকে লুকাইয়া রাখিল। তাহার ন্যায় একজনকে সৃষ্ট করিয়া বিবস্বানকে দান করিল। এই ঘটনার সময় তিনি অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিলেন; সরণ্যু মিথুনদিগকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।"

এই সূক্তের অর্থ পরিষ্কার নহে, কিন্তু এইটুকু বুঝা যায় যে ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সহিত বিবস্বানের বিবাহ হয় এবং সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিয়া ত্যাগ করেন।

বিবস্বান্ অর্থ—সূর্য্য এবং সরণ্য—উষা। কিন্তু তাহাদিগের অশ্ব ও অশ্বিনী রূপ ধারণ করার কোনও কথা এখানে নাই।

সে গল্প যাস্কের নিরুক্তে পাওয়া যায়। তিনি উক্ত সূক্তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবস্বান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমক সন্তান হয়। সরণ্যু তাঁহার স্থানে তাঁহার ন্যায় আর একজন দেবীকে রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন করিলেন। বিবস্বান্ও অশ্বরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাতে যান ও তাঁহার সহিত সংসর্গ করেন। এইরূপ অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।" যাস্ক আরও বলেন অশ্বিনীরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর যে যমজ সন্তান হইয়াছিল তাহারা যম ও যমী, এবং সরণ্যু আপন পরিবর্ত্তে যে দেবীকে বিবস্বানের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন সে দেবীর নাম সবর্ণা, এবং বিবস্বানের দ্বারা সবর্ণার যে পুত্র হয় তিনিই বৈবস্বত মনু। এইরূপে পুরাণের অনন্ত উপাখ্যান আরম্ভ হইল।

কিন্তু যদিও প্রথম আর্য্যগণ আকাশের ধাবমান আলোককে অশ্বিদ্বয় বলিয়া উপাসনা করিতেন, তথাপি অচিরে সেই অশ্বিদ্বয় চিকিৎসা-কুশল দেবদ্বয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন, এবং ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে তাঁহাদিগের কৃত আরোগ্য বর্ণিত আছে। তাঁহারা শত্রু দগ্ধ অত্রি ঋষিকে শান্তি দিয়াছিলেন, গোতম ঋষিকে মরুভূমিতে জল দিয়াছিলেন, সমুদ্রে মজ্জমান্ তুগ্র পুত্রকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ জীর্ণাঙ্গ চ্যবন ঋষিকে যৌবন দিয়াছিলেন, * বন্দন ঋষিকে কূপ হইতে উঠাইয়াছিলেন, ইন্দ্র দধীচির শিরশ্ছেদন

* Kuhn, Max Muller এবং Benfey বলেন যে বার্দ্ধক্যের পর পুনরায় যৌবন প্রাপ্তি কেবল সূর্য্যের অস্তের পর পুনরুদয় সম্বন্ধে একটি উপমা মাত্র, এবং রেভ, বন্দন, পরাবৃজ, ভুজ্যু প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে অশ্বিদ্বয় উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প আছে, সে সমস্ত গল্পের মূল প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে উপমা মাত্র।

করিলে তাঁহার মস্তক জুড়িয়া দিয়াছিলেন, বধ্রিমতীকে পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন; বৃক-গৃহীত বর্ত্তিকা পক্ষীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বিশ্‌পলা রাজ্ঞীর একটি পা ছিন্ন হইলে সেই পা জুড়িয়া দিয়াছিলেন,—নেত্রহীন ঋজ্রাশ্বকে চক্ষু দিয়াছিলেন, জাহুষ ও প্রথুশ্রবা রাজাকে শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় ঋষি আপন পুত্র হারাইলে অশ্বিদ্বয় সেই পুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, বিমদ রাজের স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন, এবং দেবদিগের মধ্যে একটি দৌড় হওয়ায় অশ্বিদ্বয় সকলের অগ্রগামী হইয়া সবিতার কন্যা সূর্য্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে এইরূপ অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে, পাঠকগণ প্রথম মণ্ডলের ১১২ অথবা ১১৬ সূক্তটি পাঠ করিলেই তাহা অবগত হইলেন।

এক্ষণে আমরা উষাদেবী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রকৃতির মধ্যে উষা অপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য আর নাই, ঋগ্বেদের ঋষিদিগের পক্ষে উষা সম্বন্ধে স্তুতিগুলি যেরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী, সেরূপ স্তুতি আর নাই।

কিন্তু কেবল ঋগ্বেদের ঋষিগণ কেন? প্রাচীন আর্য্যমাত্রেই উষাকে উপাসনা করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। ঋগ্বেদে উষার যে সকল নাম পাওয়া যায়, তাহার অনেকগুলিই গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়;—ইহার অর্থ এই যে হিন্দু আর্য্য ও গ্রীক আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সাধারণ পূর্ব্ব পুরুষগণ যখন একত্র মধ্য-আসিয়াতে বাস করিতেন, তখনই উষাকে এই নামগুলি দিয়া ডাকিতেন ও উপাসনা করিতেন।

ঋগ্বেদের	অর্জুনী	গ্রীকদিগের	Argynoris,
ঋগ্বেদের	বৃসয়	গ্রীকদিগের	Briseis,
ঋগ্বেদের	দহনা	গ্রীকদিগের	Daphne,
ঋগ্বেদের	অহনা	গ্রীকদিগের	Athena,
ঋগ্বেদের	উষা	গ্রীকদিগের	Eos,
ঋগ্বেদের	সরমা	গ্রীকদিগের	Helena,
ঋগ্বেদের	সরণ্য	গ্রীকদিগের	Erinys, *

* See Dr. Rajendra Lal Mitra's *Indo Aryans,* Vol II. *Primitive Aryans.*

উষা সম্বন্ধে দুই একটি সুন্দর স্তুতি আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিব।

"গৃহকার্য্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া উষা আগমন করেন। * * * *

"তুমি চেষ্টাবান্ পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ কর, ভিক্ষুকদিগকে প্রেরণ কর; তুমি নীহারবর্ষী এবং ক্ষণস্থায়িনী। তুমি উদয় হইলে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ আর কুলায় অবস্থান করে না।

"তিনি রথ যোজিত করিয়াছেন। সৌভাগ্যবতী উষা দূর হইতে শত রথের দ্বারা মনুষ্যগণের নিকট আগমন করিতেছেন।

"তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে; নেত্রী জ্যোতি প্রকাশ করিতেছেন; ধনবতী স্বর্গদুহিতা বিদ্বেষীদিগকে ও শোষকদিগকে দূর করিতেছেন।

"হে স্বর্গদুহিতে! আহ্লাদকর জ্যোতির সহিত উদয় হও, দিবসে দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও, এবং অন্ধকার দূর কর।"

১ মণ্ডল, ৪৮ সূক্ত, ৫ হইতে ৯ ঋক্।

"নর্ত্তকীর ন্যায় উষা আপন রূপ প্রকাশ করিতেছেন। গাভী যেরূপ দোহন কালে স্বীয় উধঃ প্রকাশিত করে, উষাও সেইরূপ নিজ বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ শীঘ্র গোষ্ঠে গমন করে, সেইরূপ উষাও পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিশ্ব ভুবন প্রকাশ করিতেছেন, অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করিতেছেন।

"আমরা নৈশ অন্ধকারের পারে আসিয়াছি, উষা সমস্ত প্রাণীকে চৈতন্যযুক্ত করিয়াছেন। দীপ্তিমতী উষা মিষ্টবাদীর ন্যায় প্রীতি পাইবার জন্য যেন স্বীয় দীপ্তিতেই হাসিতেছেন; আলোক-বিকশিতাঙ্গী উষা আমাদিগের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন।

"পশুপালক যেরূপ পশু বিচরণ করায়, সুভগা ও পূজনীয়া উষা সেই রূপ তেজ বিস্তার করিতেছেন। মহতী নদী যেরূপ প্রবাহিতা হয়, মহতী উষা সেই রূপ জগৎ ব্যাপ্ত করিতেছেন। তিনি দেবগণের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সূর্য্যকিরণের সহিত দৃষ্ট হয়েন।"

১ মণ্ডল, ৯২ সূক্ত ৪, ৬, ও ১১ ঋক।

"অদ্যও যেরূপ কল্যও সেইরূপ, উষাদেবী সর্ব্বকালেই অনবদ্যা। প্রতি দিন বরুণের অবস্থিতি স্থান হইতে ত্রিংশত যোজন

অগ্রে অবস্থিত হয়েন। একই উষা উদয় কালেই গমন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

"দেবী! কন্যার ন্যায় নিজ শরীর বিকাশ করিয়া তুমি ভোগাভিলাষী দীপ্তিমান্ সূর্য্যের নিকট গমন কর। যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তি বিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার সম্মুখে বক্ষ স্থল অনাবৃত কর।

"মাতা দেহ মার্জ্জন করিয়া দিলে কন্যার শরীর যেরূপ উজ্জ্বল হয়, তুমিও সেই রূপ আপন উজ্জ্বল শরীর সকলের দর্শনার্থ প্রকাশ কর। তুমি ভদ্রা, তুমি অন্ধকারকে দূর করিয়া দাও; অন্য উষা তোমার কার্য্যে ব্যাপ্ত হইবে না।

১ মণ্ডল, ১২৩ সূক্ত, ৮, ১০, ১১ ঋক্।

"উষা বিস্তৃত অন্তরীক্ষের পূর্ব্ব ভাগে উদয় হইয়া দিক সমূহের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন; পিতা স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎসঙ্গে থাকিয়া উভয়কে নিজ তেজে পরিপূর্ণ করিতেছেন, এবং বিস্তীর্ণ রূপে প্রথিত হইতেছেন।

"যুবতী উষা পূর্ব্ব দিক হইতে আগমন করিতেছেন, অরুণ বর্ণ অশ্বগণকে রথে যোজিত করিতেছেন। দিবসের সূচনা করিয়া অন্তরীক্ষে অন্ধকার নিবারণ করিতেছেন, গৃহে গৃহে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে।

"হে উষা তোমার উদয় হওয়ায় পক্ষিগণ কুলায় হইতে উর্দ্ধে উড়িয়া যাইতেছে অন্নার্থী মনুষ্যগণ চারিদিকে গমন করিতেছে। হে দেবি! গৃহী হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য ধন আনয়ন কর।

১ মণ্ডল, ১২৪ সূক্ত, ৫, ১১, ১২ ঋক্।

"মনুষ্য যেরূপ রমণীর পশ্চাদ্ধাবন করে, সূর্য্য সেইরূপ উষার পশ্চাতে আসিতেছেন †। এই সময়ে দেবত্বাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ বহু যুগ প্রচলিত যজ্ঞ কর্ম্ম

---

* এই ঋকের টীকার সায়ণ লিখিয়াছেন যে সূর্য্য প্রত্যহ ৫০৫৯ যোজন ভ্রমণ করেন।" The reckoning of the sun's daily journey, cited by Sayana perhaps from some text in the *vedas* is much nearer the truth than that of the *puranas,* being something more than 20,000 miles and being infact the Equatorial Circumference of the Earth.—Bentley, *Hindu Astronomy.* P. 185 Wilson's Note.

† ঋগ্বেদে যেটি উপমা মাত্র, গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে সেটি উপাখ্যান হইয়া গিয়াছে। Apollo দেব Daphne দেবীর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পলায়মানা Daphne পরিত্রাণার্থ শরীর বিসর্জ্জন দিলেন। অর্থাৎ সূর্য্য উদয় হইলে উষা অন্তর্হিত হইলেন।

বিস্তার করেন, সুকৃতের জন্য কল্যাণ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।"

১ মণ্ডল, ১১৫ সূক্ত ২ ঋক্।

"ঊষা কাহাকেও ধনের জন্য, কাহাকেও অন্নের জন্য, কাহাকেও অভীষ্ট লাভের জন্য জাগরিত করিতেছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবনোপায় প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য জগৎ প্রকাশ করিতেছেন।

"ঐ নিত্য-যৌবন-সম্পন্না শুভ্র-বসনা, আকাশ-দুহিতা অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দর্শন গোচর হইতেছেন; তিনি পার্থিব সমস্ত ধনের ঈশ্বরী। হে সুভগে; অদ্য উদয় হও।

"কত কাল হইতে ঊষা উদয় হইতেছেন। কত কাল পর্য্যন্ত উদয় হইবেন বর্ত্তমান ঊষা পূর্ব্ব ঊষাকে অনুকরণ করিতেছেন; আগামী ঊষা-গণ এই দীপ্তিমতী ঊষাকে অনুকরণ করিবেন।

"যাঁহারা পূর্ব্ব কালে ঊষাকে উদয় হইতে দেখিয়া ছিলেন, তাঁহারা গত হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা দর্শন করিতেছি, ভবিষ্যতে যাঁহারা দর্শন করিবেন তাঁহারা আসিতেছেন।" ১ মণ্ডল, ১১৩ সূক্ত, ৬, ৭, ১০, ১১, ঋক্।

অনন্ত প্রবাহিনী, অতুল সৌন্দর্য্যোপমা ঊষাকে দেখিয়া যে চিন্তালহরী, যে উপমালহরী আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের হৃদয়ে উদয় হইয়াছিল, ঋগ্বেদের পত্রে পত্রে তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে, আমরা চারি সহস্র বৎসর পরে তাঁহাদিগের সেই অনুপম সুন্দর চিন্তা গুলি দেখিতে পাইতেছি। এই চিন্তা গুলি পাঠ করিতে করিতে বোধ হয় যেন আমরা অদ্যকার আড়ম্বর পূর্ণ বৃথা বিবাদ পূর্ণ আধুনিক জগতে নাই, যেন সিন্ধুতীর-নিবাসী সরলহৃদয়, সবল বাহু পূর্ব্বপুরুষদিগের শান্ত মুখ মণ্ডল অবলোকন করিতেছি, তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিতেছি, তাঁহাদিগের মনের ভাব ও চিন্তা জ্ঞাত হইতেছি। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন উর্ব্বরা ক্ষেত্রে যবাদি শস্য চাষ করিতেছেন, গোচর হইতে অন্য গোচরে পশু লইয়া যাইতেছেন, অরুণ বর্ণ ঊষা বা জলন্ত সূর্য্য দেখিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে দ্রবীভূত হইতেছেন, প্রাতঃকালে অগ্নি জ্বালিয়া সেই প্রকৃতির অনন্ত মহিমার স্তুতি করিতেছেন, আবার যুদ্ধের সময় সকলে অস্ত্র ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ অনার্য্যদিগকে পরাস্ত করিয়া আর্য্য অধিকার, আর্য্য নাম, আর্য্য গৌরব, বিস্তার করিতেছেন। চারি সহস্র বৎসর পর সেই সরলতা পূর্ণ পরাক্রান্ত মহাত্মা পিতৃদেবদিগকে নমস্কার করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গে ইংরেজাধিকার।

৪।

যখন সিরাজের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইতেছিল, মুর্শিদাবাদের প্রধান রাজপুরুষগণ যখন ইংরেজদিগের সহযোগী হইয়া আপনাদের প্রভুকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলা তখন আপনার কর্ত্তব্য পথ অবধারণ করিতে পারেন নাই; তখন তাঁহার গভীর সন্দেহ ক্রমে গভীরতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আপনার চারিদিকে ঘোরতর বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া অধিকতর উদ্বিগ্ন ও কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিরূপে ইংরেজের সমক্ষে আপনার প্রাধান্য অব্যাহত রাখিতে হইবে, কিরূপে আপনাকে সমুদায় বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইবে, তাহা তিনি তখন কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। সিরাজের আশঙ্কা কিরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার সেই সময়ের অবস্থার বিষয় ভাবিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি যাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। যাঁহাদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া তিনি আপনাকে নিরাপদ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে অধিকতর বিপদে ফেলিতে সমুদ্যত হইয়া উঠেন। গুরুতর আশঙ্কা ও উদ্বেগের করাল ছায়া চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে গভীর কালিমার রেখাপাত করিতেছিল। বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারিগণের ষড়যন্ত্রে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সুনিয়মিত ছিল না। তিনি শাসনদণ্ডের গৌরব রক্ষা করিতে সুযোগ পাইতেন না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনই সিরাজের শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্রতিদিনই সিরাজ আপনাকে শত্রুপরিবেষ্টিত ভাবিয়া, অধিকতর শঙ্কিত, অধিকতর চিন্তিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চন্দননগর অধিকৃত হইলে কতিপয় ফরাসি-সৈন্য কাশিমবাজারে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারা তথায় উপস্থিত হইলে, কাশিমবাজারের ফরাসিদিগের কুঠিতে ৭০ জন ইউরোপীয় ও ৬০ জন এতদ্দেশীয়

সৈন্য সমবেত হয়। 'ল' নামক এক জন ফরাসি ইহাদের সেনাপতি ছিলেন। সেনাপতির কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ যোগ্যতা না থাকিলেও, তিনি দূরদর্শী ও সদ্বিবেচক ছিলেন। নবাবের মঙ্গলসাধনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি নবাবের কাছে থাকিয়া আপনার স্বদেশীদিগকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড ক্লাইব এই অল্পসংখ্যক ফরাসিরও বিরুদ্ধাচরণে বিরত থাকেন নাই। তিনি বাঙ্গালার অন্যান্য ফরাসি অধিকার আক্রমণ করিবার অনুমতি দিতে নবাবকে কঠোর ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহাতে নবাবের ক্রোধ অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। নবাব ক্লাইবের এই অনুচিত প্রার্থনায় সম্মত হন নাই। কিন্তু ক্লাইবের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার অল্পকাল পরেই তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। তিনি আবার ইংরেজ-ভীতিতে বিচলিত হইয়া উঠেন। ফরাসি সেনাপতি 'ল'কে স্থানান্তরিত করিয়া ইংরেজ সেনাপতির সন্তুষ্টি সাধনে এখন তাঁহার ইচ্ছা হয়। দূরদর্শী 'ল' সহসা নবাবের এইরূপ চাঞ্চল্য দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বৃথা নবাবকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, যাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতেছে, তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিলে, তাঁহার বিপদ বাড়িয়া উঠিবে। বৃথা দেখাইতে লাগিলেন, যে, বিশ্বস্ত ফরাসিরা রাজধানীর নিকট থাকাতেই তাঁহার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীদিগের দুরভিসন্ধি সিদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে। 'ল'র এই যুক্তিপূর্ণ কথায় নবাবের চৈতন্য হইল না। 'ল' স্থানান্তরে গেলে আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধির অন্তরায় দূর হইবে ভাবিয়া মুর্শিদাবাদের বিশ্বাসঘাতক রাজপুরুষগণও সিরাজকে পূর্ব্বসঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সুতরাং নবাব 'ল'কে কাশিমবাজার পরিত্যাগ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ফরাসি সেনাপতিকে প্রয়োজনানুসারে অর্থ ও অস্ত্র শস্ত্র দিয়া কহিলেন, যে, তিনি যেন ভাগলপুরের অধিক দূরে গমন না করেন। ভাগলপুরে থাকিলেই নবাব আবশ্যক মত তাঁহার সাহায্য লইতে পারিবেন। 'ল' তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তরুণবয়স্ক যুবককে চতুরের চাতুরিজালে এইরূপ জড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে গভীর বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ক্লাইব যেরূপ চতুরতা দেখাইতেছেন, মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষগণ যেরূপ অবিশ্বাসের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে নবাবের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ফরাসি সেনাপতি নবাবকে

ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত তাহা ঘটিয়া উঠিল না। নবাবের বুদ্ধিচাঞ্চল্যে ও ষড়যন্ত্রকারিগণের কৌশলে এই হিতৈষীব্যক্তির সমস্ত যুক্তি বিফল হইল। নবাব পূর্ব্বেই তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন, তিনি এখন এই আদেশ পালনে উদ্যত হইলেন। নবাব বিষণ্ণচিত্তে,সজলনয়নে তাঁহাকে বিদায় দিয়া কহিলেন যে, তিনি শীঘ্রই আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু নবাব বিপত্তির বিষম বাগুরায় ধীরে ধীরে যেরূপ আবদ্ধ হইতেছিলেন, তাহা দূরদর্শী ফরাসিসেনাপতির অবিদিত ছিল না। সুতরাং নবাবের শেষ কথায় 'ল' কাতরতার সহিত কহিলেন, যে, বোধ হয় আর তাঁহারা কখন পরস্পর সম্মিলিত হইবেন না *। ইহার পর 'ল' আবার কাতরতার সহিত নবাবের কাছে এই ভিক্ষা করিলেন, যে, নবাব যেন তাঁহার সমস্ত কথা মনে রাখেন। নিরাশার ঘোর অন্ধকারে বিপত্তির করাল ছায়ায়, তাঁহার ভবিষ্য সুখের পথ আচ্ছাদিত হইতেছে, আপাত মনোরম দৃশ্যে, আপাত সুখের আবেশে, তিনি যেন কখনও ইহা ভুলিয়া না যান। পরস্পরের সম্ভাষণ বাক্য শেষ হইল। 'ল' সজল নয়নে নবাবের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। তরুণবয়স্ক নবাবও একজন বিদেশীর এইরূপ সৌজন্য, এইরূপ স্নেহ ও এইরূপ সমবেদনায় মুগ্ধ হইয়া, সজল নয়নে তাঁহার গমন পথের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। 'ল' আপনার সৈন্য লইয়া ধীরে ধীরে কাশিম বাজার পরিত্যাগ করিলেন; ধীরে ধীরে তাঁহার ভবিষ্যবাণী ফলবতী হইতে লাগিল ফরাসি সেনাপতির গমন-সংবাদে ক্লাইব সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হইলেন। এখন অভীষ্ট কার্য্য সাধনে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ জন্মিল। তিনি কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি রক্ষা করিতে একদল সৈন্য পাঠাইয়া, ওয়াট্‌স সাহেবকে মীরজাফরের সহিত সমুদায় বন্দোবস্ত ঠিক করিতে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন। ফরাসি সেনাপতি "ল"র প্রস্থানের কয়েক দিন পরেই নবাবের চিত্ত-বৃত্তি আবার পরিবর্ত্তিত হইল। ইংরেজদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই নবাব 'ল'কে কাশিমবাজার পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বিশ্বাস হইল, যে, ইহাতে তাঁহারই অনিষ্ট ঘটিবে। ইংরেজ সেনাপতি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকেই ধনে প্রাণে বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইবেন; সুতরাং আবার তাঁহার ভয় বাড়িয়া উঠিল। গভীর আশঙ্কা আবার তাঁহাকে বিচলিত করিতে লাগিল। তিনি

* *Seir Mutuqherim, p 762.*

মীরজাফরকে পনের হাজার সৈন্য লইয়া রাজা দুর্লভরামের সহিত পলাশিতে থাকিতে আদেশ দিলেন, কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং ইংরেজ-রণতরীর গতি নিরোধ জন্য ভাগীরথীতে বৃহৎ বৃহৎ কাঠের গুঁড়ি ডুবাইয়া রাখিলেন।

নবাব ইংরেজের ভয়েই এই সমস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজদিগকে আপনা হইতে আক্রমণ করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। নানা দুশ্চিন্তায় ও নানা দুর্ঘটনায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে, ইংরেজ একদিন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন। তিনি এই আশঙ্কাতেই এইরূপ পূর্ব্ব সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। নবাবের এই কার্য্যে চতুর ক্লাইবের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ অধিকতর প্রশস্ত হইল। নবাব ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন বলিয়া ক্লাইব আটঘাট বাঁধিতে লাগিলেন, এবং এখন দুরাশয় মীরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্রঘটিত সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া নবাবের সর্ব্বনাশ ঘটাইবার অবসর পাইলেন।

যখন মীরজাফর নবাবের আদেশে পলাশিতে যাত্রা করেন, তখন ইংরেজদিগের সহিত সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে একজন বিশ্বস্ত এজেণ্ট রাখিয়াছিলেন। ওয়াট্স সাহেব ইহা অবগত হইয়া উপস্থিত বিষয়ে অতঃপর কি করিতে হইবে জানিবার জন্য আপনার সহকারী স্ক্রাফটন সাহেবকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে, নবাবের মনে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত না হয়, নবাব আপনাকে সম্পূর্ণরূপ নিরাপদ ভাবেন, এজন্য তিনি, যে সকল সৈন্য কাশিম বাজারে আসিবার জন্য কাটোয়ায় অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদিগকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

ষড়যন্ত্র-ঘটিত সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কলিকাতায় ইংরেজদিগের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল *। এই সমিতি হইতে প্রথম এক খানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত হয়। নবাব হইলে, মীরজাফরকে যে সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সন্ধিপত্রে তৎসমুদয়ের উল্লেখ থাকে। এই সন্ধিপত্রে পরে লিখিত ১৩টি ধারা ছিল—

* এই সমিতিতে ড্রেক, কর্ণেল ক্লাইব, ওয়াট্স, কর্ণেল কিলপাট্রিক, বেচর ও মানিংহাম সাহেব ছিলেন।

১ম। শান্তির সময়ে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদিগের যে যে সন্ধি হয়, আমি তৎসমুদায় প্রতিপালন করিব।

২য়। ভারতবর্ষীয় হউক, কিম্বা ইউরোপীয় হউক, যে কেহ ইংরেজের শত্রু হইলেই, আমার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৩য়। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসিদিগের যে সকল কুঠি ও সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় ইংরাজদিগের অধিকারে থাকিবে। আমি এই তিন প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে ফরাসিদিগকে কখন অনুমতি দিব না।

৪র্থ। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করাতে ইংরেজ কোম্পানির যে ক্ষতি হয়, তাহার পূরণ জন্য আমি ঐ কোম্পানিকে এক কোটি টাকা দিব।

৫ম। উক্ত আক্রমণে কলিকাতার ইংরেজঅধিবাসীগণের যে ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে ৫০ লক্ষ টাকা দিব।

৬ষ্ঠ। কলিকাতার অন্যান্য অধিবাসীদিগের ক্ষতি পূরণ জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবে।

৭ম। কলিকাতার আরমানিদিগের ক্ষতি পূরণ জন্য ৭ লক্ষ টাকা দিব। এই সমস্ত টাকা দেওয়ার ভার ওয়াট্‌স, ক্লাইব, ড্রেক, ওয়াট্‌সন, কিলপাট্রিক ও বেচার সাহেবের উপর থাকিবে।

৮ম। কলিকাতার প্রান্তভাগে যে মহারাষ্ট্র খাত আছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ এবং ঐ খাতের বহিঃস্থ ৬০০ গজ পরিমিত ভূমি ইংরেজ কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত হইবে।

৯ম। কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ, ইংরেজ-কোম্পানির জমিদারির অন্তর্গত হইবে। অন্যান্য জমিদারেরা যে নিয়মে কর দেন, ইংরেজ কোম্পানিকেও সেই নিয়মে কর দিতে হইবে।

১০। ইংরেজ আমার সাহায্যের জন্য যে সৈন্য পাঠাইবেন, আমি তাহার খরচ যোগাইব।

১১। হুগলির দক্ষিণ গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর তটে আমি কোন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিব না।

১২। উপরে টাকা দেওয়ার সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব হইয়াছে, আমি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকার পাইয়াই তৎসমুদায় কার্য্যে পরিণত করিব।

মীরজাফর নবাব হইলে, প্রথমে যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা এইরূপে স্থির হয়। ওয়াট্‌স সাহেব কলিকাতা হইতে এই সন্ধি-লিপি প্রাপ্ত হইয়া মীরজাফরের এজেন্টের হস্তে সমর্পণ করেন। এজেন্ট পলাশিতে যাইয়া উহা আবার মীরজাফরকে দেখান। ইহার দুই দিন পরে, এই এজেন্ট মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইয়া ওয়াট্‌স সাহেবকে কহেন, যে, "মীরজাফর সন্ধিপত্রের সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছেন; কিন্তু এই বিষয় উমিচাঁদের গোচর করা তাঁহার অভিপ্রেত নয়, যেহেতু তিনি উমিচাঁদের উপর কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না।"

সন্ধিপত্র পারস্য ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। উহার দ্বাদশ ধারার পর মীরজাফর এই বলিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করেন, যে,—"আমি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রেরিতের নামে শপথ করিতেছি, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন সন্ধির নিয়ম সকল প্রতিপালনে কখনও ঔদাসীন্য দেখাইব না।" ইহার পর ত্রয়োদশ ধারায় ওয়াট্‌সন, ড্রেক, কর্ণেল ক্লাইব, ওয়াট্‌স, কিলপাট্রিক ও বেচার সাহেব নিম্নলিখিত ভাবে আপনাদের নাম স্বাক্ষর করেন—"মীর-জাফর খাঁ সন্ধিপত্রের উল্লিখিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবেন, এই সর্ত্তে আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের নিকট শপথ করিতেছি, যে, মীরজাফর খাঁ বাহাদুরকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার করিতে যথোচিত সহায়তা করিব, এবং তাঁহাকে সমস্ত শত্রুর আক্র-মণ হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিব।" এইরূপে ত্রয়োদশ ধারাপূর্ণ এই ঘৃণিত সন্ধিপত্র মীরজাফর ও ইংরেজদিগের মধ্যে বিধিবদ্ধ হয়, এইরূপে মীরজাফর ও ক্লাইব-প্রমুখ ইংরেজগণ হতভাগ্য সিরাজের সর্ব্বনাশ ঘটাইবার সূত্রপাত করেন।

উল্লিখিত সন্ধিপত্রে মীরজাফর কলিকাতার ইংরেজদিগকে যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহাতেও ক্লাইব প্রভৃতির দুর্নিবার লালসা চরিতার্থ হয় নাই। ইংরেজ সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে অর্থ দেওয়ার সম্বন্ধে আর একখানি অঙ্গীকার পত্র প্রস্তুত হয়। এই অঙ্গীকার পত্রে পর পৃষ্ঠায় লিখিত ব্যক্তিদিগকে পার্শ্বের লিখিত মত টাকা দিবার কথা থাকে,—

কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেব	২,৮০,০০০ টাকা
কর্ণেল ক্লাইব	২,৮০,০০০ ,,
ওয়াট্‌স সাহেব	২,৪০,০০০ ,,
কর্ণেল কিল্‌পাট্রিক	২,৪০,০০০ ,,
মানিংহাম সাহেব	২,৪০,০০০ ,,
বেচার সাহেব	২,৪০,০০০ ,,
	১৫,২০,০০০ টাকা।*

মীরজাফর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য লাভ মানসে, এইরূপে ইংরেজদিগের ভোগ-লালসার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ওয়াট্‌স সাহেব যখন তাঁহার সম্মুখে সন্ধিপত্র উপস্থিত করেন, তখন তিনি আপনাদের চির-পবিত্র কোরাণ মাথায় লইয়া, এবং আপনার পুত্রের হস্তে দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করিয়া, গম্ভীর ভাবে এই অঙ্গীকার করেন, যে, ইংরেজগণ যখন নবাবের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি ইংরেজদিগের সহযোগী হইতে

* এতদ্ব্যতীত ক্লাইব প্রভৃতিকে আরও অনেক টাকা দিবার কথা হয়। অতি গোপনে এই বিষয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যদিও সন্ধি সংক্রান্ত কোন প্রকাশ্য কাগজে এ বিষয়ের উল্লেখ ছিল না তথাপি নিম্নলিখিত ব্যক্তি-দিগকে, স্বতন্ত্রভাবে পার্শ্বের লিখিত মত টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়,—

কর্ণেল ক্লাইব	১৬,০০,০০০ টাকা
ওয়াট্‌স সাহেব	৮,০০,০০০ ,,
কর্ণেল কিলপাট্রিক	৩,০০,০০০ ,,
কলিকাতার ইংরেজ কৌন্সি-লের ৬ জন সদস্য, প্রত্যেক ১ লক্ষ করিয়া	৬,০০,০০০ ,,
ক্লাইবের সেক্রেটরি ওয়াল্‌স সাহেব ...	৫,০০,০০০ ,,
স্ক্রাফ্‌টন সাহেব	২,০০,০০০ ,,
লসিংটন সাহেব	৫০,০০০ ,,
৩৯ গণিত পদাতিক দলের অধ্যক্ষ মেজর গ্রাণ্ট	১০০,০০০ ,,

এতদ্ব্যতীত সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে যে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয়, তাহার অংশস্বরূপ ক্লাইব ২,০০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। এই বিলুণ্ঠন কার্য্যে ক্লাইবের ২০,৮০,০০০ টাকা লাভ হয়। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, সে সময়ে টাকার মূল্য বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা অধিক ছিল।

সঙ্কুচিত হইবেন না। ইংরেজেরা যদি সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেমন আক্রমণ করিবেন অমনি তিনি নবাবকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিবেন। চতুরে চতুরে মিলন হইল। বিশ্বাসঘাতকতার সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা স্থান পরিগ্রহ করিল। অর্থের অপার মহিমায়, অনন্ত ভোগতৃষ্ণায় ধর্ম্ম ন্যায়পরতা সমস্ত অন্তর্দ্ধান করিল। ঘোরতর অবিচার—কলঙ্কের অসীম কালিমার মধ্যে বঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে, মীরজাফর উপস্থিত ষড়যন্ত্রের বিষয় উমিচাঁদের নিকট গোপন রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, উমিচাঁদের সহিত ইংরেজদিগের ঘনিষ্ঠতা আছে, উমিচাঁদ অনেক সময়ে ইংরেজদিগের অনেক উপকার করিয়াছেন। এখন যদি তিনি এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারেন, তাহা হইলে, তাহাকেও অনেক টাকা দিয়া বশীভূত করিতে হইবে। মীরজাফর এই আশঙ্কাতেই সমস্ত বিষয় উমিচাঁদের অবিদিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মীরজাফরের এই অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করা ওয়াট্‌স সাহেবের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। উমিচাঁদ ওয়াট্‌স সাহেবের বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে ওয়াট্‌স সাহেবের অনেক সহায়তা করেন।

ওয়াট্‌স সাহেবের বিশ্বাস ছিল, যে, উপস্থিত ষড়যন্ত্রের বিষয় যথাসময়ে তাঁহার বিশ্বস্তপাত্রের গোচর করা হইবে; কিন্তু মীরজাফরের দূত পলাশি হইতে প্রত্যাগত হইলে ওয়াটস সাহেবের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। এখন হইতে ওয়াট্‌স সাহেব উমিচাঁদের নিকট অনেক কথা চাপিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে উমিচাঁদের সন্দেহ বাড়িয়া উঠে। উমিচাঁদ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, মীরজাফরের সহিত ইংরেজদিগের কোন গুরুতর ও গোপনীয় বিষয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে। সন্দেহের আবেগে, এখন তিনি ওয়াট্‌স সাহেবকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ইতিহাস-লেখক অর্ম্ম সাহেব উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যে কথিত আছে, উমিচাঁদ এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, যদি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করা না হয়, তাহা হইলে তিনি নবাবকে ষড়যন্ত্রের কথা জানাইবেন। অন্যান্য ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ অর্ম্ম সাহেবের এই বাক্যই অতিরঞ্জিত করিয়া পবিত্র ইতিহাসে আপনাদের অপূর্ব্ব কল্পনা-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। সর জন মাল্-

কম লিখিয়াছেন, "যখন সমস্ত ঠিক হইয়াছে, তখন উমিচাঁদ ওয়াট্‌স সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহেন, যে, যদি তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিবার বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে, তিনি নবাবের নিকট সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিবেন।" লর্ড মেকলে মাল্‌কমের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছেন,—"উমিচাঁদ ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করিয়াছিলেন।" গ্লিগ্‌ সাহেবের কল্পনাময়ী লেখনী আবার এরূপ অতিরঞ্জন-শক্তির অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিয়াছে। "উমিচাঁদ ওয়াট্‌স সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহেন, যে, যদি তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করা না হয়, তাহা হইলে, তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে সমস্ত বিষয় জানাইবেন, এবং সমস্ত ইংরেজ ও এতদ্দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীকে ঘটনাস্থলে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিবেন *।"

ইংরেজ-ঐতিহাসিকগণের এই সকল বাক্য নিরবচ্ছিন্ন জনশ্রুতিমূলক। এই বাক্যের কোন পরিপোষক প্রমাণ অদ্যাপ পাওয়া যায় নাই। মাল্‌কম, মেকলে প্রভৃতি সকলে অর্ম সাহেবের 'কথিত আছে' বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, আপনাদের এই রূপ অতিরঞ্জন-শক্তি ও কল্পনা-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। উমিচাঁদ নবাবের নিকট ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিবেন বলিয়া যে, সকলকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কেহ কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। সে সময়ে উমিচাঁদের চরিত্র কলঙ্কিত করিতেই সকলে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। টাকা না পাইলে, পাছে উমিচাঁদ সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়াও সে সময়ে কলিকাতায় ইংরেজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অলীক দোষের আরোপ করেন। অর্ম সাহেব অন্য প্রমাণাভাবে কেবল "কথিত আছে" বলিয়াই, উমিচাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন পূর্ব্বক ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিতে যত্নশীল হন। মাল্‌কম এই অর্ম সাহেবেরই "কথিত আছে" কথার অনুসরণ করিয়া, উক্ত অভিযোগটি পল্লবিত করিয়া তুলেন, আর মেকলে ও গ্লিগ্‌ মাল্‌কমের পরিপোষক হইয়া আপনাদের রসময়ী লেখনীর বলে জগতের সমক্ষে অপূর্ব্ব কল্পনা-বিভ্রম প্রদর্শন করেন। বস্তুত উমিচাঁদ ওয়াট্‌স সাহেবকে কোনরূপে ভয় দেখান নাই। তিনি ইংরেজদিগের যেরূপ সপক্ষতা করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারে না।

* *Malleson,* Lord Clive, P. 229—230.

সে সময়ে উমিচাঁদ হইতে ইংরেজদিগের অনেক উপকার হইয়াছিল। উমিচাঁদ ইংরেজদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজগণ শেষে আপনাদের এই উপকারীর নিকট সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাই। ইংরেজের অসীম চাতুরি বলে ও অনন্ত কৌশলেই, শেষে উমিচাঁদ প্রতারিত ও ভগ্নহৃদয় হইয়া দুর্দ্দশার একশেষ ভূগিতে থাকেন। এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ-ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, যে, উমিচাঁদ সে সময়ে ইংরেজদিগের যে অসীম উপকার করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, যে, ইংরেজেরা উমিচাঁদকে বিশেষ পারিতোষিক না দিয়া যার পর নাই আপনাদের অসাধুতা, অকৃতজ্ঞতা ও দুর্নীতির পরিচয় দিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে তাঁহাদের আচরণেই উমিচাঁদ ভগ্নহৃদয় হন। টাকা না পাইলে তাঁহার অসন্তোষ জন্মিত কিন্তু তিনি কখনও ওয়াট্‌স সাহেবকে ভয় দেখান নাই, যথোচিত অর্থ না পাইলে নবাবকে ষড়যন্ত্রের বিষয় জানাইবেন, ইহা কখনও ওয়াট্‌স সাহেবকে বলেন নাই। উমিচাঁদের জাতির এবং উমিচাঁদের শ্রেণীর কোন হিন্দু কখনও এরূপ করেন না। *

এই ইংরেজ-লেখক ইহার পর লিখিয়াছেন,যে, কলিকাতার গুপ্ত সমিতির আচরণ ও ষড়যন্ত্রমূলক ঘৃণিত সন্ধির বিষয় পড়িয়া কোন ইংরেজ বোধ হয় লজ্জার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। ইংরেজগণ যখন উমিচাঁদকে অর্থ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা আপনাদের মধ্যে অনেক টাকা ভাগাভাগি করিয়া লইবার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহাদের ধন-তৃষ্ণা ও তাঁহাদের নীচাশয়তা কেবল ইহাতেই শেষ হয় নাই। ওয়াট্‌স সাহেব একজন বিশ্বস্ত দূত দ্বারা ক্লাইবের নিকট একখানি পত্র পাঠাইলেন, পত্রে উমিচাঁদের বিষয় উল্লেখ থাকিল। ক্লাইব এই পত্র পাইয়া ওয়াট্‌স সাহেবকে লিখিলেন, যে, ওয়াট্‌সন ও সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ সকলেই উমিচাঁদের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতেছেন,সকলেরই ধারণা জন্মিয়াছে, যে,—উমিচাঁদ ঘোর দুর্ব্বৃত্ত ও নীচাশয়, এরূ দুর্ব্বৃত্ত নীচাশয়ের সমুচিত শিক্ষা হওয়া উচিত; † অতঃপর ক্লাইব দুইখান অঙ্গীকার পত্র প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার মতে এই স্থির হয় যে, প্রকৃত অঙ্গীকার পত্রে উমিচাঁদকে অর্থ দেওয়ার সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত হইবে না, কিন্তু যে খানি অলীক,

---

* *Malleson*, Lord Clive, P. 232—233.

† *Malleson*, Lord Clive, P. 233 234.

তাহাতে লেখা থাকিবে,—কার্য্য সিদ্ধ হইলে উমিচাঁদ ৩০লক্ষ টাকা পাইবেন উভয় অঙ্গীকার পত্রেই মীরজাফর, ওয়াট্‌সন, ক্লাইব ও কলিকাতাস্থ সমিতির অন্যান্য সদস্যগণের স্বাক্ষর থাকিবে বলিয়া বন্দোবস্ত হয়। ক্লাইব এইরূপ নীচাশয়তার পরিচয় দিয়া, আপনাদের স্বার্থসাধনের উপায় স্থির করেন, কিন্তু এই স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে প্রথম একটি অচিন্ত্যনীয় অন্তরায় উপস্থিত হয়। রণ-তরীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌সন সাহেব প্রথম হইতেই ক্লাইবের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, এখন তিনি অলীক অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হন। ক্লাইব স্পষ্ট জানিতেন, যে অঙ্গীকার পত্রে ওয়াট্‌সনের স্বাক্ষর না দেখিলে, উমিচাঁদের সন্দেহ বাড়িয়া উঠিবে সুতরাং প্রথমে তিনি কিছু চিন্তিত হইলেন ; কিন্তু এই চিন্তা দীর্ঘ কাল থাকিল না। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। যে কোন প্রকারেই হউক, এখন আপনাদের স্বার্থ সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপর কলঙ্কময় উপায় স্থির হইল। লিখিতে লজ্জা হয়, ক্লাইব অলীক অঙ্গীকার পত্রে ওয়াটসনের নাম জাল করিলেন।

ক্লাইব স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে একজন অর্থগৃধ্নু লোককে হতাশ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইংরেজ ও মীরজাফরের মধ্যে যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হয়, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সে সময়ে আরও অনেক অর্থগৃধ্নু লোক ছিল, ক্লাইব ইঁহাদিগকে হতাশ করিবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। ইংরেজেরা যখন নবাবের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় অর্থলালসা যখন বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহারা কেবল উমিচাঁদকে লক্ষ্য করিয়াই দুরন্ত লোভের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হন, এবং সেই লোভী ব্যক্তিকে যথোচিত শাস্তি দিয়া আপনাদিগের লোভশূন্যতা প্রকাশ করেন। তাঁহারা জগতের সমক্ষে এইরূপ ধার্ম্মিকতার ভাণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এইরূপ কলঙ্কের গভীর কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ক্লাইব আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সভ্য জগতের নিকট তাহা কখনও আদরণীয় হইবে না। লোভের কুহকে পড়িয়া, দুরাশার দাস হইয়া, তিনি যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, জগতের সমক্ষে অনন্তকাল তাহা বিদ্যমান করিবে—অনন্তকাল এই পাপময় চিত্র ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

সত্য।

মনেই হউক, অথবা মুখেই হউক, সকলেই সত্যের অত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই ঈশ্বর। মনু যে দশবিধ ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সত্যও একটি।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচং ইন্দ্রিয় নিগ্রহং।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্য মক্রোধঃ দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।"

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ঈশ্বরের প্রধান লক্ষণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং।" যে সত্য কহে, বা সত্য কার্য্য করে, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সেই সৎ। রামায়ণে আছে,—

সত্যমেক পদং ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ, সত্যেনাবাপ্যতে পরং॥"

অর্থাৎ "ব্রহ্ম সত্য ভিন্ন আর কিছু নহেন। ধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। অক্ষয় বেদ সমস্ত সত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল সত্য দ্বারাই ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়।" মনু মিথ্যাবাদীর শাস্তির স্থলে লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, মিত্রদ্রোহ, কৃতঘ্নতা প্রভৃতিতে যেরূপ পাতক হয় মিথ্যা কথাতেও সেইরূপ পাতক হইয়া থাকে। সমস্ত জীবনে যে পুণ্য সঞ্চিত হয় মিথ্যা কথা দ্বারা সে সমস্ত বিনষ্ট হয়।" অন্য অন্য জাতির মধ্যেও এরূপ সত্যের আদর দেখিতে পাওয়া যায়। থ্যাকারে এক স্থলে বলিয়াছেন "আমার পুস্তকে সত্য কথা আছে। যদি আমার পুস্তকে তাহা না থাকে তবে উহাতে কিছুই নাই।" ফলত কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান সকলেই সত্যের অনুরাগী, এবং ইহারা সকলেই সত্যকে ধর্ম্মমূল বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

কিন্তু সত্য কি? সত্য কাহাকে বলে? সংস্কৃতে সত্যের যে কয়টি প্রতিশব্দ আছে, আমরা এক একটি করিয়া সে গুলির আলোচনা করিতেছি।

১ম। সত্য। যাহা চিরকাল আছে ও যাহা চিরকাল থাকিবে, তাহাই সত্য। অস্ ধাতু হইতে সত্য উৎপন্ন হইয়াছে। এবং সত্যের অর্থ স্থায়ী। যাহা চিরকাল আছে ও যাহা চিরকাল থাকিবে যাহা নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়,—তাহাই পূর্ণসত্য। যে বস্তু, যে পরিমাণে স্থায়ী সে বস্তু সেই পরিমাণে সত্য। মিথ্যাবাদী মিথ্যাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য কত কৌশল অবলম্বন করে, কত পরিশ্রম স্বীকার করে, কিন্তু তথাপি মিথ্যা কথা অল্পকালের মধ্যেই জগতে মিথ্যা বলিয়া ব্যক্ত হয়। আর যিনি সত্যবাদী তিনি কোন পরিশ্রম স্বীকার করেন না; কোন কূটতর্ক উত্থাপন করেন না, কোন বাগ্জাল বিস্তার করেন না, অথচ তাঁহার কথা উচ্চারিত হইবা মাত্রই উহা জগতে সর্ব্বত্র

আদৃত ও পূজিত হয়, উহা চিরস্থায়ী হইয়া চিরকাল নিজের প্রভাব বিস্তার করে। ঈশ্বর সত্য, কেন না, তিনি নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। সংসার অর্থাৎ ধন,মান, প্রভৃতি অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল, এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে সংসারকে মিথ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সত্যত্ব অথবা নিত্যত্বের তারতম্য অনুসারে সৃষ্ট-বস্তুর উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারিত হয়। পৃথিবী সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, কারণ ইহাতে পাঁচটি গুণ বিদ্যমান থাকাতে ইহা সর্ব্বাগ্রে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী অপেক্ষা জল শ্রেষ্ঠ। কারণ জলে চারিটি গুণ বর্ত্তমান আছে। এবং এই কারণেই পৃথিবীর বিনাশের পরেও জল বর্ত্তমান থাকিতে পারে। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি গুণের মধ্যে গন্ধটি বিনষ্ট হইলেও শব্দ স্পর্শ রূপ রস, বিদ্যমান থাকিবে। অর্থাৎ পৃথিবীর বিনাশ সাধন হইলেও জলের অস্তিত্ব থাকিবে। এইরূপে চতুর্গুণ বিশিষ্ট জলের একটি গুণ (রস) বিনষ্ট হইলেও ত্রিগুণ বিশিষ্ট (শব্দ স্পর্শ-রূপ) অগ্নি বিদ্যমান থাকিবে। এইরূপে ত্রিগুণ বিশিষ্ট অগ্নির একটি গুণ (রূপ) বিনষ্ট হইলেও দ্বিগুণ বিশিষ্ট (শব্দ-স্পর্শ) বায়ু অবশিষ্ট থাকিবে। আবার বায়ুর একটি গুণ (স্পর্শ) বিনষ্ট হইলেও একগুণ বিশিষ্ট (শব্দ) আকাশ বিদ্যমান থাকিবে। শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশ বিনষ্ট হইলেও ঈশ্বরের কার্য্য-শক্তি অথবা ক্রিয়াশক্তি অবশিষ্ট থাকিবে। কারণ কার্য্যের বিনাশ হইলেই ক্রিয়াশক্তির বিনাশ হয় না। ক্রিয়াশক্তি বিনষ্ট হইলেও ইচ্ছাশক্তি অবশিষ্ট থাকিবে। এবং ইচ্ছাশক্তি বিনষ্ট হইলেও সর্ব্বকারণ কারণ ঈশ্বর অবশিষ্ট থাকিবেন। আমরা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিম্নে তালিকা করিয়া দেখাইতেছি।

১। ঈশ্বর (নিত্য অতএব পূর্ণ সত্য)
|
(মহত্তত্ত্ব) ২ (ঈশ্বরের) ইচ্ছাশক্তি (ঈশ্বর অপেক্ষা অসত্য কিন্তু, অন্য সমস্ত বস্তু হইতে সত্য)
|
(অহংতত্ত্ব)৩। (ঈশ্বরের) ক্রিয়াশক্তি (ইচ্ছাশক্তি হইতে অসত্য, কিন্তু অন্য সমস্ত বস্তু হইতে সত্য)
|
৪। আকাশ (শব্দ) (ঐরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে)
|
৫। বায়ু (শব্দ + স্পর্শ) ঐ
|
৬। অগ্নি (শব্দ + স্পর্শ + রূপ) ঐ
|
৭। জল (শব্দ + স্পর্শ + রূপ + রস) ঐ
|
৭। পৃথিবী (শব্দ + স্পর্শ + রূপ + রস + গন্ধ) ঐ

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এত কঠিন, ও ইহার অর্থবোধ করা এত দুরূহ ব্যাপার,যে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। এই বিস্তৃত বর্ণনা এখানে না করিলেও চলিত। আশা করি, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায় অনুসারে পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা অসত্য ও পরিবর্ত্তনীয়, এবং ঈশ্বর পূর্ণ সত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। ধাত্বর্থ অনুসারে সত্যের অর্থ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। ইংরাজ-দার্শনিকেরাও সত্যের এই অর্থই করিয়াছেন। মিল বলেন ("The uniformity of experienee is the test of truth." অর্থাৎ) "যাহা চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি তাহাই সত্য।" স্পেন্‌সর ও লিউইস বলেন—("The unthinkableness of the negative is the test of truth." অর্থাৎ) "যাহার বিনাশ বা পরিবর্ত্তন কল্পনাতে চিন্তা করা যায় না, তাহাই সত্য। এই দুইটি মতের সমন্বয় করিলে দাঁড়ায়, এই যে, "যাহা চিরকাল আছে, ও চিরকাল থাকিবে বলিয়া আমরা অটলভাবে বিশ্বাস করি, তাহা সত্য।" সংস্কৃত অনুসারেও দেখান হইয়াছে, যে, "যাহা চিরকাল আছে ও যাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব তাহাই সত্য।"

সত্য কথাই স্থায়ী হইবে, মিথ্যা কথা স্থায়ী হইবে না, এ বিশ্বাস আমাদের সকলেরই মনে নিতান্ত জাগরূক থাকে। এজন্য যখনই আমরা কোন মিথ্যা কথা বলি, তখনই বাক্যের ছড়াছড়ি, শব্দের গড়াগড়ি পড়িয়া যায়। আমাদের নিজেরই মনে মনে ভয় থাকে, যে এ মিথ্যা কথা বুঝি টিকিবে না। এজন্য আমরা অলঙ্কার, সমাসচ্ছটা প্রভৃতির সাহায্যে অস্থায়ী মিথ্যাকে স্থায়ী সত্য করিতে চাই। ভারতচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।" যে সত্যবাদী তাহাকে বিস্তর কথা কহিতে হয় না। কারণ, সে জানে যে সত্য নিজ গুণেই জগতে আদৃত হইবে। যে কুরূপা তাহার কুরূপ আবরণ করিবার জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন হয়। যে সুরূপা তাহার অলঙ্কারের প্রয়োজন কি?

যিনিই যত বড় কৌশলময় হউন না কেন, কেহই মিথ্যাকে চিরস্থায়ী করিতে পারেন না। যাহা মিথ্যা তাহা অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥

সর্ব্বকালে রজনী দিবস নাহি হয়।
মিথ্যা মিশ্রণ সত্য সম লোকে খ্যাত হয়॥

হে কৌশলময় ধূর্ত্ত! শিক্ষা লাভ কর। "সর্ব্বকালে রজনী দিবস নাহি হয়।" ঝাড় লণ্ঠন গ্যাস, ইলেক্ট্রিক বাতি জ্বালাও, তাই রাত্রি কখন দিন হইবে না। মিথ্যাকে সত্যের গিল্টি দিয়া দুই দিনের জন্য সাজাইতে পার, কিন্তু সত্যের গিল্টটুকু ধুইয়া গেলেই মিথ্যা নিজরূপ প্রকাশ করিবে। আর ইহাও মনে রাখিও, যে, যে যত কৌশল অবলম্বন করিবে, লোকে তাহাকে তত অধিক ঘৃণা করিবে। সর্ব্বদা ইহাও মনে রাখিও, যে সত্যই নিত্য ও চিরস্থায়ী মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী ও জলবুদ্বুদের ন্যায় নশ্বর। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" অর্থাৎ "অসত্যের বিনাশ নিশ্চয়। সত্যের বিনাশ অসম্ভব।"

২য়। সত্যের আর এক নাম তথ্য। অর্থাৎ যে বস্তু বাহিরে এক প্রকারে, ও আমাদের অন্তরে আর এক প্রকারে উপস্থিত না হয় সেই বস্তু সত্য। যদি সর্প সর্পের আকারে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তবে উহা সত্য সর্প। আর যদি সর্প রজ্জুর ন্যায় আমাদিগের নিকট অনুভূত হয়, তবে উহা মিথ্যা সর্প। মরীচিকা মিথ্যা, কারণ উহা প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্য্যকিরণ হইলেও আমাদের নিকট জলের আকারে প্রকাশিত হয়। যতক্ষণ কোন বস্তু রূপান্তর পরিগ্রহ না করিয়া, উহার স্বাভাবিক ও প্রকৃত আকারে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয় ততক্ষণ উহা সত্য। তথ্য শব্দের ধাত্বর্থ দ্বারাও এইরূপ বুঝা যায়, যে বস্তুটি যাহা, ঠিক সেই ভাবেই ইহা আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে সুতরাং "ইহা তাহাই" ("It in that.") তত্ত্ব শব্দেরও ধাত্বর্থ এইরূপ। যে বস্তুটি যাহা, সেই বস্তুটিকে ঠিক সেইরূপে জানিতে পারিলেই তাহার তত্ত্ব লাভ করা হইল। পতঞ্জলি, সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের এইরূপই লক্ষণ করিয়াছেন "মনোবৃত্তি সকল, অবলম্বিত বস্তুর অবিকল সদৃশ উৎপন্ন হইলে উহা প্রমাণ বা সত্যজ্ঞান বলিয়া গণনীয়। আর বিপরীত ভাবে উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ বস্তু এক প্রকার ও মনোবৃত্তি অন্য প্রকার হইলে তাহা ভ্রম, বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া স্বীকার্য্য।"* লিউইস্, স্পেন্সর প্রভৃতি ইংরেজি-দার্শনিকেরাও সত্যের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "Truth is the correspondence, between the order of ideas

* পূজ্যপাদ কালিবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ব্যাখ্যা।

[Subjctive] and the order of phenomena [objective]") অর্থাৎ "বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের মনোবৃত্তি অথবা ধারণার যে সাদৃশ্য তাহার নাম সত্য।" যে বস্তু প্রকৃতরূপে আমাদিগের কর্তৃক অনুভূত হয়, তাহাই সত্য। বস্তুর বাহ্য রূপের সহিত আমাদিগের মানসিক ধারণায় যে ঐক্য তাহাই সত্য।

সত্য অপরিবর্তনীয় বলিলেও প্রায় এই কথাই বলা হয়। কারণ যে বস্তু যাহা, সে বস্তু যদি ঠিক সেইরূপে আমাদের বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে আর আমাদিগকে ঐবোধের কোনরূপ পরিবর্তন করিতে হয় না। কিন্তু বস্তু যদি স্ব-রূপে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বারম্বার মত পরিবর্তন করিতে হয়।

সত্যের আর এক নাম ঋত। ঋত অর্থে গতিবিশিষ্ট। সত্য ভিন্ন আর কিছুরই গতি নাই। মিথ্যা মৃত পদার্থের ন্যায় নিশ্চল ও নিস্পন্দ। জগতে সত্যই সজীব। গতি অর্থে উন্নতিও বলা যাইতে পারে। ফলত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ উন্নতিই লাভ করা যায় না। রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, চরিত্র-নীতি প্রভৃতি সমস্তই সত্যের সাহায্য অপেক্ষা করে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা অন্য অন্য বিষয়ে সভ্যতার উচ্চ শিখরে অবস্থিত হইলেও, সত্য সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। ভারতে ইংরেজ-শাসন হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মেকলের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, তিনি কৌশলক্রমে হিন্দুদিগকে অহিন্দু করিবার জন্য এদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়াছেন—"বৎস! দেখিও যাহাতে দেশীয়েরা খ্রীষ্টান হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা করিও।" মেকলে বলিলেন—"পিতঃ, আমি এরূপ শিক্ষা-প্রণালী বিস্তার করিবে, যে ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই হিন্দু-নর-নারী অহিন্দু হইবে, এবং তখন তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করা সহজ হইবে।" মনে মনে এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া, মেকলে সংস্কৃতের নিন্দা ও ইংরাজির গৌরব বিস্তার করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে ও আগ্রহেই সংস্কৃত, দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, এবং ইংরাজি শিক্ষা সমস্ত দেশ অধিকার করিল। কিন্তু দেখুন, এই মিথ্যা কি টিকিয়াছে! কিছু কালের জন্য সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ধর্ম লোকের নিকট অবজ্ঞাত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু আবার তাহারা অল্পে অল্পে নিজ গৌরব বিস্তার করিতেছে! যে প্রণালীতে মেকলের "মিথ্যা" কার্য্য

প্রণালী সংশোধিত হইয়াছে, সে প্রণালীও আশ্চর্য্য। প্রথমে কয়েক জন হিন্দু খ্রীষ্টান হইয়াছিল। পরে তেত্রিশ কোটী দেবতার পরিবর্তে এক দেবতা স্থিরীকৃত হইলেন। পরে সেই এক দেবতারও আসন টলিল। লোকে নাস্তিক হইল। নাস্তিকতার অবশ্যম্ভাবী ফল, অবাধ্যতা, ক্রূরতা, কপটতা, নির্দ্দয়তা প্রভৃতি ভীষণ পাপে সমস্ত সমাজ উত্ত্যক্ত ও ব্যথিত হইল। তখন আবার সংস্কৃতের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, আবার জীর্ণ গৃহের পুনঃ সংস্কার আরম্ভ হইল। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজেও গীতা পাঠ হয়। এক্ষণে আবার হরিবোল নামে দিগ্ দিগন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। "আমি হিন্দু" একথা বলিতে আর কেহই লজ্জিত হন না। এইরূপেই বোধ হয়, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মেরও বিলয় হইয়া থাকিবে। বৌদ্ধেরা দেব দেবী মানেন না, পুরাণ মানেন না, কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। এই সকল মতের জন্য, বোধ হয়, সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই বিশৃঙ্খলা দূর করিয়াই হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় সকলের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছে।

ইংরাজ-শাসনে আর এক মিথ্যা এই, যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে বলিয়া থাকেন, যে, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যই ভারতবর্ষ কিন্তু ইহা তাঁহারা নিজেও বিশ্বাস করেন না। গ্ল্যাড্‌ষ্টোন সাহেব একবার ইহার বড় সুন্দর অর্থ করিয়াছিলেন। পার্লেমেণ্টে মিসর যুদ্ধের ব্যয়ভার সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইতেছিল, গ্লাডষ্টোন উঠিয়া বলিলেন 'আমরা ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য শাসন করি। অতএব মিসর যুদ্ধের ব্যয়ভার তাহাদিগকেই বহন করিতে হইবে।" ব্যয়ত ভারতবাসীদিগকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু ঐ মিথ্যা কথা টুকু বলিবার প্রয়োজন কি! উহার কি বিষময় ফল তা যথা দেখুন। যাঁহারা সরল, তাঁহারা ঐ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বৃথা আশায় আপনাদিগকে ও সত্যকে প্রতারিত করিতেছেন। আর যাঁহারা চতুর, তাঁহারা ইংরাজদিগকে চতুর চূড়ামণি চাণক্য বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। রাজা অসন্তোষের সীমা নাই। যে বিষয়েই দেখিবেন, মিথ্যা কথা বলিলে লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতি, উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি ও সজীবতার পরিবর্ত্তে নিশ্চলতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদের সমাজেও সম্প্রতি মিথ্যার সাহায্যে জয়লাভের চেষ্টা হইতেছে। এ চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। রাজনীতিই বলুন, ধর্ম্মনীতিই বলুন, সমাজনীতিই বলুন, কোন নীতিতেই মিথ্যার জয়লাভ হয় না। বঙ্গীয় সংবাদ পত্র মাত্রেই

মুখে রাজভক্তির ভাণ করিয়া থাকেন। অথচ যেরূপ দেশ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে স্বদেশীয় রাজা, বা স্বজাতীয় রাজাই ভক্তিপ্রাপ্ত হন না। দেশমধ্যে, ইংরাজ আসিয়া তূরী ভেরীর নিনাদে ঘোষণা দিয়াছেন, যে, ব্রাহ্মণে,—চণ্ডালে, রাজায়—প্রজায়, পুরুষেও—রমণীতে সমান। তবে আবার প্রজা রাজাকে ভক্তি করিবে কেন? যখন লোকে বিশ্বাস করিত, যে, রাজা দেবতার অংশ, তখন ভক্তির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন আর কি বলিয়া লোকে ভক্তি করে? এতদ্ভিন্ন, এত যে রাজভক্তির কথা লিখিত হয়, ইহা কি কেহ বিশ্বাস করে? ইংরাজেরাও ইহা বিশ্বাস করেন না, এবং বোধ হয়, লেখকেরা নিজেও ইহা বিশ্বাস করেন না। তবে ইহা লিখিয়া লাভ কি? রাজনীতিক্ষেত্রে যাহাই হউক, বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি উভয়ের মধ্যে মিথ্যা আসিয়া প্রবেশ লাভ করিতেছে। একদিন, এক ভট্টাচার্য্য আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। আমি ঐ ভট্টাচার্য্যের নিকট "রঘুনন্দন" পাঠ করিতাম। আমি একদিন সমাজের মঙ্গল সম্বন্ধে ভট্টাচার্য্যের সহিত তর্ক করিতেছিলাম। ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"বাপু, তোমরা যদি সমাজের মঙ্গল চাও, তবে অগ্রে হিন্দু হও, পরে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবে। সন্ধ্যা, আহ্নিক আরম্ভ কর, দেব দেবী পূজা কর, শুদ্ধ শাক্ত হও, পরে সমাজের মঙ্গল করিও।" বাস্তবিকও ভাবিয়া দেখুন, সম্প্রতি যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পোষকরূপে অবতীর্ণ হইতেছেন, তাঁহাদের কথায় সর্ব্বসাধারণে আস্থা প্রদর্শন করে না। করিবেই বা কেন? মুখে মনে এক না হইলেও সত্য হয় না। মুখে বলিলাম, হাতে লিখিলাম, তাহাতে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? যে দিন লোকে দেখিবে, যে, তুমি হরি-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভাবে তুলসীদল দিয়া হরির চরণ বন্দন করিতেছ, সে দিন লোকে তোমায় বিশ্বাস করিবে। দেখ চৈতন্য বক্তৃতা করিতেন না, প্রবন্ধ লিখিতেন না, তথাপি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে বিশ্বাস করিত। তাঁহার সহবাসে লোকে পবিত্র হইত, তিনি যে গ্রামে পদার্পণ করিতেন, সে গ্রাম পুণ্যের ও ধর্ম্মের আলোকে বিভাসিত হইত। কেন হইত? তিনি সত্যময় বলিয়া।

সমাজনীতি সম্বন্ধেও এই কথা। আমরা মুখে জাতিভেদের স্বপক্ষে বক্তৃতা করি, জাতিভেদের স্বপক্ষে উদ্দীপনা-পূর্ণ কবিত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জাতিভেদের কোন নিয়মই প্রতিপালন করি না। লোকে

আমাদের কথায় বিশ্বাস করিবে কেন? আমাদের কথায় লোকে আস্থা করিবে কেন? ঐ যে নিরক্ষর পুরোহিত, উনি যদি হিন্দুর কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে উঁহা দ্বারাও সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইবে। আর আপনি বিদ্যাবাগীশ হইয়া কবিত্বে, দর্শনে, আপনার প্রবন্ধকে সালঙ্কৃত করিলেও আপনার দ্বারা অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইবে না। মনু বলিয়াছেন,—

"সাবিত্রী মাত্রসারোঽপি বরঃ বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ
নাযন্ত্রিত চিত্রবেদোপি সর্ব্বাশী সর্ব্ব বিক্রয়ী।"

অর্থাৎ "যদি কোন ব্রাহ্মণ গায়ত্রীমাত্র জানিয়া সুনিয়মে থাকেন, তাহা হইলে তিনিও শ্রেষ্ঠ। আর যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বাশী ও সর্ব্ববিক্রয়ী, সে যদি ত্রিবেদজ্ঞ হয় তাহা হইলে সেও অবজ্ঞেয়।" অতএব ভাই সকল, যদি ঈশ্বর বাস্তবিকই তোমাদিগকে সুমতি দিয়া থাকেন, যদি বাস্তবিকই তোমরা শ্রুতি স্মৃতির পক্ষপাতী হইয়া থাক, যদি লোক-পাবন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের প্রতি বাস্তবিকই সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আর একটু অগ্রসর হও; শ্রুতি স্মৃত্যাদিত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে দেখিবে, যে, তোমাদের এক কথায় সমাজ পরিবর্ত্তিত ও সমুন্নত হইবে। চৈতন্যদেব একটি সঙ্গীতে সমস্ত ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি গাহিয়াছিলেন,

"বল হরি রাম।
এইরূপে নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম।"

যে এই সঙ্গীত শুনিয়াছিল, সেই উন্মত্ত হইয়া গাহিয়াছিল—

"বল হরি রাম।"

কেন না সকলে বুঝিয়াছিল, যে চৈতন্য সত্যময়। এইরূপে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে সত্য অবলম্বন কর। দেখিবে সমাজের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিছুতেই ভয় করিও না। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিও না। সত্য চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। আর ঈশ্বরও সত্যময়। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ ও অন্যকে বুঝাইতেছ। নিজ নিজ জীবনে সেই সত্যানুসারে অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। অবশ্য, যাঁহারা সত্য নির্দ্ধারণে অক্ষম, তাঁহাদের প্রতি এ সমস্ত কথা প্রযুজ্য নহে। তাঁহাদের উচিত, যে, তাঁহারা নির্জ্জনে, সাবধানে সত্য অন্বেষণ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সর্ব্বাগ্রে মনোমালিন্য দূর করেন। যতদিন সন্দেহ দূরীকৃত না হয়, ততদিন ধৈর্য্য সহকারে সকল বিষয় বিবে-

চনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে, এবং যখন আমরা শিক্ষকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাজকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন আর শুদ্ধ তর্ক ও আলোচনায় আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখা উচিত নহে। জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান আবশ্যক। বিনা অনুষ্ঠানে জ্ঞানের পরিপক্কতা হয় না। আর যখন জ্ঞানের পরিপক্কতা সংসাধিত হয়, তখন বিশ্বাসের দৃঢ়তা হইবেই হইবে, এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে, কার্য্যও আরব্ধ হইবে যতদিন এই কার্য্য আরব্ধ না হয়, ততদিন আমরা ছাত্র। আমাদের ছাত্রত্বের সময় অতীত হইয়াছে, এক্ষণে নিজের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিরূপ অনুষ্ঠান আমাদের সাধ্যায়ত্ত তৎসম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। বোধ হয়, আমাদের সকলের গৃহেই দুই একটি দেবমূর্ত্তি আছে। আসুন না কেন, আমরা সর্ব্বাগ্রে হিন্দু-শাস্ত্র অনুসারে সেইগুলির পূজা অর্চ্চনা আরম্ভ করি। তাহার পরে, যে, জাতিভেদ আমাদের সমাজের প্রধান ভিত্তি ও অবলম্বন, তৎসম্বন্ধে আরও কিছু সাবধান হওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে; অর্থাৎ আমাদের পিতৃ পিতামহেরা যে যে নিয়মে ও যে যে প্রণালীতে জীবনযাপন করিতেন, আসুন না কেন, আমরা সেইগুলির পুনঃপ্রবর্ত্তন করি। সেই পবিত্র মহাত্মাদিগের পদানুসরণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গল হইবে। যদি চিত্তের অন্ধকার ঘুচিয়া থাকে, তবে আসুন, অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিকে কৃতার্থ করি।

বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র।

মোটা কথায় বলা যায়, যে, ইংরাজি-সভ্যতা বহির্মুখ, আর হিন্দু-সভ্যতা অন্তর্মুখ, ইংরাজি সভ্যতা ধনচর্য্যায়, আর হিন্দুসভ্যতা ধর্ম্মচর্য্যায়। অর্থাৎ ধন প্রভৃতি বাহ্যসম্পদ লইয়া ইংরাজি সভ্যতা এবং তাহার উন্নতিতে ইংরাজি সভ্যতার উন্নতি, আর ধর্ম্ম লইয়া হিন্দু সভ্যতা এবং তাহার

উন্নতিতে হিন্দু সভ্যতার উন্নতি। কিন্তু ইংরাজি সভ্যতা বহির্মুখ বা বাহ্য-সম্পদ-মূলক হইলেও তাহা যে একেবারে ধর্ম্মশূন্য এমন কথা বলা যায় না। ইংরাজের খুব ধনসম্পদ আছে সত্য, কিন্তু ইংরাজের ধর্ম্মশাস্ত্রও আছে, ধর্ম্মশিক্ষাও আছে, ধর্ম্ম মন্দিরও আছে, ধর্ম্মযাজকও আছে। ইংরাজের বৈষয়িক ভাব ও বিষয়াসক্তি প্রবল হইলেও তাহাদের অসীম মানসিক শক্তি আছে। ইদানীন্তন কালে হব্‌স্, হিউম, লক, বর্কলি, মিল বা হর্বর্ট স্পেন্সরের অপেক্ষা মানসিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ কোন দেশে যে বড় বেশি জন্মিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। ইংরাজের মধ্যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবও আছে। যতদূর জানিয়াছি তাহাতে বোধ হয়, যে, ইংরাজের মধ্যে যথার্থই ঋষিতুল্য মানুষ আছেন—অন্তরে সদাই ঈশ্বরচিন্তা, বাহিরে সদাই সদাচার সদাই পরোপকার, প্রেমিক, সাত্ত্বিক, নম্র, নির্বিকার, শান্ত, শুদ্ধাচার। তথাপি ইংরাজি-সভ্যতা বহির্ম্মুখ, ইংরাজের ধনচর্য্যাই বেশি, ধর্ম্মচর্য্যা বড়ই কম। এত দার্শনিক, এত ধর্ম্মযাজক, এত ধর্ম্মমন্দির, খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির ন্যায় এমন সুন্দর ধর্ম্মনীতি,—থাকিতেও ইংরাজ প্রধানত পৃথিবী লইয়াই ব্যস্ত, ইংরাজের ধর্ম্মচর্য্যা নাই বলিলেই হয়। ইংলণ্ডে যাঁহারা ধর্ম্মভাব ও মানসিক শক্তি-সম্পন্ন তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এবং মানসিক শক্তি বড়ই বেশি এবং উচ্চদরের। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বড় বেশি নয় এবং তাঁহারা প্রায়ই কিছু উচ্চ শ্রেণীর লোক। ইংলণ্ডের লোক-সাধারণ এবং নিম্নশ্রেণীর লোক বড়ই বুদ্ধিহীন, ধর্ম্মহীন ও দুরাচার। ভাল ভাল ইংরাজ-লেখকেরাই একথা বলিয়া থাকেন, এবং সম্প্রতি একজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালি ইংলণ্ড দেখিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

"ইতর শ্রেণীর লোকের অক্ষর পরিচয় আছে। সাধারণ সংবাদপত্রও পড়ে। কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় নীচ ও ভয়ানক প্রকৃতির লোক মনুষ্য-শ্রেণীর মধ্যে নাই। ইহাদিগকে দ্বিপদ পশু বলিলেও হয়। ধর্ম্ম যে কাহাকে বলে, ইহারা তাহা জানে না। সেণ্টজাইল্‌সে ইহাদিগের স্ত্রীপুরুষগণকে সন্ধ্যাকালে দেখিয়া আসিয়াছি। তাহারা মদ্যপান করিয়া কলহ চীৎকার করত পথিকগণের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। এখানে পথিকগণের নির্ব্বিঘ্নে ভ্রমণের সাধ্য নাই। তাহাদিগকে পুলিশের শাসনের ক্ষমতা নাই। এই সকল মনুষ্যের আকার অতি ভয়ানক। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এতাদৃশ ইতর শ্রেণীর লোকের উৎপাত নাই। এই সকল লোকে ভারতবর্ষীয়দিগের

প্রতি অসভ্যতা প্রকাশ করে। কখন 'ব্ল্যাকি' বলে, কখন বা তাহাদের সেই বানর অপেক্ষা কুৎসিৎ মুখ বিকৃত করিয়া দেখায়। এরূপ মনুষ্যনামধারী পশু আর কুত্রাপি দেখা যায় না।"*

ইহার অপেক্ষাও ভীষণ বর্ণনা ইংরাজ-লেখকদিগের সংবাদ পত্রে ও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলত ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর ন্যায় এককালে পশুবৎ ও রাক্ষসবৎ মানুষ পৃথিবীর সভ্যদেশের মধ্যে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। ইংরাজের ন্যায় হিন্দুদিগের বাহ্যসম্পদ নাই, ব্যবসায় বণিজ্য, কারবার কারখানা রেলরোড টেলিগ্রাপ প্রভৃতি নাই। কিন্তু ইংরাজের অপেক্ষা হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ও চরিত্রোৎকর্ষ আছে। এ কথাটি একটু বিশেষ অর্থে বুঝিতে হইবে। ইংলণ্ডের শিক্ষিত এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর লোকের ধর্ম্মজ্ঞান এবং চরিত্রোৎকর্ষ আছে, কিন্তু অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোক নিতান্তই ধর্ম্মহীন ও অসচ্চরিত্র। হিন্দুর মধ্যে, কি শিক্ষিত এবং শ্রেষ্ঠশ্রেণীর লোক, কি অশিক্ষিত এবং নিম্নশ্রেণীর লোক—সকলেরই ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ আছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর যত ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ আছে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর তত নাই সত্য তত থাকাও সম্ভব নয়। ধর্ম্মচর্য্যা অর্থ ও অবসর সাপেক্ষ। নিম্নশ্রেণীর লোকের সে দুয়েরই অভাব। অতএব উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর যত, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর তত ধর্ম্মচর্য্যা বা চরিত্রোৎকর্ষ নাই। না থাকিলেও একথা ঠিক যে, নিম্নশ্রেণীর ইংরাজের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ অনেকগুণে বেশি এবং একথাও ঠিক যে ধর্ম্মজ্ঞান ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যত সৌসাদৃশ্য ও সমত্ব আছে, উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ এবং নিম্নশ্রেণীর ইংরাজের মধ্যে তাহার এক শতাংশও নাই। ধর্ম্ম এবং চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ এবং নিম্নশ্রেণীর ইংরাজ-দুইটি অতি ভিন্ন জাতীয় লোক, সভ্যতায় দুইটি অতি বিসদৃশ স্তরের লোক এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি বা অযথা উক্তি হয় না। ইংরাজ-জাতির শ্রেণী সকলের মধ্যে ধর্ম্মচর্য্যা ও চরিত্র সম্বন্ধে বড়ই পার্থক্য, বড়ই বিসদৃশ্য, বড়ই heterogeneity দৃষ্ট হয়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ধর্ম্মচর্য্যা ও চরিত্র-সম্বন্ধে শিক্ষা ও অবস্থার বিভিন্নতা বশত যতটুকু পার্থক্য বা বিভিন্নতা

* নব্যভারত, তৃতীয় খণ্ড, নবম সংখ্যা—'বাঙ্গালির ইউরোপ দর্শন' নামক প্রবন্ধ। আবশ্যক বলিয়া কিছু কিছু বদলাইয়া উদ্ধৃত করিলাম।

ঘটিতে পারে, তদপেক্ষা বেশি পার্থক্য বা বিভিন্নতা নাই। এ বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এক জাতীয় এবং সভ্যতার একই স্তরের লোক। সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ধর্ম্মচর্য্যা, ধর্ম্মজ্ঞান ও চরিত্র সম্বন্ধে ঐক্য বড়ই বেশি, সৌসাদৃশ্য বড়ই বেশি homogeniety বড়ই বেশি, বড়ই অপূর্ব্ব। ইংলণ্ডের শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কথা বেশ ভাল রকম জানে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর লোকে যীশু খৃষ্টের নাম পর্য্যন্ত জানে না। একবার একখানি ইংরাজি সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম,—একজন ইংরাজ ধর্ম্মযাজক ইংলণ্ডের একটি কয়লার খনির ভিতর প্রবেশ করিয়া তথায় যে সকল মজুর খাটিতেছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমরা যীশু খৃষ্টকে জান? তাহারা আপনারা বারকতক গীয়ু খৃষ্ট, ঝীশু খষ্ট প্রভৃতি নানা রকম বিকৃত আকারে যীশুখৃষ্টের নাম উচ্চারণ করিয়া উত্তর করিল—what lombore, ? "লম্বোর" অর্থাৎ নম্বর কত? কয়লার খনিতে মজুরদিগের নম্বর থাকে, নম্বর ধরিয়া তাহারা পরিচয় দেয়, তাহারা মনে করিয়াছিল, যে, যীশুখৃষ্ট যদি তাহাদের মধ্যে একজন নম্বরধারী মজুর হয়, তবেই তাহারা তাহার কথা বলিতে পারিবে, নচেৎ নয়! যে জাতির মধ্যে ম্যাগিং মিলমানের ন্যায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জাতির মধ্যে সহস্র সহস্র লোক যীশুখৃষ্টের নাম পর্য্যন্ত জানে না! হিন্দুদিগের মধ্যে এমন হয় না। যে হিন্দু অতি নীচ এবং অশিক্ষিত সেও তাহার দেবদেবীর কথা জানে, দেবদেবীর পূজা করে, এবং সাধ্যমত ধর্ম্মচর্য্যা করে। আমাদের বাগ্দী দুলেরাও দোল দুর্গোৎসব করে, পুরাণ-কথা শুনে, স্ত্রী পুত্রকে প্রতিপালন করে, শ্রেষ্ঠকে সম্মান করে, দুষ্কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম বলিয়া জানে ও ঘৃণা করে, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়, সাধ্যমত নিঃসহায় জ্ঞাতিকুটুম্বকে অন্নদান করে। আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা যে রকম দরিদ্র এবং অশিক্ষিত, তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মচর্য্যা না থাকাই সম্ভব। কিন্তু তাহাদের যে পরিমাণ ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মচর্য্যা আছে তাহা নিতান্তই সম্ভবাতিরিক্ত এবং বিস্ময়কর। মোটামুটি ধরিতে গেলে এমন কথা বলা যাইতে পারে, যে, ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে তাহারা অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর প্রায় সমতুল্য। তাই বলিতেছি, যে, ধর্ম্মচর্য্যা ও চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে হিন্দুর ভিতর সকল শ্রেণীর মধ্যে যেমন অপূর্ব্ব সমত্ব,—সৌসাদৃশ্য বা homogeniety আছে, ইংরাজ বা অপর

কোন ইউরোপীয় জাতির ভিতর শ্রেণী সকলের মধ্যে তাহার এক শতাংশও নাই। এই অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্যের বা homogeniety্র হেতু কি? কি কারণে হিন্দুর ভিতরে উচ্চ শ্রেণীর লোকের ন্যায় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরও ধর্ম্মচর্য্যা এত বেশি এবং চরিত্র এত উত্তম?

এই আশ্চর্য্য সমত্ব বা সৌসাদৃশ্যের অনেক কারণ থাকিতে পারে, এবং বোধ হয় যে অনেক কারণই আছে। বোধ হয়, যে, প্রাকৃতিক কারণে এ দেশের লোক ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা বেশি ধর্ম্মশীল এবং সেইজন্য ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে ইউরোপ অপেক্ষা এ দেশে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বেশি সমত্ব বা সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই সৌসাদৃশ্যের অন্যান্য কারণ এ স্থলে নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিব না। বর্ণভেদ প্রথার সহিত এই সৌসাদৃশ্যের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাই এ স্থলে বুঝিয়া দেখিব।

পৃথিবীতে মানুষের সম্বন্ধ দুইটি জিনিসের সহিত। একটি পার্থিবতা অর্থাৎ ধন, যশ, প্রভৃতি পার্থিব ভোগসম্পদ, আর একটি আধ্যাত্মিকতা বা পারলৌকিকতা অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মচর্য্যা। এই দুইটি ছাড়া আর কোন জিনিসের সহিত মানুষের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কেন না পার্থিবতা এবং আধ্যাত্মিকতা ছাড়া আর কোন জিনিস নাই। মানুষের যাহা কিছু আছে তাহা হয়, পার্থিবতার অন্তর্গত, নয় আধ্যাত্মিকতার অন্তর্গত। এই জন্য মানুষকে ধর্ম্মপ্রধান করিতে হইলে তাহার পার্থিবতা কমাইয়া দিতে হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জ্ঞানী লোকের কাছে ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা পার্থিবতার সম্মান বা গৌরব যে বেশি, তা নয়। ইংরাজি-সাহিত্যে ধর্ম্মের যত প্রশংসা এবং মর্য্যাদা, ধনসম্পদের তত মর্য্যাদা এবং প্রশংসা নয়। ইংরাজলেখকেরা বলিয়া থাকেন, যে, ধনী বা বিদ্বান হওয়া অপেক্ষা ধার্ম্মিক হওয়া বেশি আবশ্যক। ইংরাজ-ধর্ম্মযাজকেরা পার্থিবতাকে অতি হেয় বা অপকৃষ্ট বলিয়া নিন্দা করিয়া আধ্যাত্মিকতারই প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং লোককে পার্থিব পথ ছাড়িয়া ধর্ম্মপথে প্রবেশ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তথাপি ইংরাজ জাতি সাধারণত পার্থিবতা-প্রিয় এবং ধর্ম্মহীন ও চরিত্র-ভ্রষ্ট। ইংরাজের সাহিত্য ও ধর্ম্মশিক্ষার সহিত ইংরাজের জীবনের এ অনৈক্য কেন? ইংরাজ তাহার শিক্ষাদাতার শিক্ষা বুঝে নাই বা কেন, অথবা বুঝিয়া তদনুসারে জীবন নিয়মিত করে নাই বা কেন? বোধ হয়, ইহার কারণ এই যে,

ইংরাজ শিক্ষক বা ধর্ম্মযাজক ধর্ম্মকে প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন বা উপদেশ দিলেও ইংরাজের জীবনের এবং সমাজের ভিত্তি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত নয়, পার্থিব-তার উপর স্থাপিত। ইংরাজ ধর্ম্ম-যাজক ইংরাজকে মুখে বলেন—ধার্ম্মিক হও, ধন-সম্পদের লোভে ধন-সম্পদ লইয়া থাকিও না এবং পরকাল নষ্ট করিও না। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে বা প্রকৃত জীবন-যাত্রায় ইংরাজ দেখে, যে কর্ম্মক্ষেত্র তাহার সম্মুখে অসীমআকারে স্থাপিত, এবং বিরাট মূর্ত্তিতে বিরাজমান, কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর অবলম্বন করিতে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, অর্থের উপর অর্থ সঞ্চয় করিতে সে সদাই আহূত। সে ধর্ম্ম-মন্দিরে শোনে যে, পার্থিব জীবন বড়ই অকিঞ্চিৎকর, ধনসম্পদ বড়ই অনিষ্টকর, পার্থিব ভাব সঙ্কুচিত করাই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া সে দেখে যে পার্থিবতার দ্বার তাহার জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রহিয়াছে, সেই উন্মুক্তদ্বার দিয়া পার্থিবতা তাহাকে মোহিনী মূর্ত্তিতে আহ্বান করিতেছে। তখন সে তাহার সেই কাণে-শুনা দুই চারিটা কথা ভুলিয়া যায়, প্রবল পার্থিবতার প্রবল প্রলোভন তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে; সে পার্থিবতার নেশায় পশুবৎ হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মোপদেশ থাকিলে কি হইবে, ইংলণ্ডের জীবন প্রণালী ও সমাজ-প্রণালী সে ধর্ম্মোপদেশের উপর স্থাপিত নয়, সে ধর্ম্মোপদেশকে কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে অনুকূল ও উপযোগী নয়, সে জীবন-প্রণালী সমাজ-প্রণালী সম্পূর্ণ পার্থিবতা-মূলক এবং উভয় প্রণালীই পার্থিব নেশা বাড়াইয়া মানুষকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও দুরাচার করিয়া ফেলে। এইজন্য ইংরাজ সাধারণত এত দুশ্চরিত্র ও ধর্ম্মহীন। কিন্তু অতি সামান্য হিন্দুও অনেকাংশে সচ্চরিত্র ও ধর্ম্ম-শীল। তাহার কারণ এই যে, হিন্দু কেবল শাস্ত্রকার বা ধর্ম্মযাজকের মুখে পার্থিবতার অপকৃষ্টতা এবং ধর্ম্মচর্য্যার উৎকৃষ্টতার কথা শুনে না। হিন্দুর জীবন-প্রণালীতে হিন্দু দেখে যে পার্থিবতার দ্বার বড়ই সঙ্কীর্ণ, পার্থিবতার পরিমাণ বড়ই কম, পার্থিবতার আয়তন নিতান্তই মাপা—জোঁকা; তাহার এ দিকেও যাইবার যো নাই ও দিকেও যাইবার যো নাই, পার্থিবতা লইয়া দম্ভ আস্ফালন বা বেশি বাড়াবাড়ি করিয়া বেড়াইবার যো নাই। সেই এক স্থির নির্দ্দিষ্ট জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম,—যাহা শত সহস্র পূর্ব্বপুরুষ করিয়া গিয়াছেন, আজ আমাকেও কেবল তাহাই করিতে হইবে, আর আমার পরে আমার বংশে শত সহস্র

উত্তরপুরুষ কেবল তাহাই করিবে। তবে পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র ত আর একটা বাহাদুরি করিবার জায়গা নয়, সেখানে বাহাদুরি ত চলেও না। সে ক্ষেত্র এতই সঙ্কীর্ণ, যে, সেখানে পাশমোড়া দিবারও স্থান নাই। যে সঙ্কীর্ণ স্থান টুকু নহিলে নয়, তাই আছে। সে স্থানটা ভাল স্থান হইলে শাস্ত্রকারেরা কি তাহা এত ক্ষুদ্র করিয়া, এত স্বল্প পরিমাণে দিতেন? পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র অর্থাৎ যে কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ত হইলে পার্থিবতা প্রশ্রয় পাইয়া মানুষকে পশুবৎ করিয়া ফেলে, সেই পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র অপকৃষ্ট বলিয়া হিন্দু তাহা এত সঙ্কীর্ণ আকারে পাইয়াছে। পাইয়া কি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু কি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, সকল হিন্দুই বুঝিয়াছে, যে, পার্থিবতা অপকৃষ্ট এবং ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট, এবং এইরূপ বুঝিয়াছি কি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, কি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সকল হিন্দুই ধর্ম্মচর্য্যায় প্রায় সমান হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর মধ্যে বর্ণভেদে ব্যবসায়ভেদ অর্থাৎ বর্ণানুসারে স্থির নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় থাকায় এই অত্যাশ্চর্য্য ফল ফলিয়াছে।

পার্থিবতা এবং আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম্মচর্য্যা, মানুষের কেবল এই দুইটি জিনিসের সহিত সম্পর্ক। কারণ তৃতীয় জিনিস আর নাই। অতএব ইহার মধ্যে একটি যদি অপকৃষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়, অপরটি কাজে কাজেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। ভারতে বর্ণানুসারে নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় থাকায় হিন্দু পার্থিবতাকে অপকৃষ্ট বলিয়া অনুভব করিয়াছে এবং ধর্ম্মচর্য্যাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিয়াছে। কাজেই হিন্দুর মনে পার্থিব ভাবের উপর ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছে। এখন এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব, যে, বর্ণভেদ প্রথার আর কতকগুলি গুণ বা লক্ষণ আছে যদ্দ্বারা ধর্ম্মভাবের প্রাধান্য বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে, এবং ধর্ম্মচর্য্যা সমস্ত হিন্দু-সমাজে বড়ই সম্প্রসারিত হইয়াছে। বর্ণভেদ প্রথায় মানুষ শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ইহার একটি ফল হয় এই যে, যে নিকৃষ্ট সে শ্রেষ্ঠকে মান্য করিতে শিখে এবং শ্রেষ্ঠকে মান্য করিতে শিখিলে শ্রেষ্ঠের আচার ব্যবহার অনুসরণ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হয়। সেইজন্য হিন্দুর মধ্যে নিকৃষ্ট বর্ণ শ্রেষ্ঠ বর্ণের আচার ব্যবহার অনুসরণ করে। ইহার আর একটি ফল হয় এই যে, যে শ্রেষ্ঠ, সে তাহার নিকৃষ্ট হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ যে শ্রেষ্ঠ সে তাহার নিকৃষ্টের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ এবং যে নিকৃষ্ট সে তাহার শ্রেষ্ঠের সম্বন্ধে নিকৃষ্ট। অতএব একটা সূত্রে শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। শ্রেষ্ঠ জাতি

নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত একটা না একটা সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া যে বর্ণে নিকৃষ্ট, তাহাকে শ্রেষ্ঠ জাতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয় এবং সেইজন্য শ্রেষ্ঠবর্ণ যাহাকে উত্তম জীবন প্রণালী বলিয়া অনুসরণ করে, নিকৃষ্ট বর্ণও সেই জীবন প্রণালী অনুসরণ করে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অর্থের পরিমাণ ছাড়া শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত সামাজিক সম্বন্ধ কিছুই নাই, এবং সেইজন্য সেখানে সকল লোকও যেমন, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকও তেমনি, কেবল অর্থের এবং পার্থিবতার অনুসরণ করিয়া বেড়ায়। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর লোকের মধ্যে যদি কাহারো জীবন-প্রণালী ধর্ম্মমূলক হয়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকে সে জীবন-প্রণালী অনুসরণ করে না। এই দুই কারণে হিন্দুর ভিতর শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ জীবন-প্রণালী নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং এই দুই কারণের অভাবে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ জীবন-প্রণালী শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যেই সম্বদ্ধ আছে, নিকৃষ্ট শ্রেণী কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় নাই। ইহাত গেল শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বর্ণের সম্বন্ধ-সম্ভূত ফল।

আবার ধর্ম্মচর্য্যা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে বর্ণগত দুই একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। সাধারণ লোকে যতই কেন ধর্ম্মভাবাপন্ন হউক না, তাহারা একেবারে পার্থিব আসক্তি বা স্পৃহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। সমাজে যশস্বী বা ক্ষমতাশালী হইতে তাহাদেরও ইচ্ছা হয়। কিন্তু সমাজ সমুদ্রবৎ সুদূর-প্রসারিত কূল-কিনারা শূন্য হইলে, সাধারণ লোকের যশস্বী বা ক্ষমতাশালী হইবার ইচ্ছা সহজে হয় না, হইলেও সে ইচ্ছা প্রায়ই মনের মধ্যে মিলাইয়া যায়। যেখানে লোকসমাজ অনন্ত সাগর সদৃশ, সেখানে তুমিও যেন কোথায় ডুবিয়া থাক, আমিও যেন কোথায় ডুবিয়া থাকি, তোমারও সমাজে প্রতিপত্তি লাভের আশা যেমন বামনের চাঁদ ধরিবার আশার অনুরূপ, আমারও সমাজে প্রতিপত্তি লাভের আশা তেমনি বামনের চাঁদ ধরিবার আশার অনুরূপ। যে সমাজে কত লোক রহিয়াছে এবং কত বড় লোক, আরো কত বড় লোক, আরো কত বড় লোক রহিয়াছে, সে সমাজে তোমার আমার বড় হইবার আশা হইবেই বা কেমন করিয়া? এই যে আমাদের সামান্য বাঙ্গালা সাহিত্য-মণ্ডলীতে থাকিয়া আমরা দুকলম লিখিয়া যশোলাভের আশা করিতেছি,—কিন্তু কৈ চল দেখি, ইংলণ্ডের বিরাট-সাহিত্য-মণ্ডলীতে গিয়া কেমন করিয়া লিখিয়া যশো-লাভ করিবার আশা করিতে পারি? ইংলণ্ডে মনুষ্যসমাজ সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ ও একাকার। সেখানে সামান্য এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের সমাজে প্রতি-

শক্তিশালী হইবার আশা সহজে হয় না। ভারতে হিন্দুসমাজ সমুদ্রবৎ বৃহৎ কিন্তু ইংলণ্ডের মনুষ্য সমাজের ন্যায় একাকার নয়। হিন্দু সমাজ অনেক বর্ণে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্ণ সমস্ত সমাজের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। অতএব আপন আপন বর্ণের মধ্যে বড় হইবার ইচ্ছা সকল হিন্দুরই সহজে হইতে পারে। সীমার ভিতরে সামান্য লোকও বড় হইতে পারে, অসীমের ভিতর অসীম শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ বড় হইতে পারে না, বড় হইবার আশাও করিতে পারে না। যে আপন বর্ণের মধ্যে বড় হইতে চায়, তাহাকে সমস্ত সমাজের বড় লোকের প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভয় করিতে হয় না, তাহার আপনার বর্ণের মধ্যে যাহারা বড় লোক, কেবল তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতারই ভয় করিতে হয়। সে ভয় বড় বেশি ভয় নয় এবং সেইজন্য এদেশে হিন্দুর ভিতর অতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেক লোকে সৎকর্ম্মের দ্বারা আপন আপন বর্ণের মধ্যে সম্মান ও সামাজিক ক্ষমতা লাভ করে। দেবালয়, সদাব্রত, অতিথিশালা, পথ, ঘাট, পুষ্করিণী, সরাই, কূপ, কুঞ্জ প্রভৃতি পরোপকারার্থ এবং পারলৌকিক হিতার্থ অনেক সৎকর্ম্ম এদেশে হইয়া গিয়াছে এবং এখনও কিছু কিছু হইতেছে। সকলেই বোধ হয়, জানেন যে, এই সকল সদনুষ্ঠান উচ্চশ্রেণীর হিন্দুতে যে পরিমাণে করিয়াছে, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুতেও প্রায় সেই পরিমাণে করিয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বর্ণভেদ নাই বলিয়া সেখানে জনকতক করিয়া খুব বড় বা ভাল লোক হয়। কিন্তু ভারতে বর্ণভেদ আছে বলিয়া সমাজের সকল শ্রেণীতে খুব বড় রকমের লোক না হউক, অসংখ্য ভাল লোক হয়—অতি নীচ জাতিতেও অনেক অতিউত্তম লোক দেখা যায়। হিন্দুসমাজে অসংখ্য গুহক চণ্ডাল দেখা যাইতে পারে, ইউরোপীয় সমাজে বোধ হয় দুই চারিটির বেশি নয়, হয়ত তাও নয়।

আবার কোন একটি বর্ণের মধ্যে কেহ সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠাবান হইলে সেই বর্ণের মধ্যে অনেকেই তাহার কার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকে। নিকৃষ্ট বর্ণ শ্রেষ্ঠ বর্ণকে যে কারণে অনুকরণ করে, তাহারাও সেই কারণে সেই প্রতিষ্ঠাবান্ লোকের অনুকরণ করে। অধিকন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি আপন বর্ণের মধ্যে বর্ণসম্বন্ধীয় ব্যাপারে বেশি ক্ষমতা লাভ করে বলিয়া তাহার আপন বর্ণের লোক ভয়েও তাহার দৃষ্টান্তানুসরণ করে। এই প্রকারে বর্ণ বিশেষের দ্বারা বর্ণ বিশেষ ধর্ম্মপথে পরিচালিত হয়।

এখন বোধ হয় বুঝা গেল, যে, হিন্দুর ভিতরে উচ্চ মধ্যম এবং নিম্ন

সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব সমত্ব সৌসাদৃশ্য বা homogeneity আছে, হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথা তাহার একটি প্রবল কারণ। তবে কি বর্ণভেদ থাকিয়া যাইবে, বর্ণভেদ প্রথা উঠান হইবে না? বর্ণভেদ প্রথা থাকিবে, কি না, বলিতে পারি না, বর্ণভেদ প্রথা উঠান উচিত কি না, তাহাও এপ্রবন্ধে বলিতে প্রস্তুত নহি। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে, কালে বর্ণভেদ প্রথার কি হইবে, তাহা এখন কাহারো বলিবার সাধ্য নাই। যাইবার হয়, সে প্রথা যাইবে, না যাইবার হয় থাকিবে; ভিন্ন আকারে থাকিবার হয়, ভিন্ন আকারে থাকিবে। আমরা যথার্থই দৃষ্টিহীন এবং বুদ্ধিহীন। এত বড় সামাজিক কথা মীমাংসা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অতএব বর্ণভেদ প্রথার কি হইবে একথার মীমাংসা করিবার চেষ্টাও করিব না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিব যে, শুধু উপদেশবাক্যে বা উচ্চভাবের জোরে সমাজকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। উপদেশ-বাক্য উচ্চ প্রকৃতির লোকের জন্য—উচ্চভাব উচ্চদরের লোকের জন্য। কিন্তু সমাজ শুধু উচ্চদরের লোক লইয়া নয়, প্রধানত সামান্য লোক লইয়াই সমাজ। কিন্তু সামান্য লোক শুধু উপদেশে আবদ্ধ হয় না, উচ্চভাবে মজিয়া উচ্চভাবে জীবন যাপন করিতে পারে না। সমাজকে বাঁধিতে ও সদাচার করিতে হইলে, মুখের উপদেশও চাই, উচ্চভাবও চাই, আবার বর্ণভেদ, পারিবারিক শাসন প্রভৃতি ঠেকা-ঠোকাও চাই। মানুষকে যেমন উপদেশ দিয়া এবং উচ্চভাবের তরঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ভাল করিবার চেষ্টা করা চাই, আচার ব্যবহার সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঠেকা-ঠোকা দিয়াও তেমনি ভাল করিবার চেষ্টা করা চাই। বর্ণভেদ ক্রিয়া কাণ্ড প্রভৃতি সকল প্রকার ঠেকাঠোকা ফেলিয়া দিয়া শুধু উচ্চ উপদেশ ও ভাবের উপর সমাজ দাঁড় করাইবার চেষ্টাও হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধদেব একবার সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। চৈতন্য দেব আর একবার সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। বৌদ্ধসমাজ এদেশে আর নাই বলিলেই হয়, আর বঙ্গের সাধারণ বৈষ্ণব চৈতন্যদেবের কলঙ্কের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চৈতন্যদেবের পরম পবিত্র বিশ্বব্যাপী প্রেম-পাশব প্রেমে পরিণত হইয়াছে। তাই বলি যে, শুধু উচ্চ উপদেশে বা ভাবে সমাজকে বাঁধিয়া সৎপথে রাখা যায় না। সমাজকে বাঁধিতে বা সৎপথে রাখিতে হইলে উচ্চ উপদেশ, উচ্চ ভাব এবং আচার ব্যবহার প্রথা

প্রণালীরূপ সামাজিক ঠেকা-ঠোকাও চাই। সবই চাই। তাই উপসংহারে একটি কথা বলিতে হইতেছে। দেখিতেছি, এখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ণভেদ প্রথা ছাড়িয়া ইংরাজদের ন্যায় একাকারভাব অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে বলি যে, বর্ণভেদ প্রথাকে যদি যথার্থই বড় অনিষ্টকর বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সে প্রথা ছাড়িয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু শুধু উচ্চ উপদেশ বা উচ্চ ভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবেন না, কেন না তাহা হইলে আপনাদের সমাজ টিকিবে কি না সন্দেহ, সৎপথে কিছুতেই থাকিবে না। অতএব সামাজিক ঠেকা-ঠোকার অনুসন্ধান করুন এবং যত শীঘ্র পারেন ঠেকা-ঠোকা প্রয়োগ করুন। আর আমাদের সমস্ত হিন্দু জাতির সম্বন্ধে এই কথা বলিতে চাই যে, কালে আমাদের বর্ণভেদ প্রথা না থাকিতে পারে। না থাকিবার হইলে, কখনই থাকিবে না, এবং তাহা হইলে সে প্রথাকে রাখিবার চেষ্টা করিলে আমাদের অমঙ্গল বই মঙ্গল হইবে না। যদি সে প্রথা না থাকে, অথবা আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া না চলে, তবে বড়ই ভয় হয় যে, সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের বংশোদ্ভূত মহাপুরুষদিগকে সামাজিক ঠেকা-ঠোকার জন্য ব্যতি-ব্যস্ত হইতে হইবে, এবং সামাজিক ঠেকা-ঠোকা না মিলিলে পবিত্র আর্য্যভূমের পবিত্র আখ্যা ঘুচিয়া যাইবে এবং অপবিত্র আর্য্যভূমে সেই মহাপুরুষদিগকে কোটি কোটি ধর্ম্মহীন চরিত্রভ্রষ্ট পিশাচের সহিত এক বিকটাকার সমাজে কোন মতে দিন যাপন করিতে হইবে।

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য।

তোমরা, বোধহয়, গৃহস্থ শক্তি-সাধক রামপ্রসাদ ও সংসার-বিরাগী আজু গোঁসায়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার গল্প শুনিয়া থাকিবে। কুমারহট্ট-গ্রামে রাম প্রসাদের বাড়ীর পাশেই একটি ছোট আম বাগান ছিল; পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, খট্‌খটে; নিবিড় ছায়াময় অথচ বায়ু সর্ব্বদাই ঝর ঝর করিতেছে।

আহারান্তে রামপ্রসাদ সুধাপানে * ভোর হইয়া, সেই বাগানে মাদুরি পাতিয়া, তামাকু খাইতেন, বিশ্রাম করিতেন, আর আপন মনে শ্যামাগুণ গান করিতেন। বাগানের পার্শ্বেই একটি পুষ্করিণী; পর পারে আজুগোঁসায়ের আখড়া। বাবাজিও ছোট কলি হুঁকাটিতে গাঁজা সাজিয়া, পুষ্করিণীর পাড়ে ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেন; রাম প্রসাদের গান বুঝিতে পারিলে, কখন কখন বাবাজি তাহার উত্তর স্বরূপ আর একটি গান গাহিতেন। শাক্তে বৈষ্ণবে এইরূপ বাদ প্রতিবাদ রামপ্রসাদের জীবন বৃত্তান্তে প্রকাশিত হইয়াছে, আপনারা অনেকেই বোধ হয়, তাহা দেখিয়াছেন, অথবা সেই কাহিনী শুনিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয়, আপনারা অনেকেই দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের নাম পর্য্যন্ত ও শুনেন নাই। ভট্টাচার্য্যের কীর্ত্তি অকীর্ত্তির কথা আজি আপনাদিগকে উপহার দিব।

আজু গোঁসাই যেমন সাধক রামপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য সেইরূপ মহাত্মা রাম মোহন রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রাজা রাম মোহন রায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রতিভাশালী, দেশভক্তিপূর্ণ, তেজস্বী, মনস্বী, মহা পুরুষ; দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এই মাত্র জানি, যে মহাত্মা রামমোহন রায় কৃত কতকগুলি গানের উত্তরে তিনি কতকগুলি গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই বাদ প্রতিবাদও বড় বিস্ময়কর।

আজু গোঁসায়ের সহিত যে রামপ্রসাদের সখ্য ছিল, এমন কথা কোথাও শুনি নাই। দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের সহিত রাজা রাম মোহন রায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ভট্টাচার্য্যের নিবাস এই কলিকাতাতেই হইবে। যখন রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতেন, তখনই ভট্টাচার্য্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিতেন; এরূপ প্রবাদ, যে উভয়ে একত্র সুরাপান করিতেন। যাহাই হৌক, দিগম্বরে রামমোহনে বিশেষ সখ্যভাব ছিল; উভয়ে মধ্যে মধ্যে বিচার বিতর্ক হইত। সকলেই জানেন, মহাত্মা রামমোহন রায় নিরাকার, নির্গুণ, অদ্বৈত,—বাদী। তাঁহার মতে অনিত্য সংসার মিথ্যা, একমাত্র নিত্য নিরঞ্জনই সত্য। জগদীশ্বরের মহিমা চিন্তনই মহাত্মার মতে, তাঁহার বিশুদ্ধ উপাসনা। দিগম্বর ভট্টাচার্য্য সগুণ সাকার-বাদী, পৌত্তলিক, এবং তন্ত্রমতে আদ্যাশক্তির উপাসক।

---

* সুরাপান করি নে আমি, সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজি, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
রামপ্রসাদের গান।

দিগম্বর ভট্টাচার্য্যোক্ত গানগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই, তাঁহার রীতি নীতি উপাসনা-পদ্ধতি বুঝিতে পারা যায়। গানগুলি সমস্তই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের রচিত প্রচলিত কয়েকটি গানের প্রত্যুত্তর মাত্র। সুর তাল অনেক সময়েই এক, অনেক গুলিতে কথায় কথায় মিল আছে, কেবল দুই দশটা শব্দ পরিবর্ত্তিত করা এবং দুই একটি কলি নূতন বাঁধা। কিরূপ গুণপনা পরের কয়েক পৃষ্ঠা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

রামমোহন রায়ের গান।

১

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

মন তুমি সদা কর তাঁহার সাধনা।
নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা ॥
যে ব্যাপিল সর্ব্বত্র, তবু মন বুদ্ধিনেত্র
নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন জান না
জানিতে তায় পরিশ্রম,
করিছ সে বৃথা শ্রম,
সে সব বুদ্ধির ভ্রম, দুসাধ্য সূচনা
বিচিত্র বিশ্ব নির্ম্মাণ,
কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান
আছে মাত্র এই জ্ঞান অতীত ভাবনা

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

তুমি কার কে তোমার
কারে বল রে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় যেমন ভ্রমে অহি দরশন,
প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন।
নানাপক্ষী এক বৃক্ষে,
নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে যায় নানাস্থান
তেমতি জানিবে সব অমাত্য বন্ধু বান্ধব
সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ
কোথা বা রহিবে তব, প্রাণ প্রিয়জন।
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান।

১

বসন্ত বাহার, আড়াঠেকা।

কেন ক্ষেপা কর তবে তাঁহার সাধনা ?
নির্গুণ যদি তিনি রহিত কল্পনা

* * *
* * *
* * *

"আছে মাত্র" এই জ্ঞান
তবে কেন গাও গান
চক্ষু মুদি কার ধ্যান, কিসের ভাবনা ?

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

মা আমার, আমি তাঁর,
তাঁরে বলি রে আপন।
মহামায়া মায়ে আমি দেখি রে স্বপন।
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন,
অহি মিথ্যা রজ্জু মিথ্যা বল কি তখন ?'
নিশিতে বিহরি সুখে, যায় পাখী দিকে দিকে
আবার ফিরিয়া আসে, আমারি মতন।
যাতায়াতে সমাচার, নিত্যসত্য এ সংসার
চিন্ময়ী চরণচিন্তা সংসার বন্ধন। *

---

* ভট্টাচার্য্যের ভাব যেন এইরূপ বোধ হয়, যে, চিন্ময়ী ও সংসার দুইই সত্য, আর সংসারী কর্ত্তৃক চিন্ময়ী চিন্তা, চিন্ময়ীর সহিত সংসারীর এক-মাত্র বন্ধন।

রামমোহন রায়ের গান।

বেহাগ—আড়া ঠেকা।

মন একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার।
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহা গচ্ছ বল তাকে
তুমি কে বা আন কাকে, একি চমৎকার
অনন্ত জগতাধারে, আসন প্রদান কা'রে
ইহা তিষ্ঠ বল তাঁরে, একি অবিচার.
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব
তাঁরে দিয়া কর স্তব, এবিশ্ব যাঁহার.

সিন্ধু ভৈরবি, আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল,
আছি ভাল প্রাণে প্রাণে,
কোথায় কুশল তব,
আয়ুক্ষতি দিনে দিনে।
দারা সুত প্রভৃতি,
কেহ না হইবে সাথী,
জ্ঞান করি অবস্থিতি,
তোমার সহায় জীবনে.
যুক্তিবেদ মতে চল,
মিথ্যা মায়ায় কেন ভুল,
ইন্দ্রিয় আছে সবল,
ভজ সত্য নিরঞ্জনে

কেদার আড়াঠেকা।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান না
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে,
বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে,
একবার ভাবিলে না।
অতএব বলি শুন, ত্যজ রজঃ তমগুণ,
ভাবিলেই নিরঞ্জন এ বিপত্তি রবে না।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান

বেহাগ—আড়া ঠেকা।

ভ্রান্তিতে শান্তি—আমার।
আবাহন বিসর্জ্জন ক্ষতি কি বা কার!
সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয় জীবন সঞ্চার।
জগমাতা জগময়ী, যখন কাতর হই,
বলি এসো ব্রহ্মময়ী, করগো নিস্তার।
জড় জীব জড় করি, যাহার সাধন করি
ধ্যানজ্ঞান জপী ফল সকলিত তাঁর।

সিন্ধু ভৈরবী, আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বলি,
ভাল আছি খোলা প্রাণে।
ভাল মায়ের বেটা আমি,
ভাল না থাকিব কেনে?
দারা সুত প্রভৃতি
সকলে সাধনা সাথী
চক্র করি অবস্থিতি
মত্ত থাকি সুধাপানে
তন্ত্রে মন্ত্রে ভর করি,
ভাবি সেই দিগম্বরী,
ইন্দ্রিয় গেল বা র'ল
কখন ত ভাবিনে।

কেদার আড়াঠেকা।

ওঁকারে মত্ত মন অপার বাসনা।
দেহ সত্য মন সত্য,
সত্য শ্যামা-সাধনা
শীত গ্রীষ্ম আদি ছয়, আসে যায় রয়, হয়,
পুত্রের সাধনা রয়, মায়ের করুণা,
অতএব শুন বলি,
ত্যজ মিথ্যা মিথ্যা বুলি।
সত্যময়ী তথ্য লও, যাবে ভাবনা॥

রামমোহন রায়ের গান
ইমণ কল্যাণ—আড়াঠেকা।

ঐকি ভুল মন। (তোমার)
দেখিবারে চাহ যারে
না দেখে নয়ন।
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে,
যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের ন্যায় তাঁরে
মানা এ কেমন
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত,
যে চালায় অবিরত,
তাঁরে দেখাইতে কর করহ যতন।
পশু পক্ষী জলচরে,যে আহার দেয় নরে,
চাহ সেই পরাৎপরে
করাতে ভোজন।

ললিত—আড়াঠেকা।
কোথা হতে এলে কোথা
যাইবে কোথা রে।
নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন
প্রপঞ্চ জগতে তেমন
ভ্রমে সত্য দরশন।
অতএব দেখ বুঝে যিনি সত্য ভজ তাঁরে

বেহাগ—একতালা।
মন তোরে কে ভুলালে হায়!
কল্পনারে সত্যকরি জান একি দায়!!
প্রাণ দান দেহ যাকে,
যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়।
কখন ভূষণ দেহ, কখন আহার,
ক্ষণেক স্থাপহ ক্ষণে করহ সংহার,
প্রভু বলি মান যাঁরে,
সম্মুখে নাচাও তাঁরে,
এত ভুল এ সংসারে
কে দেখে কোথায়!

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান।
প্রসাদী সুর—একতালা।

ভুল নয়, ভুল নয়, ঐ দেখ ওই।
আঁধারে করিছে আলো ঐযে আমার—
[ব্রহ্মময়ী।
পদতলে পড়ি মহেশ বিকলে,
লক্ষ লক্ষ কর কটির শিকলে,
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি নয়ন নিকলে
বদনে মা ভৈঃ মা ভৈঃ।
অট্ট অট্ট হাস, বিকট বিকাশ
ত্রাসিত আকাশ, সমরে জয়ী।
করাল বদনে সরল হাসিছে
মরাল গমনে মেদিনী কাঁদিছে,
তালে তালে তালে সুঠাম
নাচিছে তাথৈ, তাথৈ।

ললিত—আড়াঠেকা।
কোথা হতে এলাম আমি
যাইব কোথায় রে।
মা আমার, আমি মার,
ভাবনা কি তায় রে!
ভক্তিভরে দেখিতেছি জাগ্রতে খেয়াল
আমার মায়ের আমি স্নেহের ছাওয়াল
তাঁহার কোলেতে শুয়ে
ধরিয়াছি রাঙ্গা পায় রে।

ভৈরবী—মধ্যমান।
ভুবন ভুলালে মায়ায় ভুবনমোহিনী।
কল্পনারে সত্যকরি দেখা দিলা জননী
কল্পনায় অধিষ্ঠান, কল্পনায় দেই প্রাণ,
সত্য করি আত্মদান, এই মাত্র জানি।
কখন ভূষণ দেই কখন অশন,
কখন স্থাপন করি, কভু বিসর্জ্জন,
মাতৃরূপা দেখি চক্ষে,
নাচিছে বাপের বক্ষে
ভয়ে বলি সর্ব্বরক্ষে
কর সর্ব্বরূপিণী।

রামমোহন রায়ের গান।

ইমণ ভূপালী—ঢিমা তেতালা।

ভুল না নিষাদ কাল
পাতিয়াছে কর্ম্ম জাল,
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ওযে কর্ম্মতরু ফল,
গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন,
নিত্যসুখে জ্ঞানারণ্যে করহ গমন।
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিতে কত আনন্দ বিহঙ্গ।

পূরবী—আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে
তথাপি বিষয়ে মত্ত
সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হলো এত
বর্ষগেলে বর্ষ বৃদ্ধি কহে বন্ধুগণে।
এসব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে,
অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে,

রামকেলী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যেবাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর
যার প্রতি যত মায়া,
কিবা পুত্র কিবা জায়া
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে 'হায় হায়' শব্দ
সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন, নাড়ীক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান,
ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান।

ইমণ ভূপালী—ঠেকা তেতালা।

দেখরে! বুদ্ধি নিষাদ
পাতিয়াছ জ্ঞান ফাঁদ,
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধফল, ওযে গরল কেবল,
তর্কে তর্কে চল চল, দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মন,
কর্ম্মরথে ভক্তিপথে করহ গমন,
মিলিবে মুক্তির ফল,মধু তাহে অবিরল
মত্ত হবে সুধাপানে দেখিবে যে রঙ্গ।

পূরবী—আড়াঠেকা।

তিলেতিলেপরমায়ু বাড়িতেছে প্রতিক্ষণে
ধীরে ধীরে ভক্তিনদী ধায় শ্যামা চরণে।
বৃদ্ধি পায় আয়ু যত, পুত্র হয় মাতৃরত,
কোলে টানে মা যে তত,আপন সন্তানে
পরের কথার ছলে,
পুত্র কি আর টলে, বলে,—
ভয় নাহি আর সেই কালের দর্শনে।
এক চিন্তা নিরন্তর মায়ে পোয়ে একঘর
ভেদ নাহি অতঃপর জীবনে মরণে।

পূরবী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন সুখকর।
আধনীরে গঙ্গাতীরে শঙ্কা হীন নর॥
কাটায়ে সংসার মায়া,
আশীর্ব্বাদি পুত্র জায়া
নিরমাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর।
চিন্ময়ী ধরেছ বুকে,
কালী কালী নাম মুখে,
কালীনাম সবে ডাকে, করি উচ্চস্বর।
কালীনাম অবিচ্ছেদ,
স্বর্গে মর্ত্তে নাহি ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর।

মহামায়া।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সিপাহি সমর।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সিপাহীদিগের সহিত ইংরাজের মহা সমরানল প্রজ্জলিত হইয়াছে। সিপাহীগণ দিল্লী দখল করিয়াছে, ইংরাজকুল ভয়ে সশঙ্কিত। মান সম্ভ্রম ধন প্রাণ লইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত।

যমুনা গোপিনীকে আপনাদের স্মরণ আছে কি? তাহার পিতা এখনও অমূল্যদের বাটিতে দুগ্ধ দেয়, সে নিজে আর আসে না। দুর্গাবতী তাহাকে আসিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেও আসে না, কচিৎ এক আধ বার আসে,তাও আবার দুধ দিতে নয়,— দেখা করিতে, তাহাও মধ্যাহ্নের সময়।—

যমুনা আজি প্রাতে আসিয়া সশঙ্কিতচিত্তে দুর্গাবতীকে বলিল "আপনারা আর সহরের মধ্যে থাকিবেন না!"

দুর্গা। কেন?

যমুনা। শুনিতে পাই ২।১ দিন মধ্যে এখানে লড়াই বাধবে।

দুর্গাবতী ভীতা হইলেন, অমূল্যকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া এ সংবাদ দিলেন। অমূল্য আর কাল বিলম্ব না করিয়া সহরের বাহিরে বাসার অনুসন্ধানে চলিলেন। যমুনা কুমারীও চলিয়া গেল।

অমূল্য বাসা স্থির করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে বৃটিশ সিংহের দুর্জ্জয় কামান গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থুল বাধিয়া গেল। ইংরাজের রণবাদ্য, কোলাহল, সিপাহীদিগের জয়োল্লাসে মিশ্রিত হইয়া এক ভীতিপ্রদ ভাব ধারণ করিল। সকলেই সশঙ্কিত চতুর্দ্দিকে ছুটা ছুটি হুড়া হুড়ি—অমূল্য মহা বিপদে পড়িলেন, কি করিয়া বাসায় যাইবেন, তাঁহাদিগের উপায়ইবা কি করিবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। সম্মুখে মহা সমর—যাইবার পথ নাই, অমূল্য অনেকক্ষণ— একটি বৃক্ষপার্শ্বে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরেই ইংরাজ সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। অসুরাবতার সিপাহিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বিগুণ তেজে তাহাদের অনুধাবন করিল। তখন অমূল্য সেই রণভঙ্গ স্থল— মহা শ্মশানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। কত প্রাণশূন্য কায়া রুধির ধারায় প্লাবিত। তিনি বিষণ্ণ হৃদয়ে সেই সকল দেখিতে দেখিতে উর্দ্ধশ্বাসে চলিলেন। চলিতে চলিতে,—দেখিলেন তাহাদের মধ্যে দুই একটি তখনও জীবিত আছে, চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে, কাহারও চক্ষে বারি ধারা, কাহারও বা—চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অমূল্য যে এই মহা শ্মশান দিয়া একাকী চলিতেছেন, তাহা নহে। কত লোকে কত দিকে ছুটিতেছে। অমূল্য শুনিলেন,—সেই মহা শ্মশানের মহারব ভেদ করিয়া উচ্চে একটি কণ্ঠস্বর উঠিতেছে। জানিলেন এ সেই পরিচিত যুবার সুপরিচিত কণ্ঠস্বর। প্রথমে

অমূল্য বিস্মিত হইলেন; তাহার পর অনন্য মনস্ক হইয়া সেই গান শুনিতে শুনিতে চলিলেন। সেই কম্পিত কণ্ঠের স্বর, আজি যেন বড়ই মধুর, বড়ই মর্ম্মভেদী; চারিদিকের আর্ত্তনাদের অস্ফুটধ্বনি, ত্রস্তজনগণের পদশব্দ, দূরাগত কামানের গর্জ্জন দূরাগত সিপাহী সৈন্যের জয় হুঙ্কার, সকল আচ্ছন্ন করিয়া পরিষ্কার তীব্র কণ্ঠস্বর উঠিতেছে; সুস্পষ্টে শুনা যাইতেছে, অদৃশ্য যুবা কবির সুরে গায়িতেছে।

চিতেন।

দৈব যোগে যদি প্রাণনাথ, হলো এপথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোলো ও বিধু বদন॥
পীরিত ভেঙেছে ভেঙেছে তায় লজ্জা কি?
এমনত প্রেম ভাঙাভাঙি অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ
বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচে কিছু মাণিক পাবনা।

মহড়া।

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেওনা।
তোমায় ভাল বাসি তাই. চোখের দেখা দেখতে চাই
কিছু থাক থাক বলে ধরে রাখবো না॥
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভালো,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল,
সদা বিরাগে কর ভর, আমিতো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিওনা॥ *

অমূল্য মহাশ্মশান মধ্যে এই অপূর্ব্ব গীত শ্রবণ করিয়া, ব্যাকুল, বিহ্বল-চিত্তে বিপথে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একজন আহত ইংরাজ সৈন্য অমূল্যকে লক্ষ্য করিয়া বল্লম তুলিল। সে আঘাতে অমূল্যর জীবনের আশা থাকিত না,—কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে একটি যুবা সেই দ্রুতগামী বল্লমের মুখে আসিয়া পড়িল। বল্লম তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। সেই মুমূর্ষ প্রায় ইংরাজ "হুর্‌রে" করিয়া উঠিল। সে ধ্বনি অমূল্যের কর্ণে পশিল। তিনি দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! সেই সুন্দর যুবা পুরুষের বক্ষে বল্লম বিদ্ধ হইয়াছে। অমূল্য তৎক্ষণাৎ তাহার সহায়তায় আসিলেন, বক্ষস্থিত বল্লম টানিয়া বাহির করিলেন, ঘোরতর শোণিত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

যুবক বলিল এস্থানে দাঁড়াইবেন না, এ বল্লম আপনারই প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল।

অমূল্য। আমার প্রতি?

যুবক। হাঁ—চলুন, বলিতেছি।

* রাম বসুর গান।

অমূল্য। তুমি চলিতে পারিবে।

যুবক। আপনার স্কন্ধে ভর দিয়া যাইব।

যুবক তাহাই করিলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কতক দূরে একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া যুবক বলিলেন "আর আমার যাইবার সময় নাই; এখানে বসুন।"

অমূল্য যুবককে লইয়া বসিলেন।

যুবক বলিল,— "আপনার কোলে শুই।"

অমূল্য কোল পাতিয়া দিলেন।

যুবক অমূল্যের ক্রোড়ে শয়ন করিলে অমূল্য বলিলেন "তুমি এ দিকে কোথায় যাচ্ছিলে?

যুবক। আপনার সঙ্গে।

অমূল্য। কই আমিত দেখ্‌তে পাই নাই।

যুবক। না দেখ্‌লে কি করে দেখাব।

অমূল্য। কেন যাচ্ছিলে?

যুবক। গান শোনাতে। শুনিতে পান নাই?

অমূল্য। একি গানের সময়?

যুবক। গানের আবার সময় অসময় আছে না কি?

অমূল্য। তোমার বুকে বল্লম লাগলো কি করে?

যুবক। ইংরাজ আপনাকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুঁড়লে তাই দেখে।—

অমূল্য। না হয় আমি মরতাম, আমার জন্যে তুমি মরিলে!

যুবক মৃদু হাসিয়া কহিল,—"একজন মানুষের প্রাণ রক্ষায় কি কোন ফল নেই?"

অমূল্য যুবকের প্রতি একটি স্থির দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, বলিলেন "আপনার প্রাণ বড় না, পরের প্রাণ—বড়?"

যুবক ঈষৎ চঞ্চল নয়নে বলিলেন "আমি বড় না, তুমি বড়?"

অমূল্য। তুমি হয় পাগল নয়, দেবতা!

যুবক এইবার মৃদু হাসি হাসিয়া কহিল,—'দেবতা নয় পাগল বটে।' না হলে কি আমি সাগর ছেঁচে মাণিক তুলিতে যাই। বলিতে বলিতে যুবা কাঁদিয়া ফেলিল।

অল্পক্ষণ পরে যুবকের অধর প্রান্তে আবার যেন ঈষৎ হাসি ডুবিয়া ডুবিয়া দেখা দিল। যুবক বলিল,—"দেখুন আমার মাথার পাগড়িতে একটি কাগজ আছে, সে খানি আপনি লইবেন—আমি সে কাগজ খানি আপনাকে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, অবসর পাইলেই ডাকে পাঠাইয়া দিব, কিন্তু আজিও ঘটিয়া উঠে নাই।

অমূল্য। কি কাগজ?

যুবক। এখনি দেখিতে পাইবেন।

অমূল্য আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। পাগড়ি হইতে যেমন পত্র বাহির করিতে যাইবেন, অমনি পাগড়ি খুলিয়া পড়িল, কুণ্ডলীকৃত কাল-ভুজঙ্গিনীর

মত বেণীবদ্ধ কেশরাশি তাঁহার কোলে ছড়াইয়া পড়িল। অমূল্য চকিত, বিস্মিত হইলেন, বলিলেন,—"তুমি স্ত্রীলোক!"

তখন মুমূর্ষুর বক্ষে কিএক তরঙ্গ হঠাৎ খেলাইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল,—"আমি যমুনা"।

অমূল্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক ভাবে মাথার বেণীগুলি কপাল হইতে সরাইয়া দিলেন। বলিলেন,—"যমুনা,তোমার অন্তিম কাল উপস্থিত, তুমি স্বর্গে চলিলে; আমায় ভাল বাসিতে বল, এখন আমি কি করিব?"

যমুনা মৃদু অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

(চিতেন।)

নির্জ্জনে এমন, না পাব দরশন,
যায় নিশি যাক, জানুক গুরুজন,
তাহাতে নহি খেদিতো, শুন ওহে ব্রজনাথো,
ও বংশীর গুণ কতো, বিশেষ শুনাও।

(মহড়া।)

শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ কাল বরণে,
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও,
সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশীটি বাজাও।

(অন্তরা।)

শ্যাম শুন শুন, যাও কেন রাখ হে বচন,
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ,

(পর চিতেন।)

কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি হে, কুলবতীর মন,
কুল সহিতে হে করিলে হরণ॥
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও॥ *
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও—

গান থামিল;—যমুনা সতৃষ্ণ নয়নে, স্থির দৃষ্টিতে অমূল্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমূল্য বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"কেন যমুনা আমিত কোথাও যাই নাই।" যমুনা তেমনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে যেমন সন্ধ্যার সময় মল্লিকা ফুল ফুটে, তেমনই হাসি হাসিল। অমূল্যের স্কন্ধে ধীরে ধীরে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিল, অস্তগামী সূর্য্যের ছবির মত সেই মুখপ্রভা ধীরে ধীরে মুখেই মিলাইয়া গেল। যমুনা তখনও তেমনই চাহিয়া আছে, কিন্তু সকলই ফুরাইয়াছে।

অমূল্য পত্রখানি বস্ত্রকক্ষে যত্নে রাখিয়া ধীরে ধীরে সেই কেশরাশি মণ্ডিত মস্তক দূর্ব্বাদলে স্থাপন করিলেন। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে মৃতসৎকারের চেষ্টায় চলিলেন। তখনও ইংরাজের কামান দূরে গর্জ্জন করিতেছে।

---

* হরু ঠাকুরের গান।

নবজীবন।

২য় ভাগ } ফাল্গুন ১২৯২। { ৮ম সংখ্যা।

ঋগ্বেদের দেবগণ।

চতুর্থ প্রস্তাব। অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবগণ।

অগ্নি মনুষ্য সভ্যতার একটি প্রধান সাধন মনুষ্য সুখের একটি প্রধান উপকরণ, সুতরাং আদিম আর্য্যজাতি সেই অগ্নির আরাধনা করিত। পরে যখন সেই জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিল, তখনও সেই পুরাতন দেবকে সেই পুরাতন নামেই আরাধনা করিতে লাগিল।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, যে গ্রীসদেশে অগ্নিকে যে যে নামে পূজা করা হইত, সে সমস্ত নামই হিন্দুদিগের ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অগ্নি সকল সময়েই যুবা, কেননা সকল সময়েই নূতন রূপে প্রজ্বলিত হয়েন, এবং এই হেতু ঋগ্বেদে অগ্নিকে সর্ব্বদাই "যবিষ্ঠ" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন গ্রীকদিগের বিশ্বকর্ম্মার Hephaistos নাম এই "যবিষ্ঠ" নামের রূপান্তর মাত্র। এই Hephaistos দেবকে রোমকগণ Vulcan বলিয়া ডাকিত, উপরি উক্ত পণ্ডিতদিগের মতে Vulcan শব্দ—উল্কা শব্দের প্রতিরূপ মাত্র। আবার দুইটি কাষ্ঠ ঘর্ষণ—বা মন্থন করিলে তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, এইজন্য অগ্নিকে "প্রমন্থ" বলা যায়। পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন গ্রীকদিগের যে Prometheus দেব স্বর্গ হইতে মনুষ্যদিগের জন্য অগ্নি আনিয়াছিলেন, তাঁহার

নাম এই "প্রমন্থ" নামের রূপান্তর মাত্র। স্বর্গ হইতে অগ্নি আনিবার গল্প যেরূপ গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেইরূপ হিন্দুদিগের ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। মাতরিশ্বা স্বর্গ হইতে ভৃগুবংশীয়দিগের জন্য অগ্নি আনিয়া দিয়াছিলেন; (১ মণ্ডল, ৬০ সূক্ত, ১ ঋক।) পুরাণে মাতরিশ্বা বায়ু; ঋগ্বেদে মাতরিশ্বা বায়ু নহে, মাতরিশ্বা অর্থে—অগ্নি। *

"অগ্নি" নামটিও ইউরোপে পাওয়া যায়। লাটিনগণ অগ্নিকে Ignis কহিত, শ্লাভগণ Ognis কহিত। প্রাচীন ইরাণীয়দিগের মধ্যে অগ্নির বড়ই সম্মান, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরো মজ্দের পুত্র এবং "অতর্" নামে উপাসিত হইতেন। ঋগ্বেদে অগ্নির "নরাশংস" ও "তনূনপাৎ" বলিয়া দুইটি বিশেষ নাম আছে, তাহার প্রথমটির প্রতিরূপ শব্দ "নৈর্য্যোসঙ্ঘ" ইরাণীয়দিগের জেন্দ অবস্থায় পাওয়া যায়। যথা—

"আমরা অহুরো মজ্দের পুত্র অতরকে যজ্ঞ প্রদান করি। আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি। রাজাদিগের নাভিতে যিনি বাস করেন সেই নৈর্য্যোসঙ্ঘকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।" জেন্দ অবস্থা।

দ্বিতীয় সিরোজা।

অগ্নি না হইলে হিন্দুদিগের যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, এই জন্য ঋগ্বেদে অগ্নিই দেবদিগের যজ্ঞ নির্ব্বাহক পুরোহিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং প্রত্যেক মণ্ডলের প্রথম সূক্তগুলি অগ্নির স্তুতি। দেবদিগের যজ্ঞ কার্য্যে অগ্নিতেই দ্রব্য নিক্ষেপ করা হইত, এই জন্য অগ্নি দেবদিগের হব্যবাহক ও দূত। যজ্ঞ করিলেই ধন পাওয়া যায়, এই জন্য অগ্নিই ধন দাতা, তিনি দ্রবিণোদা। আমরা এখানে ঋগ্বেদ সংহিতার সর্ব্ব প্রথম অংশ টুকু, অর্থাৎ প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তটি উদ্ধৃত করিব।

'অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী। আমি অগ্নির স্তুতি করি।

"অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতি-ভাজন; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

"অগ্নি দ্বারা যজমান ধনলাভ করে, সে ধন দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।

---

* "তং শুভ্রং অগ্নিং অবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানং উক্থ্যং।"
৩ মণ্ডল, ২৬ সূক্ত, ২ ঋক্।

"হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাক তাহা কেহ হিংসা করিতে পারে না, এবং সে যজ্ঞ দেবগণের নিকট গমন করে।

"অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী, সিদ্ধকর্ম্মা, সত্যপরায়ণ এবং প্রভূত ও বিবিধ কীর্ত্তিযুক্ত; সেই দেব দেবগণের সহিত যজ্ঞে আগমন করুন।

"হে অগ্নি তুমি হব্যদাতা যজমানের যে কল্যাণ সাধন কর, হে অঙ্গিরা! সে কল্যাণ প্রকৃত তোমারই।

"হে অগ্নি আমরা দিন দিন দিবস ও রাত্রিতে মনের সহিত নমস্কার সম্পাদন করত তোমার সমীপে আসিতেছি।

"তুমি দীপ্যমান্, তুমি যজ্ঞের রক্ষক, যজ্ঞের দীপ্তিকারক, এবং যজ্ঞশালায় বর্দ্ধনশীল।

"পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের নিকট সেইরূপ হও; আমাদিগের কল্যাণের জন্য নিকটে বাস কর।" ১ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ১ হইতে ৯ ঋক্।

পাঠক দেখিবেন, যে, ষষ্ঠ ঋকে অগ্নিকে অঙ্গিরা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অগ্নিই অঙ্গিরাবংশীদিগের পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ প্রথম অঙ্গিরা ছিলেন, এরূপ কথা ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দেখা যায়। আবার অঙ্গিরাগণ প্রথমে অগ্নিকে ধারণ করেন, পরে অন্যান্য লোকে অগ্নির উপাসনায় রত হয়, এরূপ কথাও অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে মাতরিশ্বা স্বর্গ হইতে ভৃগুদিগের জন্য অগ্নিকে আনিয়া দিয়াছিলেন, এবং কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে, মাতরিশ্বা মনুর জন্য অগ্নিকে আনিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিবংশীয়গণ ভারতবর্ষের আর্য্যদিগের মধ্যে অগ্নির উপাসনা অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন।

আমরা অগ্নির আর একটি স্তোত্র এখানে উদ্ধৃত করিব। সেটি দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্ত হইতে উদ্ধৃত এবং তাহাতে অগ্নিকেই সর্ব্বদেবাত্মক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

"হে অগ্নি! তুমি সাধুদিগের অভীষ্টবর্ষী, অতএব তুমিই ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি বহুলোকের স্তুত্য, তুমি নমস্কার যোগ্য। হে ধনবান্ স্তুতির অধিপতি! তুমিই ব্রহ্মণস্পতি। তুমি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর ও বহু প্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর।

"হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত, অতএব তুমি রাজা বরুণ। তুমি শত্রুদিগের বিনাশক ও স্তুতিযোগ্য, অতএব তুমি মিত্র। তুমি সাধুদিগের পালক, অতএব তুমি অর্য্যমা, তোমার দান সর্ব্বব্যাপী। তুমি অংশ, হে দেব! তুমি আমাদিগের যজ্ঞে ফল দান কর।

"হে অগ্নি! তুমি ত্বষ্টা, তুমি পরিচর্য্যাকারীর বীর্য্যস্বরূপ, স্তুতিবাক্য সকল তোমারই, তোমার তেজঃ হিতকারী, তুমি আমাদিগের বন্ধু, তুমি শীঘ্র উৎসাহিত কর, তুমি আমাদিগকে উত্তম অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর। তোমার ধন প্রভূত, তুমি মনুষ্যগণের বলস্বরূপ।

"হে অগ্নি! তুমি মহৎ আকাশের অসুর রুদ্র, তুমি মরুৎগণের বলস্বরূপ, তুমি অন্নের ঈশ্বর। তুমি সুখের আধার স্বরূপ, তুমি লোহিতবর্ণ বায়ুসদৃশ অশ্বে গমন কর। তুমি পূষা, তুমি আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পরিচালক ব্যক্তিদিগকে রক্ষা কর।

"হে অগ্নি! তুমি অলঙ্কারকারী যজমানের পক্ষে দ্রবিণোদা, অর্থাৎ স্বর্ণ-দাতা। তুমি দ্যোতমান্ সবিতা, রত্নের আধার স্বরূপ। হে নৃপতি! তুমি ধনদাতা ভগ। যে যজমান যজ্ঞগৃহে তোমার পরিচর্য্যা করে, তুমি তাহাকে পালন কর।

"হে অগ্নি! লোকে নিজ নিজ গৃহে তোমাকে প্রাপ্ত হয় ও তোমাকে ভূষিত করে। তুমি মনুষ্যগণের পালক, দীপ্তিমান্ এবং আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহসম্পন্ন। তোমার সেনা অতি উত্তম, তুমি সমস্ত হব্যের ঈশ্বর, তুমি সহস্র শত, ফল দান কর।

"হে অগ্নি! লোকে যজ্ঞদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, যেহেতু তুমি পিতা। তোমার সৌভ্রাত্র লাভের জন্য কর্ম্মদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, তুমি তাহাদিগের শরীর দীপ্ত করিয়া দাও। যে তোমার পরিচর্য্যা করে তুমি তাহার পুত্র হও। তুমি সখা, শুভকারী ও শত্রুনিবারক হইয়া পালন কর।

"হে অগ্নি! তুমি ঋভু, তুমি প্রত্যক্ষ স্তুতিযোগ্য, তুমি সর্ব্বত্র বিশ্রুত ধন ও অন্নের স্বামী। তুমি অতিশয় উজ্জ্বল, তুমি অন্ধকার ছেদনের জন্য ক্রমে ক্রমে কাষ্ঠাদি দাহ কর। তুমি বিশেষরূপে যজ্ঞ নির্ব্বাহ কর এবং তাহার ফল বিস্তার কর।

"হে দেব অগ্নি! তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। তুমি হোত্রা ভারতী,

তুমি স্তুতিদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তুমি শত বৎসরের ইলা. তুমি দান সমর্থ। হে ধনপালক! তুমি বৃত্রহন্তা, তুমি সরস্বতী।

"হে অগ্নি! উত্তমরূপে পোষিত হইলে তুমিই উত্তম অন্ন। তোমাতে স্পৃহনীয় এবং উত্তমবর্ণ ঐশ্বর্য্য অবস্থিতি করে। তুমিই অন্নস্বরূপ, তুমিই তার কর, তুমিই বৃহৎ, তুমি বহুল ও সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ।

হে অগ্নি! আদিত্যগণ তোমাকে মুখ করিয়াছেন; হে কবি! শুচি দেবগণ তোমাকে জিহ্বা করিয়াছেন। দানকালে সমবেত দেবগণ যজ্ঞে তোমার অপেক্ষা করেন, এবং তোমাতেই আহুতিরূপে প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ করেন।" ২ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ৩ হইতে ১৩ ঋক্।

বায়ু ও আদিম আর্য্যদিগের আরাধ্য দেব ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুরাতন সাধারণ নাম লইয়া সেই আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতিগণ তাঁহার আরাধনা করিত। গ্রীক ও লাটিনদিগের Pan ও Favonius সংস্কৃত পবন শব্দের প্রতিরূপ, এবং ইরাণীয়দিগের জেন্দ অবস্থায় এই দেব "বায়ু" নামেই উপাসিত হইয়াছেন, এবং বায়ুর সাহায্যে থ্রেতেয়ন অহিকে বিনাশ করেন, এরূপ বিবরণ আছে, যথা

"থ্রেতেয়ন বায়ুর নিকট একটি বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন হে উর্দ্ধ-বিচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও, যেন আমি তিন মুখ ও তিন মস্তক যুক্ত অহি দহককে পরাস্ত করিতে পারি। * *

"উর্দ্ধবিচারী বায়ু সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরো মজ্দের প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে সেই বর দিলেন'।

জেন্দ অবস্থা। রাম যাস্ত।

ঋগ্বেদ সংহিতায় বায়ুর বড় অধিক স্তুতি নাই. আমরা একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে রমণীয় বায়ু আইস, এই সোমরস সমূহ অভিষুত হইয়াছে। ইহা পান কর, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

"হে বায়ু! যজ্ঞাভিজ্ঞ স্তোতাগণ সোমরস অভিষুত করিয়া তোমার উদ্দেশে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া স্তব করিতেছে।

"হে বায়ু! তোমার সোমগুণ প্রকাশক বাক্য সোমপানার্থ হব্যাদাতা যজমানের নিকট আসিতেছে, অনেকের নিকট আসিতেছে।

১ মণ্ডল, ২ সূক্ত, ১ হইতে ৩ ঋক্।

মন্দ মন্দ বায়ু অপেক্ষা ঝড়ের প্রবল বাত্যা সরল হৃদয় প্রাচীন হিন্দুদিগের অন্তঃকরণ অধিক পরিমাণে আলোড়িত করিয়া ছিল, সুতরাং ঋগ্বেদ সংহিতায় বায়ু অপেক্ষা প্রবল মরুৎগণের অধিক স্তুতি দেখিতে পাই। দুই একটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"দ্যুলোক ও ভূলোকের কম্পনকারী হে নরগণ! তোমাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? তোমরা বৃক্ষাগ্রের ন্যায় চারিদিক পরিচালিত করিতেছ।

"হে মরুৎগণ! তোমাদিগের উগ্র ও ভীষণ গতির ভয়ে মনুষ্য গৃহে দৃঢ় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছে, কেন না তোমাদের গতিতে বহু পর্ব্বযুক্ত গিরিও সঞ্চালিত হইতেছে।

"তাঁহাদিগের গতিতে পদার্থ সমূহ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, পৃথিবীও বৃদ্ধ জীর্ণ নরপতির ন্যায় ভয়ে কম্পিত হইতেছে।

১ মণ্ডল, ৩৭ সূক্ত, ৬, ৭, ৮ ঋক্।

"প্রস্রুতস্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জ্জন করিতেছে; গাভী যেরূপ বৎসের সেবা করে, বিদ্যুৎ সেইরূপ মরুৎগণের সেবা করিতেছে; মরুৎগণ বৃষ্টি দান করিতেছে।

"উদকধারী মেঘের দ্বারা মরুৎগণ দিবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন, পৃথিবী জলসিক্ত করিতেছেন।

"মরুৎগণের গর্জ্জনে সমস্ত পৃথিবীর গৃহাদি কম্পিত হইতেছে, মনুষ্যগণ কম্পিত হইতেছে।

হে মরুৎগণ! তোমাদিগের দৃঢ় হস্তের সহিত বিচিত্র তটশালিনী নদী দিয়া অপ্রতিহত গতিতে গমন কর।

"তোমাদিগের রথের নেমি দৃঢ় হউক, অশ্বগণও দৃঢ় হউক, তোমাদিগের অঙ্গুলি বল্গা-ধারণে সুদীক্ষিত হউক।"

১ মণ্ডল, ৩৮ সূক্ত, ৮ হইতে ১২ ঋক্।

"মরুৎগণের স্বকীয়া পত্নী রোদসী আলুলায়িত কেশে ও অনুরক্ত মনে মরুৎগণকে সেবা করিতেছেন। সূর্য্য যেরূপ অশ্বিদ্বয়ের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন, দীপ্তশরীরা রোদসী সেইরূপ চঞ্চল মরুৎদিগের রথে উঠিয়া শীঘ্র আগমন করিতেছেন।

"যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তরুণ মরুৎগণ তরুণী রোদসীকে রথে স্থাপিত করিতেছেন। বলশালিনী রোদসী তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গতা হইতেছেন।

যজমান মন্ত্র ও হব্য ও সোমাভিষব দান করিয়া মরুৎগণের পরিচর্য্যা করত স্তব করিতেছেন। ১ মণ্ডল. ১৬৭ সূক্ত, ৫ ও ৬ ঋক্।

শেষের দুই ঋকে রোদসী মরুৎদিগের স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রোদসী অর্থে এখানে বিদ্যুৎ. কবি সুন্দর কল্পনা পরবশ হইয়া বিদ্যুৎকে প্রবল ঝড়ের স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার অন্যান্য স্থানে রোদসী রুদ্রের স্ত্রী, মরুৎগণের মাতা। "রোদসী রুদ্রস্য পত্নী মরুতাং মাতা"। [সায়ণ, ৫ মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের ৮ ঋকের ব্যাখ্যা।] ঋগ্বেদের অনেক স্থানে এইরূপ উদাহারণ পাওয়া যায়. এবং ইহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। পুরাণের দেবদিগের ন্যায় ঋগ্বেদের দেবদিগের ততটা ব্যক্তিগত পার্থক্য নাই, দেবদিগের পিতা, পুত্র, মাতা, ভার্য্যা, দুহিতা ও বংশাবলির বিবরণ ততটা স্থিরীকৃত হয় নাই। সরল স্বভাব উপাসক প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের স্তুতি করিতেছেন ভক্তি ও কল্পনায় দ্রবীভূত হইয়া আহ্বান করিতেছেন, হৃদয় যে নাম বলিয়া দিতেছে, সেই নাম দিয়া আহ্বান করিতেছেন। ঋগ্বেদের উপাসনার প্রাচীনত্ব ও সরলত্ব ইহা দ্বারাই বিশেষ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানে পৃশ্নিই মরুৎদিগের মাতা এবং রুদ্র মরুৎদিগের পিতা।* পৃশ্নি অর্থে সায়ণ পৃথিবী করিয়াছেন, কিন্তু যাস্ক আকাশ করিয়াছেন। যাস্কের অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, আকাশই ঝড়ের মাতৃস্থানীয়া। রোথ ও লাংলোয়া পৃশ্নি অর্থে মেঘ বিবেচনা করিয়াছেন। মরুৎদিগের পিতা রুদ্র সম্বন্ধে আমরা ইহার পরের প্রস্তাবে লিখিব।

---

* "The mythology of the Veda is to comparative mythology what Sanscrit has been to comparative grammar. ** The whole nature of these so-called gods is still transparent; their first conception in many cases clearly perceptible. There are as yet no genealogies, no settled marriages between gods and goddesses. The father is sometimes the son, the brother is the husband, and she who in one hymn is the mother, is in another the wife. As the conceptions of the poet varied, so varied the nature of these gods. No-where is the wide distance which separates the ancient poems of India from the most ancient literature of Greece so clearly felt than when we compare the growing myths of the Veda with the full grown and decayed myths on which the poetry of Homer is founded. The Veda is the real Theogony of the Aryan races" Max Muller's Comparative Mythology. *Selected Essays, Vol 1. (1881) p. 381.*

মরুৎগণের বাহন পৃষতী। সে পৃষতী কি? ঐতিহাসিকগণ বলেন, শ্বেত বিন্দুচিহ্নিত মৃগই পৃষতী এবং উহাই মরুৎগণের বাহন। নৈরুক্তগণ বলেন নানা বর্ণ মেঘমালাই পৃষতী। মেঘকে ঝড়ের বাহন বলিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব নহে।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে দেবদিগের সাধারণ নাম মরুৎ হইয়া গিয়াছে, এবং দেবপতি ইন্দ্রকে "মরুতাং পতি" বলিয়া সম্বোধন করা হয়। তাহার উৎপত্তি ঋগ্বেদেই স্পষ্ট দেখা যায়। বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র ঝড়ের সহায়তায় বৃষ্টি দান করেন; সুতরাং ঋগ্বেদে একটি কল্পনা আছে যে, ইন্দ্র যখন মেঘরূপ অহিকে হনন করিয়া বৃষ্টি দান করেন, তখন মরুৎগণ, অর্থাৎ ঝড়, তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল। অতএব বৃষ্টিদাতা ইন্দ্রকে মরুৎদিগের পতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে ইন্দ্র ও মরুৎগণের একত্র স্তুতি আছে। কিন্তু বোধ হয় এইরূপ একত্র স্তুতি হওয়াতে কোন কোন ঋষি সম্প্রদায়ের পূর্ব্বকালে আপত্তি ছিল; তাঁহারা ইন্দ্রকে অতিশয় বড় মনে করিতেন, এবং মরুৎদিগকে তাঁহার উপযুক্ত সহায় বলিয়া মনে করিতেন না। প্রথম মণ্ডলের ১৬৯ সূক্তে এই ভাব কিছু কিছু লক্ষিত হয়। সেই সূক্তে ইন্দ্র ও মরুৎগণের কথোপকথন আছে, ইন্দ্র একাকীই অহিকে বিনাশ করিয়াছেন, একাকীই উপাসনার পাত্র এইরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মরুৎগণ ইন্দ্রের অনেক স্তুতি করিয়া অবশেষে তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন।

ত্বষ্টা দেবগণের অস্ত্রাদি নির্ম্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্ম্মা। তিনি ইন্দ্রের বজ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও ব্রহ্মণস্পতির পরশু তীক্ষ্ণ করিয়াছিলেন। তিনি গর্ভস্থ সন্তানের রূপ বিধান করেন, সমস্ত জীবের রূপ ব্যক্ত করেন, এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের রূপ বিধান করিয়াছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। ত্বষ্টার সৃষ্ট পান পাত্র ঋভুগণ চারিখণ্ড করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবাহ সম্বন্ধে যে আখ্যান আছে তাহাও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্র ত্বষ্টাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার গৃহে সোমপান করিয়াছিলেন এরূপ বিবরণ আছে। (৩।৪৮।৪ এবং ৪।১৮।৩।) এবং ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলেন এরূপও আখ্যান আছে। (১০।৮।৯।) এ আখ্যানের উৎপত্তি ও অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

ঋগ্বেদে পর্জ্জন্য শব্দ কখন মেঘ অর্থে, এবং কখনও মেঘরূপ বৃষ্টিদাতা দেব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১।৩৮।৯ ঋকে আছে যে মরুৎগণ উদক-ধারী পর্জ্জন্য দ্বারা দিবাকালেও অন্ধকার করিয়াছেন। এখানে পর্জ্জন্য অর্থে কেবল মেঘ মাত্র, মেঘরূপ দেব নহে। আবার ৫ মণ্ডলের ৮৩ সূক্তে এবং ৭ মণ্ডলের ১০১ ও ১০২ সূক্তে পর্জ্জন্যকে বৃষ্টিদাতা ও বজ্রধারী দেব বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। ডাক্তার বুলর ঋগ্বেদের পর্জ্জন্য ও লিথুনীয়দিগের বজ্রদেব পর্কুনকে একই দেব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

সোমরস প্রাচীন আর্য্যদিগের যজ্ঞের একটি প্রধান সাধন, সুতরাং সোমকে প্রাচীন আর্য্যগণ দেব বলিয়া উপাসনা করিত, এবং জেন্দ অবস্তায় হওমার অনেক স্তুতি দৃষ্ট হয়, যথা—

"আমরা কাঞ্চনবর্ণ ও দীর্ঘ হওমাকে যজ্ঞদান করি; আমরা হর্ষদাতা হওমাকে যজ্ঞদান করি, তিনি জগৎকে বৃদ্ধি করিতেছেন। আমরা হওমাকে যজ্ঞদান করি, তিনি মৃত্যুকে দূরে রাখিয়াছেন"। জেন্দ অবস্তা। দ্বিতীয় সিরোজা।

"যে মনুষ্য হওমা পান করিবে, সে যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিবে"। জেন্দ অবস্তা। বহরাম যাস্ত।

ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে আমরা দেখিতে পাই যে সবিতা আপন দুহিতা সূর্য্যাকে সোম রাজার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আবার ৯।১১৩।৩ ঋকে আছে, যে সূর্য্যের দুহিতা পর্জ্জন্য কর্তৃক বর্দ্ধিত সোমকে আনয়ন করেন। ইহার প্রকৃত অর্থ কি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। ৯।১।৬ ঋকে আছে, সূর্য্যের দুহিতা পরিস্রুত সোমকে বিশুদ্ধ করেন। সূর্য্য কিরণে সোমরস মাদকতা প্রাপ্ত হয়, এই কি সূর্য্যার সোমের সহিত বিবাহের উপাখ্যানের প্রকৃত অর্থ?

এক্ষণে আমরা যম সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পুরাণের যম কে, তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ঋগ্বেদে প্রথমে কাহাকে "যম" বলিত? বিবস্বানের দ্বারা ত্বষ্টকন্যা সরণ্যুর গর্ভে যম ও তাঁহার ভগিনী যমীর জন্ম হয়, তাহা আমরা অশ্বিদ্বয়ের বিবরণে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। বিবস্বান্ অর্থে আকাশ, সরণ্যু অর্থে ঊষা। আকাশ ঊষাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের পুত্র যম কে? মক্ষমূলর উত্তর করেন দিবস বা সূর্য্যই যম। আখ্যানে আছে, যে, সরণ্যু যমকে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন;—তাহার

অর্থ উষা অদৃশ্য হইল, দিবস হইয়াছে। আবার আখ্যানে আছে যে বিবস্বান্ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন;—তাহার অর্থ সায়ংকালের সন্ধ্যা আকাশকে আলিঙ্গন করিল।

এই মত যদি ঠিক হয় তাহা হইলে দিবস বা সূর্য্য এবং রাত্রিকেই প্রথম ঋষিগণ যম ও যমী নাম দিয়াছিলেন। এই মতটি গ্রহণ করিবার পক্ষে আমরা তিনটি প্রধান কারণ দেখিতে পাইতেছি।

(১) যম—বিবস্বান্ ও সরণ্যু, অর্থাৎ আকাশ ও উষার সন্তান বলিয়া ঋগ্বেদেই বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ ও উষার সন্তান দিবস বা সূর্য্য হওয়াই সম্ভব।

(২) যম শব্দের অর্থই যমক সন্তান। দিবস ও রাত্রিকে যমক সন্তান বলিয়া বর্ণনা করা সম্ভব।

(৩) পুরাণেও যমকে সূর্য্য না বলুক সূর্য্যের সন্তান বলে।

দিবস বা সূর্য্যরূপ যম পুরাণের মৃত্যুরাজ হইলেন কিরূপে? তাহাও অনুমান করা কঠিন নহে। প্রাচীন ঋষিগণ যেরূপ পূর্ব্বদিককে উৎপত্তি স্থল মনে করিতেন, পশ্চিম দিককে সেইরূপ জীবনের অবসান বলিয়া মনে করিতেন। সূর্য্য বা দিবস পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমদিকে অন্তর্হিত হয়েন, অর্থাৎ জীবনের ভ্রমণ শেষ করিয়া পরলোকের পথ দেখান। এইরূপে যম পরলোকের রাজা, এই অনুভব উদয় হইল। যম পাপাত্মাদিগের শাস্তি দেন, এ কথার উল্লেখ ঋগ্বেদের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এ সমস্ত গল্প পৌরাণিক, কালে ক্রমে কল্পিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ইরাণীয়দিগের ধর্ম্ম পুস্তক জেন্দ অবস্থায় যমকে "যিম" বলে। বেদে যেরূপ যমের পিতা বিবস্বান্, জেন্দ অবস্থায় যিমের পিতা বিবনঘৎ। বেদে যেরূপ পুণ্যাত্মা লোক যমের নিকট স্থান প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করে, জেন্দ অবস্থায়ও সেইরূপ পুণ্যাত্মা লোক ও উৎকৃষ্ট পশু পক্ষী যিমের সৃষ্ট উৎকৃষ্ট জগতে বাস করিতে পায়। পৌরাণিক যমপুরী ঠিক ইহার বিপরীত,—পাপীদিগের নরক।

পরে ইরাণে এই গল্প আরও বাড়িতে লাগিল, এবং সেই গল্প অবলম্বন করিয়া পারসীক কবি ফেরদৌসী তাঁহার রচিত শাহনামায় যিমকে যমশিদ্ নামে এক মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই যমশিদ্ যে ঋগ্বেদের যম তাহা অদ্বিতীয় ফরাসী পণ্ডিত বর্ণুফ (Burnouf)

প্রথমে আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন, যে, জেন্দ্‌ সীয় ঐতিহাসিক যমশিদ্‌, ফেরুদিন্‌ ও গর্শাস্প আর কেহ নহে, জেন্দ অবস্থার যিম, থ্রেতেয়ন, এবং কেরেশাস্প, এবং জেন্দ অবস্থার এই তিন জন আদিম মনুষ্য আর কেহ নহে, ঋগ্বেদের যম, ত্রিত ও কৃশাশ্ব!

১০ মণ্ডলের ১০ সূক্তে যম ও তাহার ভগিনী যমীর একটি কথোপকথন আছে। যমী তাঁহার ভ্রাতাকে স্বামী রূপে বরণ করিতে বার বার লালসা প্রকাশ করিতেছেন, এবং যম সে প্রস্তাব পাপজনক বলিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া ভগিনীকে অন্য স্বামী লাভের আশীর্ব্বাদ দিলেন। ১০ মণ্ডলের ১৪ সূক্তে যমের সম্বন্ধে পরলোকের কথা আছে, আমরা তাহা হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ব্রাহ্মণদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় এই ঋক্‌ গুলি উচ্চারণ করিতে হয়।

"যে পথ দিয়া আমাদিগের পূর্ব্বে পিতাগণ গিয়াছেন, সেই পুরাতন পথ দিয়া গমন কর। স্বধায় হৃষ্ট উভয় যম ও দেব বরুণ রাজাদ্বয়কে দেখিবে।

"পিতৃদিগের সহিত সঙ্গত হও; যমের সহিত সঙ্গত হও, পরম স্বর্গে যজ্ঞ ফল লাভ কর। দোষ ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রবেশ কর, দ্যোতমান শরীর ধারণ কর।

"এস্থান হইতে প্রস্থান কর; শীঘ্র প্রস্থান কর, পিতৃগণ তাঁহার জন্য এই লোক প্রস্তুত করিয়াছেন। যম তাঁহাকে দিবস, এবং জল ও আলোক দ্বারা ব্যক্ত একটি আবাস দিয়াছেন।

১০ মণ্ডল, ১৪ সূক্ত, ৭, ৮, ৯ ঋক্‌।

বিধবা বিবাহ।

এই প্রস্তাবে আমরা বিধবা বিবাহের পক্ষাপক্ষ বিচার করিব; বাধক সাধক উভয় বিধ প্রমাণ আহরণ করিব; অনন্তর তাহার পদ্ধতি বা প্রাচীন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা বর্ণন করিব।

প্রথমত বিধবা বিবাহের বিপক্ষে বাধক প্রমাণ ও অশাস্ত্রীয়তা বোধক তর্ক যথাযথ রূপে বর্ণিত হইবে, তৎপরে উক্ত বিবাহের সপক্ষে সাধক প্রমাণও শাস্ত্রীয়তা দ্যোতক যুক্তি বর্ণিত হইবে। বিচার দ্বারা পক্ষাপক্ষ ভঙ্গ করিয়া, এক বাক্যতা বা সামঞ্জস্য প্রণালী উন্নয়ন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন ও মতামত প্রকাশ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে; বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান পাঠক বর্ণিত পক্ষ দ্বয় উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিয়া স্বস্ব বুদ্ধিবলে সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন।

বিপক্ষে—বাধক প্রমাণ ও যুক্ত এইরূপে উন্নীত করা যাইতে পারে। যথা; যদিও কোন কোন স্মৃতিবাক্যে ও পুরাণ কথায় বিধবার পুনর্ব্বিবাহের যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্ক থাকা অনুভূত হয় বটে, পরন্তু সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সে সকল আচরণ যোগ্য বা গ্রহণ যোগ্য নহে। বোধ হইবে, যে, বিধবার পুনর্বিবাহ ধর্ম্ম নহে, কোনও কালে উহা সদাচার বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

সেই জন্যই প্রধান ঋষি ঐ কার্য্য করণ পক্ষে প্রতিকূল ছিলেন এবং উহার অশাস্ত্রীয়তা ও কদাচারতা দেখাইয়া বচন নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি মনু, যাঁহা অপেক্ষা মান্য, গণ্য আর কেহ নাই তিনিই বিধবা বিবাহ অবৈদিক, অশাস্ত্রীয় ও সাধু বিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। যথা,

"নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিযোগঃ কীর্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ।"

এই মনুবাক্যের ব্যাখ্যায় জানা যায় যে তাহার সময়ে যে কিছু বিবাহ বিধি প্রচারিত ছিল এবং যেগুলি বিবাহ বোধক বেদ-মন্ত্র বিদ্যমান ছিল, তাহার একটিতেও বিধবা বিবাহ হওয়ার কথা নাই। তাৎপর্য্য এই যে, যখন কোনও শাখায় ও কোনও মন্ত্রে বিধবার বিবাহ হওয়ার কথা নাই, তখন উহা অসদাচার, অশাস্ত্রীয়, ও আর্য্য ব্যবহারের বহির্ভূত।

বিবাহ-বোধক বেদ মন্ত্র গুলি দেখুন, দেখিতে পাইবেন তাহার কোনটিও বিধবা-বিবাহে সঙ্গত হইবে না এবং তাহার প্রত্যেকটির লক্ষ্য কন্যা-বিবাহের দিকে। যথা;

"অর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষত।
স ইমাং দেবো অর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু নামুতঃ।"

এই একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারা বধূ ও বর অগ্নিতে লাজা হোম করিয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে, এই কন্যা এক্ষণে অর্য্যমা নামক অগ্নির পূজা বা

ত্যাগ করিতেছেন। অগ্নিদেব এই কন্যাকে এ লোক হইতে পরিত্যাগ করুন, পরলোক হইতে পরিত্যক্ত করিবেন না।

বিবাহের সময়ে যে সকল মন্ত্র পড়া হয়, তাহার একটি এই; পরন্তু এটি কন্যা বিবাহের কথাই ব্যক্ত করে; বিধবা বিবাহের কথা বলে না।

"সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতি স্তুরীয়স্তে মনুষ্যজঃ।"

ইহাও একটি বৈবাহিক মন্ত্র। এই মন্ত্রটি বর কর্তৃক বধূ উদ্দেশে পঠিত হয়। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ;—

প্রথমত চন্দ্র তোমাকে লাভ করিয়াছিলেন, পরে গন্ধর্ব্ব, তৎপরে অগ্নি তোমার পতি, এক্ষণে মনুষ্যজাত আমিই তোমার পতি।

বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ মন্ত্রটিও বিধবা বিবাহের বিরোধী।

"সোমো দদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাং।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, বর সেই কন্যাকে অগ্নির নিকট হইতে লাভ করিলেন, এবং বর সেই অগ্নির পর চতুর্থ পতি। অপিচ, অগ্নি যে বরকে কন্যা দান করিল, যে বরের সহিত বিবাহ সংযোগ করিয়া দিল, সে বর মরিলে অন্য বর আর তাহাকে বিবাহ কালে "অগ্নির্মহ্য মথো ইমান্" অগ্নি আমাকে এই কন্যা প্রদান করিলেন, বলিতে পারে না। অতএব, বিধবা গ্রহণে মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ অসঙ্গত থাকায় বিধবা-বিবাহ বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ধর্ম্মার্থ যোগ্য হইতে পারে না, তবে কামভোগ চরিতার্থের উপযোগী সংযোগ মাত্র হইতে পারে।

বিবাহ বিষয়ক মন্ত্রের একটিও বিধবা বিবাহে খাটে না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না, সুতরাং বিধবাদের পাণিগ্রহণ অমন্ত্রক ও কামাচার পূর্ব্বক করিতে হয়। কাজে কাজেই তাদৃশী স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী মধ্যে গণ্য নহে; তাদৃশ আচারও ধর্ম্ম আচার নহে। বোধ হয়, তখনকার ভীল, কোল, ও সন্তাল প্রভৃতি অনার্য্য জাতিরা ঐরূপ কামাচার করিত, ধর্ম্ম মর্ম্ম বুঝিত না বলিয়াই করিত। পাছে, সেই কদাচার ও কুপ্রবৃত্তি আর্য্য সমাজে প্রবেশ করে, ব্যবস্থাপক মনু সেই আশঙ্কায় বলিয়াছিলেন;

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাহ কন্যাসু কচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়াহি তাঃ॥" [মনু, ৮ অধ্যায়।

বিবাহ বোধক মন্ত্র সকল কন্যাতেই প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ কন্যা বিবাহেই সমবেত আছে। যাহার কন্যাত্ব নষ্ট হইয়াছে বিবাহ-ঘটক কর্ম্ম সকল তাহাদের নাই, ইহা নিশ্চিত জানিবে।

এই মনু বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, মনু বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রীয় ও সদাচার যুক্ত বলেন নাই। মনু আরও বলিয়াছেন, যে, বিবাহ কর্ম্মের শেষাঙ্গ সপ্তপদী গমন সমাপ্ত হইলেই কন্যার কন্যাত্ব নাশ হয়, হইয়া ভার্য্যাত্ব জন্মে। যথা,—

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।

তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥"

পাণিগ্রাহক মন্ত্র সকল ভার্য্যাত্ব জন্মায়; পরন্তু সপ্তপদী গমনে তাহার সমাপ্তি হয়, ইহা বিদ্বান্‌গণ জানেন।

মনুর এই কথায় ব্যক্ত হইতেছে, যে, যতক্ষণ না সপ্তপদী গমন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ কন্যাত্ব থাকে, এবং তন্মধ্যে বরের অন্যথাগতি হইলে, কন্যাত্ব থাকা বিধায় কদাচিৎ তাহার পুনর্ব্বিবাহ হইলেও অসদাচার ও অধর্ম্ম হয় না। সপ্তপদী গমনের পর অর্থাৎ বিবাহ সংস্কার সমাপ্ত হইলে, পুনর্ব্বিবাহ অবশ্যই অশাস্ত্রীয় ও অধর্ম্ম, ইহা মনুর অভিপ্রায়। পরাশর ঋষিও এইরূপ বলিয়াছেন। যথা;—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু কন্যানাং * পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে, অর্থাৎ কন্যাত্ব থাকার অবস্থায়, বর যদি দেশান্তর গমন করে, বহুকালেও যদি ফিরিয়া না আইসে ও অস্তিত্ব সংবাদ অজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে তাহা এক বিপদ। এরূপ বিপদ হইলে, অথবা মরণরূপ বিপদ হইলে কিংবা বরের ক্লীবত্ব প্রকাশ হইলে, পাতিত্য ও সন্ন্যাস ঘটনা হইলে, সে কন্যা অন্য পতির আশ্রয় করিতে পারে। †

বিধবা বিবাহের সপক্ষগণও এই বচন দেখিয়া বিধবা বিবাহ ঋষিসম্মত, এইরূপ বলিয়া থাকেন পরন্তু তাঁহারা "কন্যানাং" স্থানে "নারীনাং"

---

* কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে "কন্যানাং" পাঠের পরিবর্ত্তে "নারীনাং" পাঠ থাকায় যে গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।

† এখন যেমন বিবাহ রাত্রেই সপ্তপদী গমন সম্পন্ন হইয়া থাকে, পূর্ব্বে সেরূপ হইত না, চতুর্থ দিবসে হইত; সুতরাং মধ্যবর্ত্তী তিন দিনে সকল ঘটনাই হইতে পারে, অসম্ভব কিছুই নাই।

পাঠ জানেন। ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য "নারীনাং" পাঠ দেখিয়া এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পরন্তু নন্দ পণ্ডিত যখন টীকা করেন, তখন তিনি নিজ আদর্শ পুস্তকে "কন্যানাং" পাঠ দেখিয়াছিলেন। বচনের পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে "কন্যানাং" পাঠই ঋষি প্রোক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, "নারীনাং" পাঠ লেখক প্রমাদ বলিয়া অবধারিত হয়। "কন্যানাং" পাঠ ঋষিপ্রোক্ত হইলে উপভুক্তা বিধবার বিবাহ অন্যায্য হইয়া পড়ে, ইহা ব্যাক্তি মাত্রেরই বুদ্ধিগম্য। বিশেষত পতি মরিলেই যদি পুনঃ পতি গ্রহণ করা ঐ বচনের অভিপ্রায় হয়, তবে বচনস্থ পতির নিরুদ্দেশ, প্রব্রজ্যা, মৈথুনাক্ষমতা, কুষ্ঠাদি রোগ ও অভক্ষ্য ভক্ষনাদি স্থলেও অন্য পতি গ্রহণ করা শাস্ত্র সম্মত ও ঋষির অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু কৈ? এ পর্য্যন্ত কোন সাধু ব্যাক্তি উক্ত বিধ বিপদ দেখিয়া বিধবাদিগকে পুনর্ব্বিবিবাহিতা করেন নাই। নারীর পতি মরিল, অমনি পরাশরের আজ্ঞায় তাহাকে অন্য পতি দেওয়া হইল এরূপ হইলে, ক্লীব-পতিকা নারীও বলিতে পারে, 'আমার পতি ক্লীব * আমাকেও অন্য একটি সক্ষম পতি দাও।" নিরুদ্দিষ্ট-পতিকা ও ব্যাধিগ্রস্ত-পতিকা রমণীও বলিবে, যে 'আমাদিগেরও পরাশরের মতে পুনর্ব্বিবাহ দাও।" উহাদের প্রত্যেকের অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলে সংসার পাপস্রোতে ভাসিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। অতএব পরাশরের অমন অসদভিপ্রায় হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিত কথা।

এ পর্য্যন্ত নিষেধবাদীর মত বলা হইল, এক্ষণে বৈধবাদীর অভিপ্রায় বর্ণন করা যাউক।

যাঁহারা বলেন, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রীয়, অশাস্ত্রীয় নহে, তাঁহারা প্রথমত একটি শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধার করিয়া থাকেন। যথা;

"তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ।"

[শ্রুতি।

সেই কারণে এক পুরুষের বহু পত্নী হইয়া থাকে, কিন্তু এক নারীর এক কালে বহু পতি হয় না।

---

* ক্লীব অনেক প্রকার। অক্ষম ও অল্পক্ষম উভয়কেই ক্লীব বলা যায়। অনেক অক্লীব পুরুষও বিশেষ বিশেষ নারীর মতে ও জ্ঞানে ক্লীব বলিয়া বিবেচিত হয়। এমত স্থলে উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে জগতে কি ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হইতে পারে, ভাবিলে হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।

শ্রুতি বলিতেছেন, "এক নারীর বহু সহপতি নিষিদ্ধ" অর্থাৎ এক সময়ে বহুপতি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। শ্রুতির ঐ কথায় অবশ্যই বুঝা যাইতে পারে, যে সময় ভেদে বহুপতি গ্রহণ অনিষিদ্ধ অর্থাৎ একটির মরণের পর অন্য একপতি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নহে এতদ্ভিন্ন দ্রৌপদী বিবাহ কালে যখন এক সময়ে পঞ্চপতি গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছিল, যুধিষ্ঠির তখন বলিয়াছিলেন,

"সূক্ষ্মো ধর্ম্মো মহারাজ! নাস্য বিদ্মোগতিং বয়ম্।"

হে মহারাজ। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহার গতি আমরা জানিতে পারি না।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক স্ত্রীর এক কালে বহুপতি হইলে তাহাতে ধর্ম্ম থাকিবে কি না, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। অতএব, যুধিষ্ঠির যখন এক সময়ে বহু পতিত্বের ধর্ম্মতা বিষয় সংশয় করিয়াছিলেন, অবশ্যই তখন তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অসংশয়িত হইতে পারে।

পরাশর সংহিতার ভাষ্য লেখক মাধবাচার্য্য আদিত্য পুরাণের একটি বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন * যে বিবাহিতা নারীর পুনর্বিবাহ কলিকালে নিষিদ্ধ বটে, পরন্তু উহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অনুষ্ঠিত হইত কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কলিকালেও বিধবা বিবাহ হইয়াছে এবং তাহাতে কোন নিন্দা হয় নাই।

যুধিষ্ঠির কলির প্রথমে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার ভ্রাতা অর্জ্জুন বিধবা নাগকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তদ্গর্ভে ইরাবান্ নামে পুত্র হইয়াছিল, সে পুত্র আনন্দিত হয়, এবং অর্জ্জুন ও লোকাপবাদে নিন্দিত হন নাই। যথা —

" অর্জ্জুনস্য সুতঃ শ্রীমান্ ইরাবান নাম বার্য্যবান্।
সুষায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥
ঐরাবতেন সা দত্তা অনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্।
এবমেষঃ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রেঽর্জ্জুনাত্মজ॥
স নাগলোকে সংবৃদ্ধো মাত্রা চ পরিরক্ষিত॥
পিতৃব্যেন পারত্যক্তঃ পার্থদ্বেষাদ্ দুরাত্মনা।
রূপবান্ বলসম্পন্নো গুণবান্ সত্যবিক্রমঃ॥

---

* উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহো জ্যেষ্ঠাংশো গোবধস্তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম॥

ইত্থং লোকঃ জগামাশু শ্রুত্বা তত্রার্জুনংগতম্।
সোহভিগম্য মহাবাহুঃ পিতরংসত্য বিক্রমঃ॥

ইত্যাদি ভীষ্মপর্ব্ব দেখ।

মহাভারতের এই আখ্যান দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, কলিকালেও বিধবা-বিবাহ হইত; হইলে তাহাতে নিন্দা হইত না। কলিকালেও বিধবাগণ ধর্ম্ম পত্নী হইতে পারিত, তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ ঔরসপুত্র বলিয়া মান্য গণ্য হইত, পৌনর্ভব বলিয়া নিন্দিত হইত না। ইহারও প্রমাণ উক্ত আখ্যানের শেষ ভাগে প্রত্যক্ত আছে। যথা,—

বিমোহিত মিরাবন্তং ন্যহনং বাক্সোহসিনা।
অজ্ঞানান্ অর্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্র মৌরসম্॥
জঘান সময়ে শত্রূন্ বাহ্লীকান্ ভীষ্ম রক্ষিণঃ॥

এই দেখুন, মহাভারতেও বিধবা নাগ কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে ঔরস পুত্র বলা হইয়াছে। অতএব, কলিকালেও বিধবা বিবাহ হইয়াছে, বিধবারাও ধর্ম্ম পত্নী হইয়াছে, তাহাদের গর্ভজাত সন্তানেরা ঔরস পুত্র বলিয়া সম্বোধিত ও সম্মানিত হইয়াছে। এইযাতে বলিয়াই কলিকালের ধর্ম্মোপদেষ্টা পরাশর মুনিও বলিয়াছেন

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎ সু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

পতি নিরুদ্দেশ হইলে মৃত হইলে, সন্ন্যাসী হইলে ক্লীব হইলে, পতিত হইলে, নারীদিগের অন্য পতি গ্রহণ করিবার বিধি আছে।*

শ্রী রামদাস সেন।

---

* নিষেধ-বাদীরা এই সকল কথার অনেক প্রকার খণ্ডন করিয়া থাকেন এবং নষ্টে মৃতে বচনটিকে বাগদত্তাচার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহার অন্যতর ব্যাখ্যাতা নন্দ পণ্ডিত বিদ্বন্মনোহরা নাম্নী টীকায় 'নারীনাং" পাঠের পরিবর্ত্তে 'কন্যানাং" পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদ্ব্যাখ্যানে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে, সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে অর্থাৎ কন্যাত্ব নাশের পূর্ব্বে উক্ত পাঁচ প্রকার বিপদ হইলে অন্য পতি গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে বিহিত। সে কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে

ব্রিটিশ ও বঙ্গীয় চিত্রাবলী।

২। গুইনিবিয়ার (Guinevere) ও শৈবলিনী।

এই চরিত্র দুইটির সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য আমরা ইহাদিগের জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা ভাগ করিয়া লইলাম। (ক) প্রসক্তি (খ) পাপ (গ) অনুতাপ (ঘ) প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তি (ঙ) পরিণাম। এই চরিত্র দুইটি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে, প্রথমে আমরা এই বিভাগানুসারে তাহা বলিব; পরিশেষে মোটের উপর দুই একটি কথা থাকিবে।

(ক) প্রসক্তি—

গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীর প্রসক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, ল্যান্সেলট ও প্রতাপকে অবলম্বন করিয়াই তাহা বলিতে হইবে। যাঁহারা আমাদিগের আলোচ্য গ্রন্থদ্বয় পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার কারণ বলা অনাবশ্যক কিন্তু একটি কথা এখানে বলিতে হইতেছে— আমরা এই প্রসক্তি অধ্যায়ে তাহাদিগের প্রসক্তিই দেখাইব, ন্যায় অন্যায়ের কথা বড় একটা পাড়িব না। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমরা "প্রসক্তি" ও "পাপ" দুইটিকে পৃথক করিয়া লইয়াছি।

শৈবলিনীর প্রসক্তির আরম্ভ চন্দ্রশেখরের উপক্রমণিকায়। মূল আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই বঙ্কিম বাবু শৈবলিনী ও প্রতাপকে আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে একত্র করিয়া ধরিয়াছেন। "শৈবলিনী তখন ৭।৮ বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোর বয়স্ক।"

বালক বালিকারা যেরূপ খেলিয়া থাকে, শৈবলিনী ও প্রতাপ ঠিক সেইরূপই খেলা করিত, আর বালক বালিকার এরূপ ঘনিষ্ঠতায় যে ফল ফলিয়া থাকে, এখানেও তাহাই ফলিল। গ্রন্থকার লিখিলেন "এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ১৬ বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভাল বাসিতে জানে না।" শৈবলিনীর বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, এ ভালবাসা ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে চলিল। শেষে শৈবলিনী বুঝিল যে "প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই!"

বঙ্কিম বাবু এইরূপ করিয়া ধীরে ধীরে দুই এক কথায় প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর ভালবাসার উৎপত্তি দেখাইলেন, তাহার কারণ বলিলেন এবং

তৎসম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বলিলেন। গুইনিবিয়ারের চিত্রে এরূপ কিছু আমরা দেখিতে পাই না। ব্রিটিশ কবি এইরূপ করিবার কোন আবশ্যকতা মনে করিলেন না। গুইনিবিয়ারের এই প্রসক্তির উৎপত্তি স্থান সময় বা কারণ আমরা প্রথমে বড় একটা দেখিতে পাই নাই। গুইনিবিয়ার যখন পাপের অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিল, তখনই কবি আমাদিগকে সেই কথাটি কৌশলে বলিয়াছেন।

"And ev'n in saying this,
Her memory from old habit of the mind
Went slipping back upon the golden days
In which she saw him first, when Lancelot came,
Reputed the best knight and goodliest men,
Ambassador, to lead her to his lord
Arthur, and led her forth, and far ahead
Of his and her retinue moving, they
Rapt in sweet talk or lively, all on love
And sport and tilts and pleasure &c
&c &c &c
But when the Queen immersed in such a trance,
And moving thro' the past unconciously,
Came to the point where first she saw the King
Ride toward her from the city, sigh'd to find
Her journey done, glanced at him, thought him cold,
High, self-contained, and passionless, not like him,
'Not like my Lancelot'—&c &c

এই স্থলেই আমরা প্রণয় বৃত্তান্তটি জানিলাম। ইহার কারণ আমরা গুইনিবিয়ারের স্ব-মুখে শুনিয়াছি। গুইনিবিয়ার এক স্থলে এইরূপ বলিয়াছে,—

"Arthur, my lord, Arthur, the faultless king,
The passionless perfection, my good lord,—
But who can gaze upon the sun in heaven ?
He never spoke word of reproach to me,
He never had a glimpse of mine untruth,
He cares not for me : only here to-day
There gleam'd a vague suspecion in his eyes :
Some meddling rogue has tamper'd with him —else
Rapt in this fancy of his Table Round,
And swearing men to vows impossible,
To make them like himself but, friend, to me
He is all fault who hath no fault at all
For who loves me must have a touch of earth ,
The love seen makes the colour : &c.——'

এই উক্তিটি পড়িয়া অন্যে কি ভাবিয়া থাকেন, জানি না, কিন্তু আমরা ইহাতে গুইনিবিয়ারের কিছু নীচত্ব দেখিতে পাই। গুইনিবিয়ারকে লঘুচেতা করিতে ব্রিটিশ কবির ইচ্ছা ছিল কিনা জানি না, কারণ অন্য কোথায়ও এইরূপ দেখিতে পাই না, কিন্তু আমাদিগের কবি যে কখনও শৈবলিনীকে এই-রূপ করিতে চাহেন নাই, নিরাপত্তিতে একথা বলা যাইতে পারে; সুতরাং আমরা তাঁহার শৈবলিনীর আসক্তির কারণ প্রবলরূপে দেখিতে পাই।

শৈবলিনী ও গুইনিবিয়ার উভয়েরই প্রসক্তির প্রগাঢ়তা দেখান কবি-দ্বয়ের লক্ষ্য ছিল। ইহার উদ্দেশ্য আমরা পরে বলিব। অবস্থার পার্থক্য-বশত এই প্রসক্তি দেখাইবার সুযোগও পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। কোন একটি জিনিসের বল পরীক্ষা করিতে হইলে যেরূপে তাহার বিরুদ্ধে অন্য একটি বল প্রয়োগ আবশ্যক হয়; প্রণয় বল পরীক্ষা করিতেও প্রায় সেইরূপ আবশ্যক। প্রণয় প্রতিরোধী কতকগুলি অবস্থার সংঘর্ষণে আমরা এই বল স্ফুটতর দেখিতে পাই। গুইনিবিয়ারের জীবনে এরূপটি ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার প্রেম পরিতৃপ্ত—বিঘ্নশূন্য; সুতরাং এস্থলে তাহা দেখাইতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক। এখানে মুখে কিছু না বলিয়া কার্য্যের উপরে নির্ভর করা যায় না। তাই টেনিসন ইহা কতক লিখন ভঙ্গি দ্বারা কতক উঁহাদিগের স্ব-মুখ বহির্গত উক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন।

প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কেবল একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। গুইনিবিয়ার যখন স্বীয় পাপকার্য্য জন্য অনুতপ্তা, যখন তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত, তখনও আমরা দেখিয়াছি ল্যান্‌সেলট্ তাহার অন্তর হইতে উঠিয়া যায় নাই। অনুতাপ করিতে করিতেও সেই ভূত কথা মনে পড়িল—সেই প্রথম সাক্ষাৎ, সেই প্রণয় সম্ভাষণ, সেই সুখের জীবন, একে একে সব মনে পড়িল। এই স্থলটি আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

এ ত গেল অনুতাপের আরম্ভে। শেষেও আমরা ইহা দেখিতে পাই। আর্থর চলিয়া গেলে গুইনিবিয়ার যে অনুতাপসূচক, হৃদয়ভেদী কথাগুলি বলিয়াছিলেন,—তাহাতেও আমরা দেখিতে পাই, তাহার অন্তর সম্যক্‌রূপে ল্যানসেলট্-চিন্তা বিমুক্ত হইতে পারে নাই।

"The shadow of another claves to me,
And makes me one pollution."

ইহা দ্বারা কবি গুইনিবিয়ারের প্রসক্তির প্রগাঢ়ত্ব ও স্থায়িত্ব দেখাইয়া লইয়াছেন।

বঙ্কিম বাবুর এ সম্বন্ধে অনেকটা সুযোগ ছিল। তাঁহার শৈবলিনী ও প্রতাপের মিলন পথে অনেকটা বাধা ছিল। স্বয়ং প্রতাপই তাহার একটি প্রকাণ্ড বিঘ্ন। তাই শৈবলিনীর প্রণয় এত খুলিয়াছে। বিবাহ হইবে না, অবস্থা প্রতিকূল, তাহাতেই তাহাদিগের একদিন ডুবিয়া মরিতে সাধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও শৈবলিনীর প্রণয় পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই, তাই প্রতাপের ন্যায় সে ডুবিতে পারিল না। কিন্তু পূর্ণতা নাই লাভ করুক, অনেকটা বিকাশ হইয়াছিল, ইহা দেখান হইয়াছে। ক্রমে শৈবলিনীর বিবাহ হইল, শৈবলিনী সংসারী হইল কিন্তু তাহার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই। সেই প্রতাপ আসিয়া তাহার অন্তরটি যুড়িয়া বসিল। শৈবলিনীর প্রণয়ে মোহ জন্মিল। এইখানে আমরা এ প্রণয়ের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইলাম। যখন আমরা শৈবলিনীকে ভীমা পুষ্করিণী মধ্যে অত ব্যাপিকা, অত সাহসিনী দেখিতে পাইলাম, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, যে, শৈবলিনী এখন সে মোহে উন্মত্তা—শৈবলিনীর হৃদয় এখন অশান্তিতে পূর্ণ। যখন আমরা শৈবলিনীকে নির্ব্বিবাদে লরেন্স ফষ্টরের সহিত গমন করিতে দেখিলাম, সুন্দরীর সহিত তাহার কথোপকথন শুনিলাম, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, শৈবলিনী কেন এত উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া পড়িয়াছে। যাহার মনে সুখ শান্তি নাই, তাহার আবার ভবিষ্যৎদৃষ্টি কিসের? তাহার আবার সমাজ-ভয় কিসের? শৈবলিনী একস্থলে বলিয়াছে "পৃথিবীতে আমার ভয় নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়?" লজ্জা, ভয়, অভিমান যাহাই বল, সবই জীবনের জন্য। যাহার জীবনভার দুর্ব্বিসহ, তাহার ইহাতে ভয় কি? অনেকে শৈবলিনীর চরিত্রে অস্বাভাবিকতা দেখিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিম বাবুর প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা জন্যই হউক, বা যুক্তিসঙ্গত অন্য কারণেই হউক, আমরা ইহাতে এত দোষ দেখি না। শৈবলিনীর চরিত্র যে ঠিক বাঙ্গালির মেয়ের মত হয় নাই, এ কথা সম্পূর্ণ আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তবে একটি কথা আছে। শৈবলিনীই বল, আর চন্দ্রশেখরই বল, ঠিক মানুষ গড়া কবির অভিপ্রায় নহে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই মানবচিত্র কয়েকটি অবলম্বন করিয়া ভারতরাজ্যের কতকগুলি চিত্র বিকাশিত করাই

তাঁহার উদ্দেশ্য। কবি ঐরূপ করিয়া শৈবলিনীকে উচ্ছৃঙ্খলা করিয়া শৈবলিনীর মোহ বা উন্মত্ততা, তাহার যন্ত্রণারাশি, যেরূপ স্ফুটতর করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আর কিসে হইত? হৃদয়ে যখন একটি ভাব সমধিক প্রবল হইয়া উঠে, তখন আমরা অন্য সব বিস্মৃত হইয়া কেবল তন্ময় হইয়া পড়ি। তাই আমরা শৈবলিনীকে প্রতাপ মিলনেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীজাতি-সুলভ ভাবগুলি পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। এটি ইংরাজি শিক্ষার কুফল বলিয়া কাহাকেও দুঃখিত হইতে হইবে না; অন্য সকল ঠিক থাকিলে, বঙ্কিম বাবুর জন্য সে ভয়টি না করিলেও চলিতে পাবে। কথা প্রসঙ্গে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। শৈবলিনীর প্রসক্তির প্রগাঢ়তা দেখাইবার জন্য বঙ্কিম বাবু অনেক করিয়াছেন। তিনি কতক কার্য্য দ্বারা দেখাইয়াছেন, কতক তাহাদিগের কথোপকথন দ্বারা বুঝাইয়াছেন, নিজে বড় একটা বেশি বলেন নাই। শেষ উপায়টি দুইয়েরই প্রায় এক। এ প্রসক্তির গাঢ়ত্ব ও স্থায়ীত্ব দেখাইতে বঙ্কিম বাবুও পরিবর্ত্তিতা শৈবলিনীর মুখ হইতে দুই একটি কথা বাহির করাইয়াছেন। তাই আমরা শেষেও শৈবলিনীকে বলিতে শুনিয়াছি,—

"তুমি (প্রতাপ) থাকিতে আমার সুখ নাই;—যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।" এখানে যদিও শৈবলিনী ঠিক ইহা বলেন নাই, যে, The shadow of another cleaves to me, তবু ইহাতে এমনই কিছু আছে, যদ্দ্বারা শৈবলিনীর প্রণয়ের প্রগাঢ়ত্ব বেশ খুলিয়াছে। সাধনা-বলে গতি ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু শৈবলিনী এত সাধনা করিয়াও এরূপ স্থির হইতে পারে নাই, যে, কোন দিনও সে প্রসক্তি তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

এইরূপে আমরা দেখিলাম যে, শৈবলিনী ও গুইনিবিয়ার উভয়েরই প্রসক্তি প্রগাঢ়, স্থায়ী ও অপরিমেয়। এখন আমরা অন্য কথা বলিব।

(খ) পাপ—

আমরা এখন গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীর পাপের কথা কিছু বলিতে চাহি। উভয় দেশের কবিই এই চরিত্র দুইটিতে এক একটি পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই পাপের প্রকৃতি ও পরিণাম দেখাইতেই শৈবলিনী

ও গুইনিবিয়ার সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহা দেখাইতেই "চন্দ্রশেখর" ও "Guinevere" রচিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে এক স্থলে বলিয়াছি, যে, যাহার ধর্ম্ম ভাব যত উন্নত হইবে, ততই তাহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি বাড়িবে। অন্যে যাহা পাপ বিবেচনা করে না, তাহা তাহার নিকট পাপ বিবেচিত হইবে। ব্রিটিশ কবি টেনিসন সম্যক্ পতিতা গুইনিবিয়ারের চরিত্রে যতটা পাপ কল্পনা করিয়াছেন, আমাদিগের সতীভূমি আমাদেশের কবি বঙ্কিমচন্দ্র গুইনিবিয়ার হইতে অনেক উচ্চে স্থিতা শৈবলিনীর চরিত্রে তিনি তত পাপ দেখিতে পাইয়াছেন। এখানেও আবার আমরা সেই জড়ভাব ও আধ্যাত্মিক ভাবের পার্থক্য দেখিতে পাই। কথাটি আমরা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব।

একই পাপের চিত্র অঙ্কন দুইয়েরই উদ্দেশ্য, এবং সেই পাপ যত সূক্ষ্ম করিতে পারা যায়, তজ্জন্য দুই কবিই চেষ্টা করিয়াছেন। পাপ সূক্ষ্ম করা কথাটায় বুঝি কিছু গোল রহিয়া গেল। পাপ সূক্ষ্ম করার অর্থ পাপের কতকগুলি কারণ (extenuating circumstance) দেখান ও পাপের কঠোরতা হ্রাস করা। এইরূপ কারণ আমরা উভয়ের চরিত্রেই দেখিতে পাই। তবে তাহা ঠিক একরূপ নহে। আমরা ক্রমে তাহা দেখাইতেছি।

প্রথমে গুইনিবিয়ারের কথা বলিয়া লই। গুইনিবিয়ার ব্রিটন দেশস্থ কামিনী হইলেও, তাহার বিবাহটি ঠিক তদ্দেশীয় প্রণালীতে হয় নাই। একেবারে যে হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না; কারণ প্রাপ্তবয়স্কা গুইনিবিয়ারকে অতি সহজবোধ্য ভাষায় ধর্ম্মমন্দিরে বসিয়া বলিতে শুনিয়াছি,—

'King and my lord, I love thee to the death!

কিন্তু এ বিবাহে গুইনিবিয়ারের পূর্ব্ব সম্মতি গ্রহণ করা হয় নাই। তখনকার বিবাহ কার্য্য এইরূপে হইত বলিয়াই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, আমরা গুইনিবিয়ারকে ইচ্ছার বিরুদ্ধ আর্থরকে বিবাহ করিতে দেখিলাম। বলা বাহুল্য, যে, এই বিবাহের পূর্ব্বেই ল্যান্সেলোটের প্রতি তাহার অনুরাগ সঞ্জাত হইয়াছিল। ইহা একটি গুরুতর ঘটনা। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি extenuating circumstacnes আছে; তন্মধ্যে তাহার প্রসক্তির প্রগাঢ়ত্বও একটি। গুইনিবিয়ারের ল্যান্সেলটাসক্তি এত প্রবল করিয়া কবি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, যে, এ পাপ সাধারণ কুপথগামিনী কামিনীদিগের ন্যায় যৌবনচাঞ্চল্যজনিত কিছু নহে, মাত্র

পশুভাব ইহাতে নিহিত নাই, ইহা পাপ হইলেও সাধারণ পাপ হইতে অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ। গুইনিবিয়ারের বিবাহ যদি আর্থরের সহিত না হইয়া ল্যান্‌সেলটের সহিত হইত, তবে আমরা গুইনিবিয়ারকে একজন অসামান্যা সতী বলিতে পারিতাম। ইহাও কম কথা নহে। এ ছাড়া গুইনিবিয়ারের পাপ সূক্ষ্ম করিতে কবি আরও একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। গুই-নিবিয়ারের একটি বই পাপ নাই। এই পাপে পাপী হওয়া ভিন্ন গুইনি-বিয়ার সাধু চরিত্রা। আর্থরের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল না সত্য, কিন্তু আর্থরের মহত্ত্ব তাহার নিকট আদরণীয়। আর্থরের প্রতি তাহার ভক্তি (Regard) অচলা। আর্থরের উন্নত চরিত্রে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর্থর সম্বন্ধে গুইনিবিয়ারের প্রত্যেক উক্তিই আমাদিগের এই কথার প্রমাণ।

এখন শৈবলিনীর কথা বলা যাউক। যে সকল Extenuating circumstances আমরা গুইনিবিয়ারের পক্ষে দেখাইয়াছি, শৈবলিনীর পক্ষে তৎসমস্তই আছে। শৈবলিনীর বিবাহও অধিক বয়সে, তাহার মনের সম্মতি না লইয়াই হইয়াছিল। শৈবলিনীরও প্রতাপাসক্তি ঐ রূপই প্রবলা ছিল, এবং শৈবলিনীর তাহার স্বামীর প্রতি বড় ভক্তি (Regard) এবং তাঁহার মহত্ত্বে বিশ্বাস ছিল। এ সকলই ছিল এবং ইহা ছাড়াও অনেকগুলি ছিল। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রসক্তিতে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল—বাল্যাবধি একত্র সহবাস, একত্র ক্রীড়া ইত্যাদি। শৈবলিনী প্রথমে জানিত, যে, প্রতাপের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে, সুতরাং প্রতাপকে ভালবাসিতে প্রথমে তাহার কোন পাপ বোধ হয় নাই।*

এখন উভয়ের পাপের প্রকৃতি দেখিতে হইবে। শৈবলিনীর পাপ তাহার মনেই সীমাবদ্ধ—শৈবলিনী মনে মনেই অসতী; কিন্তু গুইনিবিয়ারের পাপ সেরূপ নাই। গুইনিবিয়ার সম্যক্ পতিতা ভ্রষ্টা। সকল কথা জড়া-

---

* গুইনিবিয়ার সম্বন্ধেও এইরূপ একটি কথার আভাস পাওয়া যায়। Murlin একস্থলে Vivienকে বলিয়াছে।

" Sir Lancelot went ambassador, at first,
To fetch her, and she watch'd him from the walls.
A rumour runs, she took him for the king,
So first her fancy on him." কিন্তু একথা অন্য কোথায় স্পষ্ট দেখিতে না পাইয়া, আমরা গুইনিবিয়ার সম্বন্ধে তাহা বলি নাই।

ইয়া ইহা বলা যায়, যে. শৈবলিনীর এখন পাপ এত সূক্ষ্ম, যে, অন্য দেশে ইহা পাপ বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। গুইনিবিয়ারের পাপ মোটা রকমের। সকল জড়াইয়া তাহার পাপও কিছু হ্রাস করা যায় বটে, কিন্তু তবু তাহা শৈবলিনীর পাপ হইতে অনেক ভারি, অথচ টেনিসনের নিকট গুইনিবিয়ার যেরূপ পাপিষ্ঠা, বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট শৈবলিনী তদ্রূপই পাপিষ্ঠা। এ নৈতিক তত্ত্ব লইয়া অধিক কথা বলিবার স্থান এ নহে। আমরা সংক্ষেপে এতৎ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

শৈবলিনী এক স্থলে বলিতেছিল, —"অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম পরকাল নষ্ট করিলাম।" আমাদিগের কবি তখন বলিলেনঃ—

"পাপিষ্ঠা শৈবলিনী এ কথা মনে করিল না, যে পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একদিন সে এ কথা বুঝিবে; একদিন প্রায়শ্চিত্তের জন্য সে অস্থি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা না থাকিলে, আমরা এ পাপ চিত্রের অবতারণা করিতাম না।"

(গ) অনুতাপ ;—

সকল বিষয়েরই প্রায় একটা সময় স্তর আছে। অনুতাপেরও তাহাই। যাহারা পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সকলেরই যে সকল সময়ে অনুতাপ হইবে এরূপ ভরসা করা যায় না। প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই, যে, পাপকার্য্যে যখন আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ পরিতৃপ্ত হয়, বা যখন সেই পাপকার্য্য অভীষ্ট ফলোৎপাদক হয় না, অথবা যখন তাহার অনুষ্ঠানে বিশেষ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখনই পাপীর হৃদয়ে পাপানুষ্ঠানজনিত কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে। গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনী উভয়ের পক্ষেই ঠিক এই কথাটি সঙ্গত হইতে পারে। গুইনিবিয়ারের পাপানুষ্ঠান অধিক দিন হইতেই চলিতেছিল, কিন্তু তাহাকে পূর্ব্বে কখন বিশেষ একটা অনুতাপ করিতে দেখি নাই। যে পর্য্যন্ত গুইনিবিয়ারের কলঙ্কের কথা প্রকাশিত হয় নাই, সে পর্য্যন্ত আমরা তাহাকে অব্যাথিতচিত্তে অসঙ্কুচিত ভাবে পাপস্রোতে গা ঢালিয়া দিতে দেখিয়াছি। পাপের সহবাসে থাকিয়া কখনও তাহাকে কষ্ট পাইতে দেখি নাই। কিন্তু যখন তাহাদিগের সেই পঙ্কিল প্রণয়-ব্যাপার ধূর্ত্ত মড্রেডের (Modred) দৃষ্টিগোচর হইল, তখন

আর গুইনিবিয়ারকে পূর্ব্বের ন্যায় স্থির ও অসঙ্কুচিতচিত্ত দেখিতে পাইলাম না।

Hence forward rarely could she front in hall,
Or elsewhere, Modred's narrow foxy face,
Heart-hiding smile, and gray persistent eye:
Hence forward too, the Powers that tend the soul,
To help it from the death that cannot die,
And save it even in extremes, began
To vex and plague her. Many a time for hours,
Beside the placid breathings of the King,
In the dead night, grim faces came and went,
Before her, or a vague spiritual fear—
Like to some doubtful noise of creaking doors,
Heard by the watcher in a haunted house,
That keeps the rust of murder on the walls—
Held her awake: or if she slept, she dream'd
An awful dream, for then she seem'd to stand
On some vast plain before a setting sun
And from the sun there swiftly made at her
A ghastly something, and its shadow flew,
Before it, till it touch'd her, and she turn'd—
When lo ! her own, that broadening from her feet,
And blackening, swallow'd all the land, and in it,
Far cities burnt, and with a cry she woke.
And all this trouble did not pass but grew ;
Till ev'n the clear face of the guileless King,
And trustful courtesies of household life,
Became her bane:—

গুইনিবিয়ারের পাপের শাস্তি আরম্ভ হইল—গুইনিবিয়ারের অন্তরে অন্তরে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পাপপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে তাহার ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু প্রলোভনের বস্তু ঐরূপ নিকটে রাখিয়া তাহার আকর্ষণ অবহেলা করিতে তাহার সাধ্য ছিল না। কোন বিষয়ে আসক্তি জন্মিলে তাহা পরিত্যাগ করা সহজ কথা নহে। তাই গুইনিবিয়ার ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ল্যান্সেলট্‌কে বলিলে ;—

" O Lancelot, get thee hence to thine own land,
For if thou tarry we shall meet again,

And if we meet again, some evil chance,
Will make the smouldering scandal break and blaze,
Before the people, and our lord the King,

কিন্তু এইরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই হইল ;—

— Lancelot ever promised, but remain'd,
And still they met and met.

কিন্তু গুইনিবিয়ারের চিত্তে যে আগুন জ্বলিয়াছে, অত সহজে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে কেন ?

" ———Again she said,
" O Lancelot, if thou love me get thee hence."

পরিশেষে বিদায়ের দিন অবধারিত হইল। আবার মড্রেড আসিয়া বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইল। তখন গুইনিবিয়ার ল্যান্সেল্টকে বলিলেন,

" ———The end is come
And I am shamed for ever"

ল্যান্সেলট গুইনিবিয়ারকে লইয়া দেশে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু গুইনিবিয়ার এখন আর তাহাতে সম্মতি দিতে পারিল না। এখন তাহার মনে অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্মের ঈষৎ আলোকে তাহার পাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাই সে প্রাণপ্রতিমা ল্যান্সেলটের অমন প্রেমপূর্ণ কথায়ও সম্মতি দিতে পারিল না। গুইনিবিয়ার যখন সস্নেহে ল্যান্সেল্টকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

"———Lancelot, will thou hold me so ?
Nay, friend, for we have taken our farewells.
Would God that thou couldst hide me from myself,
Mine be the shame, for I was wife, and thou
Unwedded : yet rise now, and let us fly,
For I will draw me into sanctuary,
And bide my doom,

গুইনিবিয়ারের এই কথাটিতে যেমন একদিকে ল্যান্সেলটের প্রতি তাহার প্রেমসক্তি খুলিয়াছে, অন্যদিকে তাহার অনুতপ্ত হৃদয় খানিও তেমন প্রকাশিত হইয়াছে। গুইনিবিয়ার ল্যান্সেলটের নিকট জন্মের তরে বিদায় গ্রহণ করিয়া Almesburyর ধর্ম্ম মন্দিরে গমন করিল। পাপের সংস্পর্শ অনেকটা ছাড়িয়া আসিল। গুইনিবিয়ারের অন্তঃকরণে বড়ই যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল।

And in herself she moan'd—too late—too late.

গুইনিবিয়ারের পাপবোধ ও তজ্জনিত অনুতাপ এইরূপে জন্মিল।

শৈবলিনীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেও আমরা ঠিক ইহাই দেখিতে পাইব। শৈবলিনীর হৃদয়খানি প্রতাপে ভরা—প্রতাপের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার্য্য। প্রতাপ-প্রাপ্তিপথে সে কোন বিঘ্নকেই বিঘ্ন জ্ঞান করে নাই;—প্রতাপকে পাইবার জন্য সে স্ত্রীজনোচিত লজ্জা, ভয়, প্রভৃতি সকলি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে। এ পথে এ পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিন্তু শতসহস্র বিঘ্ন পায়ে ঠেলিয়াও সে যখন প্রতাপের নিকট শুনিল যে তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার নহে। যখন এইরূপ একটি অনতিক্রমণীয়া বাধা আসিয়া তাহার সম্মুখে পড়িল, তখন আর তাহার পূর্ব্বের আত্ম বিস্মৃতি রহিল না। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

"শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীর পার্শ্বে শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল,—সেই করবীর সর্ব্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত, কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল! শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল। একমুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। আত্মহত্যার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শৈবলিনী ভাবিল "মরি ত বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব, যে, আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তার পর মরিব।—আর তিনি—যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি, বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁথিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই, কখন ভাল বাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া

থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?" শৈবলিনীর অনুতাপের প্রথম অধ্যায় এইরূপে আরম্ভ হইল। আশাপথে বিঘ্ন ঘটিল বলিয়া শৈবলিনীর এই বোধ টুকু হইল। কিন্তু এখনও শৈবলিনীকে আমরা গুইনিবিয়ারের ন্যায় মিলনেচ্ছা অনুতপ্তা দেখিতে পাই না এখনও প্রতাপের সহিত তাহার সম্যক্ দূরীভূত হয় নাই। তাই যখন আমরা দেখিলাম গঙ্গাবক্ষে এ ক্ষীণ আশাটিও তাহাকে বিদূরিত করিতে হইল, তখন আমরা শৈবলিনীকে আত্মবোধ সম্পন্না দেখিতে পাইলাম। তখন হইতে শৈবলিনী মনকে দমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—তখন হইতে পাপেচ্ছা তাহাকে ছাড়িয়া চলিল। যে ভয়ে গুইনিবিয়ার ল্যান্সেলটের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; ঠিক সেই কারণেই শৈবলিনী প্রতাপের নিকট হইতে পলায়ন করিল। "যে ভায় দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্য চর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণ-ভয়ে শৈবলিনী, সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়াদি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষা পারিহার্য্য নিকটে থাকিলে, কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে থাকিলে কোন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে?"

এক্ষণে আমরা বলিতে পারি, যে, পাপবোধ দুজনের প্রায় একই কারণে উৎপত্তি হইল এবং তাহার প্রকৃতিও প্রায় একইরূপ।

(খ) শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত।

শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের কার্য্য প্রায়ই এক—তবে আপনা হইতে বা দৈব হইতে আগত কষ্টকে আমরা শাস্তি বলি, ও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গৃহীত কষ্টকে আমরা প্রায়শ্চিত্ত বলি। গুইনিবিয়ারের এ দুইটি বেগ পৃথক্ভাবে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু শৈবলিনীর চরিত্রে ইহা সমভাবে জড়িত। আর্থরের সহিত শেষ সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত গুইনিবিয়ারকে যে সকল কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, আমরা তাহাই তাহার শাস্তি মনে করি। কিরূপে অতি সাধারণ কথা শুনিয়াও তাহার পাপমান (guilty conscience) পীড়িত হইত, তাহার Almsbury মন্দিরে তাহার কথা ও কার্য্যেতেই সুস্পষ্ট রহিয়াছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে

এস্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। প্রায়শ্চিত্তকে এক প্রকার চিকিৎসা বলা যাইতে পারে। গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত এক প্রকার তাহাদিগের বিকৃত মনোভাবের চিকিৎসা বলা যায়। এই চিকিৎসাটি কিন্তু একরূকমে হয় নাই। এখানেও ঠিক সেই ডাক্তারি ও কবিরাজি মত দেখিতে পাই। গুইনিবিয়ারের চিকিৎসায় অতি শীঘ্র ফল দর্শিল। সে চিকিৎসা আর কিছুই নহে, পুণ্যের সংস্পর্শ। শৈবলিনীর পক্ষে কিন্তু এরূপ চিকিৎসা কার্য্যকরী হইবার নহে, তাহার রোগ অপেক্ষাকৃত কিছু জটিল প্রকৃতি; গুইনিবিয়ারের আকাঙ্ক্ষা অনেকটা পরিতৃপ্তা, কাজেই তাহার চিকিৎসা অতি সহজেই হইল, পুণ্যের সংস্পর্শ মাত্রেই তাহার বিকৃতভাব দূর হইল—অপবিত্রাকাঙ্ক্ষা নিবারিত হইল। কিন্তু শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত, সুতরাং তাহার মনোভাব অধিকতর বিকৃত ভাবাপন্না। আমাদের বঙ্গীয় কবির চিকিৎসা প্রকরণ দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি—শত সহস্রবার প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে ভক্তি উপহার দিয়াছি। চন্দ্র শেখরের "প্রায়শ্চিত্ত" খণ্ড একটি অপূর্ব্ব জিনিস। দুই এক কথায় তাহা কি বুঝাইব? তাহা বুঝানও দুষ্কর। গ্রন্থকার একস্থলে লিখিয়াছেন, "যে, বলিয়াছিল এইরূপে স্বামিধ্যান কর, সে অনন্ত মানব হৃদয় সমুদ্রের কাণ্ডারী—মনজ্ঞানে আমারাও বলি যাঁহার মস্তিষ্ক হইতে ইহা বাহির হইয়াছে, তিনি মনোবিজ্ঞানে সম্যক্ অভিজ্ঞ, একজন উচ্চশ্রেণীর কবি। আধ্যাত্মিক উন্নতি যে দেশে একদিন চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই আর্য্য দেশেই এইরূপ কল্পনা সম্ভবে। ইহার অধিক আর কি বলিব?

(ঙ) পরিণাম:—

প্রায়শ্চিত্তে উভয়েরই ঠিক এক ফলই ফলিল। উভয়ের মনেই স্বামীর মহত্ত্ব দৃঢ় অঙ্কিত হইল, উভয়েই স্বামীকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে উভয়েই এক সিদ্ধান্তে উপনীত। যখন আর্থর তাঁহার ঔদার্য্য ময়ী বাক্যাবলী পরিসমাপ্ত করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন, গুইনিবিয়ারের রোগ সারিল। সে উদারতা, সে গম্ভীর স্নেহভাব দেখিয়া গুইনিবিয়ারের মনো বিকৃতি লোপ পাইল। পুণ্যের সংস্পর্শে পাপ ভস্ম হইয়া গেল।

একদিন আমরা শৈবলিনীকে বলিতে শুনিয়াছি, "কে তুমি? প্রতাপ?

না, কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ? "আবার, "তুমি কি রিয়াছ? কেন তুমি, তোমার এই অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আ য় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কালে ও রূপের জ্যো : কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল।—"সেই শৈবলিনীকেই আবার আমরা আর একদিন অন্যরূপ দেখিতে পাই। অবসন্ন মনে একাগ্রচিত্তে স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনীর চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

"বিকৃতি? না দিব্য চক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্য চক্ষু চাহিয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ—কিরূপ! এই শাল তরু নিন্দিত, সুভুজ বিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, সুকুমারে বলময়, এ দেহ যে রূপের শিখর। এই যে ললাট—প্রশস্ত, চন্দন চর্চ্চিত, চিন্তারেখা বিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা। এই যে নয়ন জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—আঁখি বিস্ফারিত, তীব্রজ্যোতিঃ স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎ রঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্ব জিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ—নব পত্র শোভিত শাল তরু—মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুম পরিব্যাপ্ত পর্ব্বত; অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—পরিষ্কৃত পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গ রঞ্জিত, স্নেহ পরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকা রাশিতুল্য, মেঘ মণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসব তুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্ত ভাবে স্থির গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গ ভীষণ, অগম্য, অজেয়

ভয়ঙ্কর—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না! কে আমি? তাঁহার কি যোগ্যা—বালিকা, অজ্ঞান,—অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বূক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ। আমি মজিলাম,—মরিলাম না কেন?"

শৈবলিনী ও গুইনিবিয়ার উভয়েরই প্রায়শ্চিত্তের এক ফল ফলিল। ইহারা পূর্ব্বে ইহাদিগের স্বামীতে যাহা অভাব ছিল বলিয়া বোধ করিত, ঠিক তাহাই এখন আবার সমধিক প্রবল দেখিতে পাইল।

পরিণাম সম্বন্ধে আর এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। শৈবলিনীর মনের পাপ মনের প্রায়শ্চিত্তেই শুধরাইয়া গেল, আর গুইনিবিয়ারের পাপ কার্য্যত, সুতরাং তাহার প্রায়শ্চিত্ত ঠিক এক রূপ হইল না। তাই চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন—গুইনিবিয়ার ইহকালে, পুনর্গৃহীতা হইতে পারিল না। এখানে আমরা টেনিসনের আধ্যাত্মিক ভাবের কিছু উৎকর্ষ পূর্ব্বের তুলনায় দেখিতে পাই। গুইনিবিয়ার পরকালে পুনর্ম্মিলনের আশা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে রহিল।

এখন আমরা মোটের উপর গোটাকতক কথা বলিতে চাহি। টেনিসন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই এক লক্ষ্য করিয়া চরিত্র দুইটি সৃজন করিয়াছেন, তাই আমরা দুই চরিত্র প্রায় একরূপ দেখিতে পাই। উভয়েরই যেন এ সম্বন্ধে নীতিও এক। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে।" এই কারণেই, যে শৈবলিনীকে আমরা এক দিন বলিতে শুনিয়াছি "তাঁহাকে (চন্দ্রশেখরকে) আমি কখন ভাল বাসি নাই—কখন ভাল বাসিতে পারিবনা—"সেই শৈবলিনীকে আবার গ্রন্থকার চন্দ্রশেখরকে ভাল বাসাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধেই তিনি মুক্তকণ্ঠে লিখিয়াছেন 'শৈবলিনীর চিত্তে চির প্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু তাড়িত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভাল বাসিল।" আর্য্যকবি দেখাইয়া গেলেন যে, ভালবাসা সাধনার ফলে সর্ব্বত্রই বিস্তারিত হইতে পারে।

মনের উপর এ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রভূত প্রভুত্ব আছে। আর ইহা তিনি দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই শৈবলিনীকে পাপিষ্ঠা বলিতে পারিয়াছেন। শৈবলিনী কেন আগে এ সাধনা করে নাই—এই তাঁহার পাপ। টেনিসন যদিও খুব স্পষ্টরূপে এ সত্য বাহির করেন নাই, কিন্তু সত্যটি তাঁহার চিত্রে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমাদিগের বোধ হয় যে, যাহারা বর্ত্তমান শতাব্দীর বাহিরের কার্য্য প্রণালীর নিন্দা করিয়া, বহিঃস্থ সমাজের দোষ দিয়া, এই সকল পাপ কার্য্য ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে তিনি শিখাইয়াছেন, যে, ইহা বাহিরের তত দোষ নয়, যত দোষ অন্তরের—সমাজের তত দোষ নয়, যত দোষ ব্যক্তি বিশেষের। তোমরা সমাজের নিন্দা করিয়া, হিন্দু বিবাহ প্রণালীর নিন্দা করিয়া, শৈবলিনীকে সমর্থন করিতে পারিবে না, কারণ গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, যে, শৈবলিনীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ থাকিলে সকল দোষই মিটিতে পারিত।

গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীর উভয়ের চরিত্রই যে পরস্পর সদৃশ তাহার কারণ এই যে, উভয়েরই চরিত্রেই চরিত্র-নির্ম্মাণের লক্ষ্য এক—এ সম্বন্ধে উভয় দেশেরই আদর্শও প্রায় এক। আদর্শ পুরুষ চরিত্র লইয়া যেরূপ দুই দেশে মতভেদ আছে, আদর্শ স্ত্রী চরিত্র লইয়া তত মতভেদ নাই। আবার এই সাদৃশ্যই আমরা উভয়েরই সমুচিত প্রশংসা মনে করি—এবং ইহাই আমরা তাঁহাদিগের কারাহিত সত্যের যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া মনে করি। আবার সাদৃশ্যের যেরূপ কারণ দেখা যায় যেটুকু পার্থক্য রহিয়াছে তাহারও কারণ সেইরূপ পরিষ্কার। আমরা টেনিসনের এই চিত্রগুলি মধ্যে স্ফুটতা বড় অধিক দেখিতে পাই। মহত্বই হউক, বা, ক্ষুদ্রত্বই হউক, তাহা তাঁহার চরিত্রগুলিতে সর্ব্বদাই উজ্জ্বল ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার আর্থর, তাঁহার গুইনিবিয়ারকে দেখিলেই তাহাদিগের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়—কিন্তু বঙ্কিম বাবুর চিত্রগুলি সেরূপ নহে। প্রথম দৃষ্টিতে তাহার বাহিরের রঙগুলিই খুলিবে; ভিতরের কিছুই দেখিতে পাইবে না। তাঁহার চন্দ্রশেখরের মহত্ব আর্থরের মহত্বের ন্যায় পরিস্ফুট নহে, তাঁহার শৈবলিনীর চরিত্র গুইনিবিয়ারের চরিত্রাপেক্ষা অনেক জটিল। টেনিসনের চিত্র সহজবোধ্য, পরিষ্কার; আর বঙ্কিম বাবুর চিত্র বুঝিতে কিছু চিন্তা আবশ্যক, প্রচ্ছন্নতাই যেন তাহার সৌন্দর্য্য।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

যে প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোকের অমৃতনিস্যন্দি ভক্তি-রসামৃত-সিঞ্চিত শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত নিচয় বঙ্গের প্রতি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, ধনীর বিচিত্র অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের সামান্য পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দু গৃহে অনুদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে;—যাঁহার ভাবপূর্ণ হৃদয়স্পর্শি গীত প্রভাবে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, সাধু অসাধু, সকল শ্রেণীর লোকের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, ভক্তির অনির্ব্বচনীয়-ভুবন ভুলান ভাব সঞ্চারিত করিতেছে; সেই সাধুরঞ্জন স্বর্গীয় মহাত্মা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্যই অদ্য আমরা তন্নামশীর্ষক এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গীতাবলী সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতেও অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাধনার বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহই নিরপেক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতা-বিহীন হইয়া সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, বরং কোন কোন জীবনাখ্যায়ক তাঁহাকে তিনি যাহা ছিলেন না, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন। যতদূর সাধ্য সেই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিবার জন্যই আমাদের অদ্যকার প্রবন্ধের অবতারণা। রামপ্রসাদ তদীয় জীবন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ যে সংগীতপুঞ্জ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গীতপুঞ্জ অবলম্বন করিয়া, আমরা আজ সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পক্ষপাত বিহীন হইয়া প্রসাদের সাধনা, সাধন-প্রণালী এবং ধর্ম্মমতের প্রকৃত তত্ত্ব এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের এই বিবৃতি এবং আলোচনার লক্ষ্য কবি রামপ্রসাদ নহেন, সাধক রামপ্রসাদ। মুক্তি, সাকার ও নিরাকার উপাসনা, পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম, অবতারবাদ এবং তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি সম্বন্ধে রামপ্রসাদের কি মত ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করাই আমাদের অদ্যকার প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা প্রকার মুক্তির উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য এবং নির্ব্বাণ এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির কথাই

বিশেষ প্রচলিত। রামপ্রসাদ এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির কোনটি মানিতেন, কি না, এবং মানিলে কোন্‌টি অথবা কোন্ কোন্‌টিকে মানিতেন, আমরা সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা করিব। তাঁহার একটি সঙ্গীতে,—

"প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার ও রাঙা চরণে মিশি॥"

এবং অপর একটিতে

"মৃত্যুঞ্জয়ের উপযুক্ত সেবায় হবে আশু মুক্ত।
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে, পরমাত্মায় মিশাইবে।"

এই দুইটি কথা দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা এই অনুমিত হইতে পারে, যে তিনি সাযুজ্য অথবা নির্ব্বাণ এই দুই প্রকার মুক্তির একতর অথবা উভয়ই মানিতেন। কিন্তু আবার তাঁহার অন্য এক সঙ্গীতে দেখিতে পাই "নির্ব্বাণে কি আছে ফল," এবং আর এক স্থলে "সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি ফল বল না?" ইহা দ্বারা বুঝা যায় তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি মানিতেন না; কিন্তু সাযুজ্য মানিতেন কিনা স্পষ্ট বুঝা গেল না। পুনশ্চ, একস্থানে বলিয়াছেন "ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি"। ইহা দ্বারা আমরা এই বুঝি, যে, তিনি সালোক্য অথবা সামীপ্য মুক্তিই মানিতেন ও অন্তরের সহিত আকাঙ্ক্ষা করিতেন, এবং তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালীন সংগীত চতুষ্টয়ের অন্যতরে বলিয়াছেন "যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে।" এতদ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে, তিনি বাস্তবিকই নির্ব্বাণ মুক্তি মানিতেন। তবে এই প্রকার মতবৈষম্য দেখা যায় কেন?—এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। বৈষম্যের কারণ আছে। এই মত-বৈষম্যে প্রসাদের সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা (Stage) প্রতিভাত হইয়াছে। পূর্ব্বে নির্ব্বাণ মুক্তিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে নাই, অথবা তিনি তাহা চাহিতেন না। কিন্তু অন্তিম কালে—মৃত্যুর প্রাক্‌কালে—সেই বিশ্বাসই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়; সুতরাং উদ্ধৃত উক্তিনিচয়ের মধ্যে বস্তুগত্যা কোন বিরোধ ভাব নাই।

রামপ্রসাদ একমাত্র ভক্তিকেই মুক্তির স্থির উপায় বলিয়াছেন। বস্তুত ভক্তিই সাধনার প্রকৃত জীবনীশক্তি। "জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বটে,"(১)

(১) "বোধোহি কো? যস্তু বিমুক্তি হেতুঃ"—মণিরত্নমালা (শঙ্করাচার্য্য।)
—জ্ঞান কি? যাহা বিমুক্তির কারণ।

কিন্তু ভক্তি না থাকিলে জ্ঞান, নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং হৃদয়কে তত মধুময় করিতে পারে না। আর যদি কাহারও জ্ঞান জন্মিয়া না থাক, তাহার প্রকৃত ভক্তি হইলেই তৎসহযোগ জ্ঞান স্বয়ংই উৎপাদিত হইয়া থাকে।(১) এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রকারকগণ জ্ঞানের উপর ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।(২) তাঁহারা শিক্ষাভিমানী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ন্যায় সুধু বুদ্ধিবৃত্তিকে (intellect) সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিতেন না বস্তুত একমাত্র ভক্তিতেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে (৩) 'ব্রহ্মসিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তিযোগের ন্যায় শুভদায়ক পন্থা আর দ্বিতীয় নাই।' তাই প্রসাদ বলিয়াছেন ;—

"সকলের মূল ভক্তি মুক্তি হয় মন তার দাসী"।

"ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া মুক্তি জলে টেনে ফেল"।

"পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তিদড়া"- ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রাম প্রসাদের ভক্তি কিরূপ গাঢ় ছিল, এবং মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ অচল ও অটল বিশ্বাস ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত দুই পংক্তিতেই বেশ বুঝা যাইবে।—

"আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারি।"

"কত মহাপাপী তরে গেল, রাম প্রসাদ কি চোর ?"

রাম প্রসাদ পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম মানিতেন কি না, ইহাই আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। 'জন্মজন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে," এবং "জন্মজন্মান্তরের যত বকেয়াবাকী জের টেনেছে," ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায়, যে, তিনি পূর্ব্বজন্ম অথবা বহুজন্ম মানিতেন। পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংগীতেও তাঁহার পরজন্ম এবং বহুজন্ম মানার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

---

(১) "বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥" ভা, ১, ২, ৭।

(২) "——পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি———।" ভা, ৬, ৩, ২২।

(৩) "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মাপ্রিয়ঃ সতাং।" ভা ১১, ১৪, ২০।
"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া।" গীতা ১৩।১৩।
"ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিংতস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
——যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥" বিষ্ণুপুরাণম্, ১, ২০, ২৭।

"ইহজন্ম, পরজন্ম, বহুজন্ম পরে।
রাম প্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে॥" (১)

আমাদেরও বিশ্বাস রামপ্রসাদ পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম, বহুজন্ম, এ সকলই মানিতেন। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্র দ্বারা দেখা যায়, যে, তাঁহার নিজসম্বন্ধে পরজন্ম বিশ্বাস ঘুচিয়া গিয়াছিল।—

"রাম প্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মার চরণে, আরত ভবে জন্মিব না॥"
"গিয়েছি না যেতে আছি, আর কি পাবে ভবে?"
"ভবে আর জন্ম হবে না।
হবে না জননীর জঠরে॥——ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মৃত্যুর পূর্ব্বে রামপ্রসাদ দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজাত্মা হয়েন। (২) তিনি হয়ত চরমকালে সেই জ্যোতির্ম্ময় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের দিব্যালোকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, যে, এই দুঃখসঙ্কুল, পাপ পরিপূর্ণ, মায়ামোহময় সংসারে আর তাঁহাকে পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে না। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই পুনর্জ্জন্ম হইবেনা, এ কথা তিনি কোথায়ও বলিয়া যান নাই। তাঁহার নিজের পুনর্জ্জন্ম হইবে না বলিয়া কোন মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম তিনি মানেন না, এমন বুঝায় না, বরং তিনি যে পুনর্জ্জন্ম মানিতেন, তাহাই আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

প্রসাদ অবতার মানিতেন না। তাহারও প্রমাণ তাঁহার নিজের সঙ্গীতেই পাওয়া যায়।—

"তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলি না মরিলি না।

---

(১) 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ-কার' জোরজবর দস্তি (forced construction) করিয়া রামপ্রসাদ পরজন্ম মানিতেন না, এইটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই পংক্তিদ্বয়ের স্বীয় মতপোষক একটা ভিন্ন অর্থ খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রথম পংক্তির পর "বলে" এইরূপ একটি ক্রিয়া উহ্য আছে। আমরা এইরূপ কূট অন্বয়ের কোন আবশ্যকতা দেখি না। সংগীতটি যেরূপ আছে তাহাতেই বেশ অর্থ হয়।

(২) "য এতদক্ষরং বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩, ৯, ১২।

"ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন সত্যেন চ দমেন চ।
ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি যৎপরং দ্বিজসত্তমঃ। বনপর্ব্বণি, ২০৯, ১৩৮৯৫।

পুনশ্চ—verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God——*John III. 3.*

এখন দেখা যাউক তিনি তীর্থ এবং তীর্থ পর্য্যটন সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার সংগীতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

(ক) "আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥"

(খ) "কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।"

(গ) "নানা তীর্থ পর্য্যটনে, শ্রম মাত্র পথ হেঁটে॥
"পাবে ঘরে বসে চারিফল, বুঝনা রে মুখ-চেটে।"

(ঘ) "কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণে কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধত্রিশ কোটি তীর্থ, মায়ের ও চরণ বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব বসে; চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
প্রসাদ বলে এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥"

(ঙ) "এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী।" ইত্যাদি বলিয়া দুঃখপ্রকাশ।

(চ) "কাজ কি তীর্থ গঙ্গাকাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী"—

(ছ) "কেন গঙ্গাবাসী হ'ব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কত শত গয়া গঙ্গা দেখ্‌তে পাব॥"

(জ) "আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম বারাণসী"। ইত্যাদি বলিয়া খেদ।

(ঝ) "যেন অন্তিম কালে, দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে।"

(ঞ) "কাশী মোক্ষধাম।"

(ট) "কাজ কি আমার কাশী?
যার কৃত কাশী, তদ্রমণী বিগলিতকেশী॥
যেই জগদ্ধাত্রীর কুণ্ডল পড়েছিল খসি।
সেই হ'তে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥

"অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ মহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভালত না বাসি।
ঐযে গলাতে বেঁধেছে আমার কালী নামের ফাঁসি॥"

(ঠ) "প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদি গো কাশীবাসী।"

(ড) "তবু অন্তকালে আমায় টেনে ফেলো গঙ্গাজলে॥"

(ঢ) "মন চলরে বারাণসী।"

(ণ) "আমি কবে কাশী বাসী হব॥
সেই আনন্দ কাননে গিয়ে নিরানন্দ নির্বারিব॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে মোলে পরে মোক্ষ পাব॥"

(ত) "তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো না রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥"

(থ) "তবু মন ধায় কাশী রব কেমনে।"

(দ) "কিবা কাজ অভিমুক্ত পুরী (১) গমনে।"

(ধ) "আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে পদে গঙ্গা গয়া কাশী।" ইত্যাদি।

(ক), (খ), (গ), (ঘ), (চ), (ছ), (ট), (ঠ), (দ) এবং (ধ) দ্বারা দেখা যায় যে তিনি কাশী এবং অন্যান্য তীর্থে যাওয়া অনাবশ্যক মনে করিতেন, এবং ভাল বাসিতেন না। (ত) "তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ," পথ হাঁটার শ্রম মাত্রই লাভ, অন্য কোন লাভ নাই। যাঁর ঘরে রাশি রাশি তীর্থ আছে, তাঁহার আর তীর্থে প্রয়োজন কি? কিন্তু আবার (ঙ) ও (জ) দ্বারা দেখা যাইতেছে, তিনি কাশী না যাইতে পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং (ঝ) ও (ড) দ্বারা তাঁহার মৃত দেহ গঙ্গাজলে পরিত্যক্ত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন; (ঞ) ও (থ) দ্বারা তিনি কাশীকে মোক্ষ ধাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার মন যে কাশীর দিকে ধায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আর (ঢ) এবং (ণ) দ্বারা কাশী যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন

---

(১) কাশী।

"বারাণসীর জলে স্থলে মোলে পরে মোক্ষ পাব" এবং ত্রিবেণীর ঘাটে বসিলে অন্তর শীতল হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে রামপ্রসাদ নিজেই তীর্থ পর্য্যটন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মত কি একে অন্যের বিরোধী? আমাদের বিবেচনায় তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ ভাব নাই। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন মতে তাঁহার সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রতিফলিত হইতেছে; অথবা প্রকৃত সিদ্ধ হিন্দুভক্ত ও বিশ্বাসীর পক্ষে তীর্থ পর্য্যটন করা না করা উভয়ই সমান, কিন্তু করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। প্রসাদ বাস্তবিক তীর্থের মাহাত্ম্য বিশ্বাস করিতেন, ইহা তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালীন কার্য্য দ্বারাই উপলব্ধি হয়। যিনি মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কালী পূজা করত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সৎ জ্ঞানে অর্দ্ধ নাভি গঙ্গা জলে নামিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনি যে তীর্থের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন না এ কথা কে বলিবে?

গুরুদত্ত মন্ত্রের প্রতি আমরণ প্রসাদের আন্তরিক বিশেষ ভক্তি ও আস্থা দেখা যায় (১)। তিনি গুরুদত্ত মন্ত্রকে "মহাসুধা" এবং "রতনতোড়া" বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় পংক্তি তাহার প্রমাণ:—

"গুরুদত্ত তত্ত্বকর।"

"গুরুদত্ত রত্নতোড়া বাঁধ রে যতনে কসে।"

"মুখে গুরুদত্ত মন্ত্রকর।"

"গুরুদত্ত মহাসুধা"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এখন দেখা যাক্ ব্রহ্ম নিরূপণ সম্বন্ধে প্রসাদ কি বলিয়াছেন, "প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি" (২) অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বতঃপ্রকাশিত। যখন সূর্য্য উঠে, তখন যদি কেহ বলে "কই কোথায় সূর্য্য উঠে, আমায় দেখাইয়া দেও দেখি," তখন যেমন তাহাকে সূর্য্যোদয় দেখাইবার জন্য প্রদীপ জ্বালিবার আবশ্যক করিবে না, ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য দর্শন কি বিজ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিবার আবশ্যক করে না। তাই প্রসাদ বলিয়াছেন "ষড় দর্শনে দর্শন পেলে না, আগাম নিগম তন্ত্রসারে"। ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে দর্শনের আলো দ্বারা দেখিতে পাইবে না, মনোরূপ প্রদীপ দ্বারা দেখিতে হইবে।

---

(১) ইহা কি প্রসাদের হিন্দুত্বের একটি বলবৎ প্রমাণ নয়!

(২) কেমন সুন্দর উক্তি!

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং" কঠোপনিষদ, ৫, ১৫।

"মনসা তু প্রদীপেন মহানাত্মা প্রকাশতে"। শান্তি পর্ব্ব ২৩৯, ৮৭৬৯।

তথাচ যজুর্ব্বেদে

"———মনসৈবাপ্তব্যম্' —

প্রপাঃ ১৪, অধ্যায় ৭, প্রাঃ ২, ২১ শ্লো।

"সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে"—প্রসাদ।

'প্রসাদ প্রসঙ্গ'কার(১) এবং 'সাধক সঙ্গীত'(২) রাম প্রসাদের জীবনী লেখক "শুনেছি শ্রীনাথের বাণী" "পাগল বাবার কথায় মজে" ইত্যাদি দ্বারা প্রসাদ প্রত্যাদেশ পাইতেন এই কথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় এইটি তাঁহাদের ভুল হইয়াছে। রাম প্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি কালীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইতেন এইরূপ প্রমাণ করিতে পারিলে সঙ্গত এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত বটে, কিন্তু কালীভক্ত প্রসাদ শিবের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইতেন, এই কথাটা আমাদের নিকট বড় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। শিববাক্য অর্থে তন্ত্রকে বুঝায়; সুতরাং উদ্ধৃত পদদ্বয় দ্বারা প্রসাদের প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি না বুঝিয়া তাঁহার তন্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসই বুঝিতে হইবে।

প্রকৃত সাধকের ন্যায় প্রসাদের সামান্য ধনে এবং ঐহিক সুখে স্পৃহা ছিল না।(৩)

"কাজ কি মা সামান্য ধনে।"

"চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র।"

"মন করো না সুখের (৪) আশা যদি অভয় পদে লবে বাসা।"—ইত্যাদি।

তিনি দুঃখ কে ভয় করিতেন না।(৫) দুঃখ আসিলে তিনি দুঃখিত না হইয়া বরং সুখী হইতেন।(৬) তিনি "সুখেই দুখ দুখেই সুখ" মনে করিতেন। তিনি

---

(১) প্রসাদ প্রসঙ্গ, ৩৫ ও ৩৮ পৃষ্ঠা।

(২) সাধক সঙ্গীত, ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠা।

(৩) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাম প্রসাদকে স্বীয় সভাসদ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। প্রসাদের এই প্রস্তাবে অসম্মতি তাঁহার সুখ নিস্পৃহার অন্যতর প্রমাণ।

(৪) Not bliss. but pleasure.

(৫) "আমি কি দুঃখেরে ডরাই"।

(৬) "দুঃখ দিবে মা বাজার মিলাই।"

সম্মানে হৃষ্ট হইতেন না; (১) অবমাননাতেও সন্তপ্ত হইতেন না। ইহাকেই প্রকৃত জ্ঞানী, ইহাকেই প্রকৃত সাধু বলা যায়। এইরূপ সমাহিত ব্যক্তিই মুনি বলিয়া উক্ত হয়।

ন হৃষ্যত্যাত্মসম্মানে নাবমানেন তপ্যতে।

গাঙ্গো হ্রদ ইবাক্ষোভো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥"

উদ্যোগ পর্ব্বণি ৩৩ ৯৯।

"উদয়াস্তে মনজ্ঞোহি ন হৃষ্যতি ন শোচতে।

সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ॥" বনপর্ব্বণি ২৫৮ ১৫৩৮৯।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে॥ গীতা ২ ৫৬।

সাধুসঙ্গের যে কতদূর উপকারিতা (২) তাহা রাম প্রসাদ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

"আমি সাধুসঙ্গে নানারঙ্গে দূর করিব মনের ব্যথা।"

রামপ্রসাদ পাপপুণ্য মানিতেন না। নিম্নলিখিত সংগীতে বোধ করি তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

"ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য মান্য করে সব খেয়ালে।"

এই উদ্ধৃত বাক্যটি দ্বারা ইহাও বুঝা যায়, যে, তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এ যদি ঠিক হয়, তবে পাপপুণ্য না থাকারই কথা বটে!

তিনি বেদ দর্শন প্রভৃতিকে অভ্রান্ত মনে করিতেন না,—

"বেদে দিলে চক্ষে ধূলা ষড় দর্শনের সেই অন্ধগুলা।"

---

(১) প্রসাদ কৌলিক প্রথানুসারে সাধনায় মনোনিবেশের জন্য সুরাপান করিতেন। একদিন কুমারহট্ট-নিবাসী বলরাম তর্কভূষণের টোলের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন; তর্কভূষণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—মাতাল ব্যাটা যাইতেছে। প্রসাদ ইহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া নিম্নোদ্ধৃত সংগীত দ্বারা পণ্ডিতকে যথোচিত প্রবোধ দিলেন,—

"মন ভুল না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে॥
সুরাপান করিনেরে সুধা খাইরে কুতূহলে!
আমার মনমাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে।" ইত্যাদি।

(২) ধর্ম্মাদ্যযোনিঃ সাধুসমাগমঃ। বনপর্ব্বণি, ১, ২৫।

শ্রীমান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মণিরত্নমালা নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

কিং মত্র হেয়ং? কনকঞ্চ কান্তা।

মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কোন্ বস্তু হেয়? ধন ও স্ত্রী।

"দ্বারং কিমাহ নরকস্য?—নারী"।

নরকের দ্বার কি?—নারী। (১)

নারী সাধনার অন্তরায় বলিয়া প্রসাদেরও বোধ হইয়াছিল, তাই বলিয়াছেনঃ—

"রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।"
আগে ইচ্ছা সুখে পান কর, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি।"

প্রসাদ অদ্বৈতবাদী ছিলেন কি, দ্বৈতবাদী ছিলেন, এই বিষয় লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমরা দেখাইয়াছি—'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি" এই কথা দ্বারা প্রসাদের দ্বৈতবাদই প্রতিপন্ন হয়, কারণ তাহাতে স্বতন্ত্র জীবাত্মার স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু আবার দেখাইয়াছি, যে তিনি পাপ পুণ্য মানিতেন না, সুতরাং তিনি অদ্বৈতবাদী, (২) কারণ পাপপুণ্য না মানার মধ্যে 'তত্ত্বমসি" ভাব নিহিত আছে। বস্তুত দ্বৈত এবং অদ্বৈত এই দুইয়ের মিশ্রিত ভাবটিই যথার্থ তত্ত্ব। ভগবান্ শিব এই রূপ বলিয়াছেন (৩)। দক্ষ প্রজাপতিও এই রূপই বলিয়াছেনঃ—

"দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপিচাদ্বৈত মিত্যেতৎ পারমার্থিকম্॥"—

অর্থাৎ 'দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ইহাদের মধ্যে শুদ্ধ দ্বৈত, কি শুদ্ধ অদ্বৈত একপ নহে, দ্বৈতাদ্বৈতই পারমার্থিক"। ফলত সাধকের যে পর্য্যন্ত এই দ্বৈতাদ্বৈত মিশ্রিত ভাবটির সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই।

---

(১) স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের নৈকট্যে চিত্তচাঞ্চল্য এবং আসক্তি জন্মে সুতরাং অনেক সময় ইঁহারা একে অন্যের সাধনার বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

(২) "মা বিরাজে ঘরে ঘরে।"
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।
রাম প্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর, বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে॥"
—এই সংগীত দ্বারাও প্রসাদের অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয়।

(৩) "—তত্ত্বং...দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতম্" কুলার্ণবতন্ত্রম্, ৫, ১, ১১০।

রাম প্রসাদ মৃত্যুকে কণা মাত্র ভয় করিতেন না (১)। বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যু নির্ভীতি দেখিলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। (২) —"কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা" —(৩) প্রকৃত সাধক এবং বিশ্বাসী ব্যতীত এইরূপ মৃত্যু-নির্ভীতি আর কাহারও সম্ভবে না।

এখন দেখা যাউক প্রসাদ যে দেবতার সাধনা করিতেন, সেই দেবতা সাকার কি নিরাকার, সীমাবদ্ধ কি অসীম। প্রসাদ চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তির পূজা করিতেন। ইহা দ্বারা দেখা যায় তিনি সাকার উপাসক অর্থাৎ পৌত্তলিক ছিলেন। কিন্তু কেমন পৌত্তলিক? তিনি কি তাঁহার কালীকে সেই মৃৎ প্রতিমাতেই আবদ্ধ মনে করিতেন? প্রসাদ স্বয়ং এই প্রশ্নের কেমন বিশদ উত্তর দিয়াছেন, দেখুনঃ—

"কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।"

"আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে।"

"ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি।"

"তারা আমার নিরাকারা।"

"তুমি ক্ষিতি তুমি জল।"

"পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী।"

"হংস (৪) রূপে সর্ব্বভূতে বিহরিণী।"

"অজ্ঞানেতে অন্ধজীব ভেদ ভাবে শিবা শিব।" (৫)

"উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী।"

"আমার আত্মারামের আত্ম কালী; তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন" ইত্যাদি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

(১) "চেননা আমারে শমন, চিনলে পরে হবে সোজা। আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা"॥ "প্রসাদ বলে কালের ভটা (দূত), মুখ সামলায়ে বলিস্ বেটা। কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখবে কেটা॥" ইত্যাদি

(২) "শ্রীরাম প্রসাদ বলে তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি। মুখে কালী কালী কালী বলে, যাত্রা করে বসে আছি॥" ইত্যাদি।

(৩) শান্তি পর্ব্বণি, ২৪৫, ৮৯২৯।

(৪) সোহং।

(৫) "শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব অভেদত্বং ভিন্নত্বং প্রতিপাদ্যতে।

যথা দুগ্ধেষু ধাবল্যং দাহিকা পাবকস্য চ॥"

যে শক্তিতে বিশ্ব চরাচর অনুপ্রাণিত, প্রসাদ সেই শক্তির সেবক। প্রসাদের শক্তি মৃৎ মূর্ত্তিতে আবদ্ধ নহেন। মৃৎপ্রতিমা তাঁহার উপাস্যা নহে। তাঁহার উপাস্যা তদধিষ্ঠাত্রী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতা। সেই দেবতার সীমা নাই; তিনি নিরাকারা, সর্ব্বব্যাপিনী। কিন্তু তবুও দেখা যাইতেছে প্রসাদ মনুষ্য-নির্ম্মিত মৃৎমূর্ত্তি চিহ্ন ঈশ্বরারাধনায় ব্যবহার করিতেন। ইহাতে আমরা তাঁহাকে হিন্দু না বলিয়া আর কি বলিব? তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন, কিন্তু তা বলিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিতে পারি না, কারণ তাঁহার মধ্যে ষোল আনা হিন্দুত্ব ছিল। তিনি নিরাকার সাকার অভেদ জ্ঞান করিতেন। (১) তিনি "বনের পুষ্প বেলের পাতা", "রক্ত চন্দন রক্ত জবা" দিয়া মায়ের পূজা করিতেন। তিনি তারা নামের কবচ মালা গলায় ধারণ করিতেন। (২) তিনি "গঙ্গাজলে বিল্বদলে বিশ্বেশ্বরনাথের" পূজা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে হিন্দু বলিব না ত আর কি বলিব? যিনি হৃদয়ের নিরানন্দ নিবারণের জন্য তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; যিনি তান্ত্রিক প্রথানুসারে মদ্যপান করিতেন, এবং সোঁড়া মন্ত্র ন্যাস করিতেন (৩), শিববাক্যের প্রতি যাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; সন্ধ্যা আহ্নিকে যাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল; জানিয়া শুনিয়া যিনি গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে হিন্দু সাধক না বলিবে কে?

---

(১) "নিরাকার সাকার, ককার সবাকার ভিটা"—ইত্যাদি।

(২) যমের প্রতি—"ওরে যাবি সে জ করে, তার একটা ভাবনা কি রে। তবে তারা নামের কবচ মালা, বৃথা আমি গলায় রাখি রে॥"—ইত্যাদি।

(৩) "কাল করেছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া। ওরে সেই কালের কর বিনাশ, ন্যাস ধর রে মন্ত্র সোঁড়া॥"—ইত্যাদি।

উদ্ভট কথা।

প্রথম শাখা।

তোমরা যে যা বলিতে চাও, বল, আমি কিন্তু আমার মনের কথা আর পেটে পূরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। আমার একটা আসল কথা আমি চাপিয়া রাখিয়াছি বলিয়া তোমরা অনেক সময় আমার অনেক কথা বুঝিতে পার না; কি জানি কি মনে কর; আমি বুঝিতে পারি, যে আমি আমার মূলকথা বলি নাই বলিয়াই তোমরা গোলে পড়িয়াছ; কত দিন বলি বলি করিয়াছি, বলিতে পারি নাই এখন কিন্তু আর না বলিলে চলে না।

হয়ত তোমায় আমায় এ বিষয়ে মত ভেদ নাই; অথচ আমি বলিলেই তুমি বিস্মিত হইবে। এমনটা যে কেন হইবে, তাহাও আমি বুঝিতেছি। বোধ হয়, আমি আমার মনের ভিতর যত খানা-তল্লাসি করিয়াছি, তুমি তত কর নাই। প্রয়োজন হয় নাই, অথবা তোমার সেরূপ প্রবৃত্তিই বা নাই।

মনের খানাতল্লাসি করিতে আমার কতকটা প্রবৃত্তি আছে, একটু আমোদও বোধ হয়, এবং প্রয়োজনও হয়। বিজ্ঞ বিবেচক লোকের সঙ্গে কোন মতের অনৈক্য হইলে, আমি অনেক সময় ভাবি, যে হয়ত উঁহার সহিত কোন মূল বিষয়ে আমার মত মিল নাই, তাই এরূপ ঘটিয়াছে। ক্রমে দেখিতেছি, একটি মূল বিষয়ে অনেকের সহিতই আমার মত-মিল নাই। আপন মনের অনেক খানা-তল্লাসির পর এ কথা বুঝিতে পারিয়াছি। আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনারা আমার এই খানাতল্লাসির রিপোর্ট পড়িয়া ইহা একেবারে অগ্রাহ্য করিবেন না; আপনাদের মনের গূঢ় হইতে গূঢ়তম ভাগে মধ্যে মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন; দুমাস ছমাস বৎসরাবধি এইরূপ করিবেন; তাহার পর আর একবার এই রিপোর্ট খানি পড়িবেন—তখন নিতান্ত অসার বোধ হয়, ইহা দূরে নিক্ষেপ করিবেন।

কথাটি এই—আমি অন্তরে অন্তরে ইতিহাসে এবং উপন্যাসে কোন ভেদ মানি না। চোখে দেখা একটি বিষয়, আর মনগড়া আর একটি বিষয় জগদ্গত ভেদ আছে, তাহা জানি ও মানি। কিন্তু মনুষ্যের উপর বা সমাজের উপর তাহাদের ফলাফল বিবেচনা করিলে, ইতিহাসে এবং উপন্যাসে

কিছুই ভেদ দেখিতে পাই না। মানিও না সেই জন্য। Real—Ideal; History—Poetry; Fact—Fiction; Perception—Imagination; Walking—Dreaming; Physical—Metaphysical;—ইহার এক এক জোড়া মধ্যে পরস্পর কোন ভেদ দেখি না,—বুঝি না—মানি না।

কথাটা আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলি। রামচন্দ্র নামে একজন রক্ত-মাংসের মনুষ্য হস্ত পদাদি লইয়া এই পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য বিচরণ করিয়াছিলেন কি না, এই কথা ভাবিয়া, ওই কথার বিচার করিয়া, তোমার আমার মত সামান্য জীবের কোন ফল আছে কি? ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বা ডাক্তার রামদাস সেনের এ বিষয়ে বিচার করায় কোন ফল আছে কি না—সে কথা এখন আমি তুলিতেছি না,—আমি কেবল জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার আমার, পক্ষে সংসার ধর্ম্মে শিক্ষার জন্য, বা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য, পুত্র কলত্রকে শিখাইবার জন্য, ঐ কথার বিচার করিয়া কোন ফল আছে কি? আমি বলি কোন ফলই নাই। ইতিহাসই হোক, আর কবির উপন্যাসই হোক, রামচরিত যে দিক্ দিয়া দেখিবে; সেই দিকই তোমাকে আকর্ষণ করিবে। তাহার সৌন্দর্য্যে তুমি অভিভূত হইবে; আর সেই সৌন্দর্য্য ক্রমেই তোমাকে সুন্দর করিবে। তুমি এ কথা বলিতে পার, যে, কোন একটি দৃষ্টান্তে বিশ্বাস না হইলে, সে দৃষ্টান্তে কোন শুভ ফল হয় না। ঠিক কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বাস কি ইতিহাসের খাস দখল ভূমি? কাব্যে কি তুমি আমি কেহই বিশ্বাস করি না? আমি দেখাইতেছি, আমরা কাব্যে বিলক্ষণ বিশ্বাস করি।

কথাটা উল্টাইয়া বলিলে বোধ হয়, আরও সহজ হইবে। যে সকল উপন্যাসে তুমি আমি সকলেই বিশ্বাস করিতে পারি, তাহাই কাব্য; আর যে সকল বিশ্বাস করিতে পারি না, সেগুলি গল্প হইলেও কাব্য নহে। মনে করুন, কোন একজন নব্য গ্রন্থকার লিখিলেন, যে রামচন্দ্র সীতা বিসর্জ্জন করার পর কৌশল্যার কাঁদাকাটি সহ্য করিতে না পারিয়া, সূর্য্যবংশ রক্ষার্থ একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন! এরূপ শুনিলেই তুমি আমি সকলেই বলিব, যে এটি বড় অসংলগ্ন কথা। অসংলগ্ন-অর্থ—যাহা লাগে না, বা খাপে না। কাহার সঙ্গে লাগে না? কাহার সঙ্গে খাপে না? না,—রামচরিতে আমাদের যে টুকু বিশ্বভূমি আছে, তাহার সহিত লাগে না, এবং খাটে না।

আসল কথা, খাপিল, কি না খাপিল ইহা লইয়াই বিশ্বাস ও অবিশ্বাস হয়; সুতরাং বিশ্বাস—কাব্য বা ইতিহাস কাহারও এক চেটে নহে। ইতিহাসে ও বেখাপ কথা থাকিলে আমাদের বিশ্বাস হয় না, কাব্যেও বে-খাপ কথা থাকিলে আমাদের শ্রদ্ধা হয় না।

বিশ্বাসের কথা হইতেই সত্য মিথ্যার কথাটা উঠিতে পারে। অনেকে মনে করেন, যে ইতিহাসের অবলম্বন সত্য এবং কাব্যের অবলম্বন মিথ্যা; সুতরাং ইতিহাসে এবং কাব্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। এ কথা আমি মানি না। আমি বলি, কাব্য এবং ইতিহাসে উভয়েতেই সত্য মিথ্যা জড়িত হইয়া থাকে। মিথ্যা, কিন্তু কাব্য বা ইতিহাস কাহারও অঙ্গীভূত পদার্থ নহে। সত্যই উভয়ের অবলম্বন, আশ্রয়, সমবায়, এবং পরিমাণ। ইতিহাস বা কাব্যে যে মিথ্যা থাকে, তাহা পরগাছা বা বাঁদরা ডাল। সে গুলা ছাটিয়া ফেলিতে পারিলেই বৃক্ষের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কাব্যে যে সকল মিথ্যা থাকে, তাহা কাব্যাংশ নহে, সে গুলা গাঁজাখুরি; আর ইতিহাসে যে মিথ্যা থাকে, তাহা ইতিহাসের অংশ নহে, বক্কেলের জোবান বন্দ।

প্রকৃত ইতিহাসই সত্য, আর প্রকৃত কাব্য মিথ্যা—এইটি ঘোর মিথ্যা কথা। এক দিক দিয়া দেখিলে আমাদের ভূয়োদর্শনের সঙ্গে যে গুলি খাপে, সেই গুলিই সত্য। অন্যদিক্ দিয়া দেখিলে, যাহার বিপরীতটা মনে খাপাইতে পারিনা, তাহাই সত্য। * তাই যদি হয়, তবে কাব্য মিথ্যা হইবে কেন? আমাদের ভূয়োদর্শনের সহিত যদি হামলেট চরিত্রের খাপ থাকে, তবেই তাহা সত্য নতুবা তাহা মিথ্যা। হামলেটের মত পুরুষ তুমি কিম্বা আমি কোথাও দেখিতে পাইনা বলিয়া হামলেট কখন মিথ্যা হইতে পারে না। তাহা হইলে নেপোলিয়নও মিথ্যা। কেন না নেপোলিয়নের মত পুরুষ তুমি আমিও কোথায়ও দেখি নাই। যদি বল কেন নেপোলিয়নকেত ইতিহাসে দেখিয়াছি। তাহা হইলে আমিও বলিব, কেন হামলেটকেও কাব্যে দেখিয়াছি। তোমার ইতিহাসে দেখাই কি দেখা? আমার কাব্যে দেখা কি কিছুই নহে?

যদি ফল দেখিয়া সত্য মিথ্যা বুঝিতে হয় তাহা হইলে অনেক সময়, কাব্যই সত্য আর ইতিহাস মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান ইতিহাসের বর্তমান

* ১৯ সংখ্যা নবজীবনের ৪৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, মিলের এবং স্পেন্সরের কৃত, সত্যের লক্ষণ দেখ। আমাদের শাস্ত্রকার বা দার্শনিকগণের মতের সহিত ঐ লক্ষণের কোন বিভেদ নাই।

জীবন্ত মূর্ত্তি—দেখ—ঐ আমাদের বিলাস বাবু। বেলা এগারটা বাজিয়াছে, সকাল বেলা হ'তে এখন পর্য্যন্ত বিলাস বাবু করিয়াছেন কি? না নিত্য কর্ম্ম সমাধানের দশ ছিলিম তমাকু দগ্ধ করিয়াছেন। ঐ আলস্য-জীবন বিলাস বাবু সত্য? আর হ্যামলেট্ যে মিথ্যা, একথা বলিতে আমরা সম্মত নহি।

কাহারও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গোচর না হইলে, কোন পদার্থই সত্য নহে উন্নতমনা মানবের পক্ষে এরূপ ধারণা বড়ই বিড়ম্বনা। স্থূল-ইন্দ্রিয়-সম্বল কোন অসভ্য জাতি ও কথা বলিলে বুঝিতে পারি; কিন্তু তোমার আমার মত কোন হিন্দুতে ও কথা বলিলে, আর বুঝিতে পারি না। কেননা, তুমি আমি আজ কালি মানসিক ভাব লইয়াই বাঁচিয়া আছি। পূর্ব্বতন কতকগুলি কাব্য এবং মহাকাব্যই আমাদের প্রধান সম্পত্তি, এবং এখনও যাহা কিছু নাড়া চাড়া করি, সে সকলই কাব্য। কাব্যই যদি মিথ্যা হয়, তবে আমাদের এ ভাব ভূত জীবনে আর প্রয়োজন কি? চর্ম্ম চক্ষে দেখিলে, আমাদের কি আছে? আমাদের কিছুই নাই। একে আমরা অহে পৃষ্ঠে ললাটে নাগপাশ বন্ধনে বদ্ধ, তাহার উপর সেই নিরুপায় অবস্থায় আমরা পর পদের ভীষণ তাড়নে অবলুণ্ঠিত, সুতরাং চর্ম্ম চক্ষে দেখিলে আমাদের জীবন আশঙ্কায় পূর্ণ হয়, আশা স্থান পায় না। কিন্তু ভাব চক্ষুতে দেখিলে, আমরা আমাদের আর এক রূপ অবস্থা বুঝিতে পারি। আমরা দেখিতে পাই ধর্ম্ম রূপ অক্ষয় বট নানা শাখা প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া, প্রাচীন কালের মত এখনও ভারতে শীতল ছায়া প্রদান করিতেছে; এখনও পূর্ব্বের মত মহা ঝঞ্ঝাবাত হইতে আশ্রিত ভারতবাসীকে রক্ষা করিতেছে। এখনও তেমনই ভাবে সুমন্দ পবন সেই অক্ষয় বটের শাখা বিতান মধ্যে ঝর ঝর করিয়া বহিতেছে ও তাহার তল দেশের শ্যামল শষ্প শয্যা তেমনই করিয়া পরিষ্কৃত করিতেছে। এখনও প্রভাতের পাখীরা তেমনই করিয়া কূজন করিতে থাকে; মধ্যাহ্নে গাভী বৎস সকল তেমনই করিয়া ধীরে ধীরে তল দেশে চরিতে থাকে। ভারতের মহা ধর্ম্মরূপ অক্ষয় বট বৃক্ষের লক্ষ শাখা, কোটি প্রশাখা, অসংখ্য পত্রপুঞ্জ সমগ্র ভারত এখনও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ধরণী পৃষ্ঠস্থিত কোন একটি বা দুইটি বল্মীক-দষ্ট মূল দেখিলে, একটু আশঙ্কা হয় বটে, কিন্তু একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখ, কত লক্ষ লক্ষ বিলম্বিত জটা নূতন মূল রূপে

নিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়া, বৃক্ষের অবলম্বনের স্বরূপ হইয়াছে। একবার স্বর্গাভিমুখে উপরে চাহিয়া দেখ. কেমন জীবন্ত বৃক্ষ, প্রশান্ত মূর্ত্তি। পত্র পুষ্পের কেমন শ্যামল সুন্দর বর্ণ—ফলের কি প্রবাল-গঞ্জন বঞ্জন। মহাকাল রাক্ষসকে সৌম্য হাস্যে উপহাস করিয়া, জরা রাক্ষসীকে পাদ মূলে আশ্রয় দিয়া—চির-যৌবন, অক্ষয় বটরূপী মহাধর্ম্ম ভারতে যুগ যুগ ব্যাপিয়া বিরাজমান। আমরা চিরদিনই এই মহা বৃক্ষের আশ্রিত। এই আশ্রয় গুণেই আমরা দুর্জ্জয় বজ্র কোটিতে নষ্ট হই নাই, ঝঞ্ঝার উপর ঝঞ্ঝাতে আমাদিগকে আবাসচ্যুত করিতে পারে নাই। আর আজি একটু খর পশ্চিমে বাতাসে দুইটি শাখা ঈষৎ দুলিতেছে বলিয়া, কতকগুলি শুষ্ক পত্র ঝরিয়া গেল দেখিয়া—আমরা কি আশঙ্কিত হইব? এবং মহদাশ্রয় ত্যাগ করিব? না; কথনই না। না, আমাদের কোন আশঙ্কা নাই।

মন্বন্তর।

আর্য্যশাস্ত্র, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারকে একটি সাম্রাজ্যের ন্যায় প্রতিপাদন করেন। পরাৎপর ব্রহ্মা সেই সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিপতি। পার্থিব রাজা ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, দেহ, দেহী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে পারেন না, কিন্তু সেই সর্ব্বেশ্বর রাজা সর্ব্ব পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি তাহাকে পালন করেন। পশ্চাৎ যখন প্রয়োজন হয়, তখন তিনি তাহাকে উপসংহৃত করিয়া থাকেন। পার্থিব সম্রাট যেমন রাজবিধি স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য পালন ও শাসন করেন, পরমেশ্বরও সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষাত্মক স্বীয় অনাদি প্রাকৃতিক বিধি অনুসারে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি বার বার সম্পাদন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিধি সনাতন এবং অপরিবর্ত্তনীয়। সৃষ্টি, পালন, শাসন, মৃত্যু, স্বর্গাদিভোগ, প্রলয় প্রভৃতি যাহা কিছু সংঘটিত হয় সে সমস্ত ঐ সনাতন বিধি অনুযায়ী।

পার্থিব সম্রাটের রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় যে সমস্ত শক্তি আছে, তাহা তিনি স্বয়ং অথবা একাকী কার্য্যে পরিণত করিতে অপারগ। সে জন্য

তিনি উপযুক্ত পাত্রদিগের হস্তে এক এক ক্ষমতা অর্পণ করেন। তাহাতে রাজকীয় শক্তি প্রভাবে সামান্য ব্যক্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজপুরুষরূপে উপলক্ষিত হন। শক্তির ইতর বিশেষতা তাঁহাদের মধ্যে অধঃ ও ঊর্দ্ধ পদবী সকল সৃষ্টি করে। কেহ বা সমগ্ররাজ্যে সার্ব্বভৌমিক রাজপ্রতিনিধি পদ প্রাপ্ত হয়েন; কেহ সেনাপতি, কেহ শান্তিরক্ষক, কেহ দণ্ডনায়ক, কেহ ধর্ম্মাধিকরণী, কেহ করসংগ্রাহক এবং কেহ বা কোষাধ্যক্ষ হইয়া তাদৃশ রাজ-প্রতিনিধির অধীনে কার্য্য করিয়া থাকেন। ফলত রাজশক্তিই তাঁহাদিগের এবম্বিধ অধ্যক্ষতা সমূহের মূলীভূত কারণ। ব্যক্তিগুলি উপযুক্ত আধার মাত্র রাজশক্তি সমূহ তথা আধেয় স্বরূপ। আধারগুলিকে স্বতন্ত্র রাখিয়া আধেয়স্বরূপ শক্তি পদার্থকে স্মরণ করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, যে, শক্তিই রাজ প্রতিনিধি, এবং শক্তিই সমস্ত প্রকার রাজপদবী স্বরূপিণী।

সেইরূপ পরমেশ্বর এই জগৎরাজ্যের মহারাজা। তাঁহার শক্তি অনাদি অনন্ত; বিক্রম অপার। জ্ঞান ক্রিয়া এবং বলক্রিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার শক্তি-ক্রিয়া অনির্ব্বচনীয়। তদ্দ্বারা তিনি অনন্ত প্রকার প্রাণী সম্বলিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন। পার্থিব রাজা যেমন স্বয়ং অক্ষম হইয়া রাজশক্তি সকল অন্যকে প্রদান করেন, পরমেশ্বর সেরূপ অক্ষম নহেন। তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার হস্ত পদ সর্ব্বত্র বিদ্যমান; সুতরাং তিনি সর্ব্বত্র স্বয়ংই শক্তিধর ও শক্তির নির্ব্বাহক। তাঁহার শক্তিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পাত্র নির্ব্বাচন করিতে হয় না। তাঁহার ইচ্ছামাত্রে সেই শক্তি দ্বারা কোটি কোটি আধার সৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে ঐ শক্তিই তাঁহার ইচ্ছাতে আধার রূপে পরিণত হয়। ঐ শক্তিই দ্রব্যধাতুবিশিষ্ট। তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় দ্রব্যধাতু নাই তাঁহার শক্তিই পদার্থের উপাদান কারণ এবং অন্তিম পরিণাম। ঈশ্বরীয় বিধি বলে শক্তি, ক্রম পদার্থরূপ ধারণ করে, আবার রূপের বিনাশে শক্তি মাত্রই থাকে। পদার্থ সমূহ তাঁহার শক্তিরই আবির্ভাব। জগতে যত দৃশ্য বস্তু আছে সে সমস্ত স্বস্ব অদৃষ্ট কারণ স্বরূপিণী ঈশ্বরীয় শক্তির পরিণাম মাত্র। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, যে নিরাকারা ব্রহ্ম শক্তিই, এই সাকারা ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপিণী। সেই শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। তাহা ব্রহ্মেরই শক্তি। তাহারই নামান্তর প্রকৃতি। শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "শক্তি আর শক্তিমানে-

অভেদ।" সুতরাং শক্তিবিভাগে পরমেশ্বরই ব্রহ্মাণ্ডরূপী এবং জ্ঞান বিভাগে তিনিই তথা ঔপাধেয় বা আধেয়। অথবা পক্ষান্তরে ইহাই বলে, যে, তিনিই শক্তির মূলাধার। আকাশ যেমন পদার্থ মাত্রের আধার, অথচ নভস্থই ঘটে, আধেয় স্বরূপ; পরমেশ্বর সেইরূপ সর্ব্বশক্তির মূলাধার অথচ শক্তির আবির্ভাবরূপী পদার্থ মাত্রে আধেয় স্বরূপ সেই প্রাকৃতিক আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে তাঁহার আধেয়ত্ব ভিন্ন ভিন্ন পদবী দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া থাকে।

পদার্থ সমূহের বাহ্য অবয়বগুলি সংবৃত রাখিয়া যদি তাহার শক্তির দিকে দৃষ্টি করা যায়, তবে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, সমস্ত পদার্থ একমাত্র শক্তির আবির্ভাব; পরমেশ্বর সেই শক্তির পরিচালক। শক্তিরূপ মহাযন্ত্রের তিনি নির্ব্বাহক, বিধাতা এবং যন্ত্রীস্বরূপ। একদিকে সূর্য্য, চন্দ্র তারাগণ, তাঁহার শক্তির আবির্ভাব; অন্যদিকে তিনি স্বয়ং বিধাতা স্বরূপে তাহাদিগের নিয়ন্তা। একদিকে মানবের মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণ তাহার শক্তির আবির্ভাব, অন্য দিকে তিনিই আবার তৎসমূহের নিয়ামক। তিনি স্বীয় শক্তির সহিত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের সর্ব্ববিভাগের অধিনায়ক। সেই শক্তির প্রকার ভেদ ও তারতম্যানুসারে তাঁহার নায়কত্ব ও বিভুত্বের নানা সংজ্ঞা হইয়া থাকে। শক্তির নানাত্ব অনুসারে তাঁহার নানাত্ব উপলক্ষিত হয় মাত্র। নতুবা তিনি নানা নহেন। তিনি একই। যদ্রূপ রাজা একই, তাঁহার শক্তির নানাত্ববশতঃ নানারাজপুরুষ সৃষ্ট হয়, তদ্বৎ পরমেশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান্। জগতে যেখানে যত শক্তি আছে সমস্তই তাঁহার শক্তি। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত শক্তি অচলা। তাঁহার ইচ্ছাতেই তাহা সচলা হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা ক্ষণমাত্রও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে, যে, তিনিই শক্তিমান্। তথাপি, শিষ্যগণকে বুঝা বা অনুরোধে শাস্ত্র, সেই পরমেশ্বরকে কখনও শক্তিরূপে দর্শন করেন কখনও বা জ্ঞানরূপে দর্শন করেন। শাস্ত্র, শক্তিকে স্ত্রীরূপিণী, ক্ষেত্র ও উপাধি স্বরূপিণী বলেন, এবং জ্ঞানভাগকে পুরুষ স্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঔপাধেয় স্বরূপ কহেন।

এইরূপে জগতের যে লোকে যে কোন অবস্থায় তাঁহার শক্তি যে কোনরূপে আবির্ভূতা হয়, তিনি তথা সেই ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার কার্য্য বিধান করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার রাজনীতি। তিনি সহস্র মস্তক, সহস্রনেত্র, সহস্র হস্ত পদ বিশিষ্টের ন্যায় হইয়া ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যকে শাসন

ও পালন করিতেছেন। তিনি কাহারও সাহায্যাপেক্ষী নহেন। তিনি আপনিই রাজা, আপনিই রাজপ্রতিনিধি, আপনিই দণ্ডনায়ক এবং আপনিই ধর্ম্মাধিকারী। তিনি আপনিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণরূপে "ব্রহ্ম"; শক্তিরূপিণী রাজলক্ষ্মীর স্বামীরূপে "পরমেশ্বর"; পঞ্চভূতের আদ্যতন সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্ররূপ সাধাতুগণের এবং মনোবুদ্ধিপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়রূপী সূক্ষ্মদেহ সমূহের বিধাতা, ও পালয়িতারূপে "হিরণ্যগর্ভ।" তিনি এই নানাবিধ প্রজা-বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের নিয়ন্তারূপে "ব্রহ্মা," "বিধাতা" অথবা "প্রজাপতি।" তিনি এই সমস্ত প্রজার পিতা, পাতা, শাসনকর্ত্তা। তিনি জ্ঞানস্বরূপে পরমপুরুষ এবং সচেতন জগতের "ব্রহ্মরূপ" পরম ধাতু। তিনি শক্তিরূপে সকলের জননী ও "ক্ষেত্ররূপ" আধারস্থান। তিনি শক্তিরূপে "ক্ষেত্র," ব্রহ্মরূপে "ক্ষেত্রজ্ঞ।"

এই সকল তত্ত্বকথার অনুরোধে শাস্ত্র তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন বিভাগ বিশেষে নানাপ্রকার শাসন ও পালন কর্ত্তৃত্বপদে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঊর্দ্ধতনভাগে তিনি পালনে বিষ্ণু, সৃজনে ব্রহ্মা, সংহারে রুদ্র। অধস্তন ভাগে তিনি সৃজনে প্রজাপতি, পালনে ও শাসনে ইন্দ্র ও মনু এবং সংহারে মৃত্যু বা যমরাজ। নিবৃত্তিধর্ম্মে তিনিই সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমাররূপী পরম আদর্শ এবং প্রবৃত্তিধর্ম্মে তিনিই মরীচি অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতি। মরীচ্যাদি ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার পুরুষ ও ব্রহ্মরূপ ধাতুর আবির্ভাব; এজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ প্রজাপতি-শব্দে উক্ত হন এবং মনুগণ তাঁহার শক্তি ও ক্ষেত্ররূপ ধাতুর অংশ; এজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয় প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জগতের পালন ও শাসনকর্ত্তৃত্বের প্রকারভেদে সেই একই পরমেশ্বরেতে এই সকল নানা পদবী বা উপাধি কল্পিত হইয়া থাকে। পুরাণশাস্ত্রের এই সমস্ত রহস্য বেদার্থে পরিপূর্ণ।

সর্ব্বপ্রাণির ভোগশক্তি ও ভোগ্যবিষয়সংযুক্ত যে সত্ত্ব রজঃ তমোগুণময় প্রবৃত্তিধর্ম্ম বা প্রকৃতি, তৎসম্বন্ধে পরব্রহ্মের সমষ্টি নিয়ন্তৃত্ব বা কর্ত্তৃত্ব-অংশটি ব্রহ্মানামে অভিহিত হয়। নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় তাঁহারই অধিকারভূত। সর্ব্বপ্রাণীগত প্রাগুক্ত গুণত্রয়ই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপ পরিবর্ত্তনের হেতু। ব্রহ্মা তাহার সমষ্টি-ভাবের বিধাতা ও অধিষ্ঠাতা। তিনি সেই সমষ্টি প্রকৃতি, ধর্ম্ম, বা ধাতুর মূল-বীজপুরুষ। এই নিমিত্তে জীবেতে সমষ্টিভাবে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রিপু, ও ভোগবাসনা সম্বন্ধে কত

বিধি বর্ত্তমান আছে সে সমস্তই ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়। অপরা লক্ষণাপ্রয়োগে ব্রহ্মাঙ্গসম্ভূত রূপেও কথিত হয়। ব্রহ্মাঙ্গসম্ভূত বলিলেই তৎসমস্তকে ব্রহ্মার পুত্র বলিতে হয়। সামান্যত 'মানস' ও 'দেহ' ভেদে ব্রহ্মাঙ্গ দ্বিবিধ। 'মানস', উত্তমাঙ্গস্থানীয় এবং মুখ প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয়, তাহার প্রত্যঙ্গস্বরূপ। সেই সার্ব্বভৌমিক দশ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট মহা মানস-বীজ হইতে জীব সমষ্টির প্রবৃত্তিরাজ্যের নিয়ামক দশবিধ ধর্ম্মধাতু উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা ইহাই বল যে, সেই ব্রহ্মমানস, বিভাগক্রমে মানবীয় দশবিধ ব্রহ্মধাতু-স্বরূপ। সেই দশবিধ ইন্দ্রিয় ক্ষেত্র' স্বরূপ 'ব্রহ্মমানস' হইতে যে দশবিধ প্রবৃত্ত ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে তৎসমূহই ব্রাহ্মণ-প্রজাপতি শব্দে উক্ত হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ এই দশজন ব্রাহ্মণ-প্রজাপতি, ব্রহ্মার সেই মানসপুত্র। মনই ব্রহ্মধাতু এইজন্য ইহারা ব্রাহ্মণ। এই মনের উৎকর্ষ সাধন যাঁহাদের ব্রত তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বকালে ঐ দশ প্রকারের মধ্যে যে ধাতুর বিশেষত্ব যে ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হইয়াছে, তিনিই মরীচ্যাদি কোন ধাতুর নামে নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্যক্তিপুরঃসরে এবং গোত্রপুরঃসরে ব্রাহ্মণকুলে ঐ সমস্ত নামের বিস্তর ঋষি ছিলেন। মূল-ধাতুটি মানস ছিল, তাহার বিশেষ বিশেষ বিভাগ হইতে অনেক ঋষি ও গোত্রের নাম-করণ হইয়াছে। ফলে মন্বন্তর-ভেদে ব্রাহ্মণ প্রজা-পতিদিগের নামও সংখ্যার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মার দ্বিতীয়াঙ্গ-দেহ। সেই দেহ, সার্ব্বভৌমিক সমষ্টিক্ষত্রধাতুস্বরূপ। বল, বীর্য্য, রাজ্যশাসন, প্রজাপালনাদি তাহার অন্তর্গত। সেই ধাতুটিও তাঁহার পুত্র তুল্য। তাঁহারই নাম মনু। মনু, ক্ষত্রধাতুস্বরূপ ব্রহ্ম-দেহ হইতে উৎপন্ন বিধায় জাতিতে ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়। যাঁহাদের প্রতি মানব রাজ্যের ভার তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যাঁহারা দেহ-রাজ্য বা বাহ্য প্রজা-পালনাদিতে ব্রতী, তাঁহারা কখনও ব্রাহ্মণ নহেন; সুতরাং সেই প্রথম মনু, বা পর পর মন্বন্তরে যত মনু হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ধাতু স্বরূপ। যুগযুগান্তে যে সকল মহামহা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ তাদৃশ ক্ষত্রধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাও অনেকে মনু বা ক্ষত্রিয় প্রজাপতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্মার মানসস্বরূপ সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মণ্য-ধাতু ও তাহার দেহস্বরূপ সমষ্টি ক্ষত্রধাতু—এই উভয় ধাতু-মূল, আর্য্যশাস্ত্রে স্থাপিত করা আছে। সেই উভয় ধাতু হইতে প্রত্যেক মন্বন্তরে ধর্ম্মরাজ্য ও সাংসারিক রাজ্য-বিন্যাস

হয়। ক্ষত্রিয়ধাতু হইতে বাহ্যরাজ্যের শাসন-কর্ত্তা এক একজন মনু এবং ব্রহ্মধাতু হইতে ব্রাহ্মণ প্রজাপতিগণ পরিকল্পিত হন। সেই সকল কল্পিত নাম হইতে ব্যক্তিবাচক প্রজাপতিগণ স্ব স্ব গুণানুসারে নাম প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক মন্বন্তরে যিনি মনু হন, তিনিই রাজা।

মানবীয় সহস্র চতুর্যুগে বিভক্ত ব্রহ্মদিনমানস্বরূপ প্রত্যেক কল্পে চৌদ্দ জন করিয়া মনু, ক্রমে পালন ও শাসনকর্ত্তা হন। এই বর্ত্তমান শ্বেত-বরাহ কল্পের আদিতে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার ছিল। তিনি ক্ষত্র-ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। সেই ক্ষত্রধাতুতে মানব বংশ প্রোথিত আছে। প্রগুক্ত ব্রহ্মধাতু সমূহ উক্ত ক্ষত্র ধাতুর সহিত উপগত হইয়া জগতে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিধান করিতেছে। স্বায়ম্ভুব মনুই ব্রহ্মার আত্মজ ক্ষত্রধাতুরূপ আদি প্রজাপতি। প্রজাপ্রসবকারিণী ক্ষেত্ররূপিণী সমগ্রশক্তি তাঁহার স্ত্রীরূপা। সেই স্ত্রীরূপিণী বিচিত্র শক্তির নাম শতরূপা। স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ভে দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। সেগুলি প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসার-ধর্ম্মরূপ ধাতু। পুত্র দুইটির নাম উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত। উত্তানপাদের দুই স্ত্রী। প্রেয় রূপিণী সুরুচি এবং শ্রেয়ঃ-রূপিণী সুনীতি। সুরুচি সম্পূর্ণ সংসার-রুচি। সুনীতিও মোক্ষজনিকা নহে, কিন্তু কর্ম্মফলভূত উর্দ্ধস্বর্গপ্রদায়িকা। কল্পজীবীগণের উপজীব্য ধ্রুব বা 'ধ্রুবলোক' সেই সুনীতিরূপ তপস্যার পুত্রস্বরূপ। শতরূপার তিন কন্যার নাম আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। আকুতি রুচির ক্ষেত্রস্বরূপ। অতএব রুচিনামক ব্রাহ্মণ প্রজাপতির সহ তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহা হইতে সংসারের হিতকর যজ্ঞ নামে পুত্র ও দক্ষিণা নামে কন্যা জন্মে। এই যজ্ঞই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ইন্দ্র ছিলেন। তাঁহা হইতে যথাকালে পর্জ্জন্য বর্ষিত হইত এবং প্রজাগণ সন্তোষানুভব করিত। যজ্ঞ ও দক্ষিণার পরস্পর পরিণয়সূত্রে দ্বাদশ সংখ্যক দেবতা জন্মেন। তাঁহারা যজ্ঞ সম্পাদ্য মানসিক তোষস্বরূপ। এই হেতু তাঁহাদের সাধারণ নাম তুষিত দেবতা। দেবহূতি নামক কন্যাটি যাগযজ্ঞের ফলভূত ভোগ্য ও ভোগায়তনস্বরূপ লোকমণ্ডলের জননী। ব্রাহ্মণ প্রজাপতি কর্দ্দম ঋষির সহ তাঁহার পরিণয় হয়। কর্দ্দম * শব্দে লোকমণ্ডলের উপাদান মৃত্তিকা-ধাতু। তাহা ব্রহ্মার

---

* "কর্দ্দম' শব্দ কর্ম্মবীজ ও। কর্ম্মবীজ হইতে ফলরাজ্যস্বরূপ লোক-মণ্ডল সকল উৎপন্ন হয়।

ছায়াস্বরূপ। কর্দ্দম ও দেবহূতির যোগে ফলভোগের পদার্থ ও স্থান সকল উৎপন্ন হয়। কলা, বসু (কিরণ), পূর্ণিমা, দেবকুল্যা (স্বর্গগঙ্গা), সোম, শ্রদ্ধা, শান্তি, অমাবস্যা, বৃহস্পতি, অগস্ত্য, গতি, ক্রিয়া, অরুন্ধতি, খ্যাতি নিয়তি, লক্ষ্মী, প্রভৃতি তাঁহার বংশ। মরীচ্যাদি দশজন ব্রাহ্মণ ঋষি তাঁহার জামাতা। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্মময় প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও তাহার ফলভূত স্বর্গাদি অনিত্য বিধায়, সাংখ্য জ্ঞানদ্বারা তাহাতে বৈরাগ্য জন্মাইবার নিমিত্তে দেবহূতির গর্ভে সর্ব্বকর্ম্মভস্মকর জ্ঞানাগ্নিস্বরূপ কপিল * উৎপন্ন হন। তিনি স্বীয় কর্ম্মময়ী মাতাকে বৈরাগ্য অভিষিক্ত করেন। যেখানে কর্ম্ম সেইখানে জ্ঞানাগ্নি আচ্ছাদিত। যেখানে রোগ সেইখানে ঔষধ। এটি ভারত শাস্ত্রের অসামান্য মর্য্যাদা অথচ স্বভাবেরও নিয়ম। নিম্নস্থ আখ্যায়িকায় এই নিয়মের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়।

প্রসূতি শতরূপার তৃতীয়া কন্যা। সায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি দক্ষ, ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ প্রজাপতির সহিত প্রসূতির বিবাহ হয়। 'দক্ষ,' সন্তান-সন্ততির জনন-ক্ষমতা স্বরূপ। প্রসূতি, সেই ক্ষমতার স্ত্রীলিঙ্গ-বাচিকা। সুতরাং উভয়ের বিবাহ স্বাভাবিক। তাঁহাদের ১৬ টি কন্যা হয়। সেই ১৬ টি কন্যা চারিভাগে বিভক্ত। ১৩টী সংসার-ধর্ম্ম-ভাগে; তাহাদের;—নাম শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, শ্রী, মূর্ত্তি। সেই সকল কন্যার প্রত্যেকের এক একটি পুত্র; ক্রম যথা—সত্য, প্রসাদ, অভয়, শম, হর্ষ, গর্ব্ব, যোগ, দর্প অর্থ, স্মৃতি, ক্ষেম, বিনয়, এবং নরনারায়ণ। প্রত্যেক পুত্র তাহার মাতার সহিত একধর্ম্মী। কেবল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দদ্বারা মাতাকে ও পুংলিঙ্গ শব্দদ্বারা পুত্রকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এই মাত্র প্রভেদ। দক্ষ ও প্রসূতির এই ত্রয়োদশ কন্যা সকলেই সংসারধর্ম্মপ্রযোজিকা; সুতরাং ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। সংক্ষেপ এই, যে, ধর্ম্ম, তাঁহার ঐ ত্রয়োদশ পত্নী ও ত্রয়োদশ পুত্র—সমস্তই একজাতীয় তত্ত্ব।

দক্ষ ও প্রসূতির অবশিষ্ট তিন কন্যার নাম স্বাহা স্বধা ও সতী। স্বাহা অগ্নিধর্ম্মিণী। উত্তরমার্গে, দেবলোকে, দেবযানে, দেবযাজী পুরুষকে তেজোময় রশ্মিযোগে বহন করা তাঁহার কার্য্য; সুতরাং দেবযানরূপ অতিবাহিনী বা অগ্ন্যভিমানী দেবতার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। তাহাতে

* "কপিল" শব্দে ভস্মকর অগ্নি। ভস্ম অথবা পিঙ্গলবর্ণ।

পাবক, পবমান ও শুচিনামে তিনটি ঘৃত ভোজী পুত্র জন্মে। সেই তিনজন হইতে অগ্নিস্বভাব পঁয়তাল্লিশটি পুত্র জন্মে। পিতামহ, পিতা ও পুত্রগণকে লইয়া সমস্ত পরিবারের সংখ্যা উনপঞ্চাশ। এই উনপঞ্চাশ দেবতা সমুদয়ই স্বলোকসাধক অগ্নিতত্ত্ব। এ সমস্ত লৌকিক নহে। (ভাগবৎ—৪। ১। ৪৮)

স্বধানামক দক্ষকন্যাটির ধাতু পিতৃতুষ্টিকর ও শ্রাদ্ধাদির ফলবর্দ্ধক। তাঁহার ধাতু অনুসারে অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ, সোমপ, ও আজ্যপ নামক সাগ্নি ও নিরগ্নি মিলিত পিতৃগণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৩৮। জীবের সংসারবাসনা, দেবলোকে গমনের আশা, পিতৃলোক-সম্ভোগের ইচ্ছা—এ সমস্তই অনিত্য এবং বারবার জন্মমৃত্যুসাধক। সংসার, দেব ও পিতৃ ভোগসাধিনী ত্রিবিধা বাসনা জীবের সঙ্কল্পজাতা, সুতরাং আত্মজা কন্যাস্বরূপিণী। সমষ্টি দৃষ্টিতে তাঁহারা দক্ষ ও প্রসূতির আত্মজা। দক্ষ ও প্রসূতির কন্যা হওয়াতেই তাঁহারা মনুষ্যমাত্রের কন্যারূপে সিদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ ভোগসাধিনী কন্যাই মনুষ্যের মোক্ষবিরোধিনী ও যন্ত্রণাস্বরূপিণী। এই নিমিত্তে তাঁহার উপশমবীজরূপিণী একটি মোক্ষদায়িকা প্রকৃতি মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে আছে। সমষ্টিভাবে সেইটি দক্ষের সতীনাম্নী চতুর্থী কন্যা। বৈরাগ্য, ব্রহ্মবিদ্যা, কালভয়নিবারণ-ক্ষমতা সেই কন্যাটির ধাতু। এই নিমিত্ত বৈরাগ্যের একমাত্র নিকেতন, সাক্ষাৎ যোগমূর্ত্তিস্বরূপ গুণাতীত, সুখকল্যাণের আকর, মঙ্গলস্বরূপ সংসারতারক শঙ্কর তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্য সংসারধর্ম্মে, দেবস্বর্গকামনায়, পিতৃসুখ-সম্ভোগে—ইত্যাদি অসার যজ্ঞাড়ম্বরে—অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হইয়া উঠেন, তখন করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মে মানবের হৃদয়-কবাট ভেদ করত ঐ সতী কন্যাটি বিনা আহ্বানে তাঁহার যজ্ঞপ্রাঙ্গণে আগমনপূর্ব্বক তাদৃশ যজ্ঞরূপ সমস্ত কর্ম্মকে স্বীয় পতি জগৎপতি সদাশিবকে অর্পণ করিতে উপদেশ দেন। সংসারী মানব সেই সদুপদেশ শ্রবণ না করাতে তাঁহার সমস্ত যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায়। এইরূপে সংসারাসক্ত মানব-সমষ্টির বীজমূর্ত্তি দক্ষ প্রজাপতির "বৃহস্পতি সব" নামক মহাযজ্ঞ নষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ, বৈরাগ্য-ধর্ম্মরূপী সদাশিবকে অপমান করায় সতী, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অজামুণ্ড হইয়াছিল। "অজা" শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী জন্মবিহীনা অনাদি মায়া, অবিদ্যা অথবা প্রকৃতি। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন কেবল-মাত্র অবিদ্যা বিরচিত মস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপূজায় অবিদ্যাই

ছেদনীয় অজারূপ বলিস্বরূপ। দক্ষ সেই ব্রহ্মপূজা করেন নাই, বরং অবিদ্যা ও বেদের অর্থবাদ লইয়া উন্মত্ত ছিলেন; এই হেতু তাঁহার মুণ্ডটি লক্ষণা-প্রয়োগে অজামুণ্ড বলিয়া কথিত হইয়াছে।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—স্বায়ম্ভুব মনু রাজা; শতরূপা মনুপত্নী; প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ মনুপুত্র; আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি মনুকন্যা; যজ্ঞ ইন্দ্র, তুষিতগণ (অথবা যামাদিগণ) দেবতা; এবং মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। (মতান্তরে দশ ঋষি) তাঁহারা তখন জগতের পালনকর্ত্তা ও নিত্য সৃষ্টির কারণ ছিলেন। প্রবৃত্তিধর্ম্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতির কারণ। প্রত্যেক জীবের ব্রহ্মধাতু ক্ষত্রিয়ধাতুরূপিণী প্রবৃত্তি হইতে এই জগতে জীবগণ, যে, নিত্য নিত্য জন্মগ্রহণ করিতেছে ও প্রতিপালিত হইতেছে তাহারই নাম 'নিত্য সৃষ্টি।' তাহা ব্রহ্মার নিয়মিত দৈবিক প্রবৃত্তির অধীন। ক্ষত্রিয় ধাতুরূপ মনু এবং ব্রহ্মধাতুরূপ মরীচি দক্ষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ প্রজাপতিগণ, নিত্য সৃষ্টির অবান্তরকর্ত্তা ও বিধাতা মাত্র।

প্রাগুক্ত স্বায়ম্ভব মন্বন্তর ব্যতীত আর ত্রয়োদশটি মন্বন্তর আছে। তাহার প্রত্যেক মন্বন্তরে মনু, মনুপুত্র, মনুকন্যা, ইন্দ্র, দেবতা, ও সপ্তর্ষিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিধানে উৎপন্ন হন। মন্বন্তর ভেদ জন্য তাদৃশ নামাদির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। মনুগণ, এক এক জন ক্ষুদ্র ব্রহ্মা বিশেষ। এই বর্ত্তমান শ্বেত-বরাহ কল্পে ১০০০ চতুর্যুগ আছে। চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে প্রত্যেকে তাহার ৭১৩ মহাযুগ ভোগ করেন। তাঁহাদের ৬ জনের অধিকারকাল ক্রমে গত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস রৈবত এবং চাক্ষুষ। এইক্ষণ সপ্তম মনুর অধিকার। ইহার নাম বৈবস্বত। ইহারই বংশ এখন প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনুবংশ সকল লোপ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে পুরন্দর ইন্দ্র পদে, এবং কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ সপ্তর্ষি পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মনুর স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা, এবং ইনি শ্রাদ্ধদেব শব্দে উক্ত হন। ইঁহার পর আর সাত জন মনু হইবেন। তাঁহাদের অধিকারকাল গত হইয়া গেলে ব্রহ্মার রাত্রী হইবে। তখন একটি নৈমিত্তিক প্রলয় উপস্থিত হইবে।

নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় যেমন ব্রহ্মার অধিকারভূত; নিত্য সৃষ্টি ও নিত্য প্রলয় সেইরূপ মন্বন্তরের অন্তর্ভূত। এই অন্তর্ভাব অবান্তর মাত্র। মনুষ্য ব্রহ্মাই, সকল ঘটনার অধিপতি এবং মনু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ

কেহই স্বতন্ত্র নহেন; কিন্তু ব্রহ্মার সাময়িক ভাব, তত্ত্ব বা অবস্থাবিশেষ। জীবগণের ভোগশক্তি, ভোগ্য পদার্থের ভোগদানের শক্তি, মানসিক ধর্ম্মের ভাব প্রভৃতি ধাতু ও তত্ত্বকে অধিকার পূর্ব্বক মহা যুগ যুগান্তে যেরূপ অবস্থা ও ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; তাহা ঋষিগণ যোগবলে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ সূত্রে জ্ঞাত হইয়া ভারতের উপকারার্থ শাস্ত্রবদ্ধ করিয়াছেন। সে সমস্ত মন্বন্তরাদির কালসংখ্যা এবং বিভাগ হেতু সামান্য বুদ্ধিতে স্ফুরিত হইতে পারে না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ এই তিন শক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বশরীরে অবস্থান করাতে নিরন্তর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে। সত্ত্ব ও রজোগুণপ্রভাবে স্থিতি ও উৎপত্তি, তমোগুণপ্রভাবে বিনাশ। অত-এব উপরি উক্ত নিত্য সৃষ্টির বিপর্য্যয়স্বরূপ নিত্য প্রলয়ও উক্ত হইয়াছে। সার্ব্বভৌমিক-সৎপ্রবৃত্তি-সমূহ যেমন সৃষ্টির হেতু সার্ব্বভৌমিক-তমোগুণ সেইরূপ নিত্যপ্রলয়ের কারণ। সেই সার্ব্বভৌমিক-তমোগুণটি সমষ্টিজীব-বিধাতা স্বরূপ ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; সুতরাং সমষ্টি অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠদেশস্বরূপ অথবা পৃষ্ঠ হইতে উৎপন্ন। হিংসা, অনৃত, ভয়, নরক, মায়া, বেদনা, মৃত্যু শোক, কলি এই সকল সেই অধর্ম্মের বংশ। ইহারাই জগতের 'নিত্য প্রলয়ের' হেতু। এই জগতে জীবগণ যে নিত্য নিত্য জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহাই 'নিত্য প্রলয়' শব্দের বাচ্য।

এইরূপ নিত্যপ্রলয়সমূহ মনুগণকর্ত্তৃক অবান্তর রাজশাসনের অন্তর্গত। তদ্ভিন্ন মনু-পরিবর্ত্তনকালে জগতে গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তখন ঋষি, দেবতা, ইন্দ্র প্রভৃতি সমুদয় পরিবর্ত্তিত হওয়াতে জগতের প্রবৃত্তিধর্ম্মে ও ভোগরাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

খড়্গপুর।

কর্ম্মফল।

কেবা আমি, কার তরে, এসেছি কোথায় ?
কিছুই জানিনা আমি কে বলে আমায় ?
কেহত আমার নাই কার কাছে যাই,
চারিদিক্ ধূ ধূ করে যেদিকে তাকাই,
আপন যে জন, তারে চিনিতে না পারি,
কে কবে আপন হ'ল, তাই ভেবে মরি
চারিদিকে লাগে ধাঁধা,
এ দিকে ও দিকে বাঁধা
বাঁচিনে বাঁচিনে আর গেলাম গেলাম
কোথায় এলেম আমি বিঘোরে মলাম !
অনন্ত কালের আঁকা—
উপরে আকাশ ফাঁকা—
চলেছে চলেছে শুধু নাহি তার সীমা ;
কে জানে অনন্ত ভাব, অনন্ত মহিমা ?
যতই চাহিয়া দেখি,
ভাবেতে ডুবিতে থাকি,
নেত্রে উথলিয়া উঠে প্রেমের নঝর ;
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি সভয় অন্তর !

২

পড়ে থাকি জ্ঞান শূন্য নেশায় বিভোর,
উহু ! কি গভীর ভাব অনন্তের ঘোর !
মাহাত্ম্য তোমার কেবা,
আমারে বুঝায়ে দেবা,
কোথা গেলে পাই তব নিগূঢ় সন্ধান
করহ আকাশ মোরে উত্তর প্রদান ?

সর্ব্বগুণাধার তুমি, শব্দগুণালয়,
ওঙ্কারেতে বিমোহিত, ব্রহ্মরূপময়,
সহজ সে শুদ্ধ সুরে,
একবার ডাক মোরে,—
ছুটে যাক আমিঘোর এ গোলক ধাঁধা
এ ভাবেতে কত কাল থাকিব রে বাঁধা ?
"আমি কার কে আমার" ?
বল শুনি একবার,
হে আকাশ, তুমি বাপ তোমার দোহাই ?
যথার্থ ভিক্ষুক আমি কপটতা নাই !!
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড এ যে,
কোথায় পাব রে খুঁজে,
কেমনে করিব ভেদ এ লক্ষ্য বিষম !
বিনা সে অনন্ত দেব আগমে নিগম !

৪

তুমি কি আকাশ মোরে এ তত্ত্ব বুঝাবে ?
তুমিত উন্মত্ত সদা অনন্তের ভাবে !
অনন্ত এ বিশ্ব মাঝে,
কোথা আমি কার কাজে,
আমি কোর, আমি কার ঘুরিয়া বেড়াই,
শুনিয়া তোমার কাছে সন্দেহ মিটাই,
কবে, সে কোথায় রবে,
কোন্, সূত্রে, ভব-ঘোরে
পড়েছি জড়ায়ে, বল সে অনন্ত কথা,
তুমি বিনা কে কহিবে এ গূঢ় বারতা ?

তুমি হে অনন্তময় সকলি ত জান,
মনে করে দেখ দেখি, জ্ঞান ত সন্ধান।
অতীতের অন্ধকারে—
কে বল ডুবিতে পারে?
যত যাই তত পাই অনন্ত গভীর—
প্রকৃতির মায়া তায় বিকট কুম্ভীর!
একেত অনন্ত কায়া,
অনন্ত সে মহামায়া,
প্রকৃতি, বড়ই তুমি নিষ্ঠুরা প্রকৃতি।
মাগো! এ কেমন ভাব সন্তানের প্রতি
কোথা সে কারণ পিতা
বলে দাও সেই কথা,
ছুটে গিয়ে একবার ধরিগে চরণে?
'বাবা' ব'লে একবার ডাকিগে বদনে।
ছেড়ে দাও একবার,
খুলে দাও কারাগার,
আবার আসিব ফিরে মা, তোমার কাছে
ভয় নাই আর যদি নাহি ফিরি পাছে।
এমনি মায়ের মায়া,
চমকি উঠিল, ছায়া
ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতে, নিশ্বাস-পবন
তরঙ্গে মথিল সিন্ধু, আলোড়িল বন॥

৬

অনন্ত বিস্তৃত কায়, তুমি ত আকাশ,
তোমার নয়ন আগে সব সুপ্রকাশ;
সমভাবে আছ একা,
প্রেমেতে হৃদয় মাখা,
ধ'রেছ জঠর মাঝে, এ বিশ্ব ভাণ্ডার,
কে করে ধারণা তার, অনন্ত বিস্তার?

কত সূর্য্য কত তারা,
ধূমকেতু দিশে হারা,
কত অগণিত চাঁদ, (কত) গ্রহ, উপগ্রহ,
ঘুরিতেছে ভয়ঙ্কর অতি দুর্ব্বিসহ—

৭

কত ঘাত প্রতিঘাতে, ব্যথিত শরীর,
তবুও অটল ভাব, মূরতি গম্ভীর,
জঠরেতে মহাভ্রূণ,
বাড়িতেছে অনুক্ষণ,
নাহিক প্রসব বেগ, নাহিক যন্ত্রণা।
উহু কি! ধারণা শক্তি জানেনা বেদনা!
সেই প্রেমময় হাস
অথচ গম্ভীর ভাস
নির্ম্মল শীতল যেন পূর্ণিমার দিশি
ভয়ঙ্করা মহাঘোরা অমাবস্যা নিশি।
আকাশ, প্রকৃতি-তত্ত্ব জান ত সকলি,
প্রকৃতির ইতিহাস দেও দেখি বলি।
কি আছে আমার কথা,
বল সে গূঢ় বারতা,
দেখিব এতই আমি, কি পাপ করেছি
এত দুঃখ মনস্তাপ কেন সহিতেছি॥
কার ইচ্ছা অনুসারে,
বল, কে সৃজিল মোরে?
আমি কোথা বল আগে, আমি সাধিলাম,
কার প্রেমে মজে বল, ভব দেখিলাম?

৯

পাপ, পুণ্যে ভেদাভেদ কবে সে হইল?
কে আমারে কোন্ কালে সে কথা বলিল?
যার প্রতি আছে ভার,
সেই কথা বলিবার,

সেকি মোরে কাণে কাণে বলেছে সে কথা;
দেখ দেখি ভাল ক'রে সে গূঢ় বারতা?
সে যদি বলিয়া থাকে,
দোষী করে কে আমাকে?
শুনেছি এ ভব-রাজ্যে অবিচার নাই,
কেন তবে বিনা দোষে এত দুঃখ পাই?

১০

জগৎ প্রসূতি ওগো, প্রকৃতি জননি,
শোন্ মা অভয় দিয়ে সন্তান-কাহিনী;
জরায়ু ছিঁড়িয়ে যবে,
ভ্রূণগণ বাহিরিবে,
আর যেন গর্ভ-ভার কো'রো না গ্রহণ!
সন্তানে এমন ক্লেশ না পায় কখন!
পুরুষে হোয়ো মা লয়,
সৃষ্টি যেন লোপ হয়,
মিছে কেন সৃষ্টি করে হাঁসাও কাঁদাও,
আদরের জীবে মা গো জীয়ায়ে পোড়াও,

১১

প্রকৃতি গো,তুমি নাকি আদ্যাশক্তি হও
তবে মা এ অভাগারে মুক্ত করি লও।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর,
কত কাল আমি-ভার,
বহিতে হইবে মাগো. আর যে পারিনে।
একবার দয়া কর অকৃতি সন্তানে!
ভুবনমোহিনী তুমি,
তোমার কুহকে ভ্রমি,
তোমার মূরতি মাগো,ভুলিতে কি পারি
যাই আসি, আসি যাই, ভব ঘুরে মরি!

১২

প্রভাতের নবরাগ, গোধূলির হাসি,
ম'রিলেও প্রাণে যেন বেড়ায় গো ভাসি!
টেনে আনে জোর করে,
কেমনে এড়াই তারে?
তুমি হলে মহাশক্তি,আমি ক্ষীণ প্রাণী,
ডাকিলে কেমনে থাকি,বল গো জননি?

১৩

আগেও ত এসেছি মা তোমার এখানে,
কাঁদি নাই নিজদুঃখে কখন জীবনে।
হাসিতাম তোর সনে,
কাঁদিতাম দুই জনে,
বেড়াতাম কত সুখে পড়ে মা, কি মনে
গাহিতাম তোর গান, বদরিকাশ্রমে?
আজি মা তেমন নয়!
সব নিরানন্দময়!
তোমার হাসিতে আর, মন যে হাসে না!
তোমার ক্রন্দনে মাগো,মন যে কাঁদে না
আপনিই কাঁদি আমি,
জাহ্নবী পুলিনে ভ্রমি,
মিথ্যা প্রবঞ্চনা মাঝে, কলির শাসনে,
পূর্ব্ব কথা ভেবে কাঁদি স্বপনে স্বপনে!
হায় মা, সে সিন্ধুকূলে,
আপনে আপনি ভুলে,
গেয়েছি যখন মাগো. সাম-বেদ গান,
প্রকৃতির হাসি ছিল জুড়াইয়া প্রাণ!
আজি মা তেমন নয়!
সব নিরানন্দময়!

তোমার হাসতে আর, মন যে হাসে না
তোমার ক্রন্দনে মাগো, মন যে কাঁদে না
কেন মা এমন হলো,
জননী গো বলো বলো,—
কি ঘোরে পড়িয়ে মাগো. মোক্ষ হইল না,
সব পণ্ড, —গিয়ে মাগো, নূতন সূচনা ?

১৪

কর্ম্ম ফল সে কি মাগো! অদৃষ্টই বা কি?
একবার বল মাগো। পায়ে ধরে থাকি,
কে করিল কর্ম্ম সৃষ্টি ?
কেন এ গরল বৃষ্টি।
জীব-বীজ আগে কিংবা কর্ম্ম বীজ বল?
তুমিই এ বীজ মন্ত্র! জান মা, কেবল।
কর্ম্ম কভু অগ্রে নয়,
জীব ছাড়া নাহি রয়,
সে জীবের তলে কোথা, উদ্ভব কারণ,
তবে কি মা জীব সৃষ্টি, বিধি বিড়ম্বন ?
জীব যদি অগ্রে হবে,
কেন সুখ, দুঃখ রবে ?
তা হ'লে ব্রহ্মাণ্ড যে মা, হ'ত একাকার
এক বুদ্ধি চালাইত কর্ম্ম সদাকার ;
সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, গুণ,
তিন ভেঙে এক গুণ,
হ'ত গো জননী তোর, সাম্য অবয়ব,
অবতার কপিলের হ'ত অসম্ভব।
সে যে মা হবার নয়,
বেদ কোথা মিথ্যা হয় ?
তুমি মা ত্রিগুণাত্মিকা, ত্রিগুণদায়িনী,
কর্ম্মভেদে গুণভেদ, কয় গো জননী।

তবে মা বলি আবার,
চরণে ধরি তোমার,
ভেঙে দাও এ সমস্যা, মোর দিব্য লাগে,
কর্ম্মফল আগে কি মা জীব সৃষ্টি আগে ?

১৫

এ ও হয়, অ-ও হয়, কেমনে বুঝিব
না বুঝিলে, আমি ঘোর, কেমনে ভাঙিব
কেন আমি, হ'য়ে আমি,
আসিয়াছি মর্ত্ত ভূমি ?
কেন আমি হইলাম ? কে মোরে করিল
কেন যে করিল মোরে, গোড়া কোথা পাইল
গোড়া নাই, আগা নাই,
মাঝার দেখিতে পাই,
এ বড় মজার কথা, তবে কেমনেতে,
ধর্ম্মো হি দৃশ্যতে যত্র, অনন্ত ত্রবিদ্যতে?
এ যে বড় হল দায়,
মাঝে পড়ে প্রাণ যায়,
প্রকৃতি গো, এ গাছের মূল কোথা বল
আমি—বৃক্ষে, আর বড় খাই বিষ ফল।
নেমে যাই গাছ হ'তে
মূল ধরে পাতালেতে,
শেষ নাগ যেখানেতে, কারণ বারিতে
যোগাযোগ করিতেছে মণির প্রভাতে।
সুধা হ্রদ যার মূলে,
সে গাছেতে বিষ ফলে ?
প্রকৃতি গো, পায়ে ধরি বল সে কাহিনী
কর্ম্মঘুণ কোথা হ'তে আসিল জননি ?

১৬

সকলেই পূর্ব্বাপর কর্ম্মফল বলে,
কেন বলে জানি না, মা, কার আজ্ঞা বলে;

বেদ বলে, সাংখ্য বলে,
বেদান্ত, দর্শন বলে,
গীতা ভাগবত, আর শাস্ত্র সমুদয়,
এক বাক্যে বলে মাগো, কর্ম্মফল জয়
তবে মা, আমি কি বলি ?
দাও মন্ত্র কাণে ঢালি,
দেখাও সন্তানে মাগো জ্ঞান-চক্ষু দিয়ে,
কেমন জীবের কর্ম্ম, প্রকৃতি আলয়ে ;
কর্ম্ম, জীব, পরস্পরে
বাঁধা কি অনন্ত ডোরে,
কার পর কেবা মাগো, কিংবা
না, না,—মাগো, নমস্কার
বেদ বাক্যে বার বার,
গীতা, ভাগবত, আর বেদান্ত বচনে,
মহা যোগী কপিলের অমূল্য চরণে,
আমিও মা, গাই তবে,
কর্ম্ম গীত আজি ভবে,
গাও তবে দেব, নর, করিয়া ভকতি।
"নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ-
প্রপবতি ॥"

নবজীবন।

২য় ভাগ } চৈত্র ১২৯২। { ৯ম সংখ্যা।

আর্য্যধর্ম্মের ভাবীরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্ম নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়

আচার অনিত্য ও পরিবর্ত্তনীয়।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ভগবান্ মনু তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

মনু সংহিতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯২ শ্লোক।

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, মনঃশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, ধীঃ, আত্মজ্ঞান, সত্যানুরাগ, এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

'ধীঃ' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি, কুল্লুকভট্ট বলেন, এস্থলে ইহার অর্থ 'শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান।' মনু কোন্ অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। যাহার বুদ্ধি অল্প এবং শাস্ত্রজ্ঞান নাই বলিলেই হয়, তাহারও যদি কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে, সেও ধার্ম্মিক হইতে পারে; অতএব প্রচলিত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিলে, 'ধীঃ' ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ নহে বলিতে হইবে। (১)।

---

(১) কুল্লুকভট্ট আরও বলেন, 'ধৃতি' অর্থ 'সন্তোষ।' বোধ হয় মনুর অভিপ্রায় এই যে, যে ব্যক্তি আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া পরশ্রীকাতর না

'ধীঃ' অনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বলিয়া ত্যাগ করিয়া, মানবধর্মশাস্ত্রোক্ত অন্যান্য নয়টি লক্ষণ যে ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ, ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবশ্য স্বীকার করিবেন। ধর্ম্ম নিত্য এবং সার্ব্বভৌমিক; তাহা দেশ কালও অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তনীয় নহে। আচার অনিত্য; তাহা দেশকালও অবস্থা ভেদে পরিবর্ত্তনীয়। অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, দয়া, অচৌর্য্য, সত্যানুরাগ, অক্রোধ ও ইন্দ্রিয় সংযম সত্যযুগে ধর্ম্ম ছিল, এখনও ধর্ম্ম। মনু এক স্থলে বলিয়াছেন বটে, যে সত্যযুগের ধর্ম্ম অন্য, ত্রেতার ধর্ম্ম অন্য, দ্বাপরের ধর্ম্ম অন্য এবং কলির ধর্ম্ম অন্য (মনু সংহিতা ১অ ৫৮)। এই বচনের প্রকৃত অর্থ এই যে, কালভেদে ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন ভিন্ন হইবে; কিন্তু ধৃতি আদি ধর্ম্মের লক্ষণের ব্যত্যয় হইবে না। অস্তেয় বা অচৌর্য্য সকল যুগেই ধর্ম্ম; এবং তদ্বিপরীত চৌর্য্য সকল যুগেই অধর্ম্ম। কিন্তু এই অধর্ম্মের দণ্ডবিধান মনু এক প্রকার করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য অন্য প্রকার, মুসলমান ইমামগণ অন্য প্রকার, এবং ইংরেজি ব্যবস্থাপকগণ অন্য প্রকার করিয়াছেন। দণ্ডের পার্থক্যবশতঃ উক্ত পাপের গুরুত্ব বা লঘুত্ব হয় নাই।

মহাপ্রভু চৈতন্য বলিয়াছেন,

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসুচ।
প্রেমো মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে মৈত্রী মূঢ়ে কৃপা এবং বিদ্বেষীর প্রতি যিনি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। এই বচনে মধ্যম বৈষ্ণব কেন, পরম ধার্ম্মিকের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কারণ যাঁহার মানবের প্রতি মৈত্রী আছে, তিনি অবশ্যই সত্যবাদী, দয়াবান্, অহিংসক ও সংযতেন্দ্রিয় হইবেন (১) মনু

হয়, সে ধৃতি অর্থাৎ অমৎসরতা গুণযুক্ত। 'দেহশোধনং শৌচং' কুল্লুককৃত এই ব্যাখ্যার শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চূড়ামণি মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, "মনঃশুদ্ধিই যখন সকল শাস্ত্রের একমত উদ্দেশ্য, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেহ ধৌত করাকে শৌচ বলা যুক্তি বিরুদ্ধ বোধ হইল"—ধর্ম্ম ব্যাখ্যা ১ম খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা।

(১) কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে 'মৈত্রী' ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক জন ব্যবহারাজীব ইশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ধর্ম্মের সার কি?"। তদুত্তরে ইশা বলিয়া ছিলেন, 'ঈশ্বরে প্রেম ও মানবে মৈত্রী' মেথি ২২ অং ৩৬—৪০ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মহাত্মারা নিত্য ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় এক প্রকার মীমাংসাই করিয়া গিয়াছেন।

চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মারা নিত্য ধর্ম্মের যে সমস্ত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার প্রতি জনসাধারণের আস্থা এখনও আছে, এবং উত্তরকালেও থাকিবে; কিন্তু অনিত্য আচার পরিবর্ত্তিত হইবে। আমাদের কোন কোন পুরাণও স্মৃতিতে নিত্য ধর্ম্ম বিশেষ অনিত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং কোন কোন আচারও নিত্য ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) সতীত্ব নিত্য ধর্ম্ম। ইহা মানব ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের পঞ্চম ও ষষ্ঠ লক্ষণের (শৌচ এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের) অন্তর্গত, কিন্তু মহাভারতে কুন্তির প্রতি পাণ্ডুর উক্তি পাঠ করিয়া অনেক হিন্দুরই এই সংস্কার জন্মিয়াছে, যে, সতীত্ব নিত্য ধর্ম্ম নহে; উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতু স্ত্রীলোকদিগের স্বেচ্ছা-বিহার রহিত করিয়া, সতীত্বধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। (১)

ধর্ম্ম ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি ও অনন্ত; কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই, যে, সে নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করে, অথবা পুরাতন ধর্ম্ম বিনষ্ট করে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে কথিত আছে, যে, একদা একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হাত ধরিয়া তাঁহার সহিত বিহার করার মানসে তাঁহাকে একান্তে লইয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া, শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হইলেন। শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিলেন, 'বৎস, রাগ করিও না, এ সনাতন ধর্ম্ম।" শ্বেতকেতু তৎকালে ক্রোধ সম্বরণ করিলেন; কিন্তু তৎপরে এই নিয়ম স্থাপন করিলেন, "অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবে, সে ভ্রূণ হত্যার সমান পাপে পতিত হইবে, এবং যে পুরুষ সাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবে, তাহারও ঐরূপ পাপ হইবে।" শ্বেতকেতুকে উদ্দালক নারীগণের সচ্ছন্দ বিহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'এষধর্ম্মঃ সনাতনঃ"। যদি উদ্দালকের এই উক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে এক্ষণেও স্ত্রীলোকদিগের সচ্ছন্দ বিহারে কিছুমাত্র দোষ নাই, এবং সতীত্ব কৃত্রিম ধর্ম্ম, কারণ সনাতন ধর্ম্ম রহিত করে এমন কাহার সাধ্য নাই। বস্তুতঃ অতি পুরাকালে স্ত্রী পুরুষ

---

(১) অনাবৃতা কিলপুরা আসনস্ত্রিয় বরাননে।
কামাচার বিহারিণ্য স্বতন্ত্রশ্চারুহাসিনি ॥
* * * * * *
ঋষিপুত্রোহচ তৎধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্নচক্ষমে।
চকার চৈব মর্য্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি ॥

মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

সকলেই গবাদির ন্যায় সচ্ছন্দ-বিহার করিত (১)। ইহাতে সমাজের অনিষ্ট হওয়ায় সতীত্ব রক্ষার জন্য নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ নিয়ম দ্বারা সতীত্ব নামে নূতন ধর্ম্ম সৃষ্ট হয় নাই। উদ্দালকের সময়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অসতীত্ব বা সচ্ছন্দ-বিহার প্রাদুর্ভূত ছিল বলিয়া, অসতীত্বকে সনাতন ধর্ম্ম বলা উদ্দালকের ভ্রম। মনুর সময়ে কোন পুরুষ পুত্রোৎপাদনে অপারগ হইলে আপন স্ত্রীকে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন জন্য অপর পুরুষের নিকট নিয়োগ করিতে পারিত বটে; তথাপি এই প্রথা দ্বারা সাধারণ বিধির ব্যত্যয় হয় নাই বলিলেই হয়। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র সতীত্ব নিত্য ধর্ম্ম বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। সাবিত্রীর উপাখ্যান পাঠ করিয়া বোধ হয়, বেদব্যাস ও সতীত্বকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া মানিতেন; তথাপি আদিপর্ব্বে পাণ্ডুর উক্তি পড়িয়া পাঠকের ভ্রম জন্মাইতে পারে।

শ্বেতকেতুর নিয়ম অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম। তাহা সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে, হিন্দুসমাজ হইতে অধিবেদন প্রথা তিরোহিত প্রায় হইত; পত্নী বন্ধ্যা, চিররোগিনী, ব্যভিচারিণী বা মৃতা না হইলে, কেহই দ্বিতীয়া পত্নী-গ্রহণ করিতেন না।

> ব্যুচরন্ত্যাঃ পতিংনার্য্যা অদ্য প্রভৃতি পাতকম্।
> ভ্রূণ হত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্॥
> ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমার ব্রহ্মচারিণীম্।
> পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকংভুবি॥

হিন্দুসমাজে শ্বেতকেতুর এই ব্যবস্থা কেবল স্ত্রীলোকদের পক্ষেই প্রবল রহিয়াছে; বরং নিয়ম পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর হইয়াছে। শ্বেতকেতুর এই বচন বিধবা বিবাহ নিষেধক নহে; কারণ প্রথম শ্লোকার্দ্ধে 'পতি' শব্দে 'জীবিত পতি' বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্লোকে 'ভার্য্যা' শব্দে 'জীবিতা ভার্য্যা' বুঝিতে হইবে; ভার্য্যার মৃত্যু হইলেও ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে পারিবে না; অথবা পতির মৃত্যু হইলে, অন্য পতিগ্রহণ করিতে পারিবে না, শ্বেতকেতুর এমন অভিপ্রায় নহে। শ্বেতকেতু স্ত্রী ও পুরুষের পাপের কিছুমাত্র পার্থক্য করেন নাই। পতিকে অতিক্রম করায় যে পাপ, ব্রহ্মচারিণী এবং পতিব্রতা স্ত্রীকে অতিক্রম করায়ও সেই পাপ।

---

(১) Sir John Lubbock on Communal Marriage (Origin of Civilisation, Chapter 3) & M,. Lellan's Primitive Marriage.

ব্যভিচার সকলের পক্ষে দূষণীয়; তথাপি এই পাপের লঘুত্ব ও গুরুত্ব আছে। মনে কর মদ্যপায়ী স্বামী স্ত্রীকে নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা এবং অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দিয়া, অবশেষে বাটীর বাহির করিয়া দিল; এমন অবস্থায় নিরাশ্রয়া স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে, তাহার পাপের মার্জ্জনা আছে। আবার মনে কর স্বামীর প্রাণাধিকা পত্নী কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া ভ্রষ্টা হইল; তাহার পাপ গুরুতর। পত্নীহীন পুরুষ বেশ্যাগমন করিলে তাহার পাপ লঘু; যে পুরুষ পরস্ত্রীর সতীত্ব নাশ করে, তাহার পাপ গুরু। ব্যভিচার দোষের গুরুত্ব ও লঘুত্ব না বুঝিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রচয়িতা মহাভ্রমে পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে কুলটাগমনে পাপ লঘু আর মহাবেশ্যাগমনে পাপ গুরু। বৃষলী, পুংশ্চলী, বেশ্যা ও যুম্পীগমনে পাপ নাতি গুরু, নাতি লঘু। (১) এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত যে সতীর সতীত্ব নাশ না করিয়া কুলটাগমন হইতে পারে না? বৃষলী, পুংশ্চলী বা বেশ্যাগমনে অন্য যেমন পাপ হউক না কেন, সতীর সতীত্ব নাশ জনিত মহাপাতক হয় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া কুলটাগমন মহা বেশ্যাগমন অপেক্ষা একশত গুণ লঘুতর পাপ বিবেচনা করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

(২) বৃহন্নারদীয়মতে কলিযুগে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ (২)। অন্যান্য যুগে যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে লিখিত আছে যে তুগ্র রাজর্ষির পুত্র ভুজ্যু দ্বীপবাসী শত্রুদিগের বিনাশ জন্য সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন; সমুদ্রে নৌকাভগ্ন হওয়ায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভুজ্যুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মানব

---

(১) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড। পতিকে অতিক্রম করিয়া যে স্ত্রী এক পুরুষগামিনী হয়, সে কুলটা, যে দুই পুরুষগামিনী হয়, সে বৃষলী, যে তিন পুরুষগামিনী হয়, সে পুংশ্চলী, যে চারি পুরুষগামিনী হয়, সে বেশ্যা, যে পাঁচ ছয় বা সাত পুরুষগামিনী হয়, সে যুম্পী, ও যে আট বা তদধিক পুরুষগামিনী হয়, সে মহাবেশ্যা। উক্ত পুরাণমতে কুলটাগামী এক শতাব্দী, অবটোদ নরকে বাস করে। বৃষলীগামীর পাপভোগ তাহার চতুর্গুণ, পুংশ্চলীগামীর ষট্‌গুণ, বেশ্যাগামীর অষ্টগুণ, যুম্পীগামীর দশগুণ, এবং মহাবেশ্যাগামীর একশত গুণ।

(২) সমুদ্রযাত্রা স্বীকার কমণ্ডলু বিধারণম্।
দ্বিজানাম্ সবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসাদনং তথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥

ধর্ম্মশাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রার নিষেধ নাই; তবে তৃতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে যে পিতৃশ্রাদ্ধে জটিল ও মুণ্ডব্রহ্মচারীকে, বহু যাজনশীল যাজককে, বেতনগ্রাহী অধ্যাপককে, সমুদ্রযায়ী প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিবে না। রামায়ণে যবদ্বীপের উল্লেখ আছে।

'যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতং।
সুবর্ণরূপ্যকং দ্বীপং সুবর্ণ করমণ্ডিতং॥"

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০ সর্গ।

যদি পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগে সমুদ্রযাত্রা অধর্ম্ম ছিল না, এক্ষণেও হইতে পারে না; কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম নিত্য পদার্থ। মনু যে ধর্ম্মের দশ লক্ষণ বলিয়াছেন, সমুদ্র যাত্রা দ্বারা ইহার কোন্ লক্ষণের ব্যত্যয় হয়? যদি না হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে বৃহন্নারদীয়ের রচয়িতা কৃত্রিম অধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া স্বজাতির পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছেন। যদি এখন সমুদ্রযাত্রায় পাপ হয়, পরে এক স্মার্ত্ত নিয়ম করিতে পারিবেন যে পদ্মা ও মেঘনা নদীর উপর যাত্রায় পাপ আছে, অথবা লাল বাঁধপুকুরে, সাগর দীঘিতে বা কৃষ্ণসায়রে যাত্রায় পাপ আছে।

যদি বল মনুষ্যের শক্তির হ্রাসহেতু যে কার্য্যে পূর্ব্বে দোষ ছিল না; তাহা এক্ষণে দূষণীয় হইয়াছে, তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, "শক্তি হ্রাসের প্রমাণ কি?" মনুষ্য কোন কালে কেবল শারীরিক বলে সিংহ ব্যাঘ্রাদির সমকক্ষ ছিল না। তাহার দৈহিক বল সর্ব্বকালেই সামান্য। বুদ্ধি বলে ও অস্ত্র বলে মনুষ্য পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ভুজ্যু যখন সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন বরং তাঁহার কার্য্য দোষাবহ ছিল; কারণ তৎকালের তরী এক্ষণকার পোতাপেক্ষা সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট ছিল; তখন কেহ কোম্পাসের ব্যবহার জানিত না; কেবল সূর্য্য ও তারা দেখিয়া সমুদ্রে নৌকা বাহিত। এক্ষণে বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা মনুষ্যের শক্তির বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে; কোম্পাসদ্বারা দিক্ নিরূপণ অতি সহজ ব্যাপার হইয়াছে;

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়া পুনর্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

ইতি উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্নারদীয়।

জ্যোতিষের এখন সূক্ষ্ম গণনা হইয়াছে। এবং ভূগোলে এমন ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, যে পোতবাহন এক্ষণে পূর্ব্ববৎ দুরূহ ব্যাপার নহে। নাবিক বিদ্যাজনিত শক্তির বৃদ্ধি হেতু সমুদ্র যাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা এত সহজ ব্যাপার হইয়াছে, যে পূর্ব্বকালের তিন মাসের পথ এক্ষণে তিন দিনে যাওয়া যায়। আগে যাঁহারা যবদ্বীপে যাত্রা করিতেন, তাঁহারা প্রাণের আশা ছাড়িয়া যাত্রা করিতেন; এক্ষণে আবাল বৃদ্ধ বনিতা তথায় সচ্ছন্দে যাইতে পারে। অতএব পূর্ব্বকালে সমুদ্রযাত্রা নিষেধের বরং কারণ ছিল; এক্ষণে সে কারণ আদৌ নাই।

বৃহন্নারদীয়ের রচয়িতা সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ, প্রভৃতি আচারকে "ইমান্ ধর্ম্মান্" বলিয়া উক্ত করায় ভ্রমজালে পতিত হইয়াছেন। ধর্ম্মের দশ লক্ষণের কোন লক্ষণই ঐ সমস্ত আচারে নাই। যদি সমুদ্র যাত্রা ধর্ম্ম ছিল বলা যায়, তাহা কি কারণে অধর্ম্ম হইল, কেহই বলিতে পারেন না। হিন্দু সমাজের এক্ষণে এমন শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে যে যাঁহারা সমাজপতি বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, যে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম নিত্য পদার্থ; কোন ঋষির সাধ্য নাই যে ইহার অন্যথা করে। তাঁহাদের নিকট মানবধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত দশ লক্ষণ যুক্ত সনাতন ধর্ম্মাপেক্ষা অনিত্য আচারের অধিক আদর। এমন কখনও শুনি নাই যে অমুক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, কূট লেখন প্রস্তুত করিয়া, বিধবা বা অনাথের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া সমাজ চ্যুত হইয়াছে; কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই যে অমুক সমুদ্রযাত্রা করিয়া ইংলণ্ডে বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন, তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছেন। তিনি সত্যবাদী দয়াবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন; মানবধর্ম্ম তাহাতে থাকিতে পারে; তথাপি তাঁহার অপরাধের মার্জনা নাই।

হিন্দু সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত। যে পুরুষ আধুনিক আচার না মানিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচার অবলম্বন করে, সে এক্ষণে নিত্যধর্ম্ম পালন করিয়াও বিধর্ম্মী ও অহিন্দু হয়; আর যে পুরুষে নিত্য ধর্ম্মের কোন লক্ষণই নাই, সেও অনিত্য আধুনিক আচারে আস্থা দেখাইয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য হয়। হিন্দু সমাজ ইহার প্রতিকার করুন, নতুবা মহা বিভ্রাট ঘটিবে।

শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঋগ্বেদের দেবগণ।

পঞ্চম প্রস্তাব।

সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ। ব্রহ্মণস্পতি, বিষ্ণু ও রুদ্র। বিশ্বকর্ম্মা ও প্রজাপতি।

ঋগ্বেদে যে সকল দেবীর স্তুতি আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে সরস্বতী ভিন্ন কেহই ভারতবর্ষে এক্ষণে উপাসিতা হয়েন না; অদিতি বা উষার উপাসনা এক্ষণে প্রচলিত নাই। আবার এক্ষণে যে সকল দেবীর উপাসনা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে সরস্বতী ভিন্ন কেহই ঋগ্বেদের উপাস্যা দেবী নহেন, শক্তি, কালী দুর্গা উমা জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী প্রভৃতি আধুনিক দেবীগণ ঋগ্বেদের উপাস্যা দেবী নহেন, তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না, তাঁহাদিগের উপাসনা ঋগ্বেদ রচনার অনেক পর কল্পিত হইয়াছে। প্রচীনা দেবীদিগের মধ্যে কেবল মাত্র সরস্বতীর পূজাই অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, ভারতবর্ষে যেন যুগ যুগান্তর পর্য্যন্ত বিদ্যার আদর থাকে।

ঋগ্বেদে সরস্বতী নদী দেবী ও বটেন, বাক্‌দেবী ও বটেন। সরঃ শব্দ অর্থে জল, সরস্বতী অর্থে জলবতী; ভারতবর্ষে যে সরস্বতী নামক নদী আছে তাহাই প্রথমে পবিত্র নদী বলিয়া উপসিত হইত বোধ হয় সেই নদী তীরে ঋষিগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, বোধ হয় সেই নদী তীরে ঋগ্বেদের পবিত্র মন্ত্র ও স্তুতি উচ্চারিত হইত, সুতরাং সরস্বতী নদী অচিরে সেই মন্ত্র ও স্তুতির দেবী অর্থাৎ বাগ্দেবী হইয়া গেলেন। নিম্ন স্তোত্রে সরস্বতীর উভয় প্রকৃতিই বর্ণিত হইয়াছে।

"পবিত্রা, অন্ন যুক্তযজ্ঞ বিশিষ্টা ও যজ্ঞ ফলদায়িনী সরস্বতী আমাদিগের অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন।

"সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী, দেবী সরস্বতী আমাদিগের যজ্ঞ গ্রহণ করুন।

"সরস্বতী প্রবাহিতা হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন, এবং জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছেন।

১ মণ্ডল, ৩ সূক্ত, ১০, ১১, ১২ ঋক্‌।

৭ মণ্ডলের ৯৬ সূক্তে সরস্বতীকে সরস্বৎ নামক এক দেবের পত্নী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ঋষি স্পষ্টই "সরস্বতী" স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গ করিয়া একটি দেব কল্পনা করিয়াছেন মাত্র, নচেৎ সরস্বৎ নামে ঋগ্বেদে পৃথক কোন দেব নাই। সরস্বতী যে নদী তাহা ঋষিগণ স্পষ্টই জানিতেন, তাঁহাদের সমস্ত স্তুতিতেই সেই সরস্বতী নদী রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাণে ইলা মনুর কন্যা, ঋগ্বেদে ইলা একজন উপাস্যা দেবী, কিন্তু মনুর কন্যা নহেন। ঋগ্বেদে ইলার আদি অর্থ কি ঠিক করা দুষ্কর। সায়ণ অনেক স্থানে ইলা অর্থে পৃথিবী বা ভূমি, এবং অনেক স্থানে ইলা অর্থে পৃথিবীস্থ বাক্ করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত বর্ণূফ (Burnouf) ইলার এই দুই অর্থ করিয়া গিয়াছেন বাক্য ও ভূমি। ১ মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ১১ ঋকে আছে যে দেবগণ ইলাকে মনুর ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী করিয়াছেন।

বর্ণূফ বলেন মনু অর্থে মনুষ্য, ইলা অর্থে বাক্য, দেবগণ বাক্য দ্বারাই মনুষ্যের জ্ঞানের সঞ্চার করিয়াছেন।

ইলার সঙ্গে ঋগ্বেদের অনেক স্থলে মহী বা ভারতী এবং সরস্বতীকে আহ্বান করা হইয়াছে। সায়ণ ইলা অর্থে পৃথিবীস্থ বাক করিয়া সরস্বতী অর্থে অন্তরীক্ষস্থ বাক্ এবং মহী বা ভারতী অর্থে স্বর্গস্থ বাক্ করিয়া গিয়াছেন। আবার ভারতী অর্থে ভরত নামক আদিত্যের পত্নী বলিয়া কোন কোন স্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ১।২২।১০ ঋকের টীকা দেখ। ঐ ঋকে হোত্রা ও বরুত্রী ধিষণারও উল্লেখ আছে; সায়ণ হোত্রা অর্থে অগ্নি পত্নী এবং ধিষণা অর্থে বাগ্দেবী করিয়া গিয়াছেন।

Muir বিবেচনা করেন যে ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুত্রী, ধিষণা এ সকল গুলিই যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অংশ বাচক শব্দ, ক্রমে দেবী বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

পৃথিবী দ্যুর পত্নী এবং দেব গণের মাতা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রুদ্রের পত্নী রোদসীর বিষয়ও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী, বরুণের স্ত্রী বরুণানী, অগ্নির স্ত্রী অগ্নায়ী এই সকল দেবের স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে মাত্র, কোন ও পৃথক স্তুতি নাই। পুংলিঙ্গ দেব বাচক শব্দ গুলিকে স্ত্রীলিঙ্গ করিয়া ঋষিগণ দেবীর কল্পনা করিয়াছেন মাত্র—, পুরাণে সে

কল্পনা সম্পূর্ণতা লাভ করিল। পুরাণের ইন্দ্রাণী কেবল নাম মাত্র নহেন, রূপ লাবণ্য বিশিষ্টা নানা গুণোপেতা স্বর্গের মহিষী, এবং অনন্ত পৌরাণিক উপাখ্যানের আধার ভূতা।

ঋগ্বেদের দেব দেবীর কথা প্রায় সাঙ্গ হইল, কেবল তিন জনের কথা বলিতে বাকি আছে; পুরাণে যাঁহারা সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ও ধ্বংস কর্ত্তা, ঋগ্বেদে তাঁহাদের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

ঋগ্বেদে ব্রহ্মা বলিয়া দেবতা নাই; ব্রহ্ম অর্থে প্রার্থনা, ঋগ্বেদে ব্রহ্মা অর্থে প্রার্থনা কারী এক জন পুরোহিত বিশেষ। ব্রহ্মণস্পতি অথবা বৃহস্পতি নামে ঋগ্বেদে এক জন দেব আছেন, তিনি প্রার্থনার পতি। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে তিনি অগ্নির রূপান্তর মাত্র।

"ব্রহ্মণস্পতি নিঃসন্দেহই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই মন্ত্রে ইন্দ্র বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা দেবগণ অবস্থিতি করেন।

"হে দেবগণ! সে মন্ত্র সুখের উৎপত্তি হেতু এবং হিংসা দোষ রহিত আমরা যজ্ঞে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করি। হে নেতৃগণ! যদি তোমরা মন্ত্র কামনা কর, তাহা হইলে কমনীয় মন্ত্র সকল তোমাদিগের নিকট উপনীত হইবে।

'যিনি দেবগণ কে কামনা করেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন কে আইসে? যিনি যজ্ঞের জন্য কুশ ছিন্ন করেন তাঁহার নিকট ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন কে আইসে? হব্যদাতা যজমান ঋত্বিক্‌দিগের সহিত যজ্ঞ স্থানে গমন করিয়াছেন, বহু ধনোপেত গৃহে গমন করিয়াছেন"।

১ মণ্ডল, ৪০ সূক্ত, ৫।৬।৭ ঋক্‌

এই ঋক্‌ গুলিতে এবং এই রূপ ঋগ্বেদের অন্যান্য অনেক ঋক গুলিতে স্পষ্টই দেখা যায়, যে ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রার্থনার পতি। এই ব্রহ্মণস্পতি-কেই ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে "ব্রহ্মা" বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে;—৪। ৫০ সূক্তের ৮ ও ৯ ঋক্‌ দেখ।

ঋগ্বেদে বিষ্ণুর ও নাম পাওয়া যায়, এবং তিনি তিন পদবিক্ষেপ দ্বারা জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন,—এ কথা ও পাওয়া যায়।

"বিষ্ণু সপ্ত ধামের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

"বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল।

"বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না, তিনি ধর্ম্ম, সমুদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।

"বিষ্ণুর যে কর্ম্মবলে যজমান ব্রত সমুদয় অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম্ম সকল অবলোকন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।

"আকাশে সর্ব্বতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরম পদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করে।

"স্তুতিবাদক ও সদা জাগরুক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রদীপ্ত করেন।"

১ মণ্ডল, ২২ সূক্ত, ১৬ হইতে ২১ ঋক্।

বিষ্ণু তিন প্রকার পদ বিক্রম করিয়াছিলেন তাহার অর্থ কি? ঋগ্বেদের বিষ্ণু কে?

শাকপূণিঃ ও ঔর্ণবাভ নামক ঋগ্বেদের দুই জন পুরাতন ব্যাখ্যাকার ছিলেন, তাঁহাদিগের মত যাস্ক নিরুক্তে উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুর্গাচার্য্য কৃত নিরুক্ত ব্যাখ্যা হইতে প্রতীয়মান হয়, যে বিষ্ণু আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য। শাকপূণির মতে সেই বিষ্ণু পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং স্বর্গে সূর্য্যরূপে বর্ত্তমান আছেন,—এই তাঁহার তিন পদবিক্ষেপ। ঔর্ণবাভের মতে সেই সূর্য্যরূপ বিষ্ণু সমারোহণের সময় উদয় গিরিতে, দ্বিপ্রহরের সময় মধ্য আকাশে এবং অস্ত যাইবার সময় অস্ত গিরিতে পদ বিক্ষেপ করেন, এই তাঁহার তিন পদবিক্ষেপ।

এই সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর জগতে পদবিক্ষেপ স্বরূপ একটি বৈদিক উপমা হইতে ক্রমে নানা উপাখ্যান রচিত হইতে লাগিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে দেব ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগৎ বিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন, বিষ্ণু যতটুকু তিন পদে বিক্রম করিতে পারেন, ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অসুরদিগের। অসুরগণ সম্মত হইল, এবং বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ ও বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরগণ বলিতেছে বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের, দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন। আবার ঐ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সকল দেবের মধ্যে প্রাধান্য লাভের এবং তৎপর তাঁহার মস্তক ছিন্ন হওয়ার কথা আছে, এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও এই কথা পাওয়া যায়। তাহার পর বিষ্ণুর বামন অবতার ও বলি রাজার দমন সম্বন্ধে

পৌরাণিক উপাখ্যান আমরা সকলেই জানি। সূর্য্যের আকাশ ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি বৈদিক উপমা হইতে কত উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে!

ঋগ্বেদে রুদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তিনিও পৌরাণিক রুদ্র নহেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋগ্বেদের রুদ্র মরুৎগণের অর্থাৎ ঝড়ের পিতা, অথচ রুদ্র অগ্নির রূপ বিশেষ তাহাও বেদে দেখিতে পাওয়া যায় *। আর রুদ ধাতু অর্থে ক্রন্দন করা বা শব্দ করা, রুদ্র ঝড়ের পিতা, শব্দকারী, অগ্নিরূপী দেব। এখন আমরা রুদ্রের বৈদিক অর্থ বুঝিলাম, রুদ্রের আদি অর্থ বজ্র!

এক্ষণে একটি বিষম প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। ঋগ্বেদে ব্রহ্ম অর্থে প্রার্থনা, ব্রহ্মা অর্থে একজন পুরোহিত, ব্রহ্মণস্পতি অর্থে প্রার্থনার দেব, অগ্নির রূপ বিশেষ, তাঁহাকেও কখন কখন ব্রহ্মা নাম দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণু অর্থে সূর্য্য তিনি একজন সামান্য দেব, ইন্দ্রের সখা বলিলে তাঁহার স্তুতি করা হইল। রুদ্র অর্থে ঝড়ের উৎপাদক অগ্নিরূপী বজ্র। প্রার্থনা দেব বাচক ও সূর্য্য বাচক ও বজ্র বাচক তিনটি শব্দ লইয়া পুরাণের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারীর মহৎ অনুভব কি রূপে উদয় হইল? পুরাণের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মহৎ অনুভব অর্থাৎ এক জগদীশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস কার্য্যের অনুভব কোথা হইতে উঠিল?

বিশেষ অনুশীলন করিয়া দেখিলে এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। আমরা পূর্ব্বে বার বার বলিয়াছি যে বেদ রচনার সময় সরল চিত্ত উপাসকগণ প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর বা বিস্ময় কর বা ভয়ঙ্কর দেখিতেন তাহাই উপাসনা করিতেন। আকাশের অনন্ত বিস্তৃতি কে বরুণ বলিয়া, বৃষ্টিকারী আকাশকে ইন্দ্র বলিয়া, কমনীয় উষা বা জলন্ত সূর্য্য, দীপ্তিমান্ অগ্নি বা কমনীয় বায়ুকে ভক্তিভাবে স্তুতি করিতেন। প্রকৃতির যাহা কিছু দেখিয়া সেই সরল চিত্ত পূর্ব্ব পুরুষ গণের হৃদয় আলোড়িত হইত, প্রকৃতির যে সকল কার্য্য দ্বারা তাঁহারা কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ও পশ্বাদি পালন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, ভক্তি ভাবে নত হৃদয়ে সেই সকল সৌন্দর্য্য, সেই সকল কার্য্যের স্তুতি করিতেন।

কিন্তু কাল ক্রমে তাঁহাদিগের আলোচনা শক্তির বৃদ্ধি হইল, জ্ঞানের উন্নতি হইল। তখন তাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিলেন প্রকৃতির সমস্ত

* "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে"। যাস্ক। "রুদ্রায় রুদ্রায় অগ্নয়ে"। সায়ণ।

সৌন্দর্য্য ও অন্যান্য কার্য্য একই নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত! সূর্য্য আমাদিগকে পালন করিতেছেন, বায়ু আমাদিগকে পালন করিতেছেন, অগ্নি ও জল আমাদিগকে পালন করিতেছেন, কিন্তু সূর্য্য ও বায়ু, অগ্নি ও নদী একই নিয়ম শ্রেণী দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত, অতএব সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি ও জলের একজন পরিচালক, একজন নিয়ন্তা আছেন। ঋগ্বেদের ঋষিগণ তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বা প্রজাপতি বলিয়া ডাকিলেন; উপনিষদের প্রণেতা গণ তাঁহাকে আত্মন্ বা ব্রহ্মণ্ বলিয়া ডাকিলেন।

তাহার পর পৌরাণিক কালে সেই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে তিনটি নাম দেওয়া হইল। কি নাম দেওয়া হইবে? বেদে সৃষ্টি কর্তার ঠিক নাম পাইলেন না। "আরাধ্য" দেবের নাম নাই, অথবা তাঁহার নাম "আরাধনার দেব" বা "ব্রহ্মা"। পালন কার্য্য দ্বারা যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন তাঁহার কি নাম দিবেন? ঋগ্বেদের বিষ্ণু সমস্ত জগৎ পরিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার পদধূলিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত আছে, অতএব পালন কারী জগদীশ্বরের নাম "বিষ্ণু"। আর বজ্ররূপীসংহারকর্ত্তা ঋগ্বেদের "রুদ্রের" নামটিই পরমেশ্বরের সংহার কার্য্যের উপযুক্ত নাম হইল। এইরূপে পুরাণের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের অনুভব উদয় হইল। ঋগ্বেদের সময়, এবং ঋগ্বেদের বহুকাল পরে টীকাকার শাকপূণি, ঔর্ণবাভ ও যাস্কের সময় ঈশ্বরবাচী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নাম ভারতবর্ষে বিদিত ছিল না। বলা বাহুল্য যে শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র, গণপতি ও কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি পুরাণের অসংখ্য দেব ঋগ্বেদের অপরিচিত।

আমরা লিখিয়াছি যে ঋগ্বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির অনন্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অবশেষে সেই কার্য্যের একজন নিয়ন্তাকে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ হইতে সে বিষয়ে দুই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব।

"কোন্ স্থানে, কি অবলম্বনে, কোথা হইতে বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবী সৃজনকালে নিজ ক্ষমতায় স্বর্গ বিকাশিত করিলেন?

"যাঁহার চক্ষু সকল স্থানে, যাঁহার মুখ সকল স্থানে, যাঁহার বাহু সকল স্থানে, যাঁহার পদ সকল স্থানে, সেই এক দেব স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাঁহার বাহু ও পদ দ্বারা পরিচালিত করেন।"

১০ মণ্ডল, ৮১ ঋক্ ২, ৩ ঋক্।

"স্বর্গ হইতে ও বহির্ভূত, পৃথিবী হইতেও বহির্ভূত, দেব ও অসুর হইতেও বহির্ভূত কি এক গর্ভ জল সমূহ ধারণ করিয়াছিল, যাহাতে সকল দেবগণকে দেখা গিযাছিল?

"সমস্ত দেবগণ যে গর্ভে দৃষ্ট হইয়াছিলেন, জল সমূহ সে গর্ভ ধারণ করিয়াছিল। যাহাতে বিশ্বভুবন স্থাপিত ছিল, তাহা সেই জন্মশূন্যের নাভি-দেশে অর্পিত ছিল।

"যিনি এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে কখনও জানিতে পারিবে না, তোমাদের মধ্যে ও তাঁহার মধ্যে অন্তর আছে। স্তোত্র রচয়িতাগণ নীহারে আবৃত হইয়া বৃথা কথা জল্পন করিয়া এই জীবনেই তুষ্ট হইয়া বিচরণ করিতেছে।" ১০ মণ্ডল, ৮২ সূক্ত, ৫, ৬, ৭ ঋক্।

"হিরণ্য গর্ভ জন্মগ্রহণ করিয়া একাকী ভূতমাত্রের অধিপতি হইলেন, তিনি পৃথিবী ও স্বর্গ ধারণ করিলেন। আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব?

"যিনি আত্মা দিয়াছেন, যিনি বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সকল দেবগণ পালন করেন, যাঁহার ছায়া অমরত্ব, যাঁহার ছায়া মৃত্যু। আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব?

"যিনি মহত্ব দ্বারা জাগ্রত ও সুপ্ত জগতের রাজা হইয়াছেন, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদের অধিপতি। আমরা কোন দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব?

"যাঁহার মহত্ব দ্বারা এই হিমবান্ পর্ব্বত রহিয়াছে, নদীর সহিত সমুদ্র আছে, এই প্রদেশ সকল যাঁহার বাহু, আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব?

"যাঁহার প্রভাবে স্বর্গ উগ্র এবং পৃথিবী স্থির, যাঁহার দ্বারা আকাশ যাঁহার দ্বারা স্বর্গ স্তম্ভিত হইয়াছে, যিনি অন্তরীক্ষে জগৎ পরিমাণ করিয়াছেন, আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব?

'হে প্রজাপতি! তুমি ভিন্ন কেহ বিশ্ব ভূতজাতকে চারিদিকে বেষ্টন করে না। আমরা যে কামনায় যজ্ঞ করিতেছি তাহা যেন সিদ্ধ হয়, আমরা যেন অর্থলাভ করি।" ১০ মণ্ডল, ১২১ সূক্ত, ১ হইতে ৫ এবং ১০ ঋক্।

এক্ষণে আমরা ঋগ্বেদের ধর্ম্মকে কি ধর্ম্ম বলিব? কূটতর্কে প্রবেশ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই, কোন বিশেষ মতামত সমর্থন করিবার আমাদিগের রুচি নাই, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আমাদিগের আবশ্যক নাই।

যেটি স্পষ্টই দেখিতেছি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহাই বলিব। ঋগ্বেদের ধর্ম্ম প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও কার্য্য সম্বন্ধীয় কল্পিত দেবগণের স্তুতিতে আরম্ভ হইয়াছে, প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যের এক নিয়ন্তা, ঈশ্বরের আরাধনায় শেষ হইয়াছে। From Nature up to Nature's God.

আর একটি কথা মাত্র আমাদিগের বলিবার আছে। ঋগ্বেদে যাহা পাইলাম অন্য কোনও জাতির কোনও গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না। অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কেবল প্রকৃতির কার্য্য কলাপ সম্বন্ধীয় কল্পিত দেবগণের স্তুতি আছে, অথবা সেই কার্য্যের এক নিয়ন্তার স্তুতি আছে। কার্য্য কলাপের অনুশীলন হইতে কিরূপে মনুষ্য চিন্তা সেই কার্য্যের এক নিয়ন্তা পর্য্যন্ত আরোহণ করে, প্রকৃতির আলোচনা হইতে মনুষ্য ক্রমে, বহুকালে, বহু-পরিশ্রমে, কিরূপে প্রকৃতির ঈশ্বরকে চিনিতে পারে, তাহা জগতের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে কেবল ঋগ্বেদ সংহিতায় দৃষ্ট হয়।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ব্রিটিশ ও বঙ্গীয় চিত্রাবলী।

৩। ল্যান্সেলট (Lancelot) ও প্রতাপ।

যাঁহারা আমাদিগের আলোচ্য গ্রন্থ দুইখানি একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে ল্যান্সেলট্ ও প্রতাপ গ্রন্থদ্বয়ের সর্ব্বপ্রধান নায়ক না হইলেও, দুইটি প্রধান নায়ক বটে। "Idylls of the King" এ ল্যান্সেলট্ শ্রেষ্ঠত্বে মাত্র আর্থরেরই দ্বিতীয়, আর আমাদিগের "চন্দ্রশেখরে" প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর, এ দুয়ের মধ্যে কাহাকে উচ্চস্থান দিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতের একতা নাই; ফলত গ্রন্থখানির নাম "চন্দ্রশেখর" না হইলে, অনেকেরই চিত্তে এ সম্বন্ধে সংশয়

থাকিত। এই দ্বিতীয় চরিত্র দুইটি প্রধান চরিত্রদ্বয়ের অনুজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থদ্বয়ের সম্যক শোভা সম্পাদন করিয়াছে। আমরা এইবারে এই চরিত্র দুইটি যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রস্তাবটি উপসংহার করিব।

আর্থরের সহিত ল্যান্‌সেলটের যেরূপ সম্বন্ধ, চন্দ্রশেখরের সহিত প্রতাপেরও প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। ল্যান্‌সেলট আর্থর সৃষ্ট 'বীর সম্প্রদায়' মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর—আর্থরের সমধিক স্নেহের পাত্র। আর্থরের নিকট ল্যান্‌সেলট তাঁহার মহতী কল্পনা সৃষ্ট আদর্শ পুরুষ চরিত্র—জীবন ব্যাপারে তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। প্রতাপের সহিত চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধও প্রায় এইরূপ। চন্দ্রশেখর প্রতাপের জীবন রক্ষক—একদিন তিনি প্রতাপকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। প্রতাপের সম্পদ সমস্তই চন্দ্রশেখরের প্রসাদাৎ। প্রতাপ নিজমুখে একদিন বলিয়াছেন, 'তাঁহার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে।' ল্যান্‌সেলট্ ও প্রতাপ উভয়েই তাঁহাদিগের প্রভু ও উপকারকের নিকট কৃতজ্ঞ-চিত্ত। এ কথাটি অনেকের নিকট বিসদৃশ বোধ হইবে। যে ল্যান্‌সেলট্ আর্থরের সুখের পথে কণ্টকস্বরূপ, তাঁহার প্রিয়তমা বনিতার প্রিয়তম উপপতি, তাহাকে কৃতজ্ঞ-চিত্ত বলা যায় কিরূপে? কথাটি গুরুতর সন্দেহ নাই। আমরা সম্প্রতি পাঠকবর্গকে এই কথাটি কিছুকালের জন্য ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করি। আমরা অন্য সময়ে সে কথাটি পাড়িব। যদি মাত্র এই কথাটি ভুলিয়া যাওয়া যায়, তবে ল্যান্‌সেলট সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তৎসম্বন্ধে কাহারও বোধ হয় আপত্তি থাকিতে পারে না। আর্থর একদিন কাহাকে গোপনে বীর সম্প্রদায় ভুক্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন।

'Make thee my knight in secrect? yea, but he,
Our noblest brother, and our truest man,
And one with me in all, he needs must know."

এরূপ ল্যান্‌সেলটের গুণযুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ আর্থরের মুখে প্রায়ই শুনা যায়। আমরা যদৃচ্ছাক্রমে উপরের কথাটি তুলিয়া দিয়াছি। গ্রন্থের অনেক স্থলে ল্যান্‌সেলটের এরূপ প্রশংসা রহিয়াছে। যদি ল্যান্‌সেলট্ প্রকৃত পক্ষেই নির্গুণ বা সম্যক্ অকৃতজ্ঞ হইবে, তাহা হইলে এরূপ কথা আমরা গ্রন্থের সর্ব্বত্র, বিশেষত পুরুষপ্রধান আর্থরের নিকট শুনিতে পাইতাম না। এইপ্রশংসা কেবল আর্থরের গুণজ্ঞাপক নহে—ল্যান্‌সেলটেরও গুণশীল-

তার পরিচয়।) ইহাতেই আমরা দেখিতে পাই, ল্যান্সেলট সর্ব্বত্র আর্থরের নিকট প্রিয়কার্য্য করিয়া প্রিয়তম হইয়া উঠিয়াছিলেন। ল্যান্‌সেলট অকৃতজ্ঞ হইলে এরূপ হইতে পারিত না। এতদ্ভিন্ন ল্যান্সেলটের স্বমুখেও আমরা আর্থরের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক অনেক কথা শুনিয়াছি। ল্যান্সেলট কেবল একটি অপরাধে—একটি অতি গুরুতর অপরাধে, আর্থরের নিকট অপরাধী; নতুবা সর্ব্বদাই তাঁহাকে আর্থরের নিকট কৃতজ্ঞ দেখিতে পাওয়া যায়। বিপক্ষভাবে দাঁড়াইয়াও ল্যান্সেলট্ আর্থরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই। আর্থর তাঁহার নিকট পূজনীয় দেবতাস্বরূপ।

চন্দ্রশেখরের নিকট প্রতাপ কিরূপ কৃতজ্ঞ, তাহা দুই এক কথায় বলিতে পারা যায় না। তবে, সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে, যে, আমরা প্রতাপকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই প্রায় তাঁহাকে চন্দ্রশেখরের হিতকামনায় কার্য্য তৎপর দেখিয়াছি। তাঁহার কার্য্য সমস্তই প্রায় চন্দ্রশেখরের জন্য। প্রতাপ রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন চন্দ্রশেখরের জন্য; লরেন্স ফষ্টরকে শাস্তি প্রদান করিয়া শৈবলিনীকে উদ্ধার করিয়াছেন, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য, ইংরেজ কর্তৃক বন্দী হইলেন, চন্দ্রশেখরের জন্য; সমর ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন চন্দ্রশেখরের জন্য;—আর একটি কথা যদি তোমরা বলিতে দেও, তাহা হইলে বলি,—প্রতাপ জীবনত্যাগ অপেক্ষাও যে দুর্দ্দমনীয় শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ তাহাও করিয়া ছিলেন, অনেকটা চন্দ্রশেখরের জন্য। এ কথা টিতে বোধ হয় প্রতাপের মহত্ব বিন্দু মাত্রও স্খলিত হয় না; চন্দ্রশেখরের জন্য শৈবলিনীর অকাঙ্ক্ষা ত্যাগে তাঁহার যথেষ্ট মহত্ব ও যথেষ্ট ইন্দ্রিয় বিজয়ের পরিচয় রহিয়াছে। কঠোর নীতিতত্ত্বজ্ঞগণ এ কথা শুনিয়া আমাকে কি বলিবেন জানি না। কিন্তু আমাদিগের নিকট এই কথাটিতেই যেন প্রতাপ চরিত্রের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, ইহার জন্যই প্রতাপ-চরিত্র আমাদিগের মনোরঞ্জন করিতে এত সমর্থ হইয়াছে। যাহা হউক, এ কথা বলিবার অন্য সময় রহিয়াছে এখন আমরা প্রতাপের সহিত চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধ ও ল্যান্সেলটের সহিত আর্থরের সম্বন্ধের সাদৃশ্য দেখাইয়া ক্ষান্ত হইলাম।

রূপের মাহাত্ম্যে কি, কিসের জন্য জানি না, আর্থর ও চন্দ্রশেখর যেরূপ গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীকে ভালবাসিতেন, ল্যান্সেলট্ ও প্রতাপও ঠিক সেই রূপই তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন। আর্থর ও ল্যান্সেলটের প্রণয়

তুলনা করিয়া তবু একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, কিন্তু চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের ভালবাসা সম্বন্ধে এরূপ কিছুই সম্ভব নহে। ল্যান্‌সেলটের আসক্তি পাপে পরিণত হওয়ায় দুই এক স্থলে তাহার দূষণীয় ভাব দেখিতে পাই, এবং বলিতে পারি যে, ল্যান্‌সেলট অপেক্ষা আর্থরের ভাল-বাসা পবিত্রতর সুতরাং সমধিক প্রগাঢ়; কিন্তু কাহার সাধ্য বলিতে পারে যে, প্রতাপ শৈবলিনীকে অধিকতর ভালবাসিতেন, না, চন্দ্রশেখর অধিকতর ভালবাসিতেন? উভয়ের প্রণয়ই, প্রশান্ত, প্রগাঢ়, "সমুদ্র তুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্ত ভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্য ময়—চাঞ্চল্যে কুলপ্লাবী; তরঙ্গ-রঙ্গ-ভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর"। উভয়ের প্রণয়েই ইন্দ্রিয় চাপল্য নাই—যদিও তাহার কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই জলনিমজ্জন কাল হইতে মৃত্যু দিবস, অথবা মৃত্যু-ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতাপের প্রণয় রাশি হৃদয় মধ্যে যে কি ভাবে অবস্থিতি করিতে-ছিল, তাহা কবি ভিন্ন অন্যে বাক্য দ্বারা বুঝাইতে পারে না। আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু বুঝাইতে পারি না। আমাদিগের কবিবর এক স্থলে প্রতাপ দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন। প্রতাপের তদানীন্তন অবস্থা, প্রতা-পের তাৎকালিক ভাব, আর তাঁহার সেই ভাষার আবেশ—একত্রিত হইয়াও, হৃদয় মধ্যে কেবল সেই প্রেম ছবির রেখা পাত করিয়া দেয়, কিন্তু হৃদয় সেই চিত্রের সমস্ত রঙ্‌ ফলাইয়া লইতে অসমর্থ। সে চিত্র সম্পূর্ণ করিতে অন্য কাহারও অধিকার নাই। কেবল পাঠকগণের স্মৃতিপথে প্রতাপের ভাষাই আসে। 'কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভাল বাসিয়াছি। পাপ চিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম,—জীবন-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।" এই ভাষার আর ভাষান্তর হয় না।

প্রতাপ জিতেন্দ্রিয়। মৃত্যু কালে রমানন্দস্বামী তাঁহাকে যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। সেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর দেশব্যাপিনী চন্দ্রকর-বিধৌত-সলিলরাশির উপরে পুণ্যমনা, প্রশস্ত হৃদয়, পবিত্র প্রেমপূর্ণ প্রতাপের সেই কথা মনে পড়িলে, কাহার না বিস্ময় জন্মে? সে কি সাধারণ ত্যাগ? যখন শৈবলিনী বলিল "এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?" তখন সত্যই প্রতাপ

বলিয়াছিলেন "আমি"। যিনি মানবচরিত্র অবগত নহেন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ইতর লোকের ন্যায় এইরূপ শপথে লাভ কি ছিল? আমরা এ কথায় উত্তর আপনারা কিছুই না দিয়া, একবার স্থির-চিত্তে পাঠকবর্গকে ভাবিতে বলিব; তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে কি সুন্দর চিত্র—কি আশ্চর্য্য কাব্য কৌশল। একেবারে স্বর্গের ছবি দেখিতে চাও, অন্যত্র গমন কর, নবেলে তাহা থাকিবে না। যাহা সম্পূর্ণ অমানুষিক, তাহা নবেলে, ভাল নবেলে পাইবে না। তাই আমরা চন্দ্র-শেখরকে শৈবলিনীর জন্য পাগলের মত দেখিতে পাই, তাই আমরা ভাগি-রথীবক্ষে প্রতাপ—শৈবলিনীর এইরূপ শপথের কথা শুনিতে পাই। চন্দ্র-শেখর ও প্রতাপ আদর্শ মনুষ্য।

ল্যান্‌সেলট্‌ও গুইনিবিয়ারকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কিন্তু ল্যান্‌-সেলট্‌ ইন্দ্রিয় জয়ী না হইয়া ইন্দ্রিয়-জিত। এইখানে আমরা আবার চরিত্র পার্থক্যে চরিত্রস্রষ্টৃগণের আধ্যাত্মিক ভাবের পার্থক্য দেখিতে পাই। ইহার একটি গুহ্য কারণ আমরা একস্থানে প্রকাশিত দেখিতে পাইয়াছি। গুইনিবিয়ার একস্থলে ল্যান্‌সেলট্‌কে বলিতেছে—

"Mine be the shame, for I was wife, and thou unwedded:—

এ কথাটির প্রতিধ্বনি যেন টেনিসনের হৃদয়ে শুনা যায়। এই জন্যই বোধ হয়, টেনিসন ল্যান্‌সেলটকে চিরকুমার রাখিয়াছিলেন। কিন্তু একটি কথা ন্যায়ানুরোধে বলা আবশ্যক। টেনিসনের মনে যাহাই থাকুক, তাঁহার ল্যান্‌সেলটে আমরা এ পাপের গুরুত্ব বোধ দেখিতে পাই। শৈবলিনীর ন্যায় ল্যান্‌সেলট্‌ও একদিন ইহার জন্য অনুতাপ করিবেন।

ল্যান্‌সেলেটের প্রণয় পঙ্কিল, সুতরাং তন্মধ্যে দুই এক স্থলে পবিত্র প্রণয়ের শত্রু—সন্দেহ আদি কতকগুলি জিনিস—দেখিতে পাওয়া যায়। ল্যান্‌সেলট্‌ একদিন গুইনিবিয়ারকে অন্যরকম দেখিয়া বলিতেছেন,

"Are ye so wise? ye were not once so wise,
My Queen, that summer, when ye loved me first.
• • • • •
How then is there none?
Has Arthur spoken aught? or would yourself,
Now weary of my service and devoir,
Henceforth be truer to your faultless lord?"

গুইনিবিয়ারকেও আমরা সময়ে সময়ে এইরূপ সন্দিগ্ধমনা (Jealous) দেখিয়াছি। ইহার কারণ পরিষ্কার—তাহাদিগের প্রণয় পবিত্র নহে।

প্রসঙ্গ ক্রমে আর একটি কথা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতাপ ও ল্যান্‌সেলটের প্রণয়ের সাদৃশ্য দেখাইতে গিয়া, সে কথাটি ভুলিয়া যাওয়া যায় না। সেটি প্রতাপের বিবাহ ও ল্যান্‌সেলটের চিরকৌমার্য্যব্রত। ইলেইন (Elaine) ল্যানসেলটকে কিরূপ ভাল বাসিয়াছিল, তাহা "Idylls of the King"এর পাঠকবর্গের নিকট অবিদিত নাই। কিন্তু ল্যান্‌সেলট্ তাহাকে ভাল বাসিতে পারেন নাই। ল্যানসেলট বাস্তবিকই চিরদিনই গুইনিবিয়ারের নিকট "Love loyal। কিন্তু প্রতাপের বিবাহের তবে তাৎপর্য্য কি? এ প্রশ্নটি বোধ হয়, অত্যন্ত কঠিন—সকলে ইহার একরূপ উত্তর দিবেন, এরূপ ভরসা নাই। আমাদিগের মতে ৩টি উদ্দেশ্যে কবি প্রতাপের এই বিবাহটি ঘটাইয়াছেন। (১) প্রতাপের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহাতে তিনি বিবাহ না করিলে এত সহজে—আর সহজেই বা কি করিয়া বলি?—শৈবলিনী উপভোগের আকাঙ্ক্ষা দমন বা ত্যাগ করিতে পারিতেন না। এ কথাটি ইহাতেই সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। (২) প্রতাপ সর্ব্বদাই চন্দ্রশেখরের আজ্ঞাবহ। 'চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়ঃস্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন।' ইহাতে যেন গ্রন্থকারের আভাস রহিয়াছে যে, প্রতাপ চন্দ্রশেখরের ইচ্ছাক্রমেই বিবাহ করিয়াছিলেন। (৩) প্রতাপ ভাবিয়াছিলেন, বিবাহ করিলে হয়ত শৈবলিনীকে ভুলিতে পারিবেন, এবং ভুলাই তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। আরও মনে করিয়াছিলেন যে এতদ্দ্বারা শৈবলিনীর মনে প্রতাপ পাইবার আশা একেবারে উৎপাটিত হইবে, কিম্বা তৎপ্রতি তাঁহার আসক্তি কমিয়াছে ভাবিয়া শৈবলিনীর প্রতাপাসক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইবে। চন্দ্রশেখরের হিতের জন্য, যাহাতে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা তাঁহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সব চিন্তা একত্রিত হইয়া বোধ হয়, প্রতাপকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দেয়।

কিন্তু কারণ যাহাই থাকুক, তাহা প্রতাপের পক্ষে; রূপসীর পক্ষে ত এ সব কিছুই ছিল না। তবে প্রতাপ রূপসীকে কিরূপে অক্ষুব্ধচিত্তে বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? সাম্যবাদী কঠোর নীতিতত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। ইহার উত্তরে আবার

বলেকই বলিতে পারেন, তাহাতে দোষ কি? প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসিত বলিয়া যে রূপসীকে ভালবাসিত না, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিলে? প্রতাপ সাহেবের চিত্র নহে, বাঙ্গালীর চিত্র। প্রতাপের জন্ম সেই দেশে, যেখানে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই এজন্য হইতে, যেখানে কুন্দ ও সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ও রোহিণী, নন্দা ও রমা একই ব্যক্তির প্রণয়পাত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন কারীকে অন্য কোন উত্তর না দিয়া একটি গল্প বলিব। গল্পটির সারাংশ কোন ইংরাজী পুস্তক হইতে গৃহীত। কোনও এক ব্যক্তি পরোপকারের জন্য আত্মহত্যা করিয়াছেন। একদিকে আত্মহত্যা মহাপাপ, অন্যদিকে পরোপকার মহাব্রত এই দুইটির কোনটি সমধিক প্রবল হইবে জানিতে না পারিয়া, ধর্ম্মরাজ পাপের খাতায় তাঁহার এই কার্য্যটি উঠাইলেন। কিন্তু যাই তাহা লেখা হইল, অমনি এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িয়া সমস্তই মুছিয়া গেল। বোধ হয় এ গল্পটি শুনিয়া প্রশ্নকারীগণ নিরুত্তর থাকিতে পারেন। যদি বাস্তবিকই প্রতাপ বিবাহ করিয়া কোন দূষণীয় কাজ করিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণগুলি ভাবিয়া দেখিলে, সে দোষের ভাগ মুছিয়া যায় না কি?

পাপ করিলে তজ্জন্য অনুতাপ ও সৎকার্য্যের চরমফলে আত্মপ্রসাদ ভোগ করা প্রকৃতির একটি অপরিহার্য্য নিয়ম। গ্রন্থকারদ্বয় অতি সুন্দররূপেই আমাদিগকে ইহা দেখাইতে পারিয়াছেন।

একদিন নদীতটে বসিয়া ইলেইনের মৃত-দেহ-বাহিনী ক্ষুদ্র তরণীখানি দেখিয়া ল্যান্সেলট আপনা আপনি কি বলিতেছেন শুন,—

— 'Ah simple heart and sweet,
Ye loved me, damsel, surely with a love
Far tenderer than my Queen's. Pray for thy soul?
Ay, that will I. Farewell too—now at last—
Farewell, fair lily.

* * * * * *

For what am I? what profits my name
Of greatest knight? I fought for it, and have it:
Pleasure to have it, none; to lose it, pain;
Now grown a part of me: but what use in it?

To make men worse by making my sin known
Or sin seem less, the sinner seeming great?
Alas for Arthur's greatest knight, a man
Not after Arthur's heart! I needs must break
These bonds that so defame me: not without
She wills it: would I, if she will'd it? nay,
Who knows? but if I would not, then may God,
I pray him, send a sudden Angel down
To seize me by the hair and bear me far,
And fling me deep in that forgotten mire,
Among the tumbled fragments of the hills."

অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে আবার এটিও দেখিতে পাই যে, ল্যান্‌সেলট্ এখন ইলেইনের প্রণয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাদু বলিয়া অনুভব করিতেছেন। ফলতঃ তাঁহার অনুতাপের আরম্ভই এইরূপ চিন্তা হইতে। পুণ্যের সংস্পর্শে এখানে পাপবোধ ও তজ্জনিত অনুতাপ আরম্ভ হইল।

অন্যত্র ল্যান্‌সেলট্ আর্থরকে বলিতেছেন

"O King, my friend, if friend of thine I be,
Happier are those that welter in their sin,
Swine in the mud, that cannot see for slime,
Slime of the ditch: but in me lived a sin
So strange, of such a kind, that all of pure,
Noble, and knightly in me twined and clung
Round that one sin, until the wholesome flower
And poisonous grew together, each to each
Not to be pluck'd asunder;

কথাগুলি জলন্ত ভাষায় ল্যান্‌সেলটের চরিত্রটি সম্যক্ বুঝাইয়া দিতেছে। পক্ষান্তরে প্রতাপের আত্মপ্রসাদও বড় সুন্দর। তাঁহার সেই অন্তিম সময়ের উক্তিটিতে যেন এই ভাবটি প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে।

আমরা এইখানে বর্ত্তমান প্রস্তাবটির উপসংহার করিলাম। যাঁহারা ল্যান্‌সেলট্ ও প্রতাপকে প্রথমে সম্পূর্ণ বিসদৃশ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা বোধ

হয়, এক্ষণে ততটা বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন না। নবেল নাটকে এরূপ কতকগুলি চিত্র থাকে, যাহা কেবল প্রধান চিত্রগুলির বিকাশ জন্যই কল্পিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে " Idylls of the King "এ, আর্থরের ও গুইনিবিয়ারের চরিত্র স্ফুটন জন্যই ল্যান্সেলটের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং "চন্দ্রশেখরে" চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর চরিত্র বিকাশ জন্যই প্রতাপ কল্পিত হইয়াছিল। ইহাদিগকে আনুসঙ্গিক চরিত্র (Secondary characters) বলা যায়। ল্যান্সেলট যে জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন বড় বেশি কিছু করিতে পারে নাই; কিন্তু প্রতাপ প্রথমে আনুসঙ্গিক রূপে (Secondary character) কল্পিত হইলেও, বিষয়ান্তরে প্রধান চরিত্রের স্থান লাভ করিয়াছে। প্রথমে, উভয় কবিরই ধারণা (Conception) একই রূপ ছিল। কিন্তু গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনী চিত্রে জাতিগত পার্থক্য ফলিত হওয়াতে, প্রতাপ ও ল্যান্সেলটেও বিভিন্ন হাত পড়িয়াছে। ল্যান্সেলট্ ও প্রতাপের বৈসাদৃশ্য কেবলমাত্র গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীর পার্থক্য জনিত। সুতরাং এস্থানেও আমরা বলিতে পারি যে, উভয়েরই ধারণা একই প্রকার, কিন্তু স্থান ও আচার ভেদে তাহা বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন।

শাক্য সিংহ পৌষ মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনীবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহা আমরা বৌদ্ধদিগের ললিত বিস্তর ও মহাবস্তু অবদান নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে জানিতে পারি।*

লুম্বিনীবন রাজা শুদ্ধোদনের উদ্যান, (বাগান বাটী,) ইহা কপিল বস্তু নগরে প্রান্ত সীমায় অবস্থিত ছিল। রাজ্ঞী মায়াদেবী গর্ব্ভের দশম মাস

* "অথ খলু মায়াদেবী লুম্বিনীবন মনুপ্রবিশ্য" ইত্যাদি ললিতবিস্তরের ৭ম অধ্যায় দেখ এবং মহাবস্তু অবদানের দীপঙ্কর বস্তু দেখ।

আরম্ভে আপন ইচ্ছায় এই উদ্যানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই ভগবান্ শাক্য সিংহকে প্রসব করেন। ললিতবিস্তরগ্রন্থে লিখিত আছে,

"পরিপূর্ণানাং দশানাং মাসানা মত্যয়েন মাতুর্দক্ষিণ পার্শ্বা ন্নিষ্ক্রামতিস্ম। স্মৃতঃ সম্প্রজানন্ অনুপলিপ্তো গর্ভমলৈর্যথা নান্যঃ কশ্চিদুচ্যতে অন্যোন্যাং গর্ভমল ইতি।"

সেই বুদ্ধদেব পূর্ণ দশ মাসে জঠর বাস সমাপ্ত করিয়া জননীর দক্ষিণ কুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; অন্য বালকে যেমন গর্ভমলে অনুলিপ্ত হইয়া প্রসূত হয়; ইনি সেরূপ গর্ভমলায় লিপ্ত হন নাই। অন্য বালক যেমন অজ্ঞান অবস্থা লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, ইনি সেরূপ অজ্ঞানাবস্থা লইয়া প্রসূত হন নাই। জন্মকালেও ইহার স্মৃতি ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান ছিল। তাই ইনি লোক গতি স্মরণ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অলৌকিক বর্ণন আছে, সে সকল কথা এক্ষণে তৃপ্তিকর নহে। ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, অপ্সরা ও দেবীগণ আসিয়া তাঁহার ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, নাগগণ আসিয়া তাঁহার স্নান কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। জাত মাত্রেই তিনি দিব্য চক্ষুদ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান লোক চরিত্র বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। কুশল মূল জানিয়াছিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়াই তিনি পূর্ব্বদিকে সপ্তপদ, দক্ষিণ দিকে সপ্তপদ, পশ্চিমদিকে সপ্তপদ ও উত্তরদিকে সপ্তপদ পরিচালন করিয়াছিলেন * এবং আনন্দকে অনেক ধর্ম্মরহস্য লোক রহস্য ও জ্ঞানরহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। †

---

* পূর্ব্বদিকে পদসঞ্চালনের উদ্দেশ্য, আমি প্রাণীমাত্রের কুশল মূল ধর্ম্মের পূর্ব্বগামী (শ্রেষ্ঠ পথদর্শক)। দক্ষিণদিকে পদবিন্যাসের দ্বারা তিনি জানাইয়াছিলেন, আমিই দেব মনুষ্যের দক্ষিণীয় অর্থাৎ প্রিয়। পশ্চিমদিকে পদক্ষেপ করিয়া জানাইয়াছিলেন, আমিই মনুষ্যের পশ্চিম জাতির অর্থাৎ জরামরণ দুঃখের অন্তকর্তা, এবং উত্তরদিকে পদক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি জীবের জীব, সত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ, ইত্যাদি।

† লিখিত আছে, যে, যে দিন বুদ্ধদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, সেই দিনেই নাকি মধ্যগয়া প্রদেশে একটি আশ্চর্য্য অশ্বত্থবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, যথাকালে সেই অশ্বত্থবৃক্ষই "বোধিদ্রুম" নামে খ্যাত হইয়াছে।

লুম্বিনীবনে কথিত প্রকারে আশ্চর্য্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা শুদ্ধোদনের নিকট সংবাদ গেল। তৎশ্রবণে রাজা শুদ্ধোদন যারপর নাই হৃষ্ট তুষ্ট হইলেন। দানক্রিয়া সমাবদ্ধ হইল লোক সকল হৃষ্ট তুষ্ট ও প্রফুল্ল হইয়া বিবিধ আনন্দ চেষ্টায় নিমগ্ন হইল; কুমারের পরিচর্য্যার্থ ও রক্ষণাবেক্ষণার্থ শত শত দাস দাসী ও রক্ষিপুরুষ সেই লুম্বিনীবনে প্রেরিত হইল। রাজা শুদ্ধোদন এখন আনন্দ মগ্ন-চিত্তে ভাবিতেছেন,—

"কিমহংকুমারস্য নাম ধেয়ং করিষ্যামি?"

কুমারের কি নাম রাখিব?

কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার মনে হইল যে—

অস্য হি জাতমাত্রেণ মম সর্ব্বার্থ সমৃদ্ধাঃ সংসিদ্ধাঃ।
অতোঽহমস্য "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" ইতি নাম কুর্য্যাম্॥"

যে ক্ষণে আমার এই কুমার জন্মিয়াছে, আমি দেখিতেছি, সেই ক্ষণেই আমার সকল অর্থ সকল কামনা, সকল অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইয়াছে। অতএব কুমারের "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" এই নাম রাখিব।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন মহা সমারোহের সহিত কুমারের নামকরণ নির্ব্বাহ করিলেন, "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" এই নাম রাখা হইল; আজ হইতে শাক্যগণ কুমারকে "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" নামে ডাকিয়া আনন্দ করিতে লাগিল।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের সাত দিবস পরে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। ঐ সাতদিন নগরে ও বনে কোথাও অনুৎসব ছিল না। মায়া দেবীর মৃত্যু সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের মধ্যে এতরূপ তর্ক বিতর্ক আছে। যথা—

"সপ্তরাত্র জাতস্য বোধিসত্ত্বস্য মাতা মায়াদেবী
কালমকরোৎ। সা কাল গতা ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবেষূ
পপন্নাস্যাৎ। খলু পুনর্ভিক্ষয়ো যুষ্মাকমেবং
বোধি সত্ত্বাপরাধেন মায়াদেবী কাল গতেতিন খল্বেবং
দ্রষ্টব্যম্। তৎকস্মাদ্ধেতোঃ? এতৎ পরমং হিতস্যায়ুঃ
প্রমাণমভূৎ। অতীতানামপি বোধিসত্ত্বানাং সপ্ত
রাত্র জাতানাং জনয়িত্র্যঃ কালন কুর্ব্বন্। তৎকস্মা-
দ্ধেতো? বিবৃদ্ধস্য হি বোধিসত্ত্বস্য পরিপূর্ণেন্দ্রি-
য়স্যাভি নিষ্ক্রামতো মাতুহৃদয় মস্ফুটৎ।"

বোধিসত্ত্বের জন্ম দিবস হইতে সপ্তম দিবসে তাঁহার মাতা মায়াদেবী কালগতা হইয়াছিলেন। সেই কালগতা মায়াদেবী পুদ্গল দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা মনে করিতে পার যে, বোধিসত্ত্বের অপরাধে তাঁহার জননী মায়াদেবীর মৃত্যু হইয়াছিল, (প্রসবের দোষেই মৃত্যু হইয়াছিল), এরূপ মনে করিও না; কেন না মায়াদেবীর ঐরূপ আয়ুঃ প্রমাণ অবধারিত ছিল। কেবল মায়াদেবী নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধের জননীরাও প্রসবের পর সপ্তম দিবসে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গগামিনী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর উপলক্ষ এই যে, বোধিসত্ত্বগণ পূর্ণ ইন্দ্রিয় না হইয়া, পূর্ণজ্ঞান না হইয়া, ভূমিষ্ঠ হন না। তাঁহারা পূর্ণেন্দ্রিয় ও পূর্ণাবয়ব হইয়া নির্গত হন, তাই তাঁহাদের জননীদিগের হৃদয় স্ফুটিত হয়; তৎকারণে তাঁহারা কালগতা হন।

শাক্যসিংহের জন্মের পর সপ্তম দিবসে তাঁহার জননী মায়াদেবী পরলোকগামিনী হইলে, কাযেই তাঁহার আর লুম্বিনী উদ্যানে থাকা হইল না; সেই দিবসেই তাঁহাকে রাজভবনে আনয়ন করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। পঞ্চ সহস্র সজ্জিত পুরুষ পূর্ণকুম্ভ লইয়া অগ্রগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ পঞ্চ সহস্র পুংকন্যা ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন করিয়া যাইবে, তৎপরে তালবৃন্তধারিণী কন্যাগণ যাইবে, তৎসঙ্গে অন্যান্য কন্যাগণ গন্ধোদক পূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজপথ জলসিক্ত করা হইবে, পঞ্চ সহস্র বালিকা পতাকা ধারণ করিবে, পঞ্চ সহস্র কন্যা বিচিত্র রত্নধন মালায় বিভূষিতা হইয়া সঙ্গে যাইবে; পঞ্চশত ব্রাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে সঙ্গে যাইবেন; বিংশতি সহস্র হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব, অশীতি সহস্র রথ, তদ্ভিন্ন চত্বারিংশ সহস্র পদাতি সৈন্য সজ্জীভূত হইয়া কুমারের অনুগমন করিবে *। নগরবাসীরা সকলেই স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশ ও অন্তর্গৃহ সজ্জিত ও শোভিত করিতে লাগিল, তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা যে, কুমারকে তাহারা এক একদিন নিজ নিজ গৃহে রাখিবে।

অভিযান সজ্জা সমাপ্ত হইল; রাজপুরুষগণ কুমারকে লইয়া লুম্বিনী বন পরিত্যাগ করিলেন। নগরবাসীগণের অনুরোধে, প্রার্থনায়, কুমারকে

---

* ললিত বিস্তরের এই বর্ণনা সত্য হইলে কপিলবস্তু নগরকে মহানগর বলায় দোষ হইবে না এবং ইহার দ্বারা তৎকালের শ্রীসমৃদ্ধির ও সভ্যতার পরিমাণ হইবে।

এক একবার এক এক ভবনে লইয়া যাইতে ক্রমে চারি মাস অতীত হইল।

চারি মাস পরে কুমার রাজভবন প্রাপ্ত হইলেন। শাক্য বৃদ্ধগণ কুমারের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যা জননী স্থানীয়া রমণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে স্থির হইল, কুমারের মাতৃস্বসা (মাসী) মহাপ্রজাপতী; তিনিই কুমারের রক্ষণ যোগ্যা মাতৃস্বরূপা হইতে পারেন। মহা প্রজাপতী তৎবার্ত্তা শ্রবণে হৃষ্টা তুষ্টা হইলেন এবং কুমারের মাতৃস্থানীয়া হইয়া প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিলেন। রাজা শুদ্ধোদন কুমারের পরিচর্য্যার্থ ৩২জন ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। ৮আট জন অঙ্গ ধাত্রী, ৮জন ক্ষীর ধাত্রী, ৮জন মল ধাত্রী ও ৮জন ক্রীড়া ধাত্রী।* ভগবান শাক্যসিংহ রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে উক্ত রূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শাক্যগণও কুমারের ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের পার্শ্বপ্রদেশে "অসিত" নামে এক জীর্ণতম মহর্ষি বাস করিতেন। নরদত্ত নামে তাঁহার এক ভাগিনেয় ছিল। নরদত্ত বালক; এবং বেদাধ্যায়ী মানবক। ভগবান্ শাক্যসিংহ যখন কপিলবস্তু নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নরদত্ত তখন মাতুল অসিত মুনির নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে ছিলেন। ঐ সময়ে হিমালয় প্রদেশে অনেক প্রকার অদ্ভুত দৃশ্য আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের উভয়কে বিমোহিত করিল। দেবগণ আকাশপথে আনন্দে 'বুদ্ধ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক এদিক ওদিক গতায়াত করিতেছিলেন, অসিত মুনি তাহা দেখিতে পাইলেন। মুনিবর দেবগণের সেই আনন্দ ব্যাপারের কারণ জানিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানবলে তাঁহার দিব্য চক্ষু উন্মেষিত হইল, তদ্বারা তিনি জম্বুদ্বীপের সমুদায় ঘটনা জানিতে পারিলেন এবং দেবগণের আনন্দের কারণও জ্ঞাত হইলেন। ধ্যানভঙ্গের পর তিনি নরদত্তকে ডাকিলেন

* অঙ্গধাত্রী—যাহারা অঙ্গ সংস্কার করে, বেশভূষা পরায় এবং স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ করে।

ক্ষীরধাত্রী—যাহারা কেবল শিশুকে স্তন্য পান করায়।

মলধাত্রী—যাহারা শিশুর মলমূত্রাদি পরিষ্কার করে।

ক্রীড়াধাত্রী—যাহারা শিশুকে হৃষ্ট রাখে, খেলা করায় ও উৎসঙ্গে লইয়া শিশুর ইচ্ছানুগামিনী হয়।

এবং বলিলেন, নরদত্ত, এই মহা জম্বুদ্বীপে এক মহারত্ন জন্মিয়াছে। কপিলবস্তু নগরে শুদ্ধোদন রাজার গৃহে এক অদ্ভুত বালক জন্মিয়াছে। এই বালক সর্ব্বলোকপূজ্য এবং দ্বাত্রিংশৎ মহালক্ষণে লক্ষিত। ইনি গৃহে থাকিলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন, ত্যাগী হইলে সম্যক্ বুদ্ধ হইবেন। অতএব চল, আমরাও সেই অনুপম বালককে নয়নগোচর করিয়া জীবনের সার্থক্য সাধন করিব।

অনন্তর অসিত ঋষি ভাগিনেয় (নরদত্তের) সহিত রাজহংসের ন্যায় আকাশ মার্গ অবলম্বন করিয়া কপিলবস্তু মহানগরে আসিলেন। নগর-প্রান্তে লোকের সমাগম দেখিয়া যোগবল উপসংহার পূর্ব্বক সাধারণ মানবের ন্যায় পদব্রজে রাজদ্বারে গিয়া উপনীত হইলেন। দ্বারপালকে বলিলেন "দ্বারপাল, রাজাকে গিয়া বল, দ্বারে একজন ঋষি উপস্থিত। তিনি আপনার সন্দর্শন ইচ্ছা করেন।'

দৌবারিক রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক, তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, রাজা হৃষ্ট তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ঋষিকে আনয়ন কর এবং তাঁহার জন্য আসনাদি আহরণ কর।"

অনন্তর দ্বারবান্ ঋষিকে লইয়া রাজসমীপে গমন করিল। রাজা যথোচিত অভ্যর্থনা সহকারে ঋষিকে আমন্ত্রণ করিলেন, ঋষিও সানন্দচিত্তে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে! আমার মনে হয় না যে, আপনি আর কখন আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। এক্ষনে বলুন, কি উদ্দেশে আমার নিকট আপনার আগমন। "ঋষি বলিলেন, তোমার একটি পুত্র হইয়াছে, তাহাকেই দেখিবার ইচ্ছায় আসিয়াছি।"

রাজা বলিলেন "কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করুন, কুমার নিদ্রিত আছে, উঠিলেই আপনাকে দেখাইব।" ঋষি বলিলেন "রাজন! মহাপুরুষেরা দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকেন না, জাগ্রত থাকাই তাঁহাদের স্বভাব। আপনি অন্তঃপুরে যান, দেখিবেন কুমার উঠিয়াছেন।"

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পুর প্রবেশ পূর্ব্বক কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া ঋষি সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। ঋষি সেই দ্বাত্রিংশল্লক্ষণান্বিত বালককে দেখিয়া মনে মনে কি অনুধ্যান করিলেন; অনন্তর সসম্ভ্রমে 'অদ্ভুত বালক, অদ্ভুত বালক" এইরূপ বলিয়া উঠিলেন। সেই বৃদ্ধতম ঋষি তখন অসঙ্কোচে

চিত্তে সেই বালককে প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও স্তুতি বন্দনাদি করিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, আর অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঋষির সেই নীরব রোদন দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন কিছু ভীত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে, রোদন কেন? দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন কেন? বালকের কি কোন অমঙ্গল দেখিলেন?

ঋষি বলিলেন, "মহারাজ! আমি বালকের জন্য কাঁদিতেছি না; বালকের কোন অমঙ্গলও দেখি নাই। আমি আমার নিজের জন্যই কাঁদিতেছি। মহারাজ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, জরাজীর্ণ হইয়াছি, আর অধিককাল বাঁচিব না। তোমার এই বালক বুদ্ধ হইবেন। বুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবৃত্ত করিবেন। যে ধর্ম্ম কোন শ্রমণ, কোন ব্রাহ্মণ, কোন দেব, কোন দেবপুত্র, কেহই প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই, সেই অনুত্তম ধর্ম্ম ইনি সর্ব্ব লোকের হিতের জন্য, সর্ব্ব লোকের সুখের জন্য, সর্ব্ব লোকের কল্যাণের জন্য প্রচারিত করিবেন। মূলে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, শেষেও কল্যাণ, শুদ্ধ, নির্ম্মল ও ব্রহ্মচর্য্য সংযুক্ত অনুত্তম ধর্ম্ম প্রচারিত করিবেন। ইঁহার ধর্ম্ম শুনিয়া জাতিধর্ম্মা প্রাণী সকল মুক্ত হইবে। ইনিই লোকদিগকে জরা ব্যাধি মরণ শোক পরিবেদন দুঃখ দৌর্মনস্য ও অপার হইতে রক্ষা করিবেন। রাগদ্বেষ মোহাদি সন্তপ্ত জীব নিবহকে স্বধর্ম্ম জল বর্ষণের দ্বারা সুখী করিবেন। মহারাজ, উড়ুম্বর পুষ্প যেমন কদাচিৎ কখন এক আধটা উৎপন্ন হয়, ইহ লোকে বুদ্ধ পুরুষও তেমনি কল্প কল্পান্তকাল অতীত হইতে হইতে কদাচিৎ কখন একবার উৎপন্ন হন, বহুকাল পরে সেই বুদ্ধ পুরুষ তোমার কুমাররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, অবশ্য ইনি বুদ্ধ হইবেন। অবশ্যই নষ্ট প্রাণী নিবেসকেই সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবেন। নির্ব্বাণে স্থাপিত করিবেন। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, তৎকারণে আমরা আর সেই বুদ্ধরত্ন দেখিতে পাইব না। সেই জন্যই আমি রোদন করিতেছি, সেই জন্যই আমি শ্বাস ত্যাগ করিতেছি। আমি ইহার আরাধনা করিতে পাইব না, এই ভাবিয়াই আমি রোরুদ্যমান, তজ্জন্যই আমার অশ্রু বিসর্জ্জন। মহারাজ! আমাদের মন্ত্রশাস্ত্রে ও বেদশাস্ত্রে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে ইনি নিশ্চিত বুদ্ধ হইবেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন; গৃহে থাকিবেন না। মহারাজ! দেখুন, আপনার এই কুমারে

দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে বিরাজিত আছে।* অতএব হে শুদ্ধোদন! তোমার এই কুমার সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন; গৃহবাসী হইবেন না; নিশ্চিত ইনি প্রব্রজ্যা ভেক ধারণ করিবেন।

রাজা শুদ্ধোদন অসিত ঋষির নিকট কুমারের স্বরূপ বর্ণন শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন, প্রীত হইলেন। তাঁহার মনের আবরণ বিদূরিত হইল, জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইল, তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বের চরণে প্রণিপতিত হইলেন এবং একটি গাথার দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

"বন্দিত স্তং সুরৈঃ সেন্দ্রৈ ঋষিভিশ্চাপি পূজিতঃ।
বৈদ্যোসর্ব্বস্য লোকস্য বন্দেহহমপিত্বাং বিভো॥"†

পরে রাজা শুদ্ধোদন হিমালয়বাসী অসিত ঋষিকে ও তাঁহার ভাগিনেয় নরদত্তকে আহার দানাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া দিলেন এবং অসিত মুনিও ভাগিনেয়ের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অসিত মুনিও নরদত্ত যোগ শক্তির উদ্ভাবন পূর্ব্বক অন্যের অলক্ষ্যে আকাশ পথে শীঘ্রই হিমাচল পার্শ্বস্থ আশ্রমে গিয়া উপনীত হইলেন। অসিত মুনি ভাগিনেয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "নরদত্ত! আমি তোমায় এক হিতকথা বলি, শ্রবণ কর। যে দিন তুমি শুনিবে, ইহলোকে বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই দিনেই তাঁহার শাসন অবলম্বন করিবে, শিষ্য হইবে। তাহা হইলেই তোমার হিত হইবে, সুখ হইবে, দীর্ঘজীবনের সাফল্য হইবে।"

বৌদ্ধাচার্য্যেরা বুদ্ধের বাল্যলীলা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক কথা বলিয়া গিয়াছেন। ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধগ্রন্থের অষ্টমাধ্যায়ে বুদ্ধের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এমন সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা পাঠ করিলে অনুবাদ করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। এস্থলে তাহার নিদর্শনের স্বরূপ একটি মাত্র বিষয়ের অনুবাদ করিলাম।

অসিত ঋষি গমন করিলে, কিছু দিন পরে, শাক্যগণ সমবেত হইয়া রাজাকে গিয়া বলিল, মহারাজ! কুমারকে দেবকুলে উপনীত করিবার

---

* বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জক আমরা পৃথক প্রস্তাবে বলিব।

† শিষ্যগণ গুরুকে কিরূপে বড করে তাহা এই সকল বর্ণনা দেখিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়।

সময় আগত হইয়াছে, শুভদিন স্থির করিয়া কুমারকে দেবদর্শন করান।* রাজা বৃদ্ধ অমাত্যগণের উপদেশ ক্রমে মহা উৎসবের সহিত কুমার দেবতা স্থানে লইয়া গেলেন; মন্দিরস্থ দেব প্রতিমা সকল বালকরূপী বোধিসত্বকে দেখিবামাত্র আপন আপন স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালকের চরণে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে শাক্যগণ সকলেই বিস্মিত হইল, আনন্দিত হইল, অন্তরীক্ষে দিব্য পুষ্পবর্ষন ও দিব্য বাদ্য প্রভৃতি হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীরাম দাস সেন।

দয়া।

গুরু। ভক্তি ও প্রীতির পর দয়া। আর্ত্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতি-ভাব, তাহাই দয়া। প্রীতি যেমন ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনি প্রীতির অন্তর্গত। যে আপনাকে সর্ব্বভূতে, এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্ব্বভূতে দয়াময়; অতএব ভক্তির অনুশীলনেই যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনই প্রীতির অনুশীলনে দয়ার অনুশীলন। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, হিন্দুধর্ম্মে এক সূত্রে গ্রথিত—পৃথক করা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের মত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম্ম আর দেখা যায় না।

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক অনুশীলন হিন্দুধর্ম্মে অনুজ্ঞাত হইয়াছে।

গুরু। ভূরি ভূরি, পুনঃপুনঃ। (হিন্দুধর্ম্মে) দয়ার অনুশীলন যত পুনঃপুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এমন কিছুই নহে। যাহার দয়া নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এই সকল উপদেশে দয়া কথাটা তত ব্যবহৃত

---

* মাস বিশেষে শিশুকে দেবদর্শন করান এখনও পর্য্যন্ত অনেকের কুল প্রথা থাকিতে দেখা যায়।

হয় নাই. যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দয়ার অনুশীলন নামে। কিন্তু দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বলিলে সচরাচর আমরা অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনদান, ইত্যাদিই বুঝি। কিন্তু দানের এরূপ অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ। দয়ার অনুশীলনার্থ ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ—আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত, বুঝিতে হইবে। অতএব যখন দান ধর্ম্ম আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে। এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অনুশীলনমার্গ। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার অত্যল্পাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া করা হইল না। কেননা, যেমন জলাশয় হইতে এক গণ্ডূষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন প্রকার সঙ্কোচ হয় না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ হইল না। এরূপ দান যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম বটে, কিন্তু যে করে সে একটা বাহাদুর নয়। ইহাতে দয়া বৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন নাই। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের উপকার করিবে, তাহাই দান।

শিষ্য। যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ আপনি বলিয়াছেন সুখের উপায় ধর্ম্ম।

গুরু। যে বৃত্তিকে অনুশীলিত করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পবিত্র সুখে পরিণত হয়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তি গুলি—ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের অনুশীলনজনিত দুঃখ সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগুলি সকল দুঃখকেই সুখে পরিণত করে। সুখের উপায় ধর্ম্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট, সেও যতদিন আত্মপর ভেদ জ্ঞান থাকে, ততদিনই লোক তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশ্বরানুমোদিত, এজন্য নিষ্কাম হইয়া, তাহার অনুষ্ঠান করিবে। (নিষ্কাম কর্ম্মেই সকল বৃত্তির সম্যক স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয়।)

(শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম্মির আবার সুখ কি! সুখ ত কাম্য।

গুরু। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানই পূর্ণ সুখ। তাহার অপেক্ষা উচ্চ সুখের স্থান মনুষ্য-হৃদয়ে নাই।) এক্ষণে দান ধর্ম্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তৎ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার

আছে। হিন্দু ধর্ম্মের সাধারণ শাস্ত্রকারেরা (একালে মতে) বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য দান করিবে। এখানে "পুণ্য" স্বর্গাদি কাম্য বস্তু লাভের উপায়। দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। এইজন্য দান করিবে, ইহাই সাধারণ হিন্দু শাস্ত্রকারের ব্যবস্থা। এরূপ দানকে ধর্ম্ম বলিতে পারি না। স্বর্গ লাভার্থ ধনদান করার অর্থ মূল্য দিয়া স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন দিয়া রাখা মাত্র। ইহা ধর্ম্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য। এরূপ দানকে ধর্ম্ম বলা ধর্ম্মের অবমাননা।

দান করিতে হইবে, কিন্তু নিষ্কাম হইয়া দান করিবে। দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য দান করিবে; দয়াবৃত্তিতে প্রীতি বৃত্তিরও অনুশীলন, এবং প্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন, অতএব ভক্তি, প্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান করিবে। বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মার্থেই দান করিবে, পুণ্যার্থ বা স্বর্গার্থ নহে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, অতএব সর্ব্বভূতে দান করিবে; যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্ব্বপ্রদানই মনুষ্যত্বের চরম। সর্ব্বভূতে এবং তোমাতে অভেদ অতএব তোমার সর্ব্বস্বে সর্ব্ব লোকের অধিকার; যাহা সর্ব্বলোকের তাহা সর্ব্ব লোককে দিবে। (সর্ব্ব লোকের জন্য আত্মত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন করিবে।) ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত, গীতোক্ত ধর্ম্মের অনুমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দান ধর্ম্ম। নহিলে তোমার অনেক আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে। বিস্ময়ের বিষয়, যে এমন অনেক লোক আছে যে তাহাও দেয় না।

শিষ্য। সকলকেই কি দান করিতে হইবে? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই? আকাশের সূর্য্য সর্ব্বত্র করবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়। আকাশের মেঘ সর্ব্বত্র জলবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান হাজিয়া ভাসিয়া যায়। বিচারশূন্য দানে কি সেরূপ আশঙ্কা নাই?

গুরু। দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য। যে দয়ার পাত্র তাহাকেই দান করিবে। যে আর্ত্ত সেই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত্ত তাহাকেই দান করিবে—অপরকে নহে। সর্ব্বভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না, যে যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখ মোচনার্থ আত্মোৎসর্গ করিবে। তবে, কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন লোকও সংসারে পাওয়া না। যাহার দারিদ্র্য দুঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, যাহার

রোগ দুঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্ত্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া, পৃথিবীতে যাহারা সৎকার্য্যে দিন যাপন করিতে পারে, তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়। অনুচিত দানে সংসারে আলস্য বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অনেকে তাই ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন না। তাঁহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলস্য বশতই ভিক্ষুক, অথবা প্রবঞ্চক। এই দুই দিক্ বাঁচাইয়া দান করিবে। যাহারা জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণীবৃত্তি যথাবথরূপে অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন নহে। কেন না তাঁহারা বিচারক্ষম অথচ দয়াপর। অতএব মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবদুক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য্য ঐ রূপ।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃত॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং॥

অর্থাৎ "দেওয়া উচিত এই বিবেচনায় যে দান, যে প্রত্যুপকার করিবার সম্ভাবনা নাই তাহাকে দান, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে যে দান, এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দান করা যায়, তাহা রাজস দান। দেশ কাল পাত্র বিচার শূন্য যে দান, অনাদর এবং অবজ্ঞাযুক্ত যে দান তাহা তামস দান।"

শিষ্য। দানের দেশ কাল পাত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ আছে কি?

গুরু। গীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সে কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারদিগের রহস্য দেখ। দেশ কাল পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। সকল কর্ম্মই দেশ কাল পাত্র

বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও সেইরূপ। দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, (দান, যাহাকে ইংরেজেরা Indiscriminate Charity" বলেন, তাহাতে পরিণত হয়। তাহা হইলে,) দান আর সাত্ত্বিক হইল না, তামসিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা বুঝিবার জন্য হিন্দু ধর্ম্মের কোন বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশ দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে, মনে কর সেই সময়ে মাঞ্চেষ্টরে কাপড়ের কল বন্ধ—শিল্পী-দিগের কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে, দুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে, কেবল বাঙ্গালায় যা পারি দিব। তাহা না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চেষ্টরে দিই, তবে দেশ বিচার হইল না। কেন না মাঞ্চেষ্টরে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কাল বিচারও ঐ রূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণ পাত করিয়া রক্ষা করিলে, কাল হয় ত তাহাকে তুমি রাজ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণ দান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে না। পাত্র বিচার অতি সহজ—প্রায় সকলেই করিতে পারে। দুঃখীকে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব "দেশে কালে চ পাত্রে চ" এ কথার একটা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই—যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের হৃদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন তাহা দেখ। "দেশে"—কিনা "পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ।" শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। তার পর "কালে কি?" শঙ্কর বলেন "সংক্রান্ত্যাদৌ।" শ্রীধর বলেন "গ্রহণাদৌ।" পাত্রে কি? শঙ্কর বলেন, "ষডঙ্গবিদ্বেদপারগায় ইত্যাদৌ আচার নিষ্ঠায়" শ্রীধর বলেন, "পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়।" সর্ব্বনাশ! আমি যদি স্বদেশে বসিয়া মাসের ১লা হইতে ২৯ তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীন দুঃখী পীড়িত একজন মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি, তবে সে দান, ভগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইরূপে ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং সার্ব্বলৌকিক যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, এবং অনুদার উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এখানে শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা ভগবদ্বাক্যে নাই। কিন্তু তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। ভগবদ্বাক্যকে স্মৃতির অনুমোদিত করিবার জন্য, সেই উদার ধর্ম্মকে অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

এই সকল মহা প্রতিভাসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায়গণের তুলনায়, আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেরা পর্ব্বতের নিকট বালুকণা তুল্য, কিন্তু ইহাও কথিত আছে যে,—

কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥*

বিনা বিচারে, ঋষিদিগের বাক্য সকল মস্তকের উপর এতকাল বহন করিয়া আমরা এই বিশৃঙ্খলা অধর্ম্ম, এবং দুর্দ্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন কর্ত্তব্য করা নহে। আপনার বুদ্ধ্যনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত। নহিলে. আমরা চন্দনবাহী গর্দ্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পীড়িত হইতে থাকিব—চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না।

শিষ্য। তবে এখন, ভাষ্যকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার করা, আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য।

গুরু। প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভা সম্পন্ন, এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্য্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে যেখানে বুঝিবে, যে তাঁহাদিগের উক্তি, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে। এ কথাটা স্থানান্তরে কল করিয়া বুঝাইব।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

* মনু ১২ অধ্যায়, ১১৩ শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট ধৃত বৃহস্পতি বচন।

শাস্ত্র সমর্থন।

অতি অল্প দিন হইল, বাঙ্গালার দুইটি প্রধান মাসিক পত্রে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি দুইটি আক্রমণ প্রকাশিত হইয়াছে। বান্ধবে শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র সেন নামক জনৈক লেখক মনুকে ভ্রান্ত অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এই নবজীবনে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রভাত বাবুর সিদ্ধান্ত এই ' অতএব (মনুর, স্বর্গ সম্বন্ধীয়) উল্লেখ ভ্রান্ত সংস্কারমূলক ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না ; " অতএব এস্থলেও (পৃথিবী জলের উপরে ভাসমান ছিল) মনুর এই কথার ব্যত্যয় দেখা যাইতেছে " ; " অতএব মনুর বাক্য অভ্রান্ত নহে ", " বাস্তবিক (মনুর ন্যায়) গ্রন্থ আমাদের ন্যায় ভ্রান্ত মনুষ্যকর্ত্তৃকই রচিত হইয়াছে।" তারাপ্রসাদ বাবুর সিদ্ধান্ত এই, " মনু এবং বেদব্যাস যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথার্থ শিক্ষা-বিভ্রাট। * আমরা অদ্যকার প্রস্তাবে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি এই সমস্ত তীব্র আক্রমণের যথাসাধ্য সমালোচনা করিব।

---

* নবজীবনে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা এই —"সম্প্রতি কেহ কেহ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে 'শিক্ষা বিভ্রাট' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। 'আমরা অধঃপাতে যাইতেছি এবং যাইব"—ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, মনু এবং বেদব্যাস যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথার্থ শিক্ষা-বিভ্রাট। যাহাই হৌক, পাশ্চাত্য বিদ্যা চর্চ্চা দ্বারা যদি আমরা আর কিছু না শিখি,—কেবল এই মাত্র জানিতে পারি, যে, আমাদের পুরুষকার আছে, এবং আমরা সাধনা করিলেই জ্ঞান ও ধর্ম্মে উত্তরোত্তর উন্নত হইতে পারিব, তাহা হইলে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিফল হইবে না।"

ঐ লেখাটুকু সম্পূর্ণ ভাবে তারাপ্রসাদ বাবুর নহে, উহাতে আমার যৎসামান্য সংস্রব আছে বলিয়া আমাকে দুই একটি কথা বলিতে হইতেছে ;—

(১) "ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে * * * * শিক্ষা-বিভ্রাট" এই লেখায় এমন বুঝায় না, যে, লেখক মনু ও বেদব্যাসের উপদেশকে শিক্ষা-বিভ্রাট বলিতেছেন। বরং "আমরা অধঃপাতে যাইতেছি না" ইহাই প্রতিপন্ন করিতে তারাপ্রসাদ বাবু যখন বিশেষ যত্নশীল, তখন ইহাই বুঝা উচিত যে, ঐ শিক্ষাকে তিনি শিক্ষা-বিড়ম্বনা বলেন না।

তিনটি কারণে প্রভাত বাবু মনুকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মনু বলেন, জলই সৃষ্টির প্রথম বস্তু। মনু স্বর্গকে বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মনু বলেন যে ব্রহ্মাণ্ড জলে ভাসমান ছিল। প্রভাত বাবু ইহার উত্তরে বলেন, যে, জলে যখন দুইটি বায়বীয় পদার্থের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন জলকে সৃষ্টির প্রথম বস্তু বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বর্গ সম্বন্ধে প্রভাত বাবু বলেন, স্বর্গকে কোন বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা অবিহিত, কারণ "স্বর্গ কোনও বস্তু নহে"। পৃথিবীই সমস্ত জলের আধার, সুতরাং জলকে ব্রহ্মাণ্ডের আধার বলা যুক্তি ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। এই রূপে প্রভাত বাবু মনুর তিনটি উক্তির অযথার্থতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

এক্ষণে মনুর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে, যে, যে জলকে মনু, সৃষ্টির প্রথম বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে জল, সাধারণ জল নহে। সে জলের নাম "কারণ জল," "প্রলয়-পয়োধি জল"। এই জল হইতে জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। পরে সেই ব্রহ্মা সাধারণ জলের সৃষ্টি করেন। "প্রলয় পয়োধি জল" সম্বন্ধে ভাগবৎ বলিতেছেন, যে ঐ জল প্রলয় বায়ু দ্বারা সর্ব্বদাই বিলোড়ত, বিঘূর্ণীত ও উর্ম্মিমালাকুল হইয়া রহিয়াছে" তস্মাৎ যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণজলোর্ম্মিচক্রাৎ সলিলাৎ'। এই জলে এখনও গুণ-সন্নিবেশ হয় নাই। প্রকৃতির উপাদান সমস্ত এই জলের মধ্যে গূঢ়ভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। মিল্টন যাহাকে "Chaos" "Deep profound" "Abyss" বলেন, এই কারণবারিও প্রায় তাহাই। ভারত চন্দ্র বলিয়াছেন—

---

(২) মনু ও বেদব্যাস সম্বন্ধে তারাপ্রসাদ বাবু প্রবন্ধের অন্যত্র বলিয়াছেন:—মনুর প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি আছে। তিনিই নিষ্কাম ধর্ম্মের আদৌ শিক্ষা গুরু। মনু ও বেদব্যাসের ন্যায় মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে অত্যল্প জন্মিয়াছেন।" নীলকণ্ঠ বাবু কি এটুকু লক্ষ্য করেন নাই?

(৩) "যাহা হৌক, পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা যদি আমরা আর কিছু না শিখি ইত্যাদি। ঐ 'যাহাই হৌক' পদটি থাকাতে বুঝা যায়, যে যাহাই হৌকের পূর্ব্বের কথা গুলি, লেখকের প্রতিপাদ্য বা উদ্দেশ্যব্যঞ্জক নহে, পরের কথা গুলিই—অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার সফলতা প্রদর্শনই—লেখকের প্রতিপাদ্য। 'যাহাই হৌক,' পদের ফল, নীলকণ্ঠ বাবু তারাপ্রসাদ বাবুকে দেন নাই।

(৪) নীলকণ্ঠ বাবু যে মতের খণ্ডনে প্রবৃত্ত, তারাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধে ঠিক সেই রূপ মত না থাকিলেও, বঙ্গদেশে ঐ রূপ মতাবলম্বীর অভাব নাই। সুতরাং নীলকণ্ঠ বাবুর প্রবন্ধ নিরর্থক নহে। [নবজীবন সম্পাদক।]

"বিনা চন্দ্রানন রবি, প্রকাশি আপন ছবি, অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে, বসি স্থল বিনা স্থলে, বিনা গর্ভে প্রসব হইলা॥

সাধারণ জলের সৃষ্টি সম্বন্ধে মনু যে ক্রম দেখাইয়াছেন, তাহা এইঃ—

"মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া। ১ম অধ্যায়
আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং স্মৃতং॥ ৭৫
আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
বলবান জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুণোমতঃ॥ ৭৬
বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ বিরোচিষ্ণু তমোনুদং।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে ভাস্বৎ তদ্রূপগুণমুচ্যতে॥ ৭৭
জ্যোতিষশ্চ বিকুর্ব্বাণাৎ আপো রসগুণাঃ স্মৃতাঃ।
অদ্ভ্যো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ॥ ৭৮

অর্থাৎ সৃষ্টির ক্রম এই।

১ম মহত্তত্ত্ব
২য় আকাশ
৩য় বায়ু
৪র্থ তেজ
৫ম জল
৬ষ্ঠ ক্ষিতি

মনু বৈজ্ঞানিক ছিলেন কিনা, তাহা ভগবান জানেন, কিন্তু তিনি বায়ুর সৃষ্টির পরে, সাধারণ জলের সৃষ্টির নির্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মনু গ্যাসের সৃষ্টির পূর্ব্বে সাধারণ জলের সৃষ্টির কথা বলেন নাই।

এই সাধারণ জল হইতে "প্রলয়পয়োধি জল" সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই জলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা শয়ান ছিলেন। স্বয়ং নারায়ণ সেই জল আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ হইয়াছে। এই প্রলয়পয়োধিজলে সমস্ত বিশ্ব নিমগ্ন ছিল; সুতরাং ইহা যে ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ তাহাতে সন্দেহ কি? এক্ষণে দেখা গেল, যে, প্রভাত বাবু মনুর যে তিনটি ভ্রম দেখাইয়াছেন, তাহার মধ্যে দুইটিতে তিনি নিজেই বালকোচিত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এক্ষণে মনুর লিখিত স্বর্গের বিবরণ আলোচনা করা যাউক। মনু বলিতেছেনঃ—

তাভ্যাং স শকলভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টৌ অপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং॥

অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চে স্বর্গ, মধ্যে আকাশ, ও নিম্নে ভূমি এই তিন লোক ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন। প্রভাত বাবু বলেন, যে, স্বর্গ নামক কোন বস্তুই নাই। তাঁহার মতে স্বর্গ ভূবায়ুর বর্ণমাত্র। কিন্তু ভূবায়ুর বর্ণ কি বস্তু নহে? এবং আমরা কি বুঝিব, যে, যেখানে ভূবায়ুর বর্ণ আছে, সেখানে ভূবায়ু নামকও কোন বস্তু নাই? যদি স্বর্গে ভূবায়ুর বর্ণ থাকে, তবে স্বর্গে ভূবায়ুও আছে; এবং তাহা হইলে স্বর্গকে বস্তু বলা কোনরূপেই অসঙ্গত বা অযৌক্তিক নহে। ফলত মনু বলিতেছেন যে পৃথিবীর উপরে যে বায়ুস্তর আছে, তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মা সর্ব্বোচ্চ ভাগের নাম স্বর্গ রাখিলেন ও সর্ব্বনিম্ন ভাগের নাম আকাশ রাখিলেন। পৃথিবীও এই দুই ভাগ বায়ুস্তর, তিনে মিলিত হইয়া "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" হইল। ইহার মধ্যে অবৈজ্ঞানিকতা কোথায়?

মনুর প্রথম অধ্যায় যত্ন সহকারে পাঠ করিলেই প্রভাত বাবু এ সমস্ত ভ্রমে নিপতিত হইতেন না। মনু একেবারে অভ্রান্ত হউন বা না হউন, তিনি যে আমাদের অপেক্ষা লক্ষগুণে অভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রভাত বাবু ব্যাপ্য ব্যাপক ও ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত বিচার উত্থাপিত করিয়াছেন, ঢাকাস্থ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় শীঘ্রই তাহার সমালোচনা করিবেন; সুতরাং তৎ সম্বন্ধে আমি কোন কথা না বলিয়া তারাপ্রসাদ বাবুর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

২য়। অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন বৃহস্পতি যুক্তির সম্মাননা করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু যে যুক্তির বলে ব্যাস ও মনুর শিক্ষা শিক্ষা বিভ্রাট বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, সে যুক্তিকে বৃহস্পতিদেব যুক্তি-বিভ্রাট বলিতেন কি না, তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না, কারণ ঐ বৃহস্পতিই স্থলান্তরে বলিয়াছেন;

তাবচ্ছাস্ত্রানি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানিচ।
ধর্ম্মার্থ মোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে॥

অর্থাৎ মনু অন্য অন্য সকল শাস্ত্র অপেক্ষা তর্ক অথবা যুক্তি অপেক্ষা এবং ব্যাকরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন আমরা ইহাও দেখিতে পাই, যে,

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

ইহার অর্থস্থলে টীকাকার কুল্লুকভট্ট বলিতেছেন—"বিরোধী বৌদ্ধাদিতর্কৈর্ন হন্তব্যানি; অনুকূলস্তু মীমাংসাদিতর্কঃ প্রবর্ত্তনীয় এব" অর্থাৎ যে যুক্তিদ্বারা বেদ বা স্মৃতি হত হন তাহা ব্যবহর্ত্তব্য নহে, যে যুক্তি বেদ ও স্মৃতির অনুকূল সেই যুক্তিই প্রবর্ত্তনীয়। এই রূপ একদেশদর্শী যুক্তি তারাপ্রসাদ বাবুর মনোনীত হইবে কি না জানি না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যুক্তির এই রূপ ব্যবহারই আদরণীয়। আরও দেখুন

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা ঋষিদিগের ধর্ম্মোপদেশের ব্যাখ্যা করিবেন, তিনিই ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবেন, অন্যে পারিবে না।

তবে কি হিন্দুশাস্ত্রে যুক্তির আদর নাই? না তাহা নহে। মনুই বলুন, অথবা অন্য অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রই বলুন সমস্তই যুক্তির উপর অবস্থাপিত, অথবা যুক্তির সাহায্যে সবলীকৃত। বেদ ঈশ্বরের যুক্তি, এ জন্য তাহা মনুষ্য-যুক্তির দ্বারা অকাট্য। এইরূপে মনু ঈশ্বর সদৃশ বা ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তির যুক্তি, সুতরাং তাহাও মনুষ্য-যুক্তির দ্বারা অকাট্য। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, যে, যেখানে দেখিবে যে বেদের অথবা মনুর কোন অংশ তোমার নিকট অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইতেছে সেখানে বুঝিবে যে তুমিই ভ্রান্ত এবং মনু যাহা বলিতেছেন তাহা যৌক্তিক। আমরা, এমন কি তারাপ্রসাদ বাবুও, যখন সেক্ষপীয়রের কোন অংশ বুঝিতে না পারি, তখন মনে করি যে, এই অংশ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। সেক্ষপীয়র ভ্রান্ত ইহা বলিতে আমাদের কোন মতেই সাহস হয় না। আমরা সেক্ষপীয়রের যে পরিমাণে সম্মান করি, বেদ বা মনুর প্রতি সেই পরিমাণেও সম্মান প্রদর্শন করিলে আমরা কখনই ধর্ম্মে বা ন্যায়ে পতিত হইব না।

তারাপ্রসাদ বাবু বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তিনি মনু অথবা পুরাণাদিকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু যদি বেদ অভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে মনুকেও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ মনু সম্পূর্ণ রূপে বেদের উপর অবস্থাপিত।

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়োহিসঃ॥

অর্থাৎ মনু যে কোন ধর্ম্মের বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমস্তই বেদে কথিত হইয়াছে। তবে বেদ অভ্রান্ত কি না, সে বিষয়ে অবশ্যই বিচার উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এ বিচার তারাপ্রসাদ বাবু উত্থাপিত করেন নাই, সুতরাং এ বিচার আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। তবে মনু ধর্ম্মের যে চারিটি লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

"বেদ ; স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥"

অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে বেদের মত প্রতিপালন করিতে হইবে ; পরে স্মৃতির মতানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। তৎপরে সদাচারের বশবর্ত্তী হইবে। সর্ব্বশেষে আত্মতুষ্টি খুঁজিতে হইবে। অর্থাৎ অন্য অন্য প্রধান ব্যক্তির যুক্তি অনুসারেই প্রধানত কার্য্য করিতে হইবে। তবে যেখানে সেই রূপ যুক্তি পাওয়া যাইতেছে না, সেখানে নিজের যুক্তিই অবলম্বনীয়। শুদ্ধ যে অধম হিন্দুজাতিই এই রূপে নিজের যুক্তির উপর অনাদর প্রকাশ করে তাহা নহে। ইংরেজকুল-গৌরব মহামতি বর্কও এই কথা বলিতেন ; "We are afraid to put meu to live and trade each on his own private stock of reason ; because we suspect that this stock in each man is small, and that the individuals would do better to avail themselves of the general bank and capital of nation and ages."

তারাপ্রসাদ বাবুর প্রথম তর্ক এই যে হয় মনু ভ্রান্ত, নয় অথর্ব্ববেদ ভ্রান্ত। যদি বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়, তাহা হইলে মনু ভ্রান্ত, কেননা মনু বেদকে ত্রয়ী বলিয়া বারম্বার নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং মনু কুত্রাপি অথর্ব্ববেদের উল্লেখ করেন নাই। আর যদি মনু অভ্রান্ত হন, তাহা হইলে অথর্ব্ববেদ ভ্রান্ত, সুতরাং দেখুন হিন্দুশাস্ত্রকে রামে মারিলেও মারিয়াছে, রাবণে মারিলেও মারিয়াছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে, যে, মনু এক স্থলে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রুতীরথর্ব্বাঙ্গিরসীঃ কুর্য্যাদিত্যবিচারয়ন্।
বাক্শাস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মস তেন দন্যাদরীন দ্বিজঃ॥ ১১ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক।

কুল্লুক ভট্ট টীকা করিতেছেন অথর্ব্ববেদে আঙ্গিরসীঃ (বৃষ্টাভিচারশ্রুতীঃ) অবিচারয়ন্ ইত্যাদি—। ভরত শিরোমণি অনুবাদ করিতেছেন,—"অথর্ব্ব-বেদোক্ত আঙ্গিরসী শ্রুতি অর্থাৎ অভিচারমন্ত্র পাঠ করিবে, ঐ মন্ত্রাত্মক বাক্য-রূপশাস্ত্র দ্বারা শত্রুকে বিনাশ করিবে।" এই রূপে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ করিয়াও মনু কি জন্য বারম্বার ত্রয়ী শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অবশ্য বিচার্য্য বটে। কিন্তু এই বিচার যে তারাপ্রসাদ বাবু অদ্য প্রথম উত্থাপিত করিলেন, তাহা নহে। প্রায় অশীতি বৎসর পূর্ব্বে কোলব্রুক সাহেব এই প্রশ্নের যে মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "The true reason why three first Vedas are often mentioned without any notice of the fourth, must be sought not in their different origin and antiquity, but in the difference of their use and purport." অর্থাৎ—'অথর্ব্ববেদ যে অন্য অন্য বেদ হইতে ভিন্ন সময়ে বা ভিন্ন মূল হইতে রচিত হইয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু অন্য অন্য বেদ হইতে ইহার উদ্দেশ্য ও ব্যবহার স্বতন্ত্র। এ জন্য আমরা সর্ব্বদাই তিন বেদের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ দেখি না।" পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীও প্রায় এই কথাই বলিয়াছেন—'বেদ বিভাগ হইবার পূর্ব্বেই ঐ সমস্ত ত্রিবিধ রচনা বিমিশ্র থাকায় ত্রয়ী নামে ব্যবহৃত হইত। এবং সেই অবস্থাতেই ঐ ত্রয়ী বেদ হইতে...মহর্ষি অথর্ব্বা ঐহিকপ্রত্যক্ষফলপ্রদক শত্রুমারণাদির উপযোগী মন্ত্র প্রকরণগুলি স্বতন্ত্র করিয়া প্রচলিত করেন।" ভাগবতেও লিখিত আছে—"অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণোমুনিঃ" অর্থাৎ অভিচারাদিকর্ম্মে প্রবৃত্ত দারুণস্বভাব সুমন্তু মুনি অথর্ব্ববেদে পারদর্শী হন। তবেই দাঁড়াইল, যে ক্রূর ও নৃশংস কর্ম্মের বিধান আছে বলিয়াই মনু অথর্ব্ববেদের বারম্বার উল্লেখ করেন নাই। আর ইহাও একরূপ বুঝা গেল, যে, মনুও ভ্রান্ত নহেন, অথর্ব্ববেদও ভ্রান্ত নহেন, তারাপ্রসাদ বাবুই ভ্রান্ত।

তারাপ্রসাদ বাবুর দ্বিতীয় তর্ক এই যে—হয় শশধর তর্কচূড়ামণি ভ্রান্ত নয় মনু ভ্রান্ত। যদি তর্কচূড়ামণি অভ্রান্ত হন, তাহা হইলে মনু ভ্রান্ত, কেন না তর্কচূড়ামণি মনুর আজ্ঞার বিরুদ্ধে শূদ্রদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। আর এই কারণেই যদি মনু অভ্রান্ত হন, তাহা হইলে তর্কচূড়ামণি ভ্রান্ত। কিন্তু এস্থলেও আর এক পূর্ব্বপক্ষ করা

যাইতে পারে, যে তর্কচূড়ামণিও ভ্রান্ত নহেন, মনুও ভ্রান্ত নহেন তারাপ্রসাদ বাবুই ভ্রান্ত।*

মনু এক স্থলে বলিয়াছেন

"ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ"

অর্থাৎ শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে না, শূদ্রকে ব্রত শিক্ষা দিবে না। শুদ্ধ মূল ধরিলে বোধ হইতে পারে, যে মনু শূদ্রকে সকল শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু টীকার সহিত মূল পাঠ করুন, মনুর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবেন। কুল্লূকভট্ট টীকা করিতেছেন—'ব্রতঞ্চাস্য প্রায়শ্চিত্তরূপং সাক্ষাৎ ন উপদিশেৎ। কিন্তু ব্রাহ্মণং মধ্যে কৃত্বা তদুপদেশবিধানাৎ। যথাহ অঙ্গিরাঃ "তথা শূদ্রং সমাসাদ্য সদাধর্ম্মপুরঃসরং অন্তরা ব্রাহ্মণং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাদিশেৎ।" প্রায়শ্চিত্তং ইতি সকল ধর্ম্মোপদেশস্য উপলক্ষণার্থং" যদি বলেন যে মনুর মূল ধরিয়াই অর্থ করিব টীকা ধরিব কেন? তাহা হইলে মূলই ধরুন;

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ নচ সংস্কারমর্হতি। ১০ ম অধ্যায়
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মে ধর্ম্মোস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনং॥ ১২৬
ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তি মনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ॥ ১২৭
যথা যথা হি সদ্বৃত্তং আতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ।
তথাতথেমঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥ ১২৮

অর্থাৎ "শূদ্রের পাতক নাই, সংস্কার নাই, ধর্ম্মে অধিকার নাই, ধর্ম্মে নিষেধও নাই। যদি মন্ত্রাংশ ত্যাগ করিয়া শূদ্রেরা দ্বিজদিগের ন্যায় আচরণ করে; তাহা হইলে তাহাদের নিন্দা না হইয়া প্রশংসাই হয়। পরগুণানিন্দক শূদ্র যে যে রূপে দ্বিজজাতির আচার অনুষ্ঠান করে; সেই সেই রূপে লোকে অনিন্দিত হইয়া মান্য হয় এবং পরলোকে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়"। ফলত তারাপ্রসাদ বাবু যে শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, শূদ্রমাত্রেই তাহাদের লক্ষ্য নহে। কারণ এই দুই শ্লোকে লিখিত আছে

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং নহবিষ্কৃতং।

---

* বঙ্গবাসীতে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে নীলকণ্ঠ বাবুর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

[নবজীবন সম্পাদক]

কিন্তু দশম অধ্যায়ের ১২৫ শ শ্লোকে লিখিত আছে, যে, শূদ্রভৃত্যকে উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।"

এই দুই শ্লোকের সমন্বয় করিলে এই দাঁড়ায় যে আশ্রিত শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দান বা ধর্ম্মোপদেশ দান অবিহিত নহে। কিন্তু যে অনাশ্রয় শূদ্র তাহার প্রতি উচ্ছিষ্টও নিষিদ্ধ, ধর্ম্মোপদেশও নিষিদ্ধ। আবার কুল্লূকভট্টের টীকা অনুসারে ও অন্য অন্য স্মার্ত্তদিগের বচনানুসারে ব্রাহ্মণ সম্মুখে রাখিয়া সকল শূদ্রকেই উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। যদি বলেন মনুর বিধি-নিষেধ ভাল বুঝিলাম না, তাহা হইলে অন্য অন্য শাস্ত্রকার হইতে উপদেশ লাভ করুন। এস্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, মনু যদি দুই প্রকার বিধানই দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ দুই প্রকার বিধানকেই শিরোধার্য্য করিতেই হইবে। কারণ গৌতম বলিয়াছেন—

"তুল্যবলবিরোধে বিকল্প।"

এবং কুল্লূকভট্টও বলিয়াছেন—

স্মৃত্যোরপি বিরোধে বিকল্পঃ॥"

যাহা হউক এক্ষণে শূদ্রের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে অন্য অন্য দু একটি বিষয়েরও আলোচনা করা যাইতেছে। ভাগবতে ব্রাহ্মণেরা, শূদ্র সূতকে বলিতেছেন।

"মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ।"

অথাৎ বেদ ভিন্ন অন্য অন্য সকল শাস্ত্রেই তোমাকে পারদর্শী বলিয়া আমরা জানি। নারদ পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ছিলেন, কিন্তু তথাপি ঋষিরা তাঁহাকে নিতান্ত গুহ্য বিষয়েও জ্ঞানপ্রদান করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেনঃ—

"ততশ্চ স্নান শ্রাদ্ধপঞ্চযজ্ঞেতরত্র শূদ্রস্য মন্ত্রপাঠঃ প্রতীয়তে।"

অর্থাৎ শ্রাদ্ধ স্নান এবং পঞ্চযজ্ঞ ভিন্ন অন্য সকল কার্য্যেই শূদ্রেরা পৌরাণিক মন্ত্রপাঠ করিতে পারেন। পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন—

"স্ত্রীশূদ্রয়োস্তু সত্যাং অপি জ্ঞানাপেক্ষায়াং,
উপনয়নাভাবেন অধ্যয়নরাহিত্যাৎ বেদ অধিকারঃ প্রতিবদ্ধঃ।
ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানন্তু পুরাণাদি মুখেন উৎপাদ্যতে।"

স্ত্রীজাতির ও শূদ্রজাতির বেদে অধিকার নাই। কিন্তু পুরাণাদি দ্বারা তাঁহারা ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এইরূপ শত শত প্রমাণ দেওয়া

যাইতে পারে। তাহার পর সদাচারও দেখুন। ভরত শিরোমণি স্মার্ত্ত-শ্রেষ্ঠ হইয়া স্বয়ং সাধারণের নিকট মনু প্রচার করিয়াছিলেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত তারাপ্রসাদ বাবুর বড় বিরোধ নাই। কারণ তারাপ্রসাদ বাবু স্বয়ংই বলিয়াছেন—"বিবেকশক্তি অপ্রতিহত রাখিয়া স্বদেশের ধর্ম্মানুশীলন করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।" তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও বোধ হয় এই কথাই বলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে শাস্ত্রের সহিত বিবেকের অবিসম্বাদিতা প্রদর্শন করা। যখন ৺ রমানাথ ঘোষ বাবুর মতকে সায়ণাচার্য্যের মত অপেক্ষা বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, এবং যখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বেদকে অসভ্য-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং যখন তারাপ্রসাদ বাবুর মত পণ্ডিতেও রঘুনন্দনকে "তাঁতির" সহিত সমতুল্য বলিয়া উপহাস করেন,* এবং যখন ব্যাস ও মনুর শিক্ষা বিভ্রাট বলিয়া স্বীকৃত হয়, এবং যখন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সগর্ব্বে হিন্দুসমাজকে তুচ্ছ করিতে কুণ্ঠিত হন না, তখন হিন্দুসমাজের বড়ই দুঃসময় সন্দেহ নাই। এই দুর্দ্দিনে যে আমাদের হইয়া দু কথা বলিবে সেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম্মের জন্য যাহার কিছু মমতা আছে সেই তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে সহর্ষে অভিবাদন করিবে সন্দেহ নাই।

তারাপ্রসাদ বাবুর ৩য় তর্ক এই যে হিন্দুশাস্ত্রে সত্যযুগকে নিষ্পাপ বলা হইয়াছে, অথচ সত্যে অনেকবিধ পাপকাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। এইরূপে কলি, হিন্দুশাস্ত্রে পাপময় বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু কলিতে পুণ্যের অসদ্ভাব নাই, সুতরাং পাপের তারতম্যানুসারে যে যুগ বিভাগ করা হইয়াছে তাহাতে ভ্রান্তি হইতেছে।

সত্যযুগে যে কিছুমাত্রই পাপ ছিল না, তাহা নহে। ফলত যখন সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনগুণ লইয়া সংসার সৃষ্ট হইতেছে, এবং যখন তমোগুণ

---

* তারাপ্রসাদ বাবুর লেখা এই:—'বেদ দূরে থাকুক, অনেক স্মার্ত্তের মনুসংহিতাতেও অধিকার নাই। বাঙ্গালার ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ীদের পক্ষে রঘুনন্দন সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছেন। এখন 'মোগল পাঠান হদ্দ হলো, পার্শি পড়ান তাঁতি।" ইহাতে রঘুনন্দনের উপর উপহাস আছে কি? আমাদের বোধ হয়, অনধীতশাস্ত্র ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রব্যবসায়ী হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ আছে।

নবজীবন সম্পাদক।)

পাপের মূল, তখন সৃষ্টির আদি হইতেই পাপ আছে। ভাগবতে এরূপও লিখিত আছে, যে, ব্রহ্মা প্রথমে তমোগুণ হইতে পাপেরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরাশর সংহিতায় লিখিত আছে যে "কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং" অর্থাৎ সত্যযুগে পাপীর সহিত কথোপকথনে পাপ হয়। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে হিন্দুশাস্ত্রকারেরাও সত্যকালে পাপের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন,। মনু বলিয়াছেন যে সত্যযুগে মনুষ্য চারিশত বৎসর বাঁচিত। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন "চতুর্বর্ষশতায়ুষস্ত্ব স্বাভাবিকং। অধিকায়ুঃ প্রাপকধর্ম্মবশাদধিকায়ু র্যোঽপি ভবন্তি।" অর্থাৎ চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকাই স্বাভাবিক নিয়ম। তবে যাগযজ্ঞাদির দ্বারা লোকে অধিকায়ুও হইতে পারিত। এইরূপে কলিতে একশত বৎসর পরমায়ু হইলেও সকলেই যে একশত বৎসর বাঁচে এরূপ নাহে। সাধারণ নিয়ম একশত বৎসর বাঁচা। কেহ ইহার অধিকও বাঁচে। কেহ বা এক শত বৎসর পূর্ণ না হইতেই মরিয়া যায়। বয়স বিষয়ে মনু যেরূপ সাধারণত কালনির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাপ পুণ্যের সময় সেইরূপই বুঝিতে হইবে। লোকে সাধারণত পুণ্যবান্ ছিল, সত্যবাদী ছিল। ধর্ম্ম সাধারণত সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু অধর্ম্ম যে সত্যযুগে একেবারেই ছিল না, মনু এরূপ বলেন নাই। একটা সহজ কথাই ধরুন না কেন। যদি সত্যযুগে পাপ না থাকিত, তাহা হইলে সত্যযুগে মনুষ্য পশুপক্ষী কাহারও জন্মই হইত না, সকলেই নিষ্পাপ হইয়া ঈশ্বরে গিয়া লয় পাইত। ফলকথা মনু এবং অন্য অন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, যে, সত্যযুগ হইতে ক্রমশই পুণ্যের হ্রাস ও পাপের বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা প্রকারান্তরে তারাপ্রসাদ বাবুও নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যদি সমাজকে শরীরী-পদার্থ বলিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ না বলিলে চলেই না। যদি শরীরী-পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি বৃদ্ধি ও বিনাশ থাকে, তাহা হইলে সমাজ নামক শরীরীপদার্থেরই বা থাকিবে না কেন? স্পেন্সর বলেন, যে সমাজের এইরূপ বিনাশ হওয়াই সম্ভব। ইতিহাস দ্বারাও এই কথাই বারম্বার প্রমাণীকৃত হইতেছে,—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃক্ব-গতোত্তর কোশলা ?"

তারাপ্রসাদ বাবুর শেষ তর্ক এই যে এই ভ্রান্ত মত দ্বারা আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি ও হইতেছি। আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না। আমরা

ত সকলেই জানি যে আমরা মরিব; তথাপি আমরা মৃত্যুশয্যাতেও সুখ কামনা পরিত্যাগ করিতে পারি না। সমাজ বিনষ্ট হইবে, এ কথা আমরা নামে মাত্র শুনি। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনে কোনরূপ কার্য্য করে বলিয়া ত বোধ হয় না। আমরা অনেকে জানি যে এক সময়ে পৃথিবী বিনষ্ট হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কবে নিরাশ বা হতাশ্বাস হইয়াছি? এতদ্ভিন্ন আমাদের শাস্ত্রকারেরা আশার কথাও ত বলিয়াছেন। কল্কি ম্লেচ্ছ বিনাশ করিবেন, ইহা কি আশার কথা নয়? গীতায় বারম্বার বলা হইয়াছে যে, লাভালাভ সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিবেচনা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। শ্রীধর স্বামী ভারতের টীকাস্থলে বলিতেছেন—"এতচ্চ স্বরূপকথনমাত্রং বৈরাগ্যার্থং নতু ধর্ম্মসঙ্কোচার্থং।" এই যে ধর্ম্মের হ্রাস পাপের বৃদ্ধির কথা বলা হইল, ইহা স্বরূপকথন (Historical); ইহা দ্বারা তোমরা মনে বৈরাগ্য উৎপাদন কর, ধর্ম্মসঙ্কোচ করিও না। তোমাদের চারিদিকে কিরূপ বিপদ বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্যের সহিত কর্ত্তব্য পালন কর। ফলত হিন্দুশাস্ত্রে উন্নতির পথে কোথাও বাধা দেওয়া হয় নাই। কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিয়া সৎকার্য্য করুন, অবশ্য সুফল লাভ করিবেন। দেখুন কলিকালে ধার্ম্মিক হওয়া অতি সহজ। কোন শাস্ত্রকার বলিতেছেন—"কলিতে তোমরা আর কিছু করিতে পারিবে না। কেবল অনবরত হরির নাম কর। তাহাতেই তোমরা মুক্ত হইবে।" আর এক শাস্ত্রকার বলিতেছেন—"অন্য অন্য যুগে তপস্যা, জ্ঞান, সত্য শৌচ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে তোমরা তাহা পারিবে না। সৎপাত্রে দান করিও, তাহা হইলেই তোমরা মুক্ত হইবে।" আর এক শাস্ত্রকার বলিতেছেন—"পূর্ব্বে দুশ্চিন্তা করিলেও পাপ হইত। কিন্তু এক্ষণে তোমরা দুর্ব্বলচিত্ত হইয়াছ। তোমাদের জন্য এই ব্যবস্থা হইল, যে দুষ্কার্য্য ব্যতিরেকে তোমাদের পাপ হইবে না।" পাছে আমরা নিরাশ হইয়া একেবারে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করি, এ জন্য আমাদের প্রতি সহজ সহজ বিধান করা হইয়াছে। ইহাতেও যদি আমরা নিরাশ হই, তাহাতে শাস্ত্রকারদিগের দোষ কি? সেই মহানুভব শাস্ত্রকারগণ যাহা দিব্য চক্ষে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা আমাদের নিকট অকপটে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

উপসংহারে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য, যে, হিন্দুশাস্ত্র বাস্তবিকই সমুন্নত

বিশেষ। ইহাতে রত্নও আছে এবং বিষও আছে,* কারণ এ সংসারে রত্নের যেরূপ প্রয়োজন বিষেরও সেইরূপ প্রয়োজন। কিন্তু রত্ন উত্তোলন করা যেমন সহজ, বিষ উত্তোলন করা তত সহজ নহে। দেখুন সমুদ্র মন্থনের সময় সকল দেবতায় মিলিয়া রত্নই তুলিয়াছিলেন। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব ভিন্ন আর কেহই বিষোত্তলনে সমর্থ হন নাই। কেননা বিষ উত্তোলনের সর্ত্ত এই যে, যিনি বিষোত্তলন করিবেন, তাঁহার বিষ পানে সমর্থ হওয়া চাই। যে বিষ তুমি গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ নও, সে বিষ তোমার উত্তোলন করায় প্রয়োজন কি? যে সর্পের উপর তোমার প্রভুত্ব নাই, সে সর্প লইয়া ক্রীড়া করিলে তুমি নিজেও বিনষ্ট হইবে, অন্যকেও বিনষ্ট করিবে। আর হিন্দশাস্ত্রালোচকগণ! আপনাদের প্রতি সবিনয়ে এই নিবেদন করি, যে, আপনারা এই অভিমন্যু-বৃত্তি পরিহার করুন। শুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্র ব্যূহভেদ করিলে পৌরুষ নাই। অভিমন্যু ব্যূহভেদ করিতে পারিতেন। কিন্তু ব্যূহ হইতে নিষ্ক্রামণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। আপনারাও সেইরূপে যুক্তি দ্বারা শাস্ত্র ব্যূহভেদ করিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু ব্যূহ হইতে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারেন না। আপনারা পূর্ব্ব পক্ষ করিতে বিলক্ষণ পটু হইয়াছেন, কিন্তু মীমাংসার শক্তি আজিও আপনাদের হয় নাই। যে সন্দেহ আপনারা ভঞ্জন করিতে পারেন না, সে সন্দেহ তুলিবার প্রয়োজন কি? যখন আপনারা হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ভক্তি উৎপাদন করিতে অসমর্থ, তখন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন করায় লাভ কি? হিন্দুশাস্ত্রের শত্রুরা হিন্দুশাস্ত্রের বিদ্বেষী হউন, তাহাতে দুঃখ করিব না। কিন্তু আপনারা হিন্দুশাস্ত্রের মিত্র হইয়াও হিন্দুবিদ্বেষীদের সহিত যোগদান করিতেছেন ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়।

শ্রীনীলকণ্ঠ মজুমদার।

* তারাপ্রসাদ বাবুর কথা;—"আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মহাসমুদ্র স্বরূপ ইহাতে অনেক রত্ন আছে, এবং মনুষ্যের অনিষ্টকর বস্তুরও অভাব নাই; এই রত্নাকর হইতে রত্নোদ্ধার করিতে হইলে, যুক্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই।" অর্থাৎ রত্ন তুলিতে গেলেই বিষ উঠিবে।

নীলকণ্ঠ বাবু বলেন, 'যিনি বিষোত্তলন করিবেন, তাঁহার বিষ পানে সমর্থ হওয়া চাই।" আমরা বলি, তা কেন, তারাপ্রসাদ রত্ন তুলিতে গিয়া যদি সঙ্গে সঙ্গে বিষ তুলিয়া থাকেন, নীলকণ্ঠ তাহা পান করিয়া হজম করিলে ক্ষতি কি? (নবজীবন সম্পাদক।)

বিশ্বের পরমায়ু।

আমাদের অণ্ডকটাহ * চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক। তাহা যৌগেশ্বর্য্যদণ্ড
ভোগৈশ্বর্য্য ভেদে প্রধানত দ্বিবিধ। মহর্লোক অবধি বিষ্ণুপদাখ্য ব্রহ্মলোক
পর্য্যন্ত যে মহাসৌর স্বর্গচতুষ্টয় তাহা যোগফলের ভূমি। তৎসমস্ত অমল
সত্ত্বগুণ ও সূক্ষ্ম-আধ্যাত্মিক তেজসম্পন্ন। পৃথিবী, ভুবর্লোক, পিতৃলোক
এবং সূর্য্যাবধি সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত গ্রহতারানক্ষত্র বিশিষ্ট দেবলোক এ সমস্তই
ভোগরাজ্য। তৎসমূহ রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ ও কর্ম্মনিষ্পন্ন বা দেবজ্ঞান
সম্পাদ্য আলোকপ্রধান। প্রাগুক্ত যৌগৈশ্বর্য্য ভোগের স্বর্গচতুষ্টয় এবং
শেষোক্ত ভোগৈশ্বর্য্যপ্রদ পৃথিবী, ভুবর্লোক ও পিতৃদেবমিলিত স্বর্লোক—এই
ত্রৈলোক্য একত্র সপ্তস্বর্গের বাচ্য। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর অধম তমোগুণ
প্রতিপালিত সপ্তবিধ লোকের প্রতি আছে। তাহাকে সপ্ত পাতাল বলে।
এই চতুর্দ্দশ ভুবন। স্থূল সূক্ষ্ম ধাতুক্ষয়ানুসারে দীর্ঘ বা অতিদীর্ঘ ভোগান্তে,
ইহারা সমুদায়ই অধিকবার বা অল্পবার প্রলয়রূপ পরিবর্ত্তনাধীন।

যাঁহারা কাল, প্রকৃতি ও গ্রহনক্ষত্রের সংবাদ লইয়া থাকেন, তাঁহারা
জানেন, যে, এই বিশ্বরাজ্যের কোন পদার্থই স্থির হইয়া নাহি। কোন পদার্থ
একেবারে নষ্ট হইতেছে না—একভাবেও নাহি। কিন্তু সকল পদার্থই স্ব স্ব
নিয়মকালান্তে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে। সকল
পদার্থই স্বল্প বা দীর্ঘ পরিমিত কালের বেগবান চক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে।
সকল পদার্থই দেশ কাল পাত্র ভেদে, হয় জাতি পুরঃসরে, নয় ব্যক্তি পুরঃ-
সরে, হয় রূপান্তরে, নয় পূর্ব্বরূপে গমনাগমন করিতেছে। প্রত্যেক শুক্ল
কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র পূর্ব্ব পূর্ব্বরূপে উদিত হইতেছেন এবং মাসে মাসে সপ্তবিংশতি
নক্ষত্রকে ভোগ করিয়া আবার তদ্রূপ ভোগে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সূর্য্য
একবার দ্বাদশরাশি ভোগ করত পুনর্ব্বার সে প্রকার ভোগ করিতেছেন।
তাঁহার ভোগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষচক্রের ন্যায় ষড়ঋতু বিরাজ
করিতেছে।

যেরূপ পক্ষে পক্ষে মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে কতিপয় একই প্রকারের ঘটনা
সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ কতিপয় নিরূপিত সংখ্যক অল্প বা বহু-

---

* এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের নাম অণ্ডকটাহ। ব্রহ্মাণ্ড অনেক।

বর্ষ অন্তে অনেক ঘটনা পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ ঘটনা সমূহের পরিক্রম উপলক্ষে কালকে চক্রবৎ বলা যায়। কালচক্র নানাবিধ। (যথা বিঃ পুঃ ২।৮।৬৬) সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্মাস বিকল্পিতাঃ। নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে॥ সংবৎসরস্তু প্রথমোদ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ। ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থাশ্চানুবৎসরঃ। বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোঽয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ॥ ৩০ দিনের মাস সাবন মাস, সূর্য্যের এক রাশিগত কাল সৌর-মাস, শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যাপর্য্যন্ত চান্দ্রমাস, চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভোগকাল নাক্ষত্র মাস। এই চারি প্রকার মাস। চারি প্রকারেই বৎসর গণনা হয়। যে সময়ে শুক্লপ্রতিপৎ, চন্দ্র সূর্য্যের সমান নক্ষত্র ও সংক্রান্তি একেবারে উপস্থিত হয়, তখন এক দিনেই ঐ চারি প্রকার মাস আরম্ভ হয়। পাঁচ বর্ষ পর্য্যন্ত উহাদের হ্রাস, বৃদ্ধি, অনৈক্য থাকে। পরে যখন পাঁচ বর্ষ পূর্ণ হয় তখন পূর্ব্ববৎ শুক্লপ্রতিপৎ, চন্দ্র সূর্য্যের এক নক্ষত্র ও সংক্রান্তি উপস্থিত হয়। সেই সময়ে আবার একদিনে ঐ চারি প্রকার মাসই আরম্ভ হয়। উক্ত চারি প্রকার মাসের এইরূপ প্রত্যেক পঞ্চবর্ষান্তযোগ ধরিয়া তাদৃশ প্রত্যেক পঞ্চবর্ষকে এক যুগ বলে। ঐ পাঁচ বর্ষের প্রথমের নাম সংবৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর, তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর, পঞ্চম যুগবৎসর। ইহার এক একটির উল্লেখ দ্বারা ঐরূপ যুগের গত ও অনাগত অংশ নিরূপিত হয়।

পঞ্চবর্ষাপেক্ষা দীর্ঘতর যুগকাল সকলও আছে। যথা সৌরযুগ। অষ্টাবিংশতি সংখ্যক সৌর-বৎসর যাবৎ প্রতি সৌরদিনে রবি সোমাদি ক্রমে যে যে বার একবার সংঘটিত হয়, সেই সমস্ত বারের ঐ অষ্টাবিংশ বর্ষব্যাপী ভোগ কালের অন্তে পুনর্ব্বার তত্তুল্যকাল যাবৎ একাদিক্রমে সেই সেই সৌরদিন ভোগ হইয়া থাকে। অতঃপর চন্দ্রেরও এক প্রকার যুগ আছে। প্রত্যেক ঊনবিংশতি বর্ষ যাবৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঊনবিংশ বর্ষের অনুরূপ সমান তিথি সকল একাদিক্রমে সমান সৌরদিনে উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই প্রণালিতে বার তিথি মাস ঋতু সম্বৎসর এক এক নিয়মিত কালকে অধিকার পূর্ব্বক কালচক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এবং পরস্পর যোগবদ্ধ হইয়া বর্ষে বর্ষে বা নিরূপিত যুগ-বর্ষে বার-বার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অনাদি কালচক্রের মধ্যে প্রত্যেক গ্রহ, নক্ষত্র, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে।

কোন কোন গ্রহতারা কতিপয় দিনে, কোন কোন গ্রহাদি কতিপয় মাসে, কোন কোন গ্রহ নক্ষত্র কতিপয় বর্ষে, কোন কোনটি সহস্র সহস্র বর্ষে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে নিজ নিজ বর্ষ পরিক্রম করিতেছে।

যেমন গ্রহতারাগণ কালচক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেই রূপ সেই পরিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরমায়ুও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কেননা প্রকৃতিই সকলের উপাদান। কোন পদার্থ তাহাকে চিরকাল একভাবে ভোগ করিতে পারে না; কোন পদার্থে উহা চিরদিন সমান ভাবে থাকে না। পদার্থের দেহ, গঠন, গতি সমুদয়ই প্রকৃতির বিকার। কি গ্রহ-নক্ষত্রের, কি পার্থিব ভৌতিক পদার্থের, কি জীবদেহের সকলেরই সমান ভাব। কেবল পরমায়ুর স্বল্পতা ও দীর্ঘতা, পরিবর্ত্তনের শীঘ্রতা বা বিলম্ব মাত্রে ভেদ। এই রূপ পরিবর্ত্তন সকল যেমন জড় পদার্থে লক্ষিত হয়; যেমন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহতারাগণের মধ্যে কার্য্য করে; যেমন তরু লতা ঔষধিতে দৃষ্ট হয়; যেমন প্রকাণ্ড গজরাজ, সিংহ, ও মনুষ্যাদি দেহে প্রবাহিত হয়; সেই রূপ মানবের শুভাশুভ ভোগ শক্তিতেও ভোগ্য পদার্থের শক্তিতে সংঘটিত হইয়া থাকে। মানসিক শক্তি, বুদ্ধির বল, ধর্ম্মের ভাব, জ্ঞানের দীপ্তি প্রভৃতি আন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও কালে কালে বিস্তর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। যখন ব্যষ্টি নর-স্বভাবে অল্প দিনের মধ্যে বিস্ময়-কর পরিবর্ত্তন সকল দৃষ্ট হয়; তখন সমষ্টি-নরস্বভাবে,—সমষ্টি মানবজাতির জ্ঞান, ধর্ম্মে—দীর্ঘকালান্তে যে আরো বিস্ময়-জনক পরিবর্ত্তন সকল দেখা দিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহনক্ষত্রের গতি সংক্রমণ এবং তাহাদের রাশিচক্র ও বর্ষ যুগাদি ভোগের যথার্থ কাল নিরূপণ করিয়াছেন, উক্ত গ্রহ নক্ষত্রগণের পরমায়ুকাল নির্ণয়পক্ষে সেরূপ ক্ষমবান্ হন নাই। মানবের ভোগশক্তি, মানসিকশক্তি, জ্ঞানধর্ম্ম প্রভৃতি পৃথিবীর কত বয়ঃক্রমকালে, কি আকারে, পরিবর্ত্তিত হইবে তাহারও স্থির সিদ্ধান্ত করা গণিত-শাস্ত্রের অধিকার-ভুক্ত নহে। কিন্তু সকলের অন্তরে ইহা বিশদ রূপে অনুভূত হইতেছে, যে, তাহার কিছুই চিরকাল একভাবে যাইবে না। চন্দ্রকলার ও সাগরবেলার হ্রাসবৃদ্ধির ন্যায় মানব সমাজের ভোগ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, বীর্য্য, জ্ঞান, ধর্ম্ম কিছুদিন উন্নত এবং কিছুদিন অবনত হইবে। উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পর উন্নতি চক্রবৎ বর্ত্তনশীল। ইহা

স্বাভাবিক তাহা সকলেই জানেন। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যেমন জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বলে পৃথিবী ও গ্রহতারাসমূহের গতি পরিক্রমাদির কালসংখ্যা স্থির করিয়াছেন; সংসারতত্ত্বসন্ধিৎসু, ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয়বৃদ্ধিদর্শী ভোগশক্তি ও ভোগ্যধর্ম্ম-চিন্তক মহাপুরুষেরা সেইরূপ একটি উপায়দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম, মানসিক শক্তি, ও শুভাশুভ ভোগ সম্বন্ধে ক্ষয় ও বৃদ্ধি কালের নিরূপণার্থ ব্যগ্র হইয়া থাকেন। এ সমস্ত তত্ত্ব-রাজ্যে একাল যাবৎ জগতে ঘোরতর পরিবর্ত্তন সকল হইয়া আসিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের মধ্য হইতে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম ও ভাবী-পরিবর্ত্তন সকল সংঘটনের ঋতুকাল, তাহার আগমনের অবশিষ্টকাল, আগমন সময় হইতে তাহার স্থিতিকাল এবং তাহার লক্ষণ প্রভৃতি নিরূপণ করণার্থ ঐরূপ দূরদর্শীগণ এই পৃথিবীতে চিরকালই কোন না কোন প্রকার যত্ন করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেক গণনাও সফল হইয়াছে। যাঁহারা এই প্রকারের সার্ব্বভৌমিক গণনা সকল করেন, অন্যান্য দেশে তাঁহাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা কহে, এ দেশে তাঁহারা যোগী বা ঋষি বলিয়া উক্ত হন। প্রত্যুত সেরূপ গণনা সকল এ দেশে পুরাণ শাস্ত্রের মধ্যে আছে এবং তাহা সনাতন বাক্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মানব সমাজের শুভাশুভ ভোগকাল, জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির কাল, ভোগ ও ধর্ম্মের মৃত্যুরূপ চূড়ান্ত ক্ষয়কাল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও ভোগ ক্ষেত্র স্বরূপ পৃথিবীর ক্ষয়কাল, ভোগদায়িনী প্রকৃতির ক্ষয়কাল, শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগের স্থানস্বরূপ স্বর্গাদিলোকের ক্ষয়কাল,—শাস্ত্রানুসারে এই সমস্ত তত্ত্ব পরস্পর সম্বন্ধ-শৃঙ্খলে গ্রথিত। শাস্ত্রের বাক্য রাজাজ্ঞার ন্যায় অথবা গুরুর আদেশবৎ। তাহাতে প্রথমত কোন তর্ক স্থান পায় না এবং কোন বাহ্য যুক্তি উদ্ভাবনের আজ্ঞা নাই; সুতরাং শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তি ব্যতীত শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝা দুঃসাধ্য।

শাস্ত্রের নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে, জীবগণের অনাদি অনির্ব্বচনীয় কর্ম্ম বীজরূপী অজ্ঞান প্রকৃতি জীবের ভক্তৃত্ব কর্তৃত্বরূপ মনোবৃত্তির যেমন উপাদান, সেই রূপ তাঁহার কর্ম্মভূমি বা ভোগভূমিরূপ লোকমণ্ডল সমূহেরও উপাদান। অজ্ঞানপ্রকৃতি মূল, মন তাহার সৃষ্ট এক ভাগ, ভোগরাজ্য ও কর্ম্মক্ষেত্র তাহার প্রকাশিত আর এক ভাগ। এই দুই ভাগের মধ্যে মন—সাধক ও ভোগী; সৃষ্টিরাজ্য—উত্তর-সাধক ও ভোগ্য। সমষ্টি দৃষ্টিতে উহার একটির শক্তি যদি ক্ষয় হয়, তবে অন্যটিরও হইবে। মন যদি দীর্ঘ কাল কর্ম্ম সাধন ও কর্ম্মফল

ভোগে পরিশ্রান্ত হইয়া তদনুরূপ দীর্ঘকাল নিদ্রাভিভূত হয়, তবে সৃষ্টিও সেই পরিমাণ কাল যাবৎ লুপ্ত, তমোভূত ও অপ্রজ্ঞাত থাকিবে। ফলে এটি সমষ্টি ভাব। সৃষ্টি ও প্রলয় সমষ্টি ভাবের অনুগত। ব্যষ্টি প্রকৃতির ক্ষয়ে কোন ব্যষ্টি জীবের মৃত্যু হইতে পারে; কেবল তাহারই পক্ষে ভোগরাজ্য অদর্শন হইতে পারে; কিন্তু তখন অনন্তকোটি কর্ম্মী, ভোগী, ও সাধক বিদ্যমান থাকিবে; তাহার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র, ভোগভূমি ও শুভফলপ্রদ স্বর্গরাজ্য উত্তর সাধকরূপে বর্ত্তমান থাকিবে; কিছুই লয় পাইবে না। ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে—কর্ত্তা, ক্রিয়া ও কর্ম্মের মধ্যে—এই শৃঙ্খলা—এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একই প্রকৃতি উভয়ের উপাদান, মূল, কারণ, উদ্ভবস্থান ও লয় স্থান। সেই প্রকৃতি, যখন দীর্ঘ ভোগান্তে স্বীয় সুব্যক্ত-মনাদি-সূক্ষ্ম আকার ও জড়-ব্রহ্মাণ্ডরূপ স্থূল-আকার ভঙ্গপূর্ব্বক পুনঃ অব্যক্তে পরিণত হইবে, তখন মনাদি ইন্দ্রিয়গণ, তাহাদের বাহ্যাবয়বরূপ স্থূল-দেহ এবং ভোগ্য সৃষ্টি সংসার সমুদয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তখন অণ্ডকটাহস্থ সমুদয় গ্রহতারাগণের গতিরোধ হইয়া আসিবে; সূর্য্য নির্ব্বাণ হইবে; স্বর্গ ও পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি ও জল দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন দগ্ধ ও প্লাবিত হইয়া পশ্চাৎ সূক্ষ্ম ভূতের আকার গ্রহণ করিবে, এবং সূক্ষ্মভূত অবশেষে সূক্ষ্মদেহ ও যোগৈশ্বর্য্যের সহিত অব্যক্ত প্রকৃতি হইয়া যাইবে। এইরূপ, প্রকৃতি হইতে সকলের উদয়কাল অবধি, পুনঃ প্রকৃতিতে লয় পর্য্যন্ত যে অননুভবনীয় প্রকাণ্ড দীর্ঘকাল তাহাই এই বিশ্বের পরমায়ু।

ঐ পরমায়ু ক্ষয় হইলে সমগ্র বিশ্বরাজ্য প্রকৃতিস্বরূপ বীজে লীন হইয়া যায়। সেই বীজের ক্ষয় নাই। তাহা জীবের অনাদি কর্ম্ম-বীজ ও ভোগ-বীজ। তাহাই জগৎ সৃষ্টির নিমিত্তে ঈশ্বরের সহকারিণী শক্তি। কিন্তু ঈশ্বরের আরো অনেক পরিমাণশক্তি আছে। সে সম্বন্ধে তিনি সৃষ্টি-সংসারের অতীত।

বিশ্বের প্রাগুক্ত প্রকার পরমায়ুকে প্রাকৃতিক সৃষ্টিকাল এবং তাহার অন্তকে প্রাকৃতিক প্রলয়কাল কহে। তাহার মধ্যে অনেকবার নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া পৃথিবী অবধি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মফল ভোগের প্রদেশ দগ্ধ ও জলপ্লাবিত হয়। তখন স্থূল সূক্ষ্ম ভূতগণ, মনপ্রধান সূক্ষ্মদেহ, এবং মহানাত্মিক যোগৈশ্বর্য্যের ভোগভূমিস্বরূপ ব্রহ্মাভুবন চতুষ্টয় অবশিষ্ট থাকে। প্রত্যেক নৈমিত্তিক সৃষ্টিকালের অভ্যন্তরে অনেকবার যুগ পরিবর্ত্তন হয়।

একবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, হইয়া আবার একাদিক্রমে সেইরূপ হয়। চন্দ্রকলার বৃদ্ধি ও হ্রাসের ন্যায় ধর্ম্ম, মানসিকশক্তি, ভোগ সুখ, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতির স্বাভাবিক ও সাময়িক বৃদ্ধি ও হ্রাসই সেই সব যুগপরিবর্ত্তনের হেতু। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি, মতি, ভোগ, বীর্য্য প্রভৃতি কতদিন উন্নত থাকিবে, কতদিন পরে কি পরিমাণ হ্রাসাবস্থ হইয়া থাকিবে, ক্রমে কতদিন পরে একেবারে অবনত হইয়া আবার উন্নতির পথবর্ত্তী হইবে, এই সকল গণনার দ্বারা যুগের নির্ণয় হয়। যুগ নির্ণয় পূর্ব্বক এমন একটি শেষ যুগের লক্ষণ লক্ষিত হয়, যাহার পর প্রলয় ব্যতীত পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভোগ ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি প্রকৃতিস্থ বা উন্নতির পথস্থ হইতে পারে না। এই কালটির গণনার দ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয়-কালের অর্থাৎ কল্পকালের পরিমাণ নির্ণীত হয়। অল্পকাল নির্ণয় হইলে তদন্তর্গত ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভোগ প্রভৃতির সাধারণ প্রকৃতিগত ক্ষয় এবং ব্রহ্মভুবনের ভোগ্য যোগৈশ্বর্য্যের বিশেষ বিনাশ সম্ভাবনা অনুভূত হয়। তাদৃশ ভোগাদির, বিশেষত যোগৈশ্বর্য্যের ক্ষয়কালের গণনাই বিশ্বের পরমায়ুর গণনা। এই সমস্ত গণনা জ্যোতিষ অথবা সামান্য গণিত বিদ্যার অন্তর্গত নহে। সে সকল বিদ্যা দ্বারা তাহার সত্যতা প্রমাণ করা যায় না। যাঁহাদের গণনাশক্তি তাদৃশ বিষয়-বিদ্যার মধ্যে বিচরণ করে, ঐ সমস্ত মহাগণনার রস তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না। কেবল যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন যোগিগণ উহার মর্ম্ম জানেন, এবং সাধারণত ভারতীয় শাস্ত্রের প্রভাব যাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহাদের তাহাতে কোন বিপ্রতিপত্তি নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

খড়্গপুর।

বাসন্তী পূজা।

মিলনে সৃজন—অমিলনে লয়,
বিজ্ঞানের এই মহামন্ত্রদ্বয়,
গাইতেছে বিশ্ব সকল সময়,
সৃজন লয়ে,
শকতি সৌন্দর্য্য মিলনে বিকাশ,
অমিলনে মহা ঘোর সর্ব্বনাশ,
উন্মত্ত প্রকৃতি করে হা হুতাশ!
বিনাশ ভয়ে!

যামিনী মিলনে হাসে শশধর,
শশীর মিলনে তারকা সুন্দর,
তেমনি আবার মিশে চারুতর
তারকা নভে,
দূরে—অতিদূরে—দিক্‌দিগন্তরে
যেখানে যে আছে বিশ্ব চরাচরে
কেমন সুন্দর মিশে পরস্পরে,
হাসিছে সবে!

অরুণ উদয়ে উষা, আগমনে,
নবজীবনের মৃদু আন্দোলনে,
পরশ কোমল প্রভাত পবনে,
সুরভিশ্বাসে,
তরু লতিকার শ্যামল শোভায়,
কুসুমের মধুমাখা সুষমায়,
কোমল অলক্ত অরুণ আভায়,
প্রকৃতি হাসে!

আবার—
মিশি বাষ্পরাশি জলদে গর্জ্জিয়া,
কালান্তে অনলে বিশ্ব পুড়াইয়া,
গ্রহ উপগ্রহ ছুড়িয়া ফেলিয়া,
তুফানে ঝড়ে,
কি মহান্ এক করি হুলস্থূল
নাচে ধ্বংসমূর্ত্তি উলঙ্গ বাতুল,
ভয়ে আশঙ্কায় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাকুল,
ত্রাসে শিহরে!

প্রকৃতির যেন মহান্ শ্মশান—
পাতাল পৃথিবী ব্যাপিয়া বিমান,
অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গ পূর্ণ চিতাস্থান
করিছে ধূধূ!
শকুনী গৃধিনী টানে না শব,
শৃগাল কুকুরে করে না রব,
সকলেই মৃত—সকলি নীরব,
ঘোর অট্টহাসে হাসিছে ভৈরব
প্রলয় শুধু

দেবগণ—
বুঝেছিল এই শকতির বল,
বুঝেছিল সুধা কেবলি বিফল,
বুঝেছিল বজ্র নিতান্ত দুর্ব্বল
অসুর নাশে,

ঐরাবত হস্তী উচ্চৈঃশ্রবা হয়,
মিছে কল্পতরু, কেহ-কিছু নয়,
বৃথাই নন্দনে মন্দার নিচয়
ফুটিয়া হাসে!

বুঝেছিল ইহা সকল দেবতা
কিসে অমরের রবে অমরতা,
কিসে কি করিয়া মরমের ব্যথা
হইবে দূর,
বরুণের পাশ বৃথা অহঙ্কার
কৃতান্তের দণ্ড নিতান্ত অসার,
চক্র সুদর্শনে কখনো না আর
মরে অসুর।

অলকার ধন তেমনি বিফল,
তেমনি কৌস্তুভ মণি সুবিমল
দৈত্য-দাসত্বের পদক উজ্জ্বল
দেবের গলে,
পারিল না আর সহিতে অমর,
যে যেখানে ছিল, মিশিল সত্বর,
ইন্দ্র চন্দ্র যম বায়ু বৈশ্বানর
সুর সকলে।

সুপ্ত মহাশক্তি করিলা বোধন,
কোটি হস্ত ঊর্দ্ধে করি উত্তোলন
কোটি কণ্ঠে করি গভীর গর্জ্জন
বিদারি ব্যোম;—
হাসিলা চণ্ডিকা ঘোর অট্টহাস,
তীব্র জ্যোতিঃপুঞ্জ হইল বিকাশ,
নিবিল অনল বিজলী বিভাস
তপন সোম!

আগ্নেয় অচল গগন পরশি
দাঁড়াইলা যেন শক্তি মহিয়সী,
গদা শেল শূল ভিন্দিপাল অসি
শোভিল করে।
ক্রোধে রক্তাধর করিলা দংশন,
নয়ন কালাগ্নি কৈল উদ্গীরণ,
প্রতি রোমকূপে বিদ্যুত যেমন
উছলে পড়ে।

ধরা যেন হ'ল ভবে টলমল,
ভয়ে উথলিল সপ্তসিন্ধু জল,
সভয়ে কাঁপিল অষ্ট মহাচল
চরণভরে।
ঊর্দ্ধ যোড় করে মুনি ঋষিগণ
কেহ ধ্যানেরত মুদিয়া নয়ন,
কেহ যোগাসনে করিলা স্তবন,
কাঁপিয়া ডরে!

ভাই ভাই তুমি মিলিয়ে তেমন,
পার না কি কভু করিলে যতন,
সুপ্ত মহাশক্তি করিতে বোধন?
পার না তুমি?
পারনা সে তুমি আর্য্য কুলাঙ্গার
নিবারিতে হায় দৈত্য-অত্যাচার?
পার না সে তুমি করিতে উদ্ধার
ত্রিদিব ভূমি?

দেবতার মত হ'য়ে একপ্রাণ,
নিজ নিজ তেজ করিয়ে প্রদান
কর মহিয়সী শকতি নির্ম্মাণ
মিলি সকলে,

সিংহের গরাসে মহিষ অসুর,
হীনবীর্য্য আজ যবন নিষ্ঠুর,
দেখিবে উভয়ে লুটিতে দেবীর
চরণ তলে!

নিরখি সে মূর্ত্তি ভীমা ভয়ঙ্করী,
উদ্দাম আগ্নেয় আনন্দ লহরী,
জয়দা যশোদা রাজ রাজেশ্বরী
সহস্র ভুজা,
আরব ইরাণ চীন ম্যাঙ্গোলিয়া
মিশর জর্ম্মেণ ইটালি কষিয়া
আতঙ্কে কাঁপিয়া, ত্রাসে শিহরিয়া,
করিবে পূজা!

ভাই ভাই তুমি মিলিয়া তেমন,
পার না কি কভু করিয়া যতন,
সুপ্ত মহাশক্তি করিতে বোধন,
পার না তুমি?
পার না কি তুমি আর্য্য-কুলাঙ্গার
নিবারিতে হায় দৈত্য-অত্যাচার!
পার না কি তুমি করিতে উদ্ধার
ত্রিদিব ভূমি?

অতীত।

"What am I? Nothing."
"Thou the soul of my life"

অতীতই আমাদের হৃদয়ের অমরাবতী। অতীতের সেই মহান পবিত্র মন্দিরের চারি দিকেই সুখের পারিজাত ফুটিয়া আছে। চারিদিকেই প্রেমের অমর ছবি অঙ্কিত। হায়! আজ সে ফুল কে অন্বেষণ করে! কে তার ফুলের হাসির মধ্যে কান্নার নীরব মুমূর্ষ দাহ দেখিতে যায়! কে তাহার ছবির দিকে চায়! কেন? কে জানে কেন, এখানে এই রূপ হয়। তুমি নাই। আজ তুমিও সেই মৃত স্মৃতির নিস্তব্ধ সমাধি গৃহের অতিথি। আজ তুমি জ্যোতির্ময়ী, অনন্তস্বরূপিণী। আজ তুমি আমার সব। আজ তুমি ফুলের গন্ধ ও চাঁদের জ্যোৎস্নার মতন অতীতের অনন্ত রাজ্যে বিরাজিত। তোমার স্নেহ কটাক্ষে সমস্ত অতীত পূর্ণ আলোকিত। আজ আমি সে আলোর হৃদয়ের সিংহাসনের উপর বসিয়া দেখিতেছি, যে, অনন্তের ক্রোড়ে মানুষ মৃত্যুর হাত ধরিয়া যায়। মৃত্যু কি? মৃত্যু অনন্ত জীবনের একমাত্র পথ প্রদর্শক।

অতীত—তুমি, তুমি—অতীত। আজ বর্ত্তমানের এই শূন্য অলিন্দে স্মৃতির হাত ধরিয়া তোমার সেই—রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তির পূর্ণ ছায়া দেখিতে পাই। দেখিতে পাই—তোমার সেই মূর্ত্তির চারিদিকে কত পুরাণো কথা, কত পুরাতন গান, জীবনের কত পুরাতন দিন, ঝরে পড়া কত স্নেহ, গীত-গানের স্মৃতির মতন হাসি-অশ্রু-মাখা কত আদরের মুখ, নিশীথের হৃদয়-উন্মত্তকরী পুস্তিকা পাঠের কত গভীর সুখ দুঃখ—এক একটি রাগিণীর মত বিরাজ করিতেছে। বর্ত্তমানের নিস্তব্ধ অন্তঃপুরে অবিরাম ঐ সকল মিশ্রিত রাগিণীর অভিনয় হইতেছে।

কি চমৎকার! অতীতের বাসরঘর শ্মশানের উপর গঠিত! সে বাসর-ঘরের পুরোহিত মৃত্যু স্বয়ং। অতীত—অতীতের প্রত্যেক কথা এক একটি নন্দনকানন। অতীত কি? তা' কি বলিব। অতীতের ভাষা নাই। অতীত বুঝিতে পারি; কিন্তু বুঝাইতে পারি না। বুঝি, অতীতের কথা স্মরণ করিয়াই প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের সহিত বলিয়াছেন যে, "অতীত কালের সংখ্যাতীত মৃত মানুষের প্রেমে পৃথিবী আচ্ছন্ন; সমস্ত নগর গ্রাম কানন ক্ষেত্রে বিস্মৃত মনুষ্যের প্রেম শত সহস্র আকারে শরীর ধারণ করিয়া আছে, শত সহস্র আকারে বিচরণ করিতেছে; মৃত মনুষ্যের প্রেম ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে; আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উত্থান করিতেছে। আমরাও সেই মৃত মনুষ্যের প্রেম,—নানা ব্যক্তি আকারে বিকশিত।" আর আজ কতদিন হইল, শেলীর হৃদয়ের বাঁশী এই গান গাহিয়াছিল—

> Forget the dead, the past? Oh yet
> There are ghosts that may take revenge for it!

আজ সে-শেলী নাই! কিন্তু আমি ঐ গান, ঐ প্রেম এবং ঐ স্মৃতির হৃদয়ের মধ্যে শেলীকে দেখিতেছি। আজ—গান—প্রেম—স্মৃতি—শেলী একই। একটি ফুল হইয়া অতীতের মধ্যে ফুটিয়া আছে। কি স্বপ্নময় মধুর মিলন!

চিন্তাশীল কবি রবীন্দ্রনাথ "পুষ্পাঞ্জলির" এক স্থানে লিখিয়াছেন, যে "বাগানে এই যে বহুবৃদ্ধ বকুল-গাছটি দেখিতেছ—একদিন কোন্ সকাল বেলায় কি সাধ করিয়া কে একজন রোপণ করিতেছিল—সে জানিত সে ফুল তুলিবে, সে মালা গাঁথিবে; সেই মানুষটি শুধু নাই, সেই সাধটি শুধু নাই, কেবল ফুল ফুটিতেছে আর ঝরিয়া পড়িতেছে। আমি যখন

ফুল সংগ্রহ করিতেছি, তখন কি জানি কাহার আশার ধন কুড়াইতেছি, কাহার যত্নের ধনে মালা গাঁথিতেছি!" মানুষ নাই সত্য কথা বটে। কিন্তু সাধ আছে। তার যত সাধ সেই গাছটির প্রাণের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে। তার সাধ-বারি-বর্দ্ধিত বলিয়াইত সে ফুল আমাদের এত আদরের। আর তোমার জন্যই ত সে ফুল ঝরিয়া পড়ে। তোমার উপরইত সংগ্রহের ভার।* সেই বকুল গাছইত তাহার পুরাতন স্বামীকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে। সে যে, সেই বকুল গাছটিকে—আপনার সর্ব্বস্ব—দিয়া গিয়াছে। সেই বকুলের ফুলের মধ্যে কি তুমি তাহার গন্ধ পাও না? তাই বলি, অতীতের সঙ্গে কাহারও কোন মিল নাই এ কথা বলিতে পারি না। অতীতকে সরাইতে পারি না। অতীত চিরকাল থাকিবে। তাহার সাধও চিরকাল থাকিবে। শেলী—ফুল কোনকালে শুকাইবে না। উহারা অমর।

বড় আশার কথা। বড় সুন্দর দৃশ্য। দেখিতেছি—আমার অতীতের নিকুঞ্জ-কাননে তোমার জীবন্ত হাসি-ফুল-রাশি আজিও তেমনি ভাবে হাসিয়া সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে। বর্ত্তমানের এই ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে অতীতের অদৃশ্য-গৃহ হইতে স্মৃতির সৈকত দিয়া তোমার আলো আসে। সে আলো, স্বর্গের আলো। সে আলো অতীত হইতে উৎপন্ন হইয়া দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের হাতে তোমার আলো এক গাছি মালা। অতীত, সে মালা ভবিষ্যতের গলায় পরাইয়া দিয়াছে। অতীত ও ভবিষ্যৎ, সেই আলোর মালা লইয়া মালা বদল করিয়াছে। বড় সুন্দর—বিরহ-মিলন-বিবাহ বড় সুন্দর।

আবার আমার এই অতীতের মাথার উপর কত শত লোকের কত অতীতই জাগিতেছে! আমার অতীত—আজ আমার অতীত—সেই সব অতীতের কেন্দ্রস্থল। আজ আমার অতীত হইতে বিসের এক তরঙ্গ উঠিয়া সমস্ত অতীত তরঙ্গায়িত করিয়াছে। সেই তরঙ্গের বৈদ্যুতিক গতিতে অতীতের সেই প্রকাণ্ড জগৎ হইতে কত শত সুখের হৃদয়, কত আত্মশূন্য প্রেম, কত মিলনের নিস্তব্ধ ভাব, কত জীবনের শারদীয় পৌর্ণমাসি,

---

* Thine are these early wilding flowers,
Though garlanded by me.
Shelley.

পূর্ণ-আশার কত বৈচিত্র্যময় সুখ কল্পনা, কত সৌন্দর্য্য, নৈশ সমীরণে গবাক্ষে বসিয়া দুইটি অকপট হৃদয়ের কত অস্ফুট কথাও কত—সেই,—

"I, Beyond the limit of all else in the world,
Do love, prize, honour you!"

—উৎফুল্লহৃদয় আমার অতীতে, অতি ধীরে ধীরে মিশিতে মিশিতে কত শত সুখের তারা হইয়া ফুটিতে লাগিল। কত সুখ—সুখের বসন্তে কি চির-জাগরণ। এই জন্যই অতীতের এত পক্ষপাতী। সেখানে বিচ্ছেদ নাই। মিলনের চির রাজত্ব।

অতীতকে ছাড়িয়া আমরা কতক্ষণ থাকিতে পারি? এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না। আমরা ত অতীতের মধ্যেই বাস করিতেছি। বর্ত্তমান যে, এক মুহূর্ত্তও নয়। আর অতীতের জীবন অনন্ত কাল ব্যাপিয়া। অতীত না থাকিলে বর্ত্তমানকে কে মানুষ করিত? বর্ত্তমানের প্রতি মুহূর্ত্ত অতীতের ক্রোড়ে জাগ্রত। অথবা অতীত ও বর্ত্তমানের পার্থক্য কোথায়? বর্ত্তমান অতীতে জন্মিয়া আবার অতীতে মিশিতেছে। সময়ের অনন্ত স্রোতে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের তারতম্য কোথায়! অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, কেবল কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দের সমষ্টি। ইহাদের কোন বিশেষ গুণ নাই। ঠিক কথা। কালের একটানা সূত্রের মধ্যে অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের কোন বিচ্ছেদ গ্রন্থি দেখি না। এই চির প্রাচীন ভুবনমণ্ডলের শশীত আজও নবীন; অতীত—তুমি—তুমিও আমার চির-নবীন শশী।

এস তবে বাঞ্ছিত, এস আজ অতীতের পৃষ্ঠে তোমার নবজীবন প্রতিষ্ঠা করি। সেই আমার সুখ। সেই আমার শান্তি।

——oo——

উদ্ভট কথা।

দ্বিতীয় শাখা।

Ordinary history is traditional; higher history is mythical; highest history is mystical.

সামান্য ইতিহাস শ্রুতি-স্মৃতি-মূলক; উচ্চতর ইতিহাস পৌরাণিক বিবরণ মূলক; এবং উচ্চতর ইতিহাস আধ্যাত্মিক রহস্য-মূলক।

কাব্য সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ বলা যাইতে পারে। সামান্য কবিতা (স্বভাব) বর্ণনাময়ী; উচ্চতর কবিতা (আদর্শ) কল্পনাময়ী; উচ্চতম কবিতা (আধ্যাত্মিক) রহস্যময়ী।

ইতিহাস ও কাব্যের এইরূপ ক্রমোত্থিত স্তরে স্তরে—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এবং আধ্যাত্মিক ভাব যিনি না বুঝিয়াছেন, তিনিই ইতিহাস ও কাব্যে সত্য মিথ্যার প্রভেদ আরোপ করিয়া অনর্থক গণ্ডগোল করেন; তিনি শ্রেষ্ঠতম ইতিহাস ও শ্রেষ্ঠতম কাব্য কি, তাহা আপনিত বুঝেনই না, কাজেই অন্যকেও বুঝিতে দেন না। বাস্তবিক ইতিহাসে ও কাব্যে কোন রূপ ভাব-অভাব ভেদ নাই। দুইটিতে কোথাও পাশাপাশি থাকিয়া, কোথাও গলাগলি করিয়া, কোথাও মেশামেশি হইয়া,—ভাব-রহস্যময় বিশ্বের বিবরণ প্রদান করে।

তবে কি বর্ণনা ও কল্পনা একই বৃত্তি? না কখনই নহে। তবে উহার একটিও মিথ্যা নহে। আর ইহা সচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে, যদি নিকৃষ্ট মানবে বর্ণনা অধিকতর ফল-দায়িনী হয়, তবে শ্রেষ্ঠতর মানবে কল্পনা অধিকতর ফলদায়িনী। অন্তত সংসারধর্ম্মের সামান্য কার্য্যে—উভয়েই সমান কার্য্যকরী।

কিরূপে তাহা দেখাইতেছি। পাঁচটা দেখে শুনে একটা স্থির করাকে অন্বীক্ষণ বলা যায়। এই অন্বীক্ষণের উপর মনুষ্যজীবনের ষোল আনা নির্ভর করে বলিলেও চলে। এখন দেখা যাউক, কিরূপ সাধনে, কিরূপ সোপানে অন্বীক্ষণ হয়, এবং তাহাতে কেবল ঘটনার বর্ণনাই থাকে, না কল্পনার সাহায্যও লইতে হয়। আমরা দেখাইতেছি, যে বর্ণনা ও কল্পনা উভয়ে না মিলিলে অন্বীক্ষণ হয় না।

পড়িয়াছি, শুনিয়াছি;—

রামলক্ষ্মণাদি মরিয়াছেন,
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনাদি মরিয়াছেন,
হানিবল, সীজর, নেপোলিয়ানাদী মরিয়াছেন,
পিতামহ পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা মরিয়াছেন,
আরও কত কোটি কোটি লোক লোক মরিয়াছেন;—শুনিয়াছি।

দেখিয়াছি;—

প্রতিবাসী মধ্যে শতজন মরিয়াছেন,
পরিবার মধ্যে দশজন মরিয়াছেন;

অতএব, সকল লোকই মরে। ইহাই অন্বীক্ষণ।

রাম লক্ষ্মণের মৃত্যু হইতে, পরিবারস্থ ব্যক্তি বর্গের মৃত্যু পর্য্যন্ত—সমস্তই ইতিহাসের বিষয়ীভূত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি; কিন্তু ইতিহাসকে ত ঐপর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে। উনি মরিয়াছেন, তিনি মরিয়াছেন, সে মরিয়াছে, উহারা মরিয়াছে;—ইতিহাসের ইহার অধিক আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার উপায় নাই। তখন কল্পনা আসিয়া বলিয়া দেয়, অতএব সকল লোকই মরিবে। সুতরাং ঘটনায় ও কল্পনায় মিলিত না হইলে অন্বীক্ষণ হয় না। কল্পনা না আসিলে অন্বীক্ষণের ঐ 'অতএব' কখনই আসিতে পারিত না। কিন্তু কল্পনামূলক বলিয়া অন্বীক্ষণের সিদ্ধান্ত,

মিথ্যা,—একথা কখন কেহ বলেন না। অন্বীক্ষণ সত্য, পরম সত্য, অথচ একান্তই কল্পনামূলক। আমরা সকলেই নিত্য জীবনে প্রতি নিয়তই অন্বীক্ষণের উপর সুতরাং কল্পনার উপর নির্ভর করিতেছি। দেখুন, আমরা উদ্ভট কথার প্রথম শাখায় যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক কিনা। আমরা বলিয়াছি, যে অনেকে আপন আপন মনের খানাতল্লাসী করেন না বলিয়াই, কল্পনাকে মিথ্যা-প্রসবিনী বলিয়া অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন।

বিচিত্র দেখুন, যাহাকে ইংরাজিতে বা বাঙ্গালায় (circumstantial evidence) ঘটনামূলক প্রমাণ বলে, বাস্তবিক তাহা কল্পনামূলক মাত্র। বর্ত্তমান ঘটনা এই যে, ভবেন্দ্র কাটা পড়িয়াছে। পূর্ব্ব ঘটনা এই যে, উপেন্দ্রের সহিত তাহার শত্রুতা ছিল; এক সময়, উপেন্দ্র যে চুপে চুপে ভবেন্দ্রের ঘরে গিয়াছিল, তাহা একজন দেখিয়াছিল। তাহার এক ঘণ্টা পরে, ত্রস্ত ভাবে বাহির হইয়া যায়, আর একজন দেখিয়াছে। বাড়ীতে গিয়া সে কাপড় ছাড়ে, তাহার চাকরাণী বলিতেছে। সেই ছাড়া কাপড়ে রক্তের দাগ আছে, এখনও দেখা যাইতেছে। অতএব উপেন্দ্র ভবেন্দ্রকে কাটিয়াছে। এই অতএবও কল্পনার কথা। ইতিহাসের ওকথা বলিবারই অধিকারই নাই। সুতরাং যাহাকে আমরা ঘটনামূলক প্রমাণ বলি, তাহা অংশত কল্পনা-মূলকও বটে।

অন্বীক্ষণ বা অনুমান এবং প্রমাণ যে রূপ অংশত ঘটনা-মূলক, (Theory বা) দার্শনিক মতবাদও সেই রূপ। বিজাতীয় বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ অগস্ত কোমৎ তাহা পরিষ্কার রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সূর্য্যকে কেন্দ্রস্থ করিয়া গ্রহ উপগ্রহাদি নিয়ত আকাশ মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণের এই মত-বাদের, কল্পনা হইতেই উদ্ভাবনা এবং কল্পনাতেই ধারণা। কেবল জ্যোতিষী গণনা হইতে ওরূপ সিদ্ধান্ত আসে না। গ্রহগণের স্ফুট গণনা প্রাচীন কালেও ছিল; বিশেষ সূক্ষ্মতম গণনা না থাকিলেও, অনেকটা সূক্ষ্ম গণনা ছিল। অথচ পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদগণ, সূর্য্যকেন্দ্রের সিদ্ধান্ত করেন নাই। চোখে দেখিতেছি বটে, যে সূর্য্যের দৈনন্দিন উদয়াস্ত হইতেছে, বুধ শুক্রের বক্রগতি, শনির শনৈঃ শনৈঃ গতি হইতেছে; পৃথিবী স্থিরা অচলা; কিন্তু কল্পনা বলে ভাবিতে হইবে, যে সূর্য্যই ইহাদের কেন্দ্রীভূত, এবং এই সাগরাম্বরা তুষার-স্তূপ-কিরীটিনী বিশাল ধরণী, অন্যান্য গ্রহগণের সহিত নভোমণ্ডলে বিচিত্র চক্র কক্ষে নিয়ত ভ্রাম্যমানা। মহাকবির মহীয়সী কল্পনার আশ্রয় না পাইলে, ঐ বিকট বিচিত্র সুন্দর সিদ্ধান্ত আমরা ধারণাই করিতে পারি না। অতীত সাক্ষী ইতিহাস এখানে ক্ষুদ্রপ্রাণ হইয়া অগ্রসর হইতে পারে না; জড় বিজ্ঞান বিঘূর্ণিত মস্তকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে; তখন রহস্যময়ী কল্পনা, তাহার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া সূর্য্যকেন্দ্র সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করেন। তখন বিজ্ঞান কল্পনাকে প্রণিপাত করেন, কল্পনা বিজ্ঞানের শিরচুম্বন করেন। ইতিহাস এই অপূর্ব্ব মিলনের সাক্ষী হইয়া থাকে।

আবার আর এক দিক দিয়া কাব্য ইতিহাসের গৌরব বুঝা যাইতে পারে।

সচরাচর শুনা যায়, যে, ইতিহাস (Real বা) ঘটনা-মূলক এবং কাব্য (Ideal বা) ভাবমূলক। এবং সেই জন্য কাব্য অপেক্ষা ইতিহাস অনেক কার্য্যকর; কেননা কাজের কথা লইয়াই সংসার; ভাবের কথা শৈশবের খেলাধূলা, যৌবনের মোহলীলা, এবং স্থবিরের দুরাশা মাত্র। আমরা বলি, এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

যাহা (Real বা) প্রকৃত তাহা ক্ষণস্থায়ী সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু যাহা (Ideal বা) পরাকৃত তাহা নিত্য সুতরাং অভঙ্গুর। প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীলা; পরাকৃতি স্থিরা অচলা।

মুখুয্যেদের মেঝো বৌ বড় সতীলক্ষ্মী; স্বামী,-শ্বশ্রূ,-সংসার-সেবায় দিনযামিনী যাপন করে। এত যে খাটুনি, এত যে টানাটানির সংসার, তবু মুখে কথাটি নাই, কিন্তু গোলাপি হাসিটুকু মুখে লাগিয়াই আছে। মেঝো বৌয়ের প্রশংসা প্রতিবাসীর মুখে ধরে না; মেঝোবৌয়ের প্রশংসা করিবার সময় তোমার মুখে খৈ ফুটিতে থাকে। অথচ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী দ্বিরাগমন যাত্রার পূর্ব্বে যখন তোমায় আসিয়া ধীরে ধীরে প্রণাম করিল, তখন তুমি তাহাকে 'এসো মা, সাবিত্রীর সমান হও,' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে। কৈ 'মুখুয্যেদের মেঝোবৌয়ের মত হও,' এ কথা ত বলিলে না! আমরা সকলেই এইরূপ করি।

মেঝোবৌ যতই কেন প্রশংসনীয়া হৌন না, তিনি প্রকৃত মানবী বৈ ত নন; লুকান ছাপান, কোন না কোন খুঁত ত থাকিতে পারে; দুই দিনে দশ দিনে, দশ বৎসরে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তনত হইতে পারে। কিন্তু সাবিত্রীর পরাকৃতি; তাহাতে ত কোন খুঁত থাকিবার সম্ভাবনাই নাই; আর পরিবর্ত্তন - তাহাও অসম্ভব। আশীর্ব্বাদ করিবার সময় কাজেই সাবিত্রীর উল্লেখ করাই ভাল।

অবশ্য আমরা কেহই এরূপ বিচার বিতর্ক করিয়া আশীর্ব্বাদ করি না। কিন্তু আমরা ইতিহাস প্রদত্ত চরিত্র অপেক্ষা কাব্য-সৃষ্ট চরিত্রের কার্য্যত যে অধিকতর গৌরব করি, তাহা নিশ্চয়। তবে আবার ঘটনার আদর, ভাবের অনাদর করির কেন? আবার বলি, যাহারা ভাব ভাবিতে জানে, কল্পনায় যাহারা আদর্শ-চিত্র সুন্দররূপে ধারণা করিতে পারে, এরূপ সভ্যতর মানবের কাছে বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনাই গরীয়সী। আমাদের চিত্তে ও চরিত্রে ঐ কথাই প্রমাণ হয়।

নবজীবন।

২য় ভাগ } বৈশাখ ১২৯৩। { ১০ সংখ্যা।

ঋগ্বেদের দেবগণ।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। আচার ব্যবহার ও সভ্যতা।

পূর্ব্বের পাঁচ প্রস্তাবে আমরা ঋগ্বেদের দেবদিগের সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি। ঋগ্বেদের সময়ের হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও সভ্যতার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি প্রস্তাবের ভিতর দেওয়া অসম্ভব। কেবল দুই একটি অতি জ্ঞাতব্য বিষয়ে দুই একটি মাত্র কথা আমরা বলিতে পারি।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমে সিন্ধুনদীতীরে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, এবং সিন্ধুর শাখানদীগুলির তীরে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে নিবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উপনিবেশের চারিদিকে অনার্য্য-অসভ্য জাতিগণ তখনও অরণ্যে বাস করিত, এবং আর্য্যদিগের সহিত সর্ব্বদাই ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হইত। ঋগ্বেদের শত শত স্থানে এই অনার্য্যদিগের শত্রুতা বিষয়ের উল্লেখ আছে, ঋষিগণ ইন্দ্রাদি দেবকে দস্যুদিগের বিনাশ সাধন জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। কালক্রমে সবলবাহু আর্য্যগণ আপনাদিগের উপনিবেশ বিস্তৃত করিতে লাগিলেন, অগ্নিদ্বারা অরণ্যদাহ করিয়া ক্রমে কৃষি বিস্তৃত করিতে লাগিলেন, আপনাদিগের গো মেষ ও অশ্ব সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন গ্রাম নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে আধুনিক পঞ্জাব হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষ জয় করিয়া তথায়

আর্য্যনগর ও গ্রাম' আর্য্য শিল্পকার্য্য ও আর্য্যকৃষি কার্য্য বিস্তার করিলেন। ক্রমে তাঁহারা সরযুও অতিক্রম করিয়া গেলেন —

"হে ইন্দ্র! তুমি সরযূর অপর পারে অর্ণ ও চিত্ররথকে হনন করিয়াছ।"

৪ মণ্ডল, ৩৬ সূক্ত, ১৮ ঋক্।

এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ খণ্ডে—আর্য্যগণ শত শত গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। ঋগ্বেদে গ্রামের বিষয় অনেক স্থানে উল্লেখ আছে,

"হে প্রভা সম্পন্ন ধনবান্ অগ্নি! তুমি সকলের দর্শনীয়, তুমি পূর্ব্বগামী উষার পর দীপ্ত হও, তুমি গ্রাম সমূহের রক্ষক।"

১ মণ্ডল, ৪৪ সূক্ত, ১০ ঋক্।

"যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হইয়া থাকে।" ১ মণ্ডল, ১১৪ সূক্ত ১ ঋক্।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে অবস্থান করিয়া আর্য্যগণ চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি চাষ করিতেন, গো মেষাদি চতুষ্পদগণকে পালন করিতেন, এবং সময়ে সময়ে সেই গো মেষাদির আহার্য্য উৎকৃষ্ট তৃণ ক্ষেত্রের অন্বেষণে এক দেশ হইতে অন্য প্রদেশে পর্য্যটন করিতেন।

"পূষা আমার জন্য সোমের সহিত ছয় ঋতু বার বার আনিয়াছেন, কৃষক যেরূপ গরু দ্বারা বার বার যব চাষ করে।" ১।২৩।১৫।

"যে জল আমাদিগের গাভী সকল পান করে সেই জলদেবীকে আহ্বান করি, যে জল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে হব্যদান করা বিধেয়।" ১।২৩।১৮।

"যে সকল উপায় দ্বারা শূব মনুকে শস্যাদি দান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলে, হে—অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।" ১।১১২।১৮।

"হে—অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা চাষ করাইয়া, যব বপন করাইয়া শস্যের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, ও বজ্র দ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছ।" ১।১১৭।২১।

এই প্রকার শত শত ঋক্ হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, তৎকালের গ্রামবাসী হিন্দুগণ এক্ষণকার গ্রামবাসীদিগের ন্যায় লাঙ্গল দ্বারা কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, শস্য উৎপাদন করিয়া এবং গো মহিষ রক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। কিন্তু তখন একটি ভয় ছিল—অদ্য যাহা নাই। আর্য্য

গ্রামগুলির প্রান্তে অনার্য্য দস্যুগণ বাস করিত, তাহাদিগের মধ্যে রাজা ছিল, সেনা ছিল এবং তখনও তাহাদিগের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। জঙ্গলে বা নদীবক্ষে তাহারা সর্ব্বদাই আর্য্যদিগকে আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত; কখন বা তাহাদিগের কৃষ্ণকায় সৈন্য আর্য্যদিগের গৌরবর্ণ যোদ্ধাদিগের সম্মুখে যুদ্ধে উপনীত হইত। গ্রামবাসীদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত, কৃষকগণ ও আয়ুধ ধারণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্র, নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল।

কৃষিকার্য্য ও পল্লিগ্রামের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমরা কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে একটি সূক্ত এখানে উদ্ধৃত করিব।

"আমাদিগের সখার ন্যায় ক্ষেত্রপতির সহিত আমরা বিজয় লাভ করিব; তিনি আমাদিগের গো অশ্বদিগকে পোষণ করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন।

"হে ক্ষেত্রপতি! গাভী যেরূপ দুগ্ধ দেয়, তুমি সেইরূপ মিষ্ট ও প্রচুর ও মধুশ্চ্যুত ও ঘৃতের ন্যায় জল দাও। যজ্ঞপতি আমাদিগকে সুখী করুন।

"ওষধি সমূহ আমাদিগের পক্ষে মধুযুক্ত হউক, আকাশ জল ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের প্রতি মধুযুক্ত হউন, ক্ষেত্রপতি আমাদিগের প্রতি মধুযুক্ত হউন, আমরা যেন শত্রু কর্ত্তৃক নিবারিত না হইয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করি।

"আমাদের উক্ষগণ সুখে বহন করুক, মনুষ্যগণ সুখে পরিশ্রম করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহ গুলি সুখে বন্ধন করুক, সুখে প্রতোদ প্রেরণ কর।

"শুন ও সীর! আমাদিগের স্তুতি বাক্যে তুষ্ট হও, এবং আকাশে সৃষ্ট বৃষ্টিজল দ্বারা এই পৃথিবী সিঞ্চন কর।

"হে সৌভাগ্যবতী সীতা! * তুমি প্রসন্ন হও, আমরা তোমায় স্তুতি করি; যেন তুমি আমাদিগের পক্ষে সুভগা ও সুফলা হও।

"ইন্দ্র সীতাকে ধারণ করুন, পূষা তাঁহাকে লইয়া যাউন; সীতা উদকপূর্ণ হইয়া বৎসর বৎসর (শস্য) দোহন করুন।

---

* লাঙ্গলের ফলায় ভূমিতে যে রেখা করে, তাহার নাম সীতা। ঋগ্বেদে তিনি স্তুত হইয়াছেন, যজুর্ব্বেদে তিনি দেবী হইয়াছেন, রামায়ণে তিনি মহাকাব্যের নায়িকা হইয়াছেন। উপাখ্যানের এই রূপ উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়।

"লাঙ্গলের ফাল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক; ষণ্ডদের রক্ষক সুখে বলদের সঙ্গে সঙ্গে যাউক, পর্জ্জন্য সুখে বৃষ্টিদান করুন, শুন ও সীর আমাদিগকে সুখ দান করুন।" ৪ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত।

কিন্তু ঋগ্বেদে কেবল যে কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষণ ও গ্রাম সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে, শিল্পকার্য্য ও নগরেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

"ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসের জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত শতপুরী ধ্বংস করিয়াছেন।" ৪।৩০।২০।

"সোম পানে হৃষ্ট হইয়া আমি (ইন্দ্র) শম্বরের ৯৯ নগর ধ্বংস করিয়াছি, অবশিষ্ট এক নগর দিবোদাসের নিবাসের জন্য দান করিয়াছি, সেই অতিথিগ্বকে আমি যজ্ঞে রক্ষা করিয়াছি।" ৪।২৬।৩।

এইরূপ অনেক স্থানে নগরের উল্লেখ আছে; কোন কোন স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত বা লৌহময় নগরের উল্লেখ আছে, কোথাও বা শতভুজী নগরের উল্লেখ আছে। অতএব সে সময়ে যে সিন্ধু ও গঙ্গা যমুনাতীরে আর্য্যগণ বড় বড় নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রস্তর নির্ম্মিত নগর অথবা প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত নগর ছিল এরূপ ও বোধ হয়, কেননা পর্ব্বত-সঙ্কুল দেশে প্রস্তরখণ্ড আনিয়া তদ্দ্বারা গৃহ প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু লৌহময় নগর বোধ হয় কেবল ঋষিদিগের কল্পনা সৃষ্ট;—অতি দুর্গম নগরকে উপমাস্থলে লৌহময় নগর বলিয়া গিয়াছেন।

নগরবাসীগণ যে নানারূপ শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ৯ মণ্ডলের ১১২ সূক্তে এবং ১০ মণ্ডলের ৯৭ সূক্তে সূত্রধার, চিকিৎসক, পুরোহিত, কর্ম্মকার, কবি ও যে নারীগণ ধান ভানে,—তাহাদিগের উল্লেখ আছে। শকট নির্ম্মাণের অনেক উল্লেখ আছে; এবং ধাতুদ্বারা নানা রূপ পাত্রাদি অস্ত্রাদি ও দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইত। তন্তুবায়ের ব্যবসায় বিলক্ষণ রূপে পরিচিত ছিল; টানা ও পোড়েনকে "তন্তু" ও "ওতু" বলিত;—"আমি তন্তু ও জানি না, ওতু ও জানি না।" ৬। ৯। ১।

অন্য স্থানে আছে "উষা ও রাত্রি বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের সাহায্যে গমনাগমন করত যজ্ঞের রূপ নির্ম্মাণার্থ পরস্পরকে আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তন্তু বয়ন করিতেছেন। ২।৩।৬

এই উপমা হইতে উপলব্ধি হয় সেকালে দুই জন নারী একত্র পরিশ্রম করিয়া টানা ও পোড়ন সঞ্চালন করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিত।

তৎকালে সমুদ্র-গামী নৌকা প্রস্তুত হইত; অশ্বিদ্বয় মজ্জমান ভুজ্যুকে শত দাঁড় নৌকায় উঠাইয়া সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন ।১।১১৬।৩ অন্যান্য অনেক স্থলে সমুদ্র গমনের কথা আছে।

ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে অতি সুন্দর বস্ত্রাদি, সুবর্ণের অলঙ্কারাদি-রুক্ম (বক্ষের অলঙ্কার), স্রক্ অর্থাৎ হার, খাদি অর্থাৎ বালা ও মল, এবং শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম, খড়্গ, ধনুর্ব্বাণ, নিষঙ্গ, বর্ষা, পরশু প্রভৃতি যুদ্ধের অস্ত্রাদিরও নানাপ্রকার শিল্পের উল্লেখ আছে, সুতরাং ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যগণ আপনাদিগের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন,—স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ধনবানদিগের দানের কথা আছে, নর্ত্তকীদিগের বেশভূষার কথা আছে, (১।৯২ ৪) এবং সুভূষণ সম্পন্না বন্দীদাসীদিগেরও উল্লেখ আছে। (৮,৪৬,৩৩) কিন্তু সে সময়ে নরনারীগণ কি প্রকার বেশ করিত, কি প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত, তাহার বিশেষ বর্ণনা আমি পাই নাই।

আর্য্যগণ যেমন আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত হইতে লাগিল তেমনই ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য সংস্থাপন করিতে লাগিল। সিন্ধুনদী হইতে সরযুতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশ খণ্ড এক রাজার অধীন ছিল না, অনেক গুলি ভিন্ন ভিন্ন জনপদ ও রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঋগ্বেদে অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। ভব্যরাজা সিন্ধুতীরে বাস করিতেন (১।১২৬।১)। চিত্র ও অন্যান্য রাজাগণ সরস্বতীতীরে রাজত্ব করিতেন, (৮।২১।১৮)। দশজন রাজা সুদাসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, (৭।৩৩।৩)। অন্যান্য অনেক স্থানে অনেক রাজাদিগের ও তাঁহাদিগের নিবাস-স্থানের উল্লেখ আছে।

দেবদিগের বর্ণনা হইতে তৎকালে রাজাদিগের সমৃদ্ধি ও অবস্থা অনেকটা অনুভব করা যায়। রাজাদিগের ন্যায় ইন্দ্র বহুস্ত্রী বেষ্টিত হইয়া বাস করেন (৭।১৮।২)। মিত্র ও বরুণ সহস্র স্তম্ভ শোভিত সহস্র দ্বার বিশিষ্ট অট্টালিকায় বাস করেন (২।৪১।৫; ৫।৬২ ৬; ৭।৮৮।৫)। বরুণ সুবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দূত পরিবেষ্টিত হইয়া রাজত্ব করিতেছেন (১।২৫।১০ ও ১৩)।

রাজাদিগের যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ অনেক ঋত্বিক ও পুরোহিত থাকিত, এবং কখন্ কখন রাজাগণ তাঁহাদিগকে অনেক সুবর্ণ রৌপ্য শকট ও গো অশ্বাদি দান করিতেন। অনার্য্যদিগের সহিত বা অন্য আর্য্য রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ হইলে নরপতিগণ নিজ নিজ সৈন্য লইয়া প্রস্তুত হইতেন। মহাভারতের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জনপদ ও ভিন্ন ভিন্ন নরপতিদিগের যেরূপ সমৃদ্ধি, ক্ষমতা,

সভ্যতা ও যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়, ঋগ্বেদের সময় সেরূপ দেখা যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের সময়ের আর্য্যসমাজও সেই ছাঁচে গঠিত; ঋগ্বেদের সময়ের আর্য্যগণ সেইরূপ ভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধীনে বাস করিতেন, এবং সময়ে সময়ে পরস্পরের সহিত লিপ্ত হইতেন।

নরপতি দিগের অধীনে নগরে "পুরপতি" এবং গ্রামে "গ্রামনী" থাকিতেন। (১।১৭৩।১০) ও (১০।৬২।১১)।

যব প্রভৃতি নানারূপ শস্য মনুষ্যের আহার দ্রব্য ছিল। বৃষ পাক করারও উল্লেখ আছে (১।১৬৪।৪৩) অশ্ব পাককরা ও প্রচলিত ছিল (১।১৬২ সূক্ত।) মহিষাদি পাককরারও উল্লেখ আছে,তৎকালের আর্য্যগণ সোমরস ভক্ত ছিলেন, এবং সুরা ও সুরাবিক্রেতারও উল্লেখ আছে। (১।১১৬।৭ ও ১।১৯১।১০)

এক পুরুষের সহিত সচরাচর এক নারীরই বিবাহ হইত, কিন্তু ধনাঢ্য লোক ও নরপতি গণের মধ্যে বহুবিবাহ ও প্রচলিত ছিল।

"সপত্নীদ্বয় স্বামীর উভয় পার্শ্বে থাকিয়া যেরূপ তাহাকে সন্তাপ দেয়, সেই রূপ এই পার্শ্বস্থ কূপের ভিত্তিসকল আমাকে সন্তাপ দিতেছে"। ১।১০৫।৮

"ইন্দ্র একাই সমস্ত নগর অধিকার করিলেন, যেমন একপতি স্ত্রী সমূহকে গ্রহণ করে।" ৭।২৬।৩

অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকিতেন, এবং তাঁহারা পিতৃসম্পত্তির অংশ পাইতেন,—তাহাও দেখা যায়। বিধবাদিগের চির-বৈধব্যের প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। অথর্ববেদে নারীর দ্বিতীয় স্বামীর কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

"যে নারী প্রথম পতি হারাইয়া অন্যপাত প্রাপ্ত হয়, তাহারা অজ পঞ্চৌদন প্রদান করিলে আর বিচ্ছিন্ন হয় না।

দ্বিতীয়বার বিবাহিতা পত্নী তাহার দ্বিতীয় স্বামীর সহিত একলোকে বাস করে, যদি সে অজ পঞ্চৌদন প্রদান করে।" অথর্ব্ববেদ।৯।৫।২৭৩২৮

ঋগ্বেদের সময় সতীদাহের প্রথাও প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে বিধবার প্রতি এই আদেশ,—"নারী উত্থান কর, জীব জগতে প্রত্যাবর্ত্তন কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিয়া আছ, তাঁহার জীবন গত হইয়াছে। আমাদিগের নিকট আইস। যে পতি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তোমাকে মাতা করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি তুমি পত্নীর কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছ।"

পুত্রহীন বিধবা তাঁহার দেবরকে বিবাহ করিবার মনুসংহিতায় যে বিধান আছে, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বিধবা যেরূপ দেবরকে শয়নে অভিমুখ করে, নারী যেরূপ পুরুষকে শয়নে অভিমুখ করে, হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে কে গৃহে আনিতেছে।

১০।৪০।২

স্বামী মন্দ হইলে পত্নী কুপথগামী হয় রক্ষকহীনা নারীও কুপথ গামিনী হয়;—এরূপ কথাও ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

"অক্ষক্রীড়ায় যাহার অর্থ নাশ হয়, তাহার পত্নীকে অন্যে সম্ভোগ করে।"

১০।৩৪।৪

মন্দ লোকদিগকে ভ্রাতৃহীন নারী ও পতিবিদ্বেষিণী পত্নীদিগের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ৪।৫।৫

কুপথ গামিনী গোপনে প্রসূতা হইয়া সন্তানকে দূরে ফেলিয়া আইসে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। ২।২৯।১

গৃহস্থা নারী স্বামীকে তুষ্ট করিবার জন্য যত্ন করেন, প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহ কার্য্যাদি সম্পাদন করেন, যজ্ঞকালে স্বামীর সহিত একত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাহার ভূয়োভূয় উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। বিদ্যাবতী রমণী ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়া পরিচিতা হইয়া স্তোত্র রচনা ও উচ্চারণ করিতেন, ঋত্বিকের কার্য্য করিতেন, যজ্ঞ সমাধা করিতেন। ৫।২৮ সূক্ত।

আদিম হিন্দুদিগের দেবদেবী ও ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়াই দেখিলেন এ দেশ অরণ্য পূর্ণ এবং সেই অরণ্যে অসংখ্য বর্ব্বর জাতি বাস করে। তখন হইতেই "আর্য্য" ও "অনার্য্য" এই দুই জাতির সৃষ্টি হইল। "ইন্দ্র দস্যুকে বধ করিয়া আর্য্য "বর্ণ" কে রক্ষা করিয়াছেন।" (৩।৩৪।৯) ঋগ্বেদ রচনার সময় অন্য কোন জাতি ছিল না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চারি জাতি ছিল না। গৃহপতি নিজেই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিতেন, তাঁহার স্ত্রী কন্যা পুত্রাদি সে যজ্ঞ সম্পাদনে সহায়তা করিতেন। এই রূপ পরিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরিবারের সকলের কুশলের জন্য, কৃষির সফলতার জন্য, গো বৎসাদির রক্ষার জন্য অথবা দুর্দ্দান্ত অনার্য্যদিগের ধ্বংশের জন্য সোমরস

ও ঘৃতাহুতি দিয়া আকাশের কল্পিত দেবদিগের আরাধনা করিতেন। পুরোহিত ডাকাইবার আবশ্যক ছিল না, পুরোহিতদিগের একটি ভিন্ন জাতি ছিল না।

তথাপি সমাজের মধ্যে দ্বিজগণ মন্ত্ররচনায় ও যজ্ঞ সম্পাদনে অধিক নৈপুণ্য লাভ করিতেন, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ঋত্বিকের ব্যবসা অবলম্বন করিতেন। নরপতিগণ ও ধনাঢ্যগণ নিজে যজ্ঞ সম্পাদন না করিয়া এই ঋত্বিকগণকে ডাকাইতেন, এবং এক একটি বড় যজ্ঞে ১৬ জন ঋত্বিকও নিযুক্ত হইতেন। ধনাঢ্যগণ ঋত্বিক্‌দিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দান করিতেন, এবং তাঁহাদিগের গৃহেও অনেক বেতনভোগী ঋত্বিক্‌ও বাস করিতেন।

সে সময় অঙ্গিরা, মনু বশিষ্ঠ, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশ যজ্ঞ সম্পাদন ও মন্ত্র রচনায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া বিশেষ খ্যাতি পাইয়াছিলেন, এবং ঋগ্বেদের সমস্ত মন্ত্র বংশানুক্রমে তাঁহাদিগের কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহারা পুত্র কলত্র বেষ্টিত হইয়া, ভূমি ও গো অশ্বাদি অধিকার করিয়া সাংসারীর ন্যায় *সংসারে বাস করিতেন এবং বেদের অনুশীলনা ও যজ্ঞাদি সম্পাদন দ্বারা কাল* যাপন করিতেন। আবার অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধের সময় তাঁহারাই যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। বনবাসী ফলমূলহারী ঋষি বা তপস্বী ঋগ্বেদের সময় ছিল না।

সে সময়ে দেব দেবীর মন্দির বা বিগ্রহ ছিল না। আকাশই দেবদিগের অনন্ত অক্ষয় মন্দির, আলোক বা সূর্য্য, মরুৎগণের ভীষণ গতি বা বজ্রের ভয়ঙ্কর শব্দই তাঁহাদের দেবতা। প্রকৃতির সরল স্বভাব সন্তানগণ প্রকৃতিকেই উপাসনা করিতেন সেই গৌরবান্বিত প্রকৃতির উপাসনা করিতে করিতে প্রকৃতির আদি নিয়ন্তাকে তাঁহারা অনুভব করিলেন।

কুম্ভকারের দ্বারা বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া মনুষ্য গৃহে সে বিগ্রহ স্থাপন করাইয়া, বেতনভোগী পুরোহিতের দ্বারা তাহার নিকট কতকগুলি অবোধগম্য মন্ত্র পাঠ করান,—আর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া স্বয়ং ভক্তিভাবে প্রকৃতির নিয়ন্তাকে আহ্বান করা,—এই দুই প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে কতদূর প্রভেদ! ভারতবর্ষে আমা মন সত্যের পথ হইতে কাল ক্রমে বহুদূর বিপথে আসিয়া পড়িয়াছে, সাধারণ লোকের অজ্ঞানতা,—শ্রেণী বিশেষের স্বার্থপরতা, ও সকল শ্রেণীর মানসিক বলহীনতাই—ইহার প্রধান কারণ। জ্ঞানালোকের সহিত আবার হিন্দু জাতি সরল পথ প্রাপ্ত হইবে, জাতিহিতৈষী হিন্দু মাত্রেরই ইহা একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

কল্পকাল।

অণ্ডকটাহের মধ্যে যত লোকমণ্ডল আছে সে সমস্তই মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় পরস্পর-সম্বন্ধ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তন্মধ্যে ব্রহ্মভুবন চতুষ্টয় মস্তক স্বরূপ। মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক সেই মস্তকেরই বিভাগ। ব্রহ্মলোকই যোগৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার এবং হৈরণ্যগর্ভ রাজ্য। ইহাই আদিত্য লক্ষণ প্রধান স্বর্গ এবং সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ, 'এত দ্বৈ প্রাণানাং আয়তনং' (প্রশ্নে) ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের মস্তিষ্কস্বরূপ; তপোলোক ললাট; জনলোক জ্রসন্ধি; মহর্লোক চক্ষু। অন্যান্য লোক সকল কণ্ঠ অবধি অধো-অধোভাগরূপে প্রলম্বিত। মস্তিষ্ক স্বরূপ ব্রহ্মলোক যতদিন প্রকৃতিস্থ থাকিবে ততদিন প্রাকৃতিক প্রলয় হইবে না। কিন্তু মস্তক মণ্ডলের নিম্নে, অপ্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সময়ে সময়ে নৈমিত্তিক প্রলয় ও নৈমিত্তিক উদয় হইবে। শাস্ত্রানুসারে নির্গুণ মোক্ষ, পরম জাগ্রত-অবস্থারূপী ও অপরিলুপ্ত চৈতন্যস্বভাব তাহা সৃষ্টির অতীত এবং ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাপ্য। কোন প্রলয়ে সে অবস্থা আহত হয় না। কিন্তু মস্তিষ্ক-রূপী উক্ত মস্তক-মণ্ডল স্বপ্নস্থান স্বরূপ। অপ্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপী সমস্ত সৃষ্টিরূপ স্থূলদেহ নিদ্রাভিভূত, সুষুপ্ত, অসাড় হইলেও উক্ত মস্তিষ্করূপী ব্রহ্মভুবন, অন্তঃপ্রজ্ঞ, সৃষ্টি সংসারের সমাবেশ স্থান, মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রাণের আধারক্ষেত্র, সুসূক্ষ্ম ভোগালয়, অস্থূল অণিমাদৈশ্বর্য্য যুক্ত তৈজসপুরী ইত্যাদি সুসূক্ষ্ম সুখরাজ্যরূপে অবস্থিতি করে। স্বপ্নে যেমন সূক্ষ্মের ভোগ—মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্মধাতুর যোগ ঐ ব্রহ্মভুবন চতুষ্টয় তাহারই আভাস যোজিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নস্থ অঙ্গসমূহ, অর্থাৎ স্বর্লোক হইতে ভূর্লোক ও তন্নিম্নস্থ সপ্ত পাতালগত সাধারণ প্রকৃতি নিদ্রিত প্রলুপ্ত, ভগ্ন ও ক্ষয় হইলেও ঐ ব্রহ্মভুবন মহাসূক্ষ্ম ভোগরাজ্যরূপে জীবিত থাকিবে। স্বপ্নে মানবদেহ পর্য্যঙ্কোপরি মৃতবৎ নিপতিত থাকিলেও, মন যেমন বারাণসীক্ষেত্রে—আনন্দকাননে—আনন্দভোগ করিতে পারে, সেইরূপ নৈমিত্তিক প্রলয়ে ব্রহ্মার স্থূলদেহরূপ ভূর্ভুবস্ব প্রভৃতি ত্রৈলোক্যের ঘোর নিদ্রাকালে, ব্রহ্মার মহামৌলি স্বরূপ মানস রাজ্য সুসূক্ষ্ম যোগানন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রানুসারে ঐ স্বর্গচতুষ্টয়ের পরমায়ুই স্বয়ং ব্রহ্মার পরমায়ুরূপে উক্ত হয়। ব্রহ্মা সর্ব্বজীবের সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতা। তৎসম্বন্ধাধীন তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ কহে। যোগিগণ সাধন প্রভাবে যে মহাবিদ্যা উপার্জ্জন করেন, তাহার নাম হিরণ্যগর্ভ বিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বিবিধ। ক্রিয়াপরতন্ত্র ও বস্তু পরতন্ত্র। যাহা বস্তু পরতন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার উপাধি ও ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত শারীরকে (৩।২) 'প্রকৃতৈতাবত্ত্বংহি প্রতিষেধতি ইত্যাদি' তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃতির অতীত। তাহা ব্রহ্মরূপ পরম বস্তুর অধীন এবং সাধন নিরপেক্ষ। তাহা সত্যজ্ঞান এবং নির্গুণ মুক্তি শব্দের বাচ্য। যাহা ক্রিয়া-পরতন্ত্র-ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই সাধন-প্রভাব। তাহার যে সিদ্ধি তাহাই যোগৈশ্বর্য্য। তাহারই নামান্তর হিরণ্য গর্ভ-বিদ্যা। শারীরকে কর্ম্মাঙ্গ প্রকরণে (৩।৪।১) কহিয়াছেন 'পুরুষার্থোতঃ শব্দাৎ'; বেদে আছে আত্ম-বিদ্যার সাধন দ্বারা সগুণোপাসকের সকল পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। এই বিদ্যা বলে যোগিগণ স্থূল দেহের বীজস্বরূপ সূক্ষ্ম দেহের উপরি প্রভুত্ব লাভ করেন। তাহাতে তদনুষঙ্গীরূপে স্থূল সৃষ্টির বীজস্বরূপ সূক্ষ্ম প্রকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের আয়ত্তাধীন হয়। এই সূক্ষ্মরাজ্য পরমাত্মার যে কর্ত্তৃত্বের অধীন তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। সেই হিরণ্যগর্ভ, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু, স্থূলবিষয় হইতে বিনিবৃত্ত মনোবুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহ সমষ্টির অধিষ্ঠাতা। এই মর্ত্ত্যলোকে স্থূল দ্বারা সূক্ষ্ম আবৃত। উহার কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া সকলই স্থূল। ইহার ঊর্দ্ধতন পিতৃ-দেব-মিলিত স্বর্লোকও স্থূল, —কর্ম্মফলভোগের প্রদেশ। তথায় স্বর্গবাসিগণের সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যের প্রভাব অল্পই। কিন্তু উক্ত ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয়, সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য ও সত্ত্বগুণের চরম রাজ্য। তথাকার কর্ম্মী, ক্রিয়া ও ভোগ্য সমুদয়ই সূক্ষ্ম। কর্ম্মী—ঐচ্ছিক দেহ-ধারী; ক্রিয়া—সঙ্কল্প প্রধান; এবং ভোগ্য—সগুণানন্দ ও সগুণমুক্তি। ঐসমস্ত সূক্ষ্ম ভোক্তা ও ভোগ্য এত দীর্ঘস্থায়ী যে, তাঁহাদের পরমায়ু, তাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃদেব ব্রহ্মার পরমায়ু, এবং তাঁহাদের স্থান ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয়ের পরমায়ু—সমান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভোগশক্তি ও ভোগ্য পদার্থের শক্তি কেবল প্রকৃতিরই বিকার। যোগৈশ্বর্য্য অতি সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিক বটে, কিন্তু তাহাও প্রকৃতির সুসূক্ষ্ম পরিণাম। তাহাও ভোগ, তবে বিশুদ্ধতম ভোগ এইমাত্র। শুদ্ধ প্রকৃতির উপাসনা করিলে সে সম্পদ্ লাভ হয় না। হিরণ্যগর্ভরূপ সূত্রাত্মার সহিত সমুচ্চয়-

পূর্ব্বক অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধান সহকারে যোগসাধনাদি করিলে উক্তরূপ সম্পদ্ ও অমৃতত্ব লাভ হয়। "সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা হসম্ভূত্যা হমৃতমশ্নুতে॥" (বাজসনেয়) যে ব্যক্তি হিরণ্য গর্ভ ও প্রকৃতি উভয়ের সমুচ্চিত উপাসনা করে সে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভের উপাসনা প্রভাবে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পাইয়া মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং প্রকৃতির অধিকারস্থ দীর্ঘস্থায়ী জীবন লাভ করে। কাঠকে উক্ত হইয়াছে, "কামাস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং, স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং" ইত্যাদি। হিরণ্যগর্ভোপাসনার ফলস্বরূপ যে হিরণ্যগর্ভ লোক তাহা সকল কামনার পরিসমাপ্তি স্থান, তাহা সকল জগতের আশ্রয়, ভূরি কাল স্থায়ী, সকল অভয় স্থানাপেক্ষা অভয় সম্পন্ন, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের আকর, এবং বিস্তীর্ণগতিস্বরূপ। তাহা হইতে শীঘ্র চ্যুতি হয় না। যদি ও হিরণ্যগর্ভসেবী যোগিগণের এরূপ সম্পদ্ সর্ব্বত্র প্রাপনীয়; কিন্তু ব্রহ্মলোকই ঐপ্রকার ঐশ্বর্য্যের নিকেতন তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ। তদ্বিষয়ক ভূরি বার্ত্তা ছান্দোগ্যে এবং শারীরকে আছে। পুরাণাদি শাস্ত্রেও তাহার অভাব নাই। শারীরকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (৪।৩।১০) "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহিতঃ পরমভিধানাৎ।" ব্রহ্মলোকের বিনাশ হইলে পর যোগিগণ তাহার অধ্যক্ষ হিরণ্যগর্ভের সহিত পরব্রহ্মকে লাভ করেন। ব্রহ্মলোকের প্রতি সহস্র "অমৃত" বিশেষণ প্রদত্ত হইলেও তাহা বিনাশশীল, এবং তাহার প্রভু হিরণ্যগর্ভও বিনাশশীল—একথা শাস্ত্রের বার বার উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মলোকের অর্থাৎ হৈরণ্যগর্ভরূপ দীর্ঘজীবনের স্থিতি ও প্রলয় কাল সম্বন্ধে মানব স্মৃতি, গীতাস্মৃতি এবং পুরাণশাস্ত্রে যে অঙ্কপাত আছে তাহার আমূল-তত্ত্ব পাওয়া যায় না। ফলত কথিত আছে যে, কেবল যোগীগণই তাহা বুঝিতে পারেন। সামান্য বুদ্ধিতে তাহা প্রতিফলিত হয় না। মানব স্মৃতিতে (১ অঃ) আছে যে, মানুষ ও দেব-সম্বন্ধিনী দিনরাত্রি সূর্য্যকর্ত্তৃক বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে রাত্রি জীবগণের নিদ্রার নিমিত্তে। মনুষ্যদিগের এক মাসে পিতৃগণের এক দিনরাত্রি হয়। তাহা পক্ষদ্বয়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের দিন, এবং শুক্লপক্ষ রাত্রি। মানবীয় এক বর্ষে দেবতাদের একদিন রাত্রি হয়। তন্মধ্যে সূর্য্যকর্ত্তৃক নিয়মিত উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। যথা—

মানবীয়	১ মাস	...	...	পিতৃ	১ দিবারাত্রি
ঐ	১ বর্ষে	.	...	দৈব	১ দিবারাত্রি
ঐ	৩০ বর্ষে	...	...	পিতৃ	১ বর্ষ
ঐ	৩৬০ বর্ষে	...	..	দৈব	১ বর্ষ
ঐ	৪ যুগে	...	...	ঐ ১২০০০ বর্ষ।	

যাহা ব্রহ্মলোকের বা ব্রহ্মার দিনরাত্রি তাহা যুগের গণনা দ্বারা নিশ্চয় হয়। যথা,—

যুগ	যুগের ভোগকাল মানবীয় বর্ষ	যুগের ভোগকাল পৈত্র বর্ষ	যুগের ভোগকাল দৈব বর্ষ
সত্য	১৭২৮০০০	৫৭৬০০	৪৮০০
ত্রেতা	১২৯৬০০০	৪৩২০০	৩৬০০
দ্বাপর	৮৬৪০০০	২৮৮০০	২৪০০
কলি	৪৩২০০০	১৪৪০০	১২০০
সমষ্টি	৪৩২০০০০	১৪৪০০০	১২০০০

মনুতে আছে যে ঐরূপ এক সহস্র চতুর্যুগ সংখ্যাতে ব্রহ্মার একদিন হয়, এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রিও হয়। এই প্রকার দীর্ঘদিন ও দীর্ঘরাত্রির জ্ঞান যাঁহাদের আছে, তাহাদিগকে 'অহোরাত্রবিৎ' কহে। গীতাস্মৃতিতে (৮ অঃ) কহিয়াছেন যে, মানবীয় চতুঃসহস্র যুগপরিমিত ব্রহ্মলোকের দিনমান এবং তত্তুল্যকালপরিমিত রাত্রিকাল,—তাহা যাঁহারা জানেন, "তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ" তাঁহারাই অহোরাত্রবিদ্। গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য কহেন যে, তাঁহারাই কালসংখ্যাবিদ্। শ্রীধর স্বামী কহেন, "সহস্রংযুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণোঽহর্যদ্বিদুঃ যুগসহস্রমন্তো যস্যা তাং রাত্রিঞ্চ যোগ বলেন যে বিদুস্ত এব সর্ব্বজ্ঞাজনা অহোরাত্রবিদঃ। যেষান্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং তে তথাহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগ অভিপ্রেতং চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো-দিনমুচ্যতে ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ ব্রহ্মণো ইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনা-মুপলক্ষণার্থং। • • • তাবৎ প্রমাণের রাত্রিস্তাভ্যামহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদি-ক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি।" (গীঃ ৮।১৭।) স্বামীকৃত এই টীকার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মার দিন যাহা সহস্র যুগপরিমিত, তাহা যে সকল সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি যোগবলে জানেন, তাঁহারাই অহোরাত্রবিদ্। যাঁহাদের কেবল

চন্দ্র সূর্য্যের গতি মাত্রেই জ্ঞান, তাহারা উক্তরূপ দিবারাত্রিজ্ঞ নহেন, যেহেতু তাঁহারা অল্পদর্শী। এস্থলে যুগশব্দে চতুর্যুগ। সহস্র চতুর্যুগ পরিমাণে যে কাল তাহাই ব্রহ্মার দিন বলিয়া উক্ত হয়। তাহার রাত্রিও সেই পরিমিত। গীতার 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বশ্লোকে যে 'ব্রহ্মলোক' শব্দ আছে তাহা মহর্লোকাদি ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয়কেই লক্ষ্য করে। সেই সমস্ত লোকে উক্ত পরিমিত দিবারাত্রি প্রচলিত। উক্ত প্রকার দিবা-রাত্রি দ্বারা কল্পিত পক্ষ মাসাদি ক্রমে একশত বর্ষ ব্রহ্মার অথবা ঐ ভুবন চতুষ্টয়ের পরমায়ু।

এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, যোগৈশ্বর্য্য, ও সগুণমোক্ষানন্দ সম্ভোগের মহাস্বর্গস্বরূপ যে ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয় তাহার পরমায়ুকাল জ্যোতির্ব্বিদ্যা অথবা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। সূক্ষ্মশরীর, সূক্ষ্মবিভূতি, সূক্ষ্ম-ঐশ্বর্য্যের ব্যবহার ও সূক্ষ্ম-সম্ভোগক্ষেত্ররূপী ব্রহ্মলোক, এ সমস্তই যোগী ও সূক্ষ্ম প্রকৃতিদর্শীগণের ধারণার বিষয়। সুতরাং তাদৃশ সূক্ষ্ম স্থানে ব্যবহার্য্য দিবারাত্রি ও তাহার পরমায়ুর কাল নিরূপণ তাঁহাদেরই কার্য্য। তাহা জ্ঞাত হওয়ার প্রণালী স্বতন্ত্ররূপে উক্ত হয় নাই। তাহা যোগৈশ্বর্য্যেরই অনুগত। কিন্তু তাহার অঙ্কপাত শাস্ত্রে আছে। ইতিপূর্ব্বে মানব, পিতৃ ও দেব পরিমাণে যে চতুর্যুগ সমষ্টির অঙ্কপাত করা হইয়াছে, কল্পের পরিমাণ তাহার সহস্র-গুণ। ব্রহ্মার দিনমান অর্থাৎ ব্রহ্মভুবনের ব্যবহৃত দিনমানের নাম কল্প। কল্পকালও যাহা, নৈমিত্তিক সৃষ্টির পরমায়ুও তাহা। ব্রহ্মার রাত্রিকালেই ব্রহ্মলোকাদি স্বর্গচতুষ্টয়ের রাত্রিমান। তাহার পরিমাণও ব্রহ্মদিনের তুল্য। তাদৃশ দিবারাত্রি দ্বারা একশত বর্ষ গণনা করিলে, যে সুদীর্ঘকাল হয় তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ু। মহর্লোকাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্ম চতুষ্টয়ের পরমায়ু। তাহাই প্রাকৃতিক সৃষ্টির চূড়ান্ত পরমায়ু, তাহার পর প্রাকৃতিক প্রলয়। ৩৬০০০ দিন ও তত্তুল্য রাত্রিতে একশত বর্ষ হয়। সুতরাং ৩৬০০০ কল্প (বা ৩৬০০০ নৈমিত্তিক সৃষ্টিকাল) ও তত্তুল্য নৈমিত্তিক প্রলয় কাল ধরিয়া ব্রহ্মার বা ব্রহ্মভুবনের আয়ুস্থিতি হইয়াছে। যথা—

যুগাদি	মানব পরিমাণে বর্ষ সংখ্যা	পিতৃ পরিমাণে বর্ষ সংখ্যা	দেব পরিমাণে বর্ষ সংখ্যা
চতুর্যুগ	৪৩২০০০০	১৪৪০০০	১২০০০
ব্রহ্মদিন	৪৩২০০০০০০০	১৪৪০০০০০০	১২০০০০০০

ব্রহ্মদিবা ও রাত্রি	৮৬৪০০০০০০০০	২৮৮০০০০০০০	২৪০০০০০০০
ব্রহ্মবর্ষ	৩১১০৪০ কোটি	১০৩৬৮ কোটি	৮৬৪ কোটি
ব্রহ্মআয়ু	৩১১০৪০০০ কোটি	১০৩৬৮০০ কোটি	৮৬৪০০ কোটি

উপরি উক্ত মহা গণনা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অন্তর্গত নহে ইহাই অভিপ্রায়। যদি তাহা হইত তবে মম্বাদি স্মৃতিতে 'যোগ বলেন যে বিদুঃ, তেহহোরাত্র বিদোজন)' ইত্যাদি বিশেষ উক্তি থাকিত না। বরং তৎপরিবর্ত্তে জ্যোতিষের উল্লেখ থাকিত। ফলে জ্যোতিষের অনধিকার হইলেও ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ প্রয়োজনস্থলে উক্ত যুগ ও কল্পকালের সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিবর্ষের নবপঞ্জিকায় তাহাই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং শক, সম্বৎ প্রভৃতি সামান্য কালসমূহের সহিত সেই জগৎ সৃষ্টির মহা- শকেরও অঙ্কপাত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে যে যুগচতুষ্টয় প্রচলিত আছে তাহাও সামান্যযুগ-বর্ষ সমূহের ন্যায় কোন জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কাল নহে। ইতিপুর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, মানব-সমাজের ধর্ম্ম, বুদ্ধি ও ভোগাদিকে অধিকার পূর্ব্বক সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি এই চারিযুগ, ষড়ঋতুর ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইয়া থাকে। সত্যযুগ হইতে জ্ঞান, ধর্ম্ম, শক্তি, বীর্য্য, আনন্দ, বিষয়ভোগ, প্রভৃতি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে তৎসমস্ত মন্দীভূত হয়, এবং পাপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার পর স্বভাবত ধর্ম্মও ভোগাদির আবার উন্নতি হইয়া সত্যযুগের উদয় হয়। ঋষিরা যোগবলে নিরূপণ করিয়াছেন যে, ঐরূপ ১০০০ সত্য, ১০০০ ত্রেতা, ১০০০ দ্বাপর, ও ১০০০ কলিযুগ হইয়া গেলে একটি অবান্তর প্রলয়দ্বারা প্রকৃতি পুনঃ শুদ্ধতা লাভ করিবে, কিন্তু তাহার মধ্যগত যুগপরিবর্ত্তন সকল প্রলয় ব্যতীত সম্পন্ন হইবে। কেননা, তাদৃশ পরিবর্ত্তন কালে প্রকৃতি তত দূষিত হইবে না।

ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক যুগের যে বর্ষ সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রনিধানপূর্ব্বক দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মানব-সমাজের ধর্ম্ম ও সুখভোগের কাল, ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। সত্যযুগে মানব-সমাজের জ্ঞান, ধর্ম্মও সুখভোগ চারিপাদে পূর্ণ ছিল; ত্রেতা হইতে কলি পর্য্যন্ত তাহার এক এক পাদ খর্ব্ব হইয়া কলিযুগে এক পাদমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক যুগের ভোগ-কালও ক্রমে পাদে পাদে হ্রাসাবস্থ হইয়াছে। কলিতে ধর্ম্ম ও সুখাদি ভোগের কাল ৪৩২০০০ মানবীয় বর্ষ;

দ্বাপরে তাহার দ্বিগুণ ৮৬৪০০০ বর্ষ; ত্রেতায় তাহার তিনগুণ ১২৯৬০০০ বর্ষ; এবং সত্যে তাহার চারিগুণ ১৭২৮০০০ বর্ষ। এই সমস্ত গণনাও যোগ-বলে লব্ধ হইয়াছিল। তাহা সামান্য বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় না। ফলত যোগের অসাধারণ প্রভাব। তাহার দ্বারা ভূত ও ভবিষ্যৎ নখদর্পণস্থ হয়, ব্যবধান ও দূরত্ব বিদূরিত হয়, এবং অমৃতায়মান শান্তি-বারি-পূর্ণ ধর্ম্ম-মেঘ হৃদয়াকাশে উত্থিত হয়। প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে, অদৃশ্য সূক্ষ্মরাজ্যে ব্রহ্মভুবন হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত লোকমণ্ডলে, প্রকৃতির যত শোভা, সম্পৎ ও ঐশ্বর্য্য আছে, সে সমস্তই যোগরূপ পবিত্রনেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা অসম্ভব নহে, অস্বাভাবিকও নহে।

শাস্ত্র পাঠে সংগ্রহ হয় যে, 'ভূ ধাতু,' 'জলধাতু' এবং 'জ্যোতি-ধাতু' অথবা 'অন্ন', 'প্রাণ,' ও 'জ্ঞান' এই ত্রিবিধ তত্ত্ব—সমুদায় ভোগের উপাদান। তন্মধ্যে ভূলোকের ভোগ, দেহ বা অন্ন-প্রধান। স্বার্থমিশ্রিত-ধর্ম্ম, শৌর্য্য বীর্য্য, প্রাণ প্রভৃতি সকলই অন্নধাতুতে রচিত। ধন, প্রজা, পশু, যশ সমস্তই অন্নময়। সমস্তই স্থূল-ভোগ্য, অল্প এবং ক্ষণস্থায়ী। দিবাকরের প্রত্যেক উদয়াস্ত তৎসমূহকে ক্ষয় করে। সেই নিয়মে অন্নধাতু-প্রধান ভোগীর দিনে দিনে আয়ুক্ষয় হয়। ঊর্দ্ধ ৩৬০০০ দিবারাত্রি যাবৎ মানব তাহা ভোগের অধিকারী। ঐকালে তাঁহার শ্রুতি সিদ্ধ শতবর্ষ পরমায়ু শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুর পর তাদৃশ মানব এই ভূলোকেই পুনর্ব্বার জন্মেন এবং পুনর্ব্বার ঐ নিয়মের বশতাপন্ন হন। কিন্তু যোগ প্রভাবে আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিতৃ লোকের ভোগ জল-প্রধান অথবা প্রাণ পর। তাহা চন্দ্রোপলক্ষিত ভোগ; চন্দ্রগ্রহ জলধাতু প্রধান। জল ও প্রাণ, অন্নাপেক্ষা সূক্ষ্মপদার্থ। তাহা প্রজা, পর্জ্জন্য, মানসিক সুখ, এবং অন্নের কারণস্বরূপ। যে সকল গৃহপতি, পৃথিবীর মঙ্গলার্থে সেই সকল অপেক্ষাকৃত নিস্বার্থ-ধর্ম্ম ও সূক্ষ্মভোগের কামনা পূর্ব্বক প্রজাগণের হিতার্থ প্রাজাপত্যব্রত, ইন্দ্রযাগ ও ইষ্টাপূর্ত্তাদি ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের পার্থিব পরমায়ু তাদৃশ পুণ্যবশত শতবর্ষের অধিক হইতে পারে না, হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা তৎকালে পরলোকের নিমিত্তে তাঁহারা দীর্ঘতর পরমায়ু সঞ্চয় করেন এবং পিতৃলোকে গিয়া তাহা ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই পরমায়ু ও তদ্ভুক্ত ভোগাদি, সূর্য্যের উদয়াস্তদ্বারা শীঘ্র শীঘ্র নিয়মিত ও হ্রসিত হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহাদের স্বীয়মানে এক

শতবর্ষ পরমায়ু হইল, তাহা আমাদের শতবর্ষের ত্রিংশদ্গুণ অর্থাৎ ৩০০০ বর্ষ হইবেক। তাঁহাদের যতই পরমায়ু হউক, ভোগ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা স্থূল অন্ন-ধাতু-প্রধান নহেন, কিন্তু অন্নের অথবা পৃথিবীর সূক্ষ্মমূর্ত্তি স্বরূপ প্রাণ ও জলধাতু-প্রধান। চন্দ্রের কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ জলধাতুর নিয়ামক এজন্য তাঁহারা চন্দ্র ধাতু-প্রধানরূপে কথিত হন। চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যের সময়ে রশ্মিদ্বারা পৃথিবীর দিকে দিন দিন শুক্ল হয়, তদ্যুক্ত কালকে আমরা শুক্লপক্ষ বলি, সেই কালটি পিতৃলোকের রাত্রি-কাল। তাহার যে অংশ ঊর্দ্ধভাগে গগনমার্গের দিকে শুক্ল হয়, অর্থাৎ যাহা পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় না তদ্যুক্ত পক্ষটি আমাদের কৃষ্ণপক্ষ হইলেও পিতৃলোকের দিবাকাল। অতএব পক্ষদ্বয়ে বিভক্ত সেই দীর্ঘ দিবা ও দীর্ঘ রাত্রিকাল দ্বারা পিতৃস্বর্গের উপাদেয় ভোগ ধর্ম্ম ও সুখ নিয়মিত হইয়া থাকে। এই পার্থিব ও পৈত্র ভোগকাল সামান্যগণনায় সিদ্ধান্ত নহে, কিন্তু যোগজ সূক্ষ্মদূরদৃষ্টির ফল।

ভূলোকের ভোগ যেমন ভূধাতু ও অন্ন প্রধান, এবং পিতৃস্বর্গীয় ভোগ যেমন তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জল-ধাতু ও প্রাণ-প্রধান, সেইরূপ দেবস্বর্গের ভোগ আলোক ধাতু ও জ্ঞান-প্রধান। তাহা মানবীয় দিবা বা শুক্ল কৃষ্ণপক্ষদ্বয় দ্বারা নিয়মিত হয় না। তাহা সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। চন্দ্র যেমন পার্থিব প্রাণ ও জলধাতু প্রধান সূর্য্যও সেইরূপ আলোক-ধাতু ও জ্ঞান-ধাতু-প্রধান যাঁহাদের চিত্ত দেবসঙ্গ, দেবতা জ্ঞানরূপ বিদ্যা, প্রতীকোপাসনা, বাসন্তীয়া ও শারদীয়া প্রভৃতি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বিহিত পূজাদ্বারা প্রসাদ সম্পন্ন, দিবারাত্রি বা পক্ষদ্বয় পরিমাণে তাহাদের আয়ুক্ষয় হয় না; কিন্তু উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বিশিষ্ট দ্বাদশ মাস পরিমাণে তাহা হইয়া থাকে। উত্তরায় তাঁহাদের দিবস এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। সুতরাং তাঁহাদের দিবা-রাত্রি যখন আমাদের একবর্ষ পরিমিত তখন তাঁহাদের একবর্ষ আমাদের ৩৬০ বর্ষ পরিমিত এবং তাঁহাদের শতবর্ষ আমাদের ৩৬০০০ বর্ষ পরিমিত। এই নিয়মে আমাদের ৪ যুগে অর্থাৎ ৪৩২০০০০ বৎসরে তাঁহাদের ১২০০০ বর্ষ মাত্র। প্রাগুক্ত প্রকার দেবজ্ঞানী মহাপুরুষদিগের যে স্থানে গতি হয়, তাহার প্রচলিত দিবারাত্র ও যুগাদির এই নিয়ম। সেই স্থানের নাম দেব-লোক বা দেবস্বর্গ। তথায় ভোগ সমাপ্ত হইলে ভোগীগণ পৃথিব্যাদি নিম্নস্থ লোকমণ্ডলে পুনর্ব্বার পতিত হন, কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত জ্ঞানপ্রধান-সূক্ষ্ম-

জ্যোতিঃ বা হিরণ্যগর্ভরূপ সূক্ষ্ম প্রাণের উপযাচক তাঁহারা তথা হইতে ক্রমো-ন্নতি সহকারে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উত্থান করেন।

তেজ, আলোক ও জ্ঞান ধাতুর যে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিকাংশ তাহা ব্রহ্মভুবন চতুষ্টয়ের ভোগোপাদান। যাঁহারা পার্থিব, পৈত্র ও দৈব ভোগ প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক মহা সূক্ষ্মা প্রকৃতিরূপিণী হিরণ্যগর্ভ-বিষয়া ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগজা-বিভূতির সেবা করেন, যাঁহারা ব্রহ্মচারী ও বনবাসী হইয়া অপ্রতী-কোপাসনায় ও যোগধারণে ব্রতী হন তাঁহারাই ব্রহ্মভুবনের অধিকারী। তাঁহাদের উন্নত মানসিক ধাতু। যোগৈশ্বর্য্য ও সঙ্কল্পাত্মিকা সাত্ত্বিকী শক্তি-সম্পন্ন তাঁহাদের স্থূলদেহ ধারণ—তাদৃশ শক্তি বশাৎ ঐচ্ছিক মাত্র। এই সৌর জগতের সূর্য্য, অথবা, স্থূল ভোগীদিগের শাস্তা অন্য কোন জগতের সূর্য্য, তাঁহাদের অথবা তাঁহাদের লোক পুরীচতুষ্টয়ের সংযামক নহে। "নৈব তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।" (ছাঃ ৩। ১১। ২) সেই ব্রহ্মলোকে এই সূর্য্য কখন অস্তগতও হন না, উদিতও হন না। তাৎপর্য্য এই যে, 'ব্রহ্মলোকে সূর্য্য, জীবন হ্রাস করেন না।' (তত্ত্ববাদিনী) সেই লোক, জগৎ-সবিতা হিরণ্যগর্ভরূপ মহাসূক্ষ্ম সূর্য্যের অধিকারস্থ। 'যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা' যেখানে প্রথমজ অব্যয়াত্মা অমৃতস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ সংসারের বীজরূপে যাবৎ সংসার স্থায়ী তাবৎকাল অবস্থিত আছেন। (শাঙ্কর ভাঃ ১ মুঃ ২-খঃ ১১ শ্রু।) 'তেষামসৌ বিরজোব্রহ্মলোক ন যেষু জিহ্ম মনৃতং ন মায়াচেতি।' (১ প্রঃ ১৬।) যাঁহাদের কৌটিল্য বা অসত্য ব্যবহার নাই এবং মিথ্যাচাররূপা মায়া নাই। 'আদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণঃ প্রাণাত্মভাবঃ বিরজঃ শুদ্ধ. অসৌব্রহ্মলোকঃ তেষাং।' (শাঙ্কর ভাঃ ১ প্রঃ ১৬) তাঁহাদেরই নিমিত্তে এই আদিত্যোপলক্ষিত, উত্তরাগতিস্বরূপ, সূক্ষ্মপ্রাণস্বরূপ, রজো-মলবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক। 'অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মান মন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদ-মৃতমভয় মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি।' (ঐ ১০) যাঁহারা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও হিরণ্যগর্ভবিষয়া বিদ্যাদ্বারা হিরণ্যগর্ভরূপ সূক্ষ্ম সমষ্টি প্রাণাত্মাকে অন্বেষণ করেন, তাঁহারা উত্তর পথদ্বারা হিরণ্যগর্ভ-ভুবনরূপ আদিত্যলোকে গমন করেন। এই লোকই প্রাণ সকলের আয়তন, ইহাই অমৃত, ইহাই পরমগতি, ইহা হইতে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ভূলোক পিতৃলোক, এবং দেবলোকে ভোগের যতবিধ উপাদান আছে, এই ব্রহ্মলোক,

তাহার সূক্ষ্ম ও তৈজস আয়তন ক্ষেত্র। এখানে সূক্ষ্ম জ্যোতি ও জ্ঞান-জ্যোতি বিরাজিত। প্রভু হিরণ্যগর্ভ হইতে তাহা নিঃসৃত হইয়া যোগী ও তাপসমণ্ডলের মহৈশ্বর্য্য ও বিভূতিস্বরূপ হইয়াছে। ঐ বিভূতি ভক্ত্য ভোক্তাগণের সঙ্কল্পিত অন্তর্দ্ধানাবস্থায় সাত্ত্বিক জ্ঞান মাত্র; কিন্তু তাঁহাদের ঐচ্ছিক দেহ প্রকাশ ও ভোগাদিকালে তাহা সঙ্কল্পরূপ-শক্তি-সম্পন্ন। প্রাগুক্ত দেবলোক এবং এই শেষোক্ত ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয় উভয়ই উত্তর মার্গে স্থিত। উভয়ই অর্চ্চিরাদি মার্গ ও দেবযান নামে উক্ত হয়।

সর্ব্ব সঙ্কল্পের আশ্রয়, সর্ব্ব প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ামক, এবং সর্ব্ব জ্ঞানের সমষ্টি আধার ও আকরস্বরূপ প্রভু হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি-সঙ্কল্পরূপ জাগরণ এবং সৃষ্টিশক্তির বিশ্রামরূপ নিদ্রাই যথাক্রমে ব্রহ্মলোকে দিবস ও রাত্রি শব্দের বাচ্য। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ-নিষ্পাদিত জ্ঞান, শক্তি, ভোগ প্রভৃতির ক্ষয় হইলেই ঐ বিরামকাল উপস্থিত হয়। মানবীয় এক সহস্র চতুর্যুগের পর এবং দৈব ১২০০০০০০ বর্ষের অন্তে সেই কালটি আগত হয়। ঐকালে যোগৈশ্বর্য্যরূপ সূক্ষ্ম প্রাকৃতিকতত্ত্ব নিদ্রিত হয় বলিয়া উহা ব্রহ্ম-ভুবনের রাত্রিস্বরূপ। তাদৃশ রাত্রির পরিমাণ সহস্র চতুর্যুগব্যাপী। যোগৈশ্বর্য্যই সকল স্থূল ঐশ্বর্য্য ও প্রাণের সূক্ষ্ম আয়তন। সুতরাং তাহার নিদ্রাতে নিমগ্ন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে লীন হয় এবং তাহার জাগরণে পুনঃ সৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রলয় ও সৃষ্টিতে, সূক্ষ্মভূতগণ এবং সূক্ষ্মদেহ সমূহ বিনষ্ট ও কৃত হয় না। তাহার সহিত কেবল স্থূলাবয়বেরই সম্পর্ক। এইরূপ সৃষ্টির নাম নৈমিত্তিক সৃষ্টি এবং তাহার পরমায়ুর নাম কল্পকাল। আর, এইরূপ প্রলয়কে নৈমিত্তিক প্রলয় ও কল্পান্ত কহে।

ঐরূপ জাগরণ ও নিদ্রা অর্থাৎ দিবারাত্রিই ব্রহ্ম দিবারাত্রি শব্দের বাচ্য। তাদৃশ দিবারাত্রিকে অধিকার পূর্ব্বক ব্রহ্মার শত বর্ষ পরমায়ু ভোগ হয়। তদ্ভুক্ত প্রতিদিনে একটি নৈমিত্তিক সৃষ্টির উদয় হয় এবং প্রতিরাত্রিতে নৈমিত্তিক প্রলয়। অতএব ব্রাহ্মপরিমিত উক্ত শতবর্ষের মধ্যে তাদৃশ সৃষ্টি ও প্রলয় পুনঃ পুনঃ ৩৬০০০ বার সংঘটিত হয়। তাহার পর প্রকৃতি-শক্তি মূলতঃ নিস্তেজ হইয়া যখন পুনঃ সংশোধনার্থ পরব্রহ্মে প্রবেশ করে; সেইকালকে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। তাহাতে প্রকৃতির সূক্ষ্মধাতু পর্য্যন্ত উপসংহৃত হয়। সূক্ষ্মভূত, সূক্ষ্মবিভূতি ও সূক্ষ্মদেহ, কারণরূপিণী শক্তিতে পরিণত হইয়া পরব্রহ্মেতে সাম্যাবস্থা লাভ করে। তখন ব্রহ্মার সহিত

ব্রহ্মানন্দে আনন্দ যোগী, পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মার প্রাগুক্ত প্রকার দিনরাত্রি ও পরমায়ু সংখ্যা যাহা উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই যোগ-নিষ্পাদ্য গণনা। সামান্য বুদ্ধিতে তাহা স্ফূর্ত্তি পায় না।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

বঙ্গে ইংরাজাধিকার।

৫।

উমিচাঁদের সম্বন্ধে যে দুই খানি অঙ্গীকার পত্র প্রস্তুত হয়, তাহার এক খানি শ্বেত ও অপর খানি লোহিত বর্ণের। লোহিত বর্ণের পত্রে উমিচাঁদকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিবার কথা ছিল, কিন্তু শ্বেত বর্ণের পত্রে তাহার কিছুই ছিলনা, সুতরাং শ্বেতবর্ণ পত্রখানি প্রকৃত ও লোহিত বর্ণ পত্রখানি অলীক। ক্লাইব প্রকৃত অঙ্গীকার পত্রে ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিয়া, উভয় পত্রই ওয়াট্‌সের নিকট প্রেরণ করিলেন, এবং এ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, তাহাও লিখিয়া পাঠাইলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রায় দুর্লভ ও মীরজাফর সৈন্যদল লইয়া পলাশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংরাজেরা অকস্মাৎ পলাশীতে নবাবের সৈন্য দেখিয়া মনে করেন, নবাব তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু নবাব ইহাতে প্রকাশ করেন যে, ইংরেজদিগের অনিষ্ট-সাধন জন্য পলাশীতে সৈন্য স্থাপিত হয় নাই। সিরাজউদ্দৌলা যখন এইরূপে আত্মদোষ ক্ষালন করিতেছিলেন, তখন সহসা আর একটি ঘটনায় অদূরদর্শী অপরিপক্কমতি হতভাগ্য সিরাজকে অধিকতর চক্রান্ত জালে জড়িত করিয়া তুলে।

১৭৫৭ অব্দের ৩রা মে হঠাৎ কলিকাতায় একটি অপরিচিত পুরুষ উপস্থিত হন, আগন্তুকের নাম গোবিন্দ রায়। তিনি মহারাষ্ট্র সেনাপতি বলজী রাওর দূত বলিয়া আপনার পরিচয় দেন। তাঁহার নিকট বলজী রাওর একখানি পত্র ছিল, এই পত্রে বলজীরাও প্রস্তাব করিয়াছিলেন

যে, যদি কলিকাতার ইংরেজ গবর্ণর সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি এক লক্ষ সৈন্য সহিত বাঙ্গালায় উপস্থিত হইবেন, এবং ইংরেজদিগের সহযোগী হইয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। এই পত্র উপস্থিত হইলে, ইংরেজদিগের সমিতিতে উহার সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়, অবশেষে ক্লাইব বিশেষ চতুরতা দেখাইয়া, উহা নবাবের নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। তিনি এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে, উপস্থিত পত্র নবাবের নিকট পঁহুছিলেই, ইংরেজদিগের উপর নবাবের বিশ্বাস জন্মিবে। নবাব আপাততঃ বুঝিতে পারিবেন যে, ইংরেজদিগের কোনও দুরভিসন্ধি নাই, কেননা তাহারা মহারাষ্ট্র সেনাপতির গোপনীয় পত্র দেখাইয়া আপনাদিগের সদাশয়তার পরিচয় দিতেছে। সমিতিতে ক্লাইবের এই প্রতারণাময়ী যুক্তির সম্মান রক্ষিত হয়—সকলেই উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করেন, সুতরাং ক্লাইব বলজীরাওর গোপনীয় লিপি ও আপনার লিখিত আর একখানি পত্র স্ক্র্যাফ্টন সাহেব দ্বারা নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেন। ক্লাইব আপনার পত্রে প্রকাশ করেন যে, মহারাষ্ট্র সেনাপতির গোপনীয় পত্র পাঠাইয়া দেওয়াতেই সপ্রমাণ হইতেছে, ইংরেজেরা নবাবের সহিত শান্তভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন। নবাব কেন যে পলাশীতে সৈন্য রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই সৈন্য থাকাতে ইংরেজদিগের বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হইতেছে এবং ইহাতে ইংরেজদিগের মনে এই সন্দেহ হইতেছে যে, যখন সুযোগ উপস্থিত হইবে, তখনই নবাব তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইবেন। যখন নবাব গভীর আশঙ্কার তরঙ্গে দোলায়মান ছিলেন, ইংরেজদিগের উপর যখন তাঁহার গভীর অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছিল, তখন বলজীরাওর পত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। পত্র পাইয়া সিরাজ আবার বিচলিত হইলেন—আবার একটির পর আর একটি চিন্তার তরঙ্গ তাঁহাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। তিনি আবার এই চিন্তার আবেগে অধীর হইয়া, সুখময় স্বপ্নের অপূর্ব্ব-বিভ্রম দেখিতে লাগিলেন।

নবাব বলজীরাওর পত্রের বিষয় পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না। বলজীরাও যে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন, ইহা পূর্ব্বে তাঁহার বিদিত হয় নাই। এখন সহসা এই বিপদের সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। নবাব বুঝিলেন যে, ইংরেজেরা তাঁহার হিত-সাধন

...বর্দি তাঁহাকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং ইংরেজদিগের উপর তাঁহার অপরিসীম বিশ্বাসের আবির্ভাব হইল। তিনি ভাবিলেন, ইংরেজদিগকে অবিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে—ইংরেজগণ প্রকৃত প্রস্তাবে অবিশ্বস্ত বা অসাধু নহেন। তাঁহারা অবিশ্বস্ত হইলে, কখনও বলজীর পত্র পাঠাইয়া দিতেন না, সুতরাং ইংরেজদিগের সদভিপ্রায়ের উপর সন্দেহ স্থাপন করা কখনও উচিত নহে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, নবাব সুখের আবেশে, ইংরেজদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।—সুখের আবেশে, ইংরেজদিগকে শুভানুধ্যায়ী পরম মিত্র বলিয়া মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। ক্লাইবের চাতুরী ফলবতী হইল। বলজীরাওর পত্র নবাবের সম্বন্ধে অধিকতর মোহের অন্ধকার বিস্তার করিল। নবাব অধিকতর মোহজালে জড়িত হইয়া ক্লাইবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন, তিনি প্রথমে মীরজাফরকে সৈন্য সহিত মুর্শিদাবাদে আসিবার জন্য আদেশ দিতে চাহিলেন। মারহাট্টারা বাঙ্গালা আক্রমণ করিলে, রাজা দুর্লভরাম ইংরেজদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, সেই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি দুর্লভরামকে সৈন্যের সহিত পলাশীতে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া, ওয়াট্‌স ও স্ক্রাফ্‌টন সাহেব নানা কৌশলে নবাবকে সমুদায় সৈন্য ফিরাইয়া আনিতে পরামর্শ দিলেন, নবাব কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে এই পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। মীরজাফর আপনার সৈন্য দল লইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার চারি দিন পরে, রাজা দুর্লভরামও অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত নবাবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মহারাষ্ট্র সেনাপতির পত্র সিরাজের হস্তগত হওয়াতে, ইংরেজদিগের পক্ষে একরূপ অচিন্তনীয় সুযোগ উপস্থিত হইল। ইংরেজদিগের উপর নবাবের যে ক্রোধ ও অবিশ্বাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই পত্র তাহা দূর করিল। ইহা নবাবের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল যে, ইংরেজ হইতে আর কোনও আশঙ্কা নাই। যখন ইংরেজেরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, নবাবকে পদচ্যুত করিবার উপায় স্থির করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের রাজ্যভোগ লালসা বলবতী

হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ইহা নবাবের মনে ইংরে— [illegible] করিয়া ফেলে।

এই পত্র আর একদিকে ইংরেজদিগের বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সিরাজ বয়সের অল্পতা প্রযুক্ত সময়ে সময়ে বুদ্ধির চাঞ্চল্য দেখাইতেন। মীরজাফরের উপর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অবিশ্বাস ও বিরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। এত দিন তিনি ভয়ে কিছু বলিতে পারেন নাই, এখন ইংরেজেরা সহায় আছেন ভাবিয়া সিরাজ অধিকতর সাহসী হইয়া উঠিলেন। মীরজাফর পলাশী হইতে প্রত্যাগত হইলে, নবাব তাঁহার প্রতি সাতিশয় কঠোর-ভাব দেখাইলেন। ইহাতে মীরজাফর স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, নবাবের সহিত তাঁহার আর সদ্ভাবের আশা নাই; সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব-বিদ্বেষ দৃঢ়তর হইল—প্রতিহিংসা বলবতী হইয়া উঠিল—তিনি আপনার প্রাসাদে আসিয়া অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য ও কর্ম্মচারীকে আদেশ প্রাপ্তিমাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। নবাবের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত ইংরেজদিগের যে ষড়যন্ত্র হইতেছিল, এখন হইতে তাহার কার্য্য অধিকতর সুনিয়মে ও সত্বরতার সহিত সম্পাদিত হইতে লাগিল। এইরূপে বলজীর পত্র উভয় দিকেই ইংরাজদিগের সমূহ উপকার সাধন করিল—ইহা একদিকে যেমন ইংরাজদিগের উপর নবাবের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল, অপর দিকে, তেমনই নবাবের একজন প্রধান সেনাপতিকে তাঁহার ঘোরতর শত্রু করিয়া তুলিল।

এই সময়ে, ওয়াট্‌স সাহেব আপনার একজন বিশ্বস্ত দূত দ্বারা মীরজাফরের নিকট সন্ধিপত্র পাঠাইয়া দেন। মীরজাফর যদিও এখন সিরাজউদ্দৌলার ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন, যদিও এখন যে কোন উপায়ে হউক, সিরাজের সর্ব্বনাশ সাধন তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তথাপি তিনি রাজা দুর্লভরামের সহিত পরামর্শ না করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন না। ৩রা জুন রাজা দুর্লভরাম পলাশী হইতে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হন। ইহার পর দিন মীরজাফর তাঁহাকে সন্ধিপত্র দেখান। রাজা দুর্লভরাম সন্ধিপত্রে বহুসংখ্যক অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই সকল টাকা দেওয়া হইলে, রাজকোষ শূন্য হইয়া উঠিবে, প্রজাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ না করিলে, আর

[illegible] হইবে না সুতরাং তিনি নবাবের ধনাগারে এখন যে আছে, তাহা মীরজাফর ও ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে তুল্যরূপে ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ওয়াটস সাহেব এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। তিনি সন্ধি-পত্র-নির্দ্দিষ্ট কোনও প্রস্তাবের কোনও অংশ পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অসম্মতি দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাত হইল না। তিনি চতুরতা পূর্ব্বক দুর্লভ রামকে আপনার পক্ষে আনিলেন। আর দুর্লভ রাম কোনরূপ আপত্তি দেখাইলেন না। সুতরাং ৪ঠা জুন মীরজাফর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ঐ দিনই নবাব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া, খোজাহাদী নামক এক ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতি করিলেন। বলা বাহুল্য যে, উপস্থিত সন্ধিপত্রের বিষয় এ পর্য্যন্ত নবাবের গোচর হয় নাই, নবাব কেবল আন্তরিক বিদ্বেষ-প্রযুক্ত মীরজাফরকে এইরূপ দণ্ডিত করেন।

মীরজাফর এইরূপে সেনাপতির পদ হইতে বিচ্যুত হওয়াতে নবাবের উপর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং অধিকতর আগ্রহের সহিত ইংরেজ বণিকদিগের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। যেদিন মীরজাফর পদচ্যুত হন, তাহার পরদিন তাঁহার সহিত ওয়াটস্ সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। অন্তঃপুরচারিণীদিগকে যেরূপ বস্ত্র আচ্ছাদিত পাল্কিতে লইয়া যাওয়া হয়, ওয়াটস সাহেব নবাবের ভয়ে সেইরূপ পাল্কীতে চড়িয়া মীরজাফরের কাছে গিয়াছিলেন। সুতরাং উহাতে নবাবের লোকদিগের মনে কোনও রূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল কোনও অন্তঃপুর মহিলাই ঐ পাল্কিতে যাইতেছে। ওয়াটস মীরজাফরের নিকট উপনীত হইলেন মীরজাফর কহিলেন, যে, এখন তিনি অনায়াসে ৩ হাজার সৈন্য লইয়া ইংরেজদিগের সপক্ষতা করিতে পারেন। কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য প্রধান লোক নবাবের উপর যেরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ সকল লোককে তিনি আপনার পক্ষে আনিতে পারিবেন। ইহার পর মীরজাফর গম্ভীর ভাবে শপথ করিয়া আপনার প্রতিশ্রুতি-পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, এবং কলিকাতার ইংরেজদিগকে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে অভীষ্ট বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ওয়াটস্ সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করেন। ইহার পর তিনি দুইখানি সন্ধিপত্র আপনার কোনও বিশ্বস্ত

কর্ম্মচারীর দ্বারা কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে কথাবার্ত্তা হইলে ওয়াট্‌স্‌ সাহেব বিদায়গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় ছদ্মভাবে আপনার আবাস-গৃহে ফিরিয়া আসেন।

এখন ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের কেবল আর একটি মাত্র কার্য্য বাকি রহিল। উমিচাঁদের সম্বন্ধে যে দুইখানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা গোপনে গোপনে ২।৪ জনের কাণে উঠিয়াছিল। এই সময়ে উমিচাঁদ মুর্শিদাবাদে ছিলেন। যদি উপস্থিত বিষয় তাঁহার গোচর হয়, তাহা হইলে সমস্ত পণ্ড হইবে এই আশঙ্কায় ওয়াট্‌স্‌ সাহেব তাঁহাকে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি উমিচাঁদকে অধিকতর নিরাপদ করিবার ভাণ করিয়া কৃত্রিম বন্ধুতা দেখাইয়া পরামর্শ দিলেন যে, এখন নবাবের সহিত যেরূপ বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে, তাহাতে মুর্শিদাবাদে থাকিলে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে। সুতরাং স্ক্রাফ্‌টন সাহেবের সহিত তাঁহার তাড়াতাড়ি কলিকাতায় প্রস্থান করা উচিত। ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের কৌশল ব্যর্থ হইল না। উমিচাঁদ ধনাগার হইতে কিছু টাকা লইবার জন্য একদিন মাত্র অপেক্ষা করিতে চাহিলেন। কিন্তু যখন তিনি নবাবের কোষাগার হইতে টাকা পাইলেন না, তখন আর মুর্শিদাবাদে অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। উমিচাঁদ ৮ই জুন কলিকাতায় পঁহুছিলেন। ইহার ২ দিন পরে দুইখানি অঙ্গীকার পত্র লইয়া মীরজাফরের দূত কলিকাতায় আসিল। কলিকাতার ইংরাজ-সমিতি পূর্ব্বেই সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; এখন অঙ্গীকারপত্র দুইখানি উপস্থিত হওয়ামাত্র অঙ্গীকার পত্রের যেখানি অলীক, সেইখানি উমিচাঁদকে দেখান হইল। উমিচাঁদ দেখিলেন যে, এই পত্রে তাঁহার সমস্ত দাবি পূরণের কথা লেখা রহিয়াছে; ইংরেজ সমিতির সকলেই ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। সুতরাং যে গভীর সন্দেহে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইল। উমিচাঁদ প্রতিজ্ঞাপত্র দেখিয়া আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

সমুদায় ঠিক হইল। চাতুরীতে, প্রবঞ্চনা-বলে, বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে একজনের সর্ব্বনাশ ও আর একজনকে হতাশ্বাস করিবার সমুদয় কথাবার্ত্তা, সমুদয় কৌশল ও সমুদয় মন্ত্রণা ঠিক হইয়া গেল। ক্লাইব এখন সুযোগ বুঝিয়া শেষ কার্য্য-সাধনে উদ্যত হইলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে

পারিলেন যে, তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহা সম্পন্ন হইলে সমস্ত বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় ইংরেজ কোম্পানির প্রভু-শক্তি বদ্ধমূল হইবে, অধিকন্তু ইহাতে তাঁহার নিজের নামও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। সুতরাং তিনি এ সুযোগ ছাড়িতে কোন আশঙ্কায় বা ভয়ে, নিরাশায় বা নিরুৎসাহে পশ্চাৎপদ হইলেন না। ইংরেজ সৈনিক-পুরুষেরা ২০০ শত খানি নৌকায় করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল, সিপাহিরা স্থল পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবাবের যে ২ জন দূত ক্লাইবের সঙ্গে ছিল, ক্লাইব তাহাদিগকে ইহার পূর্ব্ব দিনই বিদায় দিয়াছিলেন। দূত দ্বয়ের দ্বারা তিনি নবাবের নিকট একখানি পত্র পাঠাইয়া দেন। এই পত্রে ক্লাইব সাহস করিয়া নবাবের নিকট লিখেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে নবাবের সহিত যে সন্ধি হয়, নবাব সে সন্ধির নিয়ম পালন না করাতে দোষী হইয়াছেন। কলিকাতায় তিনি যে সম্পত্তি লুঠিয়া লইয়াছেন, ৪ মাসের মধ্যে তাহার পাঁচ ভাগের একভাগের বেশি ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি থাকাতেও তিনি আপনার সাহায্যার্থ ফরাসি সেনাপতি বুসিকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং এই সময়ে ল নামক আর একজন ফরাসি সেনাপতির অধীনে আপনার রাজধানীর ১০০ শত মাইলের মধ্যে একদল ফরাসি সৈন্য রাখিয়াছেন। এইরূপে ইংরেজদিগের যারপরনাই অবমাননা করা হইয়াছে। এইরূপ অবিশ্বাসের কার্য্য এবং এইরূপ শত্রুতা করাতেও ইংরেজেরা এতদিন অসাধারণ ধীরতা দেখাইয়া আসিয়াছেন। যখন আফগানদিগের আক্রমণ আশঙ্কায় নবাব বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন ইংরেজেরা তাঁহার সাহায্যার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু নবাবের পুনঃ পুনঃ গর্হিতাচরণে এখন তাঁহাদের স্থিরতা বিচলিত হইয়াছে। তাঁহারা আর কোনও উপায় না দেখিয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া এই বিষয়ের বিচার ভার নবাব সরকারের প্রধান কর্ম্মচারী মীরজাফর খাঁ রাজা রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ এবং মোহনলালের উপর সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ক্লাইবের আশা আছে যে, নবাব এই সালিসিতে সম্মত হইয়া নর শোণিত পাত বন্ধ রাখিবেন। ইহার পর, ক্লাইব পত্রের উপসংহারে কহেন যে, বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে নবাবের নিকট হইতে উত্তর পঁহুছিতে অনেক বিলম্ব হইবে। এজন্য গুরুতর প্রয়োজনের অনুরোধে তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

রাজ্যাধিপতির নিকট এরূপ কঠোর পত্র বোধ হয় আর কেহ কখন পাঠায় নাই, এবং রাজ্যাধিপতির কাছে এরূপ গর্ব্ব, এরূপ ঔদ্ধত্য ও এরূপ অপমান সূচক ভাব, বোধহয়, আর কেহ কখন প্রকাশ করে নাই। একদল বিদেশী যাঁহার অধিকারে বাস করিয়া যাঁহার অধিকৃত রাজ্যের সমৃদ্ধিতে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতেছিল, তিনিই শেষে সেই বিদেশী, বিজাতি, লাভালাভ গণনা-নিপুণ, ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায়ী বণিকদিগের এইরূপ অবজ্ঞা ও এইরূপ অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্থির ভাবে বিচার করিলে, এ বিষয়ে ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগেরই গুরুতর অপরাধ লক্ষিত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি যখন ক্লাইব তরুণমতি নবাবকে আপনাদের সৈন্য বল দেখাইয়া চমকিত করেন সেই দিন হইতেই ইংরেজেরা নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নানা কার্য্য করিয়া নবাবকে ঘোরতর অপদস্থ করিয়া তুলেন। তাঁহারা নবাবের মতের বিরুদ্ধে চন্দন নগর অধিকার করেন। সেনাপতি লর অধীনে যে ফরাসি সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে কাশিম বাজার হইতে তাড়াইয়া দিতে জোর করিয়া নবাবের মত লওয়ান, নবাব সরকারে যে সকল কৃতঘ্ন কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং শেষে এই কৃতঘ্ন কর্ম্মচারীদিগের উপরই নবাবের ব্যবহার সম্বন্ধে বিচার করিবার ভার দিবার প্রস্তাব করেন। এইরূপ অবাধ্যতা এইরূপ অনধিকার-চর্চ্চা ও শান্তির এইরূপ ব্যাঘাত চেষ্টা কখনও মার্জ্জনীয় নহে। যে তরুণ-বয়স্ক যুবক সর্ব্বদা নানা আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত যাঁহার অধঃপতন-সাধনে উদ্যত হইয়াছিল, ক্লাইব তাঁহাকেই রাজ্যচ্যুত সম্পত্তিচ্যুত করিবার জন্য এইরূপ ধার্ম্মিকতা, সদাশয়তা ও ধীরতার ভাণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম, সৎসঙ্কল্প ও সদাচারের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে নির্দ্দোষ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি পত্রে যে সদুদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস ঘাতকতার পরিপূর্ণ। তাঁহার কথা ও তাঁহার কার্য্যের কোন মূল্য নাই, তিনি ধীরতার নামে অধীরতার একশেষ দেখাইয়াছেন, সুবিচারের নামে অবিচারের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন এবং ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধিপতি নির্দ্দোষ তরুণমতি যুবক তাঁহারই কৌশল জালে জড়িত হইয়া, তাঁহারই চাতুরী ভেদ করিতে না পারিয়া, বিস্তীর্ণ রাজ্য ও বিপুল ধন সম্পত্তির সহিত জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দেন।

এদিকে মুর্শিদাবাদে এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে কানাঘুসা হইতে লাগিল। মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, জারলতিক খাঁ প্রভৃতি সকলেই আপনাদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন। কথা ক্রমে নবাবের কাণে উঠিল। নবাব আভাসে বুঝিতে পারিলেন যে, কোন একটি গুরুতর ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হইতেছে। মীরজাফর এই ষড়যন্ত্রের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছেন। নবাব মীরজাফরের উপর পূর্ব্বেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এখন উপস্থিত ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দুরদৃষ্ট ও চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বেই ক্রোধের আবেগে মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। নবাব, আপনার সঙ্কল্প, ফলোন্মুখ হওয়ার পূর্ব্বে, চাপিয়া রাখিতে জানিতেন না। মীরজাফর পূর্ব্বহইতেই নবাবের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। নবাব যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিয়াছেন, মীরজাফর ইহা জানিতে পারিয়া বিশেষ সাবধানে বাস করিতে লাগিলেন। ৮ই হইতে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত মীরজাফর ও ওয়াট্‌স্ সাহেব, উভয়েরই মনে বড় আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। নবাব ক্রোধের আবেগে কখন কি করিয়া বসেন, মীরজাফর সর্ব্বদা সে জন্য চিন্তিত ছিলেন। এখন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া ওয়াট্‌স্ সাহেবকে পলাইতে কহিলেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব এই প্রস্তাবে আর অমনোযোগ দেখাইলেন না। ১৩ই জুন তিনি কার্য্য-পরিদর্শনচ্ছলে কাশিমবাজার গমন করেন। সেইখানে আর ৩ জন ইংরেজ তাঁহার সহিত মিলিত হন। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময়ে সকলে অগ্রদ্বীপে উপনীত হন। এইখানে নবাবের যে সকল সৈনিক পুরুষ ছিল, তাহারা নিদ্রিত ছিল, সুতরাং তাঁহাদের আর কোনও ব্যাঘাত উপস্থিত হইল না। তাঁহারা ক্রমে ভাগীরথী বাহিয়া পরদিন কালনায় আসিলেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব কালনা হইতে মীরজাফরের নিকট লোক পাঠাইয়া আপনার নিরাপদে উপস্থিতির সংবাদ জানাইলেন।

সিরাজউদ্দৌলা যখন মীরজাফরের আবাস-গৃহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন ওয়াট্‌স্ সাহেব ও তাঁহার সঙ্গিগণের পলায়ন সংবাদ তাঁহার নিকট পহুছিল। এই সংবাদে তিনি সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিলেন। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইংরেজরা তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত

হইয়াছে। ভয়ের আবেগে তাঁহার মানসিক ভাব পরিবর্তিত হইল, তিনি আবার মীরজাফরের সহিত সদ্ভাব-স্থাপনে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বয়সের অল্পতাপ্রযুক্ত নবাবের আদৃশ ধীরতা বা স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ছিল না। কোন দূরদর্শী অভিজ্ঞ লোকের মন্ত্রণায় পরিচালিত হইলে, নবাব এখনও ইংরেজদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আপনাকে নিরাপদ করিতে পারিতেন। তিনি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলেন। এই প্রমাণ পাইয়াই সেই বিশ্বাসঘাতককে দণ্ডিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। নবাব যদি আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতেন, মীরজাফর যদি তাঁহার আদেশে দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত হইতেন, তাহা হইলে, তিনি অনায়াসেই আপনার বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া বিদেশী বণিকদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিবার সুবিধা পাইতেন। কিন্তু বুদ্ধির চাঞ্চল্য প্রযুক্ত নবাব প্রতিমুহূর্ত্তে এক সঙ্কল্প ছাড়িয়া অন্য সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এ সময়ে কোন দূরদর্শী ব্যক্তি তাঁহাকে সৎপথ দেখাইয়া দেন নাই। তাঁহার বিশাল রাজ্যের শাসন-ভার যাঁহাদের হস্তে সমর্পিত ছিল, তাঁহারা পর্য্যন্ত এসময়ে তাঁহার উচ্ছেদ-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। গভীর আশঙ্কার তীব্র জ্বালা হতভাগ্য নবাবকে প্রতিমুহূর্ত্তে বিচলিত করিয়া তুলিত। তিনি একবার যাহা ভাল বুঝিতেন, আর একবার তাহাই অনিষ্টের হেতুভূত বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার অভিসন্ধি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইত। তিনি মীরজাফরকে দণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এখন ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের পলায়নে ভীত হইয়া মীরজাফরের প্রতি সদ্ভাব দেখাইয়া তাঁহাকে আপনার পক্ষে আনিতে উদ্যত হইলেন। মীরজাফরের সহিত নবাবের সাক্ষাৎ হইল। মীরজাফর মুখে স্বীকার করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি ইংরেজদিগের কোনও রূপ সাহায্য করিবেন না; নবাব স্বীকার করিলেন যে শান্তি স্থাপিত হইলে, তিনি মীরজাফরকে তাঁহার পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া নিরাপদে স্থানান্তরে যাইতে অনুমতি দিবেন।

মীরজাফরের আশ্বাসবাক্যে নবাবের ভয় দূর হইল; কিন্তু যে একবার বিশ্বাসঘাতক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, সে আপনার অঙ্গীকার কতদূর রক্ষা করিবে, নবাব তাহা বুঝিলেন না। তিনি সরলভাবে সকলকেই বিশ্বাস করিতেন; যাহার মুখে মিষ্ট কথা শুনিতেন; তাহাকেই বিশ্বাসী ও আত্মীয় ভাবিতেন;

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে তিনি এখন হিতৈষী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। মীরজাফরের আশ্বাস বাক্যে তাঁহার হৃদয় শান্ত হইল, সাহস বৃদ্ধি পাইল; ক্লাইব তাঁহার নিকট যে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তিনি ক্লাইবের নিকট একখানি পত্র পাঠাইলেন। অসময়ে ও তাঁহার অজ্ঞাতসারে ওয়াট্‌স্ সাহেব পলাইয়া যাওয়াতে এই পত্রে তিনি ক্লাইবকে ভর্ৎসনা করিলেন, এবং কহিলেন যে তাঁহার অসদ্ব্যবহার ও তাঁহার সাক্ষ্য প্রযুক্ত তিনি এখন পর্য্যন্ত পলাসীতে আপনার সৈন্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই পত্র পাঠাইবার পর নবাব তাঁহার নিজের ও মীরজাফরের সমস্ত সৈন্য পলাসী যাত্রা করিবার আদেশ দিলেন, এবং ফরাসি সেনাপতি লকে তাঁহার সাহায্যার্থ ভাগলপুর হইতে আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ১২শে জুন নবাবের সমস্ত সৈন্য পলাসীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে ইংরেজেরা অগ্রসর হইতেছিলেন। ১৭ই জুন ক্লাইব দুই শত ইউরোপীয় ও পাঁচ শত দেশীয় সৈন্য সহ সেনাপতি আইয়ার কুট সাহেবকে কাটোয়ার দুর্গ অধিকার করিতে পাঠাইলেন। এই দুর্গটি মৃত্তিকার নির্ম্মিত। নবাবের কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। উপস্থিত সময়ে নবাবের কাটোয়ার দুর্গের সেনাপতিও বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বিনা যুদ্ধে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিতে প্রতিশ্রুত হন, কুট সৈন্য সহ উপস্থিত হইলে, দুর্গাধ্যক্ষ মুখে তাঁহাকে বাধা দিবার ভয় দেখাইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিলেন না। দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গ ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। দুর্গ সহজেই কুটের হস্তগত হইল। এই দুর্গে এত শস্য সঞ্চিত ছিল যে, তাহাতে ১০ হাজার লোকের একবৎসরের আহারের সংস্থান হইতে পারিত। সেনাপতি সমস্ত শস্য-সম্পত্তি অধিকার করিলেন। যে বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে পলাসির প্রান্তরে হতভাগ্য সিরাজের অধঃপতন ঘটে, কাটোয়াতে তাহার সূত্রপাত হইল।

মীরজাফর, নবাবের সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলনের সংবাদ ক্লাইবকে জানাইয়াছিলেন। তিনি যে, ইংরেজদিগের কোনও সাহায্য করিবেন না বলিয়া নবাবের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ক্লাইবকে তাহাও লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা পালন করিতে যে, উদাসীন হইবেন না, তাহা পূর্ব্বের

শেষে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন। যে ব্যক্তি নিজে বিশ্বাসঘাতক সে যে অপরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, তাহার স্থিরতা নাই; সুতরাং ক্লাইব মীরজাফরের কথায় বড় একটা সুস্থির হইলেন না। ইহার পর মীরজাফরের আর একখানি পত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিল। এই পত্র ১৯শে জুন লিখিত হয়। মীরজাফর এই পত্রে উল্লেখ করেন যে তিনি সেই দিনই পলাসিতে যাইতেছেন। সৈন্যগণের দক্ষিণভাগে তিনি অবস্থিতি করিবেন। কিন্তু তাঁহার নিজের ও নবাবের সৈন্যের ব্যূহ রচনার সম্বন্ধে কোন কথা পত্রে লেখা হইল না; অধিকন্তু মীরজাফর কি ভাবে ইংরেজদিগের সাহায্য করিবেন, তাহাও কিছু খুলিয়া বলিলেন না। এই পত্র পাইয়া ক্লাইবের হৃদয় কিছু শান্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি এখনও ইতস্তত করিতে লাগিলেন। অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া নবাবের বহুসংখ্য সৈন্য আক্রমণ করা যে, কতদূর অসমসাহসের কার্য্য, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। এখন নানা আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার যথোচিত সাহস ও উদ্যম ছিল; কিন্তু তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বিশ্বাসঘাতকদিগের সহিত যেরূপ গুরুতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন এবং আপনি নানারূপ চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়া যেরূপ দুরূহ কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে নানা দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। মীরজাফর তাঁহার সাহায্য করিবেন কিনা, তাহা এখনও তিনি ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। যে নিজে বিশ্বাসঘাতক, সে একজনের নিকট কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া পরক্ষণে যে তাহার অন্যথাচরণ করিবে না,—তাহারই বা প্রমাণ কি? ক্লাইব কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি উপস্থিত বিষয়ে আপনার সতীর্থদিগের সহিত পরামর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে সমরসংক্রান্ত মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইল। ২০ জন ইংরেজ সৈনিকপুরুষ এই সমিতিতে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্লাইব উপস্থিত সভ্য-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহাদের সৈন্যগণ এখনই ভাগীরথী পার হইয়া নবাবের সৈন্য আক্রমণ করিবে, কি কাটোয়ার দুর্গে যে সকল শস্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাই সম্বল করিয়া বর্ষাকালের শেষ পর্য্যন্ত কাটোয়ায়

অবস্থিতি করিবে এবং ইহার মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির বন্দোবস্ত করা হইবে? ক্লাইব অপরাপর সভ্যদিগের অভিমত প্রকাশের পূর্ব্বেই কাটোয়ায় থাকা উচিত বলিয়া নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু সেনাপতি আইমর কূট এই প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন যে, ইহাতে সময় পাইয়া ফরাসি সেনাপতি ল নবাবের সহিত মিলিত হইবেন। তাঁহার মতে অবিলম্বে নবাবের সৈন্য আক্রমণ করা উচিত। যদি কাটোয়ায় থাকিতে হয়, তাহা হইলে তিনি একেবারে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন; কিন্তু ইহাতে ইংরেজ জাতির নামে কলঙ্ক স্পর্শিবে এবং ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থেরও ব্যাঘাত জন্মিবে। ৬ জন সৈনিকপুরুষ সেনাপতি কূটের পক্ষ সমর্থন করিলেন। সমর সমিতিতে উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক শেষ হইল, কিন্তু ক্লাইবের চিন্তা দূর হইল না। ক্লাইব একাকী কিয়দ্দূরে বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ায় বসিয়া আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া ভাল, কি কাটোয়ায় থাকা উচিত, ক্লাইব কেবল মনে মনে এই প্রশ্নের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল গভীর চিন্তার পর সমুদায় বিষয়ের মীমাংসা হইল। ক্লাইব শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। পথে তাঁহার সহিত সেনাপতি কূটের সাক্ষাৎ হইল। তিনি কূট সাহেবকে কহিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প দূর হইয়াছে। ক্লাইব এই কথা মাত্র বলিয়া শিবিরে আসিলেন, এবং পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে ভাগীরথী পার হইতে হইবে—এই আদেশ-লিপি লিখিতে বসিলেন। আদেশ-লিপি লিখিত হইল। ২২শে জুন প্রাতঃকালে চতুর চূড়ামণির আদেশে সমস্ত ইংরাজ সৈন্য কাটোয়া হইতে পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইল।

নাচত ময়ূর।

১

নাচত ময়ূর তুমি নাচত ময়ূর।

চঞ্চলা চপলা বালা, মেঘ সনে করে খেলা,

চেঁচায় পাগল পারা দাম্ভিক দর্দ্দুর।

সুমধুর কেকারব করত ময়ূর।

চিকুরের ঝন্‌ঝনি, শুনিয়া প্রমাদ গণি,
মার কোলে কাঁদে শিশু ভয়েতে আতুর,
নাচ ত, পাইবে শিশু প্রমোদ প্রচুর।

২

নাচ ত ময়ূর তুমি পেখম খুলিয়া,
দেখিয়া মোহন ছাঁদ ঝলমল কোটি চাঁদ
নীরদের স্নিগ্ধ মন যাইবে ভুলিয়া,
যাবে না কোথাও বায়ু বাহনে তুলিয়া
দেখিয়া বিচিত্র শোভা, মুনির মানসলোভা,
বৃষ্টিছলে মেঘদেহ যাইবে গলিয়া,
শস্য প্রসূ হবে রসা সে রসে মাতিয়া।

৩

নাচ ত ময়ূর তুমি ঘাড় উঁচু করি,
অহিভুক্‌ বিহঙ্গম, সে কি এত মনোরম,
এই ভেবে ঈর্ষাভরে মলিনা শর্ব্বরী
গৌরবে গলায় পরে তাবার নহরী।
সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ খাদ পরিহীন স্বর্ণ
তারাহারে বিভূষিতা হয়ে বিভাবরী
মনে করে তার মত নাহিক সুন্দরী।

৪

নাচ ত ময়ূর তুমি দেখুক রজনী,
কি ছার সোণার ঝারি, করে সে কাকরি নারী,
তোমার কলাপে কত নীলকান্ত মণি!
অমন পালিস পান্না পাবে না রজনী।
ভূপতির পাটরাণি, হয়োনা'কো অভিমানী,
সংখ্যায় গণিত লয়ে গোটাকত মণি,
বনের বিহঙ্গ অঙ্গে মাণিকের খনি

৫

নাচ ত ময়ূর তুমি দোলায়ে চরণ
সম্পৎ ত্যজিয়া শূলী, সার করি ভিক্ষা ঝুলি,

ছাই মাখি গায়ে, পরি হাড়ের ভূষণ,
তথাপি তোমার রূপে মুগ্ধ ত্রিলোচন;
কালকূট পানে নয় নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়,
শোভার সারের সার উমা বিমোহন
নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ করেন ধারণ।

৬

নাচ রে ময়ূর তুমি হেলায়ে শরীরে,
দুর্লভ কৌস্তুভ ভুলে ভ্রমি কালিন্দীর কূলে
গোপবেশী বিষ্ণু যারে তুলিলেন শিরে,
নাচ সে জন পূর্ণ-পরমান গভীরে।
অনুকারি যার পুচ্ছ অন্য ভূষা করি তুচ্ছ,
চক্ষুময় হন ইন্দ্র সকল শরীর,
করুক সে গর্ব্ব-শালী উর্ব্বশী নটীরে।

৭

নাচ রে ময়ূর তুমি দেখাইব ভবে
আসমুদ্র হিমাচল, ছিল যার করতল
প্রবল প্রতাপ সেই দিল্লীর ঈশ্বরে,
দেখাতে মহিমা নিজ সামন্ত নিকরে,
তক্ত তাউসেতে বসে মন বড় ছিল খুসি,
সাজেহা জানিত না কি ঘটিবে পরে।
ময়ূর কার্ত্তিক বিনা কে চড়িতে পারে?

নাচ রে ময়ূর তুমি নাচ রে ময়ূর
তোমারে দেখিয়া পাখি ভাবে বিমোহিত থাকি,
খানিক মনের জ্বালা করি আমি দূর,
শোকতাপে চিত্ত মম বড়ই বিধুর।
শোভারাশি একাধারে দেখিয়া সে বিধাতারে
নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য তবে বাখানি প্রচুর।
নাচ রে ময়ূর তুমি নাচ রে ময়ূর।

ধ্রুব

হিন্দু আজ উৎসন্নপ্রায়। আজিকার দিনে ধ্রুব-কথা কওয়া ভাল—ধ্রুব-কথা কওয়া আবশ্যক। হিন্দুর পুরাণে ধ্রুব-কথা বড়ই অপূর্ব্ব।

উত্তানপাদ রাজার সুরুচি ও সুনীতি নামে দুই মহিষী ছিলেন। রাজা সুরুচিকে যত ভাল বাসিতেন, সুনীতিকে তত বাসিতেন না। রাজার সুরুচির গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম উত্তম, এবং সুনীতির গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম ধ্রুব। একদিন রাজা উত্তমকে কোলে করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় ধ্রুব তথায় আসিল এবং ভাইকে পিতার কোলে বসিয়া খেলা করিতে দেখিয়া আপনিও পিতার কোলে উঠিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সুরুচি ঠাকুরাণী তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। অতএব সুরুচির ভয়ে রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া সুরুচি ধ্রুবকে বলিলেন 'যে কোলে তুমি উঠিতে চাহিতেছ, সে কোলে উঠিবার যোগ্য তুমি নও। পৃথিবীর মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্রবর্ত্তী, কেবল সেই সে কোলে উঠিবার যোগ্য। তুমি যদি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে, তাহা হইলে ঐ কোলে উঠিতে পারিতে। ঐ রাজসিংহাসন সম্রাটের স্থান। আমার পুত্র উত্তমই ঐ স্থানের অধিকারী এবং উপযুক্ত। সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ সাহসে তুমি ঐ উচ্চস্থান অধিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ?' বিমাতার তিরস্কার বালক ধ্রুবের বুকে লাগিল। বালক ক্রুদ্ধ হইয়া মাতার কাছে গেল এবং তাঁহাকে সকল কথা বলিল। দুঃখিনী সুনীতির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। চিরকাল দুঃখভোগ করিয়া তিনি সকল দুরাশা পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছিলেন। অতএব তিনি বালক ধ্রুবকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং বলিলেন যে, লোকে পুণ্যফলে রাজসিংহাসন, রাজছত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভ করে। তোমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ছিল না বলিয়া এজন্মে তোমার ভাগ্যে রাজপদ ও অতুল ঐশ্বর্য্য হইল না। অতএব তোমার যে অবস্থা তাহাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

পুণ্যোপচয় সম্পন্নস্তস্যাঃ পুত্রস্তথোত্তমঃ।
মমপুত্রস্তথাজাতঃ স্বল্পপুণ্যো ধ্রুবোভবান্॥
তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রক।
যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেনতুষ্যতি বুদ্ধিমান্॥

মানুষের এ জন্মের অবস্থা তাহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল; অতএব আপনার কর্ম্মফলে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ইহা অদৃষ্টবাদীর কথা। সুনীতি হিন্দুরমণী। হিন্দুরমণী অদৃষ্টবাদিনী। তাই সুনীতি এই কথা বলিলেন। কিন্তু যে অদৃষ্ট মানে তাহার কি অবস্থান্তরের আশা নাই? আছে বৈকি। সুনীতি বলিলেনঃ—

যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব।
তৎপুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফল প্রদে॥
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণি-হিতে-রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণা পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥

অথবা যদি সুরুচির বাক্যে তোমার মনোমধ্যে অতিশয় দুঃখ বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে সকল প্রকার অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় এরূপ পুণ্যসঞ্চয়ে যত্নবান হও। এবং সুশীল, ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত হইয়া সকলের প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতে আরম্ভ কর, কারণ জল যেমন নিম্নাভিমুখেই গমন করে, সেইরূপ সকল ঐশ্বর্য্যই সৎপাত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে।

(শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ।)

কর্ম্মদোষে বা পুণ্যাভাবে দুরবস্থা হইলে সেই দুরবস্থা হইতে যে নিষ্কৃতি নাই তাহা নয়। সৎকর্ম্ম করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিলে অবশ্যই উত্তম অবস্থা লাভ করা যায়। একবার পাপ করিলে তজ্জন্য যে অধোগতি হয় তাহা অপরিবর্ত্তনীয় নয়। অদৃষ্টবাদের এমন অর্থ নয় যে, যাহার ভাগ্যে যাহা একবার ঘটে তাহার ভাগ্যে তাহা চিরকালই থাকিয়া যায়, কখনই সে তাহা ছাড়াইতে পারে না। তাই অদৃষ্টবাদিনী সুরুচি পুত্র ধ্রুবকে বলিলেন—পুণ্যসঞ্চয় কর, একদিন না একদিন অবশ্যই মনোমত পদ ও সম্পদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব এক প্রকার কর্ম্মের ফল অন্য প্রকার কর্ম্মের দ্বারা অতিক্রম করা যায়। তবেই বুঝিতে হইতেছে যে কোন একটি কর্ম্মফল হইতে একেবারেই যে নিষ্কৃতি নাই তা নয়। ভিন্ন রকম কর্ম্ম করিলে

মানুষ আবার সেই ভিন্ন কর্ম্মের ফলভোগী হয় এবং এই প্রকারে পূর্ব্ব কর্ম্মফল হইতে মুক্তিলাভ করে। অতএব কোন একটি কর্ম্মফল ভোগ করিবার সময় সেই কর্ম্মফল হইতে মুক্তিলাভ করণার্থ ভিন্ন রকম কর্ম্ম করিতে যে চেষ্টা বা উদ্যম আবশ্যক, তাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত নয়। অর্থাৎ কর্ম্মফল অথবা যাহাকে চলিত কথায় অদৃষ্ট বলে তাহা অত্যাজ্য, অনন্ত-কালস্থায়ী বজ্রনিগড় নহে। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যে অদৃষ্টবাদকে ভীষণ Eastern fatalism বলিয়া থাকেন, সে অদৃষ্টবাদ হিন্দুশাস্ত্রে নাই।

সুনীতির কথা ধ্রুবের মনে ধরিল না। সুনীতির কথামত চলিতে গেলে ধ্রুবকে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া তবে ইহজন্মের পুণ্যফলস্বরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। ধ্রুব তাহা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহা করিলে তাঁহার আবার কর্ম্মের ফলভোগ করা হইল, কর্ম্মের গুণেই উৎকৃষ্ট পদলাভ করা হইল, তাঁহার নিজের কি করা হইল, তাঁহার নিজের গুণে কি পাওয়া হইল? ধ্রুব পুরুষকারের পূর্ণ অবতার। তিনি মাতাকে স্পষ্টই বলিলেনঃ—

অম্ব! যৎত্বমিদং প্রাহ প্রশমায় বচো মম।
নৈতদ্ দুর্ব্বচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি॥
সোঽহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামপি পূজিতম্॥
সুরুচির্দয়িতা রাজ্ঞস্তস্যা জাতোঽস্মি নোদরাৎ।
প্রভাবং পশ্য মে২ম্ব! বৃদ্ধস্যাপি তবোদরে॥
উত্তমঃ স মম ভ্রাতা যো গর্ভেণ ধৃতস্তয়া।
স রাজাসনমাপ্নোতু পিত্রা দত্তং তথাস্তু তৎ॥
নান্যদত্তমভীপ্সামি স্থানমম্ব স্বকর্ম্মণা।
ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম॥

(বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ, ১২ অ—২৪-২৮।)

জননি! তুমি আমার সান্ত্বনার নিমিত্ত যে সকল কথা বলিলে, তাহা আমার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিতেছে না, কারণ বিমাতার দুর্ব্বাক্যে আমার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমি যাহাতে নিখিল জগতের পূজ্য ও সকলের শ্রেষ্ঠতম স্থান প্রাপ্ত হই, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইব। রাজা, আমার বিমাতা সুরুচিকে ভাল বাসেন, আমি তাঁহার

উদরে জন্মি নাই, তোমার উদরে জন্মিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু জননি! আমার কিরূপ প্রভাব দেখ। আমার ভ্রাতা উত্তমকে তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, পিতা তাহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করুন, সে পৃথিবীর সম্রাট হউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। মাতঃ! যাহা অন্যে দিবে, এরূপ পদ আমি চাই না। যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই, স্বীয় পুণ্য দ্বারা এরূপ শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করি।

(শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ।)

কি অভিমান! কি তেজ! কি আকাঙ্ক্ষা! কি সাহস! কি বিক্রম! রাজ্য চাই না, রাজ্য ত তুচ্ছ জিনিস। সম্রাট হইতে চাই না সম্রাট হওয়া ত তুচ্ছ কথা। চাই অনন্ত বিশ্বের পূজ্য হইতে, অনন্ত বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইতে, যে স্থান পিতা পিতামহ কেহ কখনও পান নাই, চাই সেই স্থান পাইতে। আর সে স্থান কাহারো কাছে ভিক্ষা চাই না, স্নেহের বা অনুগ্রহের দান স্বরূপ চাই না। আপনার তেজে, আপনার ক্ষমতায়, আপনার প্রভাবে আপনি করিয়া লইতে চাই। ইহাকেই বলে পূর্ণ পুরুষত্ব, ইহাকেই বলে পুরুষকারের পূর্ণমাত্রা। এই অপূর্ব্ব পুরুষকার লইয়া ধ্রুব আর একটি মাত্র কথা না কহিয়া বনে গমন করিলেন। বনে কয়েকটি ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদিগকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন যে, বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে সকল অভিলাষই পূর্ণ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন করিয়া বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করা যায়। তাঁহারা তাঁহাকে যোগ প্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। যোগ প্রণালী শিখিয়া তিনি আর একটি বনে গমন করিয়া এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া যোগে ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। তখন ক্ষুদ্র বালকের পদভরে সসাগরা পৃথিবী বিকম্পিত হইয়া উঠিল, নদ নদী সমুদ্র বিক্ষোভিত হইল, পৃথিবী যায় যায় হইল। দেবতারা ভয়ে আকুল হইয়া তাঁহার যোগ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মায়া প্রভাবে যোগমগ্ন বালক দেখিলেন যে তাঁহার দুঃখিনী মাতা অতি কাতরভাবে তাঁহার কাছে আসিয়া অতিশয় করুণস্বরে তাঁহাকে সেই উৎকট তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। ধ্রুব দেখিয়াও দেখিলেন না, শুনিয়াও শুনিলেন না। তখন দেবতারা তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। পিশাচরূপ ধারণ করিয়া

তাঁহারা দলে দলে ধ্রুবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ভীষণ অস্ত্র সকল ঘুরাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য শৃগাল আসিয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। শব্দ করিবার সময় তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত বিভীষিকাই নিষ্ফল হইল। যোগমগ্ন বালক যোগেই মগ্ন রহিলেন। তখন ভগবান হরি সেই বালকের তন্ময়তা দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্রুবলোক প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল লোকই সেই ধ্রুবলোক দেখিয়া—সেই ধ্রুবলোক ধরিয়া—ভবসাগরে পাড়ি দিতেছে, কেবল আমরাই দিই না! তাই আজ আমরা পৃথিবীতে এত হেয়।

ধ্রুবের অসাধারণ পুরুষকার আমাদের নাই—তাই আমরা মনুষ্য মধ্যে এত হীন হইয়া পড়িয়াছি। তুমি বলিবে, যে অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল মানে, সে পুরুষকারের কথা কয় কেমন করিয়া? উত্তর—কর্ম্মফলের অর্থ এই যে, মন্দ কর্ম্ম করিলে মন্দ অবস্থায় থাকিতে হয়। কারণ স্বভাবচরিত্র মন্দ না হইলে লোকে মন্দ কর্ম্ম করে না। এবং মন্দ কর্ম্ম করিলে মন্দ স্বভাবচরিত্র আরো মন্দ হইয়া যায়। স্বভাবচরিত্র মন্দ হইলে মানুষ ভাল অবস্থায় থাকিবার যোগ্য হয় না, মন্দ অবস্থায় থাকিবারই যোগ্য হয়। মন্দের সহিত মন্দেরই মিল হয়, ভালর মিল হয় না। যে দুষ্কর্ম্ম করিয়া আপন স্বভাব চরিত্র মন্দ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার মন্দ কর্ম্মের দিকেই স্বভাবত ঝোঁক হয় এবং সেই জন্য তাহাকে জোর করিয়া সুখ সচ্ছন্দের অনুকূল অবস্থায় রাখিলেও সে শীঘ্র সে অবস্থাকে সুখ সচ্ছন্দের প্রতিকূল করিয়া তুলে। এ কথার প্রমাণ আমাদের দেশে বোধ হয় এখন প্রতি ঘরেই পাওয়া যায়। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হয়। এবং এই জন্যই মহাভারতে ধর্ম্মব্যাধের মুখে শুনিতে পাই যে মাংস বিক্রয় রূপ নৃশংস কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে সে কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে পারে নাই।* বদ্ধমূল স্বভাব ও সংস্কারকে পরাজয় বা বিনষ্ট করা বড়ই কঠিন। অতএব বদ্ধমূল স্বভাব ও সংস্কারের সহিত যে অবস্থার মিল থাকে, সেই অবস্থা ভোগ করাই সৃষ্টির নিয়মসঙ্গত। অতএব কর্ম্মফলবাদ ও নিয়মবাদ একই কথা। আচ্ছা, তাই যদি হইল, তবে আবার

* মহাভারত, বনপর্ব্ব মার্কণ্ডেয় সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়, ২০৭ অধ্যায়।

পুরুষকারের কথা কেন? পুরুষকারের দ্বারা কর্ম্মফল অতিক্রম করিবার কথা কেন? কথা এইজন্য যে, নিয়ম অব্যর্থ হইলেও নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করা যায় এবং নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করাও একটি নিয়ম। অগ্নি বস্ত্রকে দগ্ধ করে, ইহা একটি স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু যে বস্ত্র অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, তাহাতে জল ঢালিয়া দিলে অগ্নি আর তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, কেননা অগ্নিতে জল দিলে অগ্নি থাকে না এবং অগ্নির কার্য্যও থাকে না, ইহাও একটি স্বাভাবিক নিয়ম। অতএব নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করা যায়। এবং সেইজন্য নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করাও একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সেইরূপ কর্ম্মদোষে মন্দ অবস্থা ভোগ করা যেমন একটি স্বাভাবিক নিয়ম, তেমনি মন্দ অবস্থায় থাকিয়া চেষ্টা ও যত্ন করিয়া স্বভাবচরিত্র সংশোধন করিয়া মন্দ অবস্থার পরিবর্ত্তে ভাল অবস্থা লাভ করিতে পারাও একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সেই চেষ্টা ও যত্নের নাম পুরুষকার। অতএব পুরুষকারের দ্বারা কর্ম্মফল অতিক্রম করা যাইতে পারে এবং পুরুষকারের দ্বারা কর্ম্মফল অতিক্রম করা একটি স্বাভাবিক নিয়ম। চেষ্টা বা পুরুষকার দ্বারা যে মন্দ স্বভাবকে বিনষ্ট করিয়া ভাল স্বভাব লাভ করিতে পারা যায় এবং সেই ভাল স্বভাব লাভের ফলস্বরূপ মন্দ অবস্থার পরিবর্ত্তে যে ভাল অবস্থা লাভ করিতে পারা যায়, ইহা যুক্তিদ্বারা সহজেই সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। অনেক লোককে আপন আপন চেষ্টা দ্বারা মন্দ স্বভাব ত্যাগ করিয়া ভাল স্বভাব লাভ করিতে এবং মন্দ অবস্থার পরিবর্ত্তে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়—ইহাই এ কথার যথেষ্ট এবং অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মানুষের ভাল মন্দ দুই রকম হইবারই প্রবৃত্তি আছে। সেই দুই প্রবৃত্তিই মানব প্রকৃতির অন্তর্গত। মানুষ ভাল হইলেও যেমন তাহার মন্দ প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করিয়া মন্দ হইবার ক্ষমতা আছে, তেমনি মন্দ হইলেও ভাল হওয়ার উপকারিতা কোন রকমে বুঝিতে পারিলে ভাল প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করিয়া ভাল হইবার ক্ষমতাও তাহার আছে। মানুষের এই ক্ষমতাকেই আমরা পুরুষকার বলি, ইংরাজেরা free will (স্বাধীন ইচ্ছা) বা will power (ইচ্ছাশক্তি) বলেন। উপদেশ উত্তেজনা লাভালাভ বোধ প্রভৃতি নানা কারণে মানুষ এই ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকে এবং সেই সকল কারণ ব্যতীত এই ক্ষমতার পরিচালনা হয় না। কিন্তু কারণ ব্যতীত এ ক্ষমতার পরিচালনা হয় না বলিয়া এ ক্ষমতা যে মানুষের

স্বভাব চরিত্র ও অবস্থা নিয়মিত করিবার পক্ষে প্রভূত পরিমাণে কার্য্যকরী নয়, তা নয়। কারণ সাপেক্ষ হইলেও মানুষের পুরুষকার মানুষের একটি ব্রহ্মঅস্ত্র। ব্রহ্মঅস্ত্র বলিয়া পুরুষকার এত মহামূল্য সামগ্রী। কারণ ব্যতীত সে ব্রহ্ম অস্ত্র চলে না বলিয়া, কি তাহার কোন মূল্য বা কার্য্যকারিতা নাই? মাংসপেশীর সহিত হস্তস্থিত অসি চালনা করিতে হয় বলিয়া কি অসির কোন মূল্য বা কার্য্যকারিতা নাই? তাই ইংরাজিওয়ালাদিগকে বলি যে মানুষের will বা পুরুষকার free বা স্বাধীন হউক আর নাই হউক, উহা মানুষের মহা কার্য্যকরী মহামূল্য অস্ত্র। তাহা হইলেই হইল মানুষ আর কিছু চাই না। অতএব মানুষ কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াও নিজের চেষ্টা বা পুরুষকারের বলে সে কর্ম্মফল অতিক্রম করিতে পারে একথায় কিছুমাত্র অসঙ্গতি বা অযৌক্তিকতা নাই কিন্তু তাহাই যদি হয় তবে কেমন করিয়া বলি যে হিন্দুশাস্ত্রকারের অদৃষ্টবাদানুসারে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস এবং মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় পরিণত করিতে একেবারেই অক্ষম? না, তেমন কথা বলিবার যো নাই। হিন্দু শাস্ত্রকারের মুক্তিবাদ বুঝিয়া দেখিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যাহাকে Oriental fate বা এতদ্দেশীয় যথার্থ অদৃষ্ট বা বিধিলিপি বলিয়া থাকেন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা একেবারেই অসম্ভব। হিন্দু শাস্ত্রকারের মুক্তিবাদের অর্থ এই যে, সকল মনুষ্যকেই নিকৃষ্ট বা অধম মায়াময় প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট বা সর্ব্বোত্তম ঈশ্বর-প্রকৃতি লাভ করিয়া ঈশ্বরে লীন হইয়া মুক্তি লাভ করিতে হইবে। মানুষ যদি অধম অবস্থার দাস হইত অর্থাৎ মানুষের যদি অধম অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া উত্তম অবস্থা লাভ করিবার শক্তি বা পুরুষকার না থাকিত তবে ত হিন্দু শাস্ত্রকার তাহার জন্য মুক্তিব্যবস্থা করিতে পারিতেন না এবং হিন্দুশাস্ত্রে মুক্তিবাদ থাকিত না। হিন্দু শাস্ত্রকারের মতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে প্রকার সম্বন্ধ, তাহাতে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন হইতেই হইবে—এক জন্মে না হয় দশ জন্মে, এক যুগে না হয় দশ যুগে, দশ যুগে না হয় দশ কল্পে—পরমাত্মায় লীন হইতেই হইবে, অর্থাৎ নিকৃষ্ট অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিতেই হইবে। নহিলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ মিথ্যা হইয়া যায় এবং পরমাত্মার পূর্ণআত্মত্বও থাকে না। জীবাত্মার আপন ক্ষমতায় অধম অবস্থা অতিক্রম করিয়া উত্তম অবস্থা লাভ না করিলেই

নয়। আপন চেষ্টায় উন্নতি—ইহা ব্যতীত হিন্দুশাস্ত্রকারের সৃষ্টিতত্ত্ব মিছে হয়, পরমাত্মতত্ত্বও মিছে হয়, মুক্তিতত্ত্বও মিছে হয়, সৃষ্টিতত্ত্ব দাঁড়ায় না, মুক্তিতত্ত্ব দাঁড়ায় না, পরমাত্মতত্ত্ব দাঁড়ায় না। অতএব ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যাহাকে Oriental fate অর্থাৎ অনতিক্রমণীয় অদৃষ্ট বা বিধিলিপি বলিয়া থাকেন, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা একেবারেই অসম্ভব এবং পুরুষকার বা দুরবস্থা অতিক্রম করিবার শক্তি না হইলেই নয়। তাই হিন্দুর কথিত ধ্রুব কথায় এত অসাধারণ ও অপরিমিত পুরুষকার দেখিতে পাই। তাই হিন্দুর পুরাণে দেখিতে পাই ধ্রুব সমস্ত কর্ম্মফল তুচ্ছ করিয়া দেবদুর্লভ পদ লাভ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং প্রতিজ্ঞা বলে স্থির ও অবিচলিত চিত্তে সমস্ত বাধা সমস্ত বিঘ্ন বিষম বিভীষিকা সব অতিক্রম করিয়া সেই দেবদুর্লভ পদ লাভ করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগেরও এই প্রকার প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার ছিল। তাঁহারা যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিয়া তবে ছাড়িতেন, তাহা সম্পন্ন করণার্থ যাহা কিছু করিবার আবশ্যক হইত, বীরবিক্রমে নির্ভীক চিত্তে এবং অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাহা করিতেন। আয়োধ ধৌম্য ঋষির শিষ্য আরুণির কথা মনে আছে কি? গুরু আরুণিকে জল নির্গমন নিবারণার্থ শস্যক্ষেত্রে আইল নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আদেশ পালন করিব বলিয়া গিয়া আরুণি দেখিলেন যে আইল নির্ম্মাণ করা অসাধ্য। তিনি জল নির্গমন নিবারণার্থ নানা উপায় পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু সকল উপায়ই বিফল হইল। তখন আপন প্রতিজ্ঞা ভাবিয়া স্বয়ং ক্ষেত্রপার্শ্বে শয়ন করিয়া জল নির্গমন বন্ধ করিলেন *। শাপগ্রস্ত পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভগীরথ কি বিষম সাহস প্রতিজ্ঞা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কর্ম্মই না করিয়াছিলেন। পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ রামচন্দ্র কতদিন ধরিয়া কতকষ্টই সহ্য করিয়াছিলেন, এবং সীতাকে পুনর্লাভার্থ কি অসাধ্য সাধনই না করিয়াছিলেন। মহাঋষি বিশ্বামিত্র উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করণার্থ কত কষ্ট সহ্য করিয়া কি অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছিলেন। তুমি বলিবে, এসব গল্প-কথা. এসব কথা বিশ্বাস করি না। আচ্ছা, তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলাম যে এসব গল্প-কথা, যাহাকে ইউরোপীয়েরা ইতিহাস বলে, এসব কথা তা নয়। কিন্তু যাঁহারা এরকম গল্পকথা রচনা করেন, তাঁহারা

* মহাভারত, আদি পর্ব্ব, অনুক্রমণিকা পর্ব্বাধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায়।

কি ধাতুর লোক ছিলেন বল দেখি? তাঁহারা কি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার সম্পন্ন লোক ছিলেন না? নহিলে, যে মুক্তিকে তাঁহারা মানুষের পরম পদার্থ বলিয়া বুঝিতেন, সেই মুক্তি লাভ করণার্থ তাঁহারা এত করিতেন কেন? স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি মধুর মায়াময় সংসার, যাহা হইতে দুই দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইলে তুমি আমি কাঁদিয়া আকুল হই, সেই সংসার চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া, যে ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখে তুমি আমি এত মুগ্ধ, চিরকালের জন্য সেই ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, বিভীষিকাময় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, অনশন বা অনশন তুল্য স্বল্পাশনে রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় ঝন্‌ঝাবাত মাথায় পাতিয়া লইয়া, মুক্তির জন্য তাঁহারা কত বৎসর ধরিয়া ভগবানের ধ্যান করিতেন। ইহা কি সামান্য প্রতিজ্ঞা ও সামান্য পুরুষকারের কর্ম? এরকম প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকারের কথাকে ত গল্প-কথা বলিতে পার না। এখনও যে এমন যোগী ও তপস্বী দেখিতে পাওয়া যায়। আর যোগী তপস্বীর কথাই বা কাজ কি? আজিকার অধঃপতিত হিন্দু সমাজে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেন নাই, এমন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কি সেই পুরাতন ধাতু দেখিতে পাওয়া যায় না? আজিও কি অসংখ্য হিন্দু নরনারীকে ধর্ম্মচর্য্যার্থ এবং পারলৌকিক মঙ্গলার্থ অদ্ধাশন উপবাস ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বিলাসবর্জ্জন কঠিন ব্রতাচরণ ব্যয়-ও-শ্রমসাধ্য তীর্থ দর্শন ও ভ্রমণ করিতে দেখা যায় না? ইহাও কি প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকারের প্রমাণ নয়? আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অসাধারণ প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার ছিল বলিয়াই তাঁহারা জ্ঞান পথে ও ধর্ম্ম পথে এত উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন। গ্রীক বল রোমান বল ইংরাজ বল ফরাসী বল জর্ম্মাণ বল যে যা উন্নতি করিয়াছে কেবল অসাধারণ প্রতিজ্ঞাও পুরুষকারের বলেই করিয়াছে। কিন্তু অসীম প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার সম্পন্ন হিন্দুর বংশে জন্মিয়া আজ আমাদের প্রতিজ্ঞাও নাই পুরুষকারও নাই। আমাদের কোন রকমের উন্নতি করিবার প্রতিজ্ঞা নাই। যদি বা কখনও উন্নতি সাধনার্থ একটা কাজ করিব মনে করি সে সঙ্কল্প বেশিদিন থাকে না, দুই একটা সামান্য বাধা বিঘ্ন দেখিলেই তাহা ছাড়িয়া দি, আর বাধা বিঘ্ন না দেখিলেও দিন কতক পরেই যেন তাহা 'বেমালুম' ভুলিয়া যাই। তাই আজ ধ্রুব-কথা উত্থাপন করিলাম—ধ্রুবের সেই বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা, সেই অমানুষী পুরুষকার ও সেই সুরাসুরদুর্লভ সাহস ও বিক্রমের কথা উত্থাপন করিলাম। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ধ্রুব, কি আমাদেরও ধ্রুব হইবে না? আমাদের পূর্ব্ব

পুরুষেরা তাঁহাদের অভিলষিত ও শ্রেয় কর্ম্মে যেমন ধ্রুব-সঙ্কল্প হইতেন, আমরাও কি আমাদের অভিলষিত ও শ্রেয় কর্ম্মে সেইরূপ ধ্রুব-সঙ্কল্প হইব না? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কর্ত্তব্য সাধনে যে ধ্রুবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন আমরাও কি আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে ও উন্নতি সাধনে সেই ধ্রুবমন্ত্রে দীক্ষিত হইব না? হিন্দুর ধ্রুব শব্দ বলে যে হিন্দু ধরণীর ন্যায় দৃঢ়,ধরণীর ন্যায় ধীর, ধরণীর ন্যায় ধারণাক্ষম, ধরণীর ন্যায় উন্নতশীল, ধরণীর ন্যায় অনন্তপথের পথিক। আমরা কি ধ্রুব-কথা ভুলিতে পারি? আজি কার দিনে ধ্রুব-কথাই আমাদের বেদ, ধ্রুব-কথাই আমাদের পুরাণ, ধ্রুব-কথাই আমাদের স্মৃতি হওয়া উচিত। তাহা কি হইবে না?

অদৃষ্ট বিষয়ে যখন এত কথা কহিলাম তখন আরো একটা কথা না কহিলে চলে না। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যে এতদ্দেশের অমুল্লঙ্ঘনীয় অদৃষ্টের কথা বলিয়া থাকেন তাহার কি কোন হেতু নাই? হেতু আছে। এদেশের লোক পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উদ্যমশীল নয়। এদেশের লোককে পার্থিব অবস্থার উন্নতি করিতে বলিলে তাহারা প্রায়ই বলিয়া থাকে—তুমি ও যেমন, উন্নতির জন্য আবার চেষ্টা করিব কি? অদৃষ্টে উন্নতি থাকে চেষ্টা না করিলেও উন্নতি হইবে, অদৃষ্টে না থাকে, সহস্র চেষ্টা করিলেও উন্নতি হইবে না। একথার মোটামুটি অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের একটা বাঁধাধরা অদৃষ্ট আছে, তাহা ফলিবেই ফলিবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। ত্রিকালজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কাছে প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনা অবশ্য প্রকাশ আছে। অতএব ভগবান বলিতে পারেন ভবিষ্যতে কোন মনুষ্যের অদৃষ্টে কি ঘটিবে। কিন্তু মানুষ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না কি ঘটিবে। তবে মানুষ এ কথা বলিতে পারে যে আমি বলিতে পারি আর নাই পারি, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে একটা ঘটিবেই ঘটিবে, তখন আমি চেষ্টা করিলেও তাহা ঘটিবে, চেষ্টা না করিলে ও তাহা ঘটিবে। মানুষের ভুল এইখানে। আমরা যাহা কিছু পাইতে ইচ্ছা করি সকলই আমাদের চেষ্টা করিয়া পাইতে হয়—আমরা যাহা কিছু কখনও পাইয়াছি সকলই চেষ্টা করিয়া পাইয়াছি। অতীত কালে দেখিয়াছি যে যাহা কিছু পাইয়াছি সবই চেষ্টা করিয়া পাইয়াছি। তবে যাহা ভবিষ্যতে পাইতে হইবে কেবল তাহারই সম্বন্ধে কেন বলিবে, যদি তাহা আমার অদৃষ্টে থাকে তবে আমি তাহা চেষ্টা

করিলেও পাইব, না করিলেও পাইব? ফল কথা এই যে, এদেশের লোকে প্রকৃত পক্ষে অপরিহরণীয় অদৃষ্ট মানেন না। তাঁহাদিগকে পার্থিব-উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে বলিলে তাঁহারা বলেন বটে যে পার্থিব উন্নতি আমাদের অদৃষ্টে থাকিলে আমরা চেষ্টা করিলেও হইবে, না করিলেও হইবে এবং এই বলিয়া প্রায়ই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারাই ত পারলৌকিক উন্নতির নিমিত্ত কত চেষ্টা করিয়া থাকেন। পারলৌকিক উন্নতি অদৃষ্টে থাকে, চেষ্টা করিলেও হইবে, না করিলেও হইবে, এরূপ ভাবিয়া ত নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন না। তাঁহারাই ত স্বল্প-পরিশ্রম-সাধ্য সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ক্ষুধার শান্তি করেন। ভোজন অদৃষ্টে থাকে, অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেও ভোজন করিতে পাইব, রন্ধন না করিলেও পাইব, এরূপ ভাবিয়া রন্ধন না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে অব্যর্থ অদৃষ্ট মানেন না। তবে যে পার্থিব উন্নতি করিবার বেলা অব্যর্থ অদৃষ্টের কথা তুলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন, তাহার বোধ হয় দুইটি কারণ আছে। প্রথমত এদেশের জল বায়ু এমনি যে উহা মানুষকে কিছু অলস শ্রমকাতর বা বিশ্রামপ্রিয় করে। সেইজন্য বিষয় কর্ম্মের ন্যায় যে সকল কাজে উন্নতি করিতে গেলে বেশি শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি করিতে হয় সে সকল কার্য্যে উন্নতি করিতে এদেশের লোকের স্বভাবতই কিছু অনিচ্ছা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত বহু পূর্ব্বকাল হইতে এদেশের লোক অধিক পরিমাণে ধর্ম্মপ্রিয় হইয়াছে এবং সেইজন্য তাহারা সেই পরিমাণে পার্থিব সম্পদ ও উন্নতিকে হেয় ও অনর্জ্জনীয় মনে করিয়াছে। লোকে যাহা হেয় ও অনর্জ্জনীয় বলিয়া মনে করে, তাহা অর্জ্জন করিবার জন্য তাহাদের বড় একটা ইচ্ছাও হয় না, গাও লাগে না, পরিশ্রম করিতেও প্রবৃত্তি না। জলবায়ুর গুণে এদেশের লোকের যে আলস্য হইয়া থাকে, এই মানসিক প্রকৃতি তাহা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। সেইজন্য এদেশের লোক পার্থিব উন্নতি সাধনের কথায় অব্যর্থ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। যাহা তাহারা উত্তম ও উৎকৃষ্ট বলিয়া বুঝে সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধন করিবার বেলা তাহারা অব্যর্থ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া কঠিন উদ্যম করে। এবং রন্ধনাদি যে সকল কাজ না করিলে নয় এবং অল্প পরিশ্রমে করা যায়, সে সকল কাজ সম্বন্ধে তাহারা অব্যর্থ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া

চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, যথাযথ পরিশ্রম করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। কেবল অলসস্বভাব বশত যে পার্থিব উন্নতি তাহারা হেয় মনে করে এবং যাহা সাধন করিতে প্রভূত পরিশ্রম প্রয়োজন, সেই শ্রমসাধ্য পার্থিব উন্নতি সাধনের কথায় তাহারা অব্যর্থ অদৃষ্টের উল্লেখ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। তাহাদের অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদ প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যুক্তি সম্ভূত বা বিশ্বাস মূলক অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদ নয়। তাহাদের অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদ তাহাদের অলস প্রকৃতি ও ধর্ম্মসংস্কারসম্ভূত একটা ওজর মাত্র। পণ্ডিত ও দার্শনিক-দিগের সে রকম অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদকে প্রকৃতপক্ষে একটা অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদ বলিয়া গণনা করা অন্যায়। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা সেই অন্যায় কার্য্যটি করিয়াছেন এবং এখন পর্য্যন্তও করিতেছেন।

আমরা বুঝিলাম যে আমাদের শাস্ত্রে অব্যর্থ-অদৃষ্টবাদ অসম্ভব এবং আমাদের মধ্যে লোক সাধারণে যে অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদের কথা কয়, তাহা তাহাদের একটা ওজর মাত্র, যুক্তি বা বিশ্বাস মূলক কথা নয়। এখন আমরা যদি বুঝি যে আমাদের জীবন রক্ষার্থ, জাতি রক্ষার্থ, দেশরক্ষার্থ ও ধর্ম্মচর্য্যার্থ আমাদের পার্থিববল ও সম্পদ আবশ্যক হইয়াছে, তবে আমাদের পুরুষকারের বলে পুরুষকার বৃদ্ধি করিয়া, আমাদের শারীরিক আলস্য-প্রবণতা পরাজয় করিয়া, সেই পূর্ণ পুরুষকারাবতার ধ্রুবের ন্যায় সর্ব্বকল্যাণদাতা ভগবানের নাম করিয়া সকল বাধা সকল বিঘ্ন সকল বিভীষিকা অতিক্রম ও উপেক্ষা করিয়া অপরিসীম পার্থিবশক্তি ও সম্পদ সঞ্চয় করিয়া সকলে এক মনে এক প্রাণে সেই সর্ব্বশক্তি এবং সর্ব্ব সম্পদরূপী ভগবানের সেবায় আমাদিগকে নিযুক্ত হইতে হইবে এবং পৃথিবীকে স্বর্গের সহিত মিশাইয়াফেলিতে হইবে। অতএব আইস সকলে ধ্রুব-মন্ত্রে দীক্ষিত হই। আজিকার দিনে, আমাদের এই অবস্থায়, সেই অপূর্ব্ব ধ্রুব-মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে আমাদের মৃত্যুও ধ্রুব। অতএব আবার বলি—আইস সকলে ধ্রুব-মন্ত্রে দীক্ষিত হই।

আর্য্যবীরগণের দিগ্বিজয়।

কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষীয় নৃপতিরা চিরদিনই হয় পরস্পর বিরোধে কাল-কর্ত্তন করিতেন, নয় যুদ্ধাদি চেষ্টা রহিত হইয়া থাকিতেন। ভারতের বাহিরে তাঁহাদিগের লোভাকর্ষক বস্তু কিছুই ছিল না; সুতরাং তাঁহারা ভারতের বহিঃস্থিত কোন দেশে সৈন্য পরিচালনা করিতেন না। যে রাজার দিগ্বিজয় বাসনা একান্ত বলবতী হইত, তিনি ভারতীয় নরপতিদিগকে পরাভূত ও স্ববশীকৃত করিয়া, সার্ব্বভৌম সম্রাট প্রভৃতি গৌরবান্বিত উপাধি গ্রহণ করত, সন্তুষ্ট থাকিতেন।

কিন্তু আমরা এইরূপ সংস্কার বিশিষ্ট লোকদিগকে নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করি। যদিও সমগ্র ভারতের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি মনঃসংযোগ সহকারে সংস্কৃত সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বকালে কতিপয় মহাবল পরাক্রমশালী আর্য্যবীরপুরুষ দিগ্‌জিগীষায় উত্তেজিত হইয়া প্রবল বেগে ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়িনী বাহিনী পরিচালনা করিয়া নানাদেশে আর্য্যবৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত দেশাধিপতিরা নম্রভাবে আর্য্যবিজেতার অনুগমন করিতেন। মধ্যকালে যে দোর্দ্দণ্ড পারসীক, তাতার প্রভৃতির প্রচণ্ড প্রতাপে সময়ে সময়ে ভারতের অন্তস্থল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইত ভারতীয় জিগীষু মহাবীরগণের অনিবার্য্য বীর্য্যগরিমার নিকটে একদিন তাহাদিগকেও মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল। কতকগুলি ভিন্ন দেশজয়ী আর্য্যবীরের বিবরণ প্রকাশ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রঘু।

(১)

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রঘু সিন্ধুনদ উত্তরণ করিয়া গান্ধার (কান্দাহার) জয় করিয়া পারসীক সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবল অশ্বারোহী পারসীকেরা তাঁহার প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করে। অবশেষে এক মহাযুদ্ধে আর্য্য সম্রাট বিজয় লাভ করেন এবং গর্ব্বিত পারসীক বীরগণ শূন্যমস্তকে বিজেতার শরণাপন্ন হইয়া রক্ষা পায়। রঘু পারস্য জয় করিয়া (বর্ত্তমান স্বাধীন তাতার নিবাসী) বীর্য্যবান্ হূণ এবং কাম্বোজ দিগকে আক্রমণ করিয়া অধীনতা স্বীকার করাইয়াছিলেন।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এই বিষয়ের মনোহারিণী বর্ণনা করিয়াছেন।

(২)

অর্জ্জুন

মহাভারতীয় সভাপর্ব্বের দিগ্বিজয় পর্ব্বে লিখিত আছে, মহাবীর অর্জ্জুন বাহ্লীক, কাম্বোজ, দরদ, ঋষিক প্রভৃতি জাতিকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া ভারত সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের অধীন করিয়াছিলেন। তৎপরে জয়দর্পিত পাণ্ডু-নন্দন সুদূর হরিবর্ষ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া সেই দেশে পাণ্ডব প্রাধান্য স্থাপিত করত প্রতিনিবৃত্ত হন। এই বাহ্লীক বর্ত্তমান বাল্খ দেশ, কাম্বোজ অধুনাতন পারস্যের অংশ বিশেষ, ঋষিক প্রভৃতিরা তাতার দেশের কোন অংশে অধিবাস করিত। দরদ—দার্দি-স্থানবাসী বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান চীনতাতার পূর্ব্বকালে হরিবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। †

পারসীকাং স্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থল বর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূন্ তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥

* * *

সংগ্রাম স্তুমুল স্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্ব সাধনৈঃ।
শার্ঙ্গ কূজিত বিজ্ঞেয় প্রতিযোধে রজস্যভূৎ ॥
ভল্লাপ বর্জ্জিতৈ স্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈ র্মহীম্।
তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্র পটলৈরিব ॥
অপনীত শিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ।
প্রণিপাত প্রতীকারাঃ সংরম্ভো হি মহাত্মানাম্ ॥

* * *

তত্র হূণাবরোধানাং ভর্ত্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্।
কপোল পাটলা দেশি বভূব রঘু চেষ্টিতম্ ॥
কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্য মনীশ্বরাঃ।
গজালান পরিক্লিষ্টৈব ক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ ॥

রঘুবংশ চতুর্থ সর্গ।

† ততঃ পরমবিক্রান্তো বাহ্লীকান্ পাকশাসনিঃ।
মহতা পরিমর্দ্দেন বশে চক্রে দুরাসদান্ ॥
গৃহীত্বা তু বলং সারং ফাল্গুনঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
দরদান্ সহ কাম্বোজৈ রজয়ৎ পাকশাসনিঃ ॥

* * * *

(৩)

ভীম।

বীরকুলতিলক ভীমসেন পূর্ব্বদিক্ বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পর পারস্থ (আধুনিক ব্রহ্মাদি) ম্লেচ্ছ দেশ ও দ্বীপ সমূহ আর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

(৪)

নকুল।

শৌর্য্যবান নকুল পশ্চিম দিক্‌স্থিত দেশসমূহ জয় করিয়াছিলেন। পহ্লব, বর্ব্বর, যবন, শক প্রভৃতি জাতি ইঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। পহ্লব পারসীক দিগের পূর্ব্ব নাম; ইহাদের প্রাচীন ভাষার নাম পহ্লবী। যবন ও বর্ব্বরেরা পারস্যের পশ্চিম উত্তরাংশে বাস করিত। তৎকালীন শক নামে প্রসিদ্ধ জাতি এক্ষণে তাতার জাতির অন্তর্ভূত। গ্রীক গ্রন্থে তাহাদিগকে শাকী বলে। †

সরো মানস মাসাদ্য হাটকানভিতঃ প্রভুঃ।
গন্ধর্ব্বরক্ষিতং দেশ মজয়ৎ পাণ্ডব স্তুতঃ॥

*   *   *   *

উত্তরং হরিবর্ষন্তু স সমাসাদ্য পাণ্ডবঃ।
ইয়েষ জেতুং তংদেশং পাকশাসন নন্দনঃ॥

*   *   *   *

ততো দিব্যানি বস্ত্রাণি দিব্যান্যাভরণানি চ।
ক্ষৌমাজিনানি দিব্যানি তস্য তে প্রদদুঃকরম্॥

মহাভারত সভাপর্ব্ব অর্জ্জুন দিগ্বিজয় পর্ব্ব।

*   *   *   *   যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥

*   *   *   *

বসুতেভ্য উপাদায় লৌহিত্য মগমদ্বলী॥
স সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছ নৃপতীন্ সাগরানূপবাসিনঃ।
করমাহারয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ॥

মহাভারত সভাপর্ব্ব ভীম দিগ্বিজয়।

ততঃ সাগর কুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরমদারুণান্।
পহ্লবান্ বর্ব্বরাংশ্চৈব কিরাতান্ যবনান্ শকান্॥
ততো রত্নান্যুপাদায় বশে কৃত্বা চ পার্থিবান্।
ন্যবর্ত্তত কুরুশ্রেষ্ঠো নকুল শ্চিত্রমার্গবিৎ॥

মহাভারত সভাপর্ব্ব নকুল দিগ্বিজয়

(৫)

অশোক।

অশোক মগধ সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি খৃঃ পূঃ ২৬৩ অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ২২৩ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান এবং মধ্য এসিয়ার কিয়দংশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ভারত ও আফগানিস্থানের গিরিগাত্রে মহারাধিরাজ অশোকের অনুশাসন খোদিত আছে। অশোক ভারতেতিহাস প্রসিদ্ধ।

(৬)

ললিতাদিত্য।

রাজতরঙ্গিনীর চতুর্থ তরঙ্গে উল্লিখিত মহাবীরের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ললিতাদিত্য খৃষ্টীয় ৬৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল দিগ্বিজয় ব্যাপারে অতিবাহিত হয়। তিনি কেবল কাশ্মীরের নহে কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের অতুল গৌরবের নিদান। সমস্ত ভারতে এবং কাম্বোজ, দরদ প্রভৃতি দেশে, এমন কি, উত্তর কুরু পর্য্যন্ত বীরচূড়ামণি দুর্দ্দান্ত ললিতাদিত্যের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। তিনি দ্বিতীয় দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া উত্তরাপথ জয় করেন। অবশেষে তদ্দেশীয় আর্য্যনক নামক প্রদেশে অতিশয় তুষারপাত হওয়াতে সেই স্থানে সসৈন্য ললিতাদিত্যের প্রাণবিয়োগ হয়। কথিত আছে যে দেশে সূর্য্যোদয় হয় না, তিনি এমন দেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিত প্রধানের মতানুসারে বর্ত্তমান সাইবিরিয়া পূর্ব্বে উত্তর কুরু, উত্তরাপথ প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইত। এবং আর্য্যনককে গ্রীকেরা আরিয়ানা বলিতেন।

(৭)

বাপ্পারাও।

মিবারের রাণাদিগের আদিপুরুষ মহাবল বাপ্পরাও সম্ভবত ৭২৮ খৃষ্টাব্দে চিতোর অধিকার করিয়া দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তিনি সমস্ত রাজপুতানা ও সিন্ধু আত্ম শাসনাধীন করত শেষ বয়সে সিন্ধুনদ পার হইয়া আফগানিস্থান আক্রমণার্থ ধাবিত হন। দুর্জ্জয় আফগানেরা তাঁহার দুর্নিবার প্রচণ্ড বেগ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তৎপরে কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরান, তুরান, কাফ্রিস্থান প্রভৃতি দেশবাসীরা সেই অমিত-তেজা ক্ষত্রিয় বীরের পদানত হয়।

বাপ্পা অনেক যবনকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গর্ভসম্ভূত পাঠানদিগের বংশ পরম্পরা একাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৮)

দেবপাল দেব।

মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেব খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত জয় করেন। সেই দিগ্বিজয়কালে ভীষণ হূণ দেশীয় বীরগণের গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত, উৎকলদেশীয়দিগের মস্তক অবনত এবং গুর্জ্জর ও দ্রাবিড়ের রাজাদিগের গৌরব বিনষ্ট হইয়াছিল। দিগ্বিজয় ব্যাপার সমাহিত করিয়া গৌড়সম্রাট মুদগগিরিতে (আধুনিক মুঙ্গেরে) এক মহতী সভার অধিবেশন করেন যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত গঙ্গার উপর প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত এবং হয় উত্তর দেশীয় নৃপতিগণের প্রেরিত অশ্বসমূহের পদধূলিতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়। প্রায় সমুদয় পরাজিত মহীপতিরাই দেবপালদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সেই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহাবীর দেব পাল সমস্ত ভূপালবৃন্দে পরিবৃত হইয়া যে অনুশাসন প্রণয়ণ করিয়াছিলেন মুঙ্গেরে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বুদ্বাল নামক স্থানে দেবপালের

The foe was defeated and driven out of the country; but instead of returning to Cheetore, Bappa continued his course to the ancient seat of his family, Gajni, expelled the Barbarian called "Selim", placed on the throue a chief of the Chawura tribe, and returned with the discontented nobles. * * * *

* * * * * * * *

Bappa had reached the patriarchal age of one hundred, when he died. An old volume of historical anecdotes, belonging to the chief of Dailwara, states that he became an ascetic at the foot of MerJ, where he was buried alive after having overcome all the kings of the west, as in Ispahan, Kandahar, Cashmere, Irak, Iran, Tooran, and Kafristhan; all of of whose daughters he married and by whom he had one hundred and thirty sons, called Nosheyra Pathans.

Todd's Rajasthan.

অনেক মন্ত্রীর প্রণীত একখানি অনুশাসন পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুই পত্রের সাহায্যে গৌড়েশ্বরের বিজয় বৃত্তান্তাদি সংগৃহীত হইল। *

সংস্কৃত সাহিত্য আলোড়ন করিলে এইরূপ আরও অনেক মহাবীরের বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে দেশীয় শিক্ষিত নবীন লোকেরা ইউরোপের সমুদয় দিগ্বিজয়ী বীরগণের বিবরণ কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন কিন্তু দেশীয়দিগ্বিজয়ী দিগের বিবরণ জানিতে কিছুমাত্র চেষ্টা বা অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না। সম্প্রতি অনেক কৃতবিদ্য দেশীয় ব্যক্তির প্রাচীনতত্ত্ব জানিবার স্পৃহা হইয়াছে দেখিয়া আমরা অদ্য তাহাদিগকে এই প্রবন্ধ উপহার দিলাম।

" * * * He who conquered the earth from the source of the Ganges as far as the well known bridge constructed by the enemy of Dasasya, from the river of Luckicool as far as the habitation of Boroon, who going to subdue other princes, his young horses meeting their females at Kamboge, they mutually neighed for joy!"

From the translation of the Inscription of Devapal found at Moonghyr.

" * * * The King of Gour for a long time enjoyed the country of the eradicated race of Sotkala, of the Hoons of humbled pride, of the kings of Dravir and Goorjar, whose glory was reduced and the universal sea-girt throne."

From the translation of the Inscription of one of the ministers of Devapal found at Bodal.

"At Moodgagiri where is encamped his victorious army; across whose river is constructed for a road a bridge of boats; * * * * * *; * * * whither so many mighty chiefs of Jombood-wipa sesort to pay their respects * * * There Devapal Deva * * * issues his commands."

From the translation of the Inscription of Devapal found at Moonghyr.

Asiatic Researches. Vol. I.

মহামায়া।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পত্র।

অমূল্য যমুনার শবসৎকারের যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া, পল্লিপার্শ্বে একটি নিভৃতস্থানে দাঁড়াইয়া যমুনা যে পত্রখানি দিয়াছিল, তাহা পড়িবার উদ্যোগ করিলেন। প্রথমেই পত্রের শেষ ভাগে নাম দেখিলেন,

মহামায়া দেবী—

চক্ষুঃ বাষ্পাকুল হইল, পদতলে কেমন একরূপ রুনু ঝুনু হইতে লাগিল। বসিয়া পড়িলেন। রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া, রুমাল দিয়াই বাতাস খাইতে লাগিলেন;—ক্রমে সুস্থ হইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন;

"স্বস্তি! সকলের প্রণয় আলয়!

এই পত্রবাহক—যুবক নহে, যমুনা। যমুনা আপন ইচ্ছায় পাগল হইয়াছিল, এখন অনিচ্ছায় তাহাই দাঁড়াইল। আবার ইদানী তাহার হাসি খুসী বড় বাড়িয়াছে, কবে কি করিবে, বলিতে পারি না। আমি কিন্তু নিমিত্তের ভাগিনী হইব। তাই আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। যখন দেশে থাকিবেন, প্রত্যহ একদণ্ড তাহার গান শুনিতে পারিবেন না কি?

যমুনার কাছে প্রভাবতীর বার্তা পাইয়াছি। হয়ত প্রভাবতী, আপন মন না জানিয়া, হৃদয়ে তুষানল পুষিতেছে। কে জানে কবে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে! আপনি ভগবানের অনুগৃহীত। প্রভাবতীকে, তাঁহার পিতামহীকে রক্ষা করুন। আপনার পিতৃ দেবের মুখের দিকে দেখুন, আপনাদের সংসারের জঞ্জাল দূর করুন।

আমি সন্ন্যাসীর কন্যা; আজন্ম সন্ন্যাসিনী। পরম স্বামীর আরাধনায় পিতৃদেব আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন। নিভৃতে আমরা বাস করিতেছি। কেহই আমাদের সন্ধান জানেন না। সুতরাং আপনি বৃথা আর আমাদের অনুসন্ধান করিবেন না। আপনার বিবাহের রাত্রিতে আমি মঙ্গলাচরণের জন্য স্বয়ং আপনার নিকট উপস্থিত হইব।

যমুনার গান শুনিবেন। গম্ভীরা প্রভাবতীকে গাহিতে শিখাইবেন।

মহামায়া দেবী।"

"যমুনার গান শুনিবেন" এইখানে অমূল্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। যমুনার শেষ গান তখনও তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। "আমি কিন্তু নিমিত্তের ভাগিনী হইব" তবে আর তুমি 'আজন্ম সন্ন্যাসিনী' কৈ! তোমার মনে পাপ আছে। ভালবাসা—পাপ? পাপ বৈ কি? নহিলে ভাল বাসিলে অশ্রু ভুগিতে হয় কেন?

অমূল্য ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহাভিমুখে দ্রুত পদে যাইতেছেন এমত সময় তাঁহার বাম হস্তে একটি গুলি আসিয়া লাগিল, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, অজস্র শোণিত স্রাব হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত হইলেন।

ক্ষণেক পরে তথায় একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন অমূল্যর তখন অল্প অল্প নিশ্বাস পতন হইতেছে—কিন্তু বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই—তিনি অমূল্যর চাদর দ্বারা ক্ষতস্থানে উত্তম করিয়া বন্ধন করিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে মৃতপ্রায় অমূল্যসহ সর্ব্বানন্দের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

সর্ব্বানন্দ অমূল্যকে এতাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন "এ কি?"

আগন্তুক অমূল্যকে যে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বিবৃত করিলেন, বলিলেন, "আমি তাঁহাকে চিনিতাম, সুতরাং আপনার নিকট আনিলাম।"

সর্ব্বানন্দ অশ্রু গদ গদ স্বরে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিলেন।

বাটীর মধ্যে মহা ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। লোকটি চলিয়া গেলেন, সর্ব্বানন্দ তাঁহাকে আর একটু অপেক্ষা করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি তথা হইতে দ্রুত পদে রণ-ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পরে অন্যান আহতদিগের সাধ্যমতে সেবা সুশ্রূষায় নিরত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জননী ও সন্তান।

অমূল্য অনেক চিকিৎসায়, অনেক সেবায়, অনেক সুশ্রূষায় এযাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু এখনও কড় দুর্ব্বল। আহারান্তে সকলে শয়ন করিলেন; এমত সময় দুর্গাবতী দেখিলেন অমূল্যরতন স্বীয় কক্ষে করকপোলিত

হইয়া চিন্তা মগ্ন; সেই শোণিত শূন্য পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডলে চিন্তার ঘোর মসিলেখা দর্শনে তাঁহার প্রাণ আকুল হইল; তিনি বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে বলিলেন "ভগবান্ এ হতভাগিনীকে এক দণ্ডও সুখ দিতে নেই? দুধের ছেলে—ওর ভাবনা দেখিয়ে আমায় কি এতই কাঁদাতে হয়?" দুর্গাবতী ক্ষনেক নীরব হইয়া একদৃষ্টে চিন্তামগ্ন প্রাণাধিক সন্তানের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, পরে একটি উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমূল্য গাঢ় চিন্তামগ্ন থাকায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, দুর্গাবতী বলিলেন "অমূল্য।"

অমূল্য চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "অ্যাঁ।"

দুর্গা। বাবা কি ভাবছ?

অমূল্য। না, এমন কিছু নয়।

দুর্গা। সে কি বাবা, আমি যখন তখন যে তোকে ভাব্‌তে দেখি—অমূল্য বল্. তুই কি ভাবিস্ তা আমায় বল্।

অমূল্য একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বল্‌লেন "অনেক দেনা পত্র আছে—"

দুর্গা। না অমূল্য, ওকথা নয়—তোমায় যে দিন দেনার জন্য ধরে নিয়ে যায়, সে দিনও তোমার যেরূপ মুখভাব দেখেছি, এখনও তাই দেখছি।

অমূল্য। আমার মন কেমন উদাস হয়েছে, সেই জন্য কোন বিশেষ দুর্ঘটনায় বেশি খারাপ হয় না, যেমন তেমনি থাকে।

দুর্গাবতী চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আমি তোর ওকথা শুন্‌তে আসিনি, ওকথা শুনবো না, আমায় সত্য কথা বল—আর তোর শুক্‌নো মুখ দেখতে পারি না।"

দুর্গাবতী আবার চক্ষের জল মুছিলেন।

অমূল্য। মা সেত সুখের কথা নয়,—সে কথা শুনে ত দুঃখ বই সুখ হবে না।

দুর্গা। তোমার মুখে যদি হাসি না দেখি, তবে আর আমার কি সুখ? আমি কি তার কোন উপায় করতে পারবো না?

অমূল্য। না মা তা পারবে না। পারলে বল্‌তাম।

দুর্গা। অমূল্য মায়ের প্রাণ যে কি রকম, তা তুই জানিস না, বুক চিরে রক্ত দিলেও যদি ছেলে সুখী হয়, মা তাও দিতে পারে।

এতক্ষণে অমূল্যর চক্ষে জল আসিল; বলিলেন "আজ নয়, কাল বলিব।"

দুর্গাবতী একবার অমূল্যর বদনের দিকে তাকাইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কক্ষান্তরে যাইয়া দেখেন প্রভাবতী দণ্ডায়মানা, প্রভাবতী বলিলেন "মা আমার ভয় করছিল, পাছে আমি যে সকল কথা বলেছি তা বলে ফেল।"

দুর্গা। তুমি বারণ করেছ, তা কি বল্‌তে পারি।

প্রভা। মহামায়ার ত সন্ধান নেই।

দুর্গা। তাইত মা।

প্রভা। এখন হয় কি, এমন করে ত মানুষ বাঁচে না।

দুর্গা। ওর দেখে শুনে আমাতে আর আমি নেই, আমার হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়া গেছে।

প্রভাবতী তাহার কোন উত্তর না দিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

দুর্গা। মা কেমন আছেন?

প্রভা। ভাল নয়।

দুর্গা। চল তাঁকে দেখিগে।

উভয়ে ধীরে পাদবিক্ষেপে প্রভাবতীর পিতামহীর কক্ষে গমন করিলেন। তাঁহার আজি এক সপ্তাহ হইল অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাবতী ও প্রভাবতী।

প্রভাবতীর পিতামহীর পীড়া ক্রমশঃ সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিল, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রাণসম প্রভাবতীকে ইহ সংসারে, এই অনন্ত বিস্তৃত অন্তঃসার শূন্য, স্বার্থপর সংসারে,—একাকিনী রাখিয়া অনন্ত কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই বিশাল কাল সমুদ্রে আর একটি জল বুদ্বুদ জলে মিশাইল।

মানব আপনার লোককে সুখে আছে দেখিয়া, সুখে মরিতে পারে, কিন্তু দুঃখে থাকিতে দেখিয়া, মরিতে বড় কষ্ট। নিয়তির কাল চক্রে জাগতিক সকল বস্তু সকল প্রাণি অহর্নিশি ঘুরিতেছে, সেই চঞ্চল পরিবর্ত্তন হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই—সে কাহারও মুখ চাহে না, কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকায় না, আপন মনে আপনি ঘুরে, আর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

সেই আমূল পরিবর্ত্তনের সহিত আপন অজ্ঞাতে আপনা হইতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে—সামান্য ক্ষুদ্র প্রাণি মনুষ্য কোন ছার! আজি সেই পরিবর্ত্তনে প্রভাবতীর পিতামহীর একটি ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইল, সে পরিবর্ত্তনের নাম কি তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু তাহা আপাততঃ বড় ক্লেশকর! সে বিচ্ছেদ প্রভাবতীর হৃদয় দহিল, প্রাণ কাঁদিল। কিন্তু তাঁহার পিতামহী সুখে মরিলেন, প্রভাবতীর সহিত অমূল্যর বিবাহ হইবে, এ ধারণা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধ মূল ছিল। তিনি মৃত্যু কালে প্রভাবতীকে সকলের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন। এ দৃশ্যে সকলেরই চক্ষে জল আসিল কিন্তু দুর্গাবতীর তুল্য কাহাও হৃদয় কাঁদিল না,—প্রভাবতীরও নয়!

বৃদ্ধার মৃত্যুর কিছু দিবস পরে এক দিন প্রভাবতী দুর্গাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "মা আর কেন বাবাকে এসকল কথা বল, মহামায়ার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা হউক।"

দুর্গাবতীর চক্ষু লাল হইল, বলিলেন "প্রভা, আজ এ কথা কেন?—তাঁকে এ কথা বল্‌তে তুমি কতবার নিষেধ করছ, কিন্তু আজ সহসা এ কথা কেন?"

প্রভা। ঠাকুরমার জন্যে বড় ভাবনা ছিল, তিনি এ কথা শুন্‌লে কি বাঁচতেন! তাই বল্‌তে নিষেধ করেছিলাম—মা আর সহ্য হয় না, দাদার মলিন মুখ আর দেখা যায় না।

প্রভাবতীর দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িল। দুর্গাবতী বিস্মিত লোচনে প্রভাবতীর প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলেন "না প্রভা আমি তা পারব না।"

প্রভা। কেন মা!

দুর্গা। তোমার মনে কষ্ট দেবো!

প্রভাবতীর কুঞ্চিত অধর প্রান্তে বিষাদসূচক মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "আমার কষ্ট হবে? না মা—কখন না, আমি বড় সুখী হব।"

দুর্গা। তবে আচ্ছা তোমার একটি পাত্রের ঠিক করি।

প্রভা। কেন মা?

দুর্গা। তোমার বিবাহ দেবো না

প্রভা। সে কি মা! তোমার মুখে এ কথা! বিবাহ কি দুবার হয়—মনের বিবাহই ত বিবাহ।

দুর্গাবতী সবিস্ময়ে বলিলেন "সে কি প্রভা, তুমি বিয়ে করবে না!"

প্রভা। না, কখন না, আমি যদি বিবাহ করতে পারি, তবে বিধবারা বিবাহ করতে পারে না কেন? মা তুমি কি বিধবাকে বিবাহ করতে মত দাও?

দুর্গা। তোমার মত কচি মেয়ে বিধবা হলে তাহার বিবাহ দেওয়া যায়।

প্রভা। মা, আমার মত মেয়ে কি ভাল বাসতে জানে না, যে একবার ভাল বেসেছে, যে স্বামী চিনেছে, সে কি কখন বিবাহ কর্‌তে চায়!

দুর্গাবতী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তথা হইতে কক্ষান্তরে যাইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভাবতী নির্বিষ্ট চিত্তে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া তখন বারি বিন্দুও পতিত হইল না।

অমূল্য এক দিন ভাবিয়াছিলেন, প্রভাবতী দেবী; আমরা বলি, প্রভাবতী প্রকৃত মানবী।

উদ্ভট কথা।

তৃতীয় শাখা।

ইতিহাসের তুলনায় কাব্যের অগৌরব করিয়াই অনেকে ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা আবার কাব্যের ঐতিহাসিক সমালোচনা করিতে ভাল বাসেন। তাহা যে হয় না, বা করিতে নাই, এ কথা আমরা বলি না; আমরা বলি, যে ঐরূপ সমালোচনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের চর্চ্চার বিষয়। ঐরূপ আলোচনায় তুমি আমি সময় ক্ষেপ করিলে, কেবল যে সময়ের অপব্যবহার হয়, এমত নহে, প্রত্যুত তাহাতে কাব্যের পরাকৃতা সৃষ্টির মহত্ত্ব নষ্ট হয়, কাব্য প্রদত্ত দৃষ্টান্তের বল কমিয়া যায়, এবং আদর্শের আকর্ষণী শক্তি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

বালকের মুখেও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়, যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির লেখা নহে, উহা সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত; রামের সীতাবর্জ্জনের কথা মিথ্যা; শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের পর রাম-সীতায় আর বিচ্ছেদ হয় নাই।

কাব্যেই কি, আর ইতিহাসেই কি, এইরূপে সত্য মিথ্যার বিচার করিতে, আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে।

প্রথম ইতিহাসের কথা দেখ;—একখানি ইতিহাস দুইজনে বা দশজনে লিখিতেছেন,—তাহার মধ্যে একজনের লেখাকে মূল ও এবং অন্যের লেখাকে প্রক্ষিপ্ত এবং মিথ্যা বল কি? মনে কর লিবি এবং পলিবিয়স্ উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রোমের ইতিহাস লিখিলেন, তাহার একখানি সত্য, আর একখানি মিথ্যা কি? কখনই মিথ্যা নহে। কোন দেশের ধারাবাহিক বিবরণ দশজনে ক্রমে ক্রমে লিখিতে পারেন; একজন মানুষের জীবন চরিতও ক্রমে ক্রমে দশজনে লিখিতে পারেন। আগের লেখা, পরের লেখা দেখিয়া সত্য মিথ্যা কিছুই বলা যায় না।

কাব্যে—একথা অধিকতর রূপে খাটে। দশজনে ইলিয়দ লিখিয়াছেন বলিয়া ইলিয়দ্ কি একখানি পূর্ণকাব্য নহে? না, তাহার সমস্তই প্রক্ষিপ্ত বলিবে?

প্রক্ষিপ্ত অর্থ যদি পরে যোজিত হয়, তাহা হইলে, এই মনুষ্য দেহে—তোমাতে আমাতে, ঐ উদ্ভিচ্ছরীরে—তরু লতায়, ঐ জড় ভূমিতে,—মরু, বেলায়, ঐ আকাশের চন্দ্রসূর্য্যে, ঐ পৃথিবীর গ্রাম নগরে, ঐ নগরের মঠমন্দিরে, কোথায় রাশিরাশি প্রক্ষিপ্ত নাই! সর্ব্বত্রইত পরে যোজনা চলিতেছে। কিন্তু কেবল এক সাহিত্য সমালোচনার সময় ব্যতীত, আর কখনই ত তুমি কোন অংশ পরে যোজিত বলিয়া তাহার অগৌরব কর না। তোমার গোঁপ জোড়াটিও সে দিনকার প্রক্ষিপ্ত; কই তাহাতে তা দিতেত ছাড় না? তোমার শ্মশ্রুরাজিও ঘোর প্রক্ষিপ্ত; কই এক দিনও ত চুম্‌রাইতে ছাড় না? কেবল সাহিত্যের বেলায় নূতন নিয়ম করিবে কেন?

স্ত্রীলোকের গোঁপ—প্রক্ষিপ্ত পদার্থ বটে; হাসিবার সামগ্রী বটে,—প্রার্থনীয় বস্তু নহে। কেননা স্ত্রীলোকের গোঁপ বড় অসাঙ্গত্ত, বড় অথাপত্ত। স্ত্রীলোকের কোমলকান্তির ছন্দের সহিত তাহাদের গোঁপ মিল খায় না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের মুখের সাহিত সগোঁপ স্ত্রীমুখ খাপে না।*

তবে আমাদের সেই প্রথম কথা আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আর একদিক দিয়া আসিল। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, যে খাপিল কি না খাপিল,

* দিল্লীর ষ্টেশনের হোটেলে, আমি একদিন একজন শ্বেতাঙ্গী সগোঁপ রমণী দেখিয়াছিলাম। সেই এক হাস্যকরী বিভীষিকা।

তাহা লইয়াই বিশ্বাস ও অবিশ্বাস; খাপিল, কি না খাপিল, তাহা লইয়াই—সত্য ও মিথ্যা ধরা যায়, এবং এখন দেখা যাইতেছে, যে খাপিল, কি না খাপিল—এইটি ধরিয়াই কোন বিষয়টি প্রক্ষিপ্ত কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বে-খাপ সংযোজনা হইলেই প্রক্ষিপ্তি দোষ হয়; খাপ-সই সংযোজনা হইলে, আর প্রক্ষিপ্তি দোষ হয় না।

স্ত্রীলোকের দাড়ি গোঁপের কথা তুলিয়া আমরা একটা কথা এড়াইয়া আসিয়াছি; কিন্তু কথাটি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।

এমন তর্ক হইতে পারে, যে স্বভাবেও দুই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। সেই সকল নৈসর্গিক বিড়ম্বনা লইয়া কোন দিকেই মীমাংসা হইতে পারে না। পুরুষের দাড়ি গোঁপ উঠার কথা লইয়া বিচার চলিতে পারে। পুরুষের দাড়ি গোঁপ প্রক্ষিপ্ত নহে। আমরা পূর্ব্বে রহস্যচ্ছলে পুরুষের দাড়ি গোঁপ যে সেদিনকার প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছি, সেটা আমাদের ভুল। কেননা পুরুষের দাড়ি গোঁপে সংযোজনা নাই, পরিণতি আছে মাত্র। পরিণতি কে কেহই প্রক্ষিপ্তি বলেন না, এবং পরিণতির অগোরব কেহ করেন না পূর্ব্ব পক্ষীয়গণ আরও বলিতে পারেন, মনুষ্য দেহে, উদ্ভিচ্ছরীরে, জড় রাজ্যে, জলে স্থলে, যে সংযোজনা ক্রিয়া নিয়ত চলিতেছে, তাহা পরিণামের সংযোজনা; সুতরাং তাহাতে কিছুমাত্র প্রক্ষিপ্তি দোষ নাই।

এই পূর্ব্ব পক্ষের তিনরূপ উত্তর পক্ষ আছে। প্রথম উত্তর, এই যে সংসারে পরিণতি ব্যতীত যোজনা নাই। ঐ যে আমার সম্মুখস্থ মল্লিকা চারার কুসুম গুলি, মন্দ বাতাসে আস্তে আস্তে ফুটিতেছে উহাও যেরূপ পরিণাম, আর এই যে আমি মসী-লেখনা-যোজনে একটির পর একটি বর্ণ সংযোগ করিতেছি, ইহাও সেইরূপ পরিণাম। ঐ যে বৃহস্পতি মঙ্গল স্থির ধীর জ্যোতিতে, স্থির ধীর গতিতে আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়াছেন,—উহাও যেরূপ পরিণাম, আর ঐ দীন দুঃখী রুগ্ন দেহে ভগ্নস্বরে ভিক্ষা করিতেছে—ইহাও সেইরূপ পরিণাম। এই জগতে কেবল শক্তির পরিণাম ব্যতীত আর কিছুই নাই। পরিণামের মাঝখানে কোথাও আমরা একখানি হস্ত বা একটি মস্তিষ্ক দেখিলে, খানিকটা পরিণামকে আমরা সংযোজনা নাম দেই মাত্র। বাস্তবিক পরিণাম ভিন্ন কোন সংযোজনা নাই।

দ্বিতীয় কথা—যদি মস্তিষ্কের মধ্যবর্ত্তিতা দেখিয়া সংযোজনা বলিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থ—স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্য কৃতি মাত্রই

সংযোজনা। আর, এক জন মনুষ্যের কৃতিতে আর এক জন মনুষ্যের কৃতি সংযোজনাকে প্রকৃত প্রক্ষিপ্ত বলিলে, সেই প্রক্ষিপ্তিও দোষাবহ হয় না। কাব্যের প্রক্ষিপ্ত বাদে তোমায় আমায় বিরোধ যাইতেছে। সুতরাং ওটি ছাড়িয়া দিয়া মনুষ্যের অন্যরূপ কৃতির পর্য্যালোচনা করা যাউক। দেখা যাউক, অন্যত্র মনুষ্যের কৃতি যোজনাকে আমরা প্রক্ষিপ্ত বলি কি না?

একজন সুনিপুণ চিত্রকর একটি বিস্তৃত উপবনের মধ্যস্থিত মন্মথ মূর্ত্তি চিত্র করিয়াছে। সহকার শাখায় নবকিসলয় ঝলমল করিতেছে; পার্শ্বস্থিতা মাধবী সহস্র বাহুতে আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র; তবু যেন ধরি ধরি-করিয়া ধরিতে পারিতেছে না। পলাসের নিবিড় পত্র ঘটার মধ্যে তেমনই নিবিড় রক্তচ্ছটা—দূর হইতে যেন সদ্য জাত দাবানল বলিয়া ভ্রম হয়। নির্ম্মল সরসী কূলে, বকুলের পাশে মন্মথ দণ্ডায়মান। কণ্ঠে—বেলার কণ্ঠি, বক্ষে যুঁয়ের গোড়ে, কাণে চাঁপার দুল, হস্তে কুসুম শরাসন, মস্তকে ফেরের উপর ফের দিয়া ফুলময় উষ্ণীশ। মল্লিকা-স্তবকে ভ্রমর ভ্রমরী বিচরণ করিতেছে—মন্মথ স্থির দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছেন। মনে করুন, বহু কাল পরে, এই চিত্রের পার্শ্বে—আর এক জন চিত্রকর কুসুম-ভূষণ-ময়ী রতি মূর্ত্তি চিত্রণ করিল। বনফুলে তাঁহার কবরীবন্ধন—জাতি ফুলের ঝালরে তাঁহার অব-গুণ্ঠন। তাঁহার ফুলের কাঁচলি, ফুলের আঁচল। ফুলময় তালবৃন্ত লইয়া মন্মথের লক্ষ্য ভ্রমর ভ্রমরীকে মল্লিকা গুচ্ছ হইতে যেন অপসারিত করিতেছেন। দুই জন বিভিন্ন চিত্রকর বিভিন্ন সময়ে এই দুইটি মূর্ত্তি চিত্র করিয়াছেন বলিয়া শেষের টি প্রক্ষিপ্ত— সুতরাং অগৌরবের সামগ্রী—বলিবে কি? এখন তর্কস্থলে, যাহাই বল, আর কখন কেহও বলেন নাই।

চিরদিনই দেখিতেছি কুম্ভকার গঠন করিল, চিত্রকর চিত্র করিল, সাজওয়ালা সাজাইল, তবে পূর্ণ প্রতিমা হইল। অর্থাৎ স্বভাবে যেমন পরিণতি আছে—সুচারু শিল্পেও সেইরূপ পরিণতি আছে। দুই জন বা দশ-জন কারিগরে, একটি কারুকার্য্য করে বলিয়া, কার্য্যের কোন ক্ষতি হয় না, এবং শেষের কার্য্যও কাহারও অনাদরের পদার্থ হয় না।

তৃতীয় কথা, এবং এইটিই আমাদের মূল কথা—এই যে, স্বভাবের সর্ব্বত্রই, মানব কার্য্যের সর্ব্বত্রই, উন্নতি, বৃদ্ধি, পুষ্টি, পরিণতি, স্ফূর্ত্তি—আছে—তবে কি কেবল কাব্যেই সেরূপ কিছু নাই? এমন কখনই হইতে পারে না। সকল সামগ্রীর মত কাব্যও গজাইয়া উঠে, ক্রমে ক্রমে

কাব্যও ফুটে, বাড়ে, পাকে; কোন বিশেষ কাব্যের প্রকৃতি ও পরিণামের গতি বুঝিয়া যিনি কাব্যের পরিপোষণার্থ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভাত করেন, তাহাঁর কীর্ত্তি অতি মহৎ; উহাতে প্রক্ষিপ্তির দোষ হয় না। পরিণতির ঐশ্বর্য্য উদ্ভাসিত হয়।

জগতে অতুলনীয় মহাকাব্য রামায়ণ লইয়াই আমরা এই প্রক্ষিপ্তবাদের বিচার করিব।

উদ্ভট কথার প্রথমে আমরা বলিয়াছি 'যে রামচন্দ্র নামে একজন রক্ত মাংসের মনুষ্য হস্ত পদাদি লইয়া এই পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য বিচরণ করিয়াছিলেন কি না—এই কথা ভাবিবার, এই কথার বিচার করিবার তোমার আমার মত সামান্য জীবের কোন কথা নাই।' * * * 'তোমার আমার পক্ষে সংসার ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি জন্য—ঐ কথার বিচার করিয়া কোন কথা নাই।' অর্থাৎ রামায়ণ কতদূর ঐতিহাসিক বা প্রামাণিক, আমাদের পক্ষে তাহার বিচার করা আমরা আবশ্যক বোধ করি না।

আমাদের মূল কথা ঐ; সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রক্ষিপ্তবাদের কথা তুলিয়া—এই বলিতে চাই যে, রামায়ণকে কেবল কাব্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, রামায়ণ একজনের লেখা কি না, একাধিক কবির লেখা হইলে, কতটুকু কাহার লেখা —ইত্যাদি বিষয়ের বিচারেরও প্রয়োজন নাই।

রামায়ণের ন্যায় জাতীয় মহাকাব্য—জাতীয় কৃতি ও জাতীয় সম্পত্তি। একজনে বা দশজনে, উহার শ্লোক যোজনা করিলেও উহাতে কোটি কোটি লোকের মনোভাব সমষ্টি সন্নিবেশিত থাকে। জুবর্টের মহামেলা কি কেবল জুবর্টেরই কীর্ত্তি বলিবে? মূল ধারণা জুবর্টের, এবং তাহাতেই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব বলিতে হয়। সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ যদি মহর্ষি বাল্মীকির রচনা হয়, তাহা হইলেও তাঁহার কৃতিত্ব সেইরূপ বলিতে হইবে। তবে জড় পদার্থ সংগ্রহের জন্য জুবর্টকে যেরূপ ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল, জাতীয় মনোভাব সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে সম্ভবত সেরূপ ভিক্ষা করিতে হয় নাই। মনীষীগণের মহদাত্মায় সমগ্র জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয়; তাঁহাদের মহাকাব্যে জাতীয় মনোভাব সুতরাং প্রকটিত হয়।

আর্য্য চরিত্রের সরলতা, সত্যপালন, সহিষ্ণুতা, দাঢ্য, বীর্য্য, নিষ্ঠা,— জড়ে উদাসীনতা, জীবে মায়া মমতা, প্রীতি, ভক্তি, আনুরক্তি; আর্য্য সমাজে

অনার্য্যের উৎপাত,—আর্য্য রাজ পরিবারের কলঙ্ক-বৃক্ষ বহু বিবাহ ও সেই কলঙ্ক বৃক্ষের কণ্টকময় ফল সপত্নী-বিদ্বেষ,—পুরুষের পত্নীভক্তি, নারীর পাতিব্রত্য, ভ্রাতৃপ্রণয় ও ভ্রাতৃ বিবাদ—জাতীয় জীবনের সমগ্র চরিত কেমন স্বতন্ত্র ভাবে, অথচ মহাযোগে রামায়ণে মিলিত রহিয়াছে। দশটিভাব একত্র হইয়া রামনামে একটি মহাভাব হইয়াছে। রঘু-বীর, দশরথ-তনয়, লক্ষ্মণাগ্রজ, সীতাপতি, রাবণারি, সুগ্রীব-সহায়, বিভীষণ-মিত্র, হনুমৎপ্রভু—শ্রীরাম। সেইরূপ দশরথ, সেইরূপ লক্ষ্মণ, সেইরূপ রাবণ, সেইরূপ সীতা। তাহাতেই এমন বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য জগতে আর নাই। এই অতুল্য মহাকাব্য মৃত না জীবন্ত? আমরা বলি জীবন্ত এবং পরিণতিশীল।

উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচিত হৌক, আর নাই হৌক, উহা প্রক্ষিপ্ত, সুতরাং আদরণীয়, অবিশ্বসনীয় এবং ত্যজ্য—একথা কখনই বলিতে দিব না। এ বিষয়ে বাঙ্গালি কবি কৃত্তিবাস বড় সার কথা বলিয়াছেন।

"উত্তর কাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডেরি বিশেষ;
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ।

এই বিশেষ কথাটি বড় সুন্দর, বড় সার্থক; ছয় কাণ্ডের স্ফূর্ত্তিই উত্তরকাণ্ডে; উত্তর কাণ্ডেই ছয় কাণ্ডের বিশিষ্ট পরিণতি। উহার জান, উহার মূল কথা পরিণতির পরিণতি—

সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশ।

দেবীর পাতাল-প্রবেশের পরও অনেক কথা উত্তর কাণ্ডে আছে; স্বয়ং রামের সরযূ প্রবেশের বার্ত্তা আছে; কিন্তু উত্তর কাণ্ডের পরিচয়ে, কৃত্তিবাস সে সকল কোন কথা বলেন না।

রাম চন্দ্র করিলেন সরযূ প্রবেশ।

সচ্ছন্দে বলা যাইতে পারিত; কৃত্তিবাস তাহা বলেন নাই। স্বীকার করিতে, হয়ত একটু কুণ্ঠিত হইতে হইবে, কোলব্রিজ, শ্লেগেল পাঠ নিষ্ফল হইয়াছে, ভাবিয়া হয়ত একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে হইবে—কিন্তু এমন সম্ভব হইতে পারে, যে প্রাচীন কৃত্তিবাস ওঝা ঠাকুর তোমা আমা অপেক্ষা কাব্যের অধিকতর রসগ্রাহী ছিলেন।

উত্তরকাণ্ডে যে ছয়কাণ্ডের বিশেষ স্ফূর্ত্তি, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যে রামরাজ্য এখন জগদ্বিখ্যাত, সেই রাজ্যেশ্বর আদর্শ নৃপতি রাজারামকে, আমরা বিশেষরূপে উত্তর কাণ্ডেতেই দেখিতে পাই।

আত্মচরিত্রে প্রজাকে সদ্দৃষ্টান্ত দান করা—রাজার একান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্যনারীর চরিত্রে কেহ মিথ্যা রটনা করিলেও আর্য্যনারী কলঙ্কিত হন। এই কঠোর শিক্ষা প্রজাসাধারণকে প্রদান করিবার জন্য রাজারাম সীতা সাম্রাজ্ঞীকে বিসর্জ্জন করেন। ইদানী রাজ-কর্ত্তব্যতা আমরা জানি না; সাংসারিক আত্মত্যাগ,—তাহাও ভুলিতে বসিয়াছি সুতরাং রামের সীতা বিসর্জ্জন আমরা বুঝিতেই পারি না। সুতরাং উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত বলিলেই সকল বালাই যায়। "ও সকল মিথ্যা কথা!" "তা কি কখন হয়!"

বাস্তবিক মিথ্যা কথা নয়, কিন্তু বড় বিষম কাণ্ড! "স্ত্রীবিসর্জ্জন মাত্রেই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই মর্ম্মোচ্ছেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক, আর না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু,—ভাল বাসুক আর না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা,—ভাল বাসুক বা না বাসুক কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে, পত্নী বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভাল বাসে," সীতার জন্য যে সবংশে রাবণ পাত করিয়াছে—"তাহার কি কষ্ট! কি সর্ব্বনাশ! কি জীবন-সর্ব্বস্ব-ধ্বংস যন্ত্রণার অধিক যন্ত্রণা!" লোক শিক্ষার্থ লোকরঞ্জনার্থ—শ্রীরামের এই আত্মোৎসর্গই—রাজা রামের বিশেষ পরিচয়। এই পরিণতিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিঃক্ষেপ করিবে?

উত্তরকাণ্ডে-সহিষ্ণুতা প্রতিমা সীতাসতীরও বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ছয় কাণ্ডের মধ্যে, সীতা রাজকুলবধূ হইয়াও দুইবার বনবাসিনী। প্রথমবারে সীতা স্বেচ্ছায় পতি শুশ্রূষার্থ, পতি সোহাগে সোহাগিণী হইয়া, রাম সহবাসে বনবাসিনী। সম্মুখে যে স্বর্ণসিংহাসন চমক দিতেছিল, সেদিকে তিনি একবার ফিরিয়া দেখিলেন না, যে কৈকেয়ী মাতা হইতে এই দারুণ অনর্থপাত হইল, তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধির কথা একবারও ভাবিলেন না, প্রফুল্লমনে স্বামীর অনুসারিণী হইলেন। বনবাসেও একদিন বিমর্ষভাব

নাই; বনচারী জীব জন্তুর, পশু পক্ষীর লালনের পালনের যেন সদাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এই এক বিচিত্র মূর্ত্তি। কিন্তু অশোকবনের মূর্ত্তি আরও বিচিত্র! সেই রাম-গত-প্রাণা এখন আর রামকে দেখিতে পান না; সেই লক্ষ্মণ প্রহরী বা কোথায়! যাহা বলিতে নাই, রাবণ আসিয়া তাহাই বলেন, যাহা শুনিতে নাই সীতা তাহাই শুনেন যাহা করিতে নাই রাবণের চেড়ীগণ সীতার উপর তাহাই করে। যাতনার উপর যাতনা, মধ্যে মধ্যে মনে হয়, রাম বিচ্ছেদের তিনিই ত মূল,—যদি তিনি স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করিতে রামকে অনুরোধ না করিতেন—সীতা আর ভাবিতে পারেন না। এত দুঃখেও তবু তিনি রাম সোহাগে সোহাগিনী। তাঁহারই জন্য ত আজি চারিদিকে "জয় রাম" ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীরামের বিক্রমে আজি কনক লঙ্কা টলিতেছে—তাঁহারই জন্য ত. স্বামীবিচ্ছেদ যেন কাহারও কপালে কখন না হয়, কিন্তু যদি কখনও হয়, তাহা হইলে তাহাতে যেন এমনই সোহাগই থাকে!

কিন্তু উত্তরকাণ্ডের বনবাস, কেবলমাত্র যন্ত্রণাময়। সীতা যে স্বামী-সোহাগে বঞ্চিত হইয়াছেন, এ সংশয় সীতার মনে একবারও উঠে নাই। কোনও আর্য্যসতী কখন সে ভাবনা ভাবেন না। সীতার দারুণ দুঃখ, যে হয়ত মুনীপত্নীরা মনে করিবেন, যে তিনি স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা হইয়াছেন; হয়ত তাঁহারা রামের প্রজা বাৎসল্যের গভীরতা বুঝিবেন না, হয়ত সীতার জন্য তাঁহারা রামকে কি কথাই বলিবেন! "হা লক্ষ্মণ, রাম কি জন্য আমাকে বনে দিলেন, এই কথা মুনিপত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি বলিব?" জিজ্ঞাসা করি, এই সীতা যদি না দেখিতে, তবে সেই অশোকবনের সীতা, সেই পঞ্চবটীর সীতা—বুক চিরিয়া, বুকের ভিতর বসিতে পারিত কি?

আর, সীতার সেই শেষ পরীক্ষা। সেই শুভ্র বসনে, আনত আননে সভাস্থলে আগমন; রামের সেই সস্নেহ গম্ভীর আবেদন এবং আদেশ। আর সর্ব্বশেষে সীতার সেই সতীত্বের প্রভাবে প্রাণদানে পরীক্ষা-দান। বিলাত হইতে এক প্রক্ষিপ্তবাদ আনিয়া তোমরা রামায়ণ হইতে এই সকল ত্যাগ করিতে বল? তাহা কি কখন পারা যায়? ছয়কাণ্ডের বিশেষ যাহাতে আছে, রামায়ণের সেই অপূর্ব্ব পরিণাম, কখন কি ত্যাগ করিতে পারা যায়? তাজ মহলের গম্বুজ সর্ব্বশেষে হইয়াছে বলিয়া, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বল? ত কি কখন পারা যায়!

নবজীবন।

২য় ভাগ } জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩। { ১১শ সংখ্যা।

নৈমিত্তিক প্রলয়।

একসহস্র সত্য, একসহস্র ত্রেতা, এক সহস্র দ্বাপর এবং এক সহস্র কলিযুগ লইয়া ব্রহ্মার একদিন হয়। ব্রহ্মার একদিনের নাম এক কল্প। এক এক কল্পের মধ্যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হইয়া থাকে। তদন্তে ব্রহ্মার দিবাবসান ও নিদ্রাকাল উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ত্রৈলোক্যের সার্ব্বভৌমিকী স্থূলশক্তি ক্ষয়জন্য ঈশ্বরীয় স্থূল সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব-রূপ ব্রহ্মার নিদ্রা কল্পিত হইয়াছে। সে নিদ্রা কেবলমাত্র প্রকৃতির স্থূল-ধাতুর ও তদন্তর্গত ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বের বিরাম বোধক। নতুবা ঈশ্বরের নিদ্রা অসম্ভব।

ব্রহ্মার দিবাবসান অর্থাৎ ব্রহ্মনিদ্রা নিমিত্ত যে ত্রৈলোক্যের লয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। এই প্রলয় দ্বারা কৃতক শব্দবাচ্য ভূলোক, ভুবলোক, ও পিতৃদেবমিলিত স্বর্গলোক,—এই লোকত্রয় বিনষ্ট হয়। জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোকের তুলনায় এই ত্রিলোক-বিশ্ব স্থূল ভোগের স্থান। এসমস্ত লোকে যেরূপ স্থূল ভোগের অধিকার, যেরূপ বাসনা ও অদৃষ্ট বিদ্যমান, এবং অন্ন, জল, তেজঃ, প্রভৃতির যেরূপ স্থূল প্রভাব বর্ত্তমান, তাহা সামান্যত প্রকৃতির স্থূল-ধাতু মাত্র। সেই সমষ্টি স্থূল-ধাতু ক্ষয় অথবা অধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মার দিবাবসান—একই কথা। সেই অবস্থা উপস্থিত হইলেই উপরি উক্ত লোকত্রয় নৈমিত্তিক প্রলয়ে বিলীন হইয়া থাকে।

নৈমিত্তিক প্রলয়ে পঞ্চীকৃত ভূত-পঞ্চের মহাতেজোময় ও পরম পবিত্র দীর্ঘস্থায়ী সত্ত্বাংশ দ্বারা বিরচিত জন, তপ ও ব্রহ্মলোকের বিন্দুমাত্র ক্ষতি

হয় না। যে সকল সাধুব্রত পুরুষেরা পৃথিবী অবধি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্বর্গত্রয়ের ভোগ্য বিষয়ানন্দ, পিতৃ ও দৈবকর্ম্ম-নিষ্পন্ন সামান্যফল প্রভৃতি হীন ভোগ ত্যাগ করিয়া যোগাভ্যাস, সন্ন্যাস, বা ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা চিত্তকে উন্নত করিয়াছেন, তাঁহারাও বিপদ্গ্রস্ত হন না। তাঁহারা ভূতপঞ্চের নির্যাসিত যে প্রকার সত্ত্বগুণের সেবা করেন; সূক্ষ্মভূত নিষ্পন্ন মনোবুদ্ধি-প্রধান সূক্ষ্ম দেহ মাত্রের অবলম্বনে যে প্রকার বিচরণাদি করেন, বাহ্য ইন্দ্রিয়, প্রাণ-বায়ু, ক্ষুৎ, পিপাসা প্রভৃতিকে দমন-পূর্ব্বক যেরূপ মানসিক সূক্ষ্মশক্তির ভজনা করেন, বাহ্য যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে প্রকার প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করেন, বাহ্য দেব-দেবীর পূজা ত্যাগপূর্ব্বক যে প্রকার সূক্ষ্মদেহাদির অধিষ্ঠাতৃ হিরণ্যগর্ভাদি দেবতার ধ্যান ধারণা করেন, তাহাতে উক্ত পঞ্চভূতবিশিষ্ট ত্রৈলোক্যের বিনাশে তাঁহাদের সূক্ষ্ম দেহাবলম্বন পূর্ব্বক সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যভোগের ও তাহার ফলদাতা স্বরূপ হিরণ্য-গর্ভদেবের সহবাসে সাত্ত্বিক আনন্দ সম্ভোগের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। অতএব ত্রিভুবনের তাদৃশ বিলয়কালে জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক অটল থাকে। তথাকার নিবাসিগণ তখন রক্ষা পান এবং ত্রৈলোক্যে সেই সকল উন্নত স্বর্গের ভাগী যত যোগী, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী থাকেন, সে সময়ে তাঁহারা স্ব স্ব মানসত্যক্ত স্থূলকলেবর সকল অবাধে ত্যাগপূর্ব্বক ঐ সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় ভুবন আশ্রয় করেন। তাদৃশ মহাবিপ্লব সময়ে মহর্লোক একেবারে জনশূন্য হইয়া যায়। মহর্লোকবাসী মহাত্মারা সকলেই যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন। এজন্য তাঁহারা সকলেই উদ্ধার লাভ পূর্ব্বক জনলোক আশ্রয় করেন।

অতএব নিশ্চয় হইল যে, নৈমিত্তিক প্রলয়ে অন্ন, জল, তেজঃ প্রভৃতির স্থূল প্রভাব বিনষ্ট হয়। সূক্ষ্ম, সাত্ত্বিক ও তৈজস প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। সূক্ষ্মভূতগণ ও স্থূল ভূত সংখ্যা সমুদয়ই বর্ত্তমান থাকে। কেবল পৃথিবী এবং পিতৃ ও দেবলোকে ধ্রুব তারা পর্য্যন্ত পৃথিবীর ন্যায় যত বসতি-স্থান, ভোগ-স্থান, ও সুখধাম আছে, সমস্তই, প্রলয়-কবলিত হয়। উপরিউক্ত বৃহদায়তন ক্ষেত্রের অন্তর্গত দেব পিতৃ প্রকাশোপাদক সূর্য্যচন্দ্র পৃথিব্যাদি প্রত্যেক অণ্ডগোলক সঙ্কর্ষণানলে দগ্ধ হইয়া প্রলয়াগ্নি সম্ভূত অথচ স্বপ্ন অব্যব-হিত কারণ স্বরূপ জলে একার্ণবীভূত হইয়া থাকে। উহার কুত্রাপি একটি জীবও বিদ্যমান থাকে না। উহার জাগ্রত কালে পরমাত্মার ব্রহ্মানামক যে

অধিষ্ঠান, উঁহার নিয়মানে নিযুক্ত থাকে, তাহা নিদ্রিত হইয়া যায়। এক মহাঘোরা কালরাত্রি এই ত্রিভুবনকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তাহার নাম ব্রহ্মরাত্রি (ব্রহ্মার রজনী)। যদবধি জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক অবস্থিত করে, সে পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে ধ্রুবতারা পর্য্যন্ত যে ত্রিলোকবিশ্ব, তাহা এইরূপে বার বার প্রলয় প্রাপ্ত এবং বার বার সৃষ্ট হয়। সেইজন্য তৎসমূহকে 'কৃতক' কহে। 'ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং।' 'কৃতকং' প্রতিকল্পং কার্য্যত্বাৎ। (বিঃ পুঃ ২।৭।১৯।)

জীবের স্থূলশরীর, পার্থিব প্রাণ, এবং স্বর্গীয় কলেবর সম্বন্ধীয় যে সুখভোগের অধিকার তাহা স্বভাবত চিরস্থায়ী নহে। তাহার সহিত প্রকৃতির যে অংশের লিপ্ততা এবং ঈশ্বরের যে কর্তৃত্ব বিদ্যমান আছে তাহাও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এই কারণে নৈমিত্তিক প্রলয়ে, দেহ, ভোগস্থান প্রকৃতি এবং তাহাদের সুব্যক্ত সম্বন্ধের যুগপৎ প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাহার অন্তর্গত ঈশ্বরীয় কর্তৃত্বস্বরূপ ব্রহ্মাও নিদ্রাভিভূত হন।

জীবদেহে নিদ্রাই একটি প্রলয়, কিন্তু মৃত্যুর ন্যায় তাহা ভয়ঙ্কর নহে। মৃত্যুকে যদি প্রাকৃতিক প্রলয়ের সহিত তুলনা দাও, তবে নিদ্রা, নৈমিত্তিক বা অবান্তর প্রলয়ের তুল্য হইবে। অতএব জীবদেহে নিদ্রাই ক্ষুদ্র প্রলয়-স্বরূপ। শরীরের বীর্য্য ও শক্তি প্রতিদিনই নিস্তেজ হইয়া যেমন প্রতিদিনই নিদ্রা উপস্থিত করে, সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূরাদি ত্রিলোকের সমুদয় ব্যবহারিক শক্তি প্রত্যেক সহস্র চতুর্যুগান্তে হ্রাস হইয়া যায়। তাহাতেই ব্রহ্মনিদ্রা, নৈমিত্তিক প্রলয় বা কল্পান্ত সংঘটিত হয়। এইরূপ অবান্তর প্রলয় অস্বাভাবিক নহে। জীবদেহে সমস্ত দিনের জাগরণ ও পরিশ্রমের পর নিদ্রা উপস্থিত হওয়া যদি স্বাভাবিক হয়, বৃক্ষ সকলের এক বা দুই বর্ষকাল ফল ধারণান্তে ফল প্রসবের শক্তি ক্ষয় জন্য যদি এক বা বর্ষদ্বয় বিরাম গ্রহণ করা স্বাভাবিক হয়, ফল ও পুষ্প বৃক্ষ সমূহের ঋতু বিশেষে নবপল্লব, মুঞ্জরী, পুষ্প, ফল প্রসবান্তে অবশিষ্ট ঋতুকালে সুষুপ্তবৎ থাকা যদি স্বাভাবিক হয়, দীর্ঘকাল স্বল্প-বৃষ্টি, মন্দবায়ু, উত্তাপাতিশয্যের পর যদি মহামহা বৃষ্টি ও ঝড় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক হয়. তবে এই ত্রিলোক-বিশ্ব, সহস্র-চতুর্যুগ জাগ্রত ও জীবন্ত থাকিয়া তাহার পর ক্রমশ শক্তিক্ষয়, বীর্য্যক্ষয়, ভোগক্ষয় বশত নৈমিত্তিক প্রলয়রূপ যে একটি ঘোর নিদ্রাতে অভিভূত হইবে তাহাকেও

সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তর উৎপাত দেখা দিতেছে, তখন অবান্তর-প্রলয়রূপা বৃহৎ বিপদ সকলও যে প্রত্যেক নিরূপিত সময়ান্তে উপস্থিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যখন পৃথিবী, অগ্নি ও জলপ্লাবনে অদৃশ্য হইতে পারে, তখন স্বর্গও যে পারিবে না; এমন স্থির করা উচিত নহে, কারণ স্বর্গও ভোগের স্থান। যেখানে ভোগ আছে, সেই খানেই ক্ষয় আছে।

ফলত ঋষিরা আমাদের ন্যায় যুক্তি পরতন্ত্র হইয়া বা কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া এই সকল প্রলয়ের বিবরণ শাস্ত্র-বদ্ধ করেন নাই। এ সমস্ত তত্ত্ব ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ স্বরূপ; তাঁহাদের যোগারূঢ়া ও বিক্ষেপ-চলন-বর্জ্জিতা বুদ্ধিতে উদয় হইয়াছিল। আমাদের পারলৌকিক উপকারার্থ তাহা তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন। এইক্ষণ আমাদের যেরূপ যুক্তি ও বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দারা আমরা ঐ সকল তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারি না। তথাপি শাস্ত্রীয় যুক্তির অনুগত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে, আমার শরীররূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যখন নিত্য নিত্য নিদ্রারূপ নৈমিত্তিক প্রলয় হইতেছে, এবং একদিন মৃত্যুরূপ মহাপ্রলয় হইবে; তখন সেই সকল ধাতুতে বিনির্ম্মিত, তদীয় উত্তর-সাধক-রূপ ভূরাদি ত্রৈলোক্য কেন সেইরূপ নৈমিত্তিক লয়কে না পাইবে?, এবং কেনই বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডীয় সমস্ত স্থূল-সূক্ষ্ম তত্ত্ব কোন নিরূপিত দীর্ঘকালান্তে মহাপ্রলয়ে কবলিত না হইবে? শাস্ত্রীয় যুক্তির!প্রসাদাৎ আরো বুঝিতে পারি যে, যখন, সূক্ষ্মদেহ-নিবন্ধন আমার এই পৃথিবীতে বা অন্য লোকে পুনরুদয় হইবে, তখন সর্ব্বভূতের সূক্ষ্মবীজ-স্বরূপিণী প্রকৃতি নিবন্ধন এই নৈমিত্তিক বা প্রাকৃতিক সৃষ্টি আবার কেন প্রকাশ না পাইবে? চিন্তা ব্যতীত, ধ্যান ব্যতীত, সাধনা ব্যতীত, শাস্ত্রাচার্য্যের বাক্যে শ্রদ্ধা ব্যতীত,—এ সকল তত্ত্ব ধারণ করা যায় না। অশ্ব, রথ, দাস, দাসী, অট্টালিকা, সংবাদপত্র, পুস্তকালয়, সভারোহণ, বক্তৃতা, অর্থকরী-বিদ্যা এবং অন্যান্যরূপ বিষয়বুদ্ধিপ্রদ ব্যাপারের মধ্যে ঐ সকল তত্ত্বের স্থান হয় না, কেবল স্থির চিত্ত শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সম্পন্ন ধীরেরা তাহার সত্যতায় নিঃসংশয় হয়েন।

প্রাকৃতিক সৃষ্টি অবধি প্রাকৃতিক প্রলয় পর্য্যন্ত ব্যাপী বিষ্ণুর যে দিবাভাগ তদন্তর্গত কালমধ্যে যতবার নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় হয় তাহা হিরণ্যগর্ভের অধিকারভুক্ত। মানবের যেমন শতবর্ষ পরমায়ু, ব্রহ্মারও সেইরূপ ব্রাহ্মপরিমিত শতবর্ষ পরমায়ু। প্রত্যেক মানব যেমন আত্মেন্দ্রিয়ে

মনোবুদ্ধি প্রাণাদির ব্যষ্টি-মাত্র, তদবস্থায় কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের আধার বিশেষ, এবং স্বতন্ত্র কার্য্যমাত্র, ব্রহ্মা সেইরূপ সমস্ত সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন আত্মার সমষ্টি অধিষ্ঠাতা। সেই কারণে তিনি বেদান্তাদি শাস্ত্রে জীবঘন বলিয়া উক্ত হন। তিনি সমুদয় কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের নিয়ন্তা এবং সামান্যত সমস্ত পৃথক পৃথক্ কার্য্যের অখণ্ড ঘনীভূত কারণ স্বরূপ। ব্যষ্টি লক্ষণাক্রান্ত মানবের যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মৃত্যু এই চারি অবস্থা, সমষ্টি লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মারও ঐ চারি অবস্থা। ঐ সমষ্টি অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতীয় সমগ্রব্যষ্টি অবস্থার বীজস্বরূপ। সর্ব্বজীবের একায়ন এবং অখণ্ড প্রাণ স্বরূপ ব্রহ্মার জাগরণেই সকলের স্বষ্টিরূপ জাগরণ ও স্থূল দেহের আবির্ভাব। এই জাগ্রত অবস্থায় তাঁহার সংজ্ঞা বিরাট। জগতে স্থূলদেহ ও জাগ্রত অবস্থা আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব্বে সূক্ষ্মদেহও অঙ্কুরাবস্থা মাত্র ছিল। সামান্য স্বপ্নে, স্বপ্ন-দেহ ও ভোগ্য পদার্থ যেমন স্থূলত্বে পরিণত হয় না, কেবল অঙ্কুরবৎ অথবা জাগরণ ও নিদ্রার সন্ধিবৎ উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ অঙ্কুরবৎ বা সন্ধিবৎ ছিল। সর্ব্বজীবের এইরূপ সূক্ষ্মাবস্থা স্বতন্ত্র বা স্বয়ম্ভূ নহে, কিন্তু তজ্জাতীয় একমাত্র সর্ব্বগত সমষ্টি বা সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক তত্ত্বের ব্যষ্টিভাব। সেই সমষ্টি ভাবটি ব্রহ্মার স্বপ্নাবস্থারূপে কথিত হয়। সেই অবস্থা সমস্ত অঙ্কুরের গর্ভাঙ্কুর। কাঠকে 'ঊর্দ্ধমূলঃ অবাক্শাখঃ' ইত্যাদি শ্রুতির ভাষ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অবিদ্যাকামকর্ম্মাব্যক্ত বীজ প্রভবঃ পরব্রহ্ম বিজ্ঞানক্রিয়া শক্তিদ্বয়াত্মক হিরণ্যগর্ভাঙ্কুরঃ সর্ব্বপ্রাণি লিঙ্গভেদস্কন্ধঃ।" অবিদ্যাকাম কর্ম্মস্বরূপিণী বীজপ্রকৃতি এই সংসার বৃক্ষের প্রভবস্থান, পরব্রহ্মের জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তিদ্বয়রূপী হিরণ্যগর্ভ তাহার অঙ্কুর, সর্ব্বপ্রাণীর সূক্ষ্ম-শরীর তাহার স্কন্ধ। পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্ম দেহ সেই মূল অঙ্কুরাবস্থারই ব্যষ্টি। সেই অবস্থাই ব্রহ্মার সূক্ষ্ম বা স্বপ্নাবস্থা। তাদৃশ অবস্থায় তিনি হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত হন। সুষুপ্তি অবস্থাতে তিনি স্বসৃষ্ট সর্ব্বভূতের লয়স্থান এবং ভাবী সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তখন উপাদানকারণ-রূপিণী প্রকৃতিও তাঁহার সহিত নিদ্রিত হয়। এই অবস্থায় তাঁহার সংজ্ঞা, সর্ব্বজ্ঞ জগৎ,কারণ,ঈশ্বর,মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি। মৃত্যু সময়ে,ঈশ্বর,হিরণ্যগর্ভ,বিরাট, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সংজ্ঞার অভাববশত তিনি প্রাকৃতিক-সৃষ্টির বীজভূতা আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্তের লয়স্থানস্বরূপিণী পরমাত্মার তটস্থা-শক্তিতে লীন হইয়া যান এবং তাঁহার অধিকারস্থ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অনুবর্ত্তী হয়। জীব যেমন

মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহ নিবন্ধন পুনঃ শরীর ধারণ করেন, ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ অনাদি কামকর্ম্মবীজস্বরূপিণী ঐশী-শক্তিবশাৎ পুনরাবির্ভূত হইয়া আবার নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও নৈমিত্তিক প্রলয় করিয়া থাকেন।

নৈমিত্তিক অর্থাৎ অবান্তর প্রলয় অনেকবার হইয়া গিয়াছে। ঋষিরা তাহা যোগবলে জানিয়াছিলেন। ব্রহ্মার ১০০ বর্ষ পরমায়ুর মধ্যে ৫০ বর্ষ গত হইয়াছে। তাহা তাঁহার 'প্রথম পরার্দ্ধকাল' বলিয়া কথিত হয়। সেই ৫০ বর্ষের মধ্যে ১৮০০০ দিনমান ও ১৮০০০ রাত্রিমান ছিল। তন্মধ্যে প্রথম বর্ষে (অর্থাৎ প্রথম ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রিতে) তিনি কিছু সৃষ্ট করেন নাই। সেই কাল যাবৎ তিনি পরব্রহ্মের সৃষ্ট অণ্ডেতে বাস করিয়া ছিলেন। সেই এক ব্রাহ্মবর্ষের মানবীয় পরিমাণ ৩১১০৪০০০০০০০০ বর্ষ। সেই দীর্ঘকাল যাবৎ এই ব্রহ্মাণ্ড নানা গ্রহতারারূপে বিভক্ত না হইয়া একমাত্র মহাসৌর অণ্ডে ঘনীভূত ছিল। ব্রহ্মার আয়ত্বাধীন প্রকৃতিশক্তির স্বাভাবিক বিক্ষেপবশাৎ কালক্রমে তাহা হইতে জ্বলন্ত পাবকের স্ফুলিঙ্গের ন্যায় গ্রহতারা চন্দ্রসূর্য্য দশদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া অসীম গগনমণ্ডলকে শোভাময় করিয়াছে। সুতরাং ১৮০০০ দিবারাত্রি হইতে উপরি উক্ত ৩৬০ দিবারাত্রিকে বিয়োগ করিলে ১৭৬৪০ দিন ও ১৭৬৪০ রাত্রি অবশিষ্ট থাকে। অতএব ব্রহ্মার বিগত ৫০ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে ১৭৬৪০ বার নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও ১৭৬৪০ বার নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় বর্ত্তমান প্রাকৃতিক-সৃষ্টিরই অন্তর্গত। তাহার প্রথমটির নাম ব্রাহ্মকল্প এবং দ্বিতীয়ের নাম পাদ্মকল্প ছিল। অবশিষ্ট ১৭৩৮টি কল্পের নাম শাস্ত্রে আছে কিনা সন্দেহ।

এখন ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ আয়ু আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিরপার্দ্ধের অর্থ তাঁহার দ্বিতীয় ৫০ বর্ষ। এই কাল মধ্যে ১৮০০০ বার নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও ১৮০০০ বার নৈমিত্তিক প্রলয় হইবে। ঐ দ্বিতীয় ৫০ বর্ষের মধ্যে সম্প্রতি কেবল তাঁহার প্রথম দিন মাত্র চলিতেছে। সুতরাং এই বর্ত্তমান নৈমিত্তিক-সৃষ্টি উক্ত ১৮০০০ সৃষ্টির প্রথমটি মাত্র। ইহার নাম শ্বেতবরাহ কল্প। অন্যান্য কল্পের ন্যায় একল্পেও ১০০০ সত্য, ১০০০ ত্রেতা, ১০০০ দ্বাপর ও ১০০০ কলিযুগ আছে। তন্মধ্যে ২৮টি সত্য, ২৮টি ত্রেতা, ২৮টি দ্বাপর এবং ২৭টি কলিগত হইয়া গিয়াছে। এখন অষ্টাবিংশতি কলিযুগ প্রবর্ত্ত হইয়াছে। একটি সত্য, একটি ত্রেতা, একটি দ্বাপর, একটি কলি,

এই চারিটি একত্রে এক মহাযুগ শব্দে কথিত হয়। সুতরাং অষ্টাবিংশতি মহাযুগের কলিযুগ এখন বর্ত্তমান। অবশিষ্ট মহাযুগ সকল ভবিষ্যৎ কালের গর্ভে তিমিরাবৃত রহিয়াছে। কাল কি অচিন্ত্য ব্যাপার! ব্রাহ্ম পরিমিত ৩০ দিন ও ৩০ রাত্রি ধরিয়া ব্রহ্মার মাস পরিকল্পিত হয়। অতএব বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ: কল্পটি ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ কালের অন্তর্গত প্রথম বর্ষের (অর্থাৎ এক পঞ্চাশত বর্ষের) প্রথম মাসের প্রথম দিন স্বরূপ। এই প্রথম মাসের অবশিষ্ট ২৯ দিনে যে ক্রমে ২৯টি কল্প হইবে তাহার নাম শব্দকল্পদ্রুমে আছে। তাহার পর যে ১৭৯৭০টি কল্প হইবে, তাহার নাম শাস্ত্রে না থাকিতে পারে। সে সব নামকরণ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

এই বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পের অন্তর্গত এক সহস্র মহাযুগের অষ্টাবিংশতি মহাযুগ এখন চলিতেছে। অবশিষ্ট ৯৭২টি মহাযুগ অনাগত। তাহার এক একটি মহাযুগ (অর্থাৎ চতুর্যুগ) মানবীয় ৪৩২০০০০ বর্ষ পরিমিত। অতএব সমুদয়ের পরিমাণ মানবীয় ৪১৯৯০৪০০০০ বর্ষ। এই মহাকাল গত হইলে পর, আগামী নৈমিত্তিক-প্রলয় সংঘটিত হইবে; তাহার পূর্ব্বে প্রলয় হইবে না; কিন্তু মন্বন্তর, ও যুগ পরিবর্ত্তন নিমিত্ত অল্প বিস্তর বিপদ সমূহ, বহু বহু কালান্তে এক এক বার উপস্থিত হইতে পারে।

শাস্ত্রে আছে যে, নৈমিত্তিক প্রলয় নিকটবর্ত্তী হইলে ভূমণ্ডল শতবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিতে শস্যহীন ও ক্ষীণপ্রায় হইবে। তাহাতে সূর্য্যের সপ্তকিরণ পরিপুষ্ট হইয়া এককালে সপ্তসূর্য্যের উদয় হইবে। সেই উত্তাপে ভূমণ্ডল জলকণাশূন্য হইবে। বৃক্ষলতা জীবজন্তু সমস্ত বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। পৃথিবী কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় নগ্ন আকৃতি ধারণ করিবে। সেই সময় সঙ্কর্ষণাগ্নি সমুদয় পাতালতল দগ্ধ করিয়া ভূতলকে ভস্মসাৎ করিবে। ত্রিলোকস্থ অন্যান্য লোক মণ্ডল সমূহও দগ্ধ হইয়া যাইবে। কেন না সে সমস্তই ভূমণ্ডলের সঙ্গে একই সম্বন্ধ শৃঙ্খলে গ্রথিত। ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগায়তন ও ভোগধাম এই সমস্ত সম্বন্ধই বিরাম প্রাপ্ত হওয়া প্রলয়ের হেতু। সুতরাং নৈমিত্তিক প্রলয়ে ভূলোকাবধি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত লোকমণ্ডল সঙ্কর্ষণানলে দগ্ধ হইয়া অণ্ডকটাহরূপ ভুবন-কোষ এক মহা-ভর্জ্জন-কটাহের আকার ধারণ করিবে। তৎকালে যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন মহাপুরুষেরা স্বস্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক জনলোকে উত্থান করিবেন। মহর্লোক দগ্ধ হইবে না, কিন্তু জনশূন্য হইয়া যাইবে। তথাকার ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগীগণ জনলোক

আশ্রয় করিবেন। সঙ্কর্ষণাগ্নি এইরূপে দশদিকে আপনার জ্বালামালারূপ মহান্ আবর্ত্ত বিস্তার করিলে, ত্রৈলোক্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। সমস্তই ভস্ম ও বাষ্পাকার হইয়া যাইবে। তাহা হইতে ক্রমে মহামেঘ সমূহ উৎপন্ন হইবে। তাহার মহাশব্দে নভোমণ্ডল পূর্ণ হইবে। তৎপরে সমস্ত লোকমণ্ডলে শতাধিক বর্ষকাল স্থূল ও অবিরল জলধারা বর্ষিত হইবে। ধ্রুব ও সপ্তর্ষি পর্য্যন্ত সমস্ত ত্রিলোক সেই জলে প্লাবিত হইয়া যাইবে। সমস্ত ত্রিলোক একার্ণবীভূত হইবে। তাহার পর ত্রিলোকব্যাপী মহাবায়ু উত্থিত হইবে। সেই বায়ু শতবর্ষ বহিবে। তাহাতে মেঘ সকল সংহার প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু, সমুদয় বায়ু সংহারপূর্ব্বক সেই একার্ণবে শেষশয্যায় শয়ন করিবেন। তিনি সত্যসত্যই নিদ্রা যাইবেন এমন উক্ত হয় নাই। কেবল স্থূল জগতের সহ তাহার সম্বন্ধ রহিত হইবে, ইহাই উক্ত শয়ন বা নিদ্রার তাৎপর্য্য। তিনি আপনা আপনি থাকিবেন ইহাই উদ্দেশ্য। তৎকালে সূক্ষ্ম ও যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক থাকিবে। তথাকার ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগীগণ সেই ব্রহ্ম রাত্রিতে ধ্যানযোগে ভগবতী যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিবেন। সেই সমুদয় রাত্রিকাল যাবৎ নিম্নস্থ ত্রৈলোক্য একার্ণবীভূত থাকিবে। নিম্নে দশদিক্ নিস্তব্ধ, ও গাঢ় অন্ধকারাবৃত হইবে। সেই জল, সর্ব্বগুণযুক্ত হইয়া ভাবি সৃষ্টির উপাদান কারণরূপে অবস্থিতি করিবে। তৎকালীন চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপী নিস্তব্ধ অন্ধকারময় অসীম কারণ-জলে একমাত্র ব্রহ্মরূপী নারায়ণ শেষশয্যা-শায়ী হইয়া ভাবি সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ রূপে ভাসমান থাকিবেন। ইহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। এইরূপ প্রলয় স্মরণ পূর্ব্বক ভূতমাত্রা ও ইন্দ্রিয়মাত্রা প্রভৃতি জগতের উপাদান কারণকে নিত্য কহা গিয়া থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রলয়কে স্মরণ করিলে সর্ব্বভূতের সদ্রূপ আধারস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নিত্য শব্দের যোগ্য হয় না।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

রৈলগাড়ি অধ্যায়।

চারি বৎসরের বেশী হইবে না, একবার গ্রীষ্মাবকাশ কালে মনে করিলাম ঢাকা যাই, প্রাচীন সহরটা দেখিয়া আসি; ইচ্ছার সহিত কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া হারি মানিলাম—যাইতেই হইল। রজনী ঠিক সাড়ে আট ঘটিকার সময় সিয়ালদহের আড্ডায় উপনীত হইলাম। লোকে লোকারণ্য। রেলগাড়ি গুলি গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আসিয়া যথা স্থানে দাঁড়াইল, এঞ্জিন্‌টা হুহুঙ্কার নাদ ছাড়িতে লাগিল, যেন যাইতে চায়। দেখিয়া ব্যস্ত হইলাম, কেননা এখনও টিকিটের ঘর খোলা হয় নাই। ঘণ্টা বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে টিকিট ঘরের জানালা খুলিয়া গেল। অমনি শ্রাদ্ধের কাঙালির মত এক এক জানালায় শত শত লোক দাঁড়াইয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল। কাহার সাধ্য টিকিট ক্রয় করে। দেখিয়া আমার প্লীহা চম্‌কিয়া গেল। সাহেবেরা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া অনায়াসে আপনাপন টিকিট আনিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া আমিও চলিলাম, কিন্তু দ্বারবান যাইতে দিল না। শুদ্ধ না যাইতে দেওয়া নয়, তাহার সঙ্গে আর যাহা করিয়াছিল, তাহা বলিব না; বলিবার দরকারও নাই; তাহা দেশী আরোহী মাত্রেই বোধহয় অবগত আছেন।—সেদিন ঢাকা যাইবার আশা ছাড়িয়া বাড়ী চলিলাম। পরদিন যথা সময়ে আবার সিয়ালদহে উপনীত হইয়া, টিকিটঘরে ঢুকিয়া টিকিট লইলাম। কেহ কিছু বলিল না—আজ আমি সাহেব সাজিয়াছিলাম। দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিয়া গেল আরোহিরা তাড়াতাড়ি যাইয়া গাড়িতে আসন লইল। দেখি, এক এক খানি গাড়ি এক একটি সিরাজুদ্দৌলার ব্লাকহোল হইল। চতুর্থশ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, এই সকল আরোহীর মৃতশরীর পদ্মাগর্ভে নিহিত হইবে। আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিন্তু খুঁজিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী পাই না; অবশেষে দেখিতে পাইলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সবে চারিখানি বেঞ্চ। দুখানী পুরুষের, দুখানি স্ত্রীলোকের জন্য। স্ত্রীলোকের গাড়ির দ্বারে উহা যে কেবল স্ত্রীলোকের জন্যই তাহা লেখা রহিয়াছে সুতরাং তাহাতে

উঠিতে চেষ্টা করিলাম না। পুরুষের গাড়িতে পুরুষ পূর্ণ—অতিরিক্ত ভাবে পূর্ণ। ষ্টেসন মাষ্টারকে যাইয়া অবস্থা জানাইলাম। আমি সাহেব, সুতরাং তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোকের গাড়ি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। লিখিত কাষ্ঠফলক উঠাইয়া লওয়া হইল। গাড়ি ছাড়িল। আমি শয়ন করিলাম।

"বগ্‌লো –বগ্‌লো—চাই চুরট, চাই পান-—বিশ মিনিট গাড়ি রহেগা"; ইত্যাদি সুমিষ্ট শব্দে উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়াই দেখিলাম, কাহার কতক গুলিন লগেজ আমার গাড়িতে রহিয়াছে। তাহার পর দেখিলাম, একজন উচু দরের ইংরেজ (ধরণে বোধ হইল সিবিলিয়ান) গাড়ির দরজা ধরিয়া প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া। আমি ভদ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"মহাশয় এ জিনিশ গুলি কি আপনার ?

"হঁা।"

"আপনি এই গাড়িতে যাইবেন ?"

"হঁা।"

"কোথায় যাইবেন ?"

"সম্প্রতি গোয়ালন্দে।"

"পরে।"

"ঢাকা।"

ঠিক এই সময়ে সাহেবের একজন লোক আসিয়া গাড়িতে বসিল—অবশ্য চাপরাশী। সাহেব চলিয়া গেলেন,—আমি দেখিলাম, ষ্টেশন মাষ্টারকে চুপি চুপি কি বলিয়া—প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে যাইয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলাম বেশ্—প্রকাশ্যে চাপরাশীকে বলিলাম "টিকিট দেখ্‌লাও।" দেখাইল, দেখিলাম, চতুর্থ শ্রেণীর। মিথ্যাবাদী সাহেবের উপর ক্রোধ হইল—বলিলাম, "নামিয়া যাও, এ গাড়ি নয়।" চাপরাশী ফাঁপরে পড়িল। তাহার সাহেব বলিয়াছে, এই গাড়িতে বসিতে, আবার আমি সাহেব বলিতেছি—যাইতে, এখন সে কি করিবে। "না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ" সৈ ইতস্তত করিতে লাগিল, আমি পুলিশম্যান ডাকিলাম; তাহারা উহাকে নামাইয়া দিল। উহা দেখিয়া সাহেব আসিয়া ক্রোধ করিয়া পুলিশম্যানকে বলিল, 'হামারা আদ্‌মী এই গাঁড়িমে যাগা।" আমি বলিলাম, "তোমার লোক তোমার গাড়িতে লইয়া যাইতে পার।" ইহাতে সাহেব ক্রোধ রক্তিম চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি প্রথম শ্রেণীর

আরোহী, আমার লোক চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যাইতে পারে।” সাহেবের উপর আমার একটু রাগ ও একটু ঘৃণা হইয়াছিল—আমিও অমনি তৎক্ষণাৎ তীব্রস্বরে বলিলাম ‘তুমি যে প্রথম শ্রেণীর আরোহী তৎ সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে।” এইবার, সাহেব নরম হইলেন। অনুভবে বুঝিলাম, এও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী। গাড়ি ছাড়িবার সময় হইল, সাহেব প্রথম শ্রেণীতে আর তাহার লোকটা চতুর্থ শ্রেণীতে যাইল। গাড়িও ছাড়িল। চাপরাশীর কাছে শুনিয়াছিলাম, লোকটা মাজিষ্ট্রেট, আর ব্যবহারে বুঝিতে পারিলাম লোকটা ছোট লোকও বটে, পাজিও বটে। কেন না এতগুলি টাকা বেতন পাইয়াও—অন্নের জন্য, রেল কোম্পানিকে লগেজের পয়সা গুলি ফাঁকি দিবার চেষ্টা। আমি আরও অনেক এইরূপ ছোট লোক সাহেব দেখিয়াছি, যাহারা এই গাড়িতে যাইব বলিয়া, এ গাড়িতে কিছু, ও গাড়িতে কিছু এইরূপে মালের বিলি ব্যবস্থা করিয়া, আর কত গুলি মাল লইয়া অন্য গাড়িতে যায়। আমাদের নায়কও সেই দলের সাহেব। দুর্ভাগ্য—এরাই আবার বিচারক! যাহা হউক, আমিও সাহেবকে কিছু জব্দ করিবার জন্য মনে মনে একটা উপায় স্থির করিলাম। একে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক, তায় সাহেবের পোষাক, এখন আমাকে পায় কে? ইহাকেই সাহেবেরা আপনা ভাষায় বলে “টিট্ ফর ট্যাট্”—এখন সাহেবের ট্যাট্ হইতে, বাঙ্গালীর টিটটী ভাল হইয়া ছিল কি না, পাঠক বিচার করিবেন।

কূট বুদ্ধিতে বাঙ্গালীর মাথা বেশ চলে, সুতরাং আমাকে অনেকক্ষণ ভাবিতে হইল না। অল্প ক্ষণের মধ্যেই গাড়ি আসিয়া পরের ষ্টেশনে থামিল। অমনি আমি গম্ভীর নাদে, সাহেবী টোনে, গার্ডকে ডাকিলাম। ডাকিবা মাত্রই গার্ড আসিয়া হাজির। আমি তাহাকে একটু ব্যস্ত ও একটু (Serious) কাজের লোক হইয়া কহিলাম—“দেখ গার্ড! এই বেওয়ারিশ মালগুলি কাহার পড়িয়া আছে; তুমি এখনই তুলিয়া লইয়া যাও; নচেৎ খোয়া গেলে তুমি দায়ী হইবে; আমি হইব না, তোমায় বলিয়া রাখিলাম।” ইহা শুনিয়া গার্ড যথার্থই একটু ব্যস্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ কুলি ডাকিয়া মাল গুলিন ব্রেক্‌বানে নিতে প্রবৃত্ত হইল। সাহেব তাঁহার মালগুলিন স্থানান্তরিত হইতেছে দেখিয়া অতি ক্রোধে আসিয়া গার্ডকে বলিলেন, “তুমি কাহার কথায় আমার জিনিষ পত্র স্থানান্তর করিতেছ?” গার্ড আমাকে দেখাইয়া বলিল “ইনি বলিয়াছেন,

এগুলি বেওয়ারিশ ; বিশেষত আমিও দেখিতেছি, ইহার মালিক এ গাড়িতে কেহ নাই এবং এত গুলি মাল যে ওজন হইয়াছে, তাহারও কোন লেবেল ইহার গায়ে নাই সুতরাং ব্রেকভ্যানে রাখিয়া দিব, যাহার জিনিষ, তিনি শেষ ষ্টেশনে ওজন মত ইহার দাম দিয়া লইয়া যাইবেন।" এখানে গাড়ি অনেক ক্ষণ থাকে না, বিশেষত ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহার পরিচিত নহে—অগত্যা সাহেব আমার দিকে চাহিয়া একটি ভ্রূকুটি করিয়া চলিয়া গেলেন। মাল গুলি গার্ড লইয়া গেল। বলা বাহুল্য যে আমি বিশাল হাস্য করিয়া সাহেবের ভ্রূকুটির জবাব দিয়া ছিলাম।

এখানে বলিয়া রাখা উচিত, যে সম্প্রতি রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের হওয়াতে এ সকল বিসদৃশ ঘটনা আর প্রায়ই ঘটে না—কর্ম্মচারিগণ রাঙ্গামুখ দেখিয়াও, নিয়ম রক্ষা করিতে ভুলেন না। এই জন্য সাহেব মহালে ষ্টেট রেলওয়ের বিরুদ্ধে এত দুঃখের কাহিনী শুনা যায়।

যাহা হউক, গাড়ি ছাড়িয়া দিলে আমি শয়ন করিলাম; রাত তখন প্রায় দুইটা। কিছু নিদ্রার আবেশ হইয়াছে—আবার "চাই পান, চাই চুরট"—গাড়ি থামিল। কিছুকাল পরে, মৃদু হস্তে কে গাড়ির দরজা ঠেলিতেছে—খুলিতে পারিতেছে না। উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইলাম। একটি সুন্দরী রমণী আমাকে দেখিয়া দু-পা সরিয়া গেলেন। আমি বাঙ্গালায় কহিলাম "কি চাও" রমণী ভয়ের স্বরে ইংরেজিতে বলিলেন "Is this Second Class Carriage ?" আমি গাড়ির দ্বার খুলিয়া বলিলাম 'হাঁ—আপনি এই গাড়িতে আসিবেন,—আসিতে পারেন, আমি বাঙ্গালী'। রমণী হাসিয়া, এবার সাহসের সহিত আমাকে হাসি মুখে প্রকাণ্ড "Thanks" দিয়া গাড়িতে উঠিলেন। একটি বাবু কিছু জিনিষ দিয়া গেলেন, আমি তাহা গুছাইয়া রাখিলাম। আবার মৃদুহাসি আবার "Thanks"। বলিতে লজ্জা করে বঙ্গরমণীর মুখে ইংরেজী ধন্যবাদ আমাকে বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল। গাড়ি ছাড়িল। কিছুকাল উভয়েই চুপ করিয়া রহিলাম, রমণী আমাকে দেখিতেছিল কি না, বলিব না। আমি ভাল করিয়া দেখিতে ছিলাম। কেন না আমি কিছু বিভ্রাটে পড়িয়া ছিলাম। কেন না, কোন্ রূপে কাহার আবির্ভাব আমার গাড়িতে হইল, তাহাই আমি ভাবিতে ছিলাম। প্রথম মনে করিয়াছিলাম, কোন উচুদরের কীর্ত্তনওয়ালী; কিন্তু সঙ্গে প্যানটুলন পরা বাবু দেখিয়া, মৃদঙ্গ না দেখিয়া, ইংরেজী কথা শুনিয়া, গহনার ছড়াছড়ি না দেখিয়া এবং পদে হাইহীল—লেডীসু দেখিয়া,

মনে একটা খটকা বাধিয়া গেল। তাই এখন রমণীর আপাদ মস্তক ভাল করিয়া দেখিতে ছিলাম—রমণীর বয়স্ অনুমান ১৬।১৭; একহারা ও একটু দীর্ঘাকার শরীর; মুখখানি বেশ সুন্দর—ওষ্ঠাধর তাম্বুল-রাগ-বর্জ্জিত—বর্ণ ন শ্যাম ন গৌর; মুখে অল্প অল্প পাউডার দেওয়া; কর্ণে ক্ষুদ্র শঙ্খকের দোলক; প্রকোষ্ঠে রৌপ্য চুড়ি। গলায় লম্বা স্বর্ণ চেন; তাহার সঙ্গে বক্ষের পকেটে ঘড়ি। পরিধানে সাদা সিমি বা শর্ট ও কালাপেড়ে ধুতি, ফুল মোজা ও বুট জুতা।—পাঠক বলুন দেখি এ রমণী কে?

কলিকাতা অঞ্চলে এক দল চটুকে ছেলে—বৎসর বৎসর স্কুলের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী হইতে বাহির হইয়া আনন্দ-সংসারে বিলীন হয়েন,—আমি তাহাদের একজন হইলে, হয়ত সুবিধা পাইয়া এ হেন রমণীর সঙ্গে বেশ কিছু রসিকতার ছড়াছড়ি করিতাম, টপ্পা গাইতাম, টপ্পা গাইতে বলিতাম। দীনবন্ধু বাবুর নদের চাঁদের মত বিশ্বস করিতাম না—এ খোষ-পোষাকী রমণী গৃহস্থ কামিনী হইতে পারেন।—আর যদি প্রাচীন দলের হিন্দু হইতাম, তাহা হইলেও হয়ত, দুর্গানাম স্মরণ করিয়া, একটু সরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "ওগো বাছা, কোথায় যাওয়া হইয়াছে?" যাহা হউক, আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম, যে হয় ইনি—আজি কালিকার পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী হইবেন, না হয় কোন ব্রাহ্ম-রমণী কিম্বা ব্রাহ্ম-কন্যা হইবেন। আমার বদনে বিলক্ষণ একটা (Brown study) ভাবনার চিহ্ন পড়িয়া গিয়াছে, রমণী বুঝিতে পারিয়া, অগ্রে তিনিই নিস্তব্ধ-ভাব দূর করিলেন। কহিলেন, "মহাশয় বড়ই ভদ্র লোক।" কিন্তু আমি তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেন না এ কথায় "হাঁ, আমি ভদ্রলোক" ইহাও বলা যায় না, কিম্বা "আমি ভদ্র লোক নয়" ইহাই বা কিরূপে বলি? আমার ভাবনা ঘুচিল না। সুতরাং পুনরায় তিনি কহিলেন,—"আপনি বিলাত হইতে কত দিন আসিয়াছেন"? তাঁহার কথার এইবার জবাব দিলাম। বলিলাম,—

"আপনি আমাকে বড় ভদ্রলোক কহিয়াছেন তার পরই কহিতেছেন, আমি বিলাত হইতে কবে আসিয়াছি—যদি বিলাত যাওয়ার সঙ্গে এ ভদ্রতার কিছু সংস্রব থাকে, তবে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, আমি কোনক্রমে ভদ্রলোক নই।"

রমণী উত্তর শুনিয়া, একটু আশ্চর্য্যান্বিত ও একটু লজ্জিত হইলেন।

ইংরেজ বাঙ্গালীকে ইংরেজ মনে করিয়া অবশেষে নেটিব্‌ টের পাইলে যেরূপ স্তম্ভিত হন—বোধ হয়, সেইরূপ স্তম্ভিত হইলেন। আমি দেখিয়া শুনিয়া আবার বলিলাম "আমি যে বিলাত যাই নাই—একথাটার আপনি একেবারে শেষ মীমাংসা করিয়া লইবেন না।"

রমণী এইবারে একেবারে আনন্দে অধীরা হইয়া হাসিয়া বলিল—' ও না, না, না,—আপনি বলুন আর নাই বলুন, আমি আপনাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছি।"

আমি একেবারে ও সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্য কথা পাড়িলাম, বলিলাম—

"আপনি একাকিনী কোথায় যাইতেছেন ?"

"আমি একাকিনী নহি, সঙ্গে লোক আছে।"

"লোক কোথায় ?"

"থার্ড ক্ল্যাশে।"

"কেন ?"

"তিনি বাবার কেরাণী, কার্য্যানুরোধে কলিকাতা আসিয়া ছিলেন,—এ দিকে আমাদেরও ছুটি হইল, তাই তাঁরি সঙ্গে বাবার কাছে যাইতেছি। প্রথমে উভয়ে এক গাড়িতেই আসিতে ছিলাম—বড় ভিড়, এইজন্য টিকিট বদলাইয়া এই গাড়িতে আসিয়াছি।"

"কেরাণী বাবু আপনার পরিচিত ?"

পরিচিত না হইলেও বাবার চিঠি আনিয়া ছিলেন।"

"পিতা যাইতে লিখিয়াছেন ?"

"না।"

"তবে কিরূপে যাইতেছেন ?"

"ছুটি হইলে আমি ত একাকীই যাইয়া থাকি, উপরন্তু লোক পাইলাম, বিশেষ সুবিধাই হইয়া গেল।"

"কত দূর যাইবেন ?"

"বরিশাল।"

"ষ্টীমারে যাইবেন ?"

"ষ্টীমারেই যাইব বটে, ঢাকা হইয়া যাইব।"

"কেন ?"

"দিদির সহিত দেখা করিয়া যাইব।"

"আপনি কোথায় পড়েন ?"

"বেথুন স্কুলে থার্ড ইয়ার ক্লাসে"

"বিএ ক্ল্যাসে ?"

"হাঁ।"

"বোর্ডিংএ থাকেন ?"

"না—আগে ছিলাম।"

"কেন ?"

"তাহার অনেক রহস্য।" এইখানে বেথুন স্কুলের বোর্ডিংএর অনেক রহস্য শুনিতে পাইলাম, কিন্তু সে কথা এখানে নয়।

এইরূপে ক্রমে আমাদের যত আলাপ হইতে লাগিল, ততই উভয়ের মানসিক নৈকট্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং উভয়ে সরিয়া অধিকতর নিকটে বসিলাম। অপরে দেখিলে মনে করিত হিন্দু স্বামী স্ত্রীতে, বা ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগিনীতে আলাপ করিতেছে। পরিচয় এবং অন্যান্য অনেক কথার পর আবার এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। প্রথম আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনার বিবাহ হইয়াছে ?"

"না—,—আপনার ?"

"আমারও হয় নাই ?"

কিছুকাল নীরবে থাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনি কি মেম্ বিবাহ করিবেন ?"

"বলিতে পারি না"

"কেন বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী বাঙ্গালির মেয়েওত পাওয়া যায় ?"

"আদৌ বিবাহ করিব কি না তাহা ঠিক করি নাই।"

এইখানে বিবাহ করা উচিত কি অনুচিত এসম্বন্ধে তিনি আমাকে একটি লেক্‌চার দিয়া বলিলেন—'আপনাকে বিবাহ করিতে হইবে, আমি ভাল মেয়ের ঘটকালি করিয়া দিব।" আমি বলিলাম,—

"যদি কখন ভাল মেয়ে পান, তার একখানি ফটোগ্রাফ্ আমাকে পাঠাইয়া দিবেন।" রমণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার কয়েক জন সহপাঠিকা বন্ধুর ফটোগ্রাফ্ আমার নিকট আছে, তারই একখানি আপনাকে দিতেছি

পছন্দ হইলে জানাইবেন।" এই বলিয়া একটি চর্ম্মপেটিকা খুলিয়া একখানি ক্যাবিনেট সাইজ, ফটোগ্রাফ, আমার হাতে দিলেন। আশ্চর্য্য! এ তাঁহার নিজের ফটোগ্রাফ,। দেখিয়া আমি হাসিলাম, তিনিও হাসিলেন। এরূপ উপহার পাইলে ইংরেজ যে ভাবে উহার সম্মান প্রদর্শন করেন, আমিও তাহাই করিয়া উহা আমার ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে রাখিয়া দিলাম। পাঠক অবাক্ হইবেন, কেননা দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে এত বড় একটা ব্যাপার করিয়া ফেলিলাম।

পাঠক অবাক হউন বা না হউন, আমি কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া বড়ই অবাক্ হইলাম,—কথাটা এই,—আমি বড়ই কুৎসিত--তাই অবাক হইতে-ছিলাম—যে বাঙ্গালীর মেয়ে কালেজে পড়িয়া কিছু বেশী গোচ লেখাপড়া শিখিলে কি ডেস্‌ডিমনার অভিনয় করিয়া থাকে, না হাট্, কোট্‌ধারী পুরুষ মাত্রকেই তাহারা সুন্দর দেখিয়া থাকে !!!

প্রায় পাঁচটা বাজে,—সারা রাত আহার নাই, নিদ্রা নাই, তাহার উপর ক্লান্তি—কেবল কথা—কেবল কথা; মাথা ঘুরিতে লাগিল; চক্ষু বেদনা করিতে লাগিল,—সঙ্গিনীর অবস্থাও সেইরূপ—আমি দেখিয়া শুনিয়া বাক্স হইতে ক্ষুদ্র কিরসিন ষ্টোব্ বাহির করিয়া জল গরম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জল গরম করিতেছেন কেন?" আমি "ক্ষুধা পাইয়াছে ও অনিদ্রা হেতু শরীর খারাপ হইয়াছে সুতরাং কফি খাইব," ইহা কহিয়া কফি—চিনি ও প্রিজর্ভ দুগ্ধ ও পেয়ালা বাহির করিলাম, এই অবসরে তিনিও কয়েকখানি প্যাটি বাহির করিয়া বলিলেন—"দেখুন যদি খাও যায়, আপনার সহিত কথোপকথনে—খাইবার জিনিষ যে সঙ্গে আছে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।" উত্তম হইল—উভয়ে কফি খাইলাম, প্যাটিও খাইলাম। শরীর সুস্থ হইল। বোধ হইতে লাগিল, ইহার উপর একটু ব্রাণ্ডি হইলে বুঝি আরও ভাল হয়; সুরাপায়ীদের এইরূপ বোধ হইয়াই থাকে—বলিতে লজ্জা করে, আমার সামান্য অভ্যাস আছে। এতক্ষণ কেবল ব্রাহ্ম ভগিনীর ভয়ে চুপ করিয়া ছিলাম, এখন আর পারিলাম না। আস্তে আস্তে ষ্টোব্ পেয়ালা প্রভৃতি যথা স্থানে রাখিয়া বোতল গ্লাস বাহির করিলাম। কিন্তু আগে আমার ভয় হইয়া ছিল, কিন্তু সঙ্গিনীর অবিকৃত ও প্রসন্নময় মুখমণ্ডল দেখিয়া সাহস হইল। সঙ্গিণী মধুর ভাষায় মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"কি ব্রাণ্ডি খাইবেন ?" আমি গ্লাসে ঢালিতে ঢালিতে বলিলাম, "একেত পেটের

পীড়া, তার উপর কফি খাইয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি সুতরাং কিছু এষ্ট্রিন্‌জেন্ট না খাইলে বাঁচিব না। আমাকে মাপ করিবেন।” সঙ্গিনীও অমনি বলিলেন, “তাই ত আমারও পেটের অসুখ, তার উপর কাফি খাওয়া ভাল হয় নাই”, আমি আশয় বুঝিয়া গ্লাস তাঁহার হাতে দিয়া খাইতে অনুরোধ করিলাম; তিনি যথারীতি দুই তিন বার ‘অভ্যাস নাই’ প্রভৃতি আপত্তি করিয়া অনায়াসে এক চুমুকে আমার ঢালিত সেই Herculean Bumper এক পো পরিমিত হলাহল পান করিলেন মনে মনে কহিলাম ‘আমি কোথায়’!!!

তৎপর হৃদয় প্রসন্ন হইলে শুনিতে পাইলাম, তাঁহার পরমাত্মীয় • • • • • • যিনি কোন উচ্চ উদ্দেশ্যে আপাব বিলাত গিয়াছেন, তিনিই ইঁহাকে হলাহল পানের প্রথম শিক্ষা প্রদান করেন। আর ইহাও শুনিলাম, তাঁহার অনেক স্বজাতীয়া বন্ধুও এই নির্দ্দোষ পানানন্দে দীক্ষিতা। আজি কালি টইলেটে কিছু বেশী ল্যাবেণ্ডার ও ইউডিকোলোনের ব্যবহার হয়!

• • • • •

প্রাতঃকাল হইল গাড়ি আসিয়া পদ্মা তটে গোয়ালন্দে থামিল। আমরা নামিলাম। পথে আমার সে পূর্ব্ব পরিচিত সাহেবের সহিত দেখা হইল, তিনি মালামাল গুছাইয়া লইতে ব্যস্ত তথাপি একটু হাসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘আমি দেখিতেছি, আডামের ন্যায় তুমিও শূন্য গাড়িতে আত্মশরীর হইতে একটি ইব্‌ সৃজন করিয়া লইয়াছ, থাক বন্ধু! আমিও ইন্‌ফরনাল সার্পেণ্ট রূপে তোমার ইডেনে আসিতেছি।”

সাহেবের এহেন খোটা রসিকতায় আমি কিছু বিরক্ত হইলাম। কেননা, সাহেব কদাপি স্বদেশীয় একজন ভদ্র মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই সম্মুখে এরূপ পরিহাস করিতে সাহস পারিতেন না কিন্তু সঙ্গিনীকে এই কথা শুনিয়া ভাব-মুগ্ধার ন্যায় সাহেবের দিকে বিড়াল লালসায় দৃষ্টি করিতে দেখিলাম। ইহাতে আরো বিস্মিত হইলাম।

ইতি মধ্যে আমরা ষ্টিমারে আসিয়া উঠিলাম; ষ্টিমারে আসিয়া সঙ্গিনী আমাকে বলিলেন, “সাহেবটি কে?—বড় ভদ্র লোক, উনিও কি ষ্টিমারে যাইবেন?”

• • • • • •

ষ্টিমার যাত্রার কাহিনী “ধূম্রযান—অধ্যায়ে” বর্ণিত হইবে।

হোলকার মলহর রাওর রাজ্য।

মালব প্রদেশ অর্থাৎ মধ্যভারতে হোলকার রাজ্য অবস্থিত। ইন্দোর নগর এই রাজ্যের রাজধানী। এক্ষণে ইন্দোর নগরের নাম হইতে প্রায় রাজ্যের নাম ইন্দোর রাজ্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে এই রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল; কিন্তু অনেক বার ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ায় মলহর রাও হোলকারের বংশধরগণ ঐ রাজ্যের অনেকাংশ হারাইয়াছেন। এখন এই রাজ্যের পরিমাণ ৮,০৭৫ বর্গ মাইল; লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ। হোলকার রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত—একলক্ত নহে। তবে ১৮৬১ খৃঃঅব্দ অবধি সমস্ত রাজত্ব এক কাট্টা করিবার জন্য হোলকারের বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছে এবং সিন্ধিয়ার সহিত কতকগুলি স্থানের পরিবর্ত্তন করাতে এখন অনেকাংশে ঐ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

চম্বা ও নর্ম্মদা—এই রাজ্যের প্রধান নদী। ভূমি স্থানে স্থানে পর্ব্বতময় এবং জঙ্গলপূর্ণ হইলেও অত্যন্ত উর্ব্বরা। এই রাজ্যে গোধুম, চাউল, নানা প্রকার দাইল, ইক্ষু, কার্পাস, তামাক ও অহিফেণ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; কিন্তু অহিফেণ চাষেরই কিছু বাহুল্য। ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক বন্য জন্তু ও বিষাক্ত সর্প ও এখানে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যে নীরা নামে একটী নদী আছে। ঐ নদীর কুলে হোল বা হল নামে গ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রামে এক ঘর ধাঙ্গড় বা মেষ পালক বাস করিত। ১৬৯৩ খৃঃঅব্দে সেই মেষপালকের এক পুত্রসন্তান হয়। পুত্র বড় হইলে পিতা তাহাকে গোপালনের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সেই বালক প্রত্যহই মেষ চরাইতে যায়। কিন্তু সে কাজ তাহার ভাল লাগে না, সে সর্ব্বদা অন্যান্য রাখালদের সঙ্গে কলহ বিবাদ ও কুস্তি করে। এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল।

এক দিবস এই রাখাল মেষ চরাইতেছে,—দেখিল এক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বীর নিজ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বীর সাজে সাজিয়া যুদ্ধার্থ গমন করিতেছেন। দেখিয়া সেই মেষ পালকের বীর-হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল—তাহারও সেইরূপ বীরসাজে সাজিয়া যুদ্ধে যাইতে সাধ হইল। ঐ মেষপালকের নাম মলহররাও—হোলকার রাজবংশের আদিপুরুষ। তাঁহার

পিতা মলহর রাও নাম রাখিয়াছিলেন কিম্বা তিনি ঐ নাম গ্রহণ করিয়া প্রথম সেই মহারাষ্ট্রীয় সম্ভ্রান্ত বীর পুরুষের সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

যাহা হউক সেই রাখালের আর মেষ চরাণ ভাল লাগিল না। অল্পকাল পরেই তিনি এই নীচবৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কোন মহারাষ্ট্রীয় রাজার সৈন্য বিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় তিনি স্বল্পকাল মধ্যে নিজ প্রতিভা ও যুদ্ধ নৈপুণ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরিশেষে ১৭২৪ খৃশব্দে একত্রিশ বৎসর বয়সে সুপ্রসিদ্ধ পেশোয়ার ৫০০ অশ্বসেনার সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। তৎপরেই তিনি দ্রুতপদে উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে যুদ্ধে গমন করেন, জয়শ্রী সেই খানেই তাঁহাকে সহাস্য বদনে সাদরে আলিঙ্গন করে। তাঁহার দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সমর-দক্ষতা ও মন্ত্রণাচাতুর্য্য দর্শনে বিখ্যাত বীরপুরুষগণও চমৎকৃত হইলেন। মলহর রাও এখন আর সেই রাখাল নন। পেশোয়া তাঁহাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করেন না। পেশোয়া দেখিলেন সেই বীরপুরুষের পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ধনসম্পত্তির আবশ্যক। তিনি চারি বৎসর পরেই প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিস্তর ভূমি ও অর্থদান করিয়া রাজশ্রীতে বিভূষিত করিলেন।

১৭৩২ খৃঅব্দে মলহর রাও পেশোয়ার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মোগল সম্রাটের দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধিকে তুমুল সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তিকলাপে মুকুট মণ্ডিত করেন। পেশোয়া তাঁহার এই বীরত্ব ও পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়া ইন্দোর নগর ও অধিকৃত দেশের অধিকাংশ মলহর রাওকে তাঁহার সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করিলেন। এই সমস্ত বিষয় ভাবী একটি প্রতাপ শালী স্বাধীন রাজ্যের ভিত্তিমূল। মলহর রাও সেই ভিত্তির উপর এই বিখ্যাত হোলকার রাজ্য সংস্থাপন করেন।

১৭৩৫ খৃঅব্দে মলহর রাও নর্ম্মদা নদীর উত্তরস্থিত প্রদেশ সমূহের মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সম্প্রদায়ের সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তী দ্বাদশ বৎসর তাঁহার জীবন ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে কাটিয়া যায়। একবার মোগলদিগের সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন; কখন বা বাসিন হইতে পর্ত্তগীজদিগকে বাহুবলে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেছেন; আবার বা রোহিলা-

দিগের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত অযোধ্যার নবাব উজীর সফদরজঙ্গকে সাহায্য করিতে যাইতেছেন। সর্ব্বদাই ব্যাপৃত—বিশ্রাম বিরাম কিছুমাত্র নাই। ভারত কেন না চমকিত ও বিস্মিত হইবে! এই সময়ে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও প্রতাপ ক্রমশ যার পর নাই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—এখন তিনি সম্পদের, যশের, গৌরবের,—অতি উচ্চ শিখরে আরোহিত সুতরাং অল্প কাল মধ্যেই যে মলহর রাও ভারতবর্ষের এক জন প্রধান ও প্রবল প্রতাপশালী রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি? সকলেই যে তাঁহাকে ভয় করিবে—অনেকেই যে তাহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে, তাই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সেই রাখাল পুত্র—নিকৃষ্ট রাখাল এখন প্রবল প্রতাপশালী মহারাজা মলহর রাও হোলকার! এখন তাহার নামে বড় বড় মহারাজাদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! এখন তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারতবর্ষ কম্পিত! তাঁহার পিতা মাতা জীবিত ছিলেন কি না, ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। মনে করুন জীবিত ছিলেন এবং মহারাজা মলহর রাও হোলকারও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই, তবে আজ তাহাদের কি আনন্দ, কি পরম সৌভাগ্য! কি শুভক্ষণেই সেই জননী এই পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, আর কি শুভক্ষণেই এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল! আজ সেই মেষপালক প্রায় দুই কোটী লোকের অধিপতি! মলহর রাও পূর্ব্বাবধি হোলকার উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বা হোলকার নামে বিখ্যাত ছিলেন কি না তাহার বিষয় জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। ইন্দোর নগরে স্বরাজ্য সংস্থাপন করিয়া তিনি যে মহারাজা হোলকার এই উপাধি গ্রহণ করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হোলকার—অর্থাৎ "হোল," তাঁহার জন্মভূমি, "কার", নিবাসী সুতরাং মলহর রাও হোলকার, অর্থাৎ "হোল" গ্রাম নিবাসী—এই অর্থ বুঝায়। এতদ্দারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জন্মভূমির উপর হোলকারের ঐকান্তিক অনুরাগ ও ভক্তি ছিল। তিনি সৌভাগ্য শৈলের উন্নততম শিখরে আরোহণ করিয়াও সেই বাল্যলীলা ভূমি—সেই গোচারণের মাঠ—হোলগ্রাম বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণও বরাবর সেই অবধি "হোলকার" উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

১৭৬১ খৃ অব্দে পানিপথের যুদ্ধে মলহর রাও ও সিন্ধিয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই জনে এক এক সম্প্রদায়ের সেনাপতি

পদ গ্রহণ করেন। কথিত আছে, মলহর রাও এই সময়ে স্বীয় স্বাভাবিক সাহস বা বলবীর্য্য বা যুদ্ধকৌশল কিছুই দেখাইতে সমর্থ হন নাই, বরং স্বীয় সৈন্যদল লইয়া কাপুরুষের ন্যায় পশ্চাৎ পূর্ব্বেই পলায়ন করেন। এরূপ করিবার অবশ্যই কোন গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। কেহ কেহ বলেন তিনি পূর্ব্বেই যুদ্ধের পরিণাম ফল বুঝিতে পারিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি অতি চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন, ভাবিলেন পরাজয় হইলে তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং সময় থাকিতে সাবধান হওয়া আবশ্যক, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তিনি পলায়ন করেন। যুদ্ধের পর তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শাসন প্রণালীর সুশৃঙ্খলা স্থাপনে মনো-নিবেশ করেন। রাজ্যভিত্তি দৃঢ়মূল করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। কিছুকাল শান্তিভোগ করিয়া প্রায় ১০০০০০০ টাকা রাজস্বের একটী রাজ্য রাখিয়া মলহর রাও ১৭৬৫ খৃঅব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পৌত্র মালী রাও রাজা হইলেন বটে, কিন্তু অধিক কাল রাজ্য ভোগ করিতে পান নাই। তিনি বাতুল হইয়া অল্প কাল মধ্যেই ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বীরাঙ্গনা জননী প্রাতঃস্মরণীয়া সুপ্রসিদ্ধ অহল্যাবাই স্বহস্তে রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রধান সেনাপতি তুকাজি রায়ের সঙ্গে সুমন্ত্রণা পূর্ব্বক ত্রিশ বৎসর যার পর নাই সুনিয়মে প্রজাপালন ও রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৭৯৫ খৃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, সুদক্ষ সেনাপতি ও মন্ত্রী তুকাজি রাও ও অচিরে তাহার পশ্চাদগামী হন; এই দুইজনের মৃত্যুতে এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৃহ বিবাদে হোলকার বংশের প্রতাপের অনেক হ্রাস হইয়া আসে

এই সময়ে তুকাজি রাওয়ের জারজ পুত্র যশোবন্ত রাও হোলকার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি দেখিয়া শুনিয়া কতকগুলি ইউরোপীয়কে আপনার সৈন্য দলের শিক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। ১৮০২ খৃ অব্দে সিন্ধিয়া ও পেশোয়া উভয়ে মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিলে তিনি উভয়কেই তুমুল সংগ্রামে সম্পূর্ণ পরাজয় করিয়া পুনা নগর অধিকার করেন। বাসিনে ইংরাজের সহিত পেশোয়ার সন্ধিতে যশোবন্ত রাও পেশোয়াকে পুনানগর প্রত্যর্পণ করেন।

১৮০৩ খৃঅব্দের মহারাষ্ট্রীয় সমরে যশোবন্ত রাও হোলকার কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। তিনি নিবিষ্টচিত্তে যুদ্ধের ফলাফল ও পরিণাম

প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ ছিল যে সিন্ধিয়ার উপর দিয়া তিনি আপনার কোন অভিসন্ধি পূর্ণ করিয়া লইবেন। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। সিন্ধিয়া ইংরাজগবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি করিলেন। তখন যশোবন্ত রাও ইংরাজের সহিত সৌহৃদ্যতা সংস্থাপনের জন্য নানা অসম্ভব প্রস্তাব করেন, ইংরাজ তাহা গ্রাহ্য করেন না। হোলকারের কুবুদ্ধি ঘটিল; তিনি ইংরাজের সহিত বিবাদের সূত্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধও সত্বর বাধিল। হোলকার সগর্ব্বে একা——অন্য কোন রাজার সাহায্য অপেক্ষা না করিয়াই মহা বিক্রমশালী বৃটীশ কেশরীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম প্রথম জয়লাভও করিয়াছিলেন। কর্ণেল মনসন পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। হোলকার জয়োৎফুল্ল হইয়া ইংরাজ অধিকারে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন, তিনি পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া পরিশেষে পঞ্জাবাভিমুখে পলায়ন করিলেন। লর্ড লেক অসংখ্য সৈন্য লইয়া দ্রুতবেগে অর্ণব প্রবাহের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া যশোবন্ত রাও ১৮০৫ খৃঅব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ডলেকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সন্ধি হইল——ইংরাজ এই যুদ্ধে হোলকারের যে সমস্ত স্থান জয় করিয়া লইয়া ছিলেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন না। অল্পকাল পরেই ঐ মনের দুঃখে যশোবন্ত রাও উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং ১৮১১ খৃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৎকালে তাঁহার পুত্র মলহর রাও নাবালগ। তুলসী বাই নাম্নী এক কামিনীকে যশোবন্ত রাও রাজ্যশাসনের ভার দিয়া যান। ক্রমে রাজ্যমধ্যে মহা গোল মাল উপস্থিত হইল; পিণ্ডারী দস্যুগণ যার পর নাই উপদ্রব আরম্ভ করিল। তুলসী বাই ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন——লেখা লেখি চলিতেছে, এমন সময় পেশোয়ার সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিল। হোলকারের কর্ম্মচারিগণ সুযোগ পাইল, ভাবিল আর কি? ইংরাজদের আর সাহায্য প্রয়োজন নাই; সুতরাং তাঁহাদের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং তুলসী বায়ের প্রাণ সংহার করিল। যুদ্ধ বাধিল, হোলকারের সৈন্যগণের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল; হোলকার সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮১৮ খৃঅব্দে জানুয়ারী মাসে মন্দিসুর নামক স্থানে এই সন্ধি হয়। হোলকারের রাজ্যের অধিকাংশ ইংরাজ অধিকার করিয়া লইলেন এবং হোলকারের প্রতাপ সূর্য্য এইখানেই প্রায় অস্তগমন করিল। তিনি নাম মাত্র স্বাধীন রাজা হইয়া

রহিলেন। এখনও হোলকার সেই সন্ধিসূত্রে বদ্ধ। কিন্তু হোলকার বংশের সেই তেজ সেই দর্প ও অভিমান এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র কমে নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে হোলকারের বিশেষ সম্ভ্রম করিয়া চলিতে হয়।

২৮ বৎসর বয়সে ১৮৩৩ খৃঅব্দে দ্বিতীয় মলহর রাও হোলকারের মৃত্যু হয়। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। বিধবা রাণী মার্ত্তণ্ড রাওকে পোষ্য পুত্র লইলেন, কিন্তু তাহা সর্ব্বের প্রীতিপ্রদ হইল না। অল্পকাল পরেই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হরি রাও রাজা হইলেন। হরি রাও ইতি পূর্ব্বে রাজ-বিদ্রোহী হওয়ায় ১৮১৯ খৃ অব্দ অবধি কারারুদ্ধ ছিলেন। যদিও তিনি রাজা হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল কিন্তু অধিক কাল কারাবাস জনিত তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট ও মানসিক বৃত্তি সকল এক কালীন স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার রাজত্ব কালে প্রজাবর্গ সুখসচ্ছন্দতা ভোগের অধিকারী হইতে পারে নাই। ১৮৪০ খৃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনিও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পোষ্যপুত্র হোলকার সিংহাসন পাইলেন সত্য, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই অবিবাহিতাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন, বর্ত্তমান মহারাজা তুকাজিরাও হোলকার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত। ইনি ভাস হোলকারের দ্বিতীয় পুত্র, তৎকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর মাত্র। ১৮৫২ খৃ অব্দে ইনি সাবালগ হইয়া স্বহস্তে রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করেন।

১৮৫৭ খৃঅব্দে সিপাহী বিদ্রোহে তাহার কয়েক দল সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া ইন্দোরস্থ ইংরাজ দূতকে আক্রমণ করে। সেই দূত আর কেহই নহেন সুপ্রসিদ্ধ ডুরাণ্ড সাহেব। এই মহাপুরুষ হোলকারের সর্ব্বনাশের মূল। তিনি ইংরাজজাতির বীরত্ব, সাহস ও আত্মত্যাগ বিস্মৃত হইয়া নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় সপরিবারে পলায়ন করেন। মহারাজা হোলকার স্বয়ং বরাবর ইংরাজগবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ সপক্ষতাচরণ করেন, এবং বিদ্রোহদমনের জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তবে ভাগ্য যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, তাহার সুখের সম্ভাবনা কোথা? ডিউরাণ্ড সাহেব কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন না করিয়া হোলকারের সহিত পরামর্শ করিয়া চেষ্টা করিলে অনায়াসে বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সাহস, সে বুদ্ধি তাঁহার হইল না। পলায়ন করিয়াছেন, বড় লজ্জার কথা, গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ বীর পুরুষগণ কি বলিবেন? পরিশেষে তাঁহার এই চিন্তা

এই ভয় হইল। তিনি নিজের মান বজায় রাখিবার জন্য, সমস্ত দোষ নিরপরাধী হোলকারের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলেন। অথবা হোলকার বিপক্ষতা করিলে তাঁহার যে পরিত্রাণ পাইবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না, তাহা একবারও ভাবিলেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হাড়ে হাড়ে হোলকারের উপর চটিয়া গেলেন; সে রাগের অদ্যাপি শান্তি হয় নাই। হোলকার কত লিখিলেন, কত কাঁদিলেন, কত বলিলেন, তাঁহার কি দোষ গবর্ণমেণ্ট দেখাইয়া দিউন। গবর্ণমেণ্ট সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

হোলকারের সম্মানার্থ ১৯টি তোপ হইয়া থাকে। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ ৫২৫০ পদাতি, ৩,৭০ অশ্ব, ৪০ জন কামান্দার এবং ২৪টি কামান আছে। কিন্তু এসমস্ত তোপকরণ নাম মাত্র—রাজ পরিচ্ছদ বিশেষ। সৈন্যগণ সুশিক্ষিত অথবা কামানগুলি কার্য্যোপযোগী নহে।

হোলকারের বর্ত্তমান বার্ষিক আয় ১৩,০০০ টাকা এবং ব্যয় ৪১,৬৬,০০০। কিন্তু এই তালিকাটি নির্ভুল নহে। এটি ইংরাজগবর্ণমেণ্টের জানিত আয়—এতদ্ব্যতীত হোলকারের অন্য প্রকার আয় আছে। সর্ব্বশুদ্ধ হোলকারের রাজস্ব ৮০।৯০ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে।

রাজকুমার ও রাজবংশীয় দিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইন্দোর নগরে একটি বিদ্যালয় আছে, যাহাতে প্রায় ২০০ ছাত্র অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি ইংরাজী ও মহারাষ্ট্রী বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে।

ইন্দোর নগর ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। ১৭৭০ খৃঅব্দে এই নগর রাণী অহল্যা বাই কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। প্রাচীন রাজধানীর নাম কম্পাইল, ঐ নগর এক্ষণে একটি সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। ইন্দোর নগরের লোক সংখ্যা প্রায় ১৫।১৬ হাজার। ১৮১৮ খৃঅব্দে হোলকার স্বীয় রাজধানী এই নগরে স্থাপিত করেন। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে, তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা অতি প্রশস্ত, সুন্দর ও বৃহৎ। এই নগরে লালবাগ নামে একটি পরম রমণীয় উদ্যান, একটি হাঁসপাতাল, একটী বাজার ও সূতার কল আছে। রেলওয়ে ষ্টেসন রাজবাটী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

মহামায়া।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জানাজানি।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সর্ব্বানন্দ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, অমূল্য তাঁহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে অবস্থিত, এমত সময় একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় অমূল্য কেমন আছে?"

সর্ব্বানন্দ। আছে ভাল।

অমূল্যর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "অমূল্য ইনিই তোমার রক্ষাকর্ত্তা।"

অমূল্য দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন; "আমার মহা—"

অমূল্যর আর কথা ফুরিল না; তিনি সংজ্ঞা শূন্য হইয়া লোকটির পদতলে নিপতিত হইলেন। লোকটি নিত্যানন্দ স্বামী।

সর্ব্বানন্দ ও স্বামী উভয়ে অমূল্যকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন, তাঁহার বদন মণ্ডলে জল-সিঞ্চন করিতে লাগিলেন; অনেকক্ষণ পরে চক্ষু চাহিয়া অমূল্য সজল চক্ষে বলিলেন,

"মহামায়া কেমন আছেন?"

স্বামী। আপাতত ভাল।

অমূল্য। আপাতত!

স্বামী। মধ্যে তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল।

অমূল্য একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সর্ব্বানন্দ এ সকল কথোপকথনের কিছুই ভাব গ্রহণ করিতে পারিতে ছিলেন না। চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন; কেবল ভাবিতে ছিলেন "আমার মহামায়া"—মহামায়া কে?

অমূল্য সর্ব্বানন্দের দিকে ফিরিয়া সজলচক্ষে বলিলেন "বাবা ইনিই আমায় নিশ্চয় কারামুক্ত করিয়াছিলেন।"

স্বামী কহিলেন "না অমূল্য ইহা তোমার ভ্রম, আমি সামান্য ব্যক্তি তোমায় কারামুক্ত কি প্রকারে করিব? ঈশ্বর করিয়াছিলেন!

অমূল্য। আপনি এবং মহামায়া উপলক্ষ।

সর্ব্বানন্দ কতক কতক বুঝিতে পারিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "অমূল্য তুমি কি বলিতেছ, প্রভাবতী শুনিলে কি বলিবে ?"

অমূল্য। প্রভাবতী একথা অনেক দিন হইতে জানে।

সর্ব্বানন্দ অবাক্ হইলেন, বলিলেন "তবে এতদিন আমায় এ কথা বল নাই কেন ?"

অমূল্য। প্রভা নিষেধ করিয়াছিল, আপনি হতাশ হইবেন বলিয়া। কেননা আপনার আশা ভরসা বিষয় বিভব,—সমস্তই সেই বিবাহের উপর নির্ভর করিতেছিল।

এমত সময় প্রভাবতী সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে গললগ্নবস্ত্রে প্রণাম করিয়া কহিলেন "দেব! ইঁহার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন, এরূপ পবিত্র হৃদয় সংসারে দুর্লভ, আর মহামায়া সর্ব্বাংশে ইঁহার উপযুক্তা।" পরে সর্ব্বানন্দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "পিতা! এ বিবাহে আপনি আপত্তি করিবেন না। যে টাকা আপনি পাইতেন, সেই টাকা আমি মহামায়াকে যৌতুক দিব।"

স্বামীর চক্ষে জল আসিল, সর্ব্বানন্দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "প্রভাকে কিছু দিতে হইবে না, মহামায়ার পিতার মৃত্যুকালে তিনি আমার নিকট তিন লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন—আমি সেই টাকা অমূল্যকে দিব।"

অমূল্য। মহামায়া আপনার কন্যা নন।

স্বামী, "না, কিন্তু এ কথা যেন মহামায়া শুনেন না।" বলিয়া তাঁহার পিতৃকুলের পরিচয় দিলেন, তিনি এ সমস্ত তত্ত্ব প্রয়াগে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বানন্দের মন হাসিল, প্রভাবতী সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইলেন। অমূল্যর বহু দিনের আশার সঞ্চার হইল, তাঁহার শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শুভ বিবাহ।

শুভ দিনে শুভক্ষণে অমূল্যরতনের মহামায়ার সহিত বিবাহ হইল। অমূল্যর বিষাদ-মাখা বদন কমলে এত দিন পরে মধুর হাসি দেখা দিল। এ বিবাহে প্রভাবতীর আর আনন্দের পরিসীমা নাই,—কিন্তু দুর্গাবতীর হৃদয়ে অতুল আনন্দ উপজিল না; যদিও সন্তানের সুখ দেখিয়া দুর্গাবতী

সুখী হইলেন বটে, কিন্তু প্রভাবতীর অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় অবিরত ব্যথিত হইতে লাগিল।

দুর্গাবতী প্রভাবতীর বিবাহের কথা আর উত্থাপন করিতে পারিলেন না। সর্ব্বানন্দ অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু প্রভাবতী কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

সর্ব্বানন্দ পুত্র ও পুত্র-বধূকে লইয়া বাঁকিপুরে যাইবার মনস্থ করিলেন, নিত্যানন্দ স্বামীকেও তাঁহাদের সহিত যাইতে অনেক অনুরোধ করিলেন,—কিন্তু তিনি স্বীকৃত হইলেন না। তবে বলিলেন যে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে। মহামায়া স্বামীকে অনেক বলিলেন, অনেক জেদ করিতে লাগিলেন। স্বামী অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকেও নিবস্ত করিলেন।

সর্ব্বানন্দের সপরিবারে বাঁকিপুর যাইবার পূর্ব্বদিন স্বামী তাঁহার গৃহে সমাগত। সর্ব্বানন্দ—স্বামীকে প্রভাবতীর নিকট তাঁহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামী প্রভাবতীকে বলিলেন "মা প্রভা তোমার বিবাহ করিতে অসম্মতি কেন ?"

প্রভাবতী স্থির গম্ভীর ভাবে কহিলেন "পিতা! ভদ্রকুলনারীর বিবাহ কয়বার হয় ?"

স্বামী। তোমার কি বিবাহ হইয়াছে ?

প্রভা। আমি জানি মনে মনে আত্ম-সমর্পণের নামই বিবাহ।

স্বামী স্নেহভরে প্রভাবতীর কপাল চুম্বন করিয়া কহিলেন "প্রভা, তুমিই ভারতের যথার্থ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা সতী! এ জগতে তোমার তুলনা নাই।"

প্রভাবতী নিরুত্তর।

স্বামী আবার বলিতে লাগিলেন "প্রভা, এ সংসারে, ইহ জগতে একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর আমার কেহই নাই— আমি বৈরাগী ; মহামায়া সংসারী হইল, বড় সুখের কথা, মহামায়ার সুখ দেখিয়া যে আমি মহাসুখী হইয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমি আরও সুখী হইয়াছি, প্রভা, আমি তোমার পিতৃ সদৃশ, আমার মহামায়াও যে, তুমিও সে ;—প্রভাবতী তুমি আমার আশ্রমে থাকিবে ?"

প্রভা। থাকিব।

স্বামী প্রভাবতীর কথা সর্ব্বানন্দকে কহিলেন। সর্ব্বানন্দ অগত্যা

তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, যাইবার সময় সর্ব্বানন্দ প্রভাবতীকে কহিলেন, "প্রভা, তোমার টাকা গুলি লও।"

প্রভা। পঞ্চাশ হাজারও মহামায়ার।

সর্ব্বা। বাকি।

প্রভা। আপনার নিকট থাকুক। মহামায়ার সন্তানের পুত্র-বধূকে আমার হইয়া যৌতুক দিবেন।

সর্ব্বানন্দ অবাক হইলেন, প্রভাবতীর এমন ভাব দেখিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না, পার্শ্বে স্বামী দণ্ডায়মান ছিলেন! তিনি মনে মনে প্রভাবতীকে শত ধন্যবাদ দিলেন।

বিদায় কালে দুর্গাবতী প্রভাবতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আকুল হইল। এমত সময়ে স্বামী আসিয়া বলিলেন "আপনারা তৎপর যাত্রা করুন, সময় বহির্ভূত হয়।" অগত্যা এই হৃদয় বিদারী দৃশ্যের শেষ হইল, কিন্তু দুর্গাবতীর হৃদয়গত যাতনার শেষ হইল না; বোধ হয় ইহ জীবনে কখন হইবেও না। দুর্গাবতী প্রভাকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন, সে স্নেহ অকপট অকৃত্রিম।

স্বামী প্রভাবতীকে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন, অতি যত্নে অতি সাবধানে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, স্বামীর উপদেশে তাঁহার মন সমধিক উন্নতি লাভ করিল, প্রভাবতী বিচিত্র বিশ্বানন্দে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন ও যোগ-শিক্ষা-পরায়ণা হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দ স্বামীর নিত্যধাম যাত্রা।

সর্ব্বানন্দের আশা ফলবতী হইল, তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার হইল, অমূল্য রতন ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন, দুর্গাবতী প্রাণাধিক পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সুখী হইলেন। সকলের সুখের মাত্রা পূর্ণ হইল, কিন্তু দুর্গাবতীর হইল না, প্রভাবতীর বিরহ, প্রভাবতীর নির্ম্মল নিরাশ হৃদয়ের বিষণ্ণভাব তাঁহার হৃদয়ে চিরঅঙ্কিত রহিল।

এই ঘটনার দশবৎসর পরে একদিন সন্ধ্যার সময় সহসা সর্ব্বানন্দ ভবনে নিত্যানন্দ স্বামী ও প্রভাবতী আসিয়া উপস্থিত। এই সময়ে

মহামায়ার তিনটি সন্তান; বড়টি ৯ বৎসরের, তাহার ছোটটির বয়স ৬ বৎসর, সর্ব্ব কনিষ্ঠের ২ বৎসর মাত্র। প্রভাবতী চক্ষের জলে ভাসিয়া পুত্রগুলিকে একে একে ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন—সে ক্রন্দন হিংসার বা দুঃখের নয়—আনন্দের। স্বামীও সকল গুলির মুখ চুম্বন করিলেন। দুর্গাবতী প্রভাবতীকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয় স্নেহরসে আর্দ্র হইল। নিত্যানন্দ স্বামীর আর সে দেহ নাই, সে লাবণ্য নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই—তাঁহার সেই তেজোময় দেহের সর্ব্বত্র যেন নির্জ্জীবতা বিরাজমান। পর দিবস স্বামী একখানি সুন্দর খট্টোপরি বিচিত্র শয্যায়, সুন্দর উপাধানে মস্তক রক্ষিত করিয়া শায়িত, এমন সময়ে তথায় তাঁহার মহামায়া পুত্রগণ সহ উপস্থিত হইলেন। মহামায়া নিত্যানন্দ স্বামীর বদন প্রতি স্থির-দৃষ্টি হইয়া বলিলেন "এখন কেমন আছেন ?"

স্বামী। বেশ আছি। তোমাদের দেখিলে কবে মন্দ থাকি!

মহা! তবে আমাকে কেন দেখিতে আসেন না?

স্বামী। তুমি সুখে আছ জানি বলিয়া, সতত আসিয়া বিরক্ত করিতে চাহি না।

মহা। আপনি আসিলে বিরক্ত হব?

স্বামী। হওয়া কি অসম্ভব!

মহামায়া সজল নেত্রে বলিলেন "আপনি আমার জন্য যা করেছেন, আপনার বাপেও ততদূর করেন না, করতেও পারেন না,- আপনি তিন লক্ষ টাকা——"

স্বামী। সে ত তোমার পিতৃধন।

মহা। আমায় কেন ওকথা বলেন, আমি ত সকলি জানি। আমার পিতার ত কিছুই ছিল না।

স্বামী। তোমায় এ কথা কে বল্লে।

মহা। রহমত পুরার কে এ কথা না জানে, আমার মা——

স্বামী সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "আর সে কথায় কাজ নাই—আর যদি তাহাই হয়, তাহাতে কি হইয়াছে—টাকাটা কি বড় জিনিষ!"

মহা। আর আমি আপনাকে যেতে দিব না।

স্বামী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আর যাবো না।"

মহা। আর রহমত পুরা যাবেন না।

স্বামী। না—তবে আর একটি স্থানে যাব।

মহা। কোথায়?

স্বামী। নিত্যধামে।

মহামায়া সবিস্ময়ে কহিলেন "সে কি?"

স্বামী মৃদু হাসিয়া কহিলেন 'মহামায়া, তোমার স্বামীকে ডাক, আমার সময় উপস্থিত।"

মহা। সে কি? সময় উপস্থিত কি?

স্বামী। আমার মৃত্যুকাল নিকট।

মহামায়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এমত সময় কক্ষ মধ্যে অমূল্যরতন প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বালকগণ তখন সবিস্ময়ে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

স্বামী অমূল্যরতনকে বলিলেন—"অমূল্য বাবা! প্রভাবতী আর তোমার বাপ মাকে ডাকিয়া আন।"

অমূল্য এ কথার কোন মর্ম্ম বুঝিলেন না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। স্বামী সর্ব্বানন্দকে বলিলেন "আমার ব্যাগে তিন লক্ষ টাকার নোট পাইবেন, সেগুলি আমার মহামায়ার ঐ তিনটি ননীর পুতলী-দিগের জন্য।" প্রভাবতীকে বলিলেন 'মা প্রভা, তোমায় বলিবার কিছু নাই—তোমাকে শিক্ষা বা উপদেশ দিবার লোক সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ নাই—আমার শিয়রদেশের বালিসের নীচে এক লক্ষ টাকার নোট আছে, সেগুলি তোমার ইচ্ছামত দরিদ্রদিগকে দান করিও।"

স্বামী এই কথা বলিয়া অমূল্যর সন্তানদিগকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলেই তখন রোদন করিতে ছিলেন, রোদন পরায়ণা মহামায়া সন্তানগুলির হাত ধরিয়া তাঁহার নিকট হইয়া গেলেন। স্বামী সন্তান গুলির মুখচুম্বন করিয়া, তাহাদের মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহামায়াও অমূল্যকে বলিলেন "এস তোমাদের জন্মের মত মুখ চুম্বন করি।"

তাঁহারা উভয়ে নিকটে আসিলেন; স্বামী তাঁহাদের মুখচুম্বন করিলেন। দম্পতি যুগল নতজানু হইলে তিনি তাঁহাদের মস্তকে উভয় হস্ত স্থাপন করিলেন। স্বামীর অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল। তিনি স্থির দৃষ্টিতে প্রথমে অমূল্যের দিকে, পরে আস্তে আস্তে মহামায়ার দিকে চাহিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ গম্ভীর স্বরে, অনুমতির ভঙ্গিতে বলিলেন;

"মহামায়া আসন দাও।"

মহামায়ার সহিত অমূল্য রতনের প্রথম সাক্ষাতের কথা, অমূল্য এবং মহামায়ার—উভয়েরই—মনে পড়িল। অমূল্য মহামায়ার দিকে চাহিলেন; মহামায়া এতকাল পরে আবার পূর্ব্বের ন্যায় ব্রীড়াবনতমুখী হইলেন। ধীরে ধীরে নিত্যানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার বিশাল বিস্ফারিত লোচনদ্বয় স্থির হইয়া আসিল, তাঁহার সেই মায়াময় পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। স্বামীর ভবলীলা সাঙ্গ হইল। স্বর্গের অপ্সরাগণ সেই পবিত্র প্রেতাত্মাকে প্রেমভরে আবাহন করিল, স্বর্গে স্বর্গীয় লোকের সমাগম ভণিত দুন্দুভিধ্বনি হইল। জড়জগৎ একটি অমূল্য রত্ন হারাইল। প্রভাবতী সেই মহাপুরুষের প্রাণশূন্য কায়ায় পাদমূলে উপবেশন করিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেই তপস্ত-নিধান জগত-পাতার অচিন্তনীয় চিন্ময় মূর্ত্তির ধ্যান পরায়ণা হইলেন। অপরদিকে সর্ব্বানন্দ হইতে মহামায়ার শিশুসন্তানটি পর্য্যন্ত রোদন করিতে লাগিল।

পরিশিষ্ট

প্রভাবতীকে সান্ত্বনা করিতে হইল না, প্রভাবতী আর সকলকে অশেষ প্রকার সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু মহামায়া বড় দারুণ শোক পাইলেন।

দুর্গাবতী প্রভাকে বড়ই যত্ন করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে একদণ্ড না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রভাবতী মধ্যে মধ্যে বলেন, মা আমার জন্য আপনি অত করিবেন না দুর্গাবতী এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন বটে কিন্তু ইহার কোন মর্ম্মাবগত হইতে পারিলেন না।

একদিন প্রাতঃকালে সকলে উঠিয়া দেখিল গৃহে প্রভাবতী নাই। প্রভাবতীর কত অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না, দুর্গাবতীর চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিল।

কিন্তু কএক বৎসর পরে অমূল্যরতনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইল। নবোঢ়া বধূ গৃহে সমাগত, সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন মাত্র, এমন সময় একটি যোগিনী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হীরাময় হার ও অঙ্গুরীয়ক দিয়া বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন দুর্গাবতী আহ্লাদ সহকারে "প্রভা, প্রভা,—" বলিয়া তাঁহার নিকট গেলেন। যোগিনী—প্রভাবতী!

দুর্গাবতী প্রভাবতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কতই কাঁদিলেন, বলিলেন

"প্রভা আমায় কি এত কাঁদাতে হয়—আমি মরি ; তার পর তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেও।"

প্রভাবতী তাহার কোন প্রতিউত্তর না দিয়া নীরবে অধোবদন হইয়া রহিলেন। মহামায়া আহ্লাদে প্রভাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "দিদি আর আমি তোমায় ছাড়বো না। তুমি আমাদের ভাল বাস না।"

প্রভা। কেন দিদি।

মহা। তা হলে ফেলে যেতে পার।

প্রভা। আমি যেখানেই থাকি, তোমরা সুখে আছ, এ সংবাদ ত পাই।

মহা। তুমি কেমন থাক, তাত আমরা জানতে পারি না।

প্রভা। সুখে না থাকিলে, তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি।

মহামায়া আর কোন কথা না কহিয়া প্রভাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন।

প্রভাবতী আবার দুইটি দিন তথায় রহিলেন। সকলের সুখের পূর্ণোচ্ছাস হইল,—কিন্তু তাহা দীর্ঘকালের জন্য নহে—প্রভাবতী আবার সহসা নিরুদ্দেশ হইলেন, কোথায় গেলেন সে সংবাদ আর পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে অনেক দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু প্রভাবতীর দর্শন সুখলাভ আর কাহারও ঘটিল না।

মধ্যে মধ্যে প্রভাবতীর কথা উঠিলে, অমূল্য বলিতেন "প্রভাবতী দেবী" সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া সহাস্য গম্ভীর আস্যে উত্তর দিতেন, আমি বলি, প্রভাবতীই প্রকৃত মানবী।

সমাপ্ত।

বঙ্গে ইংরেজাধিকার।

৬।

ইংরেজ পক্ষের যে সকল সৈন্য নবাবের বিরুদ্ধে পলাশীর অভিমুখে যাত্রা করিল, তাহাদের মধ্যে ৯৫০জন ইউরোপীয় পদাতিক (ইহার মধ্যে ২৮০ জন ইউরেশীয় সৈন্য ছিল), ১৮০ জন ইউরোপীয় কামান রক্ষক, ৫০ জন ইংরেজ সৈনিক এবং ২১০০ সিপাহি ছিল। সেনাপতির আদেশে এই ক্ষুদ্র সৈনিক দল ১০টি মাত্র কামান লইয়া ২২শে জুন প্রাতঃকালে কিয়ৎক্ষণ ভাগীরথীর তটভূমি অতিবাহন করিয়া, পরে নদী পার হইতে উদ্যত হইল। বেলা চারিটার সময় সকলে বিনা বাধায় ভাগীরথীর বাম তটে আসিল। এইখানে ক্লাইব মীরজাফরের নিকট হইতে আর একখানি পত্র পাইলেন। এই পত্রে মীরজাফর ক্লাইবকে লিখিয়াছিলেন যে, নবাব কাশীম বাজারের ছয় মাইল দূরে একটি পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন। ইংরেজের সৈন্য স্থলপথে ঘুরিয়া আসিয়া, অনায়াসে এইস্থানে নবাবকে আক্রমণ করিতে পারে। বিশ্বাস ঘাতক মীরজাফরের এই প্রস্তাব ক্লাইবের কাছে সঙ্গত বোধ হইল না। যেহেতু ইহাতে ক্লাইবকে একটি বৃত্তাকার পথ পরিবেষ্টন করিয়া নবাবের অভিমুখে যাইতে হইত। এদিকে নবাব অনায়াসে সোজা পথে আসিয়া ইংরেজ পক্ষের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিতেন। সুতরাং ক্লাইব মীরজাফরকে উত্তর দিলেন যে, তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া পলাশীর অভিমুখে যাত্রা করিবেন। এবং পরদিন ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দাউদপুর নামক স্থানে উপনীত হইবেন। মীরজাফর যদি এই স্থানে তাঁহার সহিত মিলিত না হন, তাহা হইলে তিনি নবাবের সহিত সন্ধিস্থাপনে অগ্রসর হইবেন।

যেস্থানে ক্লাইব মীরজাফরের পত্রবাহক লোককে বিদায় দেন, সে স্থান হইতে পলাশী ১২ মাইল। ২২শে জুন গোধূলি সময়ে ইংরেজ সৈন্য এই বার মাইল পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইল। পথে তাহাদের বিস্তর কষ্ট হইয়াছিল। আট ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়া রাত্রি ১ টার সময় পরিশ্রান্ত সৈনিক দল পলাশীতে উপনীত হইল এবং গ্রাম অতিক্রম করিয়া, অদূরবর্ত্তী আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করিল।

এই আম্রকানন ভাগীরথীর নিকটে অবস্থিত; ইহার দৈর্ঘ ১৬৮০ হাত এবং বিস্তার ৬০০ হাত। বৃক্ষগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত। বৃক্ষ শ্রেণী একটি মৃৎপ্রাচীর ও পরিখায় (পগারে) পরিবেষ্টিত ছিল। ক্লাইব এই সুন্দর আম্রকাননে আপনার পরিশ্রান্ত সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে অদূরে সমর-সঙ্গীত তাঁহার শ্রুতি প্রবিষ্ট হইল। সেই সামরিক গীতি তাঁহার হৃদয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার করিল। তিনি সেই সঙ্গীত শুনিয়াই আপনাদের সন্নিবেশ ভূমি সুব্যবস্থিত করিতে যত্নশীল হইলেন।

নবাব আপনার সৈন্যদল লইয়া ১৯এ জুন মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঐদিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, ইংরেজ সৈন্য কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়াছে। নবাব ক্লাইবের প্রকৃতি জানিতেন। সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, ইংরেজ অবিলম্বে ভাগীরথী পার হইয়া পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এই বিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সহসা পলাশীর দিকে না যাইয়া কাশীম বাজারের ৬ মাইল দূরে একটি পল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মীরজাফর ক্লাইবকে যথা সময়ে এই সংবাদ জানাইতে ক্রটি করেন নাই। যাহা হউক, ২১এ জুন নবাব যখন শুনিতে পাইলেন যে, ইংরেজেরা তখনও কাটোয়ায় অবস্থিতি করিতেছে, তখন তিনি পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে পলাসীতে যাইতে উদ্যত হন এবং অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া আম্রকাননের এক মাইল উত্তরে সৈন্য স্থাপন করেন। ইংরেজদিগের উপস্থিতির বারঘণ্টা পূর্ব্বে নবাব পলাশীতে আসিয়া সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

নবাবের সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল। ৩৫ হাজার পদাতিক যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া নবাবের পুষ্টি সমর্থন করিতেছিল। কিন্তু এই পদাতিক সৈন্য তাদৃশ সুশিক্ষিত ছিল না, এবং ইহাদের অস্ত্র শস্ত্রও তাদৃশ উৎকৃষ্ট ছিল না। নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ১৫ হাজার ছিল। ইহারা সুশিক্ষিত, বলসম্পন্ন ও তেজস্বী অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিল। ইহাদের প্রধান অস্ত্র তরবারি ও বড়শা। কামান-সজ্জা ও কামান পরিচালকগণ অশ্বারোহী সৈন্যদল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ছিল। নবাব ৫৩টি কামান আনিয়াছিলেন। ৪০।৫০ জন ফরাসী একজন ফরাসী সেনাপতির অধীনে ঐসকল কামান পরিচালনা করিতেছিল।

নবাবের সৈন্য যেমন অধিক সংখ্যক ও অধিকতর বলসম্পন্ন, তেমনি তাহারা অধিকতর উৎকৃষ্ট ও সুব্যবস্থিত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। নবাব যে স্থানে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পরিখায় ব্যাপ্ত ছিল। ভাগীরথী এইখানে অর্দ্ধবৃত্তাকারে উত্তর পূর্ব্বদিকে আসিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়াছে। সুতরাং ভাগীরথী প্রবাহের এই উত্তর পূর্ব্বদিক কোণাকৃতি হইয়া উঠিয়াছে। কোণাকৃতিস্থলের নিকটে একটি ছোট গড়ে কামান সকল সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উহার ৬০০ হাত পূর্ব্বে পরিখার সম্মুখ ভাগে একটি পাহাড়ি জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। ঐ গড়ের ১৬০০ হাত দক্ষিণে ইংরেজ সৈন্য যে আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল, তাহারই নিকটে একটি পুষ্করিণী এবং ঐ পুষ্করিণীর ২০০ হাত অন্তর আর একটি বড় পুষ্করিণী ছিল। উভয় পক্ষের সৈন্যের গতিবিধি বুঝিতে হইলে এই বর্ণিত স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

২৩শে জুন প্রাতঃকালে নবাবের সৈন্য আপনাদের পরিখা পরিবেষ্টিত সন্নিবেশ স্থল হইতে যাত্রা করিল। ফরাসীরা চারিটি কামান লইয়া ইংরেজদিগের অতি নিকটে পূর্ব্বোক্ত বড় পুষ্করিণীর পার্শ্বে আসিল। ভাগীরথী ও তাহাদের মধ্যভাগে আর দুইটি কামান একজন ভারতবর্ষীয় সৈনিক পুরুষের অধীনে রক্ষিত হইল। কামান পরিচালক ফরাসীদিগের পশ্চাতে নবাবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্য পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, সাত হাজার পদাতিক, তাঁহার পরম বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদনের অধীনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাঁহারই পার্শ্বে সেনাপতি মোহনলাল ইংরেজের সম্মুখে আপনার বীরত্ব গৌরবের পরিচয় দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের পার্শ্বভাগে নবাবের ৩৮ হাজার সৈন্য অর্দ্ধচক্রাকারে ইংরেজদিগের সম্মুখে রহিল। নবাবের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি রাজা দুর্ল্লভরাম, ইয়ার-লতিফ খাঁ ও মীরজাফরের অধীনে ঐ সকল সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল। দুর্ল্লভরাম, দক্ষিণভাগে, ইয়ারলতিফ মধ্যভাগে এবং মীরজাফর ইংরেজ-দিগের অতি নিকটে বামভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, নবাব সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থানে সৈন্য স্থাপন করিয়া-ছিলেন। ক্লাইব যে পথে অগ্রসর হইয়া, নবাবের শিবির আক্রমণ করিবেন, সেই পথ কামান পরিচালক ফরাসীগণ এবং সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি মীর-মদন ও মোহনলাল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অধিকন্তু ক্লাইবের

একদিকে ভাগীরথী খরবেগে তরঙ্গবাহু আস্ফালন করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছিল, আর দিকে নবাবের বিপুল সৈন্য চক্রাকারে তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইংরেজেরা এইরূপে শত্রু সৈন্যে প্রায় পরিবেষ্টিত ছিলেন। এই সুদৃঢ় বিপুল ব্যূহভেদ করিতে পারেন, তাঁহাদের সেরূপ সৈনিকবল বা ক্ষমতা ছিল না। যদি হতভাগ্য সিরাজের সেনাপতিগণ বিশ্বাসঘাতক না হইত, দুর্নিবার ভোগ লালসা ও আত্ম সুখ কামনা যদি এ সময়ে তাহাদিগকে পবিত্র কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত না করিত, তাহা হইলে ইংরেজ সৈন্য পলাশীর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইয়া যাইত।

আম্রকাননের বহির্ভাগে ভাগীরথীর তটদেশে নবাবের, শীকার করিবার একটি মঞ্চ ছিল। ক্লাইব যখন আম্রকাননে উপস্থিত হইয়া অদূরে সমর সঙ্গীত শুনেন, তখন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া ঐ শীকার মঞ্চ অধিকার করিতে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ পাঠাইয়া দেন। মঞ্চ অধিকৃত হয়। ক্লাইব এখন মঞ্চ হইতে নবাবের সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া, বিস্ময় ও আশঙ্কার তরঙ্গে মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইয়া উঠিলেন। নবাবের বল-বহুলতা, সৈন্য-সন্নিবেশের পারিপাট্য, মীরমদন ও মোহনলালের সেই অদম্য তেজ ও উৎসাহ, সমস্তই ক্লাইবের হৃদয়ে তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত করিল। ক্লাইব এক একবার গভীর আশায় বুক বাঁধিয়া মীরজাফরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, আবার আশঙ্কার সহিত আপনার ক্ষুদ্র দলের প্রতিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, বিস্ময় ও বিরাগে অভিভূত হইতে লাগিলেন। নবাবের সৈন্য যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল, তখন ক্লাইব আর কাল বিলম্ব না করিয়া আপনার ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে আম্রকানন হইতে বাহির হইতে আদেশ দিলেন। সেনাপতির আদেশে সৈন্যগণ আম্রকান হইতে বহির্গত হইল। ক্লাইব তাহাদিগকে আম্রবনের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। সৈন্য শ্রেণীর মধ্যভাগে ইউরোপীয়গণ এবং উভয় পার্শ্বে সিপাহিগণ স্থাপিত হইল। ইউরোপীয় সৈন্যের উভয় পার্শ্বে ব্যূহ ভেদের জন্য কামান সকল প্রস্তুত রহিল।

ইংরেজের ইতিহাসের এই চিরস্মরণীয় দিনে বেলা পূর্ব্বাহ্ণ আটঘটিকার সময় উভয়পক্ষ, উভয় পক্ষের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ফরাসীরা আপনাদের সুদক্ষ সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া প্রথমে একটি

কামান হইতে গোলা চালাইতে লাগিল। ইংরেজ পক্ষ হইতেও গোলা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ইংরেজের গোলা যদিও অব্যর্থ সন্ধানে শত্রুদলে আসিয়া পড়িতে লাগিল, তথাপি ইংরেজ পক্ষের কোনরূপ সুবিধা দেখা গেল না। নবাবের সৈন্য সংখ্যায় অধিক ছিল, সুতরাং তাহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। এদিকে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ক্লাইবের এরূপ ক্ষতি বোধ হইল যে ক্লাইব পশ্চাৎ হটিয়া আসিয়া সৈন্যদিগকে আম্র কাননে আশ্রয় দিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য হইল। ক্লাইব শৃঙ্খলা সহিত, পশ্চাদ্গমন করিয়া, আম্রকাননে সৈন্য স্থাপন করিলেন। ইহাতে নবাবের সৈন্য এত উৎসাহযুক্ত হইয়া উঠিল যে, তাহারা কামান সকল শত্রুপক্ষের আরও নিকটে লইয়া গিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সত্বরতার সহিত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। যে হেতু গোলা সকল ঊর্দ্ধে আসিয়া পড়াতে আম্র বনেরই ক্ষতি হইতে লাগিল, বৃক্ষের নিম্নদেশে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহাদের ততটা ক্ষতি হইল না। এদিকে ইংরেজেরা আম্রকাননের অন্তর্ভাগ হইতে গোলা চালাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও নবাবের সৈন্য পশ্চাৎপদ হইল না। তিন ঘণ্টাকাল এইরূপে গোলায় গোলায় যুদ্ধ হইল; কিন্তু ইংরেজদিগের কোন সুবিধা দেখা গেল না। নবাবের সৈন্য পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে গোলা চালাইতে লাগিল। তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইল না। এসময়েও ক্লাইবের সহিত মীরজাফরের সম্মিলনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। মীরমদন যেস্থান অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, সে স্থান অধিকার করিতে ক্লাইব সাহসী হইলেন না, সুতরাং ক্লাইব উদ্বিগ্ন হইলেন। আত্মপক্ষের কোন সুবিধা না দেখিয়া, তিনি বেলা এগারটার সময় আপনার প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন, ইহাঁদের সহিত পরামর্শের পর অবশেষে স্থির হইল যে, রাত্রিপর্য্যন্ত আম্রকাননে অবস্থিতি করিয়া, নিশীথে শত্রুশিবির আক্রমণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ স্থির হইলে, ইংরেজ সৈন্য পূর্ব্বের ন্যায় সেই সুবিস্তৃত আম্র কাননেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে একটি প্রাকৃতিক ঘটনা ইংরেজের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। বর্ষাকালে সর্ব্বদা যেরূপ হইয়া থাকে, হঠাৎ এক ঘণ্টাকাল প্রবলবেগে সেইরূপ বৃষ্টি হইল। ইংরেজেরা

আপনাদের বারুদ প্রভৃতি ঢাকিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের ততটা ক্ষতি হইল না; কিন্তু নবাবের সৈন্য এরূপ সাবধান না হওয়াতে তাহাদের সমস্ত বারুদ ভিজিয়া গেল। ইহাতে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় গোলা চালাইতে পারিল না। ভীষণ সমরানলের তেজ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। ইংরেজদিগের বারুদও এইরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া সেনাপতি মীরমদন একদল অশ্বারোহী লইয়া, প্রবল বেগে আম্রকাননের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইংরেজ সৈন্য ইহাদের উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। গুলির বেগে আক্রমণকারিগণ হটিয়া গেল। সেনাপতি মীরমদন সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন।

এই ঘটনাতেই সিরাজের কপাল একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। ২৩শে জুনের এই ঘটনাই অনেকাংশে ইংরেজের বিজয় গৌরবের প্রচারে সুবিধা করিয়া দিল। যদি মীরমদন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলেও সিরাজের একটা আশা ভরসার স্থল থাকিত। সিরাজউদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকগণে বেষ্টিত ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সাহসী প্রভুভক্ত সেনাপতি, মোহনলালের সাহায্যে তাঁহাকে কোনরূপে রক্ষা করিতে পারিতেন। এরূপ সেনাপতির মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, কোনওরূপে আর সে ক্ষতির পূরণ হইল না। হতভাগ্য ঊনবিংশ বর্ষীয় যুবক আপনার সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্যুতে অধীর হইলেন; অধীরভাবে মীরজাফরকে ডাকিয়া আনিলেন। মীরজাফর উদাসীন ভাবে নবাব সমক্ষে উপনীত হইলেন। নবাব আপনার পাগড়ি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কাতরতার সহিত বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমার অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তোমার সহিত আমার ও স্বর্গীয় মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর দুশ্ছেদ্য বন্ধন আছে। আমি এখন তোমাকেই সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের প্রতিনিধি বলিয়া চাহিয়া দেখিতেছি। আমার আশা আছে তুমি আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ ভুলিয়া যাইবে, এবং প্রকৃত সৈয়দের ন্যায়, পবিত্র পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ আত্মীয় স্বজনের ন্যায়, আমার বংশের কৃত মহদুপকার কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। আমি তোমার দিকে চাহিয়া, আমার জীবন ও আমার সম্মান রক্ষার ভার তোমার প্রতি সমর্পণ করিলাম।" ইহার পর নবাব ভূমি স্থাপিত স্বীয় উষ্ণীষ লক্ষ্য করিয়া, সজল নয়নে কহিলেন, "জাফর! এই পাগড়ি তুমি অবশ্য রক্ষা করিবে।" আপনার অনুগত প্রজা ও প্রতি-

পালিত কর্ম্মচারীর নিকট রাজ্যাধিপতির এরূপ কাতরতা, এরূপ হৃদয়স্পর্শী সানুনয় প্রার্থনা আর সম্ভবে না। ঊনবিংশ বর্ষীয় তরলমতি যুবক আজ প্রাণের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, বিশ্বাসঘাতক প্রতিপালিতের সমক্ষে এইরূপ গভীর মর্ম্মবেদনা জানাইলেন।

কিন্তু এইরূপ কাতরতায় কঠোর প্রকৃতি বিশ্বাস-ঘাতকের কঠোরতা দূর হইল না, প্রতিপালক রাজ্যাধিপতির এরূপ বিনয় অনুনয়েও তাহার কিছুমাত্র সমবেদনা জন্মিল না। মীরজাফর যেরূপ উদাসীন ভাবে নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ উদাসীন ভাবে, কিন্তু বাহিরে সম্মান ও আনুগত্যের নিদর্শন দেখাইয়া কহিলেন "বেলা প্রায়শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন আক্রমণের আর সময় নাই। যে সকল সৈন্য অগ্রসর হইয়াছে এবং যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই ফিরিয়া আসিতে আদেশ প্রচার করুন। ঈশ্বরের প্রসাদে আগামী কল্য আমি সমস্ত সৈন্য লইয়া, বিপক্ষ-পক্ষ আক্রমণ করিব।" সিরাজ আবার কাতরতার সহিত কহিলেন, "রাত্রিতে বিপক্ষগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে।" মীরজাফর পূর্ব্বের ন্যায় উদাসীন ভাবে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, বিপক্ষগণ রাত্রিকালে কখনও আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না।

সেনাপতি মোহনলাল মীরমদনের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বিপক্ষদিগকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার কামানের গোলা এই সময়ে বিশেষ কার্য্যকর হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাঁহার পদাতিক সৈন্য অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টি করিয়া, ইংরেজ সৈন্যের ক্ষমতা প্রায় পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার আদেশে মোহনলাল বিরক্ত হইয়া কহিলেন "এখন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ফিরিয়া যাওয়ার সময় নয়। উপস্থিত যুদ্ধে যাহা ঘটিতে পারে, এখনই তাহার সংঘটন প্রার্থনীয়। আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সমস্ত সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে।" সিরাজউদ্দৌলা মোহন লালের এই কথা মীরজাফরকে জানাইলেন মীরজাফর কিছু বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন, 'আমি যে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাহাই আমার মতে অধিকতর সঙ্গত বোধ হইয়াছিল। এখন আপনি যাহা উচিত বোধ করেন, তাহাই করিতে পারেন।" ভয়াতুর হতভাগ্য যুবক বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির কথায় আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তিনি মীরজাফরের কথাতেই সম্মতি দিয়া, আপনার দুরদৃষ্টকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে দুরাশয় মীরজাফর নবাবের নিকট বিদায় লইয়া অশ্বারোহণে বিদ্যদ্‌বেগে আপনার সৈন্যদলে উপস্থিত হইলেন। এই খানে আসিয়াই তিনি অবিলম্বে ক্লাইবকে সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। ঐ পত্রে ক্লাইবকে এরূপ ও অনুরোধ করা হইল যে, তিনি যেন আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, তাঁহার সৈন্যদল সহ অগ্রসর হইতে থাকেন। এদিকে মীরজাফরের উদাসীনভাবে সিরাজউদ্দৌলা অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্যু হইয়াছিল, বারুদ সকল ভিজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, কাতর ভাবে দুর্লভ রামের নিকটে আসিলেন। এই সেনাপতিও বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের দলভুক্ত ছিলেন। সুতরাং সিরাজ ইঁহার নিকটেও সমুচিত সান্ত্বনা পাইলেন না। দুর্লভরামও সৈন্যদিগকে, পরিখাবেষ্টিত স্থানে হটিয়া আসিতে আদেশ দিতে নবাবকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সমরক্ষেত্রে মীরমদনের পতন হইয়াছিল; মোহনলাল বিশেষ পরাক্রমের সহিত বিপক্ষদিগকে নির্জ্জিত করিতে ছিলেন; অবশিষ্ট তিনজন সেনাপতি দুর্লভরাম, য়ারলতিফ ও মীরজাফর ইঙ্গরেজপক্ষ সমর্থন করিতে ছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের কাহারও নিকট সদ্‌ব্যবহারের প্রত্যাশা ছিল না। হতভাগ্য যুবক এখন নিরুপায় হইয়া মীরজাফর প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে ইঁহারা সকলেই আগামী কল্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। নবাব এই বিশ্বাসে যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিতে মোহনলালকে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিতে লাগিলেন। এই আদেশ দিয়াই তিনি উটে চড়িয়া দুই হাজার অশ্বারোহীর সহিত ভয়ব্যাকুল চিত্তে মুর্শিদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশে বিরক্ত হইয়া, মোহনলাল অবশেষে ঐ আদেশ পালন করিলেন। তিনি সহসা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া, আপনার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। সেনাপতিকে সহসা যুদ্ধক্ষেত্র হটিয়া আসিতে দেখিয়া সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রহিল না। তাহারা সন্ত্রস্তভাবে এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনজন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি এখন আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থলে প্রভুত্ব করিবার সুযোগ পাইলেন। ফরাসী সেনাপতি ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি শেষ সময় পর্য্যন্ত প্রাণপণে নবাবের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। মীরমদনের সৈন্য

গণের সাহায্যে এই বিদেশী বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ আপনাদের অধিষ্ঠিত স্থান রক্ষা করিতে যত্নশীল হইলেন। কিন্তু মীরমদনের মৃত্যুতে ও মোহনলালের প্রত্যাবর্ত্তনে ঐ সকল সৈন্যও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফরাসী সেনাপতি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইলেন। সুতরাং ইংরেজ পক্ষের জয়লাভ হইল। বেলা পাঁচটার সময় ইংরেজ সৈন্য নবাবের পরিখা-বেষ্টিত শিবির অধিকার করিল।

এইরূপে ইংরেজ বর্ণিত বিখ্যাত পলাশী মহাসংগ্রামের অবসান হইল। যে যুদ্ধ ইংরেজকে বণিকবেশ ছাড়াইয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজ-সিংহাসনে বসাইয়াছে, ক্রয় বিক্রয়ে ক্ষতিলাভ গণনা পরিত্যাগ করাইয়া, সন্ধিবিগ্রহ ঘটিত মন্ত্রণায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, ইংরেজ ইতিহাসলেখকগণ শত-মুখে যে যুদ্ধের গৌরবের কথা ঘোষণা করিয়াছেন, এইরূপে তাহা শেষ হইয়া গেল। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধ মহাযুদ্ধের সম্মানিত নামের যোগ্য নহে। প্রবন্ধের সূচনাতেই এই কথা বলা হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধ ঘোর নীচাশয় বিশ্বাসঘাতকের চাতুরীমাত্র। এই চাতুরীতেই হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়, এবং এই চাতুরীতেই বঙ্গে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে।

পরদিন প্রাতঃকালে ক্লাইব মীরজাফরকে আপনার শিবিরে আসিবার জন্য স্ক্রাফ্‌টন সাহেবকে পাঠাইয়া দিলেন। মীরজাফর হাতীতে চড়িয়া যথাসময়ে ক্লাইবের শিবিরে উপনীত হইলেন। ক্লাইব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার বলিয়া অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। ক্লাইব পাছে সিরাজউদ্দৌলার ন্যায় তাঁহারও সর্ব্বনাশ করেন, মীরজাফর এই আশঙ্কায় বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন। এখন ক্লাইবের ঐরূপ অভি-নন্দনে মীরজাফরের আশঙ্কা দূর হইল। মীরজাফর ক্লাইবের পরামর্শে সেই দিনই মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন।

মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া ক্লাইব স্বয়ং তথায় যাত্রা করিলেন। পথ হইতে ২৫শে জুন তিনি ওয়াট্‌স্ ও ওয়াল্‌স্ সাহেবকে, একশত সিপাহি সঙ্গে দিয়া মীরজাফরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মীরজাফর অঙ্গীকার পত্রানুসারে যে যে হিসাবে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, ইঁহারা সেই সমস্ত টাকার বন্দোবস্ত করিতে আদিষ্ট হইলেন। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ওয়াট্‌স্ ও ওয়াল্‌স্ সাহেব মুর্শিদাবাদে আসিলেন। এদিকে ধনা-

ধারে বেশী টাকা ছিল না ; যাহা ছিল, তাহাতে অঙ্গীকৃত অর্থ সমষ্টির তিন ভাগের কিছু কম দুই ভাগ মাত্র শোধ হইতে পারিত। সুতরাং ইংরেজের অর্থলালসা চরিতার্থ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। এই সঙ্কট-কালে শেঠবংশ ও রাজা দুর্লভরাম মীরজাফরের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের সাহায্যে অবশেষে স্থির হইল যে, নগদ ও মণি-মুক্তা-তৈজসপত্রে* নিরূপিত সমষ্টির অর্দ্ধেক এখন দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট কিস্তিবন্দী করিয়া তিন বৎসর তিন কিস্তীতে শোধ করা যাইবে। বিদেশী বণিকজাতি এইরূপে রাজকোষ শূন্য করিয়া, অভিনব অনুগত নবাবকে ঋণজালে জড়িত করিয়া, বঙ্গে আপনাদের অধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিল।

টাকা কড়ির বন্দোবস্ত হইলে, ক্লাইব মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। যথাসময়ে দরবারের আয়োজন হইল। মীরজাফর এই দরবারে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন। অভিনব নবাবের নামে ঘোষণাপত্র প্রচার হইল। এই অবধি ইংরেজ প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গের অধিপতি হইলেন। অভিনব নবাব তাঁহাদের ক্রীড়া-পুতুল-স্বরূপ হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া রহিলেন।

ইংরেজের আশাপূর্ণ ও ভোগলালসা চরিতার্থ হইল। বিশ্বাসঘাতকেরা অভ্যস্ত মনোরম দৃশ্যে সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সন্তোষ সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল একজন মাত্র হতাশার তীব্রদংশনে কাতর হইয়া, আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিল। ৩০শে জুন মীরজাফর অঙ্গীকার পত্রানুসারে অর্থ দিবার বন্দোবস্ত করেন। উমিচাঁদ আশা করিয়াছিলেন, এই দিনে তিনি নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইবেন। উমিচাঁদ এই আশায় বুক বাঁধিয়া আমোদের তরঙ্গে দুলিতেছিলেন, এমন সময়ে ক্লাইব ও স্ক্র্যাফ্টন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ক্লাইব স্ক্র্যাফ্টনকে বলিলেন, "এখন উমিচাঁদকে আসল কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" অমনি স্ক্র্যাফ্টন হিন্দুস্থানীতে উমিচাঁদকে কহিলেন, "উমিচাঁদ! লোহিত বর্ণের অঙ্গীকার পত্র ভুয়া কাগজ; সুতরাং তুমি কিছুই পাইবে না।" স্ক্র্যাফ্টনের কথা বজ্রবৎ উমিচাঁদের হৃদয়কে আক্রান্ত করিল। উমিচাঁদ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যদি তাঁহার একজন অনুচর তাঁহাকে না ধরিত, তাহা হইলে তিনি অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতেন। অনুচরেরা ঐ অবস্থায় উমিচাঁদকে পাল্কিতে

* দুই তৃতীয়াংশ নগদ, এক তৃতীয়াংশ মণিমুক্তা ও বাসন ইত্যাদিতে।

করিয়া গৃহে আনিল। এইখানে তিনি গভীর বিষাদে নিমগ্ন রহিলেন। ক্রমে তাঁহার বাতুলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিছুদিন পরে ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ক্লাইব তাঁহাকে তীর্থস্থলে যাইতে পরামর্শ দেন। উমিচাঁদ এই পরামর্শ অনুসারে তীর্থযাত্রায় গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মানসিক যাতনার বিরাম হয় নাই। তিনি তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া পাগল হইলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি এক এক দিন বহুমূল্য শোভিত সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপনা আপনিই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন।" এই অবস্থাতেই, হতাশাস হওয়ার দেড় বৎসর পরে, তাঁহার মৃত্যু হয়।

উমিচাঁদকে প্রতারিত করা, ক্লাইবের স্বার্থ-পরতা-ময় নিকৃষ্ট চরিত্রের নিকৃষ্টতম অংশ। তাঁহার স্বদেশীয়গণও এই নিকৃষ্ট চরিত্রের অপার কলঙ্কে ঘৃণা ও বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। উমিচাঁদের সংসৃষ্ট অঙ্গীকার পত্রে যে, ওয়াট্‌সনের নাম জাল করা হইয়াছিল, তাহা ওয়াটসন্ পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। শেষে মৃত্যু শয্যায় এই কথা তাঁহার শ্রুতিপ্রবিষ্ট হয়। কথা শুনিয়া, তিনি বিরাগের সহিত কহিয়াছিলেন "স্ব-জাতির মধ্যে যখন এরূপ অসাধুতা ঘটিয়াছে তখন তিনি তাহাদের মধ্যে আর থাকিতে ইচ্ছা করেন না।"

সকল শেষ হইল। ইংরেজের অর্থলালসা তৃপ্ত হইল। বাঙ্গালায় তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। মীরজাফর তাঁহাদের অনুগত হইয়া, আপনার শূন্য উপাধিতে তৃপ্তি-সুখ অনুভব করিতে লাগিল। উমিচাঁদ অর্থ লাভের আশার সহিত আপনার জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিল। আর হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলা? যে নির্দ্দোষ তরুণমতি যুবকের জন্য এত চাতুরী, এত প্রতারণা, এত ষড়যন্ত্র হইল, শেষে তাঁহার দশায় কি ঘটিল? এই হতভাগ্য বালকের জীবনের অন্তিম শোচনীয় কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনীয়। ২৩শে জুন সন্ধ্যার সময় সিরাজউদ্দৌলা পলাশী হইতে মুর্শিদাবাদের শূন্য প্রাসাদে আসিলেন। এই দুঃসময়ে কেহই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল না। এক সময়ে যাহারা তাঁহার অনুগ্রহ ভিখারী ছিল, ঐ সময়ে তাহারাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অধিক কি, তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্ত নানা ছল করিয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার গৃহে গেলেন। পরিবারের সকলে ভয়ে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্তঃপুর-চারিণী দাসী-

-দিগের আর্ত্তনাদে হতভাগ্য বালকের হৃদয় অধিকতর বিচলিত হইল। সিরাজ পরদিন কুলকামিনীদিগকে মণিমুক্তার সহিত হাতীতে করিয়া পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, পলাশী হইতে শেষ সংবাদ পঁহুছিলে তিনিও ইঁহাদের অনুগমন করিবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে মীরজাফরের আগমন সংবাদ জানিয়া, তিনি, ফরাসী সেনাপতি "লর" সহিত মিলিত হইতে তাড়াতাড়ি ভাগলপুরের অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। সিরাজ এই অভিপ্রায়ে সেই রাত্রিতে প্রিয়তমা প্রণয়িনী লুৎফুল-নেশাকে সঙ্গে করিয়া, ছদ্মবেশে একজন বিশ্বস্ত খোজার সহিত প্রাসাদ হইতে যাত্রা করিলেন। নৌকা প্রস্তুত ছিল। সিরাজ সেই নৌকাতে চড়িয়া, মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। পথে তিনি ধরা পড়িলেন। যাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মুর্শিদাবাদে আনিল, তাহারা পথে তাঁহার প্রতি অবিনয় ও অসৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ত্রুটি করিল না। যে আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রে ও বিশ্বাস-ঘাতকতায় তাঁহার অধঃপতন ঘটিয়াছে, হতভাগ্য সিরাজ বন্দীভাবে ২রা জুলাই তাহারই সম্মুখে আনীত হইলেন। এই দৃশ্য বড় শোচনীয়। সুনিপুণ চিত্রকরের কৌশলময়ী তুলিকায় এই শোচনীয় দৃশ্যের শোচনীয় ভাব প্রতিফলিত হওয়ার যোগ্য। সিরাজ অতি সুশ্রী ছিলেন। কিশোর বয়সে তাঁহার দেহকান্তি লোকলোচনের বড় প্রীতিকর ছিল। অপূর্ণ যৌবনে সৌন্দর্য্যের অপূর্ণ মাদকতায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিভাসিত থাকিত। কিন্তু এখন সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে কালিমার সঞ্চার হইয়াছিল। উদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় সে প্রসন্ন মুখমণ্ডল, নয়নের সে প্রশান্ত ভাব, হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। দুঃসহ দুঃখে, কঠোর যাতনায়, প্রাণেরভয়ে উনবিংশ বর্ষীয় বালকের কান্তি, বৃন্তচ্যুত বিশুষ্ক কুসুমের ন্যায় পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। মীরজাফর, আপনার সৌভাগ্য, আপনার সম্মান, আপনার ক্ষমতা,—সমস্তই এই হতভাগ্য বালকের মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর অনুগ্রহে লাভ করিয়াছিল। এখন সেই আলিবর্দ্দীর বাৎসল্যের ধন, স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্ব, প্রীতির একমাত্র পুত্তলী—দৌহিত্র—হীন বেশে, বন্দীদশায় তাঁহার অনুগৃহীতের পদানত হইয়া,কাতর ভাবে আপনার জীবন—কেবল জীবনমাত্র—ভিক্ষা করিতে লাগিল। এসময়ে তাহার বয়স কুড়ি বৎসরও হয় নাই। এই তরুণ বয়সে সুকুমার মতি বালক কেবল জীবনটি আপনার অমূল্য

সম্পত্তি মনে করিয়া, সেই অমূল্য সম্পত্তি রক্ষার জন্য আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তির পদানত হইয়া, কাঁদিতেছিল। তাহার সুবিস্তৃত রাজ্য গিয়াছিল, বিপুল ধনসম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছিল, সম্মান ক্ষমতা, আধিপত্য—সমস্তই "প্রলয় পয়োধির' জলোচ্ছাসে ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বালক তাহাতে অধীর না হইয়া, এখন কেবল প্রাণের জন্য কাতর ভাবে কাঁদিতে লাগিল। অভিনব নবাব, এই কাতর প্রার্থনার সম্বন্ধে কোন কথা কহিলেন না। তিনি বন্দীকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া তাহার বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

অমাত্যগণ সিরাজকে প্রাণে না মারিয়া বন্দী করিয়া রাখিতে কহিলেন। কিন্তু মীরজাফরের পুত্র দুর্বৃত্ত মীরণ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিল। অবশেষে মীরজাফর, পুত্রের অনুরোধে, সিরাজকে সে রাত্রি পুত্রের তত্ত্বাবধানে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। মীরণ এই রাত্রিতেই সিরাজউদ্দৌলাকে বধ করিতে ঘাতক নিযুক্ত করিল। ঘাতক অসি হস্তে সিরাজের গৃহে উপনীত হইল। সিরাজ বিস্ফারিত চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আর তাঁহার কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। তিনি অন্তিম সময়ে মুদ্রিত নয়নে অনন্তপদ ধ্যান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ঘাতকের অসি উপর্য্যুপরি কয়েকবার তাঁহার দেহে নিপতিত হইল। দেখিতে দেখিতে বঙ্গবিহার ও উড়িষ্যায় অধিপতি কঠোর প্রকৃতি ঘাতকের কঠোর অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ঘোর বিশ্বাস-ঘাতকতায় মিরজাফরের বঙ্গরাজ্যে অধিষ্ঠান; তাহার প্রথম দিনেই আশ্রিত-হত্যা,—রাজ-ঘাতকতা। এই সকল কথা স্মরণ করিয়াই বঙ্গের শেষ নবাব-নাজিম মনসুর আলি বলিতেন, "আমরা যদি উচ্ছিন্ন না যাই, তাহা হইলে জগৎ মিথ্যা হইবে।"

মীরজাফর প্রাতঃকালে সমস্ত শুনিতে পাইলেন। তাঁহার উপকারকের দৌহিত্র তদীয় পুত্রের আদেশে নিহত হইয়াছেন, ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষোভ বা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। সিরাজের অস্ত্রবিচ্ছিন্ন গতাসু দেহ হাতীতে করিয়া, নগরবাসী ও সৈন্যদিগকে দেখান হইলে, উহা আলিবর্দ্দীখাঁর কবরের পার্শ্বে সমাহিত করা হইল।

এইরূপে উনবিংশ বর্ষ বয়সে হতভাগ্য সিরাজের অনন্ত কষ্টময় ঐহিক জীবনের শেষ হইল। বয়সের তারল্যে ও বুদ্ধির চাঞ্চল্যে সিরাজ সময়ে

সময়ে অন্যায় পথে ধাবিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার গুরুতর শাস্তি তদীয় সমস্ত অন্যায় কার্য্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তিনি ইংরেজদিগের সহিত কোনরূপ অসদ্‌ব্যবহার করেন নাই। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি যখন ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়, তখন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কেবল সরলতার পরিচয় দিতে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজগণ, তাঁহার অমাত্যদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে প্রতারিত ও হৃত-সর্ব্বস্ব করিতে নিরন্তর যত্ন করিতে ছিলেন, সিরাজ কিন্তু কখনও ইংরেজদিগকে প্রতারিত করিতে উদ্যত হন নাই। অপক্ষপাত ইতিহাস এবিষয়ে কোনও অংশে তাঁহার কোন ত্রুটি দেখাইতে পারে নাই। ঘোর প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও চাতুরীর মধ্যে এই উনবিংশবর্ষীয় বালকেই কেবল, সরলতা, সাধুতা ও সৌজন্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকও স্বীকার করিয়াছেন যে অন্ধ কূপের হত্যায় যাহারা লিপ্ত ছিল, সিরাজ তাহাদিগকে দণ্ডিত না করিয়া একবারমাত্র ইংরেজ দিগের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার পর তিনি আর কখনও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। যাহারা সিরাজউদ্দৌলাকে ঘোর পাষণ্ড নরাধম বলিয়া বর্ণনা করেন, এই ঐতিহাসিকের কথা তাঁহাদের স্মৃতি পটে অঙ্কিত রাখা কর্ত্তব্য। একদল বাণিজ্য ব্যবসায়ী তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া, তাঁহারই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করে। তিনি ইহাদের অনধিকার চর্চ্চায় ক্রোধ প্রকাশ করিলেও, ইহাদের সহিত যে সন্ধি ছিল, সেই সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিতে উদাসীন হন নাই। শেষে ইঁহারাই তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত, সম্পত্তি চ্যুত ও জীবনচ্যুত করিয়া আত্মস্বার্থের তৃপ্তিসাধন করে। ইহাদের স্বদেশীয়গণের অনেকেই হতভাগ্য সিরাজের চরিত্র গভীর কালিমায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আর আমাদের যে সকল কাপুরুষ স্বদেশীয়গণ সিরাজের অধঃপতনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাপন্ন করিবার আশা করিয়া বিদেশী, বিজাতির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সিরাজের চরিত্র পট কুৎসিত ও সিরাজের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে উদাসীন থাকেন নাই। তাঁহাদের পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তাঁহারা জীবদ্দশায় বিদেশীয় হস্তে ভ্রষ্ট-সর্ব্বস্ব হইয়াছেন। তাঁহাদের সন্তানগণ এখন বিদেশীর নিপীড়নে নিষ্পেষণে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাদের সেই অপার দুষ্কৃতের অনন্ত ফলভোগ করিতেছেন।

জন্তু-ধর্ম্মী মানব।

পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসাদে বাঙ্গালি বালক 'বোধোদয়' হইবামাত্র জানিতে পারে,—যে, মনুষ্য একটি জন্তু-বিশেষ। তাহার পর, আর দশবৎসর না যাইতেই করুণাময়ী ঠাকুরমায় প্রসাদে যখন একটি পট্ট-বাস-জড়িত, চন্দ্রিকা-রঞ্জিত নয়বৎসরের বালা-জন্তু আপনার শয্যা-ভাগিনী রূপে প্রাপ্ত হয়, তখন নবনারীর পশুভাব সে আপনার হাড়ে হাড়ে বুঝিতে থাকে। তাহার কিছু দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রস্ত যুবা—ডারউইনের মন্ত্রশিষ্য। মনুষ্যের পশুত্ব—এখনত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কাজেই, স্বদেশী বিদেশী মহামহা পণ্ডিতগণের নির্দ্দেশ অনুসারে, আর পিতামহীর প্রখর দৃষ্টান্তে, অনেকেই বুঝিয়াছেন, যে আমরা একরূপ জন্তু বিশেষ; আমরা নিশ্চয়ই পশুধর্ম্মী। আমরা সেই পুরাণ কথাটা আবার নূতন করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব,—তোমরা কেহ রাগ করিও না; করিলে, আমাদের কথাই প্রতিপন্ন হইবে; রাগ—পশু-ধর্ম্ম। আর রাগই বা করিবে কেন? বালক কাল হইতে উপর্য্যুপরি এত শিক্ষা পাইয়াও, যদি, মনুষ্যের পশুত্বে তোমার সন্দেহ থাকে, তবে তোমার গৃহ প্রতিষ্ঠিত ইষ্টদেবতার সম্মুখে এই প্রবন্ধ পাঠ করিও, তিনি অবশ্য 'বিশেষণে সবিশেষ' তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন। তাহাতেও যদি কিছু সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে, তবে এই প্রবন্ধ লেখকের সহিত একবার দেখা করিও, সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে।

জন্তু নানাবিধ; মনুষ্য-জন্তুও নানা বিধ। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি নানারূপ মনুষ্য জন্তু আছে। সকল প্রকার পশু-ধর্ম্মীর বা পক্ষী-ধর্ম্মীর লক্ষণ বুঝাইতে গেলে পুঁথী বেড়ে যায়; আমরা দুই একটি উদাহরণ দিব মাত্র। বিচক্ষণ পাঠক পাঠিকা স্বজন বন্ধু বান্ধবের সহিত জু-বাগানে গিয়া তাঁদের সহিত সাদৃশ্য মিলাইয়া ক্ষোভ মিটাইবেন।

প্রথমে,পুরাণেতিহাসে প্রসিদ্ধ, সর্ব্ব-পরিচিত শুকপক্ষীকেই দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ করা যাউক।

শৌকেয় শ্রেণীস্থ মনুষ্য দেখিলেই বলা যায়। এই শৌকেয় শ্রেণীস্থ লোককেই লোকে শৌখীন বলে। কিন্তু শৌখীন না বলিয়া শৌকীন বলিলেই ঠিক ব্যাকরণ-দুরস্ত হয়। ইহাদের নাকটি বকফুলের কুঁড়ির মত টীকল, বাঁকাল, ঘোরাল। চোখগুলি ছোট ছোট, কুঁচের মত, যেন মিটি মিটি জলিতেছে। গাটি বেশ চোমরান; মাথাটি বেশ আঁচড়ান; সর্ব্বদাই গাত্র পরিষ্কার রাখিতে ব্যস্ত। প্রায়ই শিকলে বাঁধা আছেন, তখন চাল ছোলা লইয়াই মত্ত; না হয়, মন্দিরের কোটরে, তখন দেব-দেবতার মাথায় নৃত্য করিতেছেন। চিরজীবন শিকলে বাঁধা আছেন, কিন্তু আপনার ভ্রুকুটি ছাড়েন না; ছোলার খোসা না ফেলিয়া খাইতে পারেন না; দুধের সর একটু বাসী হইলে, অমনই সেই বাঁকা নাক আর বাঁকাইয়া বসে। ইহার নাম শৌকীন বা শৌখীন রুচি।

যে বোল শিখাইয়া দিবে, শৌকীন বাবুরা, দেখিবে, তালে, বেতালে,— সময়ে, অসময়ে, কেবল তাহাই জপ-চাইতেছেন। রাধাকৃষ্ণই বলুন, আর কালী-কল্পতরুই নাম করুন,অথবা শিব-জগদ্গুরু বলিয়াই চীৎকার করুন,— দেব-দেবতার জ্ঞান ইহাদের সকল সময়েই সমান; দেব-দেবতার উপর ভক্তিও সেইরূপ;—ভক্তি করেন, ভাল বাসেন কেবল দাঁড়টি আর ভাঁড়টি। সেই মিটি মিটি কুট্‌কুটে চোখ দুটি দিয়া ধানটি ছোলাটি অনবরতই পরীক্ষা করিতেছেন; সেই বাঁকা ঠোঁট দিয়া 'অপত্য নির্ব্বিশেষে' ছোলাগুলির খোসা ছাড়াইতেছেন; আর নিকটে কেহ আসিলেই, সেই চক্ষুতে একবার আড় চোখে দেখিয়া বলিতেছেন—"রাধাকৃষ্ণ" "রাধাকৃষ্ণ।" ইহাকেই বলে, শৌকীন বা শৌখীন ভক্তি।

ছেলে পিলে, কাছে গেলে, কঠোর ঠোকরে রক্তপাত করিতে শুকলাল বড় মজবুত। শৌকীন বাবুরা বলেন, যে বালক বালিকার শাসনই গৃহ সংসারের সার ধর্ম্ম; নিকটে বাগে পাইলেই ঠোকর দিবে। আর সবল লোকে ধরিলেই, চ্যাঁ চ্যাঁ করিয়া চীৎকার করিবে; তখন রাজনীতিজ্ঞরা বলেন, যে চীৎকারই শৌকীন পলিটিক্স। শুকরাজ চিরজীবন শিকল কাটিতেই নিযুক্ত; পরিশ্রম

প্রায়ই বৃথা হয়; কচিৎ যদি শিকল কাটা হইল, তাহা হইলে হয়ত নিজে তাহা বুঝিতে পারেন না; কর্ত্তা আসিয়া হাসিতে হাসিতে ধরিয়া ফেলিলেন, আর শিকলটি খুব মজবুত করিয়া দিলেন। আর না হয়ত, কাটা শিকল পায়ে বাঁধা একবার উড়িয়া গাছে বসিতেই, ডালে জড়াইয়া গেল। আবার ধরিয়া আনিল; অথবা অনাহারে মরিলেন; কিম্বা শিকারীতে মারিয়া ফেলিল। পায়ে শিকল লাগান শৌখীন স্বাধীনতা এই রূপই জানিবে।

শুক-সংবাদের একটি পুরাণ গল্প মনে পড়িল। একজন জুয়াচোর একটি শুক পাখীকে একটি মাত্র বোল শিখাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। পাখীটি কেবল মাত্র বলিতে পারিত—"তাহাতে সন্দেহ কি?" একজন ক্রয়ার্থী জিজ্ঞাসা করিল; "এই পাখীটির দাম কত হইবে?" বিক্রেতা বলিল, "পাঁচ শত টাকা; হয়, না হয়, পাখীকেই জিজ্ঞাসা করুন।" ক্রয়ার্থী বলিল, "কেমন, তুতি! তোমার মূল্য শত হইবে কি?" পাখী বলিল, "তাহাতে সন্দেহ কি?" লোকটি বিস্মিত হইয়া, পাঁচশত টাকা দিয়াই পাখীটি বাড়ী লইয়া গেল; তাহার পর বুঝিল, যে পাখীটি ঐ একটি মাত্র বোল জানে। তখন একই বোলে কাণ ঝালা পালা হইলে; পাখীর নিকটে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি কি নির্ব্বোধ!" পাখী বলিল, "তাহাতে সন্দেহ কি?" ইহা শুনিয়া পক্ষী-ক্রেতা যেমন কপালে ঘা মারিয়া হাস্য করিয়াছিল, আজি আমরাও সেইরূপ কপালে ঘা মারিয়া, সেইরূপ হাসিয়া বলিতেছি—"আমরা এত টাকা দিয়া যে একটি মাত্র বোল কিনিতেছি, আমরা কি নির্ব্বোধ!' ঐ শুন চারিদিক হইতে শৌকীন ভায়ারা একজোটে বক্র ঠোঁটে বলিতেছেন,—"তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

এইরূপ কাক, পেচক, কুক্কুট প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী-ধর্ম্মী মানব আছে।

ভদ্র পশু-ধর্ম্মী।

পশুর দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহ-পালিত বিড়াল গৃহীত হইল।

বাঙ্গালায় বিড়াল-ধর্ম্মী পুরুষ বিস্তর আছেন; তবে চতুষ্পদ ও দ্বিপদ বিড়ালে একটু প্রভেদ আছে। চতুষ্পদের এলাকা, অধিকার, ও আব্দার,—ভিতর বাড়ীতেই বেশী; আর দ্বিপদের দখল, দাবি, দৌরাত্ম্য—

বহির্বাটিতে অধিক। অন্তর বাটিতে দেখিবেন, একটু বেলা হইয়াছে, আর বিড়াল অমনই গৃহিণীর গোলমলে ঠেশ্ দিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই তাঁহার পদ-যুগলের মধ্যদিয়া যাতায়াত করিতেছে; আর বিনম্র সলোম লাঙ্গুল সঞ্চালনে তাঁহার পদ-সেবা করিতেছে। বাহিরে দেখিবেন, কর্ত্তার দক্ষিণে বামে দুই জন পুরুষ-মার্জ্জার বসিয়া আছেন; একজনের হস্তে 'বঙ্গবাসী;' তিনি মধ্যে মধ্যে কর্ত্তার চুলকণা গুলি খুঁটিয়া দিতেছেন। চক্রবর্ত্তীর উহাতে বড় আমোদ হয়: অপর দিকে পাল মহাশয় স্বয়ং পাখার বাতাস খাইতেছেন বটে, কিন্তু দূতীর গুণে বীজনী কর্ত্তার দিকেই অভিসারিকা। গৃহস্থ রোমশের লাঙ্গুল-সেবার, আর বহিঃস্থ চক্রবর্ত্তীর চুলকানি খুঁটিতে স্পৃহার, এবং পাল মহাশয়ের পাখার ভঙ্গির—একই কারণ।—সময়ে—কাঁটাটা, গুঁড়াটা; মাছটা, মুড়াটা।

বিড়াল বড় বাস্তু-প্রিয়। বাস্তুতে বস্তু থাকিলে বিড়াল কখন তাহা ছাড়িতে বা ভুলিতে পারে না। থোলের ভিতর পূরে, নানা লাঞ্ছনা করে,' উড়ে মালীর মাথায় দিয়া, (বিড়াল কাল তাহার মাছ খাইয়াছিল, তাই তাহার এত ত্যাগ-স্বীকার) বিড়ালকে গ্রামান্তর করিয়া দিয়া আইস; একদিন পরে দেখিবে, বিড়াল শুষ্ক মুখে, রুক্ষদেহে, একটু ভয়ে, একটু আহ্লাদে, অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে অন্তর বাটির গৌজলা দিয়া মুখ বাড়াইতেছে। এদিকেও দেখ, চক্রবর্ত্তীকে শত গঞ্জনা দিয়া, নবীন বাবুর সঙ্গে গাড়ীতে চাপাইয়া, বেহারে কণ্ট্রাকটের কার্য্য করিতে দেশান্তরিত করা গেল; দশ দিন পরে দেখিবে চক্রবর্ত্তী, তেমনই শুষ্ক মুখে, রুক্ষ দেহে, বৈটক খানায় উঁকি মারিতেছেন। বলেন, "পটোল নাই, উচ্ছে নাই,—কেবল কাঁকুড়, রাত্রিদিন পেট গড়্ গড়্ করে, সেখানে কি থাকা যায়?"

বিড়াল বড় বেঁাচা। ঘৃণা পিত্ত নাই বলিলেই হয়। খোকার দুধের বাটিতে মুখ দিয়াছিল বলিয়া, এইমাত্র গৃহিণী তাঁহার সেই দুর্জ্জয়-দমন পাকান বালার বাঘমুখো খোব্‌না দিয়া তাহার থোঁতামুখ ভোঁতা করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আবার ঐ দেখ,—এখনই ফিরিয়া আসিয়াছে; স্কুলের ছেলেদের পাতের পার্শ্বে জানু গাড়িয়া বসিয়া আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরওত কম খোয়ার হয় না! সেদিন বড় বাবুর বৈটক খানায় গিয়া চক্রবর্ত্তী বরফ খাইয়াছিলেন বলিয়া, কর্ত্তা কি লাঞ্ছনাই না করেন! সকলেই মনে করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ আর দশ দিন এ মুখো হবে না,—তা কৈ? সন্ধ্যার পর সেই সমানে

আসিয়া কর্ত্তার পার্শ্বে তেমনই জলযোগ হইল। আহা পেটের দায়ে যাহারা এত নির্ঘৃণ তাহারা চতুষ্পদই হউক, আর দ্বিপদই হউক, কে তাহাদের উপর দয়া না করিবে বল?

বিড়াল বড় আয়েসী। খাওয়া আর শোয়া—এই দুইটাই তাহার জীবনের প্রধান কর্ম্ম। যে টুকু বসিয়া থাকা—তাহা হয়, কেবল খাবার প্রত্যাশায় বা উমেদারীতে; না হয় আঁচাইবার জন্য। অন্তঃপুরে দেখিবে, এই গ্রীষ্মের দিনে, বিড়াল নীচে তলার নিভৃত ঠাণ্ডা মেজেতে পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে; বহির্বাটিতে দেখিবে, পাল মহাশয় নীচের বৈঠকখানার পাশের ঘরে, পাটি বিছাইয়া নাসিকা-ধ্বনি করিতেছেন। শীতকালে দেখিবে, অন্তঃপুরে আধছায়া আধরৌদ্রে শুইয়া বিড়াল লেজ নাড়িতেছে; বহির্বাটিতে পাল মহাশয় রৌদ্রে পীঠ দিয়া তামাকুর অন্ত্যেষ্টি করিতেছেন। হা পেট্! তোমার দায়ে এ হেন বিলাসীকেও ইন্দুরের বিবর পার্শ্বে ওত করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়! তোমার দায়ে পাল মহাশয়কেও পাক করিতে দেখিয়াছি!

বিড়াল ভণ্ড-তপস্বী। রান্নাঘরের বারান্দার কোণে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া চতুষ্পদ বিড়াল কিসের ধ্যান করে, তা কি তোমরা জান না? না, কর্ত্তার জল খাবারের ঘরে গিয়া সন্ধ্যার সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিসের আহ্নিক করেন, তাহা তোমরা বুঝ না? তোমরা জানও সব, বুঝও সব; কেবল জাতীয় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই না, দ্বিপদে ও চতুষ্পদে প্রভেদ কর। বাস্তবিক পাল চক্রবর্ত্তীর সহিত পুষি, মেনীর কোন প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে কি?

এইরূপ ছাগ, মেষ, শূন, গরু প্রভৃতি নানাবিধ-গৃহ-পালিত পশুজাতীয় মানব বঙ্গদেশে যত্র তত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পূতিগন্ধময় পঙ্ক-পল্বলে পুরুষ-শূকরেরও অভাব নাই; নীলাভাণ্ডে পতিত পুরুষ-শৃগালও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। এমন বিচিত্র বিস্তীর্ণ চিড়িয়াখানায় দুই একটি সিংহ শার্দ্দূলও আছে।

ভদ্র সর্পধর্ম্মী।

সর্প-স্বভাব মানবেরও অভাব নাই। একহারা, সিক্ লিকে, ছিপ্ ছিপে চেহারা; সে শরীর যেন কিছুতেই ভাঙ্গেও না, মচ্ কায়ও না। গায়ের চামড়া—পাতলা, চিক্কণ ও মসৃণ, অথচ চাকা চাকা দাদে ভরা; হাতের পায়ের নলি সরু সরু; আঁত কখন ভরা থাকে না;—চির দিনই খাত

খোলার মত পড়িয়াই আছে; চলিবে,—আঁকা বাঁকা; দাঁড়াইবে—ঘাড় বাঁকাইয়া, কথা কহিবে অতি ক্ষীণস্বরে; হাসিবে—একদিকে, এক পাশে একটু খানি; আর যখন চাহিবে—তাহার সেই চাহনীতেই তাহার খল-স্বভাবের পূর্ণ প্রতিমা প্রতিভাত হইবে। সেই তীব্র, তীক্ষ্ণ, বক্রগতি বিষ-বিদ্যুতের চাহনীতেই বুঝা যায়, সে তাহার অন্তরের অন্তর হইতে কণামাত্র বিষ উদ্গীরণ করিয়া, তোমার অন্তরে অমৃত, গরল, যাহাই থাকুক সে সেই বিষ তোমার অন্তরে ইঞ্জেক্ট করিয়া, তোমার পরীক্ষা করিবে। তুমি সংসারের নূতন ব্রতী,—সেই বিষে তোমার শিরা সকল সড়্ সড়্ করিবে, মাথায় মৃদু ঝিম্ কিনি আসিবে; সেই বিষচক্ষু তোমার অমৃতময় বলিয়া বোধ হইবে, খলের পীরিতি তখন তোমার কাছে সরলের প্রণয় বলিয়া মনে হইবে। আর তুমি সংসারের ঘাগী, সাত হাটের কাণাকড়ি,—সর্পধর্ম্মী মানবের ঐরূপ বিষ-পিচকারী তোমার উপর বহুবার হইয়াছে; তুমি ভুক্তভোগী; সেই পরিচিত দৃষ্টিতে তুমি মনে মনে হাসিবে, মনে মনে বলিবে, 'দাদা উহাতে আর আমাদের কিছু হয় না, বহুদিন হইল, আমরা উহার বাটান ঔষধ (antidote) খাইয়া আপসার করিয়া রাখিয়াছি।

খলস্বভাব মানব কখন রাজপথের মধ্য দিয়া চলিতে পারে না। ঐ গলিতে গলিতে; আশে পাশে; আনাচে কানাচে। সন্ধ্যার পর ইহাঁদের সখের বিহার, ও সুখের বিচরণ বিষ-বায়ু-ভক্ষণেই ইহাদের শরীরেই পুষ্টি এবং হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি। যেখানে কুৎসা, নিন্দা, কলহ, দ্বন্দ্বাদ্বেষি বীষারীষি, সেইখানেই বিষকীটের বেশে বসিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে মহানন্দে ছিন্ন জিহ্বা চুক্ চুক করিতেছে। কিন্তু এক স্থানে কখনই দুই দণ্ড স্থির থাকিতে পারিবে না। সুড়ি সুড়ি, গুড়ি গুড়ি আসিয়া বসিবে, আর একটু পরেই তেমনই সুড়ি সুড়ি অলক্ষিত ভাবে চলিয়া যাইবে। পথে হাওয়া খাওয়া—তাও তদ্রূপ। পথের ধারে ধারে, প্রাচীরের পাশে পাশে চলিবে। কোথাও গান বাজনা হইতেছে, সেই-খানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইবে, একবার জানালা দিয়া উঁকি মারিবে, একবার গায়কের প্রতি সেই তীব্রদৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিবে; সহসা কাহারও সহিত চোখে চোখে হইলে অমনই Good Evening, Babu! বলিয়া সরিয়া পড়িবে। খল কখন মজলিসি হয় না। আবার, কোথাও দীন দুঃখী ভিক্ষুক দুটি অন্ন হস্তে বসিয়া আহার করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

সেই সময় সর্পধর্ম্মী গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে 'দুখী-রাম তোমার বড় মেয়ে মরেছে—সে আজ কতদিন হে?" প্রশ্নকারির উত্তরের কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু দুখীরামের অর্দ্ধ অন্ন উদরস্থ হইল না। খলের চরিত্র এইরূপ।

বলিহারি, বাইবেলের কবিকে! সয়তানকে সর্পধর্ম্মী করিয়া সংসারের কি গুহ্য কথাই কবিত্বে প্রকাশ করিয়াছেন! খলই সয়তান। চোর, লম্পট, মিথ্যুক, ঘাতুক,—সংসারে শতবিধ পাপী আছে; কিন্তু খলকে পাপী বলিলে হয় না, মহাপাপী বলিলেও কুলায় না। খল—সয়তান। যে পাপ করে, সেই পাপী; আর যে পাপ হয়, তাহাকে কি পাপী বলিলে বুঝা যায়? সে সয়তান। তোমার ভাল দেখিয়া খল ব্যক্তি যে সকল সময়েই তোমার মন্দ করিবে, এমন কথা নাই; কিছুই করিবে না; পাপের বাহ্যিক কার্য্য কিছুই করিবে না; কিন্তু সে নিজে আপনাকে আপনি পাপে পরিণত করিবে; পাপের দহনে আপনি দগ্ধ হইতে থাকিবে; খলের জীবনই এইরূপ।

বাইবেলের কবির বর্ণনা এইরূপ;—যে সয়তান বিশ্ববিধাতার বিরোধী। সে আভা সহিতে পারে না, শোভা দেখিতে পারে না, কোথাও সুখ দেখিলে তাহার কষ্ট হয়। কাজেই সয়তান, এই অনন্ত অজস্র সুখ-প্রস্রবণ সংসারের বিধাতার বিরোধী। কিন্তু বিরোধী হইয়া কি করিবে! সেত তাঁহার মহা-মহিমা স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং সয়তান স্রষ্টার উপর আক্রোশ করিয়া সৃষ্টির সার মানবের অধঃপতন সাধন করিল; তোমার চতুষ্পার্শ্বস্থ ছোটখাট সয়তানেরা অদ্যাপি দেখ, তাহাই করিতেছে। তোমার কিছু করিতে না পারিলেই, তোমার কৃতিত্ব নষ্ট করিতে ব্যগ্র।

বিধাতার বিচিত্র রহস্যময় সংসারে সর্পধর্ম্মীর সর্ব্বত্রই গতিবিধি। কোন স্থান দিয়া তোমার নন্দনকাননে সে আসা যাওয়া করে, তাহার তুমি কিছুই জান না। তাহার পর তোমার সরলা সহধর্ম্মিণীকে ভুলাইয়া সে যখন তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করে, তখনই তোমার চমক হয় ও টনক নড়ে। তোমার অধঃপতনেই সর্পধর্ম্মীর অভীষ্ট সিদ্ধি এবং পরম আহ্লাদ। এই যে রঙে কুট্‌কুটে, চোখে ফুট্‌ফুটে, চেহারায় ছিপ্‌ছিপে, মেজাজে ভিজেভিজে—মন্থরা দাসী, সন্ধ্যার সময় তোমার গৃহে শয্যা করিতে গিয়া তোমার সরলা সহধর্ম্মিণীর কাছে দাঁড়াইয়া ফিসি ফিসি

প্রত্যহ কি কথা বলে—উহাকে তুমি কখন বিশ্বাস করিও না। সর্প-ধর্ম্মিণীদের মত অমন ঘর ভাঙ্গানি আর নাই। সোণার সংসার ছারখার করিয়াই উহাদের আনন্দ; যত শীঘ্র পার, তোমার নন্দনকানন হইতে ঐ সয়তান সর্পিণীকে দূর করিবে।

সর্পধর্ম্মীর ন্যায়, গোধা, গিরগিটে, ইন্দুর, ছুছুন্দরী প্রভৃতি নানারূপ সরীসৃপধর্ম্মী মানব আছে।

তুমি নিজে যদি মানবধর্ম্মী মানব হও, তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব চিঁড়িয়াখানা তোমার আনন্দের উপবন। উহার বৈচিত্রেই তোমার আনন্দ হইবে। টিয়াকে দুটি ছোলা, ময়নাকে একটু ছাতু, বুলবুলিকে একটি তেলাকুচ—বিড়ালকে একখানি কাঁটা, কুকুরকে একটু হাড়, হরিণকে দুটি ঘাস—দিতে পারিলেই আরও আনন্দ,—আরও মজা। যথাসাধ্য সকলকেই পালন করিবে; ভবের চিঁড়িয়াখানায় অমন মজা আর কিছুতে নাই—তবে বাইবেলের কবির উপদেশ কখন ভুলিও না; দুধ দিয়া কখন কাল-সাপ পুষিও না। খলকে কখন প্রশ্রয় দিও না। সর্পধর্ম্মীর উপর অভি-সম্পাত স্মরণ করিয়া, তুমি তাহাকে পদাঘাতে দূর করিও।

অক্ষয়কুমার দত্ত।*

বাঙ্গালা ১২২৭ সালে বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলীর চুপী গ্রামের বঙ্গজ পাড়ায় অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই বঙ্গজ পাড়া সম্বন্ধে দত্তজ স্বয়ং বাল্যকালে পদ্য লিখিয়া ছিলেন;—

"তাহাতে বঙ্গজপাড়া, সে গ্রামের চূড়া।
সবার সমান তেজ, কিবা যুবা বুড়া।"

একজন বঙ্গজ কায়স্থের তেজে, বহুদিন হইল একবার বঙ্গদেশ প্রতাপ-

---

* শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয় কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থ হইতে এই জীবনচরিত প্রধানত গৃহীত হইল।

শালী হইয়াছিল, মহামোগল আকবরের টনক নড়িয়াছিল, ভয়ে যত ভূপতি ব্যরস্থ হইয়াছিল; আর এই দরিদ্র বঙ্গজ কায়স্থ সন্তানের তেজে বঙ্গভাষা আজি অক্ষয়-বলে বলীয়সী, ওজস্বিনী ও তেজস্বিনী। বঙ্গজ কায়স্থের তেজ, তোমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। অক্ষয় কুমার মনের তেজে তেজীয়ান ছিলেন।

দত্তজ দশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত, স্বগ্রামে পাঠশালায় বাঙ্গলা পড়িয়াছিলেন, এবং বাড়ীতে কিছু পার্শীও পড়িয়াছিলেন। তাহার পর খিদিরপুরে পিতা পীতাম্বর দত্তের বাসায় আসেন। সেই সময়ে ইংরেজি শিখিতে ইঁহার বলবতী ইচ্ছা হয়। একাদশ বর্ষ বয়ক্রমে আপনি স্বয়ং ভবানীপুরে মিশনরিদের ইউনিয়ন স্কুলে ভর্ত্তি হন। মিশনিরা পাঠ্যপুস্তক দিতেন, এবং ছাত্রগণের বেতন লাগিত না। পীতাম্বর দত্ত ইংরেজি জানিতেন না, অক্ষয়কুমারের পিতৃব্য-পুত্র হরমোহন দত্ত ইংরেজি জানিতেন; ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে, সুতরাং তিনিই অক্ষয় কুমারের মুরব্বি ও পরিচালক। তিনি দত্তজকে মিশনরি স্কুলে পড়িতে নিষেধ করিলেন; কলিকাতায়, গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনরিতে পড়িতে পরামর্শ দিলেন। এত পরামর্শ মত অক্ষয়কুমার আপনার পিসতুত ভাই রামধন বসুর বাসায় আসিয়া রহিলেন, এবং ওরি-য়েণ্টাল সেমিনরির পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। সাতমাস পরে বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন; তাহার পরবৎসর দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ সাঙ্গ করিবার সময়, অক্ষয়-কুমারের হঠাৎ পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, অর্থচিন্তায় তিনি স্কুল ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। স্কুল ছাড়িলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িলেন না। বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, পুরাবৃত্ত, প্রত্নতত্ত্ব, নিয়মিতরূপে সকল বিষয়েরই আলোচনা করিতে লাগিলেন। চৌদ্দবৎসরের সময় পিতৃহীন হইয়া অক্ষয়কুমার নিজে নিজে যে লেখা পড়া শিখেন, সেই লেখাপড়া হইতে আমরা অন্তত লক্ষলোক লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছি, বা শিখিতেছি।

শোভাবাজারের রাজবাটীর শ্রীযুক্ত, শ্রীনাথ ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং অমৃতলাল মিত্র দত্তজের লেখা পড়া শিক্ষার বিশেষ সাহায্য করেন; অক্ষয়-কুমার বলিয়াছেন, ইঁহারা "আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, আপনাদের ভূরি ভূরি পুস্তক আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন ও আমার জন্য অকাতরে ও অক্লিষ্টচিত্তে কতই পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন।"

অক্ষয়কুমারের লেখা পড়া শিক্ষার সাহায্যকারী ঐ তিনজন, কিন্তু গদ্য পদ্য লেখার উৎসাহদাতা—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট—আমরা সকলেই স্বত পরত, সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষ সম্বন্ধে ঋণী। অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু—প্রমুখ শত গ্রন্থকারের ঈশ্বরচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত সহায় এবং উৎসাহদাতা। গুপ্ত কবির প্রসিদ্ধ দুই পংক্তি,—

'ছিঁড়ে ফেল 'বাহ্যবস্তু,' টেনে মার কুম্।
পেট্ পুরে মাছ খেয়ে, কসে মার ঘুম॥*

স্মরণ করিয়া অনেকেই ঈশ্বরচন্দ্রকে অক্ষয়কুমারের বিরোধী মনে করিয়া থাকেন; সেটি ভুল। অক্ষয়কুমারকে গুপ্তকবি বড় ভাল বাসিতেন। অক্ষয়-কুমারের দারুণ শিরোরোগ হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন "আমি যাঁহাকে অগ্রে শিষ্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া এইক্ষণে গুরু বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা করি, এই মানসিক শ্রমের অধীন হইয়া, সেই অক্ষয়ের দৈনিকবল অক্ষয় হইতে পারিল না।"

ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারকে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত করিয়া দেন; তাহার পর বৎসর ১২৪৭ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। দত্তজ এই পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক হন। এক বৎসরের মধ্যেই ১৪ টাকা মাসিক বেতন হয়। এই সময়ে ইনি একখানি ভূগোল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১২৪৯ সালে অক্ষয়কুমার টাকী নিবাসী প্রসন্ন কুমার ঘোষের সহিত মিলিত হইয়া 'বিদ্যাদর্শন' মাসিকপত্র প্রচার করেন। উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১২৫০ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবেড়িয়ায় উঠিয়া গেল, অক্ষয়কুমার কলিকাতা ছাড়িয়া মফস্বলে যাইতে স্বীকার করিলেন না, সুতরাং তাঁহার কর্ম্ম গেল। ঈশ্বরগুপ্ত অক্ষয় বাবুকে টাকীর চৌধুরীবাবুদের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। তাঁহাদের বরাহনগরের বাটিতে প্রতিষ্ঠিত নীতিতরঙ্গিনী সভাতে অক্ষয়কুমার মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ পাঠ করিতেন।

---

* ইহার অর্থ;—অক্ষয়কুমার দত্তের বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থ (অসার,) ছিঁড়িয়া ফেল; যে কুম্ব সাহেবের গ্রন্থ (Combe's Constitution of Man) হইতে উহা গৃহীত, তাহাও টানিয়া ফেলিয়া দাও। বাহ্যবস্তু গ্রন্থে আমিষ ভক্ষণ ও অতিনিদ্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা শুনিও না, আচ্ছা করে মাছ খাইয়া, দিব্য করে ঘুম দাও।

পাঠশালা উঠিয়া যাওয়ার কয়েক মাস পরেই অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে, ১২৫০ সালের ভাদ্রমাসে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হইল। অক্ষয় কুমার প্রথম প্রথম মধ্যে মধ্যে অ, কু, দ, নাম দিয়া ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। শ্রেয় ও প্রেয় দুই ভগিনীর শাস্ত্রোক্ত গল্প এই সময়েই লেখেন। দুই বৎসরের পর অক্ষয় কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হইলেন। ইহার পরের দশবৎসর কাল, নবমুঞ্জরিতা ওজস্বিনী বঙ্গভাষা,—বিবিধতত্ত্বে সমৃদ্ধি-শালিনী তত্ত্ববোধিনী, এবং সাহিত্য পরিপালনে ব্রতী অক্ষয়কুমার দত্ত,—এই তিনটি প্রায় একই পদার্থ বলিলেই চলে। একের জীবনী জানিলেই; সেই দশবৎসর কালের তিনের জীবনী জানা হয়।

এই দশবৎসর কাল অক্ষয়কুমার অগাধ এবং অকাতর পরিশ্রম করিয়া, ইয়ুরোপের প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতি এবং ভারতের প্রত্নতত্ত্ব আলোড়িত করিয়া, সামান্য অসামান্য সকলরূপ রত্নোদ্ধার করত, তত্ত্ববোধিনীকে বিবিধ ভূষায় ভূষিত, এবং উজ্জ্বলীকৃত করিতে লাগিলেন। এইসময়ে তরুণ কিশোর-পাঠ্য চারুপাঠের, যুবক-প্রৌঢ়-পাঠ্য ধর্ম্মনীতির ও বাহ্যবস্তুর এবং প্রত্ন-প্রিয়-পণ্ডিত পাঠ্য ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থের "ভ্রূণ-তত্ত্ববোধিনী গর্ভে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।* তেমন দক্ষ, ব্রত-পরায়ণ, নিষ্ঠাবান্, শ্রম-সুখী প্রতিপালকের উপর তরুণ বঙ্গ-গদ্যের লালনের ভার না পড়িলে, আজি আমাদের কি দুর্দিশাই না হইত!

এই সময়ে সুধীরঞ্জনে দ্বারকানাথ অধিকারী বঙ্গভাষার মুখে, এইরূপ উক্তি বলাইয়াছিলেন।

"কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয়কুমার॥
তাহার বাসনা সবে পুনিশ্বাসে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়॥"

আমি অক্ষয়কুমার পাইয়াছি. কালে আর আমার ক্ষয় করিতে পারিবে না, বঙ্গভাষার এই ভবিষ্যদ্বাণী—বাস্তবিক সার্থক হইয়াছে।

১২৫৮	সালের	মাঘমাসে	বাহ্য	বস্তুর	প্রথমভাগ;
১২৫৯	,,	,,	,,	,,	দ্বিতীয়ভাগ;

* নবজীবনের সূচনা।

১২৫৮ সালের শ্রাবণমাসে চারুপাঠের প্রথমভাগ;
১২৬১ " " " " দ্বিতীয়ভাগ;
১২৬৩ " " " পদার্থবিদ্যা;
১২৭০ সালে চারুপাঠের তৃতীয়ভাগ;
১২৭১ সালে ভারতবর্ষীয়উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথমভাগ;
১২৮৩ সালের মাঘ মাসে ধর্ম্মনীতি;
১২৮৯ " চৈত্র " উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগ;
প্রচারিত হয়।

সন ১২৬২ সালে কলিকাতার নর্ম্মাল স্কুল সংস্থাপিত হইল; অক্ষয়কুমার দত্ত প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কাজেই তত্ত্ববোধিনীর গুরুভার হইতে ইঁহাকে অবসৃত হইতে হইল, কিন্তু যতদিন ইনি সুস্থকায় ছিলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ইঁহার স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দুরূহ সম্পাদকতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইনি মেডিকেল কলেজে গমন করিয়া প্রথম বর্ষে রসায়ন ও দ্বিতীয় বর্ষে উদ্ভিদ্বিদ্যার উপদেশ শ্রবণ করেন।" পরে, ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষার এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার রীতিমত অনুশীলন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন দৈবদুর্বিপাক উপস্থিত হয়। "১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পরে একদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কালে তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অত্যধিক দুর্ব্বল হইয়া একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। • • • • পরে ইঁহার আত্মীয় লোকেরা * • • • নানারূপ শুশ্রূষা দ্বারা ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। দুই দিবস পরে, তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বসিয়া কোন প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে ইঁহার মস্তকে এমন একরূপ জ্বালা উপস্থিত হইল, যে, তাহাতে ইনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, ইঁহার এক উৎকট রোগের সৃষ্টি হইয়াছে।"

ক্রমেই রোগের বৃদ্ধি হইতে থাকে; ধর্ম্মনীতি প্রকাশের সময় শেষ প্রুফ্ দেখিতে পারেন নাই। ক্রমে এমন হইল, যে অক্ষয়কুমার আর বিশেষ শীতল সময় না হইলে, কোন একটি বিষয়ে দুই মিনিট কালও আর চিন্তা করিতে পারিতেন না। দত্তজ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—"সকল বাসনাই নির্ম্মূল হইল! অঙ্কুরেই আঘাত ঘটিল! আমার হৃদয়স্থ পুষ্পোদ্যানটি একবারেই শুষ্ক হইয়া গেল।" অহো! কি দুঃখ।

এই জীবন্মৃত অবস্থায় অক্ষয়কুমার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। সে এক অসাধ্য সাধনা।

"মনোমধ্যে কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, তাহার চিন্তন ও আন্দোলনেও কষ্ট, নিজে দূরে থাকুক, অন্যদ্বারা তাহা লিপিবদ্ধ করাইতেও কষ্ট, এবং যে পর্যান্ত লিপিবদ্ধ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা নিবারণ উদ্দেশেই লিপিবদ্ধ করাইতে হইয়াছে এবং ইহাতেই অতীব অল্পে অল্পে পুস্তকখানি একরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। * * * * * * * এইরূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পংক্তি কখন দুই চারি পংক্তি, কখন বা দুই চারিটি বা দুই একটি শব্দমাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিক বিরচিত হয়। * * * * * কোন্ বাক্যটি কোন্ স্থানে, বা কোন্ বাক্যের পর বিনিবেশিত হইবে, উক্তরূপ লিপিবদ্ধ করাইবার সময়, তাহা কিছুই স্থির থাক না। সে সমুদায় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা হয়, সেই দিনেই বিভ্রাট্। পূর্ব্বোক্তরূপে, শরীরের অবস্থানুসারে, দিন বিশেষে ও সময় বিশেষে তদর্থ ঔষধ বিশেষ সেবন ও অন্য অন্য নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া—বহুকষ্টে সেটি কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি।*

আপনরা অধ্যবসায়ে—পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘন, স্পর্শজ্ঞানে—অন্ধের বর্ণপরীক্ষা, মানস বলে—অশক্তবাহু মানবের অশ্বারোহণে নিপুণতা প্রভৃতি অনেক অলৌকিক সাধনার কথা শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু এরূপ পীড়িত মস্তিষ্ক মানবের এরূপ মস্তিষ্ক-ব্যায়াম আর কখন শুনিয়াছেন কি? তাহাতেই বলিতেছিলাম অক্ষয়কুমারের সেই এক অসাধ্য সাধনা। তাই কি দুই একটি প্রবন্ধ? না এক আধটি গল্প? বেদ বেদান্ত,—দর্শন উপনিষৎ—পুরাণ ইতিহাস,—তন্ত্র, সেন্দ,—প্রভৃতি হইতে নানা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, বিচিত্র গাবেষণাপূর্ণ ৬১৩ পৃষ্ঠা পরিমিত বৃহৎ এক গ্রন্থ প্রকাশ। সেই গ্রন্থের সম্যক পরিচয় দিতে আমরা পারিলাম না; তোমাদিগকে অনুরোধ করি, তোমরা একবার বিকৃত মস্তিষ্কের মস্তিষ্ক ব্যায়াম পরীক্ষা করিও; পাঠ করিলে, আমাদের আত্মভক্তি হয়; আমরা বুঝিতে পারি, বাঙ্গালি অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

দারুণ শিরোরোগে অভিভূত হইয়া, অক্ষয়কুমার কিছু কাল পরে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বালীগ্রামে গিয়া বাস করেন। সেই বাড়ীটি আমরা

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকা।

দেখিয়াছি, ক্ষুদ্র একটি উদ্যান মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দ্বিতল ভবন; কিন্তু সেও এক অদ্ভুত কাণ্ড; কোন সহৃদয় ব্যক্তি সেই উদ্যানটি দেখিয়া বলেন, এইখানি চতুর্থ ভাগ চারুপাঠ; বাস্তবিক চারুপাঠই বটে। নানাবিধ দেশী বিদেশী, পার্ব্বতীয় সাগর-তটস্থ তরু, লতা, গুল্ম, বল্লরী সেখানে বৈজ্ঞানিক পর্য্যায়ে পাশাপাশি কাছাকাছি রোপিত; অথচ কেমন এক অপূর্ব্ব করিতে, শ্যামল সৌন্দর্য্যে, সরস মাধুর্য্যে—সমস্তই মণ্ডিত। এলা, লবঙ্গ, দারুচিনী, মরিচ কর্পূর, হিঙ্গু, সাগু, ভূর্জ্জপত্র—কত গাছই সেখানে আছে; আবার কোথাও একটি লতা-বিতান, কোথাও একটি তরুকুঞ্জ, কোথাও শস্পশয্যা, কোথাও পুষ্প বাটিকা। যেন এগজিবিশনের জন্য জীবন্ত তরুলতার সংগ্রহ হইয়াছে; যেন উদ্ভিদের অক্ষর যোজনা করিয়া স্বভাবের একখানি মহাকাব্য রচিয়াছে; যেন কোন মহাঘটক বিজ্ঞানে কবিতায় বিবাহ দিয়া স্বভাবের একটি নিভৃত বাসর ঘরে নব-দম্পতীকে বসাইয়া দিয়াছে।

এই উদ্যানমধ্যস্ত দ্বিতল ভবনে অক্ষয় কুমারের বসিবার ঘরটি—কি বলিব? বলি—পঞ্চমভাগ চারুপাঠ। উদ্যানে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা মূর্ত্তিমতী, গৃহে সাঙ্গোপাঙ্গ ভূতত্ত্বজ্ঞান জাজ্বল্যমান্। নানাবিধ শঙ্খ শম্বুক, প্রবাল পঞ্জর, প্রস্তর পুঞ্জ, জীব-কঙ্কাল, ধাতু-নিঃস্রব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা মত চারিদিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে; আর উপর হইতে নিউটন, হক্সলি, ডারউইন, মিল, মহাত্মা রামমোহন রায়কে মধ্যবর্ত্তী করিয়া এই সকল অদ্ভুত সজ্জা এক দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। চারিদিকে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক মাণচিত্র। একখানি চিত্রপটে চিত্রিত আছে;—

অফ্‌সোস্‌কে দিল্‌কো কংবল খিল্‌নে ন পায়া।
কোয়ি দিনকে চলে যাতেহেঁ মাটীকে তলে হম্‌॥

আমার এই হৃদয়-পদ্ম বিকসিত হইতে পাইল না, এইটি মনস্তাপের বিষয়। কিছু দিনের মধ্যেই আমি ধূলিসাৎ হইতে চলিলাম।

সেইদিন আসিয়াছে; ভাগীরথীর সমীপস্থ ঐ নিভৃত নিবাসে, বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ—বৃহস্পতিবার, রাত্রি তৃতীয় প্রহর গতে, অক্ষয়কুমার তাঁহার তেজীয়ান জীবনের শেষ দশায় নিস্তেজ লীলা সম্বরণ করিয়াছেন! তাঁহার সেই নিদারুণ কষ্টের অবসান হইয়াছে—আহ্লাদের কথা। আর আমরা এই লক্ষ লোক আমাদের দেশগুরু হারাইয়াছি; তিনি যত কষ্টেই থাকুন, তবুও এতদিন আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম, আরও আমরা

তাঁহাকে কখন দেখিতে পাইব না! ইহাতেই আমাদের নিদারুণ দুঃখ হইতেছে! অগো ভক্তি! তুমিও স্বার্থপরা!

অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমরা অনেকেই অনেক বিষয় শিখিয়াছি; আপনা আপনি মধ্যে সে পরিচয় আর কি দিব। তাঁহার জীবনী হইতে আমাদের যাহা শিক্ষার আছে—তাহাই বলিব।

অক্ষয়কুমার পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, তেজস্বী, মনস্বী, জ্ঞানবান্, নিষ্ঠাবান্,—অক্ষয়কুমার অসাধারণ লোক, কিন্তু আমরা সকলে যে বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত, অক্ষয়কুমার অসাধারণ হইয়াও স্বয়ং সেই বিড়ম্বনার অবতার।

শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন করা, মনুষ্য মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য—এই কথা যিনি বাঙ্গালিকে বুঝাইবার জন্য, সংহিতার পর সংহিতা প্রণয়ন করিলেন, তাঁহাকেই ভগ্ন শরীরে, রুগ্ন-মানসে অর্দ্ধজীবন অতিবাহিত করিতে হইল! বৃদ্ধ বয়সে সন্তানাদির সুখকর সাহায্য যাহাতে অনায়াস লভ্য হয়, এবং পিতা মাতার কাছে সন্তানগণের বশ্যতা যাহাতে তাহাদের আশৈশব অভ্যস্ত হয়, সন্তানগণকে এইরূপ শিক্ষা দান করিতে যিনি, নানা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, বঙ্গের পিতা মাতাকে পুনঃপুনঃ উপদেশ প্রদান করেন, পারিবারিক বিঘটন ঘটনায় তিনিই অর্দ্ধমৃতজীবনে মহাবিব্রত ছিলেন. আর "সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময়ে, পরাৎপর করুণাময়, পরমেশ্বরকে সাক্ষীস্বরূপ দেখিয়া ভক্তিভরে দ্রবীভূত হইতে" যিনি আমাদিগকে শিক্ষা দান করেন, তিনিই ঈশ্বরাধনার উপযোগিতা, উপকারিতা, আনন্দ এবং উল্লাস মানিতেন না, ও জানিতেন না! তাহাতেই বলিতেছিলাম আমাদের অনেকের মত অক্ষয়কুমার বঙ্গের বিড়ম্বনার অবতার। ইহাতে যিনি মনে করিবেন, আমরা স্বর্গীয় শিক্ষাগুরুর সৎকার করিতে আসিয়া তাঁহার জ্বলন্ত চিতা সম্মুখে তদীয় অযশ কীর্ত্তন করিতেছি, তিনি বঙ্গের মর্ম্মদুঃখ কি, তাহা জানেন না। আমাদের মর্ম্মদুঃখ এই যে, আমরা নিয়ম জানি, পালন করিতে ইচ্ছুক—কিন্তু তথাপি পালন করিতে পারি না। ইহার নাম বিড়ম্বনা, ইহারেই নাম অদৃষ্ট—ইহারইনাম অক্ষয় কুমার।

অক্ষয় কুমারের তেজস্বিনী, ওজস্বিনী, মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষার বা গভীর, সুখময়, হৃদয়-প্রসারক ভাবের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। আজি কালি রাজনীতির তরঙ্গে বঙ্গদেশে উৎসারিত হইতেছে, অক্ষয় কুমারের সেই রাজ-

নৈতিকতার পরিচয় স্বরূপ তাঁহার দ্বিতীয়ভাগ উপাসক সম্প্রদায় হইতে তাঁহার

ইংলণ্ডের নিকটে আবেদন।

উদ্ধৃত হইল।

ইংলণ্ড! তুমি অক্লেশে দুঃসাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিয়াছ। বহুদূরস্থিত লক্ষ্য অনায়াসে বিদ্ধ করিয়াছ। জগজ্জনের চির-বাঞ্ছিত সম্পত্তি সুকৌশলে করস্থ করিয়াছ। বলিতে কি, তুমি অসাধ্য সাধন ও অঘটন-সংঘটন করিয়া বিশ্ব-জনের নয়ন যুগল বিস্ফারিত করিয়াছ। সমগ্র ভারত ভূমিকে একচ্ছত্রা করিয়া ভারতবর্ষীয় কবীন্দ্রগণের মনঃকল্পনা সফল করিয়াছ এবং বাল্মীকি, কালিদাস, কণাদ ওআর্য্যভট্টের স্বজাতীয়বর্গকে পদাবনত করিয়া নিজ সিংহাসন উজ্জ্বল ও উন্নত করিয়াছ। আমরা মন্ত্রণাবলে তোমাকে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া রাজমুকুট প্রদান করিয়াছি ও প্রীত মনে তোমারে ধন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া তোমার বশতাপন্ন হইয়া রহিয়াছি। একবার ভাবিয়া দেখ, কত কোটি লোকের সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভদ্রাভদ্র, মানাপমান ও এমন কি জীবন-মরণও তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তোমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্য-ক্ষয়, বল ক্ষয়, আয়ুঃ ক্ষয় ও ধর্ম্মক্ষয় ঘটিতেতেছে। তুমি অধিক বিতরণ, কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষা দান করিতে গিয়া স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ, অর্থোপার্জ্জনের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফলপুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ, বাণিজ্য-বৃত্তি প্রসারণ করিতে গিয়া, অশেষ দোষাকর দুর্ম্মূল্যতা-দোষ ও তৎসহকৃত অধর্ম্ম-বংশের বৃদ্ধি করিতেছ এবং সভ্যতা সুখের পরিচায়ক সুখ-সামগ্রী সকলের সংঘটন করিতে গিয়া ভোগাভিলাষ প্রদীপন পূর্ব্বক পাপের স্রোত প্রবল করিতেছ। ভারত-রাজ্যের আবগারি ব্যবস্থার কলঙ্কময় ফলপুঞ্জে তোমার রাজমুকুট বিরাজিত উজ্জ্বল হীরকখণ্ড সমুদায়কে গাঢ়তর কলুষ কালিমায় প্রকৃত অঙ্গারখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। ফলত তোমার, প্রজারা সচ্ছন্দে নাই। প্রায় যাবৎ জাগ্রৎ-কাল নানারূপ ক্লেশ করিয়া কষ্টেস্রেষ্টে দিনপাত করা কোটি কোটি ব্যক্তির জীবনব্রত হইয়া উঠিয়াছে। বহুতর স্থলেই দেখিতে ও শুনিতে পাই, সকলেই রুগ্ন, সকলেই বিব্রত এবং সকলেই নানা চিন্তায় চিন্তাকুল। একটু আরাম নাই, আরাম নাই,

আরাম নাই। দুর্মূল্যতা দোষ অনেকেই উচিতমত ও আবশ্যক মত আহার-সামগ্রী প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে, ধর্ম্ম-চিন্তা, ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্মনিষ্ঠা যেন একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। নর কুলের নিতান্ত আবশ্যক নিয়মিত ধর্ম্ম আলোচনা ও ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণের তো সম্পর্কই নাই। বিদ্যালয়ে অধর্ম্মের সঞ্চার, লোকালয়ে তাহার সুপ্রকাশ ও বহু বিস্তার এবং বিচারালয়ে তাহার পরীক্ষা ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। দুর্ব্বিনীত বাল্যকালের পাপ, যৌবনে পরিপক্ক হয় এবং সঙ্গের সঙ্গী হইয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। কেবল বিদ্যালয়ের কথা কেন? তাহার মাহিরেই বা কি?—ততোধিক ইতর লোকের কুব্যবহারে ভদ্র-লোকে অস্থির হইতেছে। পল্লী মধ্যেই প্রবিষ্ট হই, বা রাজপথেই ভ্রমণ করি, প্রায়ই স্বার্থ-সূচক, বিরোধ-বোধক ও ব্যসন-বিজ্ঞাপক বই অন্য শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। যাবতীয় জাগ্রত-কাল পয়সা টাকা, দর দাম আকাল আক্রা, দলিল দস্তাবেজ, সাক্ষী সাবুদ, উকিল কৌন্সিলি, কোর্ট মোক-দ্দমা, জাল জালিয়াত—এই সমস্ত অভিচার মন্ত্রাদি জপ পুরশ্চরণ করাই কি মানব কুলের পরম পুরুষার্থ হইল? ধর্ম্ম চিন্তা ও ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের অবসর ও অভিলাষ উভয়ই অন্তর্হিত হইতেছে। এই সমুদায় প্রত্যক্ষভূত বাস্তবিক ব্যাপার। ইহার অন্যথা হইবার বিষয় নাই। যে সুসভ্য বা সভ্যতাভিমানী রাজার রাজ্যতন্ত্রে মানবীয় মনের এরূপ দুরবস্থা সংঘটিত হয়, সে রাজারও কলঙ্ক, সে রাজ্যেরও কলঙ্ক, সে সভ্যতারও কলঙ্ক।—দেখিতে দেখিতে কি পরি-বর্ত্তনই ঘটিয়া উঠিল। সে বিষয়ের পূর্ব্বাপর অবস্থা পর্য্যালোচনা ও প্রদর্শন করা আমার এ নিস্তেজ মনের কার্য্য নয় তাহা করিতে হইলে, সুদীর্ঘকায় সতেজ জনসমাজের পরিবর্ত্তে মানব-নামের অযোগ্য একটি রোগজীর্ণ বামন সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গ ও তদীয় ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্ভাবনা কীর্ত্তন করিতে হয়; সুমূল্যতা সুখে সুখী, সচ্ছন্দ চিত্ত, প্রশান্ত লোকের শান্তভাব প্রকাশের পরিবর্ত্তে দুর্মূল্যতারূপ অগ্নি শিখায় চিরদগ্ধ, রাজকীয় করপুঞ্জ-ভারাক্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত, অস্থির প্রজা-মণ্ডলের হাহাকার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে হয়; গুণগ্রাহী, গুণোৎসাহী, গুণাশ্রয়, আত্ম পর-হিতৈষী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দানশীল, পূর্ব্বতম ধনি সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে—আহার্য্য-শোভানুরক্ত, বিলাস-প্রিয়, স্বকীয় স্বাস্থ্য, ও সম্পত্তি-বিনাশক। অন্য একরূপ লঘু-চেতা ধনি-সম্প্রদায়ের জীবন বৃত্তান্ত প্রণয়ন করিতে হয়; নদী তরঙ্গে নিমজ্জমান তরী-সমূহের

ন্যায় সুরা-নদীর তরঙ্গ-প্রবাহে প্রবমান ও মজ্জমান লক্ষ লক্ষ সুরাসক্ত লোকের অঙ্গভঙ্গী, মুখ-বৈকল্য এবং শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক, নিতান্ত অধঃপাতের চিত্রপট প্রস্তুত করিতে হয়; অস্থি-পঞ্জর ও চিতা ভস্ম দ্বারা বারংবার দুর্ভিক্ষ পীড়ায় প্রপীড়িত, উৎকল-দেশাদি-সমন্বিত, বর্ত্তমান ভারত রাজ্যের অত্যুন্নত কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে হয়; এবং মারিভয় সমাক্রান্ত অশ্বথ মূল বিদ্ধ বন্য তৃণাদি সমাকীর্ণ, বিষাদ চ্ছায়ায় সমাবৃত, পরিত্যক্ত গৃহসমূহের ভগ্নভাব দর্শনে শোক মুগ্ধ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া বক্ষ স্থলে করাঘাত পূর্ব্বক হাহাকার রবে নিরন্তর মাতম্ করিতে হয়। এ সমুদায়ই মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক দুরবস্থার পরিচায়ক। আহার্য্য-শোভা ও বাহ্য আড়ম্বরে কি ইহার প্রতিকার হইতে পারে? স্বাস্থ্যনাশ ও ধর্ম্মনাশের কি প্রতিশোধ আছে? উভয়ের কি ভীষণ পরিণাম! কি ভীষণ পরিণাম! ধন্য হউক ইংলণ্ড! তোমার দয়া প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের উপায় নাই। আমরা কৃপা-পাত্র; আমাদিগকে কৃপা দৃষ্টে দৃষ্টি কর, এই প্রার্থনা। আমাদের রীতিমত রোদনস্বর নির্গত করিবারও সামর্থ্য নাই। তুমি অনুসন্ধান করিয়া আমাদের বেদনা সমুদায় নিরূপণ ও নিবারণ কর। তুমি আমাদের প্রতি নির্দ্দয় নও, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তোমার বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় রাজপথ, বাষ্পীয় রথ, অপূর্ব্ব সেতু ইত্যাদি কতবস্তু ও কত ব্যাপার—সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। কিন্তু আমাদের সন্নিপাতের তৃষ্ণা। প্রদোষ কালের কিছু পূর্ব্বে কোন বিহঙ্গম সূর্য্যাভিমুখে বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে গান করিতে ছিল শুনিয়া ভাব-সিন্ধু ফরাসী গ্রন্থকার মিশ্‌লে ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত শিরোমণি কবীন্দ্র গেটির মৃত্যু-কালীন একটি কথা স্মরণ পূর্ব্বক মানব কুলের অজ্ঞান বিমোচন প্রার্থনায় বলিয়া উঠেন, "জ্যোতি! জগদীশ! আরও জ্যোতি।" সেইরূপ, ইংলণ্ড! আমরাও ঘোর রজনী সম্মুখীন দেখিয়া "দয়া! আরও দয়া" বলিয়া তোমার চরণ সন্নিধানে রোদন করিতেছি।

নবজীবন।

২য় ভাগ } আষাঢ় ১২৯৩। { ১২শ সংখ্যা।

প্রাকৃতিক প্রলয়।

প্রকৃতির বিক্ষেপ ও ব্যক্তাবস্থা হইতে সাম্য ও অব্যক্তাবস্থায় উপসংহৃত হওয়াকে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। ৩৬০০০ নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও ৩৬০০০ নৈমিত্তিক প্রলয়ের অন্তে আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত-ব্যাপী সার্ব্বভৌমিক প্রাকৃতিক ধাতুক্ষয়-নিবন্ধন অতিমহান হৈরণ্যগর্ভ-পরমায়ু অবসন্ন হইলে প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্তিম কল্পের শেষ কলিযুগের অন্তে অনাবৃষ্টি ও প্রলয়াগ্নি দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড যখন ভস্ম হইয়া যাইবে, যখন প্রচণ্ড বায়ু সহকারে মেঘ সকল শত বর্ষ বর্ষণ করিয়া সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে জলে প্লাবিত করিবে, তখন সপ্তপাতাল ও সপ্তলোক বিনষ্ট হইলে ক্রমে প্রাকৃতিক সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল লয়প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। মৃত্তিকা, জল, জ্যোতিঃ, বায়ু এবং আকাশ ক্রমে ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য মহাসূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিবে এবং সৃষ্টির বিপরীত ক্রমে ক্রমপূর্ব্বক প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থায় পরিণত হইবে। (শাঃ সূ ২।৩ ১৪) "বিপর্য্যয়েণতু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ।" উৎপত্তির বিপর্য্যয়েতে লয়ের ক্রম হয়। যেমন তেজ হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু প্রলয়কালে জল তেঁজেতে লীন হইবে। (রাঃ মোঃ রাঃ) মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রাণাদি মিলিত সূক্ষ্মদেহ সকল ভঙ্গ হইয়া ক্রমে মহত্তত্ত্বে বিলীন হইবে। মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি গুণসাম্যাবস্থায় বিলীন হইবে। কুত্রাপি গ্রাহক-মনোবুদ্ধি, করণ-ইন্দ্রিয়, এবং গ্রাহ্য বিষয়ের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। সমস্ত গিয়া পরব্রহ্মের মায়াশক্তিতে লয় প্রাপ্ত হইবে।

ব্রহ্মার ৩৬০০০ দিন অর্থাৎ ১০০ বর্ষ পরিমিত পরমায়ুতে বিষ্ণুর এক দিবা পরিকল্পিত হয়। সেই এক দিনের কাণ্ড প্রাকৃতিক সৃষ্টি, ব্রহ্মার জন্ম, ৩৬০০০ বার কল্প প্রবাহ, ৩৬০০০ বার নৈমিত্তিক প্রলয় ব্রহ্মার বিনাশ এবং প্রাকৃতিক-প্রলয়। সেই দিবাবসানে বিষ্ণুর যে রাত্রি হয় তাহাই ঐ প্রাকৃতিক প্রলয়ের কাল। তখন এই ব্রহ্মাণ্ড মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মা অবধি সমগ্র স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের সহিত বিমলা প্রকৃতিতে লয় হইয়া যায়, এবং বিমলা প্রকৃতি পরব্রহ্মশক্তিতে সাম্যাবস্থা লাভ করে। পরে যখন বিষ্ণুর দিন হয় তখন ব্রহ্মা পুনর্ব্বার জন্মেন, তাঁহার সমষ্টি-সৃষ্টি-ধাতুকে আশ্রয় পূর্ব্বক আবার চিজ্জড়াত্মক সৃষ্টি প্রকাশ পায়। এইরূপে অব্যক্ত-ব্যক্তাত্মক ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাক্রিয়া চক্র চলিতেছে। ইহা একেবারে বীজান্ত ধ্বংসও হয় না এবং একভাবেও চিরকাল থাকে না। যখন প্রকাশ পায় তখন সৃষ্টি নামে এবং যখন অপ্রকাশ হয় তখন প্রলয় নামে কথিত হয়। জগদীশ্বরের নিত্য কার্য্য-কারণ-যুক্ত, বিক্ষেপ ও আকর্ষণ শক্তি-বিশিষ্ট অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তি হইতে উহা বারবার প্রকাশ পাইয়া থাকে। সে নিত্যশক্তি বর্ত্তমান থাকিতে সৃষ্টির অত্যন্তাভাব হওয়া অসম্ভব। যেরূপ মহাপ্রলয় হইলে ভাবি সৃষ্টির বীজস্বরূপিণী ব্রাহ্মিশক্তির বিনাশ উপস্থিত হয়, তাহা সম্ভব নহে।

যদিও শাস্ত্রে নানাস্থানে আছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল, কিন্তু আচার্য্যেরা মীমাংসা করিয়াছেন "যদসচ্ছব্দেনাভিধানং তদব্যাকৃতত্বাভিধানাভিপ্রায়ং নতুঅত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ং।" শাস্ত্রে যে অসৎ শব্দের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ অব্যক্ত-সৎ, অত্যন্ত অভাব নহে। সুতরাং বীজান্ত মহাপ্রলয় নাই। জগৎনিত্য ও কল্পনিত্য বাদীগণ, বিশেষত যাঁহারা সৃষ্টিনাশ আশঙ্কা করিয়া প্রলয় স্বীকার করেন না, তাঁহারা শাস্ত্রের এই গূঢ়তাৎপর্য্যকে যুক্তিযুক্ত বোধ করিবেন। তবে যে, শাস্ত্রে নানাবিধ প্রলয় উক্ত হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক রোগ বা দীর্ঘনিদ্রা মাত্র। কেন না জগৎ যদি অনাদি অনন্ত কাল স্থায়ী হইল, তবে তাহাতে নানা প্রকারের বিপদ ও বিপ্লব সমূহ যথাঋতুতে উপস্থিত হইবেই হইবে। পরিবর্ত্তনশীল স্বভাবের লক্ষণই তাহা।

ফলত একদিকে প্রলয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, অন্যদিকে শীঘ্র প্রলয় হইবে ইহা অনুমান করা এ উভয় পক্ষই ভ্রান্ত। প্রলয় ব্যতীত

সবলা প্রকৃতি সংশোধিত হইতে পারে না, অগ্নি ও জল দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে পরিশুদ্ধ না হইলে পৃথিব্যাদি লোক সমূহের ক্ষয়শীল ধাতু পুনঃ উন্নতি শীল ও উর্ব্বরা হয় না। কালরূপী কর্ত্তা কখন কোন অণ্ডকটাহের মধ্যগত সকল গ্রহনক্ষত্র ও সর্ব্বভূতকে পরিপাক পূর্ব্বক প্রকৃতিতে লীন করিয়া দিতেছে, কখন বা কোন কটাহস্থ অণ্ড সমূহকে তাদৃশ লয়কাল ভোগান্তে পুন জাগ্রত করিয়া দিতেছে। কিন্তু কোন ব্রহ্মাণ্ডই অল্প দিনের মধ্যে নষ্ট হইতে পারে না। কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র ও ভোগস্থান সম্বলিত এক এক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যে দশ সহস্র বা শত সহস্র বর্ষে ধ্বংস হইবে এরূপ অমূলক চিন্তা কখনই ভারতীয় শাস্ত্রকার দিগের মনে উদিত হয় নাই। একটী অণ্ডকটাহের মধ্যগত কোন গ্রহ বা লোক তত্রত্য অন্যান্য গ্রহাদি থাকিতে অর্থাৎ তাদৃশ অণ্ডকটাহ ব্যাপী সর্ব্ব-সামঞ্জস্য-কর বিধি বর্ত্তমান থাকিতে কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। তাহারা সকলেই পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং প্রাকৃতিক প্রলয়ার্থ তাহাদের কাহারো অগ্রপশ্চাৎ ভোগক্ষয় হয় না। নৈমিত্তিক প্রলয় কালে স্থূলভোগের স্থান সমূহ স্থূল-প্রলয় কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইলেও অণিমাদ্যৈশ্বর্য্য ভোগের রাজ্য প্রাকৃতিক প্রলয়ের অপেক্ষা করে। সে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের নাশ শীঘ্র হইতে পারে না। পুষ্পের নাশ হইলেও তন্নির্য্যাসিত গন্ধদ্রব্যের বিনাশ শীঘ্র হয় না। স্থূল ঐশ্বর্য্য ভোগ শীঘ্র সমাপ্ত হইলেও, সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য সকল অধিক কাল ভোগ্য হইয়া থাকে। সুতরাং নৈমিত্তিক প্রলয় বার বার হইলেও. প্রাকৃতিক প্রলয় অতিদীর্ঘ কালান্তে হইয়া থাকে। সেই নৈমিত্তিক প্রলয়ও অল্প দিনে হয় না। প্রত্যেক নৈমিত্তিক সৃষ্টির সময় হইতে ৪৩২০০০০০০০ বর্ষ কাল গত হইয়া গেলে তবে নৈমিত্তিক প্রলয় হয়। যখন এই দীর্ঘকাল বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পারি না, তখন তদপেক্ষা ৭২০০০ গুণ অধিক প্রাকৃতিক সৃষ্টির পরমায়ু-কাল কিরূপে ধারণ করিব?

আমাদের অণ্ডকটাহের অন্তর্গত অনেক গ্রহনক্ষত্রের গতি স্মরণ করিলে অনুমান হইবে যে, তাহাদের পরমায়ু এক কল্পকালের অপেক্ষা অনেক বেশী। শাস্ত্রানুসারে তাহারা কতিপয় বর্ষমাত্র স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণান্তে বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক তারা, স্ব স্ব কক্ষাতে ভ্রমণ পূর্ব্বক যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-জাগরণ-কালরূপ প্রাকৃতিক-স্থূল-ধাতু ভোগ না করিবে, ততদিন তাহারা নৈমিত্তিক প্রলয়রূপ নিদ্রাভিভূত হইবে না, এবং যতদিন পর্য্যন্ত না সুদীর্ঘ-

ব্রহ্ম-পরমায়ুরূপ প্রাকৃতিক-সূক্ষ্ম ধাতু নিঃশেষে ভোগ করিবে, ততদিন তাহারা প্রাকৃতি প্রলয়রূপ মৃত্যুর অধীন হইবে না ; এই অণ্ডকটাহের মধ্যে এমন সকল নক্ষত্র আছে যে তাহারা স্বীয় কক্ষাকে একবার পরিভ্রমণ করিতে সহস্রাধিক কল্পকাল গত হইয়া যায়। তাদৃশ বহুসংখ্যক কল্পকালই তাহাদের স্ব স্ব মাপে এক এক বর্ষ তুল্য। তাহারা আপাতত অচলতারা শব্দে কথিত হয়, কিন্তু বস্তুত সচল। এখান হইতে তাহাদের গতি চর্ম্মচক্ষুর গোচর হয় না, বা হইলেও বড় মন্দগতি অনুভূত হয়। কিন্তু বস্তুত তাহারা মহাবেগবান। তাহাদের বেগ এবং কক্ষাক্ষেত্র মনেতে ধারণ হয় না। তাহারা মানব মাপের ৫।৬ সহস্র কল্পকালের মধ্যে স্বীয় মাপে এক এক বর্ষ পরিক্রম করে। যদি তাহাদিগকে স্বীয় পরিমাপে ৬.৭ সহস্র বর্ষ পরিক্রম করান যায়, তাহা হইলেই প্রাকৃতির সৃষ্টির পরমায়ুভুক্ত ৩৬০০০ কল্পকালকে সমাপ্ত করিবে। অতএব আমাদের অণ্ডকটাহের মধ্যে এমত সকল দীর্ঘ-কক্ষা-সেবী মহাপরমায়ু-ধর গ্রহ নক্ষত্র থাকিতে অল্পদিনের মধ্যে বা এই কলিযুগের অবসানে যে প্রলয় হইবে, এমত আশঙ্কাই হইতে পারে না। তাদৃশ আশঙ্কারূপ রোগের পক্ষে ঋষিগণের সুদীর্ঘ অঙ্কপাতই ঔষধ স্বরূপ। এই অঙ্ককে স্মরণপূর্ব্বক জগৎকে নিত্য বল, তাহাতে ক্ষতি নাই, আবার এত দীর্ঘ পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি-স্রোতে ভাসিয়া কেবল যাতায়াত করিব এই চিন্তাপূর্ব্বক যদি বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা একেবারেই মায়াময়ী প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে পার, তাহাও তোমার অত্যন্ত মঙ্গলকর।

বাইবেল মতে এই পৃথিবী ৫৮৮৭ বর্ষ পরমায়ু ভোগ করিয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। উক্ত ৫৮৮৭ বর্ষের মধ্যে প্রথম ১৭০৪ বর্ষ নুঃপয়গম্বরের জল প্লাবনের পূর্ব্ববর্ত্তী। অবশিষ্ট ৪১৮৩ বর্ষ তাহার পরবর্ত্তী। যাঁহারা উক্তরূপ ৫৮০৭ বর্ষমাত্র সৃষ্টির গতাব্দা স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রায় কলিগতাব্দাকেই সৃষ্টিগতাব্দা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। যাহাই হউক ঐ প্রকার অল্প সংখ্যক সৃষ্টিগতাব্দা-বাদী ব্যক্তিরা ইহা তো স্বীকার করিতেছেন যে, সৃষ্টি হইয়া অবধি পৃথিবী এ যাবৎকাল স্বীয়মাপে ৫৮৮৭ বর্ষ অথবা প্রায় ৬০০০ বার স্বীয় কক্ষাকে পরিক্রম করিয়াছে। যখন পৃথিবীকে ৬০০০ বর্ষ স্বীয় কক্ষাতে পরিভ্রমণ করিতে দিলেন, তখন সেই সৌর-জগতের অন্যান্য গ্রহনক্ষত্র গুলিকে কি অন্তত স্ব স্বমাপে তৎপরিমিতকাল স্ব স্ব কক্ষা পরিক্রম করিতে দিবেন না? তাহারা কি জগতে দেখা দিয়াই

লুপ্ত হইবে ? 'অর্কতর' নামে একটি তারা আছে। সেটি ১৮০০ মানবীয় বর্ষে রাশিচক্রের ৩৬০ অংশের একাংশ গমন করে। সুতরাং তাহার একবার কক্ষা পরিক্রমে ৬,৪৮০০০ মানবীয় বর্ষ বিগত হয়। সেই সুদীর্ঘ কালই তাহার এক বর্ষ। যদি তাহাকে ৬০০০ বা ৭০০০ বার রাশিচক্রে ভ্রমণ করান যায় অর্থাৎ যদি তাহার স্বীয় পরিমিত ৬০০০ বা ৭০০০ বর্ষকাল সৃষ্টিভোগ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে মানবীয় ৩৮৮৮০০০০০০০ অথবা ৪৫৩৬০০০০০০০ বর্ষ প্রয়োজন হইবে। ফলত কল্পকালের সংখ্যা প্রায় তত্তুল্য। তাহা মানবীয় ৪৩২০০০০০০০ বর্ষ। সুতরাং উক্ত তারার অপেক্ষা দূর-কক্ষা-পরিক্রমী যে সকল তারা আপাতত অচল বলিয়া বোধ হয় এবং বহু সংখ্যক কল্পকালে যাহাদের পরিক্রম একবার মাত্র সমাধা হয় তাহারা যদি ঐরূপে স্বীয়মাণে ৬০০০ বা ৭০০০ বর্ষ যাবৎ স্বস্ব কক্ষায় ভ্রমণ করে তাহা হইলেই ৩৬০০০ কল্পকাল গত হইয়া প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময়কে স্পর্শ করিবে। অতএব সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যাইতেছে যে, সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অথবা তদুপহিত বিধাতার পরমায়ু বলিয়া ঋষিরা যোগবলে যে ৩৬০০০ সংখ্যক কল্পের ও তত্তুল্য সংখ্যক নৈমিত্তিক প্রলয়ের সংখ্যাপাত করিয়াছেন, তাহা অসম্ভব নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অণ্ডকটাহের মধ্যে একটি নক্ষত্রেরও সূক্ষ্ম-প্রাকৃতিক-ভোগকাল অবশিষ্ট থাকিবে, ততদিন তন্মধ্য-ভুক্ত কোন গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রাকৃতিক-প্রলয় উপস্থিত হইবে না। কেন না তাহাদের সকলের মধ্যে সাধারণত সমষ্টি ভাবে, যে প্রকৃতি ও বিধি বর্ত্তমান থাকে উক্ত ৩৬০০০ কল্প ও ৩৬০০০ নৈমিত্তিক প্রলয়ের অন্তে নিঃশেষে তাহার ভোগক্ষয় হইলেই একেবারে বিধিরূপ মহত্তত্ত্বাদিক্রমে সকলেই প্রাকৃতিক প্রলয়-কবলে কবলিত হইবে।

প্রকৃতির সূক্ষ্ম প্রপঞ্চগত যে সকল উৎকৃষ্ট ধাতু তাহারই ভোগক্ষয় হওয়াতে প্রাকৃতিক-প্রলয় ঘটে। সুতরাং সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য ভোগের স্থান স্বরূপ ব্রহ্ম-ভুবন চতুষ্টয় কেবল তাদৃশ প্রলয়েই লীন হয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ের প্রকৃতির কেবল স্থূলধাতু সমূহের ভোগক্ষয় হওয়াতে স্থূল ভোগ স্থান স্বরূপ পৃথিব্যাদি ত্রৈলোক্যের প্রলয় হয় মাত্র, তৎকালে যোগধাম স্বরূপ ব্রহ্ম-ভুবন সমূহ অনাহত থাকে. কিন্তু প্রাকৃতিক প্রলয়ে ভোগৈশ্বর্য্য ও যোগৈশ্বর্য্য উভয়ই বিনষ্ট হইয়া সার্ব্বভৌমিক ভূত সংপ্লব সংঘটিত হয়। প্রকৃতির সূক্ষ্মধাতু ও যোগৈশ্বর্য্যরূপী পরিণামও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ভোগ্যবস্তু এবং যোগীগণও এক

প্রকার ভোগী। ভোগমাত্রেই ক্ষয় আছে। সুতরাং প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রকৃতির সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব সূক্ষ্মভোগী, সূক্ষ্মভোগ, যোগপ্রভাব প্রভৃতি সমুদয়ই লয় প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক প্রলয় কালে সমস্ত সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যও সমস্ত ভেদজাত সমলা প্রকৃতির তমঃ প্রধান বিক্ষেপ শক্তিতে উপসংহৃত হইলে সামান্য রাত্রি হইতে ভিন্ন এক মহাঘোরা কালরজনীর আকার ধারণ করিবে। সৃষ্টির বীজ স্বরূপিণী সেই প্রকৃতি তমঃ প্রভাবে নিশ্চেষ্ট থাকিবে। সূর্য্যচন্দ্রতারাগণ প্রকৃতির আদিম সূক্ষ্মধাতুতে বিলীন হইবে। ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব রূপ মহত্তত্ত্ব বা ব্রহ্মার বিরাম বা মৃত্যু উপস্থিত হইবে। আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত যাবন্ত ভূত লয় প্রাপ্ত হইবে। তখন ভৌতিক প্রকৃতিও যেমন সমলা প্রকৃতির তমোগুণে বিলীন হইবে, মানসিক প্রকৃতিও সেইরূপ তাহাতে বিলীন হইবে। তাহার কারণ এই যে সমলা প্রকৃতির তদুভয়েরই উপাদান। প্রকৃতির যে মূল অংশ সৃষ্টিকার্য্যে পরিণত হয় নাই তাহা মূল প্রকৃতি শব্দের বাচ্য। সেই মূলপ্রকৃতি বিমলা ও শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা। মহাপ্রলয়ে সমলা প্রকৃতি ক্ষয়প্রাপ্ত ভৌতিক ধাতু ও মানসিক ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত উক্ত বিমলা মূল প্রকৃতিতে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐশিনিয়মাধীন দীর্ঘনিদ্রাসূত্রে সংশোধিতা হয়। এই প্রলয়রূপিণী রজনী বা প্রাকৃতিক নিদ্রাকালকে শাস্ত্রে বৈষ্ণবীরাত্রি, যোগনিদ্রা, প্রভৃতি শব্দে কহেন। সেই কালযামিনীর স্থিতিকালের পরিমাণ উক্ত হয় নাই, কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে তাহার অবসানে পুনঃসৃষ্টি হইয়া থাকে।

প্রলয়ের অর্থ চিরবিনাশ নহে। 'প্রত্যুত সর্ব্বক্লেশ নিবর্ত্তকত্বাৎ' নিদ্রাতে যেমন সর্ব্বক্লেশ নিবৃত্ত হইয়া দেহ ও মন প্রকৃতিস্থ হয় প্রলয়ের সেইরূপ সার্ব্বভৌমিক, জৈবিক ও ভৌতিক প্রকৃতি সংশোধিত হইয়া নবতর জীবন লাভ করে। ধরণী, চন্দ্র, সূর্য্য, তারাগণ পুন নব অনুরাগে বিরাজমান হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই মঙ্গলকর ফলচতুষ্টয় জীব কর্ত্তৃক নব উৎসাহে সাধিত হয়।

শ্রীচন্দ্র শেখর বসু।

রথ যাত্রা।

জয় জগন্নাথ।' কি মহান্ আজ
আকাশ ভাঙ্গিয়া উঠে গণ্ডগোল,
কিছুই শুনি না বজ্র ভয়ঙ্কর—
গর্জ্জে যে বেলায় সাগর কল্লোল! ১

মহান্ জলধি বিশাল প্রবাহ
মহাজল স্রোত পরাভব করি,
দর্পের উপরে মহাদর্পে যেন
উঠিছে তরঙ্গ তরঙ্গ উপরি। ২

ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্রেমের প্রবাহে
জীবন্ত জীবনে বহিছে হৃদয়,
আনন্দ তরঙ্গে উঠিছে কল্লোল,
'জয় জগন্নাথ জয় জয় জয়!'

ভারত শ্রীক্ষেত্র মহাপুণ্য স্থান,
নাহিক দ্বিতীয় পৃথিবীতে তার,
হেন সাম্যভাব—এ হেন মিলন—
মহা জাতীয়তা—অনন্ত উদার!

ত্রিভুবনে নাই হেন তীর্থ স্থান
বড় অহঙ্কার ভারত রে!
বড় অহঙ্কার জননী আমার
তুই পুণ্যময়ী ভারত রে!

বড় অহঙ্কারে মাতিল হৃদয়
বড় অহঙ্কারে হইনু বিহ্বল,
বড়ই আহ্লাদে নাচিছে ধমনী,
বড়ই আহ্লাদে পরাণ পাগল! ৬

যদিও জনম হয়নি সফল
নিরখি সে দিব্য মহা পুণ্যস্থান,
তবু অহঙ্কারে,তথাপি আহ্লাদে
করিছে কল্পনা উদাস পরাণ! ৭

দেখি যেন আজ সাক্ষাতে সে দৃশ্য
প্রেমার্দ্র ভক্তের অশ্রু বিগলিত,
শুনি যেন আজ সাক্ষাতে সে দিব্য
অনন্ত কণ্ঠের মহান্ সঙ্গীত! ৮

কোটি কোটি হস্ত করি উত্তোলন
ডাকে উচ্চে ভক্ত 'জয় জগন্নাথ!'
ভয়ে ভয়ে যেন নীরব নিস্পন্দ
ভারত সাগর—বঙ্গীয় অখাত! ৯

মহা মহোৎসবে, আনন্দ ভৈরবে,
বাজিছে অজস্র খোল করতাল,
ছোটে দশদিকে মত্ত প্রতিধ্বনি
ভীমা ভয়ঙ্করী বিরাট বিশাল! ১০

ভীম ভূমি-কম্পে কাঁপিছে মেদিনী
টল টল টল ভক্ত পদভরে,
আকাশে কাঁপিছে শুক্র সোম শনি
গ্রহ উপগ্রহ সভয় অন্তরে! ১১

মহা মহোৎসব মহাতীর্থ স্থানে
পৃথিবীতে হেন দ্বিতীয় নাই,
পবিত্র ভারত জননী আমার
এ সুখ রাখিতে নাহি রে ঠাঁই! ১২

চীৎকার ঘর্ঘর গর্জ্জে রথচক্র
অই পুনরায় বধিরি শ্রবণ,
'জয় জগন্নাথ! জয় বলরাম!'
'জয়দা সুভদ্রা!' ডাকে ভক্তগণ! ১৩

দেখ নব আজি নয়ন মিলিয়া
পুনর্জ্জন্ম ভবে হইবে না আর,
দেখ রথোপরে বামন মূরতি
ইহ পরকালে পাইবে উদ্ধার! ১৪

আগ্রহে উল্লাসে দেখায় কল্পনা,—
কিন্তু দেখি হায় এ কি ভয়ানক,
হস্তপদ হীন অসমর্থ দেব!
চলিছে যে দিকে চালায় চালক। ১৫

চমকি আতঙ্কে উঠিল পরাণ,
হৃদয়ের রক্ত হইল অচল,
আশার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিল
নিরখি নয়নে আকাশ কেবল। ১৬

কালা পাহাড়ের ঘোর অত্যাচার
এতদিন পরে হইল স্মরণ,
বুঝিলাম কিসে দেবের উপরে
প্রকাশিল ক্ষুদ্র মানবে বিক্রম! ১৭

দেখিলাম যেন সাগরের ভয়ে
ব্যাকুলা হইয়ে সুভদ্রা সুন্দরী,
ভ্রাতৃ যুগলের নিয়েছে আশ্রয়,
তবু কাঁপে ভয়ে থর থর করি! ১৮

সম্মুখে সরোষে গর্জিছে জলধি
বিরাট তরঙ্গ বাহু বিস্তারিয়া,
মহা আস্ফালনে—মহাদর্পে যেন
চাহে সুভদ্রারে লইতে কাড়িয়া! ১৯

বুঝিলাম হায় কি করিয়া এত
শত্রুর গরিমা শত্রু অপমান,
কাপুরুষ প্রায় দেবতার প্রাণে
সহে জগন্নাথ, সহে বলরাম! ২০

নিরেট নির্ব্বোধ পাষণ্ড বিশাচ
ভারতেরে হায় দিতে রসাতল,
গড়ে নাই হস্ত, গড়ে নাই পদ,
কি করিতে পারে নির্ভুজ বিকল? ২১

ঝরিল নয়ন, কাঁদিল হৃদয়,
আকুল অন্তরে কহিনু ডাকিয়া,
'হে ভারতবাসী!' হে ভ্রাতৃ সক
কি ফল ও রথ টানিয়া লইয়া? ২২

কি ফল ও রথ টানিয়া লইয়া,
ও দেবে হইবে কি কার্য্য সাধন?
পারে না চলিতে, পারে না ধরিতে,
খঞ্জ পঙ্গু নিয়ে কোন্ প্রয়োজন? ২৩

দেও ও নির্ভুজে ভাসায়ে সাগরে
অথবা চিল্কার সলিল অতলে,
কিম্বা পোড়াইয়া কর ভস্মশেষ,
ধোও চিতাস্থল নয়নের জলে! ২৪

অথবা—
যদি ভ্রাতৃগণ জননীর তরে
কাঁদে তোমাদের আকুল পরাণ,
এস তবে ভুজ ছেদি অকাতরে
করি দেবতায় সকলে প্রদান! ২৫

চতুর্ভুজে শংখ চক্র গদা পদ্ম
দেব জগন্নাথ করিতা ধারণ,
আজি কোটি হস্তে কোটি অস্ত্র শস্ত্রে
করুক্ শ্রীপতি দৈত্য বিমর্দ্দন! ২৬

বিশাল বিরাট আকর্ষিয়া হল,
হলায়ুধ ধরা করুক বিদার,
পাপের ধরণী যাক্ রসাতলে,
হৌক্ দূরীভূত দৈত্য অত্যাচার! ২৭

মহাবীর্য্য-বতী সুভদ্রা সুন্দরী
উল্লাসে অশ্বের বল্গা আকর্ষিয়া,
প্রমত্ত উৎসাহে ঘোর রণাঙ্গনে,
রণরঙ্গে রথ দিক্ চালাইয়া! ২৮

সেরূপ তখন নিরখিলে ভাই!
যাবে শোক, দুঃখ, যাতনা অপার,
সেরূপ তখন নিরখিলে রথে
পুনর্জ্জন্ম ভবে হইবে না আর! ২৯

বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের ইতিহাস।

সপ্ততি বর্ষ অতীত হইল বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং তাহার ইতিহাসের আলোচনা করা, এ সময়ে, বোধ করি, অসাময়িক হইবে না। ইতিহাসটি দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, (১) আদি অবস্থা এবং (২) বর্ত্তমান অবস্থা।

কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বাঙ্গালা-ভাষার সহিত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ভাষা এবং সংবাদপত্র উভয়ের স্বার্থ এক সঙ্গে বাঁধা। সে বাঁধুনী বড় সহজ নহে। উভয়েই উভয়কে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, উভয়েই উভয়ের প্রাণ।

বলিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষার সকল অঙ্গ যথাযথরূপে সুন্দর প্রণালীতে আজিও গঠিত হয় নাই। এখনও ভাষার নবকলেবরের—নবজীবনের সময়। যে সময়ে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হয়, সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার সকল অবয়ব প্রস্তুত হয় নাই; তখন কেবল উপকরণ সংগ্রহ হইতেছিল মাত্র। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে আমাদের দেশে গদ্যময় গ্রন্থ একখানিও ছিল না,—বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সকলগুলিই কবিতায় লিখিত হইত। তখনকার লোকেরা কেবল চিঠিপত্র গদ্যে লিখিতেন। সেই চিঠিপত্রের অর্দ্ধেক সংস্কৃত এবং অর্দ্ধেক বাঙ্গালা। লেখকের ক্ষমতা থাকিলে কবিতায় চিঠি লিখিতেন। ভারতচন্দ্র রায়, নাগের অত্যাচারে যে নাগাষ্টক পত্র লেখেন, সকলেই তাহা জানেন। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশে গদ্য লিখিবার প্রথা বাহুল্যরূপে প্রচলিত হয়। সেই জন্যই বলি যে, সংবাদ পত্রের সহিত ভাষার একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সংবাদ পত্রে গদ্য লিখিবার প্রথা প্রচলিত হইলে পর, একে একে কয়খানি গদ্য গ্রন্থ প্রচার হয়।

বাঙ্গালা সংবাদ পত্র বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন জেলার ভাষা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিবিশিষ্ট ছিল, এবং এক এক শব্দ জেলা ভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে উচ্চারিত হইত। সংবাদ পত্র সেই বিভিন্নতার বিলোপ সাধন করিয়া দিয়াছে এবং দিতেছে।

সন ১২৪৩ সালে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, নিম্নের উদ্ধৃত অংশ পাঠে তাহা জানা যায় ;—

"এতদ্দেশীয় অর্থশূন্য ক্ষুণ্ণ বিদ্যার্থিবর্গের প্রতি নিতান্ত করুণাবিহীন হইয়া গবর্ণমেণ্ট যে দ্বিতীয় নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে আমরা বিবিধ বিলাপ বারিধি তরল তরঙ্গে নিমগ্ন হইলাম যেহেতু আপন গর্ব্ভোদ্ভবা ভাষা ও বিদ্যা নাম্নিকা কন্যাদ্বয়কে হারা হইলে সেই শোকে ভারতবর্ষ নিজ শোভা বিশিষ্ট যশঃ সৌরভ শীলতাদি সুচারু অলঙ্কার সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাথার প্রায় হাহাকার করিবেন।"

এই সময়ের ইংরাজির অনুবাদের একটু নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল ;—

"গবর্ণর বাহাদুরের হুজুর কৌন্সিলে এহ নির্দ্ধারিত হইল যে ইংরাজদিগের উচিত কর্ম্ম যে বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিদিগেকে ইংরাজি জ্ঞান বিদ্যা ও নীতি শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা সভ্য করেন।" †

একমাত্র সর্ব্বশেষে দাঁড়ি ভিন্ন কমা প্রভৃতি কোন চিহ্ন এ সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিতে পায় নাই।

সন ১২৫৯ সালে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা নিম্ন লিখিত কয় পংক্তি প্রকাশ করিয়া দিতেছে ;—

"গোকুলধামে বকুল কুঞ্জে মনোহর বসন্তকালের সুখময় প্রভাত সময়ে কোকিল-কুলের কুহু কুহু কীর্ত্তি কলনা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে আর কি কুৎসিৎ কাকের কর্ণ-ভেদী কঠোর কা কা শব্দ ভাল লাগে? তবে এই বঙ্গদেশে যে সকল রজদর্শী নিন্দা প্রিয় বাবু আছেন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র, কারণ সুরভী রসরসিকা রসনা তৃণরসের আস্বাদন ব্যতীত অমৃতরসে তৃপ্ত হয় না।" ‡

এতদিনের পর আমরা ভাষার মধ্যে কমা প্রভৃতি চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি এবং ভাষার অবয়বও পরিবর্ত্তিত দেখা যাইতেছে। এই সময়ে এইরূপ লেখাই অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য ছিল। এক্ষণে ইতিহাসের অনুসরণ করা যাউক। ||

* সংবাদ প্রভাকর, ২১এ অগ্রহায়ণ, ১২৪৩ সাল।

† ঐ

‡ ঐ ১লা বৈশাখ, ১২৫৯ সাল।

|| মৃত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের যে বিবরণ ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করেন, তদ্দ্বারা আমরা প্রাচীন ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের সম্পূর্ণ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি।

সাহেবদিগের কথায় আমাদিগের বড়ই বিশ্বাস। তাঁহারা আমাদিগের দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে এমন কি আমাদিগের বেদ পুরাণ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাও আমরা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেইজন্যই আমাদের দেশের কৃতবিদ্যগণেরও ধারণা যে, পাদরি সাহেবেরাই আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সংবাদ পত্র প্রচার করেন। সেটি বড় ভুল। বাঙ্গালীর দ্বারাই বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের প্রথম সৃষ্টি হয়। ১২২১ বা ১২২৩ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক একজন পণ্ডিত কলিকাতা নগরে সর্ব্বপ্রথমে "বাঙ্গালা গেজেট" নামে সংবাদ পত্র প্রচার করেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতচন্দ্র রায়ের "বিদ্যাসুন্দর" এবং 'অন্নদামঙ্গল" মুদ্রাঙ্কিত করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। "বাঙ্গালা গেজেট" অল্পকালের মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হইলেও এইখানিই আমাদিগের দেশের প্রথম সংবাদ পত্র বলিতে হইবে।

১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের পাদরি সাহেবেরা "সমাচারদর্পণ" নামে সংবাদ পত্র প্রচার করেন। প্রচারকগণ নানা কারণে সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিলে, বিখ্যাত পাদরি জন মার্সমান সম্পাদক হইয়া, বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত সমাচার-দর্পণের উন্নতি সাধন করেন। মার্সমান সাহেব "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" পত্রের সম্পাদক হইলে, তিনি ১২৪৮ সালের ২রা পৌষ শনিবার হইতে "সমাচার দর্পণ" প্রচার রহিত করিতে বাধ্য হয়েন। পরে কলিকাতা, কলুটোলা নিবাসী বাবু দীননাথ দত্তের সাহায্যে বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্সমান সাহেবের অনুমতি লইয়া কিছুকাল "সমাচার দর্পণ" পুনরায় প্রকাশ করেন। দীন বাবু প্রাণত্যাগ করিলে, "সমাচার দর্পণ" আবার উঠিয়া যায়। পরে ১২৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বিখ্যাত টাউনশেণ্ড সাহেব পুনরায় সমাচারদর্পণের জীবনদান করেন বটে, কিন্তু দুই বর্ষ পরে সেখানি একেবারে বিলুপ্ত হয়।

সন ১২২৭ সালে কলুটোলা নিবাসী বাবু তারাচাঁদ দত্ত এবং পূর্ব্বোক্ত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংবাদ কৌমুদী" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায় উক্ত পত্রে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করায়, ভবানী বাবু সম্পাদকীয়তা ত্যাগ করেন। রাজা রামমোহন রায় অগত্যা কৌমুদীর সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। যদিও তিনি ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন, কিন্তু সম্পাদক কার্য্যে

পরিচয় দান করিতেন না। রাজার মৃত্যুর তিন বা চারি বর্ষ পরে এখানি উঠিয়া যায়।

উপরোক্ত ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন ১২২৮ সালে “সমাচার চন্দ্রিকা” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। কিছু দিন পরেই রাজা রাম মোহন রায় হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে, নগর মধ্যে মহা গোল পড়িয়া যায়। নগরের হিন্দু বড় লোকেরা দল বাঁধিয়া ধর্ম্মসভা স্থাপন করেন। ভবানী চরণ সেই সভার সম্পাদক হইয়া চন্দ্রিকায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তীব্র প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই সময়ে চন্দ্রিকার প্রাধান্য বিশেষ রূপে বিস্তৃত হয়, এমন কি ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের এতদূর প্রতিপত্তি ও গ্রাহক ছিল না। ১২৫৪ সালের ৩রা ফাল্গুন রবিবারে ভবানী বাবু প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিকা চালাইতে থাকেন। কিন্তু ঋণ জালে জড়িত হওয়ায় কয়েক বর্ষ পরে চন্দ্রিকা প্রকাশ রহিত হয়। কয়েকবর্ষ পরে পুনরায় নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, সমাচার চন্দ্রিকা আজি পর্য্যন্ত জীবিতা আছে। চন্দ্রিকা প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশ হইত; এক্ষণে প্রাত্যহিক হইয়াছে, এবং কলেবরও বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু চন্দ্রিকার আর সে স্নিগ্ধ জ্যোতি নাই। বাঙ্গালায় যত সংবাদ পত্র আছে, তন্মধ্যে এই সমাচার চন্দ্রিকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

চন্দ্রিকা প্রকাশের পর মৃজাপুর নিবাসী কৃষ্ণমোহন দাস “সংবাদ তিমির নাশক” নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। প্রকাশকের রচনা শক্তি ছিল না, কতিপয় যোগ্য লেখক লিখিতেন। কয়েক বর্ষ পরে এখানি উঠিয়া যায়।

বর্ত্তমানে মহারাজ, রাজা, রায়বাহাদুর প্রভৃতি দেশের বড় লোকেরা বাঙ্গালা লেখা পড়ার চর্চ্চা করা দূরে থাক, বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পাঠও করেন না, কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে বাঙ্গালী বড় লোকেরা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা নিজেও লিখিতেন এবং অর্থব্যয় করিয়া সংবাদ পত্রের উন্নতি করণে যত্নবান হইতেন। “তিমির নাশক” প্রকাশ হইবার পর রাজা রাম মোহন রায়, বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর, এবং বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের উদ্যোগে “বঙ্গদূত” নামক সংবাদ পত্রের জন্ম হয়। উক্ত তিনজনেই দেশের মস্তক

স্বরূপ ছিলেন। ইহার সম্পাদন ভারও সেইমত সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্রের হস্তে অর্পণ করা হয়। এ সময়ে নিমক বোর্ডের দেওয়ানি পদই বাঙ্গালীর প্রাপ্য সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বাপেক্ষা মান্যের পদ ছিল। স্বনাম খ্যাত বাবু নীলরত্ন হালদার সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই বঙ্গদূতের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। নীলরত্ন বাবু সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, লাটীন, এবং গ্রীক ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তিও বিলক্ষণ ছিল। ইনি "শ্রুতিগান রত্ন" "পার্ব্বতী গীত রত্ন", "কবিতা রত্নাকর", "বহুদর্শন" এবং "সর্ব্বামোদ তরঙ্গিনী" নামে কয়খানি গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "বহু দর্শন" খানি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, লাটীন, এবং আরবী ভাষায় লিখিত। ইঁহার রচিত অনেকগুলি সংস্কৃত গীত আজিও কোন কোন কথকের মুখে শুনা যায়। ইঁহার দ্বারা বঙ্গদূতের গৌরব অচিরেই সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সৃষ্টি অবধি এরূপ কোন যোগ্য ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েন নাই। নীলরত্ন বাবু, বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ততা জন্য অবকাশাভাবে উক্ত পদ ত্যাগ করিলে, কাঁসারী পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেন "বঙ্গদূত" সম্পাদন করেন। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রায় নামক একব্যক্তি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু নীলরত্ন বাবু ইহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলে, দূত একবারে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। শেষ ১২৪৬ সালে অদৃশ্য হয়।

সন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ শুক্রবার সংবাদ প্রভাকরের জন্ম হয়। পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী বাবু গোপী মোহন ঠাকুরের পৌত্র, বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর সংবাদ প্রভাকর প্রকাশের প্রধান উদ্যোগী। তাঁহারই উৎসাহে এবং ব্যয়ে বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়া, অতি অল্প বয়সেই দক্ষতার সহিত সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্র মোহন বাবু প্রাণ-ত্যাগ করিলে, ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত অগত্যা সহায্যাভাবে প্রভাকর প্রচার করিতে ক্ষান্ত হয়েন কিন্তু এই বর্ষেই "সংবাদরত্নাবলী" নামে একখানি নূতন সংবাদ পত্র প্রকাশ হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি কিছু দিন পরে উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া কটকে চলিয়া যান। তথা হইতে ১২৪৩ সালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় পরিশ্রম এবং অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করিয়া, উক্ত সালের ২৭এ শ্রাবণ হইতে পুনর্ব্বার

স্বাধীনভাবে সংবাদ প্রভাকর প্রকাশারম্ভ করেন। এই সময়ে প্রভাকর সপ্তাহে তিন দিন করিয়া প্রকাশ হইত। পরে ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় প্রভাকর প্রত্যহিক রূপে প্রচার হয়। এই সংবাদ প্রভাকরই আমাদিগের দেশের সর্ব্ব প্রথম প্রাত্যহিক পত্র।

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সময় হইতেই বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের যুগান্তর উপস্থিত হয়। ঈশ্বর চন্দ্রের কবিত্ব শক্তি বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার সেই শক্তি যতই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, প্রভাকরও সেই সঙ্গে সঙ্গে কেবল কলিকাতা বা উপনগর নহে, সমস্ত বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্বীয় প্রাবল্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। ইতিপূর্ব্বে যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল, সেগুলি কেবল কলিকাতা ও নিকট-বর্ত্তী গ্রাম সমূহে পঠিত হইত মাত্র। মফস্বলের লোকেরা "বাঙ্গালা সংবাদ পত্র" শব্দটি শুনিয়াছিল, কখনও চক্ষে দেখে নাই। প্রভাকর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া, সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালী জাতির বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পাঠের আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়া দেয়। প্রভাকর পাঠ করিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ এই সময়ে এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, নগরের অনেক গ্রাহক প্রভাকর মুদ্রিত হইবার সময় যন্ত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া অগ্রে কাগজ লইবার চেষ্টা করেন এবং মফস্বলের গ্রাহকেরা ডাকের অপেক্ষা করিতে থাকেন। ১২৬০ সালে প্রভাকরের গ্রাহক পাঁচ হাজারের অধিক হয়। এই সময়ে প্রাত্যহিক প্রভাকরে মনোমত সমধিক কবিতা প্রকাশের সুবিধা না হওয়ায়, ঈশ্বরচন্দ্র একখানি স্বতন্ত্র মাসিক প্রভাকর প্রকাশ করেন। তাহার আদর আবার প্রাত্যহিক অপেক্ষা সমধিক হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। গত ৪০ বর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশে যে সকল প্রধান প্রধান কবি, উপন্যাস রচয়িতা নাটককার এবং লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ঈশ্বরচন্দ্রের একরূপ শিষ্য। বাঙ্গালা ভাষা চর্চার জন্য যাহাতে সাধারণের আগ্রহ জন্মে, তজ্জন্য ঈশ্বরচন্দ্র যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তাঁহারই উৎসাহে হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং ঢাকা কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণ রচনা করিতে শিক্ষা করেন এবং সেই ছাত্র মণ্ডলীর জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে একখানি স্বতন্ত্র সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিতে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে একণে তিন চারি জন

মাত্র জীবিত আছেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দেশ বিদেশে মহান্ যশ সংগ্রহ করিতেছেন।

সংবাদ প্রভাকর এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ অবয়বে প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু ইহার অবস্থা তাদৃশ প্রীতিপ্রদ নহে।

সন ১২৩৭ সাল হইতে ১২৫৯ সাল পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রগুলি প্রকাশ হয়;—

সন ১২৩৭ সাল।

নাম	প্রকাশক বা সম্পাদক	স্থিতিকাল।
"সংবাদ সুধাকর"—	প্রেমচাঁদ রায়	৪ বর্ষ।

সন ১২৩৮ সাল।

"অনুবাদিকা"—ইহাতে কেবল ইংরাজি "রিফরমার" পত্রের অনুবাদ প্রকাশ হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ২ বর্ষ।

"জ্ঞানান্বেষণ"—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি হিন্দুকলেজের প্রথম ইংরাজি শিক্ষিত ছাত্রগণ ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশ করেন— ৯ বর্ষ।

"সংবাদ রত্নাকর"—রাধানাথ পাল ১ বর্ষ।

"সমাচার সভা"—

"রাজেন্দ্র"—দুর্ল্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু একজন মুসলমানের ব্যয়ে ইহা প্রকাশ হইত। কয়েক মাস।

"শাস্ত্র প্রকাশ"—	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার (মাসিক)		১ বর্ষ।
"বিজ্ঞান সেবধি"—	গঙ্গাচরণ সেন	(ঐ)	কিছুকাল।
"জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ"—	রসিককৃষ্ণ মল্লিক	(ঐ)	ঐ
"জ্ঞানোদয়"—	রামচন্দ্র মিত্র	(ঐ)	ঐ
"পশ্বাবলী"—	ঐ	(ঐ)	ঐ

সন ১২৩৯ সাল।

"সংবাদ রত্নাবলী"—সংবাদ প্রভাকর এই সময়ে প্রচার রহিত হইলে, আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের উদ্যোগে ইহা প্রকাশ হয়, এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক হয়েন। ঈশ্বরচন্দ্র কটকে চলিয়া যাইলে, রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদক হয়েন। এই সময়ে ইহা অর্দ্ধ সাপ্তাহিক হয়।

দুই বর্ষ পরে ইহার প্রচার রহিত হইলে,১২৫২ সালে শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা প্রকাশকরেন। কিছুদিন পরে একেবারে উঠিয়া যায়। ৫ বর্ষ।

"সংবাদ সংগ্রহ"—বাহির সিমুলিয়া নিবাসী বেণীমাধব দে অন্যান্য সংবাদ পত্রের সার সংগ্রহ করিয়া ইহা প্রকাশ করেন। অল্পদিন।

সন ১২৪২ সাল।

"সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়"—প্রথমে প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশ হইত। ৪৩ সালে সাপ্তাহিক এবং কয়েক বর্ষ পরে দৈনিক হইয়া আজও জীবিত আছে। অদ্বৈত চন্দ্র আঢ্য এবং উদয় চন্দ্র আঢ্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়।

১২৪৩ সাল।

"সংবাদ সুধাসিন্ধু"—বটতলার কালীশঙ্কর দত্ত ১ বর্ষ।

১২৪৪ সাল।

"সংবাদ দিবাকর"—গঙ্গানারায়ণ বসু কয়েক মাস।

"সংবাদ গুণাকর"—গিরিশ চন্দ্র বসু ঐ

"সংবাদ সৌদামিনী—ইংরাজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় প্রকাশ হইত। কলুটোলার কালা চাঁদ দত্ত সম্পাদক ছিলেন ৩ বর্ষ।

সন ১২৪৫ সাল।

"সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী"—পার্ব্বতী চরণ দাস কর্ত্তৃক ইহা বিজ্ঞাপন হইতে সংবাদ পর্য্যন্ত কবিতায় প্রকাশ হইত; নিম্নে উক্ত পত্র হইতে কয়পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল;—

"আমাদের পত্রে যে বিজ্ঞাপন দিবে গো।
তাহার পংক্তির প্রতি মূল্য চারি আনা গো॥

"চারি ঘোড়ার গাড়ী চোড়ে গত দিন বৈকালে গো
গিয়াছেন গবনর সাহেব চাণকের বাগানে গো॥"

"কলিকালে যত সব ভাল মানুষের ছেলে গো।
লেখা পড়া শিখে কেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম মানেনা গো॥"

এখানি অতি অল্পকাল মাত্র জীবিত ছিল।

"সম্বাদ ভাস্কর"—সিমলের রাধাকৃষ্ণ মিত্রের চতুর্থ পুত্র জীবন কৃষ্ণ মিত্রের আনুকূল্যে শ্রীনাথ রায় ইহা প্রকাশ করেন। ১২৪৭ সালে গোভা-

বাজারের শ্রীযুক্ত মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের হস্তে ইহার সম্পাদন ভার অর্পণ করেন। মহারাজ নিজেও ইহাতে লিখিতেন। ১২৫৪ সালে এখানি অর্দ্ধ সাপ্তাহিক হয়; পরে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশ হইত। অনুমান ৯।১০ বর্ষ হইল এখানি উঠিয়া গিয়াছে।

"রসরাজ"—উক্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "পাষণ্ড পীড়নের" সহিত ইহার লড়াই হইত। এখানিও অনেক দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে।

"সংবাদ অরুণোদয়"—জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। কয়েক মাস।

"সংবাদ সুজন রঞ্জন"—হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়। রসরাজের সহিত এই পত্রের লড়াই চলিয়া ছিল। ৬ বর্ষ।

১২৪৬ সাল।

"গবর্ণমেণ্ট গেজেট"—গবর্ণমেণ্ট—ইহার ভাষা আজিও দুর্ব্বোধ্য রহিয়াছে। এখনও জীবিত।

১২৪৭ সাল।

"মুরশিদাবাদ পত্রিকা"—কাশীম বাজারের মহারাজ কৃষ্ণনাথ ইহা প্রকাশ করেন, এবং গুরুদয়াল চৌধুরী সম্পাদকীয়তা করেন; একবর্ষ পরে ইহা উঠিয়া যায়। বহু বর্ষ পরে পুনরায় জীবিত হইয়া আজিও সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশ হইতেছে। অবস্থা ভাল নহে।

"জ্ঞানদীপিকা"—ভগবতীচরণ বট্টোপাধ্যায় ২ বর্ষ।

১২৪৮ সাল।

"ভারতবন্ধু"—শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্প দিন।

১২৪৯ সাল।

'ভৃঙ্গদূত"—নীল কমল দাস। দেড় বর্ষ।

"বিদ্যা দর্শন"—স্বনামখ্যাত লেখক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এবং প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ ইহা প্রকাশ করেন। অর্দ্ধবর্ষ।

১২৫০ সাল।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"—আদি ব্রহ্মসমাজ দ্বারা ইহা প্রকাশ হয়। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত যতদিন ইহার সম্পাদক ছিলেন, ততদিন ইহার গৌরব ছিল। এখন বৃদ্ধ বয়সে নব রঙ্গীন বসনে তত্ত্ববোধিনী শরীর আচ্ছাদন করিলেও সে লাবণ্য আর দেখা যায় না।

১২৫১ সাল।

"সংবাদ রাজরাণী"—গঙ্গানারায়ণ বসু অল্পদিন।

"সর্ব্বরসরঞ্জিনী"—কতিপয় শিক্ষিত নব্য যুবক প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে ইহা প্রকাশ করেন। অল্পদিন।

১২৫৩ সাল।

"জগবন্ধু পত্রিকা"—সীতানাথ ঘোষ, ব্রজলাল কারফরমা এবং উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি হিন্দু কলেজের কতিপয় শিক্ষিত যুবক ইহা মাসিক প্রকাশ করেন। ২ বর্ষ।

"সত্য সঞ্চারিণী"—শ্যামাচরণ বসু দেড় বৎসর।

"পাষণ্ড পীড়ন"—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রভাকর যন্ত্রে ইহা প্রকাশ হয়। গুড়গুড়ে অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সহিত এই পত্র দ্বারা লড়াই হইত। ২ বর্ষ।

"সমাচার জ্ঞানদর্পণ"—উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ৪ বর্ষ।

"জগদ্দীপক ভাস্কর"—মৌলবী বজর আলি নামে একজন মুসলমান ইহা প্রকাশ ও সম্পাদন করেন। ইহাতে ইংরাজি, বাঙ্গালা, হিন্দি এবং পারসীক ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশ হইত। অল্পদিন।

"নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা"—নন্দকুমার কবিরত্ন ইহা পাক্ষিক রূপে প্রকাশ করেন। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকটিত হইত। ১০ বর্ষাধিক।

"জ্ঞানাঞ্জন"—চৈতন্যচরণ অধিকারী ৯ মাস।

"দুর্জ্জন দমন মহানবমী"—মথুরানাথ গুহ কিছুকাল।

১২৫৪ সাল।

"কাব্যরত্নাকর"—উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য দেড় বর্ষ।

"হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়"—হরিনারায়ণ গোস্বামী (মাসিক) ১ বর্ষ।

"রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ"—রঙ্গপুরের মৃত জমীদার কালীচন্দ্র রায়ের ব্যয়ে গুরুচরণ রায় ইহা প্রকাশ করেন। কয়েক বর্ষ।

"জ্ঞান সঞ্চারিনী"—গঙ্গানারায়ণ বসু ৩ বর্ষ।

"সংবাদ সাধুরঞ্জন"—ছাত্র মণ্ডলীর কবিতা শিক্ষার সুবিধার জন্য ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত ইহা প্রকাশ করেন। প্রায় ১৫ বর্ষ।

"দিগ্বিজয়"—দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় অল্পকাল।

"সুজনবন্ধু"—নবীনচন্দ্র দে ঐ

"হিন্দুবন্ধু"—উমাচরণ ভদ্র কয়েক সপ্তাহ।

"আক্কেল গুড়ুম"—ব্রজনাথ বসু ৪ মাস।

"মনোরঞ্জন"—গোপালচন্দ্র দে অল্পদিন।

সন ১২৫৫ সাল।

"কৌস্তুভ"—মহেশচন্দ্র ঘোষ অল্পদিন।

"জ্ঞানচন্দ্রোদয়"—রাধানাথ বসু ২ মাস।

"জ্ঞানরত্নাকর"—ব্রজনাথ বসু ১ বর্ষ।

"সংবাদ অরুণোদয়"—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ

"সংবাদ দিনমণি"—শম্ভুচন্দ্র মিত্র কয়েক সপ্তাহ।

"সংবাদ রত্নবর্ষণ"—মাধবচন্দ্র ঘোষ ঐ

"সংবাদ রসসাগর"—বাগবাজারের ৺ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা প্রকাশ করেন। পদ্মিনী উপাখ্যান প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫২ সালে ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়া কয়েক বর্ষ জীবিত রাখিয়াছিলেন।

"মুক্তাবলী"—কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য অল্পদিন।

সন ১২৫৬ সাল।

"বারাণসী-চন্দ্রোদয়"—উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ৩ বর্ষ।

"রসমুদ্গর"—গুড়্গুড়ের রসরাজের সহিত, লড়াই করিবার জন্য ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা প্রকাশ করেন। অল্পকাল।

"ভৈরব দণ্ড"—বারাণসীতে প্রকাশ হয়। ঐ

"রসরত্নাকর"—যদুনাথ পাল ঐ

"সজ্জনরঞ্জন"—গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ঐ

"মহাজন দর্পণ"—জয়কালী বসু কয়েক মাস।

"কৌস্তুভ কিরণ"—রাজনারায়ণ মিত্র ৩ বর্ষ।

"বর্দ্ধমান জ্ঞান প্রদায়িনী"—বর্দ্ধমানের মহারাজের ব্যয়ে প্রকাশ হয় কয়েক বর্ষ।

"সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা"—গোবিন্দচন্দ্র দে ১ সংখ্যা।

সন ১২৫৭ সাল।

"সর্ব্বশুভকরী"—মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ৩ মাস।

"সত্যপ্রদীপ"—মিঃ টাউনশেণ্ড ১ বর্ষ।

"সম্বাদ বর্দ্ধমান"—বর্দ্ধমানের মহারাজের সাহায্যে প্রকাশ হয়। কয়েক বর্ষ।

"বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়"—রামতারণ ভট্টাচার্য্য কয়েক সংখ্যা।

"সংবাদ সুধাংশু"—মৃত ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা প্রকাশ করেন। ইহাতে কেবল খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশ হইত। ১ বর্ষ।

"উপদেশক"—পাদরি টমসন কয়েক বর্ষ।

"সত্যার্ণব"—পাদরি লং সাহেব ঐ

"সংবাদ নিশাকর"—নীলকমল দাস কয়েক বর্ষ।

"ধর্ম্মকর্ম্ম প্রকাশিকা"—কোন্নগরের ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক প্রকাশ হয় কয়েক সংখ্যা।

"ভক্তিসূচক"—রামনিধি দাস অল্পদিন।

"দুর্ব্বীক্ষণিকা"—

সন ১২৫৮ সাল।

"জ্ঞানোদয়"—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কয়েক বর্ষ।

"জ্ঞানদর্শন"—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ১ সংখ্যা।

"কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা"—কাশীদাস মিত্র অল্পদিন।

"মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ"—কতিপয় ইংরাজ ঐ

"বিবিধার্থ সংগ্রহ"—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এইখানিই বাঙ্গালার প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র। কয়েক বর্ষ।

"জ্ঞানারুণোদয়"—কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার ঐ

"বিদ্যারত্ন"—তারাচরণ সিকদার অল্পদিন।

"সাম্যদণ্ড মার্ত্তণ্ড"—যুগলকিশোর শুকুল ঐ

সন ১২৫৯ সালে নিম্নলিখিত কয়খানি পত্র প্রকাশ হইয়া ঐ বর্ষেই লয়প্রাপ্ত হয়;—

শশধর, বিশ্ববিলোকন, রসসাগর এবং ধর্ম্মবাজ।

সন ১২২২ সাল হইতে সন ১২৬০ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৯৬খানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হয়। ইহার মধ্যে ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ১৯খানি পত্র জীবিত ছিল। যথা;—

দৈনিক।

(১) সংবাদ প্রভাকর, এবং (২) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।

সপ্তাহে তিনবার।

(৩) সম্বাদ ভাস্কর।

অর্দ্ধ সাপ্তাহিক।

(৪) রসরাজ, (৫) সংবাদ বিভাকর, এবং (৬) সমাচারচন্দ্রিকা।

সাপ্তাহিক।

(৭) সংবাদ সাধুরঞ্জন, (৮) রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, (৯) বর্দ্ধমান জ্ঞান প্রদায়িনী, (১০) সংবাদ বর্দ্ধমান, (১১) সম্বাদ জ্ঞানোদয়, (১২) কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা, এবং (১৩) গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

পাক্ষিক।

(১৪) নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা, (ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়।)

মাসিক।

(ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়)

(১৫) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (১৬) উপদেশক, এবং (১৭) সত্যার্ণব।

নানাবিষয়ক।

(১৮) বিবিধার্থ সংগ্রহ এবং (১৯) ধর্ম্মরাজ।

প্রাচীন সংবাদ পত্র সমূহের মধ্যে এক্ষণে কেবল নিম্নলিখিত তিনখানি সংবাদ পত্র জীবিত আছে;—

(১) সংবাদ প্রভাকর, (২) সমাচারচন্দ্রিকা এবং (৩) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়। প্রাচীন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রের মধ্যে কেবল তত্ত্ববোধিনীকে দেখিতে পাইতেছি।

জড় জগতের বিকাশ।

পরমাণুগণের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের গতির হ্রাস, এই দুইটি বিকাশের প্রধান লক্ষণ;—একমাত্র লক্ষণ বলিলেও চলে। তবে যে এই ঘনিষ্ঠতা কেবল মাত্র সরল ভাবে চলিতেছে এমত নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার জটিল ভাবের ঘনিষ্ঠতাও ঘটিতে থাকে; অর্থাৎ পরমাণুগণ যেমন পরস্পর সন্নিহিত হইতে থাকে, অনেক

স্থলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সমাবেশও ঘটিয়া পড়ে; বিকাশে যেমন পরমাণগণের পরস্পর দূরত্বের হ্রাস হয়, তেমনি অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের সমাবেশেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। এই দূরত্ব-হ্রাস-জনিত, সরল-ঘনিষ্ঠতা-ঘটিত যেরূপ বিকাশ তাহাকেই সরল বিকাশ, আর সমাবেশের বৈচিত্রে যেরূপ বিকাশ তাহাকেই জটিল বিকাশ বলা যাউক। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, যে বিকাশ ও বিনাশ সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঘটে না, দুই জড়িত ভাবে চলিতেছে।* তবে কখনও একের আধিপত্য, কখনও বা অন্যের। এখানেও সেইরূপ একটু বুঝিতে হইবে যে, সরল বিকাশ ও জটিল বিকাশ পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হয় না। কোন পদার্থে বিকাশ-ক্রিয়া যে কেবলই সরল ভাবে চলিতেছে, কেবলই তাহার পরমাণুগণের পরস্পরের দূরত্ব কমিতেছে; আবার অন্য কোন পদার্থে বিকাশ কেবলই জটিল, কেবলই তাহার পরমাণু সমাবেশের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এরূপ ব্যাপার ঘটে না। পদার্থের বিকাশকালে দুই প্রকারের বিকাশই জড়িতভাবে ঘটিতে থাকে, কম আর বেশী। তবে কেবল বুঝিবার সুবিধা হয় বলিয়াই, আমরা বিকাশের এই দুইটি রূপ পৃথক্ পৃথক্ পর্য্যালোচনা করিব। প্রথমে, সরল-বিকাশের কথাই পাড়া যাউক।

সমগ্র জগতের রূপ আমরা অল্পই জানি। অধিকাংশই অজ্ঞাত পড়িয়া রহিয়াছে। তথাচ মোটামুটি যে টুকু জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যেন নাক্ষত্রিক জগতে এই পারমাণবিক ঘনিষ্ঠতা রূপ একটা মহা ব্যাপার চলিতেছে। বিচ্ছিন্ন নক্ষত্র মণ্ডলী কোথাও সুদূর ব্যবহিত, কোথাও বা ঘন সমাবিষ্ট; আবার সে দূরত্বও নির্দ্দিষ্ট নহে,—অনির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়া অগণ্য তারকামণ্ডলী জগতে বিরাজ করিতেছে। আবার, অনির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়াই মণ্ডলান্তর্গত অগণ্য তারকাগণ মণ্ডল মধ্যে বিরাজ করিতেছে। এ ছাড়া, ঘন, বিরল, নানা প্রকারের নীহারিকা জগৎ-পটে দেখা যায়। সে গুলি দেখিতে কুহেলিকার মত বটে; তবে উহার মধ্যেই আবার কোনটি ঘন, কোনটি বা বিরল; কোনটি অধিক ঘন, কোনটি বা অল্প ঘন; কোনটি অধিক বিরল, কোনটী বা অল্প বিরল;—ঘনত্বের এইরূপ নানা ক্রম উহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যেন জগতে বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়া ক্রমশঃ একটা ঘনিষ্ঠতা ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে।

* নবজীবন, দ্বিতীয় ভাগ, ১২ পৃষ্ঠা।

নাক্ষত্রিক জগতের অপেক্ষা সৌর জগতের কথা আমরা অধিক জানি। সৌর জগতে এই ঘনিষ্ঠতা-কাণ্ড আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান্। সৌর জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ মত এই যে, বিশাল বিস্তৃত ঘূর্ণ্যমান বাষ্পমণ্ডল ক্রমে ঘনীভূত হইয়া সৌর জগৎ হইয়াছে। কেবল যে সমগ্র সৌর জগৎটী ক্রমশই ঘনীভূত হইতেছে এমত নহে, সৌর পরিবারমণ্ডলীর প্রত্যেকেই, —গ্রহ, উপগ্রহাদি সকলেই—ঐরূপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা প্রাপ্ত হইতেছে। সকল গ্রহ উপগ্রহকেই বিরল বাষ্পাকার হইতে, তদপেক্ষা ঘন বাষ্পাকার, তার পর তরল, তার পর কঠিন, এইরূপ অবস্থা পরম্পরা পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে। এখনও কোনটি তরল, কোনটি কঠিন, কোনটি বাষ্পাকার দৃষ্ট হয়। সৌর জগতে ও সৌরজগতের পরিবারমধ্যে ঘনিষ্ঠতার এ নিদর্শন জাজ্বল্যমান্। এ ছাড়া সৌরজগতের ঘনিষ্ঠতার আরও প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সূর্য্য চতুর্দ্দিকে কিরণ বিকীরণ করিতেছে। এই বিকীরণে, এই তেজের হ্রাসে, সৌরপরমাণুগণের গতিহ্রাস হইতেছে; এবং তৎফলে তাহার পরমাণু সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইতেছে। তেজ বিকীরণে সৌর-দেহের সঙ্কোচ, ঘনিষ্ঠতার একটি স্পষ্ট প্রমাণ। আরও দেখ, গ্রহগণের প্রদক্ষিণ কাল ক্রমশই একটু একটু বেশী হইতেছে ইহা অনুমিত হইয়াছে; আর, ধূমকেতু গণের প্রদক্ষিণ কাল সম্বন্ধেও ঐরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ এ কাল-বিলম্বের এই কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, আকাশ ক্রমশই ঘন হইতেছে, তাই গ্রহগণের ও ধূমকেতুগণের গতির ক্রমশ অধিকতর ব্যাঘাত তাই তাহাদিগের প্রদক্ষিণ ক্রমশ বিলম্বিত। আকাশে এ ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে চলিতেছে।

সৌরজগৎ ছাড়িয়া আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীর কথা ভাবিয়া দেখ। ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সরল-বিকাশ অতি সুন্দররূপে উদাহৃত। প্রথমাবস্থায় সমগ্র পৃথিবী একটী বিশাল বিস্তৃত জলন্ত বাষ্প গোলক ছিল। এখন যাহা স্থল, জল, পাহাড়, পর্ব্বত প্রস্তর, মাটি, সকলই তখন তাপের তাড়নে দ্রুতগতি-সম্পন্ন বাষ্পের আকারে ছিল। ক্রমে তেজের বিকীরণে গতির হ্রাস হইল; পরমাণু সকলের সমাহার হইতে লাগিল। জলীয় বাষ্প, পরমাণু সমাহার নিবন্ধন বাষ্পাকার ত্যাগ করিয়া জলাকার ধারণ করিল,—পৃথিবী জলে প্লাবিত হইল।*

* এখনও বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প যৎকিঞ্চিৎ আছে, সে কেবল

পৃথিবী শীতল হইয়াছে বলিয়াই পৃথিবীতে জল। পৃথিবী তেজ বিকীরণ করিয়াছে বলিয়াই, সেই তেজ-হ্রাস-ফলে জলীয় বাষ্পের পরমাণুগণের ঘনিষ্ঠতা ও স্তূপীকরণ সম্পাদিত হইয়া জলের বিকাশ হইয়াছে। স্থল-বিকাশ সম্বন্ধেও ঐরূপ। জলন্ত অবস্থায় যে সকল স্থলীয় উপকরণ বাষ্পাকারে ছিল, বিকীরণ জন্য তাপের যখন হ্রাস হইতে লাগিল, তখন বাষ্পাকার সেই সকল স্থলীয় উপকরণের পরমাণুগুলি ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে যতই তেজের হ্রাস হইয়াছে, ততই সেগুলি অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া তরলতম অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান এই কঠিনাকার ধারণ করিয়াছে।* এখন যাহা শীতল ও কঠিন ভূমি, পূর্ব্বে তাহা তপ্ত ও দলদলির মত নরম ছিল; তাহার পূর্ব্বে আরও তপ্ত ও তরল ছিল, এবং তাহারও পূর্ব্বে অগ্নিময় বাষ্পাকার ছিল। তেজের হ্রাসে পরমাণুর ঘনিষ্ঠতা হইয়া বাষ্প এখন মাটি হইয়াছে,—পৃথিবী দাঁড়াইবার স্থল হইয়াছে। শীতল হওয়ায় পৃথিবীর আরও রূপান্তর হইয়াছে। তাপক্ষয়ে কঠিনস্তরের সঙ্কোচ, ঘটিয়াছে; আর সেই সঙ্কোচেই কোন স্থান উচ্চ, কোন স্থান নিম্ন। সঙ্কোচে, ঘনিষ্ঠতায় পৃথিবীর উপরিস্তরের এই উচু নিচু আকার। এ সকল ছাড়া, পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্থানীয় অবান্তর ঘনিষ্ঠতা অনেক ঘটিয়াছে। এই অবান্তর ঘনিষ্ঠতা হইতেই বড় বড় দ্বীপের উদ্ভব, বিশাল মহাদেশের বিস্তার, পলিময় স্তরভূমির বিন্যাস।

আমরা এখন কেবল বিকাশের সরল ভাব টুকু দেখিতেছি। বস্তুত ইহার সহিত জড়িত জটিল ভাবই বেশী। কেবল সরল ভাবটুকু দেখিলে খুব মোটামুটি দেখা হয় মাত্র। কিন্তু এই মোটামুটি দেখাই আগে চাই। জড় জগতের বিকাশের জটিল ভাবটি পরে দেখা যাইবে।

সূর্য্যের তাপেরগুণে। নতুবা, হয় ত এতদিনে বায়ুমণ্ডল একেবারে জলীয় বাষ্পহীন নীরস হইয়া যাইত।

* পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী কঠিন হইতে পায় নাই, সে কেবল উপরিতন স্তরের কাঠিন্য প্রযুক্ত। উপরিভাগ হইতেই অবশ্য অধিক তেজ বিকীরিত হইয়াছে; তাই ভিতর অপেক্ষা উপর অধিক শীতল হইয়া পড়িয়াছে। উপরের স্তর আগেই কঠিন হইয়া ভিতর হইতে তেজ বিকীরণের ব্যাঘাত দিয়াছে। অন্তর—স্তর হইতে বেশী তাপ বিকীরিত হয় নাই; উহা এখনও উত্তপ্ত, জলন্ত; এখনও তরল, অগ্নিময়।

সুখ ও শোক।

"যাও যাও সখি মাধব পাশে
শ্যামক আনহ ডাকি,
কহিও বনময় ফুটল ফুলদল
গায়ত শত শত পাখী।
কহিও সাধ জগত হরখ-ময়
হাসত উনমদ প্রাণে,
দুঃখিনী রাধা— হাসব হরখে
হেরখি তছু মুখ পানে।
ভরমির দুহু মিলি সারা বনময়
মোহন যমনা তীরে,
মাতল মানস আকুল ভইবে
অতি মৃদু মন্দ সমীরে।
নীরব রাতে ধীর ধীর অতি,
বাঁশী বাজাওবে শ্যাম,
উলসিত ফুলদল পুলকিত যমুনা
জাগবে কানন ধাম।"

এ গান সুখের। সুখ সোহাগ-সারঙের সুর সপ্তমে চড়াইয়া প্রেমের গান ধরিয়াছেন। ভালবাসা, গাশর সঙ্গে আচলে আচল বাঁধিয়া সুখের পিছুপিছু ছুটিয়াছে। এমন ছুট ছুটিয়াছে,—যে রূপসৌন্দর্য্যের পিন্ধন-বাস প্রায় বক্ষ-চ্যুত, কুন্তল-গুচ্ছ কবরী-চ্যুত, একে অপরকে হারাইয়া উড়িয়া উড়িয়া কি জানি কেমন এক মোহকরী সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে। সুখের হৃদয়ে দুঃখের লেশমাত্র নাই। তাঁহার মরমে মলয়ানিল ছুটিয়াছে, মল্লিকা যুঁই ফুটিয়াছে, আর সেই ফুটন্ত ফুলগুলির উপর, ততোধিক ফলের মুঞ্জরাগুলির উপর, মধুকর নিকর, আসিয়া জুটিয়াছে, মাথা কুটিয়া মধু লুটিবার ফিকিরে আছে। সুখের হৃদয়রূপ নিকুঞ্জে ঘন ঘন কোকিল ডাকছে, অনুরাগ সরোবরে বিলাস রস উথলে পড়েছে সুখ প্রেমভরে "ঢল ঢল বিহ্বল প্রাণ।" আহা সুখের কাছে এখন—

নিখিল জগত জনু হরখ-ভোর ভরি
গাওই প্রেমক গান।

সুখ, এই অনুপম সঙ্গীতের সুরে গলা মিলাইয়া "উনমদ প্রাণে" গাই-তেছেন।

যাও যাও সখি মাধব পাশে,
শ্যামক আনহ ডাকি।

কেননা এমন হর্ষের দিনে সুখের আরও সুখকর, আরও প্রিয়তর পদার্থ চাই। নহিলে সুখ ষোল-আনা হয় না। কাজেই সুখ সখী মায়ফতে বলিয়া পাঠাইতেছেন—

কহিও সারা জগত হরখময়
হাসত উনমদ প্রাণে,
দুঃখিনী রাধা হাসব হরখে,
হেরয়ি তছু মুখ পানে।

এই "তছু মুখ পানে" সুখের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপ। প্রেমের অতি পবিত্র মূর্ত্তি। এত সুখের মধ্যেও সেই মুখখানি নহিলে সুখ সুখী হইতে পারিবেন না। কেবল সেই মুখখানি পাইলেই সুখ হরখে হাসিতে পারিবেন, নচেৎ নহে। পরন্তু সেই মুখখানি মনে পড়িতেই সুখের প্রাণে যুগপৎ কতই না সাধ উঠিতেছে। কখনও 'দুঁহু মিলি সারা বনময়" ফিরিবেন। কখনও গলাগলি হইয়া "মোহন যমুনা তীরে" ভ্রমিবেন। আর সেই 'নীরব রাত্রে' শ্যামের ধীর—অতি ধীর—বংশীধ্বনি শুনিবেন। কি করিবেন কি না করিবেন—সুখ, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এক কথায়, সুখ শশব্যস্ত।

উপরেরটি গভীর রাত্রে সুখের গান। নীচেরটি গভীর রাত্রে শোকের গান;—

From short (as usual) and disturbed repose
I wake: how happy they who wake no more!
Yet that were vain, if dreams infest the grave.
I wake emerging from a sea of dreams
Tumultuous; where my wrecked desponding thought,
From wave to wave of fancied misery

At random drove, her helm of reason lost ;
Though now restored, 'tis only change of pain
(A bitter change!) severer for severe.
The day too short for my distress ; and night,
E'en in the zenith of her dark domain
Is sunshine to the colour of my fate.

ভাঙ্গিল সে কাক-নিদ্রা দুঃস্বপ্ন জড়িত ;
আর না ভাঙ্গিলে পরে, কি সুখী হতাম ;—
শ্মশানে স্বপন যদি ; সুখ কোথা তায় !
ভীষণ দুঃস্বপ্ন সিন্ধু ভেদি উঠিলাম,—
হতাশে বিচুর্ণ মন মানস তরণী
হারায়ে জ্ঞানের হাল, বানচাল হয়ে,
কল্পনা-প্রসূত শত কষ্টের তরঙ্গে
উঠিতে পড়িতে ছিল, এ দিকে সে দিকে ;
যদিও সুস্থির এবে, এই জাগরণে,
ততোধিক নিদারুণ এ পরীবর্ত্তন !
সারা দিবা ভোগে ক্লেশ পর্য্যাপ্ত না হয়।
করাল রাত্রির সেই তামসী বিভীষা,
পোড়া ভাগ্য তুলনায় দিবা-বিভাময়ী।

পুনশ্চ—

Night, sable Goddess! from her ebon throne,
In rayless majesty now stretches forth,
Her leaden sceptre o'er a slumbering world.
Silence how dead! and darkness how profound ;
Nor eye nor listening ear, an object finds ;
Creation sleeps. 'Tis as the general pulse
Of life stood still, and nature made a pause ;
An awful pause! prophetic of her end.
And let her prophecy be soon fulfilled
Fate! drop the curtain ! I can lose no more!

মহাকালী তমস্বিনী, কৃষ্ণাজিনে বসি,
বিভাহীন মহিমায় বিরাজিছে এবে,
শাসিছে করাল দণ্ডে সুষুপ্ত জগতে।
নির্ব্বাণ-নীরব বিশ্বে গভীরান্ধকার!
চক্ষু কর্ণ গ্রাহ্য কোন বস্তু মাত্র নাই।
বিশ্ব সুপ্ত; নাড়ী হীন, হিম কলেবর;
চলৎ জগৎ হয়ে, হঠাৎ অচল
ভবিষ্য প্রলয়চ্ছবি বিকাশ করিছে!
এ বিশ্ব বিলীন হোক, হোক সে প্রলয়!
কষ্ট রে অদৃষ্ট! আর, সহ্য নাহি হয়।

ইহা শোকের হৃদয়ভেদী, মর্ম্মান্তস্পর্শী—রোদন। শোক হৃদয়ে করাঘাত করিয়া আর্ত্তস্বরে কাঁদিতেছেন। গভীর রাত্রে উঠিয়া নিভৃতে নির্জ্জনে নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে অন্ধকারের ছায়ায় বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। শোকের এই ক্রন্দন—আর ক্রন্দনকে সংগীত বলা যদি একান্তই অন্যায় না হয়,—এই সংগীত—নিতান্ত নিদারুণ। কেবল নিদারুণ নয়, ইহা শ্মশানিক। এ সংগীতের সাংঘাতিক স্বর শুনিবা মাত্র শরীর সিহরে, প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

শোক সহসা সুপ্তোত্থিত। ইহা শোকের সুপ্তি। সুখের সুপ্তির ন্যায় এ সুপ্তিতে তৃপ্তি নাই, স্বাস্থ্য নাই, গাঢ়তা নাই, জীবনীশক্তি নাই। এ সুপ্তি অপ্রফুল্ল, বিষণ্ণ, ক্ষণ-মাত্র-স্থায়ী এবং সাংঘাতিক স্বপ্নময়ী। এ সুপ্তিতে যে একটু বিস্মৃতি আছে, তাহাও বিষাক্ত। এই অতৃপ্তিকর সুপ্তি ক্ষণেকের জন্য শোকের আঁখি দুটি অধিকার করিয়াছিল। শোক ক্ষণিক বিস্মৃতিতে আত্মহারা হইয়া স্বপ্ন-সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে কখনও ডুবিতেছিলেন, কচিৎ ভাসিতেছিলেন। আচম্বিতে সুপ্তি ছুটিয়া গিয়াছে। শোক সহসা সুপ্তোত্থিত। বিস্মৃতির বন্দর হইতে পুনরায় স্মৃতির সম্রাজ্যে উপস্থিত। স্মৃতি কর্ত্তৃক নিদারুণ নিপীড়িত—আক্রান্ত। শরীরের সহিত প্রাণের মর্ম্মান্তিক কথা যুগপৎ জাগিয়া উঠিয়াছে। বুকের ভিতর গুড়্ গুড়্ দুড়্ দুড়্ করিতেছে। মর্ম্মের উপর সঘনে সূচ ফুটিতেছে। সমগ্র সংসার শূন্যময়,—নিবিড় আঁধারে আবৃত। শোক ব্যাকুল হইয়া কাঁদিলেন,——

How happy they who wake no more!

কি সুখী তাহারা, চির সুপ্ত যারা
জাগে না জীবন যাদের আর।

স্মৃতি তখন আবার চাপিয়া ধরিল। বিষম বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্নপূর্ণ অতৃপ্তিকর সেই কাকনিদ্রা টুকুর কথা মনে পড়িল। চিরসুপ্তির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া, এ যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, এরূপ একটু কল্পনা ঈষন্মাত্রায় চকিতে অজ্ঞাতে মনে উঠিতেছিল,—তৎক্ষণাৎ উঠিতে না উঠিতে তাহার মূলে কুঠারাঘাত হইল। আশার ঈষন্মাত্র আলোক-ছায়া কাছে আসিবার উপক্রম করিতে না করিতেই অন্তর্হিত হইল। শোক স্মৃতিপীড়িত সন্দিগ্ধ আতঙ্কিত হইয়া আবার কাঁদিলেন—

Yet that were vain if dreams infest the gave.

শ্মশানে স্বপন যদি সুখ কোথা তায়।

দিনের পর রাত্রি, আলোকের পর আঁধার, জাগরণের পর নিদ্রা, আসিতেছে, যাইতেছে, আবার আসিতেছে। নৈসাগক পরিবর্ত্তন প্রবাহ সমভাবে চলিয়াছে। শোকের প্রাণের সেই গুরুভার কিন্তু অটল। সন্তপ্ত হৃদয় অহর্নিশি সমান জ্বলিতেছে। নিরাশ অন্ধকার সেই একই ভাবে জীবনের দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। রাত্রে দিনে পার্থক্য নাই। ইহাদের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, যাতনারই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি—কঠিন হইতে কঠিনতর মূর্ত্তি—উদিত হইতেছে। শোক কাঁদিতেছেন, কাঁদিয়া স্বকীয় দিবারাত্রের পরিচয় দিতেছেন—

The day too short for my distress; and night,
E'en in the zenith of her dark domain
Is sunshine to the colour of my fate.

সারা দিবা ভোগে ক্লেশ পর্য্যাপ্ত না হয়,
করাল রাত্রির সেই তামসী বিভীষা,
পোড়া ভাগ্য তুলনায়, দিবা-বিভাময়ী।

ইহা ভয়ানক। মনুষ্য যাতনার অত্যন্ত জীবন্ত চিত্র। নিরাশার তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিকৃতি। শোকের মূর্ত্তিমান রূপ। দিনমান ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র, শোকের সুদীর্ঘ যাতনা ধারণ করিতে অসমর্থ,—আর ঐ যামিনী,—ত্রিযামা তামসময়ী যামিনী! শোকের অদৃষ্ট লিপির কালিমাময় বর্ণের তুলনায়,

গম্ভীরা যামিনীর ঐ নিবিড়তম, আঁধারতম অন্ধকাররাশি পরিষ্কার দিবালোক সদৃশ।

শোক কোথাও একবিন্দু জুড়াইবার জায়গা,—লুকাইবার স্থান—পাইতেছেন না। দিবারাত্রি নিদ্রা জাগরণে, আকাশ-পাতাল-পৃথিবী, সকলই যেন তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে;—অথচ গ্রাস করিতেছে না। শোকে অধীর, অস্থির, ব্যাকুল। প্রচণ্ড হইয়া কখনও আপনার মাংস আপনি টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িতেছেন। কখনও নীরবে আপনার হৃদয় আপনি কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছেন।

শোক অবসন্ন, মুহ্যমান। আপনার ভারে আপনি প্রপীড়িত। অস্থির অধীর,—আবার অতিশয় স্থির ও গম্ভীর। সে গাম্ভীর্য্য অতলস্পর্শী।

সুপ্তোত্থিত শোক সেই নিশীথ সময়ে একবার জগতের নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, প্রায় নাড়ী নাই। প্রকৃতি নিদ্রিত, সমগ্র সংসার সুষুপ্ত। কালিমাময় আঁধার—আর করাল নিস্তব্ধতা—কেবল জাগিতেছে। কালরজনী স্বীয় কর বিস্তার করিয়া যেন সুপ্ত পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন।

শোক, বোধ করি, এইখানে স্বকীয় হৃদয়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পাইলেন। ভাবিলেন ইহা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ বটে। কাতর প্রাণে, গম্ভীরস্বরে ভবিতব্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

Fate! drop the curtain; I can lose no more.

ক্ষান্ত রে অদৃষ্ট! আর সহ্য নাহি হয়।

অহো শোক! ভবিতব্য যে "অচল অটল"!

আর অধিক বিশ্লেষ করিয়া, চঞ্চল লেখনীদ্বারা শোক সংগীতের অসাধারণ গাম্ভীর্য্য ও বিশাল সৌন্দর্য্যের উপর আঘাত করিব না। শোকের পবিত্র ছায়া স্পর্শ করিয়া তাহার প্রগাঢ় ধ্যান ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে।

এখন আর একটি সুখের গান;——

বধুঁয়া, হিয়া পর আও রে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদুমধু ভাষয়ি,
হমার মুখপর চাও রে।
যুগ যুগ সম কত দিবস বহিয়ে গল,
শ্যাম তু আওলি না,

চন্দ্র-উজর মধু মধুর কুঞ্জপর
মুরলি বজাওলি না!
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাস রে,
লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ।
শূন্য বৃন্দাবন, শূন্য হৃদয় মন
কথি ছিল ও মুখ-চন্দ?
ইথি ছিল আকুল গোপ নয়ন জল,
কথি ছিল ও তব হাসি?
ইথি ছিল নীরব বংশীবট তট,
কথি ছিল ও তব বাঁশী!
আওলি যদি রে ঠারলি কাহে,
সরমে মলিন বয়ান!
আপন দুঃখ কথা কছু নহি বোলব
নিয়ড় আও তুঁহু কান!
তুয়া মুখ চাহয়ি শত-যুগ-ভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান।
এক হাসি তুয়া দূর করল রে
সকল মান অভিমান!

এ সংগীতের সুকুমার সৌন্দর্য্য, পাঠক তাঁহার সুকুমার হৃদয়ের মধ্যেই সম্ভোগ করুন। আমাদের কর্কশ করস্পর্শে ইহার কুসুমাদপি কুসুম কমনীয়তা দলিত করিতে আমরা নারাজ।

বিচ্ছেদের পরেই পূর্ণমিলন। এ সংগীতের সুখ বড় সহজ পাত্র নহে। এ দুঃখের পর সুখ। দুই হস্তে নন, চারি হস্তে তিনি মূর্ত্তিমান। সুখ এখানে স্বাধীনভর্ত্তৃকা। প্রেম-পুষ্পকে, ডবল এন্‌জিন্ চড়াইতেছেন। আবার বিনাইয়া বিনাইয়া, কতই না বিনাইয়া বিচ্ছেদের বিষাদ কাহিনী বিবৃত করিতেছেন; আর এতদিন এসুখ, এতসুখ—'কথি' ছিল,—কেমনে ছিল, কোথায় কি করিতেছিল, ছলছল চক্ষে, টল টল বক্ষে, সহস্র কণ্ঠে শতবার তাই শুধাইতেছেন;

ইথি ছিল গোপ নয়ন জল,
কথি ছিল ও তব হাসি,

ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট,
কথি ছিল ও তব বাঁশী।

কিন্তু বিচ্ছেদ কাহিনীতে কি আর এখন বিষাদ আছে? বিষাদের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিচ্ছেদের সে বিষাদ এখন সাধে, অদর্শনের সে দুঃখ এখন সুখে—পরিণত। পরশ-মণিস্পর্শে সব সোনা হইয়া গিয়াছে। অতীতের দুঃখ কাহিনীর বিবৃতিতেও এখন পরম আনন্দ।

সুখ একটু আক্ষেপ করিয়া কিন্তু বড়ই আদর আর আবদার করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ইষৎ অভিমানের বাতাস তুলিয়া বলিতেছেন,—

যুগ যুগ সম কত দিবস বহয়ি গল
শ্যামতু আওলি না,
চন্দ উজর মধু মধুর কুঞ্জপর
মুরলি বজাওলি না।

ছি ছি এমনও করে! তা এখন

আওলি যদি রে হারলি কাহে,

তা বটে ত। যা হবার হয়েছে। তা বলে, লজ্জা কিসের? কাছে এস,—

বঁধুয়া হিয়া পর আও রে
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি
হমার মুখ পর চাও রে।

ঠিক। ইহাকেই বলে ত সুখ!

পুনশ্চ একটি শোকের গান শুনুন

Sweet harmonist! and beautiful as sweet!
And young as beautiful! and soft as young!
And gay as soft! and innocent as gay!
And happy (if ought happy here) as good!
For fortune fond had built her nest on high,
Like birds, quite exquisite of note and plume,
Transfixed by fate (who loves a lofty mark,)
How from the summit of the grove she fell,
And left it unharmonious! all its charm
Extinguished in the wonders of her song;

Her song still vibrates in my ravished ear,
Still melting there, and with voluptuons pain
(O to forget her !) thrilling through my heart !
Song, beauty, youth, love, virtue, joy ! this group
Of bright ideas, flowers of paradise,
As yet unforfeit ! in one blaze we bind,
Kneel and present it to the skies, as all
We guess of heaven ; and these were all her own ;
And she was mine ; and I was—was !—most blest——
Gay title of the deepest misery !

*   •   •   •   •

O the soft commeree ! O the tender ties,
Close twisted with the fibers of the heart !
Which broken, break them, and drain off the soul,
Of human joy, and make it pain to live.—
And is it then to live ? when such friends part,
'Tis the survivor dies,—my heart ! no more.

(কিবা লয়, কিবা মিশং, মরি কি সুস্বর।)
মধুর মিলনী মরি, মধুরে সুন্দর !
সুন্দরে কিশোরী সেই, কিশোরে কোমলা,
কোমলে প্রফুল্ল ফুল, প্রফুল্লে সরলা।
যদি কেহ সুখী থাকে এ মর্ত্ত ভুবনে ;
পবিত্র চরিত্রে সেই সুখিনী জীবনে।
যতনে সৌভাগ্য তারে অতি উচ্চে রাখে ;
সুবর্ণ সুন্দর পাখী যথা উচ্চে থাকে ;
দুর্ভাগ্যের দূর লক্ষ্য, তাহারে বিঁধিল,
ফুল্ল তরু শিরহতে, ভূতলে পড়িল।
থামিল কুঞ্জের গান, ঘুচিল সে শোভা ;
জুড়াল সে কলস্বর জগ-মনো-লোভা ;
মুগ্ধ মম কর্ণে কিন্তু লাগে সেই তান

হিয়ায় আকুল হই—প্রাণে আন চান।
কেমনে ভুলিব তারে, ভুলিব রে হায়!
কুসুম-অশনি-পাত লাগিছে হিয়ায়।
সুন্দর সৌন্দর্য্য, আর বয়স-লাবণ্য
প্রীতি, পুণ্য, আনন্দের, সমষ্টি সে ধন্য;
স্বর্গের কুসুমগুলি,—নর ব্যবহার
করে নাই কলুষিত,—গুচ্ছ করি তার,
জোড় জানু ভূমি ন্যস্ত জোড়হস্ত বুকে
উৎসর্গ করিয়াছি স্বর্গ অভিমুখে;
কত গুণ দিলতার, সে ছিল আমার,
আমার আছিল—ছিল,—আনন্দ অপার,
তখন—তখন—ছিল,—আছিল রে সুখ,
ঐ রূপে বলিতে হয়, এ গভীর দুখ।

* * * * *

মধুর মিলন মরি, কোমল বন্ধন!
মর্ম্মগ্রন্থী সঙ্গে তার, সুদৃঢ় গ্রন্থন।
ছিঁড়িল বন্ধন যবে, ছিঁড়ে মর্ম্ম মূল,
বাহিরিল সুখস্রোত হইয়া আকুল,
রহিল দুখের ভাগ—মর্ম্মে লাগি তায়,
বাঁচিয়া কেবল তাত দুখ সহা যায়।
বাঁচিয়া? বাঁচিয়া কই? সঙ্গিনী বিহীনে,
যে থাকে, সেইত মরে,——আর না,—পারি নে।

শোকের এ ক্রন্দন অতি কোমল—অতি করুণ। করুণ কিন্তু নিদারুণ। যে স্মৃতি—যে সুখের স্মৃতি দ্বারা শোক নিপীড়িত—মর্ম্মাহত, সেই স্মৃতিরই আবার তিনি উপাসক। যে স্মৃতিতে কেবল কাঁদায়, যে স্মৃতিতে প্রাণ পাগল করে, হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া লয়, যে স্মৃতির সামগ্রী শ্মশানে শায়িত, ইহ সংসারে অস্তিত্ব মাত্র বিরহিত, যে স্মৃতি কেবল কাঁদায় আর যাতনা জাগায়, শোক সতই সেই স্মৃতির, সেই দুঃসহ দারুণ স্মৃতির আন্দোলন আলোচনা অর্জ্জনা উপাসনা করিতেছেন। নাড়িয়া চাড়িয়া ঘুরাইয়া

ফিরাইয়া নানা ভাবে, নানা মূর্ত্তিতে সেই স্মৃতির চিত্র হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া ধারণ করিতেছেন।

যাহাতে কেবল যাতনা, তাহার এত আলোচনা কেন? এইজন্য,—যে যাতনা-দায়ক বস্তু—দুর্জ্জয়। শোকত বলেন স্মৃতি দূর হও। আশা শূন্য, আনন্দ শূন্য স্মৃতি—দূর হও।

Turn hopeless thought! turn from her;

ফিরে এসো নিরাশা রে প্রিয়া-চিন্তা ছাড়।

কিন্তু স্মৃতি-স্রোত—অতীতের চিন্তা প্রবাহ—কি বাধা মানে? বাধা পাইলে দু'কূল ভসাইয়া দ্বিগুণ বেগে ছুটে।

——————Thought repelled

Resenting rallies and wakes every woe,

ব্যাহত হইলে চিন্তা দ্বিগুণিত হয়,

শিরে শিরে শির তুলে দুঃখ সমুদয়।

সেই জন্যই কি তবে, যাতনার জ্বালা কমাইবার জন্যই কি তবে,—

Each tear mourns its own distinct distress.

প্রতি অশ্রু কেঁদে বলে, আপন যাতনা।

—স্মরণ, আন্দোলন, অশ্রু-বিসর্জ্জন! সেই জন্যই কি তবে শোক বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে?

এই এক কারণ বটে। তবে আর এক কারণও আছে। কারণ এই যে আগুণ যেমন পোড়ায়, তেমনি একটু জুড়ায়ও বটে। আগুণ যাহাকে পোড়ায় কেবল তাহাকেই জুড়ায়।

সুখ দুঃখের স্মৃতিতেও সুখী। শোক সুখের স্মৃতিতেও মর্ম্মাহত। তাই এক জনের নাম সুখ, আর এক জনের নাম শোক।

তবে অগ্নির শীতলতার ন্যায়, যাতনার মধ্যেও এক প্রকৃতির সান্ত্বনা আছে। শোচনার মধ্যেও এক প্রকার শান্তি আছে। যাতনা ও শোচনা মন্থন দ্বারা সান্ত্বনা ও শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। সে সান্ত্বনা —সে শান্তি কিরূপ—কেহ কাহাকে বুঝাইতে পারে না, যেহেতু তাহা স্বত বুঝিবারই বিষয়,——বুঝাইবার নয়। তাহা অনেকাংশে বুদ্ধি বাক্যের অতীত। ফল কথা শোকের মধ্যেও এক প্রকৃতির সুখ আছে, কিন্তু তাহার

সাহচর্য্য বা জ্ঞাতিত্ব এ সংসারের সুখ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় না। অতএব তাহাকে সুখ নামে অভিহিত না করিলেও চলে। না করাই ভাল।

শোক সুখের বিপরীত কক্ষে অবস্থিত। শোকের বাস শ্মশানে, সুখের বাস সংসারে। শ্মশানে সংসারে—সুমেরু কুমেরু ভেদ।

সুখের সহচর বিলাস, পরিণাম শোক; শোকের সহচর বৈরাগ্য, পরিণাম শান্তি। সুখ,—মোহ। শোক,—শান্তি।

শোক সুখ চায়, শোককে সুখ চায়না; কিন্তু সুখ শোক পায়।

সুখ চাঞ্চল্য, শোক গাম্ভীর্য্য; সুখ আশা, শোক নিরাশা। সুখ ইহকাল, শোক পরকাল। শোকের মধ্যে পরকালের আশা। সুখ ইহকালে আলোক; শোক আঁধার, যেহেতু পরকাল চর্ম্ম-চক্ষের অগোচর।

সুখ মনোহর, শোক ভয়ঙ্কর। সুন্দর উভয়েই বটে। দৃষ্টি ভেদে সৌন্দর্য্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ ভেদ মাত্র। সুখ সুরা। শোক সুধা। উন্মত্ত উভয়েই করে। তবে সুরায় তৃষ্ণা বাড়ায়, সুধায় তৃষ্ণা কমায়।

সুখ শীতল করিয়া উন্মত্ত করে, শোক উন্মত্ত করিয়া শীতল করে। সুখ জুড়াইয়া পোড়ায়, শোক পোড়াইয়া জুড়ায়। সুখ ভ্রম করে। শোক সংশোধন করে। সুখ লালসার সঙ্কলন। শোক তাহার ব্যবকলন। সুখ সংসারকে সংযোগ করিয়া ভগবানকে বিয়োগ করে। শোক সংসারকে বিয়োগ করিয়া ভগবানকে যোগ করে।

সুখ বাঁশী বাজাইয়া গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা নষ্ট করে, শোক সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে অদৃষ্টলিপির অস্পষ্ট অক্ষর পাঠ করিয়া অবাক হয়।

সুখ, জন কোলাহল। শোক—নিভৃত নিরালয়।

সুখ হাট। শোক মঠ। হাটে লোকে দেখে দেখায়, বেচা কেনা করে। মঠে লোকে ধর্ণা দেয়, ধেয়ায়, পূজা অর্চ্চনা করে।

সুখ, সংসারী. শোক, সন্ন্যাসী। সুখ, ভোগী। শোক, যোগী। সুখ, আবিলতা। শোক, পবিত্রতা। প্রয়োজনীয়তা উভয়েরই আছে। এ সংসারে সুখের যদি আবশ্যকতা থাকে, শোকের আবশ্যকতা আরও অধিক আছে।

Blessed are they that mourn,

যে দুঃখ করে, সেই সুখী।

এটি সন্ন্যাসীর কথা।

How wretched is the man who never mourned;
I dive for precious pearl in sorrow's stream.

যে কখন কাঁদে নাই, কি অভাগে সে,
দুখের সাগরে ডুবি সুখ রত্ন আশে।

এটি শোক সন্তপ্ত কবি-হৃদয়ের কথা। দুইই এককথা;—অতি গভীর, নিগূঢ়, যথার্থ কথা। সন্তাপ-অগ্নি-পরীক্ষিত হৃদয়ই প্রেমের প্রশস্ততা দেখিতে পায়। শোকের শোধন-যন্ত্রে সংস্কৃত না হইলে, প্রণয়ের পবিত্র সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না। স্নেহের অনুপম মাধুর্য্য বিকশিত হয় না। পরন্তু শোক মানুষকে পশুভাব হইতে দেব ভাবে লইয়া যায়। সংসার হইতে স্বর্গের দিকে টানে। এ সকলই স্বীকার্য্য;—এ সকলই সত্য। শোকের অত্যন্ত উপকারিতা আছে। আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সে আবশ্যকতা উপকারিতা অনুভব করিতে—কল্পনা করিতেও—মনুষ্য হৃদয় যত সিহরে কেন?

জীবনের সহিত দেহের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী; নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। অথচ জীবন গ্রন্থি ছেদের কথা মনে হইলেই মানুষের প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে। মানুষ ইহা স্বভাবতই যেন ধারণ করিতে, সহ্য করিতে, অসমর্থ। ইহার তাৎপর্য্য কি? তোমার নিকট ইহার অনেক উত্তর অনেক ব্যাখ্যা আছে, আমি জানি। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কাল্পনিক শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় অনেক ব্যাখ্যা তোমার নিকট আছে, সে সব ব্যাখ্যা আমি অনেক বার শুনিয়াছি। কিন্তু শুনিয়া তেমন তৃপ্তি লাভ করি নাই। তুমি যাহা বল, তাহা ছাড়া যেন আরও কিছু আছে আছে বলিয়া ঠেকে। সেই কিছু টুকুর কথা কেহই বলেন না। বোধ করি এখানকার কেহই জানেন না। কেবল তিনিই জানেন।

দেহের সহিত আত্মার, মানুষের সহিত দেবতার—কলহ ত লেগেই আছে। অথচ একজন আর একজনকে ছাড়িতে নারাজ। কবি খুব সুন্দর উপমা দিয়াছেন,—

Body and soul like peevish man and wife,
United jar, and yet are loth to part.

সর্ব্বদা কন্দলে মত্ত দেখেছ দম্পতি—
দেহ আর আত্মা তাই, জানিবে তেমতি
মিলনে মহান্ কষ্ট, অসুখে থাকয়ে,
নাহি ছাড়ে সঙ্গ কিন্তু বিরহের ভয়ে।

বটে বটে। কিন্তু দেহ আত্মায়—এ কুঁদুলের কোলাকুলির মানে কি? কোঁদল সত্য, কিন্তু পিরিত টুকুও ত—প্রাণের বটে।

স্বদেশ হইতে সুখের ও বিদেশ হইতে শোকের কয়েকটা সংগীত সঙ্কলন করিয়া আমরা পাঠককে উপহার দিয়াছি। তার পর সুখ শোকের সমালোচনা প্রসঙ্গে একটা একটা করিয়া কয়েকটা পুরাণ কথা পুনরুক্ত করিয়াছি। এখনও তবু একটু বাকি আছে। বাল্যকালে বড় পিসি মার নিকট সুখ—শোকের এক গল্প শুনিতাম। এখন সেই গল্পের একটু বলিলেই এই প্রবন্ধ সাঙ্গ হয়। বলা আবশ্যক যে পূজনীয়া পিতৃস্বসার শোকের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ছিল। তিনি সুখ—শোকের আদি বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া, শেষোক্তকে ভদ্রাসন ভিটার নিকট হইতে দূর করিতেন। আর বলিতেন যে তাঁহার এই কাহিনী যে বলিবে বা শুনিবে, নিশ্চয়ই শোক তাহার নিকটে ঘেঁসিবে না। ভাগ্যদোষে পিসি ঠাকুরাণীর কথা ভবিষদ্বাণীতে পরিণত না হইলেও, আমাদের এই প্রবন্ধ সেই কাহিনীর নিকট বিশেষ ঋণী। আমরা তাঁহার সেই কাহিনীর অনেক কথা চুরি করিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ইহার ভিতর পুরিয়া দিয়াছি। এখন তাঁহার সেই গল্পের একটুও উল্লেখ না করা,—নেহাত মহা পাতক।

ব্রহ্মা সকল সংসার সৃষ্টি করিয়া, সুখকে এক নৌকায় ও শোককে আর এক নৌকায় পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাদের পিছু পিছু আরও দুই জন লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাদের একজনের নাম বিলাস, আর এক জনের নাম বৈরাগ্য। সুখের নৌকা আগে আসিয়া ঘাটে লাগিল। শোকের ডিঙ্গি তার পর পৌঁছিল। শোক পৌঁছিয়া, সুখকে ডাকিয়া বলিল,—"সুখ এস না, আমরা এখানে দুই জনে একত্রে এক সঙ্গে ঘর সংসার করি।"

সুখ শোকের এই কথা শুনিয়া সিহরিয়া উঠিল। বলিল;—"বালাই বালাই! শোক তুমি অমন সর্ব্বনেশে কথা মুখেও এনো না। যার নামে

উপবাস! তার সঙ্গে সহবাস! তোর সঙ্গে আমি একত্রে ঘর করিব? পোড়া কপাল তোর। তোর ছায়া মাড়াইলেও অশৌচ হয়। তুই আমার সোনার সংসারের নিকট দিয়াও যাইতে পাইবি না। তুই আমার বাস্তু বাগানের ত্রিসীমা হইতে দূর হ।”

শোক মুখ আঁধার করিয়া নীরবে সব কথা শুনিল। শেষে যেন একটু শাসাইয়া বলিল, ‘আচ্ছা ভাই! তুমি আমাকে তোমার সংসারের মধ্যে একটু জায়গা দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু তুমি সাবধানে থেকো।”

সুখ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “তুই এখনও গেলি না। এখনও এইখানে দাঁড়াইয়া বাক্‌চাতুরী করিতেছিস। এখনি দূর হ, নহিলে ঝাঁটা-পেটা করিয়া দূর করিব।”

সুখ এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি বিলাসের সঙ্গে গলাগলি হয়ে বাড়ির ভিতর গেল। শোক অধোবদনে, বৈরাগ্যের হাত ধরিয়া শ্মশান-মুখ হইল।

সেই অবধি সুখে শোকে আদা-কাঁচকলা। কিন্তু লীলা খেলা দুই জনেরই ত, দেখি, একই জিনিস লইয়া। সুখও প্রেম-গত-প্রাণ। শোকও প্রেম-গত-প্রাণ। একজন, না হয় প্রেম লইয়া সংসারী, আর এক জন না হয় প্রেম লইয়া বৈরাগী। জিনিসটা ত একই বটে।

সুখেও প্রেম। শোকেও প্রেম। সংসারেও প্রেম, স্বর্গেও প্রেম। সর্ব্বত্রই প্রেম। প্রেম নাই কেবল নরকে। প্রেম নাই বলিয়াই, বোধ করি, নরক—নরক হইয়াছে।

কবি না পাচক।

আমি কবিদিগকে পাদ্যকার ব্রাহ্মণ মনে করি। যখন তাঁহাদের কাব্য পড়ি, তখন আমার ভোজন পাত্রের কথা কেবলই মনে পড়ে। মনে হয় বুঝি চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় কতরূপ রসেই পাত্র পূর্ণ রহিয়াছে। মনে মনে,

“চুক চুক চুক চুষ্য চুষিয়া, কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া,
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া, চুমকে চক্ চক্ পেয় পিয়া,—

হরিষে অবশ অলস অঙ্গ হইয়া পড়ি। তাই ইচ্ছা হয় একবার সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া সে ভোজনের ব্যাপারটা দেখাই। কিন্তু ভয় হয় পাছে এত রকম বরকম, তর বতর আয়োজন দেখিয়া তাঁহাদের রসনা লালায়িত হয়।

কথাটায় কেহ হাসিও না। রস লইয়াই কাব্য—আর রস লইয়াই ভোজন। প্রকৃতি একদিকে আমাদের রসনা সৃষ্টি করিলেন—আর সেই সঙ্গে তাহার ভোগের জন্য—তাহার তৃপ্তির জন্য—সৃষ্টি হইল—রস তন্মাত্র। সুতরাং রসনার সহিত রসের বড় নিকট সম্বন্ধ (অর্থাৎ খাদ্য খাদক সম্বন্ধ।) সেই রূপ আমাদের মনের রসনেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি হইল—কাব্য। রস-তন্মাত্র হইতে মোটে ছয়টা মূলরস সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারপর তাহার নানারূপ সংমিশ্রণ বিমিশ্রণ দ্বারা রস হইল—তেষট্টি প্রকার। আবার মানুষের হাতে পড়িয়া ভাল পাচকের পাকে রস অনন্ত, হইল—শেষে রস গড়াইল। তাই বুঝি নানারসের খাদ্য দেখিলে, রসনার রসও গড়ায়।

সেইরূপ কাব্যের রসও প্রথমে হইল নয়টি। প্রকৃতির নিয়ম—যত তাহা ক্রম পরিবর্ত্তন দ্বারা উন্নত হইতে থাকে—ততই একের বহুত্ব হয়—বিশ্লেষণের কিছু বাড়াবাড়ি হয়। সুতরাং এই নয়টি রস আবার সংমিশ্রণাদির দ্বারা নানা প্রকার মিশ্ররসের সৃষ্টি হয়। শেষে কবি সূপকারের হাতে পড়িয়া রসের অনন্ত পরিণতি হইয়াছে। এত কাব্য রসে আর আস্বাদন রসে আবার অনেক সাদৃশ্য আছে। পাঠকের যদি রসাস্বাদনে ইচ্ছা থাকে তবে তাহার দুই একটি নমুনা দিই। আদিরস আর অম্লরস—আমি দুই এক ধাতুর মনে করি। দুই বেশ মুখরোচক—কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে পীড়া দায়ক হয়—দাঁত টকে, আঁত টকে,—নানা গোলযোগ বাধে। আবার যাহারা অম্বলে রোগী বা রুচি বায়ুগ্রস্ত—তাহাদের পক্ষে অম্ল বা আদিরস বড়ই অনিষ্টকর। সেইরূপ করুণ রস আর মধুর রস দুই এক ধাতুর। ভোজনে যেমন মধুরেণ সমাপয়েৎ করিতে হয়—মিষ্ট না হইলে যেমন জল গ্রহণ করা চলে না—কাব্যেও সেইরূপ কিঞ্চিৎ করুণরস দিয়া শেষ করিতে হয়। মিষ্ট ব্যতীত বাঙ্গালীর আহার বৃথা—আর করুণরস ব্যতীত বাঙ্গালীর কাছে কাব্য বৃথা। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে বহুমূত্র রোগী বা অম্বলেরোগী বড় বেশি। পঞ্চানন্দ বলিয়াছেন বিনামূল্যে অম্বলের ঔষধ বিতরণের বিজ্ঞাপন দিলেই বাঙ্গালার লোক সংখ্যা ঠিক করা যায়।

সুতরাং এ হেন বাঙ্গালীকে আমরা কিছু অল্প করিয়া আদিরস ও করুণরস আস্বাদন করিতে ব্যবস্থা দিই।

এইরূপ বীররসটা আমাদের তিক্তরসের সমান। বসন্তকালে যেমন তিক্ত খাইতে হয়—শরীরটা একটু গরম করিবার জন্য; সেইরূপ জীবনের বসন্তকাল যৌবনেও কিঞ্চিৎ বীররস আস্বাদনের প্রয়োজন—প্রাণটা একটু মাতান চাই। আবার যেমন চির জরা বাঙ্গালীর এক্স্‌ট্রাক্ট অব নিম ঔষধ, সেইরূপ ভীরু, প্যানপেনে, করুণরসের আধার বাঙ্গালীর পক্ষে একটু বীররস মন্দ ঔষধ নহে। তবে নাটুকে ও যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি হাতুড়ের হাতে পড়িয়া ঔষধটায় বড় গুণ দেখিতেছে না। হাস্য রসটাকে আমরা লবণরস মনে করি। দুইটাই শুধু খাওয়া যায় না—কিন্তু সকল রসের সহিতই বেশ মিশ খায়। তবে লবণে আর মধুরে যেমন বিরোধ,—হাস্যে ও করুণায় সেইরূপ বিরোধ আছে। এইরূপ বীভৎসরসে আর কষায় রসে, শান্তরসে আর অম্লমধুর রসে, অদ্ভুত রসে আর লবণাম্ল রসে, রৌদ্র রসে আর কটু সে, এবং ভয়ানক রসে আর কটু কষায় রসে—বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক, এখন রসের কথায় আর কাজ নাই। এক বার বাঙ্গালী কবি-সুপকারদের রন্ধন ব্যাপারটা দেখা যাউক। আর যদি তাহা আস্বাদন করিতে ইচ্ছা হয়—তবে সাবধানে করা চাই- যেন পরিপাক হয়।

১। আমাদের প্রথম কবি-পাচক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। কিন্তু ইঁহাদের কাব্যে পাকের কার্য্য বড় অধিক নাই। মানুষগুলা প্রথম অবস্থায় রাঁধিতে জানিত না—তখন মানুষ (Cooking animal) পাচক জন্তু হয় নাই। তাই বুঝি বাঙ্গালীর আদি কবিদের কাব্যে রন্ধন ব্যাপারটা দেখিতে পাই না। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর সকের খাবার ছিল চিঁড়া দই। বাঙ্গালীর তখন তাহাতেই ভোরপুর হইত। সুতরাং বিলাতী মতে,—অনুমান খণ্ডের সাহায্যে—ডারউইনের আবিষ্কৃত তত্ত্বের বলে—আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বাঙ্গালী তখন পুরা সভ্য হয় নাই। যাহা হউক আজিও অনেক বনেদি ঘরের বনেদি পর্ব্বোৎসবে ফলারের ব্যাপারে চিঁড়া দৈয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে—বিশেষ পল্লিগ্রামের বড়ঘরে এখনও এ নিয়ম বলবৎ। এখনও পাড়াগাঁয়ে বিবাহের বরযাত্র গিয়া—অনেকের ভাগ্যেই লুচির পরিবর্ত্তে—চিঁড়ার ফলার মাত্র জুটে।

সুতরাং বাঙ্গালীর প্রথম কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যে" আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইতে পারিবেন, ইহা সম্ভব নহে। তাই বলি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কাব্য আমাদের চিঁড়ার ফলার। ইহার মধ্যে বিদ্যাপতির ফলার কিছু পাঁকা রকমের। ইহাতে দৈয়ের বদলে ক্ষীর আছে—গুড়ের বদলে সন্দেশ আছে। যাঁহারা ফলারে ব্রাহ্মণ তাঁহাদের নিকট এ ফলার বড়ই মধুর। যাঁহারা আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব, তাঁহারা ইহার মধ্যে ভক্তিরস ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। তবে যাহারা সে রসে রসিক নহেন—তাঁহার জন্য কবিবর কিঞ্চিৎ চিনি-পাতা দই—ও ভাল আনারসের চাটনিরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ চণ্ডীদাসের কাব্যও আমাদের চিঁড়ার ফলার। ইহাতে বিদ্যাপতির ন্যায় ক্ষীর সন্দেশ নাই বটে, কিন্তু ভাল আম কাঁঠালের রস আছে—সুতরাং ইহাও বড় সুতার। ইহাদের পরবর্তী গোবিন্দদাসের ফলারও বড় মন্দ নহে। সাদা সিদে হইলেও মাথা গুণে বড় মিষ্ট লাগে। আজ কালের দিনে—সভ্যতার পাতিরে—অনেক কাঁচা ফলার বড় বাড়িয়াছে। কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রেই স্বীকার করিবেন ইহা খাইতে যেমন মধুর, যেমন সুতার, তেমনই স্নিগ্ধকারী অথচ আদৌ পীড়াদায়ক নহে।

২। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরেই চৈতন্যের আবির্ভাব। লোকটা বড় রসিক। নানারূপে সমস্ত দেশময় রস ঢালিয়া গিয়াছেন। একদিকে যেমন প্রেমঘৃতে পাক করিয়া ভক্তিরসে মজাইয়া, ভক্ত বৈষ্ণবদের উপাদেয় করিয়া দিয়াছেন—যেমন ভোজনের 'বাসী ভোগ' 'মালপো ভোগ' প্রভৃতি নানারূপ নূতন ভোগের সৃষ্টি করিয়া—কাঁচা চিঁড়া দৈয়ের ফলারকে ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে অনেক উঠাইয়া দিয়াছেন—সেইরূপ আবার কতকগুলি প্রেমিক ভক্তকে কবি করিয়া বাঙ্গালার পুরাণ কাব্যরসের এক নূতন অদ্ভুত রকমের পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বৈষ্ণব কবিদের কাব্যমধ্যে—জীবগোসাঞের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, আর কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতই প্রধান। সংসারের একটা আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, সময়ে সময়ে একটা শক্তিই নানারূপে কার্য্য করিয়া নানা ভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। সুতরাং সে কার্য্য গুলির মধ্যে বড় একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকে; যে শক্তির ক্রিয়া হইতে মালসি ভোগের উৎপত্তি—সেই শক্তিই রূপান্তর হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কাব্যের

স্থাই। তাই মালসি ভোগের সহিত এই সকল খাদ্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মালসি ভোগ এই কাণ্ডগুলিও তাই। যাঁহারা মালসি ভোগের মর্ম জানেন তাঁহারাই বুঝিবেন, জিনিসটা কি উপাদেয়। এ রসে রসিক বৈষ্ণবগণ—বোধ হয় অমৃত ফেলিয়া এই মালসি ভোগের আদর করেন। যাহাহউক, যদি চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে তবে প্রথম খানি মালসিভোগ আর দ্বিতীয় খানিকে মালপো ভোগের সহিত আমরা তুলনা করিতে পারি। অনুরোধ করি পাঠকগণ একবার সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া—সভ্যতার গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া এই উপাদেয় মালসি ভাগ ও মালপো ভোগ ভোগ করিয়া দেখিবেন—আশা করি, একবার খাইলে ছাড়িতে পারুন আর না পারুন, কখন ভুলিতে পারিবেন না।

৩ তাহার পর রামায়ণ মহাভারত। আমি মহাভারত রামায়ণে বড় তফাৎ দেখি না। তবে মহাভারতে রকম অনেক বেশী,—বৈচিত্র্য ইহার প্রাণ; তাই কথায় বলে "যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে"—রামায়ণে এত বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু রামায়ণের কিন্তু কিছু উচ্চদরের। রামায়ণ এই ভেতো বাঙ্গালীর সাদা ডাল ভাত না হলে আমাদের মুখে একদিনও চলে না। ভাতের ন্যায় রামায়ণ আমাদের শরীর মনে পুষ্ট করে। ইহা দ্বারাই সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্র সংগঠিত ও সংশোধিত হয়। আমরা শিশুকালে ঠাকুরমা ঠাকুরদাদার কাছে রামায়ণের ছড়া শুনিয়া সুখ করিয়াছি। রামায়ণ পড়িতে বসিলাম—মাটির সানকে আসিয়া সেই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিত। এখন সে দিন গিয়াছে কিন্তু এখনও সামান্য দোকানদার ছোটলোক সকলেরই রামায়ণ প্রধান পাঠ্যপুস্তক। তাই বলি রামায়ণ আমাদের সাদা ডাল ভাত, না হলে একদিনও চলে না। সভ্য হইয়াছি মনে করিয়া যেন কেহ এই ডাল ভাত উপেক্ষা করিও না—তাহা হইলে বাঙ্গালীজীবন বৃথা হইবে।

আর মহাভারত—সেত গৃহস্থ বাড়ীর মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ। বাস্তবিক ইহাতে সাদা ভাত হইতে আরম্ভ করিয়া—পায়সান্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতি সমস্তই আছে—প্রাণ পরিতোষ করিয়া যত পার তত উদরসাৎ কর। কোন অপকার নাই—অথচ বেশ উপাদেয়। তবে রামায়ণের সাদা ভাতে রন্ধনে যেমন একটু বিশেষ রকমের মধুরতা—যেমন উপাদেয়তা আছে—

মহাভারতে তত নাই। আর কর্ম্মবাড়ীর নানারূপ তরি তরকারির মধ্যে যে সবই ভাল হইবে—ইহা তোমার আশা করাই অন্যায়। গৃহিণী স্বামী পুত্রের জন্য কায়মনোবাক্যে অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে যাহা রাঁধিলেন, তাহা সামান্য হইলেও ভোজনে যত তৃপ্তি হয়—কর্ম্মবাড়ীর পাচটার কারবারে গণ্ডগোলে—তাড়াতাড়িতে ততদূর হইবে কেন? যাহা হউক পাঠকগণ কি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন? আমাদের কিন্তু সাদা ভাতের নিমন্ত্রণ করিতে ভয় হয় পাছে সভ্য মহোদয়গণ সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন। আমরা জানি ইঁহারা 'যগ্গী' বাড়ী গিয়া সাদা ভাত খাইতে বড় নারাজ। সুতরাং ইঁহাদের নিমন্ত্রণ করাও দায়— আর নিমন্ত্রণ করিলেও হয়ত লোকদিয়া দুই টাকা প্রণামি বা দক্ষিণা (তাও বটতলার অনুগ্রহে দশ আনা মাত্র) পাঠাইয়া দিবেন—নিজে সে মুখ হইবেন না। সুতরাং এরূপ লোকের যে কখন মহাভারত পড়া ঘটিবে সে বিশ্বাস আমাদের নাই। কিন্তু এই সব সভ্য লোককে আমরা নিমন্ত্রণ করি, আর নাই করি,—সাধারণ পাঠকত সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন।

৪। এখন কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কথা বলি। চণ্ডী পড়িলেই আমার শ্রাদ্ধ বাড়ীর মধ্যাহ্ন ভোজনের পাকা লুচার ফলার বা জলপান মনে হয়। লুচী বাঙ্গালীর কাছে বড়ই উপাদেয়, বুঝি এমন ভাল জিনিস আর নাই। ফলারে ব্রাহ্মণ আধক্রোশ দূর হইতে ত লুচীর গন্ধ পায়, তাহার প্রাণ আন্‌চান্ করে, মন আহ্লাদে লাফাইয়া উঠে। শিকলে বাঁধা শিকারী কুকুরগুলা দূরে শীকার দেখিলে—যেমন সমুখের দুই পা তুলিয়া শিকলে জোর দিয়া দাঁড়ায়, লুচির গন্ধে মনও তেমনি করিয়া হামাগুড়ি দিয়া উঠে। এমন লুচী যে আমাদের প্রধান খাদ্য নহে, এ কথা কোন পাষণ্ড বলিতে সাহসী হইবে। চণ্ডী পাঠেও আমাদের মনে ঠিক সেইরূপ আনন্দ হয়, আমার লুচীর ফলারে জুটিল মনে হয়। বাস্তবিক ইহাতে এমনই পরিতৃপ্তি হয় যে, দুই এক দিন ভোজন না জুটিলেও চলিতে পারে। আজকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাতী অখাদ্যভুকের মধ্যেও অনেককে লুচীর বিশেষ পক্ষপাতী দেখা যায়। স্বয়ং মহাজা মহাশয়ই আমাদের কবিকঙ্কণকে দেশী 'চসার মনে করিয়া লাল ফেলিয়াছে।

৫। তাহার পর আমাদের 'মনসার ভাসান।' মনসার ভাসান পড়িলেই আমার আঁরান্ধের (অরন্ধনের) পান্তা-ভোজন মনে পড়ে। জিনিষটা সকলের

ভাল লাগে না। বিশেষত যাহারা ছেলে বেলা শীতকালে সকালবেলা রৌদ্রের দিকে পিঠ দিয়া—আলুপোড়া আর পান্তাভাত না খাইয়াছে—সে হয়ত চিরজীবনে কখন আরান্ধের পান্তা ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে না। তবে আজ কাল অনেক বাবুরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, আম পাকানে গরমের দিন, সক্ করিয়া বিকালে ভিজা ভাতও খাইয়া থাকেন—শরীর ঠাণ্ডা হয়—বায়ুও, পিত্তের প্রকোপ দূর হয়। আশা করি, ইহারা আরান্ধের নিমন্ত্রণ অবহেলা করিবেন না। কারণ সেদিন মা মনসার বরে পান্তাভাত খেতে বড় ভাল লাগে। আর তাতে আমোদও বিলক্ষণ আছে। দেশী লোক, দেশী চালে, দেশী ধরণে, পুরাণ ধরণে যে রীতিটা রক্ষা করে তা তুমি নিজে রক্ষা কর, আর না কর, তাহার উপর কখন নাক তুলিয়া তাকাইও না।

৬। এখন রামেশ্বরের শিবায়ন জিনিসটা কিরূপ দেখা যাউক। আমার বোধ হয় শিবায়ন আর সাড়ে আঠার ভাজা দুই এক পদার্থ। ইহাতে নাই—এমন জিনিস নাই। কোথায় শিবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইবে—না তাহার সহিত রুক্মিণীর এবং, বাননাম মাহাত্ম্য, সতী মাহাত্ম্য, নানারূপ ব্রত কথা, বাণরাজার উপাখ্যান, প্রভৃতি হরেক রকম পৌরাণিক উপাখ্যান—আরও কত চুটকি কথাই ইহাতে বর্ণিত আছে। আবার গল্পগুলি ও সহজভাবে লিখিত নহে। নানারূপ রঙ দিয়া, নানা ঢংয়ে সাজাইয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার করা হইয়াছে। আমাদের সাড়ে আঠার ভাজাও তাই—নানারূপ জিনিস লইয়া—তাহাদিগকে ভাজিয়া রূপান্তরিত করিয়া একরূপ নূতন আস্বাদ করা হয়। ভাজাগুলি স্বতন্ত্র খাইলে তত ভাল লাগে না ইহাদের সংমিশ্রণেই এত সুস্বাদু বোধ হয়—খাইতে লাগে ভাল। শিবায়নও তাই—ইহার এক একটি স্বতন্ত্র গল্প তত ভাল হউক না হউক—সকলগুলির সংমিশ্রণে যে জিনিসটা হইয়াছে, তাহা বড় সুন্দর। সাড়ে আঠার ভাজা বাদলার দিন বড় ভাল লাগে, আর লোক বিশেষের কাছে তাহার আদরের ত কথাই নাই। সাড়ে আঠার ভাজার প্রধান উপকরণ চালভাজা আর মুড়ি—শিবায়নের মূল কাণ্ড শিবের উপাখ্যান। এক চাউলেই আমাদের চিড়া হয়—পায়েস হয়, পোলাও হয়, খিচুড়ী হয়, সাদা ভাত হয়। এক শিবের উপাখ্যান লইয়াও তেমনি নানা কবি নানারূপ কাব্য লিখিয়াছেন। তবে রামেশ্বর শিবকে—কৃষক সাজাইয়া, শাঁখারি সাজাইয়া, কুচনী পাড়ার মধ্যে দেখাইয়া, কখন বা ভগবতীকে বা কালী সাজাইয়া—নানা রঙ্গ করিয়াছেন। তাই বলি

শিবায়নের শিবচরিত আমাদের সেই চালভাজা; জিনিষটা বড় মজাদার হইয়াছে খাইতে মন্দ লাগে না—কিন্তু আসল জিনিষটা বিকৃত হইয়াছে। সাড়ে আঠার ভাজার আর এক মজা ইহাতে ঝাল আছে, কিঞ্চিৎ তিক্ত আছে, কিছু কিছু সব রসই আছে, নাই কেবল মিষ্ট, আর কিছু অম্বল। শিবায়নেও কিছু কিছু সবই আছে, নাই কেবল করুণরস, আর রীতিমত আদিরস। তাই বলি শিবায়ন আর সাড়ে আঠার ভাজা একই জিনিস।

৭। আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে একজন প্রাচীন কবি নূতন পরিচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছেন। প্রাচীন 'মহাকবি' ঘনরাম সাহিত্য সংসারে দেখা দিয়াছেন সুতরাং এই কবি পাঠকের পরিচয় দিতে আমরা বাধ্য। তাঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পড়িলেই আমার পোষপার্ব্বণের কথা মনে পড়ে। পোষ পার্ব্বনে পিঠা, পুলি, পায়েস প্রভৃতি নানারূপ খাদ্য ভোজনে যে পরিতৃপ্তি হয়, ঘনরাম পড়িয়া সেই ফল পাওয়া যায়। বিশেষ যাঁহারা পূর্ব্বাঞ্চলের পোষ পার্ব্বণের নিমন্ত্রণের মহাব্যাপার জানেন,তাঁহার কাছে পোষপার্ব্বণ বড়ই আদরের সন্দেহ নাই। ঘনরামের চরিত্র গুলি প্রায়ই নীচশ্রেণী হইতে গৃহীত—পিঠে পুলির কোটা চাউলও তাই। তাঁহার কাব্যে বড় অধিক শিল্প-কৌশল আছে বোধ হয় না—পিঠে পুলি প্রস্তুত করিয়াও অবশ্য কোন গৃহিণীকে শিল্পে গর্ব্ব করিতে শুনি নাই। যাহা হউক পিঠে পুলি যেমন খাইতেও মন্দ নহে, বিশেষ পাঁচ একত্রে খাইতে বেশ আমোদ আছে, ঘনরাম পড়িতেও মন্দ নহে, বিশেষ, পড়িলে শিক্ষা হয়, জ্ঞান লাভ হয়, পাঁচজন একত্র হইয়া পড়িতে বা গান শুনিতে, বেশ আমোদও আছে। পিঠে পুলির ভোজে ঝাল আর কটু ছাড়া সকল রসই কিছু কিছু পাওয়া যায়, তবে মিষ্টরসের বড় বাড়াবাড়ি। ঘনরামেও রৌদ্র, বীভৎস ছাড়া আর সব রসই প্রায় কিছু কিছু মিলে, তবে করুণ রসের কিছু বাড়াবাড়ি আছে। আজ কাল এই সভ্যতার খাতিরে যদি কেহ পিঠে পুলি না ঘৃণা করেন, তবে তিনি আনন্দের সহিত ঘনরাম পড়িবেন, সন্দেহ নাই।

৮। সে যাহা হউক, এখন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কথা বলি। তাঁহার পদাবলীর ন্যায় মধুর পদার্থ, বুঝি সংসারে, আর কিছুই নাই। পদাবলীর নাম শুনিলে আমাদের কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ হয়, কি অদ্ভুত মোহ আমাদের মনকে অভিভূত করে, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণকে কিরূপ আকুল করে। ইহার তুলনা মিলে কি? সমস্ত জগতের সাহিত্যে বুঝি

ইহার জোড়া নাই। যদি আমাদের অমৃত আস্বাদনে, অধিকার থাকিত— তবে বলিতাম এ পদাবলী অমৃত বই আর কিছুই নহে। অন্ততঃ যদি সোমরস কি, তাহা বুঝিতাম তবে স্বয়ং এই সোমরসের সহিত ইহার তুলনা দিতাম। বাস্তবিক এই খানেই কবি পাচক সাধারণ পাচককে হারাইয়া দিয়াছে।

কবিরঞ্জনের কালীকীর্ত্তন জিনিসটাও বড় সুন্দর। লোকটা অদ্ভুত রকমের ভক্ত ছিল—ভক্তি রসে নিজে যেমন গলিয়া যাইত, তেমনি অন্যকেও গলাইতে পারিত। কালীকীর্ত্তনে সে ভক্তি রসের ছড়াছড়ি করিয়াছে, আমরা, ভক্তিরসকে খাঁটি সন্দেশ মনে করি। ইহা প্রধানতঃ করুণ রস দ্বারাই পরিপুষ্ট এবং ছানার কিঞ্চিৎ অম্ল রস দ্বারা প্রস্তুত। সুতরাং যদিও ইহাতে অম্ল মধুর রস পাওয়া যায়, কিন্তু ময়রার পাকের কৌশলে ইহাতে যে একরূপ নূতন সুস্বাদ হয়, তাহা সাধারণ অম্ল মধুর রসে মিলে না। যাহা হউক কবিরঞ্জন কালীকীর্ত্তনও এক শ্রেণীর সন্দেশ মাত্র। কবিরঞ্জন আমাদের নানারূপ সন্দেশের নমুনা দিয়াছেন, যথা,

ভক্ষ্য দ্রব্য নানাজাতি অতি মনোহরা।

*   *   *   *   *

অপূর্ব্ব সন্দেশ নাম এলাইচ দানা। (বিদ্যাসুন্দর)

আমরা এই এলাইচ দানার সহিত তাঁহার কালীকীর্ত্তন তুলনা করিতে পারি।

তাহার পর কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর। আমরা তাহার বিদ্যাসুন্দরকে ভুনি খিচুড়ী মনে করি। ইহাতে যেমন ঘি মসলা বেশী আছে, তেমনি রন্ধনেও কিছু পারিপাট্য আছে। এই খানে বলিয়া রাখি, ভুনি খিচুড়ীটা নেহাত দেশী রান্না নহে। বাঙ্গালা অনেক দিন ধরিয়া মুসলমানদের অধীন ছিল। এতদিনের সংঘর্ষে যে বাঙ্গালী মুসলমানদের কিছুও অনুকরণ করিবে না, ইহা সম্ভব নহে। বিশেষ মুসলমানী রন্ধন বড় পারিপাটী। নবাবী রান্নার বুঝি কোথাও তুলনা মিলে না। বাঙ্গালী এমন উৎকৃষ্ট রান্না (অজ্ঞাতসারেই হউক, আর জ্ঞাতসারেই হউক।) অনুকরণ করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। যাহা হউক যে নবাবী বা বিলাসিতার ফল এই নবাবী রন্ধন—সেই বিলাসিতার ফলই মুসলমানি সাহিত্য। সুতরাং পারসী ভাষা বাঙ্গালী কবি অজ্ঞ অজ্ঞাতসারে

সেই কাব্যের অনুকরণ করিবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। তাই ভুনি খিচুড়ী যেমন মুসলমানি বাঙ্গালী রান্না,—কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরও তেমনি মুসলমানি বাঙ্গালী কাব্য। খিচুড়ীতে যেমন ঘিমস্‌লার সহিত রাঁধিবার কৌশল আছে বিদ্যাসুন্দরেও সেইরূপ ছন্দের পারিপাট্য, রচনার কৌশল বর্ণনার কারিগুরি আছে। খিচুড়ীর যেমন জিনিসগুলি সবই দেশী কোন-টিই হিন্দুর অখাদ্য নহে, বিদ্যাসুন্দরেও তাই। প্রভেদ কেবল রন্ধন কৌশল আর শিল্পকৌশল লইয়া। যাহা হউক বোধ হয় ভুনি খিচুড়ী বা বিদ্যাসুন্দর উপেক্ষা করেন, এরূপ লোক কেহ নাই। আমরা পাঠকদের কবিরঞ্জনের ভুনি খিচুড়ী খাইতে অনুরোধ করি, ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে চাট্‌নি আর শেষে মিষ্টান্নও যথেষ্ট পাইবেন, কোন ত্রুটি নাই।

৯। তাহার পর ভারতচন্দ্র। আমরা ভারতের অপূর্ব্ব কাব্যকে ভাল পোলোয়া মনে করি। ভারত যে সঘৃত পলান্ন খাওয়াইয়া ‘হরিষে অবশ অলস অঙ্গ’ মহাদেবকে নাচাইয়াছেন...তাঁহার কাব্য পড়িয়া আমরাও সেই রূপ আনন্দে বিহ্বল হইয়া যাই, তাঁহার নাচনি ছন্দের সহিত আমাদেরও তালে তালে নাচিতে ইচ্ছা করে। বাস্তবিক যেমন পোলায়ের মত ভাল খাবার আমাদের আর নাই, তেমনি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে ভারতের অন্নদামঙ্গলের ন্যায় কাব্যও আর নাই। এমন সুতার-মুখপ্রিয় জিনিষ বুঝি আর প্রস্তুত হয় না। তবে পোলাওয়ে কিছু ঘৃতের ভাগ অধিক থাকে, সুতরাং মুখপ্রিয় হইলেও অধিক খাওয়া যায় না, শীঘ্রই মুখ মেরে যায়। কিন্তু যাহা খাওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট তাহাতেই উদর পরিতোষ হয়। শুধু তাহাই নহে, দুই তিন দিন হয়তঃ পেট এমনি ভার থাকে, যে আর কিছু খাইতে ইচ্ছা করে না। ভারতের কাব্যে তাই, পড়িলে এত পরিতৃপ্তি বোধ হয়, যে তখন আর কোন কাব্য পড়িতে ইচ্ছা করে না। আবার পোলাও যেমন বড় গুরুপাক, খাইলে সকল লোক তাহা হজম করিতে পারে না, বিশেষ যাহার অভ্যাস নাই, তাহার বড় বিপদ হয়, সেইরূপ অন্নদামঙ্গও। বিশেষ তাহার বিদ্যাসুন্দর অংশ সকলের পক্ষে পাঠ্য নহে, ইহা রুচিবায়ুগ্রস্ত পেট-রোগাদের পক্ষে বড় পীড়াদায়ক। যাহা হউক যদিও আমাদের দেশে পূর্ব্বে পোলাও প্রস্তুত করা জানিত কিন্তু ইদানী সকলে মুসলমান ধরণেই তাহা রাঁধিয়া থাকে। তাহার চাউল, ঘি, মাংস মসলা সকলই দেশী জিনিস সন্দেহ নাই কোন হিন্দুরই তাহা খাইতে

বিশেষ আপত্তি নাই তবে রান্নাটা নিতান্ত মুসলমানি ধরণের। যাহা হউক পোলাও রান্নায় রাঁধুনির বড় বাহাদুরি চাই; শতকে একজন লোকও পোলাও রাঁধিতে পারে না, ভারতের কাব্যেও যে অদ্ভুত শিল্প কৌশল আছে, তাহা কয়খান কাব্যে দেখিতে পাই? বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই বলিলেও চলে।

যাহা হউক, আজ কাল নব্য বাবুরা হিন্দুয়ানি মানেন না—পোলায়ে তাঁহাদের পলাণ্ডুর রস নহিলে চলে না—কিন্তু তাহা হইলে গোঁড়া হিন্দুর তাহা অখাদ্য হইয়া পড়ে, তাঁহারা সে পোলাও স্পর্শ করেন না। ভারত তাঁহার অন্নদামঙ্গল পোলাওয়ে পলাণ্ডুর রস দেন নাই বটে—কিন্তু তাঁহার বিদ্যাসুন্দর চাট্‌নিটা মুসলমানি ধরণের করিতে গিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ ঐ রস দিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং গোঁড়া রুচি-বীরগণের নিকট তাহা অখাদ্য হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার বর্ণনা বিশেষকে আমরা পেঁয়াজের রস মনে করি—তাহার উপর আবার স্থানে স্থানে রসুনের দুর্গন্ধও পাওয়া যায়। ভারতের চাট্‌নির মধ্যে তাঁহার রস মঞ্জরীটা সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু যাহাই বল—অনেকে কেবল চাট্‌নির খাতিরে—বেশি পোলাও খাইতে পারে—সেইরূপ আমরা জানি অনেক লোক শুধু বিদ্যাসুন্দরের খাতিরেই অন্নদা-মঙ্গল পড়িয়া থাকেন। চাট্‌নি নহিলে বুঝি পোলাও ভোজন সম্পূর্ণ হয় না। যাহা হউক নেহাত চাষা ব্যতীত কেহই পোলাওয়ের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে না—আর নেহাত অরসিক ব্যতীত কেহই ভারতের কাব্য রস পানে উপেক্ষা করে না—সুতরাং এ স্থলে সুপারিস নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের পরেই আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান কাল। এ কালে ইংরাজি চাল চলন ধরণ ধারণ সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই একমাত্র দেশী কবি ছিলেন—তাঁহার কাব্য আর মাছের ঝোল যে একরূপ তাহা পূর্ব্বে নবজীবনে দেখান হইয়াছে—সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ নবজীবন পড়িয়া বলিয়াছিলেন শুনিয়াছি—না, ও মাছের ঝোল হইতে গেল কেন? ও যে আমাদের ছেঁচ্‌ড়া! আমরা কি বলিব? "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" না—"আত্মবন্মন্যতে জগৎ।"

যাহা হউক আজ আমরা বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালী কবিদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। সে অনেক কথা। আবার তা বলিতে গেলেও অনেক

গোল আছে—লোকের গায়ে লাগিবে। আজ কাল আর সেকেলে গৃহিণী খুঁজিয়া পাই না। স্বামী পুত্র সেবার জন্য পাঁচ জনের জন্য—কর্ত্তব্য বোধে কায়মনোবাক্যে হেঁসেলঘরের অন্ধকূপে বসিয়া—ধোঁয়ায় নাকের জলে চখের জলে হইয়াও, মহা আনন্দের সহিত রন্ধন করে—এরূপ এখন কয়টা গৃহিণী মিলে। এখনকার বাবু গৃহিণীদের রান্না কেবল সক্—কেবল নাম নেবার জন্য;—আমি বাঁধিতে জানি এই বাহাদুরী দেখাইবার জন্য। কালে ভদ্রে কদাচ একদিন তাঁহারা রসুই ঘরে প্রবেশ করেন মাত্র। শুধু তাহাই নহে—তাঁহাদের রান্না যেরূপই হউক, ঢালাও প্রশংসা করা চাই—নহিলে নিস্তার নাই—তাহা না হইলে, অভিমানে—রাগে আর রক্ষা থাকিবে না। আজ কালের কবিরাও সেই ধাতুর। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরে কাব্য লেখা সখে—কর্ত্তব্য বোধে নহে। তাহার উপর যদি কেহ তাহা মন্দ বলিল, তবে রক্ষা নাই—সে এক মহাবিভ্রাট। এমন স্থলে আজ আমরা তাঁহাদের কাব্য সমালোচনা নাই করিলাম।

তবে উপসংহারে একটা কথা বলিয়া রাখি। যে ইংরাজী শিক্ষার ফলে—বিদেশী আচার ব্যবহার অনুকরণ প্রবৃত্তি আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে—যে কারণে আমরা অখাদ্য ভোজনে লোলুপ হইয়া চুপে চুপে গুপ্তদ্বার দিয়া, উইলসন হোটেলে যাইতে শিখিয়াছি—সেই প্রবৃত্তির বলেই দেশী ধরণে, দেশীভাবে লিখিত বাঙ্গলা কাব্য আমাদের ভাল লাগে না। আমরা চণ্ডী ফেলিয়া চসার পড়ি, ভারত ছাড়িয়া পোপ পড়ি, চরিতামৃত ছাড়িয়া মিলটন পড়ি, রামায়ণ ছাড়িয়া ইলিয়ড্ পড়ি, বিদ্যাপতি ছাড়িয়া সনেট্ পড়ি। যেমন দেশী সূপকার আমাদের অখাদ্য ভোজন স্পৃহা নিবারণ জন্য শকুন্তলা হোটেল' খুলিলেন, গৃহিণী যেমন ফাউল কবি রাঁধিবার জন্য স্বতন্ত্র হাড়ি কাড়িলেন—সেইরূপ দেশী কবিও গতিক দেখিয়া কেহ ফাউলকরি, কেহ পোটেটো চপ্, কেহ মটন চপ, কেহ কট্‌লেট, কেহ রোষ্ট রাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের জয় হউক।

দেব-ধর্ম্মী মানব।

দিন রাত্রি, আলো অন্ধকার, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, সুখ দুঃখ, তিক্ত মধুর শীতল উষ্ণ, পৃথিবীর দুইটি দিক, দুইটি রূপ, দুইটি ভাগ। ইহার মধ্যে একটি মাত্র দেখিলে পৃথিবী দেখা হয় না; পৃথিবীর অর্দ্ধেকও দেখা হয় না। যে শুধু তিক্তরস আস্বাদন করিয়াছে, কখনও মধুর রস আস্বাদন করে নাই, সে তিক্তরস ও আস্বাদন করে নাই। অতএব পৃথিবী বুঝিতে হইলে তাহার দুইটি দিকই বুঝা আবশ্যক, একটি দিক মাত্র বুঝিলে তাহার কোন দিকই বুঝা হয় না। কিন্তু পৃথিবীর যেমনি মানুষেরও তেমনি দুইটি দিক আছে। একটি ভাল দিক একটি মন্দ দিক। মানুষের পদতলে পৃথিবী, মানুষের মস্তকোপরি স্বর্গ। তাই বুঝি মানুষ এক দিকে পশু, আর একদিকে দেবতা। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, কথাটা ঠিক যে মানুষ এক দিকে পশু আর এক দিকে দেবতা। অতএব মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার পশু-ধর্ম্ম ও বুঝা চাই, দেবতা-ধর্ম্মও বুঝা চাই। গত বারের নবজীবনে পাঠক পশু বা জন্তু ধর্ম্মী মানব দেখিয়াছেন। এবার তাঁহাকে দেব-ধর্ম্মী মানব দেখাইব।

জন্তু ধর্ম্মী মানবের ন্যায় দেব-ধর্ম্মী মানব ও নানা শ্রেণীরও নানা প্রকৃতির। জন্তু প্রকৃতি ও যেমন বহুবিধ, দেব-প্রকৃতিও তেমনি বহুবিধ। জন্তুর মধ্যে সর্প বৃশ্চিক, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কুর, মার্জ্জার, প্রভৃতি সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন। দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গনেশ প্রভৃতি সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট। অতএব জন্তু-ধর্ম্মী মনুষ্যের মধ্যে সকল রকমের মনুষ্য যেমন বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না দেবতা-ধর্ম্মী মনুষ্যের মধ্যেও তেমনি সকল রকমের মনুষ্য বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। ফলতঃ সকল রকম বর্ণনা করিবার আবশ্যকও নাই। উদাহরণ স্বরূপ দুই তিন রকমের দেব-ধর্ম্মী মানুষের কথা বলিলেই পাঠক সকল রকমের দেব-ধর্ম্মী মানুষ ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। অতএব তাহাই করিব।

তত্র অন্নপূর্ণা-ধর্ম্মী।

জগন্মাতা অন্নপূর্ণা জগৎকে অন্ন দিয়া রক্ষা করেন। মনুষ্য মধ্যেও অন্নপূর্ণা আছে।

এই সেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন তুমি আমিও একটু একটু দেখিয়াছি—সেইদিনকার সেই পিতামহ ঠাকুরের কথা বলিতেছি। পিতামহ ঠাকুরের গৃহে লোক ধরে না—স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভাইপো আছেই ত। কিন্তু আরো যে কত আছে তাহা বলিতে পারি না। আহা! জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে স্ত্রী বল পুরুষ বল যে যেখানে নিরন্ন নিরাশ্রয় হইয়াছে সেই আমার পিতামহ ঠাকুরের গৃহে পুত্র কন্যা অপেক্ষা ও প্রিয়, গৃহদেবতা অপেক্ষাও সমাদৃত, গুরুদেব অপেক্ষা ও সম্মানিত। পিতামহ ঠাকুরের বেশ ভূষা নাই তাঁহার পায়ে একটি যোড়া খড়ম, পরণে একখানি থান কাপড়, স্কন্ধে একখানি সেইরূপ উত্তরীয়। তাঁহার ভোগবিলাস নাই—তিনি গাড়ী ঘোড়া কখনও চক্ষে দেখেন নাই, আতর গোলাপের নাম শুনিয়াছেন মাত্র, ভোজন করেন আশ্রিত অনাথা অনাথিনীরা যা তাই, তাহার চেয়ে খারাপ ত ভাল নয়। তাঁহার বিষয় বৈভবের ভাবনা নাই—তিনি মনুষ্য মধ্যে অন্নপূর্ণা—তাঁহার একমাত্র ভাবনা,কিসে তাঁহার সেই অন্নের কাঙ্গাল গুলি অন্ন পাইবে। তিনি সকলের পেটের জ্বালা বোঝেন, কিন্তু তাঁহার আপনার পেটের জ্বালা নাই। বেলা দুই প্রহর হইয়াছে, তথনও তিনি আহার করেন নাই, কেন না তখনও তিনি অনুসন্ধান করিতেছেন পাড়ার হাড়ি মুচি কাওরা কৈবর্ত্তের মধ্যে কাহারো অন্ন জুটিল কি না। যাহার অন্ন যুটে নাই তাহাকে অন্ন দিয়া তবে আপান বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় স্বয়ং এক মুটা ভক্ষণ করিলেন। তিনি মনুষ্য মধ্যে অন্নপূর্ণা। তেমন অন্নপূর্ণা আমরা আর দেখিব না। আমাদের সে অন্নপূর্ণার পুরী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আর সেই রাঙ্গা দিদির কথা মনে পড়ে কি? সেই অসামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্না সেই কালের-ছায়া-মাখা-রক্তপদ্ম রূপিণী বালবিধবা রাঙ্গা দিদিকে মনে পড়ে কি? যদি না মনে পড়ে তবে সেই কৈলাসবাসিনী ভিখারী ভূতনাথের অন্নপূর্ণাকে মনে কর তাহা হইলেও সেই বঙ্গের বালবিধবা রাঙ্গাদিদিকে মনে করা হইবে "তিনি যখন শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিধানে আলুথালু কাল কেশরাশি কপালের উপর ভাগে এল বন্ধনে, রাঙ্গা হস্তে দর্ব্বী ভরিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে শত শত বালক বালিকাকে স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন, সকলে কাণাকাণি করিত যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা হইয়াছেন। বিবাহে, শ্রাদ্ধ ক্রিয়াকলাপে সমস্ত গৃহকার্য্যনির্ব্বাহকারিণী, রাঙ্গা ঠাকুরাণীই প্রধান

ভাণ্ডারিণী ছিলেন, তিনি নিজ হস্তে যাহাকে যাহা দিতেন তাহাই তৃপ্তিকর তাহার দ্বিগুণ অপরের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলেও কেহ সুখী হইত না। আম হউক বা কুল হউক, রাঙ্গাঠাকরুণ বাঁটিয়া না দিলে কাহারো মঞ্জুর নাই। আজ অন্নমেক, কাল তুলা, পরশু সাবিত্রী ব্রতদানে রাঙ্গাদিদির রাঙ্গা তবু নিয়ত ম্লান মুখটি কখন কখন প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইত। স্বয়ং নিঃসন্তান কিন্তু দেশের ছেলে তাঁহার সন্তান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না *।”

এ রাঙ্গাদিদিকে যে মানবী বলে দেবতা কাহাকে বলে সে জানে না। হিন্দুর গৃহে গিয়া অন্নপূর্ণা রূপিণী হিন্দুবিধবাকে দেখিলে সে প্রকৃত দেবতত্ত্ব শিখিতে পারে। রাঙ্গাদিদির ন্যায় অন্নপূর্ণা এখনও আমাদের ঘরে আছে। তাই আমরা এখনও একেবারে উৎসন্ন হই নাই। তাই বিষ্ণু এখনও আমাদিগকে পালন করিতেছেন এবং বিষ্ণুপালিত বিশ্বে আমাদের এখনও দাঁড়াইবার স্থান আছে। তাই মনুষ্য মধ্যে আমাদের মনুষ্য বলিয়া এখনও বেশ মান সম্ভ্রম আছে।

আমার মেজ কাকী আর একটি অন্নপূর্ণা। মেজ কাকীর বয়স চল্লিশের বেশি, কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, পাতলা ছিপছিপে, যেন ক্ষুদ্র চাঁপার কলিটি। মেজ কাকী গৃহের মধ্যে একজন গৃহিণী কিন্তু অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, ছেলেপুলেরাও তাঁহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। মেজ কাকীর গলা নাই তিনি এখনও আস্তে আস্তে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কন। মেজ কাকীর ছেলেপুলে নাই, কোন্ কালে তাঁহার একটি মেয়ে হইয়াছিল তাহা কাহারো মনে নাই। সে মেয়েটি আজ ষোল বৎসর শ্বশুর ঘর করিতেছে, তাহারও সন্তানাদি হয় নাই। মেজ কাকীর ঝাড়া হাত পা। কিন্তু মেজ কাকীর ঘরে ছেলে ধরে না। ঘোষেদের ছেলে, মিত্রদের ছেলে, সরকারদের ছেলে, গ্রামের সকলের ছেলে মেয়ে মেজ কাকীর ঘরে। মেজ কাকীর ঘরে সদাই ছেলের হাট। মেজ কাকী কোন ছেলেকে খাওয়াইতেছেন, কোন ছেলেকে পরাই-তেছেন, কোন ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছেন, কোন ছেলের গা মুছাইয়া দিতে-ছেন। মেজ কাকী উপর হইতে নীচে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে যাইতেছে; নীচে হইতে উপরে আসিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে

---

* জটাধারীর রোজনামচা নামক গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠা। রাঙ্গাদিদি কবির কল্পনা নয়,—এক সময়ে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে রাঙ্গাদিদি যথার্থই জীবিত ছিলেন, একথা আমরা জানি। রাঙ্গাদিদির আসল নাম অন্নপূর্ণা ছিল।

আসিতেছে। মেজকাকী ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন, তাঁহার এপাশে ওপাশে সামনে পিছনে ছেলের পালও 'ঠাকুল বাল কল' বলিয়া ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছে। রাত্রি এক প্রহর, তখনও মেজ কাকীর ঘরে পাঁচটা ছেলে। মেজকাকী তাহাদিগকে দুধ খাওয়াইয়া গুণ গুণ স্বরে গান গাইয়া ঘুম পাড়াইলেন, ছেলেদের মায়েরা আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল। একটি ছেলে মেজ কাকীর ঘরেই রহিল। সে ছেলেটা বড় দুরন্ত এবং তাহার মার আরো পাঁচটা ছেলে আছে। তাহার মা তাহাকে মেজ কাকীর কাছে রাখিয়া বাঁচিল। মেজ কাকীর একটি পয়সা খরচেরও দরকার নাই। কিন্তু খেলনায় ও সন্দেশ মিঠাই খৈ বাতাসায় তাঁহার মাসে পনর ষোল টাকা ব্যয় হয়। মেজ কাকা একটু একটু আফিঙ্গ খান তাই তাঁহার প্রতিদিন সেরটাক দুধের দরকার, তার বেশি নয়, কিন্তু প্রতি দিন তাঁহার ঘরে পাঁচ ছয় সের দুধ খরচ হয়। মেজকাকীর ঝাড়া হাত পা, কিন্তু দিনে রেতে তাঁহার সাবকাশ নাই—এমন কি মেজ কাকা পাঁচ বার চাহিয়াও একবার একঘটি জল পান না। মেজকাকী জগদ্ধাত্রী, যাহার ধাত্রীর আবশ্যক সেই তাঁহার কাছে আসে। তিনি অন্নপূর্ণা, স্নেহের ভিখারী শিশুকে তিনি দিবারাত্রি স্নেহ সুধা পান করান।

আর ঐ ছোট দাদা? উনিও অন্নপূর্ণা। দশ ঘর জ্ঞাতির মধ্যে উনিও এক ঘর। কিন্তু এক ঘর হইয়াও উনি সকল ঘরেই সমান। আপনার ঘরেও যেমন, জ্ঞাতিদের ঘরেও তেমনি। ওঁর আপনার ছেলে মেয়ে ভাই ভাইপো ও যেমন জ্ঞাতিদের ছেলে মেয়ে ভাই ভাইপোও তেমনি। জ্ঞাতি সুখী হইলে ওঁর সুখ উথলিয়া উঠে। জ্ঞাতি কষ্ট পাইলে ওঁর প্রাণ কাঁদিতে থাকে। ওঁর জ্ঞাতিও যেমন ওঁর আপনার ওঁর গ্রাম শুদ্ধ লোকও তেমনি ওঁর আপনার। উনি সকলেরই ছোট দাদা। বাপও উঁহাকে ছোট দাদা বলে, ছেলেও উঁহাকে ছোট দাদা বলে ছেলের ছেলেও উঁহাকে ছোট দাদা বলে, গ্রাম শুদ্ধ উঁহাকে ছোট দাদা বলে। উঁনি 'কোম্পানির ছোট দাদা'। ওঁর গুণে সমস্ত গ্রাম খানি একটি কোম্পানি—এক পথে চলে, এক সুরে কাঁদে, এক সুরে হাসে। উঁহাকে ধরিয়া গ্রামখানি বাঁচিয়া আছে। উনি গ্রাম খানির প্রাণ। উনি গ্রামের অন্নপূর্ণা। কিন্তু হায়! উঁহাকে এখন আর বড় দেখিতে পাই না। তখন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে কোম্পানির দাদা, কোম্পানির কাকা দেখিতে পাইতাম। এখন আর বড় পাই না। বঙ্গদেশ

এখন দেবতাশূন্য হইতেছে। সত্যই বঙ্গে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে! তুমি বঙ্গীয় প্রাচীন সমাজের কতই নিন্দা কর এবং বলিয়া থাকে যে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে সে সমাজ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সহস্র দোষ সত্ত্বেও সে সমাজে দেবতা ও দেব-চরিত্র ছিল। সে দেবতা ও দেব চরিত্র হারাইয়া তোমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তোমাদের কথিত উন্নতি তাহার এক শতাংশও পূরণ করিতে পারিবে না। গুণ বল, বুদ্ধি বল, বিদ্যা বল, স্বাধীনতা বল, সাম্য বল, চরিত্রের সমান কিছুই নয়। আমরা সেই চরিত্র হারাইতেছি। ভগবান জানেন আমাদের উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে।

তত্র দিকপালধর্ম্মী।

হিন্দুশাস্ত্রে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পাল দেখিতে পাই। সকল দিক রক্ষিত না হইলে কোন দিকই থাকে না। আপনার দিকও যায়। সেইজন্য দিক্‌পাল চাই। মনুষ্য মধ্যেও দিকপাল-ধর্ম্মী আছে। গর্দন ও গারিবল্‌দি উচ্চ শ্রেণীর দিকপাল। গর্দন যখন সুদানে ও চীন দেশে যান তখন দিক রক্ষার্থ দিকপাল স্বরূপ গিয়াছিলেন। গারিবল্‌দি যখন গাম্বেত্তার রিপব্লিকের পক্ষে যুদ্ধ করিতে যান তখন তিনি দিক রক্ষার্থ দিকপাল স্বরূপ গিয়াছিলেন। একটা দিক যখন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন দিকপাল বরুণ যেমন বারিবর্ষণ করিয়া সেই দিকটা রক্ষা করেন, তেমনি পৃথিবীর এক একটা দিক যখন উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন গর্দন ও গারিবাল্‌দি দিকপাল স্বরূপ সেই সেই দিক রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অত বড় দিকপাল পৃথিবীতে বড় কম। সামান্য সংসারধর্ম্মী মানবের ও অত বড় দিকপালের কথা শুনিয়া বিশেষ লাভ নাই। অতএব সমাজে নিত্য যে সব ছোট ছোট দিকপাল দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের কথা বলাই ভাল। আগে আমাদের সমাজে তেমন ছোট ছোট দিকপাল অনেক ছিল। রঘুনাথ দিব্য জোয়ান পুরুষ—বয়স ৩০।৩৫। রঘুনাথ অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল। তোমার বাড়ীতে আজ একটি বৃহৎ ক্রিয়া। তোমার লোক বল নাই। রঘুনাথ আসিয়া তোমার জিনিস পত্র ক্রয় করিয়া দিল, ঘর বাড়ী পরিষ্কার করাইয়া দিল, চালা চুল্লী প্রস্তুত করাইয়া দিল, লোক জন খাওয়াইয়া দিল। দশ দিন ধরিয়া রঘুনাথ এই সব করিল। তুমি রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলে। রঘুনাথ তোমাকে

নমস্কার করিয়া গিয়া তাহার পর দিন হইতে আবার ঐ সিংহ মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। রঘুনাথ চিরকালই এইরূপ করে—তাহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অসূয়া নাই, অভিমান নাই। রঘুনাথকে কি কখনও দেখ নাই? ঐ যে মিত্র মহাশয়ের মাতৃ শ্রাদ্ধে ঐ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক লোক একেবারে ভোজন করিতে বসিয়াছে, আর ঐ যে রঘুনাথ,—যুবা রঘুনাথ, দীর্ঘকায় রঘুনাথ, বলিষ্ঠ রঘুনাথ—কোমরে গামছা বাঁধিয়া পৌষ মাসের দারুণ শীতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অসুর বিক্রমে ঐ সহস্রাধিক ভোক্তাকে অন্ন ব্যঞ্জন ক্ষীর দধি মিঠাই মোণ্ডা পরিবেশন করিতেছে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তাহার পদ ভরে টলমল করিতেছে। বল দেখি রঘুনাথ যথার্থই অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বরুণের ন্যায় দিকপাল কি না। আবার মিত্র মহাশয়ের অন্দরে যাও—সেখানে রঘুনাথের মাকে দেখিবে, তিনিও এক দিক্‌পাল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিয়া তিনি রন্ধন আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বাদশটা চুল্লী জ্বলিতেছে, রঘুনাথের মা রন্ধন করিতেছেন। এখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, এখনও রন্ধন করিতেছেন। কোমরে অঞ্চল জড়ান, মস্তকোপরি কেশ চূড়ার আকারে বাঁধা, মুখ রক্তবর্ণ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত—এখনও রঘুনাথের মা অসীম উৎসাহে অসীম তেজে রন্ধন করিতেছেন। মিত্র বাড়ীর গৃহিনী বারম্বার বলিতেছেন—রঘুর মা, এক ফোঁটা চিনির পানা গলায় দিয়া যাও। রঘুর মা এখন উন্মাদিনী, সে কথায় তাঁহার কাণ নাই। বল দেখি রঘুনাথের মা যথার্থই অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বরুণের ন্যায় দিকপাল কি না।

দিক্‌পাল-ধর্ম্মীকে দিবাভাগে কেহ তাহার আপন বাড়ীতে দেখিতে পায় না। পূর্ব্বাহ্নে হউক, অপরাহ্নে হউক, যখন হউক, রঘুনাথের বাড়ীতে গিয়া রঘুনাথকে ডাকিলে। রঘুনাথের সাড়া শব্দ পাইলে না। আবার ডাকিলে, একটি ছেলে আসিয়া বলিল—বাবা বাড়ীতে নাই, ঘোষেদের বাড়ীতে আছেন। ঘোষেদের বাড়ীতে গিয়া দেখিলে রঘুনাথ ভিয়ানশালায় ভোক্তার সংখ্যার সহিত মিষ্টান্নের পরিমাণ হিসাব করিতেছেন। রঘুনাথ কখন একটিবার বাড়ীতে আসিয়া চারিটি ভাত খাইয়া যায় কেহ জানে না, কেহ বলিতে পারে না। রাত্রিকালে দিকপাল ধর্ম্মীর নিদ্রা বড় কম। যে নিদ্রাটুকু হয় তাহাও কাকনিদ্রাবৎ, একটা টিক্‌টিকির শব্দে সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। নিদ্রায়ও দিক্‌পাল-ধর্ম্মীর কর্ণ চারিদিকে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার,

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে। দিকপাল রঘুনাথ ঘুমাইয়াও জাগ্রত। রোদন-ধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, অনাথিনী হরসুন্দরীর পুত্রটি প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অমনি শয্যা ত্যাগ করিয়া আপনার ন্যায় আরো ২।৩টি দিকপালকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, মৃত পুত্রটির সৎকার্য্য করিয়া আসিলেন। রঘুনাথ দিকপাল বৈ কি,—রঘুনাথ দেবতা। কিন্তু রঘুনাথকে আর বড় দেখিতে পাই না। রঘুনাথ সভ্য হইয়া কিছু সৌখিন হইয়াছেন। রঘুনাথ এখন সর্ব্বত্র উঁকি ঝুঁকি মারেন, কিন্তু ঘাড় পাতিবার ভয়ে কোথাও আর দেখা দেন না। রঘুনাথ এখন বাবু। আমাদের কি কম উন্নতি হইয়াছে?

তত্র নারায়ণ-ধর্ম্মী।

অনন্ত শয্যা-শায়ী নারায়ণ স্বয়ং কিছু করেন না। তিনি সেই অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া এক রকম নিদ্রিত বলিলেও হয়। সব জানেন, সব দেখেন, কিন্তু নিদ্রিত। দেবতারা যখন বিপদে পড়েন, কি করিলে বিপদের শান্তি হয় ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না, তখন তাঁহারা নারায়ণের নিকট গমন করেন, এবং তাঁহার পরামর্শ লইয়া বিপদ খণ্ডন করেন। গ্রামবৃদ্ধ গুরুচরণ সরকার মহাশয়ও নারায়ণ-ধর্ম্মী। তাঁহার বড় একটা নড়া চড়া নাই। দিবা রাত্রি সেই বহির্ব্বাটীর বৈটকখানার ঘরটির ভিতর বসিয়া আছেন। একখানি মাদুরের উপর একখানি ক্ষুদ্র তোষক, তদুপরি বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি হুকা, তাহাতে একটি পাতার নল। এক পাশে একটি জলপাত্র, তদুপরি একখানি পাট-করা গামছা। ঘরের দেয়ালে দুই চারিখানি ঠাকুর-দেবতার পট। ঘরে সর্ব্বদাই দুই একটি লোক আছে। গ্রামের ছোট বড় সকলেই তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে আইসে। তিনি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রবীণ এবং গ্রামের সকল লোকের সকল কথাই জানেন। তিনি গ্রামের মধ্যে গ্রামের সর্ব্বজ্ঞ ও গ্রামের ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। তাই সকলেই তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে আইসে। তিনিও তাহাদের সমস্ত কথা সমস্ত ইতিহাস জানেন, তাহারাও তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলে, তাঁহার নিকট হইতে কোন কথা গোপন করে না, গোপন করা প্রয়োজনও মনে করে না। তাহাদের তাঁহার নিকট হইতে গোপন করিবার কোন কথাও নাই। যাহারা শাস্ত্রানুসারে ও গ্রামবৃদ্ধদিগের

দৃষ্টান্ত ও উপদেশানুসারে সংসার-ধর্ম্ম করে, তাহাদের কাহারো নিকটে গোপন করিবার কোন কথা থাকে না। তাই গ্রামবৃদ্ধ সরকার মহাশয় বাল্যকাল হইতে তাহাদের সকলের সকল কথা শুনিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার পিতা পিতামহের নিকট তাহাদের সকলের আগেকার সকল কথা শুনিয়াছেন। এখনকার মতন লোকের ঘরের কথা জানিয়া তাহাদের কুৎসা রটাইবার জন্য জানেন নাই। সদুপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সৎপথে রাখিবেন বলিয়া তাহাদের সকল কথা জানিয়াছেন। তাই তাহারাও তাঁহার কাছে কোন কথা গোপন করে না এবং তিনি সকল কথা শুনিয়া ঠিক পরামর্শ দিয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে, বিধাতা হওয়া যায় না। নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জগতের বিধাতা এবং দেবতারাও তাঁহার নিকট ঠিক পরামর্শ পান। গ্রামবৃদ্ধ সরকার মহাশয়ও গ্রাম সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ। তাই তিনি গ্রামের বিধাতা এবং গ্রামের সকল লোকই তাঁহার নিকট ঠিক পরামর্শ পায়। সামান্য সংসারী লোকের পক্ষে তেমন একটা বিধাতা বা পরামর্শদাতা থাকা কি একটা কম সুখ ও সৌভাগ্যের কথা? ইউরোপ বলেন এবং আমরাও ইউরোপের দেখাদেখি বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, আপনার বিষয়কর্ম্মে আপনিই আপনার উৎকৃষ্ট পরামর্শদাতা, অন্যে ঠিক পরামর্শ দিতে পারে না। এ কথার গূঢ় অর্থ এই যে ইউরোপে কেহ কাহাকে আপনার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বুঝে না এবং সে জন্য কেহ কাহাকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিয়া আপনার সকল কথা খুলিয়া বলে না। এই কারণে ইউরোপীয় সমাজে কেহ গ্রামবৃদ্ধ সরকার মহাশয়ের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না এবং সেই জন্য ঠিক পরামর্শও দিতে পারে না। তাই ইউরোপীয় সমাজে নারায়ণ বা বিধাতা-ধর্ম্মী মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজের সমান হইয়া আসিতেছে। আমাদের শিক্ষিত সমাজে নারায়ণ-ধর্ম্মী মানুষের আর স্থান নাই। আমরা ধর্ম্মানুসারে চলি না। তাই আমরা কাহাকেও আমাদের সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারি না এবং সেই জন্য কেহ আমাদিগকে ঠিক পরামর্শ দিতে পারেন না। অগত্যা আমরা আপনারা আপনার পরামর্শদাতা হইয়াছি। আপনি আপনার পরামর্শদাতা হইলে যে ভুল ভ্রান্তি হয়, তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেছি এবং আপনি আপনার পরামর্শদাতা হইয়া আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধিকে এতই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইতেছি, যে অন্যে ঠিক

কথা বলিলেও তাহা ঠিক বলিয়া বুঝিতে ও স্বীকার করিতে অক্ষম হইতেছি এবং আপনার ভুল ভ্রান্তি হইলে আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে অশক্ত হইতেছি। ইহার অপেক্ষা উন্নতির প্রতিকূল অবস্থা আর কি হইতে পারে? নারী[illegible]-ধর্ম্মী মনুষ্য হারাইয়া আমরা দৈব-বল হারাইতেছি।

আমরা লেখা পড়া করিতেছি, গাড়ি ঘোড়া চলিতেছি, পুস্তক প্রবন্ধ লিখিতেছি, সমাজ সংস্করণ করিতেছি, সংবাদ পত্র লিখিতেছি, এখানে যাইতেছি ওখানে যাইতেছি, সভা সমিতি করিতেছি, বড় বড় বক্তৃতা করিতেছি। এত তাড়াতাড়ি এত কাণ্ড করিলে সকল দেশে সকলেরই মনে হয়, কতই উন্নতি করিতেছি। কিন্তু একবার নিশ্বাস ছাড়িয়া, স্থির হইয়া বসিয়া, ভাবিয়া দেখা উচিত—যে আমরা প্রকৃত পক্ষে উন্নত হইতেছি না অবনত হইতেছি? আমাদের মধ্যে যে দেব-চরিত্র কি, যে দেব-চরিত্র মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ ও আভরণ, সে দেব-চরিত্র লয় প্রাপ্ত হইতেছে? কি পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে? আমি কিছুরই বিরোধী নহি—গাড়ি ঘোড়া, পুস্তক প্রবন্ধ, সমাজ সংস্করণ, সভা সমিতি—কিছুরই বিরোধী নহি। কিন্তু সে সমস্ত পূর্ণ মাত্রায় পাইয়াও যদি সেই দেব চরিত্র হারাই, তবে অবশ্যই বলিব, আমাদের সে সব পাওয়া বৃথা হইল। সে সব পাইয়া আমাদের লাভ কিছুই হয় নাই, পরন্তু মনুষ্যঘাতী ক্ষতি হইয়াছে।

অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

প্রথম অধ্যায়।

১ম দৃশ্য।

বিশাল পদ্মার ক্রোড়ে রাজহংসের ন্যায় শ্বেতকায় বিপুল তরণী, "প্রিন্স-এলিস" মৃদু মন্দ নাচিতেছে। আমরা পরমানন্দে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। অগ্রে আমি, মধ্যে সুন্দরী, পশ্চাতে তাঁহার পিতার কেরাণী বাবু এবং তাহার পশ্চাতে আমাদের তল্পিবাহি কুলী।

আমি কিম্বা সুন্দরী কেহই ক্যাবিন ভাড়া করি নাই সুতরাং ডেকের উপরে যেখানে, সাহেবদের ডিনর বা ব্রেকফাষ্ট খাইবার জন্য একটি বৃহৎ টেবিল, এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে কতগুলির কেদারা ছিল, আপাতত তথায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কেরাণী বাবু তাহার প্রভুকন্যার আদেশানুসারে মালগুলি লইয়া অতি দূরে এক পাশে যাইয়া বসিয়া অপরাপর আরোহিদিগের সহিত তামাকু সেবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সুন্দরীর মুখকান্তি মলিন, এবং চিন্তা-লাঞ্ছিত দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাকে কিছু ভাবনা-যুক্ত দেখিতেছি কেন?"—তিনি একটু হাসিলেন, পরে ধীরে ধীরে একখানি গন্ধ-পরিপূরিত রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিলেন, মুখ খানি লাল হইল, তখন আবার হাসিয়া বলিলেন, "এখন?"

আমি বলিলাম, "মুখরাঙ্গা করিলে, কি চিন্তার রেখা ঢাকে?"—তিনি বলিলেন, "না এমন কিছু নয়, তবে—"

"তবে কি?"

"এই ঢাকা গেলেই সব ফুরাইল, তাই ভাবিতেছি।"

"কেন তার পর ত আবার বরিশাল আছে?"

"আপনি ত আর বরিশাল যাইবেন না?"

"আমার সঙ্গে ত পথের আলাপ, এরূপ পথিক আরো পাবেন।"

এই কথায় তিনি হাসিয়া তাহার পরে যেন একটু বেজার হইয়া বলিলেন,*—"মহাশয়!—

Glittering things are not all gold"

"কেন অন্তত হীরা চুনীও ত হ'তে পারে?"

এই সময়ে একটি মেম, একটি বাবু ও একটি সাহেব আসিয়া উপস্থিত। সাহেব বরাবর ক্যাবিনে চলিয়া গেলেন। মেম ও বাবু আমরা যেখানে বসিয়াছি, সেইখানেই বসিলেন। মেম সাহেব, বসিয়াই বাবুটির স্কন্ধে হাত দিয়া চুপি চুপি কি কহিলেন। বাবু গম্ভীর বদনে আমার পরিচিতা রমণীর

* মেয়ে মানুষে বেশ ইংরাজি বলিতে পারেন, অথচ আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ এসকল না বুঝিতেও পারেন, কাজেই আমাদিগকে মানে ভাজিয়া দিতে হইতেছে। ঐ ইংরাজি টুকুর মানে— "সকল চক্চকে জিনিশই কিছু সোণা নয়।"

দিকে তাকাইলেন। আর মেম সাহেব—আমার দিকে। এবারে ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম,—তিনি কৃত্রিম মেম সাহেব। তাঁহার সর্ব্বগ্রাসিনী দৃষ্টি দেখিয়া মনে কিছু ভয়ও হইল, ভাবিলাম—এ আবার কি!—কিন্তু সকলেই এখন নির্বাক্।

কিছু কাল পরে বাবু ডেকের উপর পা-চারি করিতে লাগিলেন, মেম সাহেবকে কিছু চঞ্চল প্রকৃতি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেননা তিনি পুরুষের সাক্ষাতে শীলতা-বিরুদ্ধ অঙ্গ সঞ্চালনে * এবং ভ্রুকুটি করিয়া পুন পুন মুখ সঞ্চালনে লজ্জা বোধ করিতে ছিলেন না। আমি এই সময়ে মনে মনে ভাবিতেছিলাম, যে সকল সৌখিন বাবু সৌখিনী মেয়েদিগকে মেম সাজাইয়া পর্দার বাহির করেন, হাবভাব বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া তাঁহাদের অগ্রে কর্ত্তব্য।

যাহা হউক মেম সাহেব কথা কহিতে না পাইয়া বড়ই ব্যস্ত হইলেন। অবশেষ আপনা আপনি, "এখনও জাহাজ ছাড়্ছে না কেন"? বলিয়া পুনঃপুন উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম "বেশী বিলম্ব নাই প্যাসেঞ্জর ও মালগুলি উঠিলেই ছাড়িয়া দিবে।" এইবারে তিনি আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন "ও বা'চ্লাম আমি মনে ক'রে ছিলুম আপনি বুঝি সাহেব।"

"সাহেব কি এত কালো হয়?"

"আপনি এমন কাল কি।"

এই সময়ে হঠাৎ পূর্ব্ব পরিচিতা রমণীর দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার কথঞ্চিৎ দুঃখও হইল; তাঁহার মুখ খানি বিমর্ষ, চক্ষু দুটি জলভারাক্রান্ত, যেন উহাতে ক্রোধ অভিমান ও সন্দেহের উদ্বেগ প্রকটিত। মনে মনে বলিলাম, 'ভগবান নিস্তার কর।' ভগবান যথার্থই নিস্তার করিলেন। এই সময়ে সাহেবে, বাঙ্গালিতে, খোট্টায় কতকগুলি লোক আসিয়া গোলমাল আরম্ভ করিল। নব পরিচিতা মেম সাহেব ধীরে ধীরে, উঠিয়া তাঁহার বাবুর সহিত পা-চারিতে যোগ দিলেন। পূর্ব্ব পরিচিতা রমণী আমাকে চুপে চুপে বলিলেন, "এখানে বসিয়া থাকিতে দিবে ত?"—আমার হাসি পাইল; বলিলাম, "ভয় নাই।"

---

* হাই তোলা, শরীর ভাঙ্গা, প্রভৃতি।

২য় দৃশ্য।

ধূম্রযান ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া ছুটিল। খালাসীরা দড়ি, কাছী, শিকল লইয়া দৌড়া দৌড়ি আরম্ভ করিল। নবাগত সাহেবেরা ক্যাবিনে যাইয়া 'বেয়ারা—সর্দ্দার—খানসামা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, এইরূপে কিছু কাল বিষম কোলাহল হইয়া সকলই নীরব হইল। কেবল ধূম্রযানের গর্জ্জন পদ্মার গম্ভীর গর্জ্জনের সহিত মিশাইয়া ভৈরব রব উত্থিত করিল। নদীজলের সুস্নিগ্ধ সমীরণ আমাদের গায়ে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। দূরে দুপাশে শস্য ক্ষেত্র, গাছ পালা ঘর বাড়ী বাজার গ্রাম,—যেন ভয়ে আমাদের বিপরীতে উদ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। আমি সেই শোভা নয়ন প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম।

এমন সময় কে আসিয়া আমার স্কন্ধে হাত দিল; চাহিয়া দেখিলাম পূর্ব্ব পরিচিত সাহেব। আমার তখনই "অনুকরনল সবপেন্টের" কথা মনে পড়িল তিনি হাসিয়া বলিলেন,—

"আমি এই খানে বসিতে পারি?"

"সচ্ছন্দে"

"আপনারা ব্রেকফাষ্ট করিয়া সুস্থ হইয়াছেন?"

"না।"

সাহেব অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ক্ষণকালের জন্য অদৃশ্য হইলেন। পাঠক এত আদর অভ্যর্থনার কারণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। সাহেব উঠিয়া যাইবার সময় আমার পরিচিতা রমণী একটু হাসিয়া, আমার দিকে চাহিলেন। ইহাতে বোধ হইল, তিনিও বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি বুঝিতে পারিয়া থাকেন তবে তাঁহার পক্ষে ইহা একরূপ (Triumph) বিজয়োল্লাস বটে। আমি এই অবসরে পা-চারি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণের পর চাহিয়া দেখিতে পাইলাম, আমার সঙ্গিনী সাহেবের সহিত আলাপ করিতেছেন। আবার অন্যমনস্কে পা-চারি করিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার যেন কর্ণে আসিল—Come into the cabin, then. you shall have short bread and sherry, whilst you look through the beautiful pictures in my tin case."* অমনি চক্ষু ফিরাইলাম।

* আমার কুঠারিতে চল, সেখানে রুটি ও সোর খাইবে, খাইতে খাইতে আমার টিনের বাক্সে যে সকল সুন্দর ছবি আছে, সেগুলি দেখিতে থাকিবে।

আশ্চর্য্য!—সাহেব ও আমার সঙ্গিনী হাত ধরাধরি করিয়া ক্যাবিনে ঢুকিতেছেন! মনে ঘৃণা হইল, বঙ্গ রমণীর এখনকার প্রথামত উচ্চ শিক্ষায় ঘৃণা হইল, তাহাদের অকাল-স্বাধীনতায়ও ঘৃণা হইল। একবার মনে করিলাম, "যাক্ আমারত কেহ নয়," আবার, বাঙ্গালার মেয়ে বলিয়া, নারী হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মনে করিয়া এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণ অরক্ষণীয়া অবস্থাপন্ন মনে করিয়া, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সাহেবের ক্যাবিনের ভিতর—নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া—যাইলাম না। নিকটে নিকটে ঘুরিতে লাগিলাম। আবার কাণে এল—"—just so, my dear,—Do you like the carraway comfits on the short-bread, or the bits of candied lemon best, eh?"—সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর দেখিয়া কিছু ভয় হইল। ধীরে ধীরে ডেকের টেবিলের দিকে যাইলাম। সেই সময়ে খানসামা দুই জনের ব্রেকফাষ্ট আনিয়া উপস্থিত করিল,—আমি তাহাকে ক্যাবিন দেখাইয়া দিয়া বলিলাম,—'মেম সাহেবকো জল্দি সেলাম্ দেও?" কিছু কাল পরে খানসামা এক টুকরা কাগজ আমার হাতে দিয়া আহার সামগ্রী ক্যাবিনে লইয়া গেল। কাগজে নীল পেনসীলে লেখা—"There is no formality here, we are friends, no excuse shall serve, pray, come in and join us."—

কেরানী বাবু আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'তিনি কোথায়?" আমি ক্যাবিন দেখাইয়া দিয়া বলিলাম "ঐখানে।"

"আর কে ওখানে?"

"একজন ইংরেজ—"

"সর্ব্বনাশ, আপনি যাইতে দিলেন কেন?"

"যাইতে না দেওয়ায় আমার অধিকার কি।"

বাবু হতভম্ব হইয়া আপনা আপনি বলিলেন—"দেখুন দেখি!"

৩য় দৃশ্য।

ক্যাবিনের ভিতরে এক খানি খাট দুখানি কেদারা ও একটি ছোট রকমের টেবিল। আমি প্রবেশ করিবা মাত্রই, একটু সাদরে গৃহীত হইলাম। খাটে আমার সঙ্গিনী বসিয়া ছিলেন, তাঁহার হাতে এবং ক্রোড়ে অনেকগুলি ভাল ভাল বিলাতি ছাব, ও খৃষ্টমাস—নিউইয়রস্ ডে—কার্ড। সাহেব নিকটস্থ কেদারায় বসিয়া সেইগুলি দেখাইতেছিলেন; টেবিলে আহারের দ্রব্য, সুরাপূর্ণ ডিকাণ্টর ও গ্লাস। ক্যাবিনস্থ দেব দেবীর রঞ্জিত নয়ন ও প্রফুল্ল বদন

দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, পান ভোজন পূর্ব্বেই একরূপ হইয়া গিয়াছে। আমি যাইয়া শূন্য কেদারা অধিকার করিলাম। এবং অনুরোধ ক্রমে কিঞ্চিৎ পানাহারও করিলাম।

সাহেবের বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে এবং অনর্গল বাক্-কৌশলে আমার সঙ্গিনী একবারে মুগ্ধ হইয়া দিশা হারা হইয়াছেন। তাঁহার তথাবিধ অবস্থা দৃষ্টে আমার যথার্থই একটু (jealousy) হিংসা হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম চুপ করিয়া থাকি, দেখি শ্রাদ্ধ কত দূর গড়ায়। এদিকে সাহেব উৎসাহে পুনঃ পুনঃ গলিত বহ্নি উদরস্থ করিতে লাগিলেন। ভদ্রতার অনুরোধে আমার সহিত একবারে আলাপটা না করা বড় ভাল দেখায় না, অথচ আমার সহিত সদালাপ (intellectual talk) করিয়া সঙ্গিনীর সম্মুখে কিছু অপদস্থ করিবেন এরূপও ইচ্ছা;—আলাপের প্রারম্ভেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। নিম্নে তাহার স্থূল স্থূল মর্ম্ম বিবৃত হইতেছে।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ঢাকা যাইতেছেন কি উদ্দেশ্যে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" আমি বলিলাম "শুদ্ধ বেড়াইতে।" সাহেব—"এবেলি নিয়ায় রাজপুত্রের ন্যায় সুখ খুঁজিতে নয়ত?"—বলিয়াই—সঙ্গিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি রাসেলাশ পড়িয়াছেন?"—তিনি—কহিলেন "না."—তৎপর আমার প্রতিও সেই প্রশ্ন হইল। আমি—বলিলাম, "রাসেলাশ পড়িয়াছি—তাহার পরিশিষ্ট ডিনার বাস পড়িয়াছি এবং রাসেলাশ যাহার সম্পূর্ণ অনুকরণে লিখিত—তাহাও পড়িয়াছি।" সাহেব ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—রাসেলাশ নূতনত্বের জন্য প্রশংসিত, আপনি কি সাহসে ইহাকে অনুকৃতি বলেন—authority কি?—আমি ধীরে উত্তর করিলাম—'Voltaires Condide পাঠ করিয়া দেখিবেন। সাহেব কিছুকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া—I see, I see করিতে লাগিলেন। সঙ্গিনী সংযত হইলেন। আমি মনে মনে বলিলাম আর ভাবনা নাই।

এই সময়ে হঠাৎ ভারি একটা গোল উপস্থিত হইল, সকল লোক কোলাহল করিতে লাগিল, সুতরাং আমরা সকলেই তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইলাম। যাইয়া দেখি, কতকগুলি খালাসী ও জাহাজের কাপ্তেন মারামারি করিতেছে—ডেকের আরোহীগণ চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্রই থামিয়া গেল, চাট্‌গেঁয়ে খালাসির হাতে কাপতান সাহেবের মাথা ভাঙ্গিয়া রক্তপাত হইতেছে। শুনিতে পাইলাম, একজন খালাসি নেমাজ করিতেছিল সাহেব তাহাকে সেই সময়ে লাথি মারিয়াছিলেন তাহাতেই এরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, গোল থামিল, আপদ গেল এ দিকে সন্ধ্যাও হইয়া আসিল—আমরা ডেকে বেড়াইতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার সেই কৃত্রিম মেম সাহেবের কথা মনে পড়িল। আমি তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম।